কেয়া
পাতার
নৌকো

কেয়াপাতার নৌকো

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে)

প্রফুল্ল রায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারী—১৯৬৩

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন

কলকাতা—৯

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিণ্টার্স

১২৮ বিধান সরণি

কলকাতা-৪

প্রচ্ছদ শিল্পী

প্রণবেশ মাইতি

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

ও

শ্রী বিমল কর

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

ভাল করে সকাল হয় নি এখনও। স্টিমারের গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে এল।

উনিশ শ ছেচল্লিশে অক্টোবর। বার বছরের বিনু বাংলা মাস আর সালও জানে। আশ্বিন, তের শ সাতচল্লিশ।

এত ভোরে রোদ ওঠে নি। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম, তিন দিক আবছা অন্ধকারে মলিন। তার ওপর পাতলা নরম সিল্কের মতন কুয়াশা। শুধু পুব দিকটায় আলো আলো একটু আভা ফুটেছে। বাতাস বইছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখনও পুবে-পশ্চিমে আড়াআড়ি। শরতের বাতাস—এলোমেলো, ঝিরঝিরে, সুখদায়ক। তার গায়ে হিমের আমেজ-মাখানো।

মস্ত জলপোকার মতন স্টিমারটা এতক্ষণ যেন হাত-পা ছুঁড়ে এলোপাথাড়ি সাঁতার কাটছিল, এখন গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

গতি কমে এসেছিল, ইঞ্জিনের ধকধকানিও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। দু'ধারের বড় বড় চাকাদুটো আগের মতন গর্জন করে জল কাটছে না, আলতোভাবে নদীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে যাচ্ছে।

এই ভোরবেলাতেই ঝাঁকে ঝাঁকে শঙ্খচিল বেরিয়ে পড়েছে। গলায় সাদা বর্ডার দেওয়া খয়েরি রঙের পাখিগুলো স্টিমারটাকে ঘিরে সমান চক্কর দিচ্ছে। তাদের চোখ কিন্তু জলের দিকে। মাছের রুপোলি শরীর দেখতে পেলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ দিয়ে পড়ছে। মুহূর্তে বাঁকানো ঠোঁটে শিকার বিঁধিয়ে উঠে আসেছে। আর বকেরা ? তাদেররও ধ্যান-জ্ঞান মাছেরই দিকে।

জলের ধার ঘেঁষে ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। একপাশে তার বাবা অবনীমোহন, আরেক পাশে দুই দিদি—সুধা আর সুনীতি। মা আসেন নি, এত ভোরে ওঠা তাঁর বারণ। চিরদিনই মা অসুস্থ, রুগ্ন। ভোরের ঠান্ডা জলো হাওয়া লাগালে শরীর আরো খারাপ হবে, তাই কেবিনে শুয়ে আছেন।

অবনীমোহনের বয়স পঞ্চাশের মতন। বেশ লম্বা, সুপুরুষ। মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর বড় বড় দূরমনস্ক চোখ। এত বয়সেও গায়ের রং উজ্জ্বল। চামড়া টানটান, একটি ভাঁজও তার ওপর পড়ে নি। চুল উস্কখুস্ক, সাদা-কালোয় মেশানো। সাদার ভাগটা কম, তবু ঐ রংটা তাঁর চেহারায় নতুন মহিমা এনে দিয়েছে।

সুনীতির বয়স একুশ, সুধার আঠার। দু'জনের চেহারার ছাঁচ এক রকম। ভুরু এত সুন্দর আর সরু, মনে হয় খুব যত্ন করে তুলি দিয়ে আঁকা। সুনীতি ফর্সা না, শ্যামাঙ্গী। কচিপাতার কোমল আভার মতন কী যেন তার গায়ে মাখানো। সুধার রং টকটকে, তার দিকে তাকিয়ে পাকা ধানের কথা মনে পড়ে যায়। দু'জনেরই হাত-পা-আঙুল, সবেতেই দীঘল টান। পানপাতার মতন মুখ, থাক থাক কোঁচকানো চুল, ছোট্ট কপাল আর সরু চিবুকে মনোরম একটি ভাঁজ। দু'জনের চোখই টানা টানা, আয়ত। সুনীতির কুচকুচে কালো মণিদুটো যেন ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। সুধার চোখের মণি কালো নয়, নীলচে।

সুনীতির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়, সে বয়স-সচেতন। এর মধ্যেই চেহারায় গম্ভীর ভাব এনে ফেলেছে। সুধা কিন্তু একেবারে উল্টো—নিয়ত ছটফটে, চঞ্চল। গাম্ভীর্য বলে কোনো শব্দ তার হাজার মাইলের ভেতর নেই। অকারণ ছটফটানি আর ছেলেমানুষি সব সময় তাকে ঘিরে আছে।

দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে বিনু। স্টিমার এখন যেখানে, সেখান নদীর তীর খুব কাছে, আধ মাইলের মধ্যে। গাছপালা, সবুজ বনানী, ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা বাড়িঘর চোখে পড়ছে।

অন্য পাড়টা অনেক দূরে, ধূ-ধূ, দুর্বল রেখায় আঁকা জলছবির মতন অস্পষ্ট।

নদীর ঠিক মাঝখানটায় ঝাপসা কুয়াশার ভেতর অসংখ্য কালো কালো বিন্দু বিন্দু ফুটকেতের মতন

ছড়িয়ে আছে। মা বলেছেন ওগুলো জেলেডিঙি, সারারাত নদীময় ঘুরে ঘুরে বি ইলিশমাছ ধরে। দূর-দূরান্তের ডিঙিগুলোই না, ছইওলা অনেক নৌকো লক্ষ্যহীনের তো কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে। স্টিমার যত আস্তেই চলুক, নদী তোলপাড় করে উঁচু-উঁচু পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ উঠছে আর নৌকোগুলো মাতালের মতন অনবরত টলছে।

নদী জুড়ে আরেকটা দৃশ্য চোখে পড়ছিল। চাপ চাপ, ঝাঁক ঝাঁক কচুরিপানা বেগুনি ফুলের বাহার ফুটিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

বিনুরাই শুধু না, প্রায় সব যাত্রীই রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে স্টিমারের এদিকটা অনেকখানি কাত হয়ে গেছে।

যাত্রীরা সবাই প্রায় কথা বলছিল। কে যেন গলা চড়িয়ে কাকে ডাকল, কেউ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সরু করে শিস দিচ্ছে, হঠাৎ উচ্ছ্বাসে কেউ এক কলি গেয়ে উঠল। টুকরো টুকরো কথা, শিসের আওয়াজ—মিলে-মিশে একাকার হয়ে মৃদু গুঞ্জনের মতন অনেকক্ষণ ধরে বিনুর কানে বেজে চলেছে। বাবা আর দিদিরাও কী যেন বলাবলি করছে, বিনু বুঝতে পারছিল না। সে শুধু তাকিয়ে আছে। অসীম বিস্ময় ছাড়া তার আশেপাশে আর কিছুই নেই এখন।

নদী বলতে বিনুর অভিজ্ঞতায় কলকাতার বড় গঙ্গাই শেষ কথা। হাওড়া পুলের ওপর দাঁড়িয়ে যতবার গেরুয়া রঙের প্রবাহটি দেখেছে ততবারই সে অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এই পারাপারহীন জলরাশির দৃশ্য তাকে যেন বিহ্বল করে ফেলেছে।

এক সময় অবনীমোহনের ডাক শোনা গেল, 'বিনু—'

বিনু সাড়া দিল না। দু চোখ মেলে যেমন দেখছিল, দেখতে লাগল।

অবনীমোহন আবার ডাকলেন।

নদীর দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কের মতন সাড়া দিল বিনু, 'কী বলছ?'

'আমরা এসে গেছি। ঐ যে দেখতে পাচ্ছিস, মনে হচ্ছে ওটাই রাজদিয়ার স্টিমার-ঘাট। ওখানে আমাদের নামতে হবে।' অবনীমোহন সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

অবনীমোহনের আঙুল যেদিকে, বিনুর চোখ এবার সেদিকে ঘুরে গেল। এখনও বেশ খানিকটা দূরে তবু নিশ্চল জেটি, দু-তিনটে গাধাবোট, লোকজনের চলাফেরায় বড়সড় একটা গঞ্জের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিনুর ছোট্ট বুকের ভেতর সিরসিরিয়ে আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রাজদিয়ায় আসা হল তা হলে। কতকাল ধরে মা'র মুখে ঐ জায়গাটার কথা শুনে আসছে সে। রাজদিয়ায় আসার ইচ্ছা তার অনেক দিনের।

ওধার থেকে বড়দি সুনীতি বলল, 'এক্ষুনি স্টিমার জেটিঘাটে ভিড়বে। চল বাবা, কেবিনে গিয়ে মালপত্তর গুছিয়ে নিই।'

অবনীমোহন বললেন, 'তাড়া কি, রাজদিয়াই তো লাস্ট স্টেশন। ওখানে গিয়ে স্টিমারটা নিশ্চয় বেশ কয়েক ঘন্টা পড়ে থাকবে। ধীরেসুস্থে লটবহর গুছোলেও চলবে।'

ছোটদি সুধা ব্যস্ত গলায় বলল, 'দাদু আমাদের নিতে স্টিমারঘাটে আসবেন তো?'

অবনীমোহন বললেন, 'নিশ্চয়ই আসবেন।'

'তোমার চিঠি দাদু পেয়েছেন?'

'পাওয়া উচিত। আজ কী বার?'

মনে মনে হিসাব করে সুধা বলল, 'বুধবার।'

অবনীমোহন বললেন, 'গেল বুধবারে জি-পি-ও'তে গিয়ে ডাকে দিয়েছি। সাতদিনে চিঠিটা কি আর আড়াইশো তিনশো মাইল রাস্তা পেরুতে পারে নি?'

সুধা বলল, 'আরেকটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী রে?'

'আমাদের তো কাল পৌঁছুবার কথা ছিল। স্টিমার চড়ায় আটকে গিয়েছিল বলে আজ এলাম। তোমার চিঠি যদি পেয়েই থাকেন দাদু, কাল এসে ঘুরে গেছেন। আজ কি আর জেটিঘাটে আসবেন?'

'আসবেন রে, আসবেন।'

সুধাটা চিরদিনের ভীতু। তার খুঁতখুঁতুনি কাটল না, 'দাদু না এলে কী যে হবে। তুমি তো আবার কখনও এখানে আসো নি। রাজদিয়ার রাস্তাঘাট কিছুই চেন না।'

অবনীমোহন হেসে ফেললেন, 'তোকে অতশত ভাবতে হবে না। দাদু আসবেনই, দেখে নিস। আর যদি না-ই আসেন, ঠিকানা তো জানি। খুঁজে ঠিক বার করে ফেলব। তা ছাড়া আমি না চিনি, তোর মা চেনে। বারকয়েক সে এখানে এসেছে।'

সুধা আর কিছু বলল না। মুখ দেখে মনে হল না খুব ভরসা পেয়েছে।

এদিকে স্টিমারটা জেটিঘাটের দিকে যত এগিয়ে চলেছে যাত্রীদের ব্যস্ততা ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। আগের সেই মৃদু অস্পষ্ট গুঞ্জনটা হৈ চৈ হট্টগোলের রূপ নিয়েছে। ধুপধাপ শব্দ, বাক্স-প্যাঁটরা টানাটানির আওয়াজ, চেঁচামেচি, চিৎকার—নিমেষে চারদিক চকিত হয়ে উঠল।

বিনু ভাবছিল পরশু দিন এই সময়টা তারা ছিল কলকাতায়, ভবানীপুরের বাড়িতে। দুপুর থেকে মালপত্র বাঁধাছাদা, গোছগাছ আরম্ভ হয়েছিল। তারপর সন্ধেবেলা শিয়ালদা গিয়ে ঢাকা মেল ধরেছে। কাল সকালে এসেছিল গোয়ালন্দ। সেখান থেকে এই স্টিমারটায় পাড়ি জমিয়েছে। কাল রাত্তিরেই তাদের রাজদিয়া পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু বিপদ বাধিয়েছিল নদীর একটা চড়া। আট দশ ঘন্টার মতন স্টিমারটাকে আটকে রেখেছিল।

সে কি আজকের কথা! খুব ছেলেবেলায় যেটাকে বলা যায় চেতনার প্রত্যুষ—সেই তখন থেকে রাজদিয়ার নাম শুনে আসছে বিনু।

বিনুর জন্ম কলকাতায়। পুবে বেলেঘাটা, পশ্চিমে বড় গঙ্গা, উত্তরে বাগবাজার, দক্ষিণে টালিগঞ্জ—কলকাতার চার সীমার ভেতর এত মজা, এত চমক, এত ঘটনার মেলা সাজানো যে যুগযুগান্ত কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু অবনীমোহন মানুষটা স্বভাব-যাযাবর, কোথাও যদি দুটো দিন পা পেতে বসেন! হাতে ক'টা দিন ফালতু এসে গেল তো সংসার তুলে নিয়ে পাড়ি দিলেন রাজপুতানায় কি সৌরাষ্ট্রে, মগধে অথবা কোশলে। বার বছরের ছোট্ট জীবনে অনেক দেশ দেখছে বিনু। ছোটনাগপুরের বনভূমি, দার্জিলিং-পাহাড়, কাশীর গঙ্গার ঘাট, প্রয়াগে কুম্ভমেলা, অজন্তার গুহায় খোদাই-করা চমৎকার চমৎকার সব শিল্প এবং আরো কত কী। কিন্তু এত কাছের রাজদিয়াটাই শুধু দেখা হয় নি। অথচ কত আগেই না তারা এখানে আসতে পারত।

পুজোর সময়টা প্রতি বছর কলকাতায় দাদুর চিঠি যায়, তাঁর ইচ্ছা একবার অন্তত বিনুরা রাজদিয়ায় বেড়াতে আসুক। চিঠি এলেই মা বলতেন, 'চল না, এবার ওখানে ঘুরে আসি। প্রত্যেক বছর যেতে লিখছেন।' বাবা বলতেন, 'এ বছরটা থাক। গিরিডিতে একটা বাড়ি ঠিক করে ফেলেছি। আসছে বার না হয় রাজদিয়া যাওয়া যাবে।' মায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এত ক্ষীণ যে, বাবার ওপর দাগ কাটতে পারত না। দ্বিতীয় বার তিনি আর এ ব্যাপারে অনুরোধ

করতেন না।

প্রতি বছর মায়ের রাজদিয়ামুখি মনটাকে অবনীমোহন এক রকম জোর করে অমরকন্টকে, নৈনিতালে কিংবা মধুপুরের দিকে ফিরিয়ে দিতেন। এবার কী খেয়াল হয়েছে, টিকিট কেটে ঘর-সংসার নিয়ে ঢাকা মেলে গিয়ে উঠেছেন। বাবা হয়তো ভেবে থাকবেন, বৃদ্ধ মানুষটি বার বার অনুরোধ করেছেন অথচ একবারও যাওয়া হচ্ছে না—এটা উচিত না। অনুচিত তো বটেই, অন্যায়ও।

বিনু শুনেছে, দাদুর সঙ্গে সম্পর্কটা খুব কাছের নয়। মায়ের কিরকম মামা হন। কিন্তু কে বলবে তিনি আপনজন নন।

বার বছরের বিনু ক্লাস সেভেনে পড়ে। অনেক কিছু বুঝতে পারে সে। তার অনুভবের সীমা বহুদূর বিস্তৃত। দাদুর চিঠি সে পড়েছে। সেগুলোতে যে আন্তরিকতা, যে স্নেহপূর্ণ মাধুর্যের সুরটি থাকে, বিনুকে তা অভিভূত করেছে। কোনোদিন দাদুকে দেখে নি বিনু, তবু মনে হয়েছে তাঁর মতন মমতাময় মধুর মানুষ জগতে খুব বেশি নেই। রাজদিয়া বার বার তাকে গোপনে হাতছানি দিয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল। সূর্যটা কোথায় লুকিয়ে ছিল, জলের তলায় কোন অজানা রহস্যময় দেশ থেকে যেন হঠাৎ লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। নরম সাদা রেশমের মতন যে কুয়াশার চাদরটা আকাশ এবং নদীকে আবছাভাবে ঢেকে রেখেছিল এখন আর তা নেই। নদী জুড়ে কত যে ঢেউ! সোনার টোপর মাথায় দিয়ে তারা টলমল করে চলেছে। আকাশটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে। আশ্বিনের অগাধ অসীম নীলাকাশ।

নীলাকাশ কি আগে আর দ্যাখে নি বিনু? কলকাতার আকাশ অবশ্য বার মাস ধুলোয় ঢাকা, ধোঁয়ায় মাখা। কিন্তু বাবার সঙ্গে যখন বাইরে বেড়াতে গেছে নির্মল আকাশ কতবার তার চোখে পড়েছে। শিলং পাহাড়ের মাথায় যে আকাশ, লছমনঝোলায় যে আকাশ কিংবা চিরিমিরিতে যে আকাশ, সবই তো মনোরম। কিন্তু এখানকার মতনটি আগে আর কখনও দেখে নি বিনু। আকাশ যে এত উজ্জ্বল, এত ঝকঝকে, নীলকান্ত মণির মতন এমন দীপ্তিময়, কে জানত। তার গায়ে থোকা থোকা ভারহীন সাদা মেঘ জমে আছে। শরৎকালটা যেন তার সবটুকু বিস্ময় নিয়ে বিনুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিশাল রাজহাসের মতন দুলতে দুলতে গম্ভীর বাঁশি বাজিয়ে স্টিমারটা একসময় জেটিঘাটে গিয়ে ভিড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালি জেলার মাল্লারা বিচিত্র সুর করে মোটা মোটা কাছি ছুঁড়ে দিতে থাকে। জেটিতে আরেক দল মাল্লা তৈরিই ছিল, কাছি লুফে মুহূর্তে লোহার থামে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। বাঁধাছাদা হলে খালাসিরা কাঠের ভারি গ্যাংওয়ে ফেলে জেটির সঙ্গে স্টিমারটাকে জুড়ে দিল।

জেটিঘাটে অনেক মানুষ। গাদাগাদি করে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখ এদিকে। এই স্টিমারে যারা এল, খুব সম্ভব তাদের নিতে এসেছে ওরা।

স্টিমারটা জেটিতে ভিড়বার আগে থেকেই চাঞ্চল্য শুরু হয়েছিল। এখন সেটা তুমুল হয়ে উঠেছে। রেলিঙের কাছে যে ভিড়টা ছিল, দ্রুত পাতলা হয়ে ডেকে, কেবিনে আর বাঙ্কে ছড়িয়ে পড়েছে। ওদিকে জেটি থেকে একদল হিন্দুস্থানী কুলি বর্গীর মতন হানা দিয়েছে। একটু পর কুলিদের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে যাত্রীমিছিল গ্যাংওয়ে বেয়ে জেটির দিকে নামতে লাগল।

বিনুরা কিন্তু এখনও রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি আসতে পাড়টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জেটিঘাটের ডান দিকে নৌকোঘাটা। ছইওলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কত যে নৌকো লগি পুঁতে

সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে! এক সঙ্গে এত নৌকো আর এত বড বড় নৌকো আগে কখনও দেখে নি বিনু। ওপরে উঁচু বাঁধের মতন রাস্তায় চেরা বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের অগুনতি দোকান। কিসের দোকান বোঝা যাচ্ছে না। লোকজন, কদাচিৎ দু-একটা সাইকেল চোখে পডছে।

সুধা অস্থির হয়ে উঠল, 'সবাই নেমে গেল বাবা, আমরা স্টিমারে পড়ে থাকব নাকি?

'থাকতে চাইলেও দেবে না রে।' অবনীমোহন হাসলেন, 'একটু দাঁড়া, হুড়োহুড়িটা কমুক। তারপর নামব।'

স্টিমার ফাঁকা হয়ে এলে বিনুদের নিয়ে কেবিনে ফিরলেন অবনীমোহন। সুরমা নিজের বিছানায় বসে আছেন, চোখ দু'টি জানালার বাইরে ফেরানো। কখন তাঁর ঘুম ভেঙেছে টের পাওয়া যায় নি।

সুরমা সুধা-সুনীতি আর বিনুর মা। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, এক-আধ বছর বেশিও হতে প্যারে। তিনি যে সুধা-সুনীতির মা, বলে দিতে হয় না। পানপাতার মতন অবিকল সেই মুখ, সেই রকম টানা-টানা চোখ, থাক-থাক কোঁচকানো চুল, ছুঁচলো চিবুকে তেমনি ভাঁজ। নিজের চেহারার নিজের সুষমার সবটুকুই অকাতরে তিনি মেয়েদের দিয়ে দিয়েছেন, আলাদা করে কিছুই রাখেন নি। একটা জিনিসই শুধু তাঁর নেই যা সুধা-সুনীতির আছে, সেটা স্বাস্থ্য।

জ্ঞান হবার পর থেকে মাকে কোনোদিন সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে নি বিনু। সারাদিনই প্রায় শুয়ে থাকেন। হাঁটাহাঁটি, সংসাবের কাজকর্ম, সব বারণ। কথা বলতে কষ্ট হয়। এক-আধটু যাও বলেন তা ফিসফিসিয়ে, আধফোটা গলায়। গায়ে মাংস নেই, হাত-পা আর কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। রোগা দুর্বল শরীরে রেখাময় শিথিল চামড়া। গায়ের রং একসময় ছিল পাকা সোনা, এখন মোমের মতন ফ্যাকাসে। চোখের কোলে রক্তের লেশ নেই, কাগজের মতন তা সাদা। দৃষ্টি কেমন যেন ক্লান্ত, দীপ্তিহীন। তাকিয়ে থাকতেও তাঁর বুঝি কষ্ট হয়। সুরমাকে ঘিরে জীবনের এতটুকু লাবণ্যও আর ঝলমল করে না, তাঁর সব আলো সব আভা নিভে গেছে।

বিনু শুনেছে, তার জন্মের এক বছর পর একটা ভাই হয়েছিল। দু'মাসের বেশি সে বাঁচে নি। নিজেও মরেছে, মাকেও মেরে রেখে গেছে। অনেক দিন ভুগবার জন্যই বোধ হয় মায়ের ওপর গাঢ় মলিন ছায়া অনড়।

স্ত্রীকে ভাল করে দেখে নিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'এ কী!'

'কী বলছ!' জানলার বাইরে থেকে চোখ দু'টি ভেতরে নিয়ে এলেন সুরমা।

'মুখটুখ ধুয়েছ দেখছি, জল পেলে কোথায়?'

কেবিনে জলের ব্যবস্থা নেই। তার জন্য অনেকটা ঘুরে ইঞ্জিনঘরের কাছে যেতে হয়। সুরমা জানালেন সেখান থেকেই হাতমুখ ধুয়ে এসেছেন।

বকুনির সুরে অবনীমোহন বললেন, 'একা একা অতটা রাস্তা তোমার যাওয়া উচিত হয় নি। দুর্বল শরীর, পড়ে টড়ে গেলে এক কান্ডই হত।'

সুরমা বললেন, 'আজ আমার শরীর খুব ভাল লাগছে। জানো, এতখানি গেছি এতখানি এসেছি কিন্তু একটুও হাঁপাই নি।'

অর্ধেক আনন্দের সঙ্গে অর্ধেক বিস্ময় মিশিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'সত্যি বলছ!'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'যাক, পা দিতে না দিতেই রাজদিয়া টনিকের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তোমার স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্যে কত জায়গায় নিয়ে গেছি, কিছুই হয় নি। রাজদিয়া যদি তোমাকে আগের

মতন সুস্থ করে দেয়, বুঝব এমন জায়গা গ্লোবে নেই।'

সুরমা বোধ হয় অবনীমোহনের কথা শুনতে পেলেন না। আপন মনে বললেন, 'কত কাল পর এখানে এলাম, কী ভাল যে লাগছে!' তাঁর ছায়াচ্ছন্ন ক্লান্ত চোখে একটুখানি আলো যেন ফুটিফুটি করছে।

ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র গুছিয়ে দুটো কুলি ঠিক করলেন অবনীমোহন, তাদের জিম্মায় সে-সব দিয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, 'অনেকখানি যেতে হবে, তোমার হাত ধরে নিয়ে যাই?'

সুরমা বললেন, 'হাত ধরতে হবে না, আমি এমনিই যেতে পারব।'

'ঠিক পারবে তো?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।'

আগে আগে সুরমা চললেন, তারপর সুধা-সুনীতি, একেবারে শেষে অবনীমোহন আর বিনু।

একটু পর গ্যাংওয়ে পেরিয়ে সবাই জেটিতে এসে পড়ল। জেটিঘাটের ভিড় এখন হালকা হয়ে গেছে। দু'চারটে উৎসুক মুখ শুধু এদিক সেদিক ছড়ানো। বিনু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। যে অল্প ক'টি লোক এখনও রয়েছে তার ভেতর কোন মানুষটি দাদু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আদৌ তিনি এসেছেন কিনা, কে জানে।

বেশি দূর যেতে হল না। জেটিঘাটের মাঝামাঝি আসতে চোখে পড়ল, একজন বৃদ্ধ উন্মুখ হয়ে প্রতিটি যাত্রীকে লক্ষ করছেন। তাঁর পাশে আট ন' বছরের ছোট একটি মেয়ে।

বুড়ো মানুষটির গায়ের রং কালো। মাঝারি চেহারা, মাথাটা বকের পাখার মতন ধবধবে, মুখময় তিনি চারদিনের জমানো দাড়ি। এত বয়সেও মেরুদণ্ড একেবারে সোজা। দু'চোখ স্নেহের রসে যেন ভাসো-ভাসো, এখন অবশ্য কিছুটা উৎকণ্ঠিত। চুলের রং বদল, শরীরে কিছু ভার নামানো আর চামড়ায় এলোমেলো আঁচড় কাটা ছাড়া সময় তেমন কিছুই করে উঠতে পারে নি। এত বয়সেও শরীর বেশ শক্তই আছে। স্বাস্থ্যের ভিত রীতিমত মজবুত। বৃদ্ধকে ঘিরে এমন এক সরলতা মাখানো যাতে মনে হয়, তাঁর বয়স্ক দেহের ভেতর চিরকালের এক শিশুর বাস। পরনে খাটো ধুতি, খদ্দরের ফতুয়া, পায়ে লাল ক্যাম্বিসের জুতো।

ছোট মেয়েটির চুল কোঁকড়া কোঁকড়া। নাকটি বোঁচাই হবে। ফুলো ফুলো নরম লালচে গাল। রুপোর কাজললতার মতন চোখের কালো মণি দুটো টলটল করছে। একটু নাড়া দিলেই টুপ করে ঝরে পড়বে। নীল ফ্রক লাল জুতোয়, মনে হয়, মোমের পুতুলটি।

সুরমা খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছিল। যেতে যেতে বৃদ্ধটির কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঝুঁকে তাঁর পা ছুঁলেন।

বৃদ্ধের চোখ আলো হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সুরমাকে তুলে চিবুকে হাত রেখে বললেন, 'আমার রমু না?'

'হ্যাঁ, মামা।' সুরমা মাথা নাড়লেন।

বিনু এই প্রথম জানতে পারল, একটা আদরের নাম আছে মায়ের —রমু।

বৃদ্ধ বললেন, 'আসতে পারলি তবে! কত বছর ধরে চিঠি লিখছি।' তাঁর স্বরে স্নেহের সঙ্গে অনুযোগ মেশানো।

'কী করব বল—' সুরমা বললেন, 'কত রকম ঝামেলা—'

'ঝামেলা তো হিল্লিদিল্লি যাস কী করে? এখানে আসতেই যত কষ্ট!'

অস্ফুট গলায় সুরমা কী একটা উত্তর দিলেন, কেউ শুনতে পেল না।

বৃদ্ধ বললেন, 'কতকাল পর তোকে দেখলাম। সেই বিয়ের সময় শেষ দেখা। তখন তুই

একেবারে ছেলেমানুষ। ক'বছব বয়েসে যেন বিয়ে হয়েছিল তোর ?'

লাজুক সুরে সুরমা বললেন, 'সতের।'

বৃদ্ধ বললেন, 'সে কি আজকের কথা! তুই নিজে এসে না বললে চিনতেও পারতাম না। মুখের আদল-টাদল, চেহারা—কত বদলে গেছে।'

সুরমা হাসলেন।

বৃদ্ধ আবার বললেন, 'স্টিমার থেকে কত লোক নেমে গেল কিন্তু কেউ আমার কাছে দাঁড়াচ্ছে না। এত লোকের ভিড়ে কে যে আমার রমু বুঝতে পারছি না। একবাব তো ভাবলাম, তোরা এবারও এলি না।' বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন যেন, 'তোর চেহারার এ কী হাল হয়েছে!'

সুরমা মলিন হাসলেন, 'ক'বছর ধরে সমানে ভুগছি। ছোট ছেলেটা হবার পর থেকে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। নিজেও সে বাঁচলে না, আমাকেও জন্মের মতন পঙ্গু করে রেখে গেল।'

'ইস, কী স্বাস্থ্য ছিল আর কী দাঁড়িয়েছে! ক'খানা শুকনো হাড ছাড়া কিছুই তো নেই। তা বাপু এই যে এলে, শরীর-টরীর সারিয়ে নাও। তারপর যাবার কথা মুখে আনবে।'

সুরমা কিছু বললেন না। মৃদু একটু হাসি তাঁর মুখে আবছাভাবে লেগে রইল।

বিনু বুঝে ফেলেছে, এই বুড়ো মানুষটিই তার দাদু। চিঠি পড়ে দাদুর নামটা সে জেনেছে—হেমনাথ মিত্র।

হেমনাথ হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ঐ দেখ, কি ভুলো মন আমার। মেয়েকে নিয়েই মেতে আছি। অবনীমোহন কোথায় ? আমার দাদা আর দিদিভাইরা ?'

অবনীমোহন সামনে এগিযে এসে প্রণাম করলেন। হেমনাথ বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, শতায়ু হও।'

অবনীমোহন বললেন, 'আপনার শরীর কেমন আছে মামাবাবু ?'

'খুব ভাল, অসুখ-বিসুখ আমার কাছে বড় একটা ঘেঁষে না। লাস্ট টেন ইয়ারসে দু'বার মোটে জ্বর হয়েছিল। তার আগে কিছু হয়েছিল কিনা, মনে নেই। সে যাক, তোমরা কেমন আছ বল।'

'আমরা খুব খারাপ নেই, তবে আপনার ভাগনীকে নিয়ে বিপদে পড়েছি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না।

হেমনাথ বললেন, 'রাস্তায় আসতে কষ্ট-টষ্ট হয় নি তো ?'

'ট্রেনে ভালই এসেছিলেম। তবে স্টিমার চড়ায় ঠেকে যাওয়াতে ঘণ্টা কয়েক আটকে থাকতে হয়েছিল।'

হেমনাথ বললেন, 'কাল একবার স্টিমারঘাটে এসেছিলাম, চড়ায় আটকাবার কথা শুনে গেছি। সুজনগঞ্জের ভাটিতে ক'বছর ধরে মস্ত চর পড়ছে। প্রায়ই স্টিমার ওখানে আটকে যায়।'

একটু কি ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'মামীমা কেমন আছেন ?'

সুরমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তাঁর স্বভাবের বং মৃদু। খুব আস্তে আস্তে আধফোটা আধবোজা গলায় কথা বলেন। নিজের দুর্বল শরীর, ক্ষীণ জীবনীশক্তি, সব ভুলে গিয়ে এখন প্রায় চেঁচামেচিই শুরু করলেন, 'তাই তো, মামীমাকে দেখতে পাচ্ছি না। স্টিমারঘাটে এল না যে! শরীর খারাপ হয় নি তো ?'

'না, ভালই আছে।' হেমনাথ বললেন, 'তোরা আসবি, তাই ভোরবেলা উঠেই রান্নাবান্না নিয়ে মেতেছে।' বলতে বলতে হঠাৎ কী লক্ষ্য করে বললেন, 'এ কি অবনী!'

হেমনাথের স্বরে বিস্ময় ছিল। অবাক হয়ে অবনীমোহন বললেন, 'আজ্ঞে—'

'তোমার চুল এর ভেতরেই পাকতে শুরু করেছে দেখছি। এটা কি রকম হল!'

'আজ্ঞে, পঞ্চাশ বছর পেরুতে চললাম'

উঁহু উঁহু, যত বয়েসই হোক বাপ খুড়ো মামা-জেঠা—গুরুজনরা বেঁচে থাকতে ছেলেমেয়েদের চুল পাকতে নেই।'

অবনীমোহন নিঃশব্দে হাসলেন। অন্যরাও হেসে উঠল।

হেমনাথ কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সুরমা বলে উঠলেন, 'মামা, তুমি কিন্তু মেয়ে-জামাই পেয়ে সব ভুলে গেছ। তোমার দাদা আর দিদিভাইরা—'

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আরে তাই তো। কোথায় ওরা?'

সুধা আর সুনীতি এগিয়ে এসে প্রায় একই সঙ্গে প্রণাম করল।

পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াতেই আঙুলের ডগায় দু'জনের মুখ তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন হেমনাথ। তারপর মুগ্ধ গলায় বললেন, 'বাঃ বাঃ! তুমি নিশ্চয়ই সুধাদিদি আর তুমি সুনীতিদিদি।'

হেমনাথ ঠিক ঠিক চিনতে পেরেছেন। বাইশ-চব্বিশ বছর দেখাসাক্ষাৎ ছিল না, তবে চিঠিপত্রে ভাগনীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। নিজের সন্তানদের কে কি রকম দেখতে হয়েছে, কার স্বভাব কেমন, পড়াশোনায় কে ভাল, কে মন্দ—সব কথা মামাকে জানানো চাই সুরমার।

সুধা বলল, 'হ্যাঁ, আমি সুধাই।'

সুনীতি বলল, 'আমি সুনীতি। কিন্তু চিনলেন কেমন করে?'

হেমনাথ বললেন, 'সে একটা মন্তর আছে, তাই দিয়ে চিনে ফেলেছি।' আঙুলের প্রান্তে চিবুক ধরাই ছিল। হঠাৎ চোখমুখে দুর্ভাবনার রেখা ফুটিয়ে হেমনাথ বললেন, 'তোমরা এসেছ, এর চাইতে আনন্দের আর কিছু নেই। কিন্তু দিদিভাইরা, একটা মুশকিলে ফেলে দিলে যে!'

'কী মুশকিল দাদু?' সুনীতিকে ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাল।

'তোমার হলে দু'জন, আর ঘরে আছেন একজন। এই তিনজনের ভেতর এখন কাকে যে পাটরানী করি! শেষ পর্যন্ত একটা গৃহযুদ্ধ না বেধে যায়।'

সুনীতি কিছু বলল না। মুখ টিপে হাসতে লাগল।

সুধা কিন্তু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বুড়ো থথুরে। আবদার কত! আপনার পাটরানী হতে আমার বয়ে গেছে।'

আমুদে গলায় হেমনাথ বললেন, 'বুড়ো বলে দাগা দিলে ভাই।'

কলকল করে সুধা কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ভিড় ঠেলে বিনু হেমনাথের পা ছুঁল। চকিত হেমনাথ বললেন, 'কে রে? কে রে?' পরক্ষণেই চওড়া বিশাল একখানা বুকের ভেতর ধরা পড়ে গেল বিনু।

সুরমা বললেন, 'ও তোমার দাদাভাই মামা। সবার সঙ্গে কথা বলছ, গল্প করছ, ওর দিকে একবারও তাকাচ্ছ না। এ কি সহ্য হয়? তাই নিজেই আলাপ টালাপ করে নিতে এগিয়ে এসেছে। হিংসের একখানা পুঁটুলি।'

'ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। সবার আগে দাদাভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিল।' বুকের ভেতর থেকে বার করে এনে বিনুকে দু'হাতে ওপরে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন হেমনাথ।

যেভাবে হেমনাথ ঘোরাচ্ছেন ফেরাচ্ছেন তাতে বিনুর মনে হল, এই বয়সেও মানুষটি যুবকের মতন শক্তিমান।

হেমনাথ বললেন, 'দাদাভাইয়ের নামটা যেন কী?'

সুরমা বললেন, 'বিনু।'

বিনু গম্ভীর গলায় বলল, 'বিনয়কুমার বসু।'

'ঠিক ঠিক। হেলাফেলা করে ন্যাড়া বোঁচা একটা নাম বললেই হল? তার সঙ্গে গয়না-টয়নাগুলো জুড়ে দিতে হবে না!' বলে বিনুর দিকে তাকালেন হেমনাথ। কৌতুকে তাঁর চোখ ঝকমক করছে। বললেন, 'আমার ইচ্ছে, নামটা একেবারে জেনারেলিসিমো বিনয়কুমার বসু হোক। কি, পছন্দ তো?'

জেনারেলোসিমো শব্দটা বিনুর অজানা। তবু মনে হল, ওটার মধ্যে ঠাট্টা আছে। সে লজ্জা পেয়ে গেল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'দাদাভাইকে তো বীরপুরুষের মতন দেখতে, বাঘ মারতে পারো?'

বিনু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সুধা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঘ! জানো দাদু সেবার ছোটনাগপুরে খরগোশ দেখে ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।'

ছোটদিটা চিরকালের বিভীষণ। ঠিক সময়টিতে শত্রুতা করবার জন্য সে যেন ওৎ পেতেই আছে। বিনুর ইচ্ছা হল, সুধার বেণী ধরে কষে টান লাগিয়ে দেয়। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে সদিচ্ছাটাকে এই মুহূর্তে কাজে লাগানো গেল না। পারলে অবশ্য সুধাকে ভস্মই করে ফেলত। কটমট করে একবার তাকিয়ে আপাতত বিনুকে থাকতে হল।

হেমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ক্লাসে পড়?'

বিনু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মনে হল, প্যান্ট ধরে কে টানছে। টানটা অনেকক্ষণ থেকেই অবশ্য টের পাওয়া যাচ্ছিল, বিনু খেয়াল করে নি। তলার দিকে তাকাতেই দেখতে পাওয়া গেল। সেই মেয়েটা—কোঁকড়া কোঁকড়া যার চুল, লালচে ফুলো ফুলো গাল, রুপোর কাজললতার মতন চোখ —ছোট মুঠিতে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে তার প্যান্টের নীচের দিকটা ধরে আছে।

চোখাচোখি হতেই মেয়েটা আরো জোরে টান লাগাল। ফিসফিসিয়ে বলল, 'নামো, নামো বলছি।'

হেমনাথ বোধ হয় লক্ষ করেছিলেন। গলার স্বরে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'ওরে হিংসুটে; দাদাকে নামতে বলা হচ্ছে!'

আগের মতন সুর করে মেয়েটা এবার হেমনাথকে বলল, 'ওকে নামিয়ে দাও, শিগ্‌গির নামিয়ে দাও—'

হেমনাথ বললেন, 'কেন, নামাব কেন?'

বিনুর প্যান্ট ধরে মেয়েটা টানছিলই। বলল, আমি তোমার কোলে উঠব।'

'দুষ্টু বদমাস মেয়ে, আমার কোলটা একেবারে মৌরুসিপাট্টা করে নিয়েছ!'

মেয়েটা কী বুঝল, সে-ই জানে। জোরে জোরে চুল ঝাঁকিয়ে সমানে বলতে লাগল, 'নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও—'

সুধা-সুনীতি-সুরমা-অবনীমোহন, সবাই সকৌতুকে দেখছিলেন। সুরমা বললেন, 'মেয়েটা কে গো মামা? এতক্ষণ খেয়াল করি নি—একেবারে জাপানি পুতুল। আর কেমন পুট পুট কথা বলছে।'

'ওর নাম ঝিনুক।' হেমনাথ বললেন, 'ভবতোষকে তোর মনে আছে?'

'কোন ভবতোষ?'

'লাহিড়ীবাড়ির ভবতোষ, রাজেন লাহিড়ীর ছেলে।'

চোখ কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করলেন সুরমা। স্মৃতির ঝাঁপি খুলতে পারলেন কিনা, বোঝা গেল না। অনিশ্চিতভাবে বললেন, 'নামটা চেনা চেনা লাগছে, মুখটা মনে করতে পারছি না। কতকাল আগে রাজদিয়াতে এসেছিলাম, সে কি আজকের কথা!'

হেমনাথ বললেন, 'ঝিনুক ভবতোষের মেয়ে।'

সুরমা কোমল গলায় ডাকলেন, 'এস ঝিনুক, আমার কাছে এস।'

'তোমার কাছে যাব না।' জেদী স্বরে বায়না জুড়ে দিল ঝিনুক, 'আমি দাদুর কোলে উঠব, দাদুর কোলে উঠব।'

এই মনোরম ছেলেমানুষির খেলাটা আরো কিছুক্ষণ হয়তো চলত। কিন্তু তার আগেই হিন্দুস্থানী কুলিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'চলিয়ে বাবুজি, বহুত দের হো যাতা—' সুরমারা হেমনাথকে দেখে দাঁড়িয়ে যেতে কুলিরাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এখন তারা অস্থির হয়ে উঠেছে।

হেমনাথ যেন এতক্ষণে স্থান-কাল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন, 'ঐ দেখ, জেটিঘাটে দাঁড়িয়েই গল্প জুড়ে দিয়েছি। চল চল—' আস্তে আস্তে তিনি বিনুকে নামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডটা ঘটল, লাফ দিয়ে ঝিনুক তাঁর কোলটি দখল করে বসল। তারপর বিজয়িনীর মতন সগর্বে একবার বিনুর দিকে তাকাল।

বিনুর ইচ্ছা হল, পা ধরে টেনে মেয়েটাকে নামিয়ে দেয়। অস্পষ্টভাবে মনে হল, দাদুকে খুব সহজে দখল করা যাবে না।

ঝিনুককে কোলে নিয়েই চলতে শুরু করলেন হেমনাথ। বিরক্ত গলায় বললেন, 'তোকে নিয়ে আর পারি না ঝিনুক—' হেমনাথের বিরক্তি যে স্নেহেরই আরেক নাম তা বলে দিতে হয় না।

হেমনাথ আগে আগে চলেছেন। সুরমারা তাঁর পিছু পিছু এগুতে লাগলেন।

যেতে যেতে হেমনাথ পেছন ফিরলেন। আলতো গলায় ডাকলেন, 'রমু—'

'কী বলছ মামা?' সুরমা উৎসুক চোখে তাকালেন।

'এই ঝিনুকটা, বুঝলি—' গাঢ় বিষাদময় স্বরে হেমনাথ বললেন, 'বড় দুঃখী রে, বড় দুঃখী—'

সুরমার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটল। বললেন, 'দুঃখী! কেন?'

খুব আস্তে আস্তে হেমনাথ বললেন, 'পরে বলব। এসেছিস যখন জানতে পারবি।'

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

বার বছরের বিনু 'দুঃখী' শব্দটা জানে। চকিতে সে একবার ঝিনুককে দেখে নিল।

স্টিমার ঘাটের বাইরে আসতেই বিনুরা দেখতে পেল, উঁচু রাস্তার ওপর পর পর দু'খানা ফিটন দাঁড়িয়ে। একটা গাড়ি বেশ নতুন, ঝকঝকে। যে ঘোড়াটা তাকে টানে সেটা চমৎকার। স্বাস্থ্যে আর লাবণ্যে ঝলমল করছে। ঘাড়ের কাছে কেশরগুলো সগর্বে ফুলে আছে। সারা

গা বাদামি রঙের চকচকে চিকন লোমে ঢাকা, দেহ মসৃণ। মনে হয়, তেল গড়িয়ে পড়বে। ঘোড়াটা এত চঞ্চল আর সজীব যে এক মুহূর্তে স্থির হয়ে নেই। সমানে পা ঠুকে যাচ্ছে।

অন্য গাড়িটা অনেকদিনের পুরনো। পা-দানি, ছাদ, কোচোয়ানের বসবার জায়গা, রেকাব প্রায় সবই ভেঙেচুরে গেছে। গাড়ির মতন তার বাহনটিরও দশা খুবই করুণ। কোমর নেই বললেই হয়। লোম উঠে উঠে কত জায়গায় যে চামড়া বেরিয়ে পড়েছে! পাঁজরার হাড় একটা একটা করে গুনে নেওয়া যায়। ঘোড়াটা এত বয়স্ক, নির্জীব আর অবসন্ন যে দাঁড়িয়ে থাকতেও তার বড়ই কষ্ট।

দু'খানা গাড়িরই চালকের সিটে দুটো লোক বসে আছে। নতুন গাড়ির কোচোয়ানটি যুবক। ছিমছাম চেহারা, চুলের ছাঁট এবং লুঙ্গির নকশা বেশ বাহারি। দ্বিতীয় গাড়িটার জীর্ণতার সঙ্গে মিলিয়ে তার কোচোয়ান বেশ বুড়ো, রুগ্ন। পরনে নোংরা লুঙ্গি, চিটচিটে গেঞ্জি, কাঁধে ময়লা গামছা।

হেমনাথ বললেন, 'মালপত্তর সব গাড়িতে তুলে দে।'

কুলিরা সিটের ওপরেই দুমদাম বাক্স-প্যাঁটরা ফেলে ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে জেটিঘাটের দিকে ছুটল।

হেমনাথ বললেন, 'ব্যাটারা কেমন ছড়িয়ে মড়িয়ে রেখে গেল দেখ। লোক বসে কোথায় ?' বলে কোল থেকে ঝিনুককে নামিয়ে টানাটানি করে মালপত্র গোছগাছ করতে লাগলেন। অবনীমোহনও তাঁর সঙ্গে হাত লাগালেন।

সাজিয়ে রাখতে রাখতে হেমনাথ বললেন, 'হিরণটাকে স্টিমার ঘাটে আসতে বলেছিলাম। সে এলে এসব তার ঘাড়েই চাপানো যেত। বাবু বোধহয় আসার কথা ভুলেই গেছে।'

সুরমা বললেন, 'হিরণ কে গো মামা ?'

'দত্তবাড়ির দ্বারিক দত্তর নাতি।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, দ্বারিক দত্তর নাতিকে চিনতে পারলেন কিনা বোঝা গেল না।

লটবহর সাজানো হলে হেমনাথ বললেন, 'উঠে পড় সব, উঠে পড়—'

নতুন গাড়িটা বেশ বড়সড়। ভেতরে অনেক জায়গা। সুরমা, বিনু, অবনীমোহন, ঝিনুক আর হেমনাথ সেটায় উঠলেন। সুধা-সুনীতি অন্যটায়।

গাড়িতে উঠবার পর ঝিনুক হেমনাথের কোলে বসল। তাকে নামাতে চেষ্টা করেও পারলেন না হেমনাথ। তাঁর ভাগ খুব সহজে বিনা যুদ্ধে আর কাউকে ঝিনুক দেবে, এমন মনে হয় না।

ফিটন চলতে শুরু করেছিল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেমনাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'বাজারের কাছে গাড়িটা একটু থামাস রসুল—'

ওপর থেকে পূর্ববঙ্গীয় টানে কোচোয়ানের গলা ভেসে এল, 'আইচ্ছা বড় কত্তা—'

স্টিমার থেকে বিনুর চোখে পড়েছিল, নদীর ধারটা বাঁধের মতন উঁচু। তার ওপর দিয়ে খোয়া-বিছানো রাস্তা সোজা উত্তরে চলে গেছে। ফিটন দুটো সেই রাস্তা ধরে এখন ছুটছে।

খানিক যাবার পর সুরমার গলা শোনা গেল। আস্তে করে তিনি ডাকলেন, 'মামা—'

হেমনাথ তক্ষুনি সাড়া দিলেন, 'কী বলছিস রমু ?'

'বিয়ের আগে আমি যখন রাজদিয়া এসেছিলাম তখন তো তোমার ফিটন ছিল না।'

'না।'

'কবে কিনেছ ?'

'পা-দুটো থাকতে ফিটন কিনতে যাব কোন দুঃখে?' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তোর নিশ্চয়ই মনে আছে আমি চিরকালের পদাতিক। এখনও দিনে পাঁচসাত মাইল না হাঁটলে পেটের ভাত হজম হয় না।'

সুরমা বললেন, 'মনে থাকবে না? খুব আছে। গাড়ি-ঘোড়া চড়া তোমার ধাতেই নেই। যদ্দূর জানি, রাজদিয়াতে ভাড়ার গাড়ি পাওয়া যায় না। এই ফিটন দুটো তবে—'

সুরমার কথার মধ্যে অনুচ্চারিত একটা প্রশ্ন ছিল। হেমনাথ বুঝলেন। বললেন, 'এ দুটো আমার না। একটা ঝিনুকদের, আরেকটা লালমোহনের। তোরা আসবি বলে ওদের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।'

'লালমোহন!'

'হ্যাঁ রে—'

'কোন লালমোহন বল তো?' হেমনাথের দিকে অনেকখানি ঝুঁকলেন সুরমা। তাঁর চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে কৌতূহল।

'তুই কি চিনবি? ওর আসল নাম তো লালমোহন না—ডেভিড লারমোর। এ দেশের লোক লারমোর উচ্চারণ করতে পারে না, বলে লালমোহন। ও আমার অনেক কালের বন্ধু।'

'চিনব না, বল কি! কি চমৎকার মানুষ লালমোহনমামা! বিয়ের আগে তোমার কাছে এসে কিছুদিন থেকে গেছি, তখন আলাপ হয়েছিল। একবার আলাপ হলে ওঁকে কি কেউ ভুলতে পারে! সব সময় হাসিমুখ। কথা থেকে চাউনি থেকে সব সময় স্নেহ যেন ঝরে পড়ছে।' সুরমা বললেন, 'উনি রাজদিয়াতে আছেন?'

হেমনাথ বললেন, 'আছে বৈকি। পঁচিশ বছর বয়েসে আয়ার্ল্যান্ড থেকে এসেছিল, এখন ওর বয়েস পঁয়ষট্টি। চল্লিশ বছর ও ইস্টবেঙ্গলে কাটিয়ে দিল। এর ভেতর একবারও দেশে যায় নি।'

অবনীমোহন এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'এ দেশকেই বোধ হয় নিজের দেশ করে নিয়েছেন।'

হেমনাথ বললেন, 'ঠিক বলেছ। জন্মভূমির কথা ও একরকম ভুলেই গেছে। সেখানে আত্মীয়স্বজন কেউ আছে কিনা, লারমোর বলতে পারবে না। যৌবনে ক্রিশ্চানিটি প্রিচ করতে বাংলাদেশের এই প্রান্তে এসেছিল। কর্মভূমিই এখন ওর স্বদেশ। আয়ার্ল্যান্ডের চাইতেও ইস্টবেঙ্গল ওর কাছে অনেক বেশি আপন।'

সুরমা বললেন, 'আমার কথা কি লালমোহনমামার মনে আছে?'

'খুব আছে।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তোর কথা কত বলে। আসবি শুনে তো নেচে উঠেছিল।'

'স্টিমার ঘাটে উনি এলেন না তো?'

'ইনামগঞ্জে আজ হাট আছে। ভোরবেলা উঠে সেখানে চলে গেছে। দেখিস, রাত্তিরে ফিরেই ছুটে আসবে।'

সুরমা কী বলতে যাচ্ছিলেন, ফিটনটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপর থেকে রসুল বলল, 'বাজার আইস্যা গেছে বড় কত্তা।'

হেমনাথ বললেন, 'তোরা একটু বোস, আসছি।' গাড়ির দরজা খুলে তিনি নেমে গেলেন। ঝিনুক সঙ্গ ছাড়ে নি। কোলে ঝুলতে ঝুলতে সেও গেল।

জানলা দিয়ে বিনু দেখতে পেল। চেরা বাঁশ আর হোগলার ছাওয়া সেই দোকানগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। স্টিমার থেকে বোঝা যায় নি, কাছে আসতে টের পাওয়া গেল

ওগুলো মিষ্টির দোকান। কাচের আলমারির ভেতর বড় বড় গামলাভর্তি ধবধবে রসগোল্লা আর প্রকান্ড পেতলের থালায় মাখা সন্দেশ স্তূপাকার হয়ে আছে। কয়েকটা দোকানে হলুদ রঙের অসংখ্য কলার ছড়া ঝুলছে।

একটু পর মস্ত মাটির হাঁড়ি আর কলার ছড়া হাতে ঝুলিয়ে হেমনাথ ফিরে এলেন। হাঁড়িটির মুখ কলাপাতা দিয়ে বাঁধা। নিজের জায়গায় বসতে বসতে বললেন, 'আমাদের রাজদিয়া রসগোল্লার জন্যে ফেমাস। দাদাভাই আর দিদিভাইদের জন্যে নিয়ে এলাম।'

অবনীমোহন হঠাৎ বললেন, 'কিরকম দর ?'

'ছ' আনা সের।'

'মোটে!'

'বছরখানেক আগেও তিন আনা চোদ্দ পয়সা ছিল। এখন তো দাম বেড়ে গেছে।'

'ছ' আনা রসগোল্লার সের! এখানে না এলে এত শস্তা কল্পনাও করতে পারতাম না।'

হেমনাথ হাসলেন, 'একেই শস্তা বলছ! ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারের আগে এই রাজদিয়ার বাজারে তিন পয়সা সের রসগোল্লা কিনেছি। দেখতে দেখতে ক'বছরে তার দাম ছ' আনায় উঠেছে। আরেকটা লড়াই ভাল করে বাধলে দাম যে কোথায় চড়বে, কে জানে।' বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, 'হ্যাঁ, ভাল কথা—'

অবনীমোহন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

হেমনাথ বললেন, 'ইউরোপে যুদ্ধ বেধেছে। খবরের কাগজে তার খবর পড়ছি। এদেশেও নাকি ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উৎসুক সুরে হেমনাথ ডাকলেন, 'আচ্ছা অবনী—'

'আজ্ঞে—' অবনীমোহন উন্মুখ হলেন।

'আমরা তো পৃথিবীর শেষ মাথায় পড়ে আছি। বাইরের কোনো খবর এখানে এসে পৌঁছুতে যুগ কেটে যায়। তোমরা খাস কলকাতায় থাকো। ওখানে যুদ্ধের হাওয়া-টাওয়া কি রকম দেখে এলে ?'

'এখনও তেমন কিছু না।'

'তবু ?'

'হিটলার ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছে। গোলমাল চলছে। সে সব ইউরোপে, আমার মনে হয় এসব সাময়িক। টেনসান খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না।'

এটা উনিশ শ' চল্লিশের অক্টোবর। এক বছর আগেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইউরোপের বাতাসে এখন বারুদের গন্ধ। ট্যাঙ্ক আর অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফটের শব্দে আকাশ চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সংশয়ে-উত্তেজনায়-মত্ততায় সুদূর সেই মহাদেশ ঢেউয়ের দোলায় দুলছে।

আর উনিশ শ' চল্লিশের বাংলাদেশ এত স্নিগ্ধ এত নিরুদ্বেগ যে মনেই হয় না, ইউরোপ মাত্র কয়েক হাজার মাইল দূরে আর সেটিকে ঘিরে একখানা আগুনের চাকা ঘুরছে। ইউরোপ বুঝি এই গ্রহের অংশ নয়। সৌরলোকের বাইরে কোনো অজানা, অনাবিষ্কৃত দেশ। বাংলাদেশের অগাধ শান্তি আর নিশ্চিন্ত জীবন যুদ্ধের আঁচে ঝলসে যাবে, এমন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাচ্ছে না।

অন্যমনস্কের মতন হেমনাথ বললেন, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না অবনী—'

'কী মনে হয় ?' অবনীমোহন শুধোলেন।

'এ লড়াই বহুদিন চলবে, অনেক লোক মরবে, নানা দেশ তছনছ হয়ে যাবে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, তাকিয়ে রইলেন।

হেমনাথ বললেন, 'তুমি হয়তো ভাবতে পার, আমার এরকম ধারণা কেন হল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন জানো? ঐ জার্মান জাতটার জন্যে। এমন আত্মাভিমানী জাত দুনিয়ায় আর আছে কিনা সন্দেহ। মর্যাদাবোধ তর অত্যন্ত প্রখর। ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারের গ্লানি সে ভোলে নি। প্রতিহিংসা না মেটা পর্যন্ত জার্মানরা থামবে বলে মনে হয় না।'

অবনীমোহন চুপ করে রইলেন। মুখ দেখে মনে হল হেমনাথের ব্যাখ্যা তাঁর খুব মনঃপূত হয় নি।

এই সময় কলার ছড়াটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সুরমা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'ভারি চমৎকার তো। সেবার যখন তোমার কাছে এসেছিলমা, রোজ এই কলা কিনে আনতে না মামা?'

'তোর মনে আছে? হেমনাথ হাসলেন, 'আমি কিন্তু ভুলে গেছি রে—'

'বা রে, মনে থাকবে না! আমার স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ নাকি?' সুরমাও হাসলেন, 'এই কলাগুলোর কি যেন নাম?'

'অমৃতসাগর।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অমৃতসাগর।'

অবনীমোহন মুগ্ধ স্বরে বললেন, 'সুন্দর নাম তো।'

হেমনাথ বললেন, 'নামেই শুধু নয়, গুণেও সুন্দর। যেমন মিষ্টি তেমনি স্বাদ। আর দামও বাড়ে নি। দশ বিশ বছর ধরে তিন পয়সা হালি।'

বিনু জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল। গাড়িতে উঠবার পর থেকে দাদু-মা-বাবা অনবরত কথা বলছেন। হিটলার-জার্মানি-লারমোর-ইউরোপ-অমৃতসাগর, টকুরো টুকরো অনেক শব্দ অসংলগ্ন ভাবে কানে আসছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সে বলল, 'দাদু, 'হালি' কাকে বলে?' কথাটা তার কাছে অদ্ভুত লেগেছে।

'এক গন্ডা জিনিসকে আমরা এখানে 'হালি' বলি।'

'ও।' বিনু আবার জানলার বাইরে তাকাল।

ফিটন চলেছে তো চলেছেই। দেখতে দেখতে হোগলা-ছাওয়া সেই দোকান ঘর গুলো চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাস্তার একধারে ছিল সারি সারি দোকান, আরেক ধারে নদী। নদীটা এখনও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বিনু দেখতে পেল, দূরে জেটিঘাটে বিশাল রাজহাঁসের মতন তাদের সেই স্টিমারটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। উঁচু মাস্তুলটার মাথায় একটা শঙ্খচিল চুপচাপ বসে। তাকে ঘিরে ছাইরঙের অচেনা ক'টা পাখি চক্কর দিচ্ছে। বিনুরা যত এগুচ্ছে স্টিমারটা ততই পেছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে।

এদিকে পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে ওঠে এসেছে। আশ্বিনের রোদ এখন বেশ ধারাল। আকাশের নীল এত ঝকঝকে যে সেদিকে চোখ পেতে রাখা যায় না। স্টিমারে থাকতে যে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘগুলোকে এদিকে ওদিকে জমে থাকতে দেখা গিয়েছিল, শরতের এলোমেলো বাতাস পেঁজা তুলোর মতন তাদের দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। নীচে নদীটা সারা গায়ে সোনালি রোদের আদর মেখে টলমল করে চলেছে।

মুগ্ধ চোখে বিনু দেখছিল। জীবনে যত দৃশ্য সে দেখেছে মনে মনে তাদের সঙ্গে এই আকাশ আর দূরের ভারহীন মেঘদলের তুলনা করে নিচ্ছিল, কোনটা বেশি সুন্দর?

এক জায়গায় এসে দেখা গেল, সিধে চলতে চলেত রাস্তাটা হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরছে। বাঁক ঘুরে ফিটনও সেদিকে চলতে লাগল। খানিক যাবার পর সম্ভব সেই নদীটা আর নেই, গাছগাছালির ওধারে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বাঁকের মুখ পর্যন্ত রাস্তাটা ছিল খোয়ায় ঢাকা। এখন খোয়া-টোয়া নেই। কৌলীন্য হারিয়ে সোজা মাটিতে নেমে গেছে।

ঘোড়ার গলায় বোধহয় ঘুন্টি বাঁধা আছে। চলার তালে তালে ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছে।

নদী নেই। মাটির রাস্তায় খানিক যাবার পর দু'ধারে খাল পড়ল। বিনুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে দুটো যেন ছুটছে। মধ্যঋতু এই শরতে খালগুলো কানায় কানায় ভরা। তবে তাতে স্রোত নেই। নিস্তরঙ্গ স্থির জলে কোথাও কচুরিপানা, কোথাও নলখাগড়ার বন মাথা তুলে আছে। আর আছে ছোট ছোট নৌকো। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাঁশের সাঁকো, মাছরাঙা আর বক চোখে পড়ছে। ফুলভর্তি হিজল গাছে শালিক বসে আছে অনেক।

খালের ওপারে দূরে দূরে কিছু কিছু বাড়িঘর দেখা যায়। বেশির ভাগই টিনের চালের। কদাচিৎ দু'চারখানা পাকা বাড়ি। এই রাজদিয়াতে লোকালয়ের রূপ ঘনবদ্ধ নয়, দ্বীপের মতন ছড়ানো।

চারদিকে এত জল দেখতে দেখতে অনেক দিন আগে পড়া একটা শহরের কথা মনে পড়ে গেল বিনুর। সেখানে রাস্তার বদলে শুধু খাল। গাড়ি-ঘোড়া নেই সেই মজার শহরটায়। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হলে নৌকোই ভরসা। এই মুহূর্তে স্মৃতি তোলপাড় করেও শহরটার নাম কিছুতেই মনে করতে পারল না বিনু।

কখন যে ফিটন দুটো একটা বড় কাঠের পুলের ওপর এসে উঠেছে, খেয়াল নেই। হঠাৎ কে যেন জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'গাড়ি থামা রসুল, গাড়ি থামা—'

থামাতে থামাতে গাড়িটা পুলের মাঝামাঝি চলে এল।

এদিকে বিনু চমকে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতেই দেখতে পেল, কে একজন বড় বড় পা ফেলে তাদের ফিটনটার দিকে এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভব সে-ই গাড়ি থামাতে বলেছে।

একটু পরেই ফিটনের জানলায় একটি মুখ দেখা গেল।

পাকা ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'হিরণবাবু মনে হচ্ছে—'

বিনুর মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগে জেটিঘাটে দাদুর মুখে 'হিরণ' নামটা শুনেছে। এই তবে হিরণ। কাছাকাছি আসতে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বয়স তেইশ-চব্বিশের মধ্যেই। এক কথায় পরিপূর্ণ যুবক। সিঁথি নেই। মাথার চুল এলোমেলোভাবে পেছনে উলটে দেওয়া। গায়ের রং কালোর দিকে, এটা খুঁত নয়। বরং কালো রঙে হিরণের ব্যক্তিত্ব আরো বেশি করে ফুটেছে। চোখদুটি ভাষাময়, উজ্জ্বল। পাতলা ঠোঁটের ওপর সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা। পায়ে নকশা-করা স্যাণ্ডেল। পরনে পাটভাঙা ধবধবে পাজামা, আর দোমড়ানো মোচড়ানো হাফ শার্ট। পোশাকের ব্যাপারে তো বটেই, নিজের সম্বন্ধেই হয়তো সে উদাসীন। তবু সব মিলিয়ে হিরণ বেশ সুপুরুষ। তার মধ্যে কোথায় যেন একটা আকর্ষণ আছে। প্রথম দেখায় অবশ্য স্পষ্ট করে সেটা বোঝা যায় না, তবে অনুভব করা যায়।

হেমনাথ আবার বললেন, 'এতক্ষণে আসার সময় হল ?'

চোখ নামিয়ে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হিরণ বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল।'

'কোন দিন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে হাজির দাও শুনি ? চিরকালের তুমি লেট লতিফ।'

'না, মানে—'

'মানেটা আবার কী হে—'

'কাল সন্ধেবেলা জারি গান শুনতে গিয়েছিলাম। মাঝ রাত্তিরে ফিরে এসে এমন ঘুমিয়েছি যে ভোরবেলা আর উঠতে পারি নি।'

হেমনাথ বললেন, 'কাল না হয় মাঝরাত্তিরে শুয়েছ। যেদিন সন্ধে রাত্তিরে শোও সেদিনও কি ভোরবেলা ওঠ ? তেইশ-চব্বিশ বছর তো বয়েস হল। সূর্যোদয়ের আগে ক'দিন উঠেছ বল তো ?

সমানে ঘাড় চুলকেই যাচ্ছিল হিরণ। ভয়ে ভয়ে একবার চোখ তুলে ফিসফিসিয়ে বলল, 'একদিনও না। সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠা আমার কোষ্ঠীতে নেই।'

হেমনাথ উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠলেন, 'এই —এতদিনে একটা সত্যি কথা বলেছিস হিরণ।'

অবনীমোহন, বিনু, সুরমা—সবাই সকৌতুকে তাকিয়ে ছিলেন। হিরণ আর হেমনাথের ভেতর যে মজার ব্যাপারটা চলছে, বেশ উপভোগই করছিলেন বলা যায়। এবার তাঁরা হেসে উঠলেন।

হাসি থামতে অবনীমোহনদের দেখিয়ে হিরণ বলল, 'ওঁদেরই তো আসবার কথা ছিল?'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। আয়, তোদের আলাপ-টালাপ করিয়ে দি।'

সুরমা, বিনু আর অবনীমোহনের পরিচয় দিলেন হেমনাথ। হিরণ শুধলো, 'আপানদের কী বলে ডাকব?'

সস্নেহে সুরমা বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছে।'

'আমার ইচ্ছে মাসিমা আর মেসোমশাই বলি।'

'বেশ তো।'

হিরণ বলল, 'ফিটনে যা মালপত্র, ওঠাই মুশকিল। বাড়ি গিয়ে আপনাদের প্রণাম করব।'

হাসিমুখে সুরমা বললেন, 'তাই করো, প্রণামটা পাওনা রইল।'

হেমনাথ এবার সুরমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'এবার শ্রীমানের পরিচয় দিই।'

সুরমা বললেন, 'ওর কথা তো তুমি বলেছ।'

'কতটুকু আর বলেছি। আমাদের বন্ধু দ্বারিক দত্তর নাতি তো?'

'হ্যাঁ।'

'ও তো সামান্য পরিচয়। হিরণ গেল বার ইকনমিক্স অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। এবছর এম. এ ফিফথ ইয়ার।' হেমনাথের বলার ভঙ্গিতে গর্ব যেন মাখানো।

সুরমা আর অবনীমোহন সস্নেহে তাকিয়ে ছিলেন। এবার তাঁদের দৃষ্টিতে স্নেহের সঙ্গে আরো কিছু মিলল। সুরমা বললেন, 'বাঃ বাঃ, এ তো গৌরবের কথা।'

প্রশংসার কথায় মুখ লাল হয়ে উঠেছিল হিরণের। চোখ নামিয়ে লাজুক সুরে সে বলল, 'গৌরব-টৌরব আবার কি।'

হেমনাথ বললেন, 'হিরণচন্দরের সব চাইতে বড় পরিচয় যেটা তা হল ও আমার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড মিসগাইড।'

হিরণ চেঁচামেচি করে উঠল, 'আমি তোমার মিসগাইড দাদু! আমার নামে একথা রটিয়ে বেড়াচ্ছ!'

'আরো কত কি রটিয়ে বেড়াই একবার দ্যাখ না।'

হিরণ কী বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামালেন হেমনাথ। হাসতে হাসতে বললেন, 'ঝগড়াঝাঁটি পরে হবে। দু'দিন দু'রাত জার্নি করে ওরা এসেছে, খুব ক্লান্ত। এখন বাড়ি যাওয়া দরকার।'

হিরণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিকই।'

হেমনাথ শুধালেন, 'তুই কি এখন বাড়ি ফিরবি হিরণ?'

'হ্যাঁ।'

ফিটনের ভেতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে হেমনাথ বললেন, 'তাই তো, একটুও জায়গা নেই। তোকে কোথায় বসাই?'

'আমি হেঁটে যাচ্ছি, তোমরা চলে যাও।'

'এখান থেকে বাড়ি পাক্কা এক মাইল রাস্তা। হেঁটে যাবি?'

এই সময় অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'ঐ ফিটনটায় শুধু সুধা-সুনীতি রয়েছে, ওখানে একজনের জায়গা হতে পারে।'

হেমনাথ বললেন, 'তা হলে আমি বিনুকে নিয়ে সুধাদের কাছে চলে যাই, হিরণ এখানে বসে যাক।'

হেমনাথ হয়তো ভেবেছেন, দু'টি তরুণীর সঙ্গে এক ফিটনে অনাত্মীয় অপরিচিত একজন যুবককে

তুলে দেওয়া ঠিক হবে না।

অবনীমোহন তাড়াতাড়ি বললেন, 'আপনি কেন যাবেন? হিরণই ঐ ফিটনে যাক। আমি ওকে দিয়ে আসছি।' বলে দরজা খুলে নেমে পড়লেন।

অবনীমোহন মানুষটি চিরদিনই উদার, সংস্কারমুক্ত। ছেলেমেয়েদের তিনি নিজের ছাঁচে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নিজের নিজের সম্মান আর মর্যাদা বাঁচিয়ে তারা মানুষের সঙ্গে মিশুক, এটাই তাঁর কাম্য। চারদিকের দরজা-জানলা খুলে দিয়ে বাইরের আলো-বাতাস যতখানি পারে ভেতরে নিয়ে আসুক, অবনীমোহন তা-ই চান।

সুধাদের ফিটনটা পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। অবনীমোহন হিরণকে সেখানে বসিয়ে একটু পর ফিরে এলেন। আবার ফিটন চলতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর অবনীমোহন বললেন 'বেশ ছেলে।'

হেমনাথ বললেন, 'কার কথা বলছ? হিরণের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ বললে যথেষ্ট বলা হয় না। এমন ছেলে আমাদের রাজদিয়াতে আর একটিও নেই।'

রাস্তাটা যেখানে এসে ফুরিয়ে গেছে, রাজদিয়া শহরের সেটাই বোধহয় শেষ বাড়ি। তারপর থেকে শুরু হয়েছে মাঠ। এই আশ্বিনে মাঠ না বলে তাকে সমুদ্র বলাই উচিত। অনেক, অনেক দূরে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমে গেছে ততদূর পর্যন্ত গাছপালা, ঘরবাড়ি, মানুষের বসতি, এমন কি এক টুকরো মাটির চিহ্নও নেই। শুধু জল আর জল। অথৈ অগাধ জল। তার ওপর মেঘের মতন ধান মাথা তুলে আছে।

বাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে, প্রায় সাত-আট বিঘের মতন হবে। চারদিক ঘিরে পাঁচিল অবশ্য নেই। সামনের দিকে এক ধারে প্রকাণ্ড বাগান। সেখানে সবই চেনাজানা গাছের ভিড়। আম, জাম, লিচু, জামরুল, কাঁটাল। আর রয়েছে দেশি ফুলেরা—সন্ধ্যামালতী, টগর, গন্ধরাজ, কাঁঠালি চাঁপা। বাগানটা ঘন ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

একদিকে বাগান, আরেক দিকে দীঘির মতন বিশাল পুকুর। পুকুরটার আলাদা কোনো অস্তিত্ব এই মুহূর্তে নেই। মাঠের জলের সঙ্গে সেটা এখন একাকার।

রাস্তা পেছনে ফেলে ফিটন বাগানে ঢুকল। একধারে দু'টি অল্পবয়সী কামলা স্তূপীকৃত পচা পাট থেকে শোলা আর আঁশ বার করে করে রাখছিল। পচা পাটের দুর্গন্ধে চারদিকে বাতাস আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে।

ফিটন দেখে কামলা দুটো বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'আইস্যা গেছে, আইস্যা গেছে—' বলেই উর্ধ্বশ্বাসে ভেতরের দিকে ছুটল।

বাগান পেরিয়ে মস্ত উঠোন। কামলারা ভেতরে পৌঁছুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিটন উঠোনে এসে থামল।

উঠোনের একধারে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, তুলসীমঞ্চ। আরেক ধারে পর পর অনেকগুলো খড়ের পালা সাজানো। তিন দিক ঘিরে সারি সারি ঘর। পুরপুরি পাকা বাড়ি নয়। মেঝে সিমেন্টের, ওপরে নকশা-করা টিনের চাল, কাঠের দেয়ালে বড় বড় জানলা ফোটানো।

ফিটন দুটো থেমেছে কি থামে নি, সারা বাড়িতে হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। সেই কামলা দুটো তো চেঁচাচ্ছিলই, ভেতর থেকে আরো কয়েকজন প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। সবাই মহিলা আর শিশু। বয়স্ক কিংবা যুবক পুরুষ তাদের ভেতর নেই।

একবারে সামনে যিনি তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। শ্যামাঙ্গীই বলা যায়। নাক চোখ তেমন ধারাল না, তবে চুল অজস্র। এর মধ্যেই স্নান সেরে নিয়েছেন, পিঠময় কাঁচাপাকা ভিজে চুল ছড়ানো, প্রান্তে একটি গিঁট বাঁধা। কপালে তামার পয়সার মতন সিঁদুরের টিপ, সিঁথিও ডগডগে। পরনে লাল নকশাপাড়

শাড়ি আর সাদা জামা। ঠোঁট দুটি টিয়াপাখির মতন পানের রসে টুকটুকে।

আলাদা আলাদা করে দেখলে হাত-পা-নাক-চোখ তেমন কিছু না। তবে সব মিলিয়ে মহিলাকে ঘিরে কোথায় যেন অলৌকিকের ছোঁয়া আছে।

বর্ষীয়সী সধবা মহিলাটির গা ঘেঁষে একজন বিধবা দাঁড়িয়ে, দু'জনে সমবয়সিনীই হবেন। বিধবাটির চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, পরনে ধবধবে সাদা থান আর সেমিজ। চেহারায় হেমনাথের পুরো আদলটি বসানো। খুব সম্ভব তাঁর বোনটোন।

সধবা আর বিধবা এই দুই সমবয়সিনীর পেছনে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে, এক পলক তাকিয়েই অনুমান করা যায়, তারা এ বাড়ির আশ্রিতা। হয়তো হেমনাথের সংসারে কাজকর্ম করে তাদের দিন চলে।

ফিটন থামতে প্রথমেই ঝিনুককে নিয়ে হেমনাথ নামলেন। মহিলা দু'টির দিকে ফিরে উচ্ছ্বসিত সুরে বললেন, 'দেখ, কাদের এনেছি।'

মহিলারা আরেকটু এগিয়ে এলেন। ততক্ষণে অবনীমোহন, বিনু আর সুরমা নেমে পড়েছেন। সুরমা তাড়াতাড়ি ঝুঁকে মহিলা দু'টিকে প্রণাম করলেন। বললেন, 'কেমন আছ মামী? কেমন আছ মাসি?' কপালে সিঁদুর, পরনে লাল-পাড় শাড়ি মহিলাটি হেমনাথের স্ত্রী স্নেহলতা। বিধবা মহিলাটি তাঁর বোন। নাম—শিবানী।

শিবানী আর স্নেহলতা দু'জনে চিবুক ছুঁয়ে সুরমাকে চুমু খেলেন। হেমনাথ যা বলেছিলেন এরাও তাই বললেন, 'আমরা তো ভালই আছি। কিন্তু তোর শরীরের একি হাল হয়েছে মা!'

সুরমা হাসলেন, 'শরীরের কথা থাক। সব সময় ঐ এক কথা শুনছি।'

সুরমার পর অবনীমোহন আর বিনু গিয়ে প্রণাম করল। হেমনাথ তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

স্নেহলতা স্বামীর দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে আস্তে করে ঝঙ্কার দিলেন, 'থাক, আর বলে দিতে হবে না। আমার জামাই, আমার নাতিকে যেন চিনতে পারি নি?'

বিনুদের ফিটনের ঠিক পেছনেই সুধাদের ফিটনটা থেমেছিল। সুরমা গলা তুলে ডাকলেন, 'কি রে সুধা-সুনীতি, তোরা দেখি গাড়িতেই বসে রইলি।'

ডাকাডাকিতে সুধারা নামল। দেখা গেল, সুধা আর হিরণ খুব কথা বলছে। আর সুনীতি মুখ টিপে টিপে হাসছে। তিনজনের ভেতর হয়তো কোনো মজার আলোচনা চলছে।

হেমনাথ বলেছিলেন, কাঠের পুলটা থেকে এ বাড়ি এক মাইলের মতন। ফিটন ছুটিয়ে আসতে কতক্ষণ আর লেগেছে! খুব বেশি হলে মিনিট দশ-বার। কিন্তু এর ভেতরেই সুধা আর হিরণ কেমন আলাপ জমিয়ে নিয়েছে।

হেমনাথ সুধাকে বললেন, 'পড়েছিস তো হিরণের পাল্লায়। কি কথাটাই না বলতে পারে। সবসময় বকবকায়মান।'

সুরমা বললেন, 'হিরণের দোষ দিচ্ছ মামা! তোমার ছোট নাতনীকে তো এখনও চেন নি। দিনরাত খালি কথা আর কথা। একটা কিছু পেল তো একেবারে কলের গান চলল, থামে আর না। ওর বকবকানিতে কানের পোকা নড়ে যায়।'

হেমনাথ বললেন, 'ভালই হল। দুটোরে মিলবে বেশ।'

কিছু না ভেবেই শেষ কথাগুলো বলেছেন হেমনাথ। তবু চকিত হিরণ আর সুধা পরস্পরের দিকে একবার তাকাল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে হাসল।

সুরমা বললেন, 'যাও, দিদাদের প্রণাম কর।'

সুধা সুনীতি এগিয়ে গিয়ে স্নেহলতা আর শিবানীকে প্রণাম করল। তারা উঠে দাঁড়ালে সকৌতুক দৃষ্টিতে স্ত্রীকে বিদ্ধ করে হেমনাথ সহাস্যে বললেন, 'কি রকম দেখলে গিন্নী?'

স্নেহলতা বুঝতে পারেন নি। বললেন, 'কী?'

'সুধা সুনীতিকে—'

'দু'জনেই সুধা।'

'তোমার কপাল কিন্তু পুড়ল।'

ইঙ্গিতটা এবার বুঝতে পারলেন স্নেহলতা। হাসিমুখে বললেন, 'ভয় দেখাচ্ছ?'

'তুমিই বিবেচনা কর।' হেমনাথ বললেন, 'ভাবছি তোমাকে বিদেয় করে এবার এই দু'জনকে রাজমহিষী করে নেব।'

'বিদেয় করবে কি? তার আগে আমিই পালিয়ে যাব।' বলে বিনুর চোখে চোখ রাখলেন স্নেহলতা, 'কি দাদা, সুভদ্রাহরণ করতে পারবে তো?'

ঠিক এই সময় হিরণ চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাইও—'

'কী হল রে?' চমকে স্নেহলতা তাকালেন।

'আমার সঙ্গে পালাবার প্ল্যান করেছিলে না সেদিন? আবার এর ভেতর বিনুকে জুটিয়ে ফেললে?'

সবাই হেসে উঠল।

হাসি থামলে শিবানী বললেন, 'আর উঠোনে না, ঘরে চল সব।'

স্নেহলতা সস্নেহে ডাকলেন, 'এস ধনেরা, এস—'

'ধন' বলে সম্বোধন করতে আগে আর কারোকে শোনে নি বিনু, ফিক করে হেসে ফেলল সে।

হেমনাথ সেই কামলা দুটোকে বললেন, 'যুগল করিম, গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে আন—'

কামলা দু'জনের নাম জানা গেল। তবে কে যুগল আর কে করিম বুঝতে পারল না বিনু।

স্নেহলতা সবাইকে নিয়ে ভেতরবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। দু-চার পা এগিয়েছেন, দুটো লোক প্রায় ছুটতে ছুটতে উঠোনে এসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল, 'বড় কত্তা—'

সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে লোক দু'টি ছুটে এসেছে তারা মধ্যবয়সী চাষী কি মাঝি শ্রেণীর মানুষ।

হেমনাথ বললেন, 'কী ব্যাপার রে?'

দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে বলল, 'মজিদ ভাই অখনই আপনেরে যাইতে কইছে, আমরা নাও লইয়া আইছি। চলেন—'

'কেন, কিছু জানিস?'

'চরবেউলা থিকা নবু গাজী আইছে যে।'

হেমনাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ যাব, এখনই যেতে হবে। নৌকো কোথায় রেখেছিস?'

'আপনের পুকৈর ঘাটে।'

পুকুরটা এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, বাগানের ওপারে। তবু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভিড়ের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে টুক করে একবার দেখে নিল বিনু। সত্যিই একটা ছইঅলা নৌকো সেখানে বাঁধা আছে, হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে।

হেমনাথ এবার এদিকে ফিরে বললেন, 'রমু, অবনী, আমাকে একবার বেরুতে হচ্ছে। তোমরা বিশ্রাম করে খাওয়াদাওয়া সেরে নিও, আমার জন্যে বসে থেকো না।' হিরণকে বললেন, 'তুই এখন আর বাড়ি যাস না, আমাদের এখানেই খাবি। কিছু দরকার-টরকার হলে—বুঝলি না, আমি তো বাড়িতে থাকব না—'

হিরণ বলল, 'বুঝেছি। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্বগুলো আমার ঘাড়ে চাপল, এই তো?'

'ঠিক।'

অবনীমোহন বললেন, 'এখন কোথায় যাবেন মামাবাবু?'

হেমনাথ জানালেন, 'কেতুগঞ্জ।'

অবনীমোহন আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। মুখচোখ দেখে মনে হল, হেমনাথের কেতুগঞ্জ যাবার ব্যাপারে তাঁর কৌতূহল আছে, হয়তো কিছু জিজ্ঞাসাও।

অবনীমোহনের মনের কথা বুঝি বা পড়তে পারলেন হেমনাথ। বললেন, 'কেতুগঞ্জের মজিদ মিঞা আমার ছোট ভাইয়ের মত। এক কানি জমি নিয়ে ওর সঙ্গে চরবেহুলার নবু গাজীর দাঙ্গা হয়ে গেছে। দু পক্ষে আট-দশজন জখম হয়ে সদর হাসপাতালে পড়ে আছে। নবু গাজীর সঙ্গে যাতে মজিদের একটা মীমাংসা হয়, সে জন্যে আমি চেষ্টা করছিলাম। আচ্ছা পরে এসে তোমাকে আমি সব বলব।'

হেমনাথ সেই মুসলমান মাঝি দু'টির সঙ্গে চলে গেলেন।

অবনীমোহন বললেন, 'মামাবাবু তো বেশ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারেন!'

ওধার থেকে স্নেহলতা বললেন, 'এই একটা ঝঞ্ঝাট নাকি! সবে এসেছ, ক'দিন থাকলেই দেখতে পাবে কত ঝামেলা মাথায় নিয়ে বসে আছে তোমার মামাবাবু। রাত নেই, দিন নেই, এ আসছে ডাকতে, ও আসছে। এক দণ্ড যদি ঘরে স্থির হয়ে বসে!'

বিনু কিছুই বোধহয় শুনতে পাচ্ছিল না। একদৃষ্টে পুকুরঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিল। এতক্ষণে নৌকোটা ছেড়ে দিয়েছে, দেখতে দেখতে পুকুর পেরিয়ে ধানবনের কাছাকাছি চলে গেল সেটা।

বিনুর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ভাসতে ভাসতে দাদুর সঙ্গে কেতুগঞ্জে যায়, আগে আর কখনও নৌকোয় চড়ে নি সে।

হেমনাথদের নৌকো ধানবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল স্নেহলতা বললেন, 'ঘরে এস মানিকেরা—' বলে পা বাড়িয়ে দিলেন।

স্নেহলতার পিছু পিছু সবাই সামনের পুবদুয়ারী বড় ঘরখানায় এল। ঘাড় ফিরিয়ে বিনু একবার দেখে নিল, হিরণ যুগল আর করিম, ফিটন থেকে মালপত্র নামিয়ে ওদিকের একটা ঘরে নিয়ে রাখছে।

স্নেহলতার গলা আবার শোনা গেল, 'এখন আর কোনো কথা না, উঠোনে জল দেওয়া আছে। হাত-পা ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নাও। ধনেদের মুখ খিদেয় একবারে শুকিয়ে গেছে।'

খানিক আগে আরেক বার 'ধন' বলেছিলেন স্নেহলতা, এবারও বললেন। কথায় কথায় ঐ শব্দটা বলা বোধহয় তাঁর অভ্যাস। ফিক করে এবারও বিনু হেসে ফেলল।

হাসিটা কানে গিয়েছিল। স্নেহলতা শুধোলেন, 'হাসলি যে দাদা?'

বিনু লজ্জা পেয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

সুরমা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি 'ধন' বলেছ মামী, সেই জন্যে।'

স্নেহলতা সস্নেহে হাসলেন। বললেন, 'শুধু ধন নাকি, আরো কত কি বলি দেখ না। তখন কত হাসতে পার, দেখব।'

একটু পর হাত-মুখ ধুয়ে এসে সবাই খেতে বসল। অবনীমোহন, সুধা, সুনীতি, বিনু, সেই পুতুল পুতুল মেয়েটা—ঝিনুক। ফিটন থেকে বাক্স-টাঙ্ক নামানো হয়ে গিয়েছিল। হিরণকে ডেকে এনে বসিয়ে দিলেন স্নেহলতা। সুরমা অবশ্য বসলেন না।

অবনীমোহন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সকাল থেকে কিছুই তো খাওনি, তুমিও বসে পড়।'

কলকাতায় স্বামী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেতে বসে যান সুরমা। খাবার দাবার মাঝখানে সাজানো থাকে। দরকার মতন সবাই চামচে করে তুলে নেয়। কলকাতার রীতি আলাদা। কিন্তু এখানে কেউ কিছু ভাবতে পারে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এই ছোট্ট রক্ষণশীল জগতে স্বামীর সঙ্গে খেতে বসা নিন্দনীয়।

অবনীমোহন যে এভাবে ডেকে বসবেন, সুরমার পক্ষে তা ছিল অভাবনীয়। তিনি লজ্জা পেয়ে গেলেন।

স্নেহলতাও বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই বসে পড়্।'

মৃদু স্বরে সুরমা বললেন, 'আমি পরে খাব'খন।

অবনীমোহন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'পরে টরে না। অসুস্থ শরীর, ডাক্তার না তোমায় বলে দিয়েছে সকালবেলা সাতটার ভেতর খেয়ে নিতে। অনিয়ম করলে—'

বিব্রত সুরমা চাপা গলায় ধমক দিলেন, 'আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তুমি খেয়ে নাও তো।'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না।

স্নেহলতা এবং শিবানী ফুলকাটা কাঁসার থালায় পাতলা চিড়ে, মুড়ি, গুড় আর পাতক্ষীর সাজিয়ে সবাইকে দিতে লাগলেন। বড় বড় জামবাটি ভর্তি করে ঘন আঠালো দুধও দিলেন।

খেতে খেতে হঠাৎ হিরণ বলল, 'কি ঠাকুমা, ঠকাবার মতলব নাকি?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন স্নেহলতা, 'ঠকাব!'

'হুঁ—' হিরণ ঘাড় কাত করল, 'গাড়ি থেকে রসগোল্লার হাঁড়ি আর কলার কাঁদি নামিয়ে তোমার হাতে দিলাম না? সে সব কোথায়?'

'তাই তো—' তাড়াতাড়ি জিভ কেটে স্নেহলতা উঠে পড়লেন। ছুটে গিয়ে ওধারের কোন একটা ঘর থেকে রসগোল্লা আর কলা নিয়ে এসে সবার পাতে পাতে দিতে লাগলেন।

বড়দের চারটে করে রসগোল্লা আর দুটো করে কলা দিয়েছেন স্নেহলতা। বিনুকে দিয়েছেন দুটো রসগোল্লা আর একটা কলা, ঝিনুকের ভাগে পড়েছে আরো কম— কলা আধখানা, রসগোল্লা একটা।

বিনুর ঠিক পাশেই ঝিনুক খেতে বসেছিল। আড়ে আড়ে একবার বিনুর পাতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সে, 'আমি আধখানা কলা খাব না, একটা রসগোল্লা খাব না।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'ক'টা খাবি?'

'গোটা কলা খাব, দুটো রসগোল্লা খাব—'

'তোর পেট ভাল না ঝিনুক, সহ্য করতে পারবি না। নিজেও কষ্ট পাবি, আমাকেও জ্বালিয়ে মারবি।'

হাত-পা ছোঁড়া থামায় নি ঝিনুক। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে বলতে লাগল, 'ওকে কেন দিলে তা হলে? কেন দিলে ওকে?'

স্নেহলতা অবাক, 'কাকে রে, কাকে?'

আঙুল দিয়ে বিনুকে দেখিয়ে দিল ঝিনুক, 'ওকে।'

'পেট ভর্তি তোমার বিষ, ছেলেটা বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই হিংসে আরম্ভ করে দিয়েছ!'

সুরমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দাও মামী ঝিনুক যা চাইছে দাও—'

স্নেহলতা বললেন, 'তুই কি ওকে মেরে ফেলতে বলিস রমু?'

'তার মানে!'

'পরশু দিন ওর বাপ এখানে দিয়ে গেছে। আসা থেকে খালি খাচ্ছেই, খাচ্ছেই। কাল সারারাত পেটের ব্যথায় ঘুমোতে পারে নি, আমাদের ঘুমোতে দেয় নি। খাওয়ায় একটু টান না দিলে—বুঝলি না, পরের দায়িত্ব—'

স্নেহের সুরে সুরমা বললেন, 'ছেলেমানুষ, বায়না করছে। এখন তো দাও, পরে না হয় দিও না।'

কি আর করা, ঝিনুকের দাবি অনুযায়ী রসগোল্লা আর কলা তার পাতে তুলে দিতে হল।

একটু নীরবতা।

হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে সুরমা বললেন, 'আচ্ছা মামী—'

'কী বলছিস ?' মুখ ফিরিয়ে স্নেহলতা সাড়া দিলেন।

'ঝিনুকের বাবা ওকে তোমার কাছে দিয়ে গেছে, বললে না ?'

'হ্যাঁ !'

'কেন ?'

'ওর মাকে নিয়ে ওর বাপ ঢাকায় গেছে।'

'ঢাকায় কী ?'

'ঝিনুকের মামাবাড়ি।'

সুরমা অবাক। বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'মামাবাড়িতে গেল, মেয়েটাকে নিয়ে গেল না ?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন স্নেহলতা। বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'না।'

'কেন ?'

কি যেন ভর করে বসল স্নেহলতার ওপর। নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝিবা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ওর বাপ চিরকালের মতন ওর মাকে রেখে আসতে গেছে।'

'সে কী !'

'হ্যাঁ, বড় অশান্তি হচ্ছিল বাড়িতে। তার চাইতে এই ভাল হয়েছে—'

অবনীমোহন, সুধা, সুনীতি—সবাই চকিত হয়ে ঝিনুকের দিকে তাকাল। যে মেয়ে খাওয়া নিয়ে এত বায়না করছিল, এখন আর সে খাচ্ছে না। ঝিনুকের চোখের তারা স্থির, টসটস করছে। পলকহীন সে স্নেহলতার দিকে তাকিয়ে আছে। লাল টুকটুকে পাতলা ঠোঁট দুটো থরথর করছে তার।

সুরমা বললেন, 'তোমার কাছে তো রেখে গেছে। ওদের বাড়িতে আর কেউ নেই ?'

'না। কাকা জ্যাঠা ঠাকুমা ঠাকুর্দা, কেউ বলতে কেউ না। থাকার ভেতর বাপ-মা আর ঐ একটা মেয়ে। তাও—'

এই সময় হিরণ ডেকে উঠল, 'ঠাকুমা—'

হিরণের স্বরে এমন কিছু ছিল, স্নেহলতা চমকে উঠলেন।

খুব চাপা গলায় হিরণ আবার বলল, 'ঝিনুকের সামনে এ সব কথা বল কেন ?' বুঝবার মতন বয়েস ওর হয়েছে। মুখ-চোখের চেহারা দেখছ মেয়েটার ?'

চকিতে একবার ঝিনুককে দেখে নিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। থাক, ওসব কথা থাক—'

সবার চোখ ঝিনুকের দিকে। বিনুও তাকে দেখছিল। দেখতে দেখতে দাদুর কথাগুলো মনে পড়েছিল। স্টিমার ঘাটে দাদু বলেছিলেন, ঝিনুক খুব দুঃখী।

এরপর আর কোনো কথা হল না। এক সময় নিঃশব্দে খাওয়ার পালা চুকল।

পুবদুয়ারী সেই প্রকান্ড ঘরখানার একধারে তক্তপোশ পাতা। ইতস্তত দু-চারখানা চেয়ারও ছড়িয়ে আছে। খাওয়া-দাওয়ার পর অবনীমোহন, সুধা আর হিরণ এখানেই আসর বসালেন। সুনীতি আর সুরমা স্নেহলতা-শিবানীর সঙ্গে ভেতর দিকে রান্নাঘরে চলে গেলেন, ঝিনুকও তাঁদের সঙ্গে গেল। সুরমা এখনও খান নি। রান্নাঘরে মামী আর মাসির সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাবেন। বিনু হিরণদের কাছেই থেকে গেল।

অবনীমোহন, সুধা আর হিরণ গল্প জুড়ে দিল। নিমেষে মশগুলও হয়ে গেল। অবনীমোহন আর

সুধা পূর্ববাংলার এই ভূ-খণ্ডটি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছে। বিপুল উৎসাহে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে হিরণ।

কিছুক্ষণ বসে বসে তাদের কথা শুনল বিনু, তারপর দূরমনস্কের মতন জানালার বাইরে তাকাল। এখান থেকে আদিগন্ত সেই ধানবন চোখে পড়ছে আর দেখা যাচ্ছে আশ্বিনের টলোমলো অথৈ অগাধ জল। আকাশের একটা টুকরোও দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। সারা বর্ষা বৃষ্টিতে ধুয়ে ধুয়ে আকাশ এখন আশ্চর্য নীল, সেখানে কেউ ভারহীন সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে রেখেছে। দূর আকাশ, অফুরন্ত জল আর শরতের মেঘদল যেন অবিরাম হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে।

আড়ে আড়ে একবার হিরণদের আসরটা দেখে নিল বিনু, সবাই বিভোর হয়ে আছে। সুযোগটা হাতছাড়া করা সমীচিন নয়, পায়ে পায়ে সুধাদের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল সে।

শালিকের মতন চঞ্চল পায়ে কিছুক্ষণ উঠোনে ঘুরল বিনু। দোলমঞ্চ দেখল, রাসমঞ্চ দেখল, পালা-সাজানো খড়ের স্তূপ দেখল। আর দেখল সারি সারি ধানের ডোল (গোলা)। ফিটন দুটো এখন আর নেই, তারা বোধহয় চলে গেছে। একটু পর কিসের একটা স্রোত তাকে একটানে বাইরের বাগানটার দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

খানিক আগে এখান দিয়েই এসেছিল বিনু, জায়গাটা তার চেনা। চারদিকে আমগাছ, জামগাছ, লিচুগাছ, কামরাঙা গাছ —সব এক পায়ে দাঁড়িয়ে। বাগানটা ছায়াচ্ছন্ন। মাটি নরম, ভিজে ভিজে। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে পাখিদের চেঁচামেচি আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ। ভিজে মাটির গন্ধ, দূর ধানখেতের গন্ধ, ফুলের গন্ধ—সব একাকার হয়ে যেন ঘুম এসে যায়।

গাছপালার পাশ দিয়ে, লতাপাতার ধার দিয়ে, ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল বিনু। কতক্ষণ ঘুরেছিল মনে নেই। একসময় কার ডাক যেন কানে ভেসে এল।

চমকে সামনের দিকে তাকাল বিনু, কাউকে দেখতে পেল না।

আবার ডাকটা শোনা গেল, 'ছুটোবাবু—ছুটোবাবু—'

এদিকে সেদিকে তাকাতে তাকাতে এবার বিনুর চোখে পড়ল। পচা পাটের স্তূপের ভেতর সেই লোকটা বসে আছে। লোক না বলে তাকে ছোকরা বলাই উচিত।

ফিটনে করে আসার সময় ঐখানেই দু'জনকে কী করতে দেখেছিল বিনু, পরে টানাটানি করে তাদের মালপত্র নামাতে দেখেছে, নামও জেনেছে। একজনের নাম যুগল, অন্য জনের নাম করিম। তবে কে যুগল কে করিম, জানা যায় নি।

যুগল হোক করিম হোক, এখন একজনই বসে বসে পচা পাটের গা থেকে আঁশ ছাড়াচ্ছে। আরেকজনকে দেখা গেল না।

চোখাচোখি হতেই সে হাতছানি দিল। পায়ে পায়ে বিনু কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'ডাকছ কেন ?'

ছোকরার বয়স কুড়ি একুশের মধ্যে। চওড়া হাড়, মোটা মোটা আঙুল, প্রকাণ্ড বুক, সরু কোমর—সবই তার বলশালিতার প্রতীক। গায়ের রং রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে। চুলগুলো খাড়া খাড়া, দুর্বিনীত—তেলে-জলে অথবা চিরুনিতে কোনোদিন তাদের বশ মানানো যাবে তা যেন নেহাতই দূরাশা। পরনে ভিজে সপসপে এক টুকরো টেনি, কোমরের কাছটায় কোনোরকমে জড়ানো। এছাড়া আর কিছুই নেই। বড় বড় ড্যাবড্যাবে দুটো চোখ সরলতায় মাখা।

দু'পাটির সবগুলো দাঁত মেলে দিয়ে হাসল ছোকরা। বলল, 'আপনেরা কইলকাতা থনে (থেকে) আইলেন ?'

স্টিমারে আসতে আসতে বাংলাদেশের এ প্রান্তের আঞ্চলিক ভাষা শুনেছে বিনু, বিচিত্র উচ্চারণগুলি লক্ষ করেছে। যা শুনেছে তার সিকিও বোঝে নি। তবে সব মিলিয়ে তার খুব মজা লেগেছে, ভালও লেগেছে। সেটা খুব সম্ভব নতুনত্বের জন্য, বৈচিত্র্যের জন্য।

ছোকরা যা বলল, প্রথমটা বুঝতে পারল না বিনু। অনেকটা অনুমানের ওপর ভরসা করে বলল,

'কলকাতার কথা বলছ?'

'হ।' ছোকরা মাথা নাড়ল, 'কইলকাতা অনেকদূরে, না?'

এবার বুঝতে পারল বিনু। বলল, 'হ্যাঁ।'

'কয়দিন লাগে যাইতে?'

মনে মনে হিসেব করে বিনু বলল, 'দেড় দিনের মতন।'

'যাইতে হইলে ইস্টিমারে চড়ন লাগে?'

'হ্যাঁ।'

'রেলগাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

ছোকরার চোখ চকচক করতে লাগল, 'জানেন আমি কুনোদিন রেলগাড়ি দেখি নাই।'

করুণাই হল বিনুর। বলল, 'রেলগাড়ি দেখ নি! কেন, তোমাদের এখানে রেলগাড়ি নেই?'

'না। আছে হেই ঢাকার শহরে। আমি কুনোদিন ঢাকায় যাই নাই।'

একটু চুপচাপ। তারপর ছোকরা আবার শুরু করল, 'আইচ্ছা ছুটোবাবু—'

'কী বলছ?'

'কইলকাতা তো পেল্লায় শহর, না?'

এবারও আন্দাজে বুঝে নিল বিনু। বলল, 'হ্যাঁ।'

'কত বড় কন দেখি।' ছোকরা সাগ্রহে শুধলো, 'আমাগো রাইজদা আপনে দেখছেন?'

'রাইজদা' অর্থাৎ রাজদিয়া। বিনু বলল, 'সবটা দেখি নি। আসতে আসতে যেটুকু চোখে পড়েছে, দেখেছি।'

ছোকরা বলল, 'এই ধারে আর কতটুক, উইধারে এইর ডাবল তিন ডাবল আছে। আইচ্ছা, কয়টা 'রাইজদা' একলগে করলে একখান কইলকাতা হয়?'

নাক কুঁচকে তাচ্ছিল্যের সুরে বিনু বলল, 'হাজার হাজার।'

চোখ দুটো গোল হয়ে গেল ছোকরার। অবাক বিস্ময়ে বলল, 'কন কী!'

ছোকরা 'আপনি' 'আপনি' করছে। এত মর্যাদা দিয়ে আগে আর কেউ তার সঙ্গে কথা বলে নি। মনে মনে নিজেকে রীতিমত বিশিষ্ট আর সম্মানিত মনে হচ্ছে। বিনু বলল, 'একবার গিয়ে দেখে এস না।'

'কইলকাতা যাওনের সাইধ্য কি আমাগো আছে?' মুখখানা ভারি বিমর্ষ হয়ে গেল ছোকরার।

বিনু এবার কিছু বলল না।

ছোকরা আবার বলে, 'কইলকাতায় মেলা গাড়ি-ঘুড়া, না?'

বিনু বলল, 'অনেক।'

'মেলা মানুষ, শুনছি মাইন্‌ষের মাথা মাইন্‌ষে খায়। রাস্তাগুলান নিকি দিনরাইত ঘইষা মাইজা ঝকঝইকা কইরা রাখে। এত্তটুক ধূলা কুনোখানে পইড়া নাই। রাইতগুলি নিকি বাত্তিরে বাত্তিতে দিন হইয়া যায়। সত্য ছুটোবাবু?'

পূর্ববাংলার সুদূর অভ্যন্তরে এই রাজদিয়াতে একটি গ্রাম্য যুবকের কল্পলোকে কলকতা স্বর্গ হয়ে আছে। তার কল্পনা কতদূর আর পৌঁছুতে পারে? সগর্বে বিনু তার চাইতে হাজার গুণ চমকপ্রদ আর বিস্ময়কর এক কলকাতার এমন বর্ণনা দিল যাতে ছোকরা একেবারে হাঁ হয়ে গেল।

বিস্ময়ের ঘোর কিছু কমে এলে ছোকরা বলল, 'আহা রে, এমুন দ্যাশ চৌখে দেখতে পাইলাম না।'

হঠাৎ বিনুর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'তখন তোমরা দু'জন এখানে

কাজ করছিলে না?'

'হ্যাঁ। আমি আর করিমা।'

করিমা অর্থে করিম। বিনু বলল, 'তোমার নাম তা হলে যুগল।'

ছোকরা অবাক হয়ে বলল, 'আমার নাম ক্যামনে জানলেন ছুটোবাবু?'

'তখন ঘোড়ার গাড়ি থেকে তোমারা বাক্স-টাক্স নামাচ্ছিলে, কে যেন তোমাদের নাম ধরে ডাকছিল। তাই শুনে জেনেছি।'

যুগল বলল, 'অ।'

বিনু শুধলো, ''করিমকে তো দেখছি না।'

'অগো (ওদের) বাড়িতে গেছে, দুফারে আইব।'

একটু ভেবে বিনু কি বলতে যাবে সেই সময় হঠাৎ ঘুরে পুকুরের দিকে তাকাল যুগল। দেখেই বোঝা যায় তার চোখমুখ এবং স্নায়ুমণ্ডলী প্রখর হয়ে উঠেছে। স্থির দৃষ্টিতে একটুক্ষণ অকিয়ে থাকল সে। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটল।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? অমন করে ছুটছ কেন?'

যুগলের উত্তর দেবার সময় নেই, সে ফিরেও তাকাল না। ছুটতে ছুটতে ঝপাৎ করে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছু পিছু বিনুও ছুটে এসেছিল, ঘাটের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ফিটনে আসতে আসতে মনে হয়েছিল পুকুরের ওপারে শুধু ধানবন, কাছাকাছি আসতে বিনু দেখতে পেল তার তিন দিকেই ধানের খেত। প্রকাণ্ড মাছের মতন জল কেটে কেটে কোনাকুনি পুকুর পাড়ি দিয়ে নিমেষে ওপারে চলে গেল যুগল। তারপর ধানখেতের ভেতর ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ কোথায় অদৃশ্য হয়ে রইল।

ভয়ে বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করতে লাগল বিনুর। যুগল ডুবে গেল নাকি? যদি আর সে জলের তলা থেকে না ওঠে? বিনু একবার ভাবল, ধানখেতে গিয়ে যুগলকে বার করে। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, সে সাঁতার জানে না। সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

ভয়ে আর উদ্বেগে কতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে ছিল, মনে নেই। একসময় ধানখেতের ফাঁকে যুগলের মাথা ভেসে উঠল। তাকে দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে ভয়টা কাটল বিনুর। না, ডুবে যায় নি। অনেকক্ষণ পর জোরে জোরে বুকের ভেতর শ্বাস টানতে লাগল সে।

বিনু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। দেখতে পেল, ধানখেত থেকে কি একটা যেন বুকের কাছে আটকে ঠেলে ঠেয়ে নিলে আসছে যুগল। একটু পর পুকুর পেরিয়ে পাড়ে এসে উঠল সে, তারপর জল থেকে মস্ত বড় গোলাকার খাঁচার মতন একটা জিনিস তুলে আনল। সরু সরু কাঠি ফাঁক ফাঁক করে বেঁধে খাঁচটা তৈরি। এমন জিনিস আগে আর দেখে নি বিনু। সে জিজ্ঞেস করল 'এটা কী?'

যুগল বলল, 'চাই।'

'কী হয় এটা দিয়ে?'

'ভিতরে তাকাইয়া দ্যাখেন ছুটোবাবু।'

প্রথমটা লক্ষ করে নি বিনু। যুগলের কথামতন তাকাতেই খুশিতে তার চোখ চকচকিয়ে উঠল। 'চাই'-য়ের ভেতরটা মাছে বোঝাই, রোদ লেগে রুপোলি আঁশগুলো ঝলকে উঠছে।

বিনু প্রায় লাফ দিয়েই উঠল, 'ইস, কত মাছ!'

'এই মাছ দেইখ্যাই ক'ন কত মাছ! আইতেন বর্ষ্যাকালে, দেখতেন মাছ কারে কয়!' বলতে বলতে কি এক কৌশলে 'চাই'-য়ের পেছন দিকটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো ঝুপ ঝুপ করে মাটিতে পড়ে লাফাতে লাগল। নানা রকমের মাছ। বেশির ভাগই বিনুর চেনা। রুই, কালবোস, বড় বড় সরপুঁটি, গোলসা ট্যাংরা আর বেলে—এদের চিনতে পারল সে। বাদ বাকি অচেনা। মাছ বার করা হয়ে গিয়েছিল।

যুগল বলল, 'ছুটোকত্তা আপনে এট্টু মাছগুলার কাছে খাড়ন, দেইখেন চিলে আর কাউয়ায় (কাকে) আবার তুইলো নিয়া না যায়।'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাবে?'

'ধানখ্যাতে, 'চাই'টা আবার পাইতা রাইখা আসি।' মাছধরা ফাঁদের পেছন দিকটা তাড়াতাড়ি আটকে দিয়ে জলে গিয়ে নামল যুগল, নিমেষের ভেতর ধানবনে সেটা রেখে ফিরে এল। তারপর যেখানে পচা পাট স্তূপাকার হয়ে আছে সেখান থেকে একটা বড় গামছা এনে মাছগুলো বেঁধে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলেন ছুটোবাবু—'

'কোথায়?

'মাছগুলা ভিতরে দিয়া আসি।'

দু'জনে বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

বিনু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মকুশলতায় যুগল তাকে জয় করে নিয়েছে।

পাশ থেকে যুগলকে একবার দেখে নিয়ে বিনু বলল, 'তুমি তো খুব সাঁতার কাটতে পার!'

'হ—'মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে যুগল বলল, 'তা পারি। আমারে পুকৈর পার হইতে দেখলেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'এইরকম তিনটা পুকৈর আমি এক ডুবে পার হইয়া যাইতে পারি। ইস্টিমারে কইরা যে নদী দিয়া আইলেন—'

'হ্যাঁ—'

'সাতইরা (সাঁতরে) ঐ নদীটা যে কতবার এপার-ওপার হইছি, হিসাব নাই ছুটোবাবু।'

আগে মুগ্ধ হয়েছিল, এবার একেবারে ভক্তই হয়ে পড়ল বিনু। তোষামোদের সুরে বলল, 'আমাকে একটু সাঁতার শিখিয়ে দেবে?'

যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল যুগল। বিস্ময়ে তার চোখ গোলাকার হয়ে গেছে। সাঁতার জানে না, এমন মানুষ জীবনে এই বোধহয় প্রথম দেখল সে। বলল, 'আপনে সাতর জানেন না ছুটোবাবু?'

চোখ নামিয়ে বিনু খুব আস্তে করে বলল, 'না।' লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিল না সে।

কলকাতায় থাকে বলে বিনুর খুব গর্ব। তার ধারণা, পৃথিবীর সব কিছু জেনে বসে আছে। কিন্তু একটি গেঁয়ো যুবকের কাছে যে পরাজয় মানতে হবে তা কে জানতো?

আবার হাঁটতে শুরু করল যুগল। বলল, 'আমাগো এইখানে কুলের (কোলের) পুলাটাও (ছেলেটাও) সাতর দিতে পারে। ডর নাই, দুই চাইর দিনের ভিতর সাতর শিখাইয়া, মাছ-ধরা শিখাইয়া আপনেরে চালাক কইরা দিমু।'

বিনু গম্ভীর হয়ে গেল। যুগলের কাছ থেকে চালাক হবার পাঠ নিতে হবে, এতখানি মেনে নিতে সে রাজি না। বলল, 'আমি বোকা না।'

যুগল বলল, 'হে তো জানিই ছুটোবাবু—'

একটু পর তারা ভেতর-বাড়িতে এসে পড়ল। যুগল ডাকল, 'ঠাউরমা এট্টু বাইরে আহেন দেখি—'

রান্নাঘর থেকে স্নেহলতা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছু পিছু শিবানী, সুরমা, সুনীতি আর ঝিনুকও এল।

ততক্ষণে গামছা খুলে মাছগুলো ঢেলে ফেলেছে যুগল। সুনীতি সবিস্ময়ে বলল, 'এত মাছ কোথায় পেলে!'

সবগুলো দাঁত বার করে হাসল যুগল, 'ধরলাম।'

বিপুল উৎসাহে হাত-পা নেড়ে যুগলের মাছ-ধরার পদ্ধতি বর্ণনা করতে লাগল বিনু।

স্নেহলতা সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'একেবারে মেছো রাশি। দিনরাত খালি মাছই ধরছে। আর ধরতেও পারে, মাছ যেন ওর গায়ে লেগে উঠে আসে।'

মাছ দেখে সুরমা খুব খুশি। বললেন, 'ছেলেটা কে গো মামী?'

স্নেহলতা সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে পাকসি বলে ভুঁইমালীদের একটা গ্রাম আছে, যুগলদের বাড়ি সেইখানে। তবে বাড়ির সঙ্গে, বাপ-মা ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই হয়। দশ বছর বয়েসে হেমনাথ তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে যুগল এ বাড়িরই ছেলে, ক্বচিৎ কখনো নিজেদের বাড়ি যায়। এবেলা যায় তো, ওবেলা ফিরে আসে। এখানে থেকে থেকে বাপ-মা'র কাছে গিয়ে ওর মনই বসে না।

উঠোনে মাছগুলো লাফালাফি করছে। ওঘর থেকে সুধা দেখতে পেয়েছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। চোখ বড় করে বলল, 'কত মাছ রে!'

একটু পর অবনীমোহন আর হিরণও এল। মাছ দেখে সবাই আনন্দিত। জল বাংলার রুপোলি ফসল সকলকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে।

স্নেহলতা যুগলের দিকে ফিরে বললেন, 'দিনরাত তো মাছরাঙার মতন মাছের পেছনে লেগে রয়েছ। পাট তোলা হয়েছে?'

যুগল একগাল হেসে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'না।'

'উনি কেতুগঞ্জ থেকে এসে যদি দ্যাখেন পাটের মনে পাট পড়ে আছে, মাছ খাওয়াবে'খন।'

'ঠাউরদা আসনের আগেই পাট তুইলা ফেলামু।' বলেই ছুট লাগাল যুগল। উঠোনের আধাআধি গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিনুকে ডাকল, 'আইবেন নিকি ছুটোবাবু?'

যুগলের সঙ্গ মোটামুটি ভালই লাগছিল। বিনু এগিয়ে গেল।

অবনীমোহন বললেন, দু'জনের বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখছি।'

সুরমা হাসলেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। মাছ ধরার কায়দা দেখিয়ে যুগল বিনুকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে।'

বার-বাড়ির সেই বাগানে এসে পচা পাটের স্তূপের ভেতর বসে পড়ল যুগল, একটু দূরে একটা গাছের মোটা শিকড়ের ওপর বসল বিনু।

হাতের কৌশলে অতি দ্রুত পচা পাট থেকে আঁশ আর শোলা বার করে দু'ধারে রাখতে লাগল যুগল, সেই সঙ্গে চলল গল্প।

জাদুকর যেমন ঝাঁপির ভেতর থেকে একের পর এক অচেনা বিস্ময় তুলে এনে চমকে দেয়, তেমনি কথায় কথায় নিজের তাবৎ গুণ জাহির করতে লাগল যুগল। বিনা পালে শুধু একখানা বৈঠার ভরসায় নৌকো নিয়ে বর্ষার নদী পেরিয়ে যেতে পারে সে, পায়ে দড়ি না বেঁধে চক্ষের পলকে তিরিশ চল্লিশ হাত নারকেল গাছের মাথায় উঠতে পারে, রাতের পর রাত কৃষ্ণলীলা আর রয়ানির আসরে গান গেয়েও তার গলা ভাঙে না।

যত শুনছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল বিনু। গানের কথায় বিস্ময়টা তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল। বলল, 'তুমি গাইতেও পার!'

'না পারি কী? সগ্গলই পারি।' যুগল বলতে লাগল, 'আমার গীত শুনলে মাইনষে মোহিত হইয়া যায়।'

'তাই নাকি?'

আশ্বাসের সুরে যুগল বলল, 'শুনামু ছুটোবাবু, আপনেরে একদিন আমার গীত শুনাইয়া দিমু। তখন বুঝবেন, যুগইলা মিছা কয় নাই।'

শরতের বাতাস এলোমেলো বয়ে চলেছে— কখনো ঝড়ের মতন সাঁই-সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, কখনও ঝিরঝিরে সুখস্পর্শে ঘুম এসে যায়। স্টিমারে আসতে আসতে মনে হয়েছিল, আকাশময় কে এক অদৃশ্য ধুনুরি পেঁজা তুলো ছড়িয়ে রেখেছে। কখন যে রং বদলে মেঘগুলো কালো হয়ে গেছে, বিনুরা লক্ষ করে নি। ধীরে ধীরে বাতি নিভে এলে যেমন হয় সেইরকম রোদটা কখন যেন দীপ্তি হারিয়ে, উজ্জ্বলতা হারিয়ে মলিন হয়ে গেছে।

গল্প করতে করতে পুকুরের ওপারে তাকাল বিনু। ধানবনে ঢেউ তুলে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। দু-চারটে নৌকাও চোখে পড়ছে, ধানখেত সিঁথির মতন চিরে তারা কোথায় পাড়ি জমিয়েছে কে জানে।

হঠাৎ বিনু বলল, 'আচ্ছা, ওই দিকটায় ধানখেত আর জল ছাড়া কি কিছুই নেই?'

যুগল বলল, 'আছে তো।'

'কী?'

যুগল এবার যা বলল, তা এইরকম। ধু-ধু এই জলরাশি আর ধানের অরণ্যের ভেতর দ্বীপের মতন একেকটা কৃষাণ গ্রাম মাথা তুলে আছে। আরো জানাল, সেই আষাঢ় মাস থেকে কার্তিকের শেষাশেষি পর্যন্ত গ্রামগুলো একখানা সমুদ্রের ওপর যেন ভাসতে থাকে। তারপর মাঠের জল সরে গেলে কয়েকটা মাস নিশ্চিন্ত।

বিনু শুধলো, 'ঐ জল কি আর যাবে?'

'যাইব বৈকি। এইর মধ্যেই টান ধরছে—' যুগল বলতে লাগল, 'আশ্বিনের শ্যাষাশেষি দেখবেন, জল কত কইমা গেছে। অঘ্রান মাসে চাইর দিক শুকনা খটখইটা (খটখটে) হইয়া যাইব।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে বিনু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'চারদিক তো জলে ডুবে আছে, ওখানে লোক যায় কি করে?'

'নায়ে কইরা।' যুগল বলতে লাগল, 'দুই চাইর দিন থাকেন, বুঝতে পারবেন নাওই এইখানকার মাইন্ষের হাত-পা। নাও ছাড়া এই জলের দ্যাশে কুনোখানে যাওনের উপায় নাই।'

একটু ভেবে বিনু বলল, 'ওই দিকে গ্রাম ছাড়া আর কী আছে?'

'বড় বড় গুঞ্জ (গঞ্জ)।'

'গুঞ্জ কী?'

'বাজার আর কি, যেখানে মাল বিকিকিনি হয়। কি একেকখান গুঞ্জ ছুটোবাবু—দিনরাইত মাইন্ষের চিল্লাচিল্লিতে গমগম করে। দেলভোগ, মোহনগুঞ্জ, মীরপুর, ইনামগুঞ্জ—যেখানেই যান, এক অবস্থা।'

ইনামগঞ্জ নামটা বিনুর চেনা-চেনা লাগল। কিন্তু কোথায় কার কাছে শুনেছে, এই মুহূর্তে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

যুগল থামে নি, 'পূজা আইতে আছে ছুট্টোবাবু। মোহনগুঞ্জে, মীরপুরে, দেলভোগে রাইতের পর রাইত যাত্রাগান হইব। এমনে মাইন্ষের ভিড়ে পাও ফালান যায় না, তখন সারা রাজ্যি একেবারে ভাইঙ্গা পড়ব।'

বিনু বলল, 'জানো, আমি কখনও যাত্রা দেখি নি।'

বরদানের ভঙ্গিতে যুগল বলল, 'তার লেইগা কি, আমি আপনেরে দেখাইয়া আনুম। কয়টা আর দিন, পূজা তো আইসাই পড়ছে।'

বিনু বলল, 'কথা দিলে, নিয়ে যেতে হবে কিন্তু—'

'যামু— যামু—যামু—'

বিনু আর কিছু বলল না। স্বপ্নলোকের রহস্যময় সংকেতের মতন দিগন্তের ওপার থেকে দেলভোগ-মীরপুর-ইনামগঞ্জ, এই বিচিত্র নামগুলি আর যাত্রাগানের আসর তাকে যেন বার বার ইশারা করতে লাগল।

রান্নাবান্না শেষ হতে হতে দুপুর পেরিয়ে গেল, তখনও হেমনাথ ফিরলেন না।

সবার চান হয়ে গিয়েছিল। সুরমা-সুধা-সুনীতি-ঝিনুক বাড়িতেই তোলা জলে চান সেরেছে। অবনীমোহন, বিনু আর হিরণ গিয়েছিল পুকুরে। সঙ্গে যুগলও ছিল। আজ থেকেই যুগলের কাছে সাঁতারের প্রথম পাঠ নিতে শুরু করেছে বিনু।

নতুন জায়গা, নতুন জল বলে বেশিক্ষণ পুকুরে হুটোপাটি করতে দেন নি অবনীমোহন। সে জন্য মুখখানা ভারি হয়ে আছে বিনুর।

যাই হোক রান্নাঘরে বড় বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি আসন পেতে থালা সাজিয়ে স্নেহলতা খেতে ডাকলেন।

অবনীমোহন বললেন, 'মামাবাবুর জন্যে আরেকটু অপেক্ষা করি। তারপর না হয়—'

'অপেক্ষা করে লাভ নেই বাবা। হয়তো আজ ফিরবেনই না।'

'এ রকম হয় নাকি?'

স্নেহলতা হাসলেন, 'প্রায়ই হয়। এই যে গেলেন, ফিরতে ফিরতে দু-চারদিনও লেগে যেতে পারে। ওঁর আশায় বসে থাকলে উপোস দিতে হবে।

অগত্যা কি আর করা, খেতে বসতে হল।

ওবেলার মতন এবারও মাছের ভাগ নিয়ে বায়না করল ঝিনুক, এবং কেঁদে কেটে সব কিছু বিনুর সমান আদায় করে ছাড়ল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রামের সুযোগ মিলল না। তার আগেই রাজদিয়ার এপাড়া-ওপাড়া থেকে দলে দলে মানুষ আসতে লাগল। তারা স্নেহলতাকে ছেঁকে ধরল। মেয়ে-জামাই দেখাও, নাতি-নাতিনী দেখাও।

স্নেহলতা সবার সঙ্গে অবনীমোহনদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের কেউ প্রণাম করে, কেউ প্রণাম নিয়ে পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে করে বিদায় নিল। যাবার আগে সবাই নিমন্ত্রণ করে গেল, তাদের বাড়ি অন্তত একদিন করে যেতে হবেই।

অবনীমোহন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'শুধু আমাদের দেখবার জন্যে এত লোক এসেছে!'

স্নেহলতা হাসলেন, 'হ্যাঁ। এখানে কারো বাড়িতে লোকজন এলে রাজ্যের মানুষ ছুটে আসে। এক বাড়িতে উৎসব লাগলে সারা রাজদিয়ায় উৎসব লাগে। কোনো বাড়িতে কেউ মরলে টরলে সবার মন খারাপ হয়ে যায়।'

'চমৎকার জায়গা তো। অথচ কলকাতায়—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন অবনীমোহন। তুলনামূলকভাবে কলকাতা নামে এক উদাসীন আত্মকেন্দ্রিক নগরীর কথা তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল।

স্নেহলতা মনে করিয়ে দিলেন, 'কলকাতার কথা কী বলছিলে অবনী?'

অবনীমোহনের দূরমনস্কতা কেটে গেল। বললেন, 'পাড়া দূরে থাক, এক বাড়িতে তিন ভাড়াটে থাকলে একজনের নাম আরেক জনের জানতে হয়তো বছর কেটে যায়।'

'বল কি অবনী!'

স্নেহলতা বললেন, 'ওখানকার লোক থাকে কি করে? আমি হলে দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম। সেদিক থেকে রাজদিয়ায় আমরা বেশ আছি।'

লোকজনের ভিড় কাটতে কাটতে বেলা পড়ে এসেছিল। আকাশে এখন মেঘ আছে, রোদও আছে—বেলাশেষের নরম সোনালি রোদ। খানিক আগে ঝিরঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন ছাটটা জোরালো না। কদমফুলের রেণুর মতন বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো ইলশেগুঁড়ি উড়ছে।

অবনীমোহনেরা সেই পুবদুয়ারী ঘরটায় আবার আসর জমিয়ে বসেছেন। এ বাড়িতে কেউ চা খায় না, অথচ অবনীমোহনের দু'বেলা চা না হলে পৃথিবী অন্ধকার। কাজেই কলকাতার এই চা-চাতকদের জন্য খেয়ে উঠেই রাজদিয়ার বাজার থেকে চা নিয়ে এসেছে হিরণ।

পেয়ালায় ধূমায়িত সোনালি তরল সামনে সাজিয়ে গল্প হচ্ছিল। ও বেলা অবনীমোহন, সুধা আর হিরণ ছিল শুধু। এ বেলা সুনীতি, সুরমা, বিনু, ঝিনুক, স্নেহলতা, এমন কি শিবানীও এসে যোগ দিয়েছেন।

এলোমেলো অসংলগ্ন নানা কথার পর হিরণের প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

অবনীমোহন শুধোলেন, 'তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড় হিরণ ?'

হিরণ বলল, 'ঢাকা।'

'তা হলে তো ঢাকাতেই থাকতে হয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি হোস্টেলে থাকি।'

'পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছ বুঝি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ছুটি শেষ হলেই ফিরে যাব।' বলে, একটু থেমে হিরণ ফের শুরু করে, 'ছুটিছাটা পেলেই আমি বাড়ি চলে আসি। ঢাকা আর কতক্ষণের পথ, স্টিমারে ঘণ্টা পাঁচেক লাগে।'

অবনীমোহন বললেন, 'তোমার কোন ইয়ার যেন ?'

'ফিফথ।'

'এম.এতে বি. এ-র মতনই রেজাল্ট হবে তো ?'

উত্তর দিতে গিয়ে সুধার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। পরিপূর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সুধা তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে সলজ্জ সুরে হিরণ বলল, 'দেখি—'

অবনীমোহন কি বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে ঝুমঝুম বাজনার মতন শব্দ ভেসে এল, তার সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের খটখট আওয়াজ।

সবাই একসঙ্গে জানলার বাইরে তাকাল। বিনুরা দেখতে পেল, সেই চমৎকার ফিটনটা আবার ফিরে এসেছে। এটায় করেই তারা স্টিমারঘাট থেকে এখানে এসেছিল।

সোজা উঠোনের মাঝখানে এসে গাড়িটা থামল। স্নেহলতা উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। বললেন, 'ভবতোষ মনে হচ্ছে—'

ঠিক সেই সময় ফিটনের ভেতর থেকে যিনি নামলেন তাঁকে যুবকও বলা যায় না, আবার প্রৌঢ়ও না। দুইয়ের মাঝামাঝি তাঁর বয়েস থমকে আছে।

ঝিনুক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—' তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠোনের দিকে ছুটল।

স্নেহলতা ঝিনুকের পিছু পিছু বড় বড় পা ফেলে ফিটনটার কাছে চলে এলেন। বিনু-সুধা-হিরণ ছুটে এসেছে। শিবানীও এসেছেন। সুনীতি ফিটন পর্যন্ত আসে নি, ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নেমেই থেমে

গেছে। অবনীমোহন এবং সুরমা ঘর থেকে বেরোন নি, দরজার কাছাকাছি এসে দ্বিধান্বিতের মতন দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সবার দৃষ্টিই আগন্তুকের দিকে।

বিনু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এই তবে ঝিনুকের বাবা।

বয়েস কত হবে ভবতোষের ? চল্লিশোর্ধ্বে, তবে পঞ্চাশের অনেক নিচে। চুল অযত্নে আর অবহেলায় এলোমেলো, কত কাল যে চুলে চিরুনি পড়ে নি! সমস্ত মুখ সাদা-কালো অজস্র অঙ্কুরে ছেয়ে আছে। চোখের কোলে ঘন শ্যাওলার মতন কালচে দাগ, কালো মণির চারধারে যে শ্বেত জমি এখন তা লাল—রক্ত যেন সেখানে জমাট বেঁধে আছে। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এই মাত্র শ্মশান থেকে ফিরলেন, তাঁকে ঘিরে দুর্বহ এক শোক রেখায়িত হয়ে রয়েছে।

ঘুম, বিশ্রাম, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা—এসবের সঙ্গে বুঝি বা কয়েক যুগ সম্পর্ক নেই ভবতোষের। কেমন এক বিহ্বলতা তাঁকে ঘিরে আছে।

ঝিনুক ছুটে গিয়ে বাবার কোলে উঠেছিল। কলকল করে একসঙ্গে অনেক কথা বলে গেল সে। তার কতক বোঝা গেল, বেশির ভাগ অবোধ্য থাকল। তবে বলার সুরে অভিমান আর রাগ যে জড়ানো সেটুকু অনায়াসেই টের পাওয়া গেল।

যেটুকু বোঝা গেছে তা এইরকম। ঝিনুক বলেছে, 'তুমি বললে মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ, যাবে আর আসবে। এক মাস দু'মাস হয়ে গেল, তুমি আর আসো না।'

ভবতোষ মলিন হেসেছেন, 'এক মাস দু'মাস কি রে, গেলাম তো পরশুদিন বিকেলবেলা।'

'মা কোথায় ?'

ঝাপসা ভারি স্বরে ভবতোষ বললেন, 'হাসপাতালে রেখে এসেছি।'

'কবে আসবে ?'

'চার পাঁচ দিন পরে নিয়ে আসব।'

ঝিনুকের সব প্রশ্নের উত্তর ঠিকই দিয়ে গেছেন ভবতোষ, তবে কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধের মতন। গলার কাছের মোটা মোটা রক্তবাহী শিরাগুলো অস্বাভাবিক স্ফীত হয়ে উঠেছে। চোখ ফেটে হয়তো বা ফিনকি দিয়ে রক্তই ছুটবে।

বাতাসে কদম ফুলের রেণুর মতন যে ফিনফিনে ইলশেগুঁড়ি উড়ছিল এখন আর তা নেই। তার বদলে শরতের ঝিরঝিরে বৃষ্টি আবার শুরু হয়ে গেছে।

স্নেহলতা বললেন, 'ঘরে চল ভব, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ভিজে নেয়ে যাবে।'

'আবার ঘরে যাব ? আমি বরং ঝিনুককে নিয়ে এখন যাই। পরে আসব'খন।'

'ঝিনুককে নেবার জন্যেই ছুটে এসেছ নাকি ?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'সেজন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।' স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'তুমি ঘরে এস তো। উঠোন পর্যন্ত এলে, ঘরে গিয়ে না বসলে কখনো হয়।'

আস্তে করে ভবতোষ বললেন, 'আচ্ছা, চলুন—'

এমনভাবে কথাগুলো বললেন ভবতোষ, যাতে মনে হয়, নিজের ইচ্ছায় তিনি চলেন না। হয়তো নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কোনো কিছুই তাঁর ওপর ক্রিয়া করে না। অন্যের খুশিতে অন্যের ইচ্ছায় সব সময় তিনি যেন নিজেকে সঁপে রেখেছেন।

অবনীমোহনরা যেখানে আছেন সেই ঘরটার দিকে পা বাড়ালেন স্নেহলতা, অন্য সবাই তাঁকে অনুসরণ করল।

যেতে যেতে স্নেহলতা শুধোলেন, 'ঢাকা থেকে কখন ফিরলে ভব ?'

ভবতোষ বললেন, 'খানিক আগে। বাড়ি ফিরেই আপনাদের এখানে চলে এসেছি।'

'নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমার ধরেছিলে কখন?'

'দশটা নাগাদ।'

'চান-খাওয়া নিশ্চয়ই হয় নি?'

'স্টিমারে মিষ্টি-টিষ্টি খেয়েছিলাম।'

'মিষ্টি খেলে কখনও চলে? তোমার বাড়িতে তো রান্নাবান্না হয়নি, রাঁধবেই বা কে?'

ভবতোষ চুপ করে রইলেন।

স্নেহলতা ব্যস্ত হয়ে উঠেলেন, 'একটু জিরিয়ে নাও, তারপর খেয়ে-দেয়ে বাড়ি ফিরবে।'

অন্যমনস্কের মতন ভবতোষ বললেন, 'আচ্ছা।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর ভবতোষ ডাকলেন, 'খুড়িমা—'

'কী বলছ?' চলতে চলতে পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে নিলেন স্নেহলতা।

'হেমকাকা আমার কাছে সেদিন ফিটনটা চেয়েছিলেন। কাদের আসবার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁরা এসেছেন?'

'হ্যাঁ। ভেতরে এস, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

ঘরে এসে অবনীমোহনদের সঙ্গে ভবতোষের পরিচয় করিয়ে দিলেন স্নেহলতা। তারপর বললেন, 'এখন কিছু খাবে ভব?'

'না। তবে—'

'বলে ফেল না—'

'একটা জিনিস পেলে মন্দ হত না, কিন্তু আপনাদের এখানে তার প্রবেশ তো নিষিদ্ধ।'

স্নেহলতা বললেন, 'চা নিশ্চয়ই?'

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

স্নেহলতা বললেন, 'এ বাড়িতে চা ঢুকে পড়েছে।'

মলিন বিষণ্ণতার মধ্যেও ভবতোষের চোখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। বললেন, 'কাকাবাবু চা ঢুকতে দিলেন!'

'না দিয়ে উপায় কি।' স্নেহলতা হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনীদের আবার ঐ জিনিসটি না হলে চলে না।'

ভবতোষ বললেন, 'যাক, এ বাড়ি নিয়ে রাজদিয়ার সাত বাড়িতে তা হলে চা ঢোকার ছাড়পত্র পেল। এবার থেকে চায়ের লোভেও মাঝে মাঝে আসতে হবে।'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'এ বাড়ি বাদ দিলে থাকে ছ'বাড়ি। ঐ ছ'বাড়ি ছাড়া রাজদিয়ায় চায়ের চল নেই নাকি?'

ভবতোষ মৃদু হাসলেন, 'না। হেমকাকা নিজে পি. সি. রায়ের শিষ্য, সারা রাজদিয়াকেও তাই করে ছেড়েছেন। শুধু আমরা ক'জন পাষন্ড তাঁকে অমান্য করে চলেছি।'

অবনীমোহনও হেসে ফেললেন।

একটু পরে চা এল। স্নেহলতা বা শিবানীর চা তৈরির অভ্যাস নেই, সুনীতিই করে এনে দিল।

চা খেতে খেতে ভবতোষ স্নেহলতার দিকে ফিরে বললেন, 'ঝিনুক কান্নাকাটি জুড়ে দেয় নি?'

'না।'

'আমার কথা বলেছিল?'

'মোটেও না। তবে—'

'কী?'

বিনুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে স্নেহলতা এবার বললেন, 'ঐ দাদাভাইটা আসার পর খুব হিংসে হয়েছে। জেদ করে, বায়না ধরে ওর সমান সমান ভাগ আদায় করেছে।' বলে তিনি হাসলেন।

ঘরের অন্য সবাইও হাসল। আর বিনু নেহাত অকারণেই হঠাৎ খুব লজ্জা পেয়ে গেল।

চা খাওয়া হলে তাড়া দিয়ে ভবতোষকে চান করতে পাঠালেন স্নেহলতা। পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে এ ঘরেই আসন পেতে খেতে বসিয়ে দিলেন।

বিশাল ঘরের এক ধারে দুটো তক্তপোশ জোড়া দেওয়া। তার ওপর অবনীমোহনরা বসে আছেন। তাঁদের দৃষ্টি ভবতোষের ওপরেই স্থির হয়ে আছে। এই মানুষটি সম্বন্ধে হেমনাথ এবং স্নেহলতা দু'জনে গাঢ় বিষাদময় কিছু ভূমিকা করে রেখেছিলেন। অবনীমোহনদের চোখ দেখে মনে হয়, সাগ্রহে কিসের যেন প্রতীক্ষা করছেন।

প্রায় নিঃশব্দেই খেয়ে যাচ্ছিলেন ভবতোষ। আধাআধি খাওয়া হয়েছে, এমন সময় স্নেহলতা ডাকলেন, 'ভব—'

পাত থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ভবতোষ।

তক্ষুনি কিছু বললেন না স্নেহলতা। বলবেন কি বলবেন না, তাই নিয়ে মনে মনে খুব সম্ভব বোঝাপড়া করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর দ্বিধান্বিত সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল তোমার ফেরার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'এলে না যে?'

ভবতোষ উত্তর দিলেন না। ঝোলমাখা ভাতের ভেতর তাঁর হাত থেমে গেছে, কণ্ঠার কাছটা থরথর কাঁপছে।

স্নেহলতা আবার প্রশ্ন করলেন, 'এই দু'দিন কি বৌমাদের বাড়িতেই ছিলে?'

আস্তে মাথা নাড়লেন ভবতোষ, 'না।'

খানিক আগে চায়ের ব্যাপার নিয়ে লঘু কৌতুকের চিকচিকে একটু আভা ফুটেছিল। সমস্ত আবহাওয়া আবার অত্যন্ত ভারি, কষ্টকর আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল।

স্নেহলতা বললেন, 'কোথায় ছিলে তবে?'

'আমার এক বন্ধুর বাড়ি টিকাটুলিতে।' ভবতোষ বললেন।

'বৌমা কি সত্যিসত্যিই ওখানে থেকে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার শ্বশুরমশায় কী বললেন?'

এই ঘর বুঝি বায়ুশূন্য, শ্বাস টানতেও ভবতোষের কষ্ট হচ্ছে। অবরুদ্ধ গলায় বললেন, 'তাঁর কিছু বলবার নেই, মেয়েকে যথেষ্ট বকাবকি করেছেন। বকাই সার।'

'শাশুড়ি?'

'তিনিও মেয়েকে প্রশ্রয় দেননি, আমার সঙ্গেই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এনে কী করব বলুন?'

বিমর্ষ সুরে স্নেহলতা বললেন, 'সে তো ঠিকই।'

ভবতোষ বলতে লাগলেন, 'আমার বন্ধুটি যার কাছে দু'দিন কাটিয়ে এলাম সে জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। একসঙ্গে ঢাকায় ইউনিভারসিটিতে পড়তাম। তাকে পাঠিয়েছিলাম বোঝাবার জন্যে। কিন্তু—'

'কী?'

'ঝিনুকের মায়ের এক কথা, আমার সঙ্গে ঘর করবে না। রাজদিয়াতেও আর কখনও ফিরবে না।'

কেউ লক্ষ করে নি, একদৃষ্টে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব কথা শুনে যাচ্ছিল ঝিনুক।

হঠাৎ জোরে জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সবাই চমকে ঝিনুকের দিকে ফিরল। ভবতোষ আর স্নেহলতা প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'কাঁদছিস কেন ঝিনুক?'

ফোঁপানি থামে নি, ক্রমশ সেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। এদিকে লাফ দিয়ে তক্তপোশ থেকে নেমে হিরণ ঝিনুককে কোলে তুলে নিল। মাথায় কপালে হাত বুলোতে বুলোতে, আদর করতে করতে বলতে লাগল, 'কাঁদে না। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে। ভাল মেয়ে—'

কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলতে থাকে ঝিনুক। জড়ানো জড়ানো আধফোটা আধভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'মা আর আসবে না। মা আর আসবে না।'

ভর্ৎসনার সুরে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে হিরণ বলল, 'কেন যে তোমরা মেয়েটার সামনে এসব নিয়ে আলোচনা কর!' এর আগেও একবার এ ব্যাপারে স্নেহলতাকে বকেছে সে।

হিরণ দাঁড়াল না, ঝিনুককে নিয়ে বৃষ্টির ভেতরেই উঠোন পেরিয়ে ওধারের একটা ঘরে চলে গেল। আর এ ঘরে সময় যেন গতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। ঝিনুকের সামনে এ প্রসঙ্গ তোলা যে খুবই অন্যায় হয়েছে, নীরবে সবাই তা অনুভব করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর পাতের ভাতগুলোর নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন ভবতোষ।

স্নেহলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ও কি, কিছুই তো প্রায় খেলে না। সবই পড়ে রইল।'

বিস্বাদ সুরে ভবতোষ বললেন, 'আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না খুড়িমা—'

স্নেহলতা পীড়াপীড়ি করলেন না।

আঁচিয়ে এসে ভবতোষ বললেন, 'হেমকাকাকে তো দেখছি না।'

'উনি কেতুগঞ্জ গেছেন।' স্নেহলতা বললেন।

'কখন ফিরবেন?'

স্নেহলতা বললেন, 'সে কথা জিজ্ঞেস কোরো না বাপু। আজও ফিরতে পারেন, কালও পারেন, পরশুও পারেন। তোমার কাকাটিকে তো চেনই। আমি একটা সময় বলি, উনি হয়তো তখন এলেন না। মাঝখান থেকে আমি মিথ্যেবাদী সাজতে পারব না।' হেমনাথ সম্পর্কে ঠিক এরকম কথাই খানিক আগে অবনীমোহনকে বলেছিলেন তিনি।

ভবতোষ মৃদু হাসলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি তা হলে এখন যাই খুড়িমা—'

'এখুনি যাবে?'

'হ্যাঁ। সন্ধে হয়ে এল। মেয়েটাকে নিয়ে আবার অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।'

'ঝিনুককে সত্যিই নিয়ে যেতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আপনাদের কাছে দু'দিন তো রইল, ভয়ানক দুষ্টু। তার উপর এঁরা সব এসেছেন—'

ভবতোষের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন স্নেহলতা, নিজের দায়িত্বভার অকারণে অন্যের ওপর দিয়ে রাখতে তিনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন।

স্নেহলতা বললেন, 'আমার কাছে মাঝে মাঝে তো দিয়ে যাও। এখানে থাকার অভ্যেস ওর আছে, বেশ ভালই থাকে। দুষ্টুমির কথা বলছ? ওটুকু দুষ্টু সব ছেলেমেয়েই। আর ওরা এসেছে তো কি হয়েছে। ওদের সঙ্গে হৈচৈ করে বেশ থাকবে, মায়ের কথা মনে পড়বে না। বরং—'

'বরং কী?'

একটু ইতস্তত করে স্নেহলতা বললেন, 'তোমার ওখানে তুমি একা। দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকো। ঝিনুকটা না পাবে একটা খেলার সঙ্গী, না পাবে কারো সঙ্গে কথা বলতে। ও এখানেই থাক।'

ভবতোষ আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার মনটা ভাল নেই খুড়িমা, আজ ও চলুক। দু-একদিন পর না হয় দিয়ে যাব।'

চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল আসার মতন অদৃশ্য গোপন পথে অনেকখানি দুঃখ এই ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্নেহলতা বুঝতে পারলেন আজকের দিনটা অন্তত ঝিনুককে কাছে পাওয়া দরকার ভবতোষের, মেয়ের সঙ্গ তাকে খানিক সান্ত্বনা দিতে পারে। গাঢ় সহানুভূতির সুরে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, নিয়েই যাও।'

ভবতোষ বললেন, 'রাগ করলেন না তো খুড়িমা?'

'পাগল ছেলে, তোমার ওপর কি রাগ করতে পারি!'

একটু চুপ করে থেকে ভবতোষ বললেন, 'এখন থেকে ঝিনুকের সব দায়িত্বই আপনাকে নিতে হবে। আমার কলেজ খুললে ওকে কে দেখবে? আপনি ছাড়া মেয়েটাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, নির্ঘাত ও মরে যাবে।'

'ওসব আজে বাজে কথা বলতে নেই।'

'তা হলে এখন যাই?'

'এস।'

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে অবনীমোহনের কথা মনে পড়ে গেল ভবতোষের। ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের বাড়ি একদিন বেড়াতে যাবেন।'

অবনীমোহন বললেন, 'আপনিও আসবেন।'

'আসব।'

শরতের বৃষ্টি, এই আছে এই নেই। একটু আগেই স্বল্পায়ু সৌখিন বর্ষণ থেমে গেছে। ভবতোষ ঘর থেকে বাইরে এলেন, আর সবাইও সঙ্গে সঙ্গে এল।

ডাকাডাকি করে ও ঘর থেকে ঝিনুক আর হিরণকে বার করলেন স্নেহলতা। কি একটা মজার কথা হচ্ছিল দু'জনের, খুব হাসতে হাসতে ওরা এল। এর মধ্যেই ঝিনুককে ভুলিয়ে ভালিয়ে অন্যমনস্ক করে ফেলেছে হিরণ।

ফিটনটা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। স্নেহলতা বললেন, 'ঝিনুককে গাড়িতে তুলে দে হিরণ।'

হিরণ বলল, 'ও কি এখন চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

ভবতোষ ইতিমধ্যে ফিটনে উঠে বসেছেন। ঝিনুককে তাঁর পাশে বসিয়ে দিতে দিতে হিরণ বলল, 'সারাদিন তো রইলাম, ভব'দার গাড়িতে আমি বরং চলেই যাই ঠাকুমা।'

'কেন, আর কোনো কাজ আছে?'

'কাজ নেই। তবে তোমার যাবার হুকুমও নেই।'

'দাদু না এলে ছাড়া পাব না?'

'না।'

'অগত্যা।'

ফিটন চলতে শুরু করল, দেখতে দেখতে উঠোন-বাগান পেরিয়ে ঝিনুকরা রাস্তায় গিয়ে উঠল। আর অবনীমোহনরা ধীরে ধীরে ফিরে এলেন।

ঘরে এসে স্নেহলতা বললেন, 'ভবতোষের বৌর মতো মেয়েছেলে জীবনে আর দেখিনি, সংসারটা একেবারে ছারখার করে দিলে।'

সুরমা বললেন, 'কী এমন হয়েছে যে, স্বামীর সঙ্গে ঘর করবে না।'

'সন্ধে হয়ে এল, এসময় ঐ অলক্ষ্মীর কথা থাক।'

ভবতোষরা চলে গেছেন, এ-বাড়ির ওপর গাঢ় বিষাদ এখনও অনড় হয়ে আছে। বিনু কারো কথা শুনছিল না, জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। সেই সকাল থেকে দাদুর ভাগ নিয়ে, মাছের ভাগ নিয়ে, কলা আর রসগোল্লার ভাগ নিয়ে সমানে হিংসা করেছে ঝিনুক। তবু হিংসুটি মেয়েটার জন্য বিনুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

একটু পর সন্ধে নেমে এল।

মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে এক আধ পশলা বৃষ্টি ছাড়া শরতের দিনটা ছিল বেশ নির্মল, তার গায়ে ছিল নরম সোনালি আভা মাখানো। দেখতে দেখতে জলে কালি গুলে দেবার মতন হাওয়ায় হাওয়ায় কেউ বুঝি কালচে রং মিশিয়ে দিতে লাগল। এই রং মেশানোর খেলাটা চলল অনেকক্ষণ। তারপর অন্ধকার গাঢ় হয়ে ঝপ করে এক সময় রাত্রি নেমে গেল।

কলকাতার ফেনায়িত কলরব থেকে এত দূরে বিজলি আলোর দাক্ষিণ্য এসে পৌঁছয়নি। জানলার বাইরে যতদূর চোখ যায় গাছপালা ঝাপসা দেখাচ্ছে। তৃতীয় ঋতুর এলোমেলো বাতাসে সুপারি বন অল্প অল্প দোল খাচ্ছে, আম বাগানটাকে কেমন ভুতুড়ে মনে হয়। পুকুরটাকে আর চেনাই যায় না। তার ওপারে ধানখেতে মিটমিটিয়ে জোনাকি জ্বলছে—জ্বলছে আর নিভছে, নিভছে আর জ্বলছে। দিগন্ত পর্যন্ত ধানের মাঠটা যেন একখানা জামদানি শাড়ি, জোনাকিরা তার গায়ে আলোর চুমকি।

স্নেহলতা ইতিমধ্যে ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন, তা ছাড়া কাঠের তিনতলা পিলসুজে রেড়ির তেলের আলোও জ্বলছে। তবু ঘরগুলো পুরোপুরি আলোকিত না, এ-কোণে ও-কোণে অন্ধকার যেন জুজুবুড়ি হয়ে বসে আছে।

সেই পুবদুয়ারী ঘরখানায় অবনীমোহন, সুধা, সুনীতি আর বিনু এখনও বসে আছে। স্নেহলতা শিবানী রান্নাঘরে, রাতের জন্য আনাজ-টানাজ কুটছেন। সুরমা কাছাকাছি বসে এ-গল্প সে-গল্প করছেন। এতকাল পর মামী মাসিকে পেয়ে কথা আর তাঁর ফুরাচ্ছে না।

জানলার বাইরে চোখ মেলেই ছিল বিনু, ধানখেতে জোনাকির নাচানাচি ওড়াওড়ি ছাড়াও মাঝে মাঝে আরো কিছু আলো ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল। ওগুলো কিসের আলো বুঝতে পারছিল না বিনু।

জোনাকি আর মাঝে মাঝে ধানখেতে আলোর ঐ বিন্দু ক'টি ছাড়া চারধারে শুধু অন্ধকার—গাঢ় অথৈ অতল অন্ধকার।

পূর্ববাংলার এত সুদূর প্রান্তে এত অন্ধকার জমা হয়ে থাকবে আর সন্ধে নামতে না নামতেই ঝুপ ঝুপ করে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরবে, কে ভাবতে পেরেছিল। কলকাতায় রাত্রি টেরই পাওয়া যায় না, সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গে আলোর ফোয়ারা ছুটে যায়। আলোকিত নিশীথের যে স্বপ্নময়তা—চিরদিন তাতেই অভ্যস্ত বিনু। কিন্তু এখানকার রাত্রি প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে আছে। সে আছে আকাশ-বাতাস-জল-স্থল সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে। শুধু অচেতন জড় পৃথিবীর ওপর নয়, বুঝিবা জীব জগতের অস্তিত্বের ভেতর, তার গভীর মর্মমূল পর্যন্ত এই রাত্রি ছড়িয়ে আছে।

পূর্ববাংলার অন্ধকার যেন এ গ্রহের নয়, পাতালের নিবিড় অলৌকিক তমসা। বিনুর মনে হতে লাগল, এ অন্ধকার কোনোদিন ফুরোবে না। আজকের রাত শেষ হয়ে দিনের আলো আবার দেখা দেবে, এমন ভরসা মনের কোথাও খুঁজে পেল না বিনু।

খুব কাছ থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু চমকে উঠল। ভয়ও পেয়ে গেল খুব। চেঁচিয়েই উঠত, তার আগেই দেখতে পেল জানলার ঠিক ওধারে একটু কোণের দিকে ভূতের মতন যে দাঁড়িয়ে আছে সে যুগল।

চোখাচোখি হতেই যুগল আগের সুরেই বলল, 'আসেন—'

'কোথায় যাব ?'

'আসেন না—'

'বাইরে বড্ড অন্ধকার।'

'অন্ধারে ডর লাগে নিকি?' কেমন করে যেন হাসল যুগল।

ভয়ের কথায় পৌরুষে খোঁচা লাগল। গম্ভীর গলায় বিনু বলল, 'মোটেও না।'

'তয় আইসা পড়েন।'

অবনীমোহনরা কথা বলছিলেন। ওবেলার মতন চুপিসারে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিনু, হঠাৎ সুধার চোখে পড়ে গেল।

সুধা বলল, 'এই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

বিনু বলল, 'বাইরে।'

অবনীমোহন হিরণের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ ফেরালেন, 'বাইরে কী?'

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'যুগল ডাকছে।'

'যুগলের সঙ্গে খুব খাতির দেখছি। আচ্ছা যা—'

বিনু ছুট লাগাতে যাচ্ছিল, সুধা বাধা দিল, 'না, যেতে হবে না। ঐ ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে গিয়ে এক কান্ড করে বোসো, আমরা পাগল হয়ে যাই—'

বাধা পেয়ে বিনু খেপে গেল। চোখ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটতে লাগল যেন। স্টিমার ঘাটে পারে নি, এখন তার পুরোপুরি শোধটুকু তুলে নিল। জিভ ভেংচে টেনে টেনে বলল, 'পা-গ-ল হ-য়ে যা-ই! চুপ কর বাঁদরী। তোর বেশি ওস্তাদি করতে হবে না।'

সুধা আর বিনুর মধ্যে সম্পর্কটা নিয়ত শত্রুতার, চোখাচোখি হলেই তাদের যুদ্ধ। মাঝে মাঝে সন্ধি অবশ্য হয়, কিন্তু তা সাময়িক। দু'চার ঘণ্টার বেশি তার আয়ু নয়। তার পরেই সব চুক্তি, সব শর্ত ছুঁড়ে দিয়ে তারা পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বারুদ সব সময় কামানে পোরাই আছে, যে কোনো কারণে যে কোনো সময় যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে যেতে পারে।

এই অজানা ভুবনে অচেনা মানুষের ভিড়ে প্রায় গোটা একটা দিন কেটে গেল, দুই ভাই-বোনের লড়াই এখনও জমে নি। নতুন পরিবেশটা একটু সইয়ে নেবার শুধু অপেক্ষা।

সুধার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল। নেহাত হিরণ রয়েছে, নইলে এতক্ষণে তার নখে বিনুর গালের ছাল উড়ে যেত। সে-ও অবশ্য অক্ষত থাকত না, এক খামচা চুলের স্বত্ব তাকেও ছাড়তে হত।

চকিতে হিরণকে একবার দেখে নিল সুধা। হিরণের শক্তবদ্ধ চাপা ঠোঁটের ফাঁকে যা আবছাভাব ফুটে আছে তার নাম হাসি কিনা, বুঝতে পারা গেল না। দ্রুত চোখ ফিরিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখছ বাবা, দেখছ—কিরকম অসভ্য হয়ে উঠেছে বিনুটা!'

অবনীমোহন হাসতে লাগলেন।

সুধা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তুমি হাসছ বাবা!'

অবনীমোহন বললেন, 'হাসব না তো করব কী?'

সুধা গলার স্বর আরেক পর্দা তুলল, 'আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওটাকে একটা আস্ত বাঁদর করে তুলছ।'

'আদর তো আমি তোকেও দিই। বিনু বাঁদর হলে তুই কী?'

সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা!'

ছেলেমেয়েদের পেছনে লাগার স্বভাব আছে অবনীমোহনের, তিনি সমানে হাসতে লাগলেন। হিরণের ঠোঁটদুটো আরো শক্ত হয়ে গেছে, ভেতরে কিছু একটা চলছিল। বুদবুদের মতন ফুটি-ফুটি করেও বেরিয়ে আসতে পারছে না।

বিনু আর দাঁড়াল না, পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগুতে লাগল। সুধা বলল, 'ওকে তুমি বারণ কর বাবা, কিছুতেই বাইরে যেতে পারবে না।' সুধার যেন জেদই চেপে গেছে। সে-ও যে বিনুর অভিভাবক, তার ইচ্ছাকে ডিঙিয়ে বিনুর কোথাও যাবার উপায় নেই, হিরণের সামনে সেটাই প্রমাণ

করতে চাইছিল সুধা।

অবনীমোহন হাসি থামিয়ে শান্ত গলায় বোঝাতে লাগলেন, 'এখানে আমাদের মাঝখানে বেচারি মুখ বুজে বসে ছিল। যাক না যুগলের সঙ্গে—'

অবনীমোহন শেষ করতে পারলেন না, সুধা হঠাৎ প্রবল বেগে হাত-পা এবং মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল। তবে সে আর কিছু বলার আগেই লাফ দিয়ে বিনু বাইরে বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় এসে কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। তবে কি যুগল চলে গেছে? আস্তে আস্তে বিনু ডাকল, 'যুগল—যুগল—'

ঘরের ভেতর ঝড়ের আভাস পেয়ে উঠোনে নেমে গিয়েছিল যুগল, অন্ধকার ফুঁড়ে সে কাছে এসে দাঁড়াল, 'এই যে ছুটোবাবু—'

'ওখানে কী করছিলে?'

উত্তর না দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল যুগল। হাসতে হাসতেই বলল, 'ঘরের ভিতরে যা হইতে আছিল, ঐখানে খাড়াইয়া থাকতে সাহস হয় নাই। ছুটো দিদি বুঝি আপনেরে আইতে দিতে চায় না?'

'হুঁ, আমাকে ও আটকাবে!' বীরের মতন ভঙ্গি করে বিনু বলল, 'কী জন্যে ডাকছিলে বল—'

'আসেন আমার লগে (সঙ্গে)।'

'কোথায়?'

'গেলেই দ্যাখতে পাইবেন।'

নিঃশব্দে অন্ধের মতন যুগলকে অনুসরণ করতে লাগল বিনু। উঠোন পেরিয়ে তারা প্রথমে এল রান্নাঘরে। দরজার বাইরে থেকে যুগল ডাকল, 'ঠাউরমা—'

স্নেহলতা সাড়া দিলেন, 'কে, যুগল?'

'হ।'

'কিছু বলবি?'

'আপনার কাছে হেইদিন যে বড় বরিটা দিছিলাম, হেইটা দ্যান। পুকৈরে শৌল আর বোয়াল যা ঘাই মারতে আছে—'

'বরি' কী, বুঝতে পারল না বিনু।

স্নেহলতা শুধোলেন, 'আবার বুঝি মাছের পেছন লাগতে যাচ্ছিস?'

যুগল ঘাড় চুলকোতে লাগল।

স্নেহলতা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'পাট তোলা হয়ে গেছে?'

'হ।'

হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়লেন স্নেহলতা। তারপর সামনের দেয়ালের উঁচু তাক থেকে প্রকাণ্ড একটা বঁড়শি বার করে বললেন, 'এই নে—'

রান্নাঘরের ভেতর থেকে হারিকেনের আলো বাইরে এসে পড়ছিল। বঁড়শি দিতে গিয়ে বিনুকে দেখতে পেলেন স্নেহলতা। বললেন, 'একি, দাদাভাইকেও জুটিয়ে নিয়েছিস দেখছি!'

এক ফাঁড়া কাটিয়ে এসেছে, আবার যদি বাধা পড়ে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বিনু বলে উঠল, 'বাবাকে বলে এসেছি।'

সুরমা ভেতর থেকে বললেন, 'ওর সঙ্গে ঘুরছ, ঘোরো। অন্ধকারে বেশি হুটোপুটি কোরো না।'

বিনু তক্ষুণি ঘাড় কাত করল, 'আচ্ছা।'

খানিক পর বিনুকে সঙ্গে নিয়ে উঠোন-বাগান পেরিয়ে পুকুরের কাছে চলে এল যুগল। অন্ধকারে বিনুর ভয় ভয় করছিল কিন্তু সে-কথা তো আর যুগলকে বলা যায় না।

ঘরে বসে দেখতে পাওয়া যায় নি, পুকুরপারে এসে বিনু দেখতে পেল শরতের উজ্জ্বল নীলাকাশে

সুরু একফালি চাঁদ। চঞ্চল ভারহীন মেঘ তার মুখে বার বার পর্দা টেনে পরক্ষণেই নিরুদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

চাঁদ আছে ঠিকই কিন্তু আলো নেই। আলো বলতে দূরে ধানখেতে রাশি রাশি জোনাকি। আলোর ছুঁচের মতন অন্ধকারকে তারা অবিরাম বিঁধে যাচ্ছে।

সঙ্গে করে একটা লম্বা দড়ি নেমেছিল যুগল। অন্ধকারেই দড়ির একটা মাথায় বঁড়শিটা পরিয়ে একটা জ্যান্ত টাকি মাছ গেঁথে দিয়ে বলল, 'ছুটোবাবু, আমি ঐ গাছটায় উইঠা 'বরি'টা বাইন্ধা দিমু। তলে একা একা খাড়াইয়া থাকতে ডর লাগব না তো?'

শুনেই বুকের ভেতরটা গুরুগুর করে উঠল। এখানে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে হলে নির্ঘাত দম আটকেই সে মরে যাবে। কিন্তু তা বলা গেল না। তার বদলে বীরত্ব ফলাতে হল, 'একটুও ভয় লাগবে না।' বলল বটে, স্বরটা কিন্তু কেমন কাঁপা-কাঁপা শোনাল।

পুকুরের গা ঘেঁষেই একটা ঝুপসি আমগাছ। তার গোটা দুই ডাল জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। চোখের পলকে তরতর করে উঠে গিয়ে টাকি মাছের টোপসুদ্ধ বঁড়শিটা জলে নামিয়ে দিলে যুগল, তারপর দড়ির অন্য প্রান্তটা ডালে বেঁধে দিয়ে প্রায় তক্ষুণি নেমে এল।

যতক্ষণ যুগল গাছে ছিল দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। যুগল নেমে এলে ধীরে ধীরে বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস বার করে দিল সে।

পুকুর তোলপাড় করে মাছেরা লাফালাফি করছিল। যুগল বলল, 'শুনতে আছেন ছুটোবাবু?'

বিনু যুগলের কাছে আরেকটু ঘন হয়ে এল। ক্ষীণ সুরে বলল, 'কিসের আওয়াজ?'

বিনুর স্বরটা খেয়াল করে নি, যুগলের ধ্যান-জ্ঞান তখন পুকুরের দিকে। লোভী ফিসফিস গলায় সে বলল, 'মাছ ছুটোবাবু, মাছ। মনে লয়, সাই (প্রকান্ড) বোয়াল আর কাতল (কাতলা)। দুইটাই রাইক্ষইসা মাছ। এট্টু খাড়ন। অখনই শালারা বঁড়শি গিলা ফালাইব।'

চারদিক নিঝুম, জনহীন। অবশ্য ঝোপঝাড়ে আর নিবিড় বনানীর ফাঁকে ঝিঁঝিঁদের জলসা বসেছে। একটানা ঝিল্লিস্বর শুনতে শুনতে দু'জনে পুকুরপারে দাঁড়িয়ে রইল।

যুগল আবার কি বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় দেখা গেল দূরের ধানখেত চিরে আলোর ক'টি বিন্দু দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো কিসের আলো যুগল?'

যুগল একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'নাও মনে লয়।'

যুগলের অনুমানই ঠিক। আরেকটু কাছাকাছি আসতে টের পাওয়া গেল, নৌকোই। বৈঠা টানার ছপছপ আওয়াজ আসতে লাগল।

হঠাৎ দুটো হাত মুখের কাছে চোঙার মতন ধরে যুগল চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন গেরামের নাও?' স্বরটা শরতের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

একটু পর দূর থেকে কাঁপতে কাঁপতে সাড়া এল, 'কেতুগুঞ্জের নাও—'

'নাও যায় কই?'

'হ্যামকত্তার বাড়িত্।'

যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিনুকে বলল, 'বড়কত্তায় ফিরা আইল বুঝি।'

বিনু বুঝতে পেরেছিল। তবু বলল, 'দাদু?'

'হ।'

দেখতে দেখতে ছইওলা বড় একখানা নৌকো ঘাটে এসে লগি পুঁতল। ছইয়ের তলায় দুটো হারিকেন জ্বলছিল। আলো নিয়ে প্রথমে দু'জন মাঝি নামল। তাদের পিছু পিছু হেমনাথ, হেমনাথের পেছনে আলো হাতে আরো দুটো মাঝি। হারিকেন ছাড়াও হাতে কলাপাতা দিয়ে মুখ-বাঁধা বড় বড় গোটা

তিনেক হাঁড়ি আর প্রকাণ্ড এক রুই মাছ ঝুলছে।

ঘাট থেকে ওপরে উঠতেই সামনের মাঝি দুটোকে চিনতে পারল বিনু, ওবেলা এরা এসেই হেমনাথকে কেতুগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল। পেছনের দু'জন অবশ্য অচেনা। খুব সাধারণ মাঝি বা চাষীশ্রেণীর লোক বলে তাদের মনে হল না। দু'জনেই প্রৌঢ়, পরনে পাজামা আর ফুল শার্ট। মচমচ আওয়াজে টের পাওয়া যাচ্ছে তাদের পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। হারিকেনের আলোয় সোনার বোতাম আর আংটি ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। মাথায় সাদা টুপি, গালে চাপ দাড়ি। দূর থেকেও আতরের ভুরভুরে উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে। গ্রাম্য হলেও দু'জনের চেহারায় বেশ সম্ভ্রান্ত ছাপ আছে।

কাছাকাছি আসার আগেই যুগল ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি যাই। বড় কত্তারা আইছে, ঠাউরমারে খবরটা দেই গিয়া—' বলে আর দাঁড়াল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল।

একটু পর হেমনাথরা কাছে এসে পড়লেন। বিনুকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এ কি দাদাভাই, এই রাত্রিবেলা একা একা তুমি পুকুরপারে এসেছ!'

বিনু বলল, 'একা আসি নি, যুগল আমাকে নিয়ে এসেছে।'

হেমনাথ রেগে গেলেন, 'কোথায় সেই হারামজাদা? তোমাকে একলা ফেলে গেল কোন চুলোয়?'

'তুমি এসেছ, দিদাকে সেই খবরটা দেবার জন্যে এই মাত্তর বাড়ি গেল।'

হেমনাথ আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, পেছন থেকে সেই প্রৌঢ় মুসলমান দু'জন সামনে এগিয়ে এল। একজন শুধলো, 'এ ক্যাঠা ঠাউর ভাই (ঠাকুর ভাই অর্থাৎ দাদা)?'

হেমনাথ বললেন, 'নাতি, ওরাই আজ সকালে কলকাতা থেকে এসেছে।'

প্রায় ছুটেই বিনুর সামনে চলে এল প্রৌঢ়, বাজপাখির মতন ছোঁ মেরে নিমেষে তাকে বুকের ভেতর তুলে নিল। বাড়ি পর্যন্ত বুকের ভেতর বন্দি হয়েই আসতে হল বিনুকে।

বিনু অবশ্য উসখুস করেছে, হাত ছাড়িয়ে নামবার চেষ্টা করেছে। প্রৌঢ় ছাড়ে নি, ঠোঁট টিপে টিপে দুষ্টমির হাসি হেসেছে আবার বলেছে, 'ছাড়ুম না, কিছুতেই ছাড়ুম না। বক্ষের পিঞ্জরে ধইরা রাখুম।'

বাড়ির ভেতরে এসে দেখা গেল, সাড়া পড়ে গেছে। একেবারে প্রথম যে ঘরখানা সেটা দক্ষিণ-দুয়ারী, সেখানে ঢালা ফরাস পাতা। চারখানা হারিকেন চারদিকে বসানো, ঘরখানা আলোয় ভরে গেছে। একধারে সারি সারি ফরসি সাজানো, জল বদলে এখন তামাক সাজছে যুগল। তার সামনে নারকেল ছোবড়া, তামাকের ডিবে, দেশলাই, কুপি—নানাবিধ সরঞ্জাম ছড়ানো।

হেমনাথ সঙ্গীদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মাঝি দু'জন মুখবাঁধা হাঁড়িগুলো আর মাছটা নামিয়ে তলায় যুগলের কাছে ঘন হয়ে বসল। প্রৌঢ় দু'জন বসল ফরাসের ওপর। বিনু এখনও ছাড়া পায় নি, সেই প্রৌঢ়টির কোলের ভেতর বসে থাকতে হল তাকে।

হেমনাথ বসলেন না। বললেন, 'তোরা তামাক টামাক খা মজিদ, আমি জামাইদের খবর দি।'

বিনু দেখতে পেল যে প্রৌঢ়টি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে সে-ই উত্তর দিল, 'ঠিক আছে ঠাউর ভাই।'

এই তা হলে মজিদ মিঞা। কেতুগঞ্জে এঁর বাড়িতেই দাদু ওবেলা গিয়েছিলেন।

হেমনাথ আর কিছু বললেন না, ভেতর-বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

খানিক পর অবনীমোহন, সুরমা, সুধা, সুনীতি—সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন হেমনাথ। স্নেহলতা আর শিবানী আসেন নি, রান্নাঘরে নানা কাজে তাঁরা ব্যস্ত।

সবার সঙ্গে আগন্তুকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। মজিদ মিঞা ছাড়া আরেকজন যে প্রৌঢ় এসেছে তার নাম হাসেম আলি—মজিদ মিঞার বোনাই সে।

অবনীমোহনদের দেখে কী করবে যেন ভেবে পেল না মজিদ মিঞা। মুঠোয় বুঝি আকাশের চাঁদই পেয়ে গেছে। অবনীমোহনের একখানা হাত ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলতে লাগল, 'আপনারা আইছেন, আমাগো কি যে সৈভাগ্য!'

অবনীমোহন বললেন, 'ছি ছি, ও-কথা বলবেন না। সৌভাগ্য আমারও কম না। অপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল—'

মজিদ মিঞা বলল, 'আমরা আবার মানুষ, দোজখের আন্ধারে (পাতালের অন্ধকারে) পইড়া আছি।'

হেমনাথ মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, 'তোমরা এসেছ শুনে মজিদ ছুটে চলে এল। আর এমন পাগল—ঐ দেখ তিন হাঁড়ি বোঝাই করে তোমাদের জন্যে মিষ্টি আর মাছ নিয়ে এসেছে।'

অবনীমোহন লজ্জিত হলেন, সুরমাও। দু'জন প্রায় একসঙ্গে বললেন, 'আবার শুধু শুধু ওসব আনতে গেলেন কেন?'

মজিদ মিঞা বলল, 'ঠাউর ভাইয়ের নাতি-নাতনি ভাগনী-ভাগ্নীজামাই আমারও নাতি-নাতনী ভাগনী-ভাগ্নীজামাই। তাগো কিছু খাওয়াইতে বুঝিন সাধ হয় না?'

এর ওপর আর কথা চলে না, অবনীমোহনরা অভিভূতের মতন তাকিয়ে রইলেন।

হেমনাথ যুগলকে বললেন, 'মাছ-মিষ্টিগুলো ভেতরে দিয়ে আয়।'

যুগল হাঁড়িটাড়ি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে জানাল, স্নেহলতা মজিদ মিঞাদের খেয়ে যেতে বলেছেন।

মজিদ মিঞা হাসল, 'খাইয়া তো যামুই। আমার ঘেটিতে (ঘাড়ে) কয়টা মাথা যে এই বাড়িত্ আইসা ভাবীর হাতের ব্যান্নন (রান্না তরকারি) না খাইয়া যাই। যা যুগইলা হাকিমেরে কইয়া আয়, তেনার হুকুম অমাইন্য করার সাইধ্য আমার নাই।'

বোঝা গেল, এ বাড়িতে আরো অনেক বার এসেছে মজিদ মিঞা এবং যুগলকে খুব ভাল করেই চেনে। আরো টের পাওয়া গেল, এ-সংসারের সবার হৃদয়ের একেবারে মাঝখানটিতে তার আসন পাতা।

হঠাৎ অবনীমোহনের কি মনে পড়ে গেল। আস্তে করে হেমনাথকে ডাকলেন, 'মামাবাবু—'

হেমনাথ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, 'কী বলছ?'

'কি একটা দাঙ্গার মীমাংসা করে দিতে না গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা মিটেছে?'

হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'মজিদকে জিজ্ঞেস করে দেখ না—'

মজিদ মিঞা শুনছিল। জিজ্ঞেস করার আগেই বলে উঠল, 'নবু গাজীর লগে আমার চাইর বছ্রের কাইজা এক কথায় মীমাংসা কইরা দিছেন ঠাউর ভাই। এমুন মীমাংসা করছেন যে কুনোকালে আর কাইজা হইব না।'

অবনীমোহনের কৌতূহল শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। শুধোলেন, 'কি রকম?'

'আমার মাইয়ার লগে নবু গাজীর পোলার বিয়া ঠিক কইরা দিছেন ঠাউর ভাই। মাঘ মাসে ধান কাটার পর বিয়া হইব। নবু শালায় আমার মাইয়ার হউর (মেয়ের শ্বশুর) হইব। আপনেই ক'ন, তার

লগে চর লইয়া মারামারি আর মানায় ?' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'ঠাউর ভাই এমুন মীমাংসা কইরা দিলেন যে মুখ চিরটা কালের লেইগা বন্ধ, না হইলে শালারে কি ছাড়তাম ? সড়কি দিয়া এফোড়-ওফোড় কইরা ফালাইতাম।'

ভাবী বেয়াই সম্বন্ধে এ জাতীয় সদিচ্ছায় অবনীমোহনরা হেসে ফেললেন।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'হে যাউক, মাইয়ার বিয়ার সময় আপনেগো কিন্তুক যাইতে হইব। আপনেরা হইবেন মাইয়াপক্ষের কত্তা। নবু শালায় তো বরযাত্র আনব কতগুলা চউরা চাষা (চরের চাষা)। শালারে দেখাইয়া দিমু আমার আপনজনেরা কি দরের মানুষ আর তার জ্ঞাতগুষ্টিই বা কেমুন !'

অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'আপনার মেয়ের বিয়ে তো সেই মাঘ মাসে ধানকাটার পর। ততদিন আমরা এখানে থাকব না।'

'থাকবেন না ?' একটু নিরাশ হয়ে পড়ল মজিদ মিঞা। তারপর হাতের ভেতর মুশকিল আসানটা যেন পেয়ে গেছে এমন সুরে বলল, 'হেইতে কি, কইলকাতায় একটা টেলি কইরা দিমু, চইলা আইবেন। আইতেই হইব।'

অবনীমোহন আগেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, মজিদ মিঞার আন্তরিকতা তাঁর প্রাণে তরঙ্গ তুলে গেল। বলল, 'আসব, নিশ্চয়ই আসব। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি উৎসব লাগলে না এসে পারা যায় !'

কোল থেকে বিনুকে নামিয়ে অবনীমোহনের কাছে আরো নিবিড় হয়ে এল মজিদ মিঞা। একরকম তাঁকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগের সুরে বলল 'এই একখানা কথার নাখান (মত) কথা কইছেন—আত্মীয়স্বজন।'

আবেগটা এ ঘরের অন্য সবাইকেও স্পর্শ করেছিল। সমস্বরে সকলে সায় দিল, এ একটা কথার মতন কথা বটে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মজিদ মিঞা বলল, 'আমার একখান সাধ আছে।'

অবনীমোহন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

মজিদ মিঞা বলল, 'চরের দুই কানি জমি লইয়া নবু গাজীর লগে চাইর বচ্ছর আমার কাইজা। আপনেরাও আইলেন, আর আইজই কাইজাটা মিটা গেল। আমার সাধ আপনের লগে মিতা পাতাই।'

অবনীমোহন সবটা বুঝতে পারেন নি, অনুমানে ভর করে বললেন, 'বন্ধুত্ব করতে চাইছেন ?'

'হ।' করুণ মিনতিপূর্ণ চোখে এমনভাবে মজিদ মিঞা তাকাল যাতে মনে হয় অবনীমোহনের বন্ধুত্ব না পেলে তার জীবন নিষ্ফল হয়ে যাবে। অবনীমোহনের একটা 'হ্যাঁ-না'র ওপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

প্রৌঢ় মানুষটির শিশুর মতন আচরণ, সরলতা, বন্ধুত্বের জন্য কাঙালপনা সব একাকার হয়ে অবনীমোহনকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। বললেন, 'আপনি বন্ধু হতে চাইছেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

'মিতা হইবেন, তা হইলে কথা দিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'পাকা কথা কিন্তুক।'

'পাকা কথা বৈকি।' অবনীমোহন হাসতে হাসতে বললেন।

'এইর লেইগাই কিন্তুক কেতুগঞ্জ থিকা একখানি পথ এই রাইতে আইছি।'

শুধুমাত্র তাঁর বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষায় একটি মানুষ এত রাতে এতটা পথ চলে এসেছে, যতবার ভাবলেন ততবারই অবাক হয়ে গেলেন অবনীমোহন।

যাই হোক, তারপর শুরু হল গল্প। সুধার সঙ্গে, সুনীতির সঙ্গে, সুরমার সঙ্গে কত কথা যে বলতে লাগল মজিদ মিঞা। কথায় কথায় রাত ঘন হতে লাগল।

একসময় ভেতর থেকে স্নেহলতা খবর পাঠালেন, রান্না শেষ।

এই ঘরেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হল। হাসেম আলি, মজিদ মিঞা এবং মাঝি দুজনের জন্য আসন পাতা হয়েছে। হেমনাথ হঠাৎ বললেন, 'আমাকেও এখানে ওদের সঙ্গে দিয়ে দাও, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।'

অবনীমোহন বিস্মিত, চমৎকৃত। উনিশ শ' চল্লিশে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-বৈশ্য-হিন্দু- মুসলমান ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভাগে, অগণিত ছোট ছোট স্পর্শকাতর কুঠুরিতে বসুন্ধরা যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে তখন মজিদ মিঞা হাসেম আলির গা ঘেঁষে খেতে বসা দুঃসাহস বৈকি।

হেমনাথ বললেন, 'অবনীমোহনও বসে যাও না। মিতাই তো হলে মজিদের, একসঙ্গে বসে বন্ধুত্বতা পাকা করে নাও।'

ঘোরের ভেতর থেকে অবনীমোহন বললেন, 'বেশ তো—'

অতএব আরো তিনখানা আসন এল। হেমনাথ বসলেন, অবনীমোহন বসলেন, বিনুও বসল। মেয়েরা কেউ বসল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর মাঝ রাত্তিরে পুকুর পেরিয়ে ধানখেতের ওপর দিয়ে কেতুগঞ্জ চলে গেল মজিদ মিঞা।

বিকেলবেলা ভবতোষ গাঢ় বিষাদের ছায়া নিয়ে এসেছিলেন। মেঘের পর রৌদ্রঝলকের মতন মজিদ মিঞা এ বাড়িটাকে আবার আলোকিত করে গেছে।

ভোরবেলা, তখনও ভাল করে ঘুমটা ভাঙে নি—আধো তরল তন্দ্রার ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে আছে বিনু। সেই সময় স্তবপাঠের মতন একটানা সুরেলা আওয়াজ ভেসে এল।

কণ্ঠস্বর খুবই চেনা, কিন্তু কোথায় শুনেছে এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না বিনু। সুরটা খুব ভাল লাগছে; আস্তে আস্তে চোখ মেলল সে।

এখনও রোদ ওঠে নি। চারদিক আবছা আবছা অন্ধকার আলতোভাবে সব কিছুকে ছুঁয়ে আছে।

সময়টা দিনের কোন অংশ—ভোর না সন্ধে, ঠিক বুঝতে পারল না বিনু। পাশ ফিরতেই বড় একটা জানলা চোখে পড়ল। তার ভেতর দিয়ে উঠোন দেখতে পেল বিনু। উঠোন পেরিয়ে বাগান, বাগানের পর যা কিছু এই মুহূর্তে সব ঝাপসা, নিরবয়ব। উত্তর থেকে দক্ষিণ থেকে জোর বাতাস দিচ্ছে, উলটো পালটা হাওয়ায় বাগানের বড় বড় ঝুপসি গাছগুলো বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়াচ্ছে। আকাশে এ প্রান্তে সে প্রান্তে থোকা থোকা সাদা মেঘ রাজহাঁসের মতন ধীর মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে।

প্রথমটা বিনু বুঝেই উঠতে পারল না, সে এখন কোথায়। কলকাতায় যে বাড়িতে তারা থাকত তার পাশেই ছিল ঘিঞ্জি বস্তি। সেগুলোর মাথায় টালি আর খাপরার ছাউনি। সকালবেলা চোখ মেললেই বিনুরা দেখতে পেত, বস্তিগুলো নিশ্চল ঢেউয়ের মতন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে আছে। আর কানে আসত কদর্য চিৎকার। ভোর হতে না হতেই কুৎসিত কলহ শুরু হয়ে যেত, তার মেয়াদ মাঝরাত পর্যন্ত।

কিন্তু এখানে? স্তবপাঠের সেই মনোরম সুরেলা শব্দটা এখনও কানে আসছে। বিনুর মনে হল, এসব সত্যি না। কেউ যেন ঘুমঘোরে তাকে সুদূর মেঘময় আকাশের নিচে বাগান, গাছপালা, আবছা

অন্ধকার আর স্তব উচ্চারণের গম্ভীর মধুর সুরের ভেতর ফেন্সে গেছে।

চিরদিন মা-বাবার কাছে শোবার অভ্যাস বিনুর, হঠাৎ তার খেয়াল হল বিছানায় মা-ও নেই বাবাও নেই। ধড়মড় করে উঠে বসল বিনু, বসতেই চোখে পড়ে গেল। উঠোনের পুবদিকটা একেবারে খোলা, সেখানে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে স্তব পাঠ করছেন হেমনাথ। 'জবাকুসুম সঙ্কাশ', 'মহাদ্যুতিম্', 'দিবাকরম্' ইত্যাদি ইত্যাদি দু-চারটে শব্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

হেমনাথকে দেখামাত্র বিদ্যুৎচমকের মতন সব মনে পড়ে গেল। কাল তারা রাজদিয়া এসেছে। স্নেহলতা-শিবানী-যুগল-হিরণ-মজিদ মিঞা—পর পর অনেকগুলো মুখ ছবির মতন চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। আর মনে পড়ল ঝিনুককে। দুঃখী মেয়েটার জন্য এক মুহূর্ত মনটা ভারি হয়ে রইল। এক মুহূর্তই। নদীর জলে উড়ন্ত পাখির ছায়ার মতন ঝিনুকের মুখ মনে এসেই মিলিয়ে গেল।

আরো একটা কথা মনে পড়ল বিনুর। কাল রাত্রিতে সে দাদুর কাছে শুয়েছিল। যাই হোক, এখন কী করবে ভেবে উঠতে পারল না। একবার ইচ্ছে হল, দাদুর কাছে যায়। পরক্ষণেই মনে হল, এ সময় তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

শরতের এই ভোরে হাওয়া বেশ ঠান্ডা, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। পায়ের দিকে পাট-করা একটা পাতলা চাদর ছিল, সেটা তুলে এনে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে বসে রইল বিনু।

একটু পর স্তবপাঠ শেষ হল। পুবদিকে তাকিয়ে আসন্ন সূর্যোদয়ের উদ্দেশে প্রণাম করে ফিরে এলেন হেমনাথ। বিনুকে বসে থাকতে দেখে ভারি খুশি। উচ্ছ্বসিত সুরে বললেন, 'দাদাভাই উঠে পড়েছ?'

বিনু মাথা নাড়ল।

'তুমি তো বেশ তাড়াতাড়ি ওঠো।'

এত ভোরে অবশ্য কোনোদিনই ওঠে না বিনু। যেহেতু তাড়াতাড়ি ওঠাটা রীতিমত গৌরবের ব্যাপার, আর হেমনাথ যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন তখন এটা মেনে নেওয়া ভাল। কাজেই বিনু এবারও মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'তুমি গানের মতন করে কী বলছিলে?'

'সূর্যস্তব করছিলাম।'

'ভারি সুন্দর তো।'

সাগ্রহে হেমনাথ বললেন, 'তুমি শিখবে?'

বিনু বলল, 'শিখব।'

'কাল থেকে এই রকম ভোরে উঠো, দু'জনে উঠোনের ঐ কোণটায় গিয়ে দাঁড়াব। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বলে যাবে। দু'দিনেই শিখে ফেলতে পারবে।'

'আচ্ছা—' বলেই যেন জিভে কামড় খেল বিনু। আজকের মতন এক-আধ দিন নয়, কাল থেকে আবার রোজ নিয়মিত ভোরবেলায় উঠতে হবে। ঝোঁকের মাথায় রাজি হয়ে কী বিপদেই না পড়া গেল!

হেমনাথ এবার বললেন, 'যাও দাদা, মুখ-টুখ ধুয়ে নাও।'

চাদর গায়ে বেরিয়ে এল বিনু। এর মধ্যে আলো ফুটে গেছে, ধানখেত আর বনানীর ওপারে দূর দিগন্তে সূর্যের ঝিকিমিকি টোপরটি আস্তে আস্তে দেখা দিতে শুরু করেছে।

বাইরে এসে বিনু দেখতে পেল সবাই উঠে পড়েছে—সুধা, সুনীতি, অবনীমোহন, সুরমা, শিবানী, স্নেহলতা, সব্বাই। স্নেহলতা তো এর ভেতর স্নানই চুকিয়ে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে আবার দাদুর কাছে ফিরে এল বিনু।

কাল স্টিমারঘাট থেকে বাড়ি আসতে যা একটু সঙ্গ পেয়েছে বিনু, তারপর সারাটা দিন তো কেতুগঞ্জেই কাটিয়ে এলেন হেমনাথ। রাত্রিবেলা যখন ফিরলেন তখন মজিদ মিঞারা সঙ্গে রয়েছে। খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজবের পর অবশ্য হেমনাথকে একেবারে একলা পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তখন অনেক রাত আর বিনুর চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছিল।

বিনুর খুব ইচ্ছা, এই সকালবেলা দাদুর সঙ্গে বসে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে কিন্তু সে সুযোগ মিলল না। তার আগেই রান্নাঘরে ডাক পড়ল।

রান্নাঘরটা প্রকাণ্ড, রাঁধাবাড়া ছাড়াও অনায়াসে পনের-কুড়ি জন লোক বসে খেতে পারে। সারি সারি পিঁড়ি পাতা ছিল, হেমনাথের সঙ্গে এ ঘরে এসে বিনু দেখতে পেল ইতিমধ্যে অন্য সবাই এসে গেছে। তারা বসে পড়তেই স্নেহলতা আর শিবানী খেতে দিতে শুরু করলেন।

কাল রাত্তিরে প্রচুর মিষ্টি এনেছিল মজিদ মিঞারা। সকালে স্টিমারঘাটা থেকে হেমনাথ যে রসগোল্লা আর কলা এনেছিলেন তার অনেকটাই থেকে গেছে। তাছাড়া স্নেহলতা গাওয়া ঘিয়ের লুচি, তরকারি আর হালুয়া করেছিলেন।

খেতে খেতে হেমনাথ বললেন, 'মজিদ মিঞাকে কাল কিরকম দেখলে অবনী?'

অবনীমোহন বললেন, 'চমৎকার। এমন সরল ভাল মানুষ জীবনে আর কখনও দেখি নি। শুধু আমাদের দেখবার জন্য রাত্তিরে কেউ এতখানি পথ আসতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে কোনোদিন বিশ্বাস করতাম না।'

গভীর আবেগের সুরে হেমনাথ বললেন, 'এখানকার প্রায় সব মানুষই ঐ রকম। সরল, ভাল—কিন্তু খেপে গেলে রক্ষে নেই।'

অবনীমোহন হাসলেন।

খানিক চুপ করে থেকে হেমনাথ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'কাল সারা দিন কেতুগঞ্জেই কেটে গেছে, তোমাদের সঙ্গে বসে দুটো কথা বলতে পারি নি। আজ আমি ফ্রী—একেবারে মুক্ত। চল—'

স্নেহলতা নাক কুঁচকে কেমন করে যেন বললেন, 'তুমি মুক্ত! তবেই হয়েছে। দেখ, আবার কোন হাঙ্গামা এসে জোটে!'

'যাই জুটুক, আমি কোনো দিকে তাকাচ্ছি না। আজকের দিনটা নাতি-নাতনী-মেয়ে-জামাই নিয়ে হই হই করে কাটাব।'

'ভালই তো।'

হেমনাথ এবার অবনীমোহনকে বললেন, 'কাল সমস্ত দিন তো ঘরে বসেছিলে। খাওয়া-দাওয়া হলে চল একটু ঘুরে আসি, আমাদের রাজদিয়াটা তোমাদের দেখিয়ে আনি।'

সাগ্রহে অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

হেমনাথ কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। হঠাৎ তাঁর কি মনে পড়ে গেছে। বেশ ব্যস্তভাবেই বললেন, 'হই-হট্টগোলের ভেতর খেয়াল ছিল না, ঝিনুক কোথায়?'

স্নেহলতা বললেন, 'ওর বাবা কাল নিয়ে গেছে।'

'ভবতোষ ঢাকা থেকে ফিরেছে তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'বৌমাকে রেখেই এল?'

'হ্যাঁ।' স্নেহলতা বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়লেন। ভবতোষ কাল যা-যা বলে গিয়েছিলেন, সব বললেন।

বিষাদময় সুরে হেমনাথ বললেন, 'নিজেরা খাওয়া-খাওয়ি করে মরছে, মাঝখান থেকে ঝিনুকটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল।'

কেউ আর কিছু বলল না, বিচিত্র কষ্টদায়ক নীরবতার মধ্যে সকলের খাওয়া শেষ হল। ঝিনুকের প্রসঙ্গ এলেই এ বাড়িতে ঘন হয়ে বিষাদের ছায়া নামে।

খাওয়ার পর হেমনাথ বললেন, 'চল অবনী, এবার বেরিয়ে পড়া যাক। তোরা কে কে যাবি? বিনুদাদা নিশ্চয়ই যাবে। সুধাদিদি সুনীতিদিদি যাবি তো?'

সুধা সুনীতি দু'জনেই ঘাড় কাত করল, অর্থাৎ যাবে।

'রমুর গিয়ে দরকার নেই. অনেকখানি হাঁটতে হবে। দুর্বল শরীরে অত হাঁটাহাঁটি করলে খারাপ হবে। এক কাজ করলে হতো, ভবতোষ কি লালমোহনের ফিটনখানা আগে থেকে চেয়ে রাখলে পারতাম। কাল চাইবার সময়ও পেলাম না। সে যাক গে, পরে গাড়ি ঠিক করে রমুকে ঘুরিয়ে আনব।'

একসময় হেমনাথরা বেরিয়ে পড়লেন। উঠোন-বাগান পেরিয়ে শহরগামী সেই পথটায় আসতেই মনে হল, আশ্বিনের এই চমৎকার উজ্জ্বল সকালটা সামনের দিকে অবিরত হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে। এই পথটা ছাড়া রাজদিয়ার আর কিছুই মাথা তুলে নেই, সব জলের তলায় হারিয়ে গেছে।

দু'ধারে কালকের সেই পরিচিত দৃশ্য। মাছরাঙা, বাঁশের সাঁকো, নিস্তরঙ্গ জল, মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন বাড়িঘর, গলানো গিনির মতন রোদ। কথা বলতে বলতে সেই কাঠের পুলটাও পেরিয়ে এল সবাই।

পথ নির্জন নয়, লোক চলাচলে বেশ সবগবমই বলা যায়। যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে ডেকে ডেকে হেমনাথের সঙ্গে কথা বলছে। বিনুরা যে এসেছে, সে খবর রাজদিয়ার আর কারো পেতে বোধ হয় বাকি নেই। বিনুরা কত দিন থাকবে, এতকাল কেন আসে নি, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন করছে তারা। হেমনাথ উত্তর দিচ্ছেন, অবনীমোহনের সঙ্গে আলাপ-টালাপও করিয়ে দিচ্ছেন।

নানা মানুষের কৌতূহল মেটাতে মেটাতে, নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে সবাইকে নিয়ে হেমনাথ যখন স্টিমারঘাটের কাছাকাছি পৌঁছলেন পুব আকাশের ঢাল বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। হোগলা-ছাওয়া সেই মিষ্টির দোকানগুলো থেকে ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল, 'আসেন বড় কত্তা, ভাল মিঠাই আছে। মাইয়া-জামাই-নাতি-নাতনীগো লেইগা লইয়া যান।'

মৃদু হেসে হেমনাথ জানালেন, আজ মিষ্টির দরকার নেই।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে বিনু, বাড়ি থেকে স্টিমারঘাট আসতে যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে সবাই হেমনাথকে 'বড় কত্তা' বলেছে।

অবনীমোহন হাসতে হাসতে বললেন, 'আমরা এসেছি, একথা দেখছি সবাই জানে। দোকানদারদের কাছেও খবরটা পৌঁছে গেছে।'

হেমনাথ হাসলেন, 'এখানকার মানুষ আমাকে খুব ভালবাসে, স্নেহ করে। আমার সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত খবর ওদের জানা।'

হেমনাথের বাড়ি থেকে স্টিমারঘাট পর্যন্ত রাস্তাটা চেনা। পথটা ওখানেই শেষ না, স্টিমারঘাট ছুঁয়ে সেটা অর্ধবৃত্তের আকারে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে নিরুদ্দেশ হয়েছে। হেমনাথ বিনুদের নিয়ে সেদিকে চললেন।

ঘাড় ফিরিয়ে বিনু একবার দেখে নিল, কালকের সেই স্টিমারটা নেই। জেটির বাঁধন ছিঁড়ে কখন কোথায় পাড়ি জমিয়েছে কে জানে। খুব সম্ভব কলকাতায় চলে গেছে। তবে কালকের সেই শঙ্খচিলগুলো চোখে পড়ল, আকাশময় তারা চক্কর দিয়ে চলেছে।

স্টিমারঘাটের পর নৌকোঘাটটা কালই চোখে পড়েছিল। তারপর একটা বরফ-কল আর সারি সারি মাছের আড়ত। হেমনাথ জানালেন, এখান থেকে কাঠের পেটিতে পরল পরল বরফের ভেতর শুয়ে রোজ শত শত মণ মাছ কলকাতায় চালান যায়। আড়তগুলোর ঠিক তলাতেই নদী, বিনুরা দেখতে পেল অসংখ্য জেলে নৌকো আসছেই, আসছেই। এখানকার বাতাস আঁশটে ভারি আর নিশ্চল হয়ে আছে।

আড়তগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেমনাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'তাজা ইলিশ আছে?'

তক্ষুণি সাড়া পাওয়া গেল, 'আছে বড় কত্তা।'

'দর কী?'

'দরের লেইগা আটকাইব না, কয়টা লাগব ক'ন।'

'দাম না বললে নেব না।'

'সব থিকা সেরাটা ট্যাকায় ছয়টা।'

'তিনটে রাখিস, যাবার সময় নিয়ে যাব।'

'আইচ্ছা।'

কাল রসগোল্লার দাম শুনে অবাক হয়েছিলেন অবনীমোহন, আজও হলেন মাছের দর শুনে। তাঁর বিস্ময়-মাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এ হল জলের দেশ, মাছ এখানে শস্তা তো হবেই। কলকাতায় চালান না গেলে টাকায় একশ'টা করে ইলিশ বিক্রি হতো।'

আড়ত পেরিয়ে আসতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। হেমনাথের বাড়ির দিকে রাস্তাটা খানিক খোয়ায় ঢাকা, বাকিটা কৌলীন্য হারিয়ে সোজা মাটিতে নেমে গেছে। এদিকটা কিন্তু লাল সুরকিতে ছাওয়া। তার একদিকে নদী, আরেক ধারে সারিবদ্ধ ঝাউগাছ। রাস্তাটা চলেছে তো চলেইছে।

সুধা বলল, 'কি চমৎকার জায়গা, আমরা কিন্তু এখানে রোজ বিকেলে বেড়াতে আসব দাদু—'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ তো।'

ঝাউগাছ যেদিকে, সেদিকটাও মনোরম। বর্ষার জলে প্রায় সবটাই ডুবে আছে। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো পাকা বাড়ি চোখে পড়ল। শুধু তা-ই নয়—এস-ডি-ওর বাংলো, দেওয়ানি আর ফৌজদারি আদালত, আর-এস-এন কোম্পানির অফিস, রেজিস্ট্রেশন অফিস, ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিস, মেয়েদের একটা হাইস্কুল, ছেলেদের দুটো, এমন কি ডিগ্রি কলেজও রাজদিয়ার এই প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। ওদিকের তুলনায় এদিকটা অনেক বেশি উজ্জ্বল, জমজমাট। জীবনের চেহারা এখানে অনেকখানি নিবিড়, ঘনবদ্ধ।

ওদিকটার মতন এখানেও হেমনাথ 'বড় কত্তা।' কারো সঙ্গে দেখা হলেই বিনুদের সম্বন্ধে সেই এক প্রশ্ন, হেমনাথের সেই এক উত্তর। সকলের কৌতূহল মেটাতে মেটাতে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

অবনীমোহন বললেন, 'ওধারের তুলনায় এধারে লোকজন বোধহয় বেশি।'

'তা একটু বেশি।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তবে এখন যতটা দেখছ এতটা কিন্তু বছরের অন্য সময় থাকে না।'

দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন অবনীমোহন।

হেমনাথ এবার বুঝিয়ে বললেন। সমস্ত বছর রাজদিয়ায় বেশির ভাগ বাড়ি প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। দু' চারটে বুড়ো-বুড়ি আর জীবন থেকে বাতিল কিছু অথর্ব মানুষের মুখ তখন দেখা যায়। কেননা বাড়ির সক্ষম সাবালক ছেলেরা সেসময় এখানে থাকে না, চাকরি-বাকরি বা অন্য কোনো জীবিকার টানে তাদের কেউ তখন আসামে, কেউ ঢাকায়, কেউ কেউ হিল্লি-দিল্লিতেও। তবে সব চাইতে বেশি যেখানে তার নাম কলকাতা।

ছেলেরা বিদেশে চাকরি করবে, মেস কি হোটেলের ঝাল-মসলাওলা অখাদ্য খেয়ে অকালে পাকস্থলীটির স্বত্ব আমাশা কি অম্লশূলের হাতে তুলে দেবে, তা তো আর হয় না। কাজেই বাপ-মা ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌমাটিকে সঙ্গে পাঠিয়ে দেন, ঘরের রান্না খেয়ে পেটটা অন্তত বাঁচুক, নাতি-নাতনী হলে তাদের কাছেই থাকে। বাপ-মা অবশ্য ছেলেদের কাজের জায়গায় গিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁরা গেলে দেশের বাড়িঘর জমিজমা বাগান-পুকুর দেখবে কে? যখের মতন পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আগলে থাকবে কে?

সারা বছর রাজদিয়ায় ঝিম তালের সুর লেগে থাকে। জীবন তখন মন্থর, ঘুমন্ত, নিষ্প্রভ। তিরতিরে স্রোতের মতো তাতে বেগ হয়তো থাকে কিন্তু টের পাওয়া যায় না। তারপর আশ্বিন মাসটি যেই পড়ল, আকাশে বাতাসে ছুটির সানাইও বাজল, নদীর ধারে কাশফুলের বন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল আর রোদের রংটি হয়ে গেল গলানো সোনার মতন। সেই সময় রাজদিয়ার গায়ে সোনার কাঠির ছোঁয়া

লেগে যায়। জলোচ্ছ্বাসের প্রবল তলের মতো দূরদূরান্ত থেকে দুর্বার আকর্ষণে ছেলেরা ফিরে আসে। পূর্ববাংলার এই তুচ্ছ নগণ্য শহরটা সারা বছর প্রবাসী সন্তানগুলির জন্য যেন উন্মুখ হয়ে থাকে, তাদের ফিরে পেয়ে খুশি আর ধরে না। রাজদিয়া জুড়ে তখন প্রমত্ত উৎসব শুরু হয়ে যায়। তারপর পূজো যেই শেষ হল, ছুটির মেয়াদ ফুরলো—ধীরে ধীরে রাজদিয়াকে অপার শূন্যতার ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে একে একে সবাই গিয়ে স্টিমারে ওঠে। ওরা যেন মানস সরোবরের বুনো হাঁস। শরতে আসে, শরৎ ফুরোলেই নিরুদ্দেশ।

রাজদিয়ার মোটামুটি একটা রূপরেখা পাওয়া গেল। হেমনাথ আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, বিনু আস্তে করে ডাকল, 'দাদু—'

হেমনাথ ফিরে তাকালেন, 'কী বলছ দাদাভাই—'

বলবে কি বলবে না, খানিক ভেবে নিল বিনু। তারপর দ্বিধান্বিত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'ঝিনুকদের বাড়ি কোথায় ?'

'খানিকটা দূরে, ঐ ওদিকে—' সামনে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন হেমনাথ।

বিনু চুপ করে রইল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ দাদাভাই। কাছাকাছি যখন এসেই পড়েছি, চল ওদের একটু খোঁজ নিয়ে যাই।'

বিনুর খুব ইচ্ছা হচ্ছিল ঝিনুকদের বাড়ি যায়। ঝিনুক মাছের ভাগ নিয়ে, রসগোল্লার ভাগ নিয়ে, দাদু-দিদার আদরের ভাগ নিয়ে তার সঙ্গে হিংসা করেছিল—সে কথা মনে করে রাখে নি বিনু। তার যা মনে পড়ছিল সেটা হল ঝিনুকের দুঃখ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝিনুকদের বাড়ি যাওয়া হল না। কয়েক পা যাবার পর হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'হেমদাদা—হেমদাদা—'

হেমনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেখাদেখি বিনুরাও থামল।

একটু দূরে ঝাউপাতার ফাঁকে হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। সামনের দিকে চমৎকার ফুলের বাগান, বাঁশের বেড়া দিয়ে বাগানখানি ঘেরা। যাতায়াতের জন্য কাঠের ছোট একটি গেট রয়েছে।

গেটের কাছে হেমনাথের সমবয়সী কি দু-চার বছরের ছোট একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। হেমনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি হাতছানি দিলেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন হেমনাথ, বিনুও সঙ্গে সঙ্গে গেল। অবনীমোহনেরা অবশ্য দাঁড়িয়েই রইলেন।

কাছে আসতেই উচ্ছ্বসিত খুশি গলায় বৃদ্ধ বললেন, 'শিশিররা এসেছে।'

বৃদ্ধের উচ্ছ্বাস এবং আনন্দ হেমনাথের স্বরেও যেন উছলে পড়ল। বললেন, 'তাই নাকি ? কবে ?'

'পরশুর স্টিমারে।'

'কেমন আছে সব ?'

'ভাল।' বলতে বলতে সচেতন হলেন যেন বৃদ্ধ। বিনুর দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'এটি কে হেমদাদা ?'

হেমনাথ বললেন, 'নাতি।'

'নাতি !' বৃদ্ধ একটু যেন অবাকই হলেন।

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ভাগনীর ছেলে।' অবনীমোহনদের দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে জামাই আর দুই নাতনী।'

বৃদ্ধ এবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'ওদের ডাকো হেমদাদা। তুমি ডাকবে কেন, আমিই ডেকে আনছি।' তিনি পা বাড়িয়ে দিলেন।

হেমনাথ বললেন, 'এখন থাক রামকেশব—'

বৃদ্ধের নাম তা হলে রামকেশব। তিনি বললেন, 'তাই কখনও হয়, নাতি-নাতনী-জামাই নিয়ে ঘরের দরজা পর্যন্ত আসবে, ভেতরে ঢুকবে না—প্রাণ থাকতে আমি তা হতে দেব না।'

রামকেশব ছুটে গিয়ে অবনীমোহনদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তারপর সাদরে সবাইকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে রামকেশব হইচই বাধিয়ে দিলেন, 'কই গো, কোথায় গেলে সব—শিশির, বৌমা—দেখ দেখ কাদের নিয়ে এসেছি।'

একজন সধবা প্রৌঢ়া—কপালে ডগডগে সিঁদুরের টিপ, পিঠময় কাঁচাপাকা চুলের স্তূপ, পরনে খয়েরি-পাড় শাড়ি, স্নেহলতার সমবয়সীই হবেন—ডান পাশের একখানা ঘর থেকে বেরিয়ে রামকেশবের সঙ্গে নতুন মানুষ দেখে খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

রামকেশব বললেন, 'হেমদাদার ভাগনী-জামাই আর নাতি-নাতনী—'

তাড়াতাড়ি কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে সস্নেহে মৃদু স্বরে ডাকলেন, 'এস দাদা-দিদিরা—'

রামকেশব শুধোলে, 'শিশির, বৌমা—ওরা সব কোথায় ?'

'দক্ষিণের ঘরে।'

একটু ভেবে রামকেশব বললেন, 'আমরা বরং দক্ষিণের ঘরেই যাই। তুমি এদের জন্যে—' বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন।

ইঙ্গিতটা বুঝেছিলেন মহিলা। মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'তোমাকে আর বলতে হবে না।'

'বেশ।'

রামকেশবের সঙ্গে দক্ষিণের ঘরে এসে দেখা গেল, একটি সাতাশ-আটাশ বছরের সুপুরুষ তরুণকে ঘিরে আসর বসেছে। লোকজন বেশি না, আধ-প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক, বছর দশেকের একটি মেয়ে, সতের-আঠার বছরের একটি তরুণী আর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের মহিলা—সব মিলিয়ে পাঁচজন। মহিলা, তরুণী এবং ছোট মেয়েটি এমন সাজগোজ আর প্রসাধন করে বসে আছে যা চোখে বেঁধে। তাদের জামাকাপড় থেকে সেন্টের গন্ধ চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তরুণটি হাত-পা-মাথা নেড়ে রোমঞ্চকর কিছু বলছে আর মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই শুনছে। রামকেশবরা ঘরে ঢুকতেই গল্প থেমে গেল।

আধা প্রৌঢ় সেই ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি উঠে এসে হেমনাথকে প্রণাম করলেন।

হেমনাথ বললেন, 'কেমন আছিস শিশির ?'

'ভাল।' শিশির বললেন, 'আপনি ভাল আছেন তো ? জ্যাঠাইমা কেমন আছেন ?'

'আমরা গাঁইয়া মানুষ, কখনও খারাপ থাকি না। তোমরা শহরের লোক, পিপল্ অফ দি মেট্রোপলিস, তোমাদের আজ পেট ভুটভাট, কাল কান কটকট, পরশু বুক ধড়ফড়। আমাদের ওসব বালাই নেই। সে যাক, রামকেশবের কাছে শুনলাম পরশু তোরা এসেছিস। কাল সারাটা দিন গেছে মাঝখানে, একবার আমাদের ওখানে যেতে পার নি ?'

অপরাধীর মতন করে শিশির বললেন, 'আজ যাব ভেবেছিলাম।'

শিশিরের পর সেই মহিলাটি এসে প্রণাম করলেন। হেমনাথ বললেন, 'বেঁচে থাকো স্মৃতিরেখা। বলতে নেই, তোমার স্বাস্থ্য গেল বারের চাইতে অনেক ভাল হয়েছে। শিশিরটা তো চিরকালের খ্যাপা বাউল, সংসারের কোনোদিকে ওর খেয়াল নেই। যাক, তোমার দিকে ও এবার নজর দিয়েছে দেখছি।'

জানা গেল মহিলার নাম স্মৃতিরেখা এবং তিনি শিশিরের স্ত্রী।

স্মৃতিরেখার পর সেই ছোট মেয়েটা আর সতের আঠার বছরের তরুণীটি এসে প্রণাম করল। দু'জনকে পায়ের কাছ থেকে তুলে হেমনাথ বললেন, 'আমার রুমাদিদি ঝুমাদিদি না ?'

রুমা ঝুমা দু'জনেই মাথা নাড়ল। বোঝা যাচ্ছে এ বাড়ির সবাইকেই চেনেন হেমনাথ। বললেন,

'তোমরা দু'জন।' সুধা-সুনীতিকে দেখিয়ে বললেন, 'আর ওরা দু'জন। এত বেগম নিয়ে কী যে করি! ভাবছি বাদশাদের মতন একটা হারেম খুলব।'

সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগল।

আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন হেমনাথ, হঠাৎ তার নজর গিয়ে পড়ল সেই যুবকটির ওপর। বললেন, 'একে তো চিনতে পারলাম না রামকেশব।'

রামকেশব বললেন, 'ও আনন্দ—শিশিরের শালা। কলকাতাতেই থাকে। এ বছর ল' পাস করেছে। চাকরি-বাকরি বা প্র্যাকটিশ এখনও কিছুই শুরু করে নি, হাতে প্রচুর সময়। তাই বৌমার সঙ্গে পুজোয় বেড়াতে এসেছে।'

হেমনাথ বললেন, 'খুব ভাল।'

এই সময় আনন্দ উঠে এসে হেমনাথকে প্রণাম করল। রামকেশব আনন্দের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ইনি শ্রীহেমনাথ মিত্র, গোটা রাজদিয়ার অভিভাবক বলতে পার।'

আনন্দ চুপ করে থাকল।

রামকেশব এবার হেমনাথকে বললেন, 'জানো হেমদাদা, আমাদের আনন্দ বাবাজীর খুব শিকারের শখ। অনেক বাঘ-টাঘ মেরেছে।'

'তাই নাকি?'

বিনু এর আগে শিকারী দেখে নি, চোখ বড় করে আনন্দের দিকে তাকিয়ে রইল। লক্ষ করল, সুনীতিও অবাক বিস্ময়ে আনন্দকে দেখছে। সুধা ওদিকটায় অবনীমোহনের আড়ালে বসে ছিল, সে আনন্দকে দেখছে কিনা বুঝতে পারা গেল না।

হেমনাথ এবার অবনীমোহনদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আলাপ-পরিচয় হলে বললেন, 'অনেক বেলা হল, এবার আমরা উঠি।'

রামকেশব বললেন, 'তাই কখনও হয়! জামাই নিয়ে প্রথম দিন এলে, একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়তে পারি? শিশিরের মা তা হলে আমার গর্দান নিয়ে নেবে।'

'তবে আর কি করা, বসেই যাই।'

একটু নীরবতা। তারপর স্মৃতিরেখার চোখে চোখ রেখে হেমনাথ বললেন, 'আমরা এসে তোমাদের জমাটি আসরটি নষ্ট করে দিলাম।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'ও মা, সে কি কথা!'

হেমনাথ বললেন, 'আনন্দ হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছিল, তোমরা খুব মন দিয়ে শুনছিলে। আমরা আসতেই বেচারি থেমে গেল। কী বলছিল আনন্দ?'

সতের আঠার বছরের সেই তরুণীটি, যার নাম রুমা, বলল, 'মামা সেবার সুন্দরবনে বাঘ মারতে গিয়েছিল—তার গল্প করছিল।'

হেমনাথ উৎসাহিত হলেন, আনন্দকে বললেন, 'আপত্তি না থাকে, আরেক বার বল না। আমরাও একটু শুনি।'

সলজ্জ হেসে আনন্দ বলল, 'আপনাদের কি ভাল লাগবে?'

'লাগবে, নিশ্চয়ই লাগবে। আমাদের খুব বেরসিক ভাবছ নাকি?'

বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর গল্প আরম্ভ হল।

বিনু চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে লক্ষ করতে লাগল, সুনীতিও অপার বিস্ময় নিয়ে আগের মতন তাকিয়ে আছে।

গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ বিনুর মনে হল, কে যেন ফিসফিস করে ডাকছে, 'এই—এই—'

চোখ ফিরিয়ে বিনু দেখতে পেল, সেই ছোট মেয়েটা—যার নাম ঝুমা। গায়ের রংখানি কালো।

নাক-মুখ-চোখ সেই ক্ষতিটুকু ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা পূরণ করে দিয়েছে, এমন নিখুঁত ধারাল গড়ন কদাচিৎ দেখা যায়। গায়ের হলুদ রঙের ফ্রকটা, মাথার গোলাপি রিবনটা কিংবা চোখে কাজলের টানটা ভারি চমৎকার মানিয়েছে।

বিনুর ধ্যানজ্ঞান এখন বাঘ শিকারের দিকে। অন্যমনস্কের মতন বলল, 'কী বলছ?'

'তুমি লুডো খেলতে পার?'

'পারি।'

'ক্যারম?'

তাচ্ছিল্যের সুরে বিনু বলল, 'নিশ্চয়ই।

ঝুমা বলল, 'এয়ার গান চালিয়ে পাখি মারতে পার?'

এবার একটু থতিয়ে যেতে হল।

ঝুমা বলল, 'তুমি পার না, আমি কিন্তু পারি।'

যার মামা বাঘ মারতে পারে সে পাখি মারবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। থতিয়ে যাওয়া ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে নিয়ে বিনু বলল, 'চেষ্টা করলে আমিও পারব।'

'তা তো জানিই।' এমনভাবে ঝুমা বলল, যেন বিনুর কোনো কথা জানতে তার বাকি নেই। এইমাত্র যে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সে কথা কে বলবে।

বিনু এবার কিছু বলল না।

ঝুমা আবার বলল, 'আমার একটা ক্যামেরা আছে, জানো। খুব ভাল ছবি ওঠে।'

বিনুর কেন জানি এবার মনে হল, ঝুমাকে আর অবহেলা করা যায় না। আধখানা মন বাঘ শিকারের দিকে রেখে বাকি আধখানা মন দিয়ে ঝুমার কথা শুনছিল সে। এবার পুরোপুরি মনোযোগটা এদিকে সঁপে দিতে হল।

ঝুমা বলল, 'আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'ও ঘরে।' পাশের ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল ঝুমা।

'সেখানে কী?'

'লুডো, ক্যারম, এয়ার গান, ক্যামেরা—সব আছে।'

বাঘ শিকারের কাহিনী যত চমকপ্রদই হোক, বিনুকে ধরে রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। ঝুমার সঙ্গে সে পাশের ঘরেই চলে যেত, কিন্তু বাধা পড়ল। সেই বর্ষীয়সী সধবা মহিলাটি খাবারের থালা সাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অগত্যা রসগোল্লা-সন্দেশেই মনোনিবেশ করতে হল।

খাওয়া হলে হেমনাথরা উঠে পড়লেন।

ঝুমা ফিসফিসিয়ে বলল, 'ক্যারম-ট্যারম-খেলা হল না। আমার এয়ার গান আর ক্যামেরাটা তোমায় দেখাতে পারলাম না। আরেক দিন আসবে কিন্তু—'

ঝুমার দুর্লভ সম্পত্তিগুলো দেখা হল না বলে মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিরস গলায় বিনু বলল, 'আচ্ছা।'

রামকেশবরা হেমনাথকে বলল, 'আবার ওদের নিয়ে এস হেমদাদা, ভাগনীকেও এনো।'

'আচ্ছা।' হেমনাথ বললেন, 'তোরাও যাস, সবাইকে নিয়ে যাবি।'

আবার রাস্তা।

হেমনাথ এবং অবনীমোহন আগে আগে হাঁটছিলেন। সুধা-সুনীতি আর বিনু একটু দূরে পড়ে গিয়েছিল। চলতে চলতে সুনীতি বলল, 'আনন্দবাবু চমৎকার গল্প বলতে পারেন।'

চোখ ঠোঁট কুঁচকে কেমন করে যেন হাসল সুধা, 'হুঁ।'

'আমার মনে হচ্ছিল, সত্যি সত্যি সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ দেখছি।'

'তাই নাকি!'

'কেন তোর মনে হয় নি?'

'আমি তো গল্প শুনছিলাম না, তোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।'

'আমার দিকে তাকিয়ে ছিলি!' সুনীতি অবাক।

'হ্যাঁ।' মাথাটা একেবারে ঘাড় পর্যন্ত হেলিয়ে দিল সুধা। ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'তুই কী করছিলি জানিস দিদি?'

ভয়ে ভয়ে সুনীতি শুধলো, 'কী করছিলাম?'

গলার স্বর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুধা বলল, 'একেবারে মুগ্ধ, মুগ্ধ হয়ে—'

বিব্রত বিপন্ন সুনীতি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তোকে আর ইয়ার্কি দিতে হবে না ফাজিল মেয়ে—'

হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'বড় কত্তা, বড় কত্তা—'

বড় কর্তা নিশ্চয়ই হেমনাথ। সবাই চকিত হয়ে উঠল।
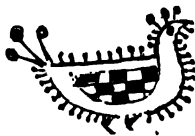
অবনীমোহনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আগে আগে হাঁটছিলেন হেমনাথ, ডাকটা কানে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর এদিক-সেদিক তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ে গেল। বিনুরাও দেখতে পেল।

সামনের দিক থেকে একটা লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতে টের পাওয়া গেল, তার বয়েস অনেকদিন আগেই পঞ্চাশ পেরিয়েছে, এখন ষাট ছুঁই-ছুঁই। বেশির ভাগ চুলই রুপোর তার। অবশ্য কাঁচা চুলেরা একেবারে দখল ছাড়েনি, এখানে ওখানে ছড়িয়ে থেকে যতখানি পেরেছে যৌবনের পতাকা তুলে রাখতে চেষ্টা করেছে। মুখখানা পরিষ্কার কামানো। পরনে বাড়িতে-কাচা হাফহাতা পাঞ্জাবি, ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। তুলনায় ধুতিটা অস্বাভাবিক খাটো, খালি পা। গলায় তিন লহর তুলসীর মালা।

একখানি বয়েস হয়েছে কিন্তু শরীর মেদশূন্য, স্বাস্থ্যের ভিত বেশ মজবুত। মাঝারি মাপের শক্ত সবল এই মানুটিকে ঘিরে কোথায় যেন খানিকটা দৃঢ়তা ফুটে আছে।

হেমনাথ বললেন, 'আরে অধর যে। কেমন আছ?'

লোকটা অর্থাৎ অধর বলল, 'ভালই। আপনের শরীলগতিক?'

'ঐ একরকম চলছে।' হেমনাথ হাসলেন, 'তারপর এই দুপুরবেলা সেজেগুজে গিয়েছিলে কোথায়?'

বিনুর হাসি পেল। পরেছে তো একটা বেঢপ পাঞ্জাবি আর খাটো ধুতি, তাতে আবার পায়ে জুতো নেই। একে নাকি সাজা বলে!

অধর বলল, 'আপনের বাড়ি গেছিলাম। গিয়া শুনলাম, আমাগো এইদিকে আইছেন। বৌ-ঠাইরেন বইতে কইছিল, আমি আর বসি নাই। দৌড়াইতে দৌড়াইতে ফিরা আইছি, যদি আপনেরে এইখানে ধরতে পারি। তা পারছি।'

'আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে কেন?'

'বড় দরকার—' বলতে বলতে বিনুদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অধর শুধলো, 'এয়ারা? এগো তো আগে দেখি নাই।'

হেমনাথ আলাপ করিয়ে দিলেন। অধরের পরিচয়টাও এবার পাওয়া গেল। পুরো নাম অধর সাহা। রাজদিয়া থেকে কয়েক মাইল উজানে কমলাঘাটের মস্ত গঞ্জ, অধর সেখানে বড় পাইকারি ব্যবসাদার। অনেকগুলো ধান-চালের আড়ত আছে তার। টাকাপয়সা যে কত তার লেখাজোখা নেই।

পরিচয়-টরিচয় হল বটে, বিনুদের সম্বন্ধে কিন্তু তেমন আগ্রহ নেই আধরের। সে হেমনাথকে বলতে লাগল, 'এইদিকে যখন আইসাই পড়ছেন আর দেখাটাও হইয়া গেছে তখন আমার বাড়িত্ এবার পায়ের ধূলা দিতে হইব।'

হেমনাথ বললেন, 'আজ আর তোমার ওখানে যেতে বোলো না অধর। তাকিয়ে দেখ কত বেলা হয়েছে। রামকেশবটা রাস্তা থেকে ওর বাড়ি ধরে নিয়ে গিয়েছিল, বড় দেরি করিয়ে দিয়েছে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমাদের বেলা হেলে যাবে।

'রামক্যাশবের বাড়ি যাইতে পারেন আর আমার বাড়ির কাছে আইসা যাইবেন না, তা কিছুতেই হইব না।' নাছোড় পেয়াদার মতন জেদ ধরল অধর, 'আসেন—'

হেমনাথ বোঝাতে চাইলেন, 'পরে একদিন আসব'খন। এখন তোমার ওখানে গেলে আরো দেরি হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েগুলোর এখনও স্নান-খাওয়া হয়নি।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। অধর বলতে লাগল, 'দুই দন্ডও না বড়কত্তা, তার আগেই আপনেরে ছাইড়া দিমু। এট্টু কষ্ট কইরা একবার খালি আহেন। বড় দরকার—'

হেমনাথ বললেন, 'তোমার দরকারের কথাটা এখানেই বলে ফেল না।'

'এইখানে কইলে হইব না, বাড়িতে নিয়া কয়টা জিনিস আপনেরে দেখামু।'

'ছাড়বে না যখন কি আর করা, চল—' অধরের জেদ আর মিনতির কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন হেমনাথ।

এই সময় অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'আপনি ঘুরে আসুন মামাবাবু, আমরা বরং রাস্তায় দাঁড়াই।'

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'রাস্তায় কি দাঁড়িয়ে থাকবে, এস—এস—'

অধরও সায় দিল, 'হ-হ, আসেন—'

বিনুরা যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে খানিকটা পিছিয়ে যেতে হল। তারপর রাস্তা থেকে ডান ধারে দু' পা গিয়ে সরু খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, সাঁকো পেরিয়ে অধরের পিছু পিছু যেখানে এসে তারা পৌঁছুল সেটা ফুলফলের বাগান। আশ্বিনের এই দুপুরবেলায় গাছগাছালির ঘন ছায়া এখানে নিবিড় হয়ে আছে। ছায়াচ্ছন্ন বাগানটার পর টিনের চমৎকার একখানা তিনতলা বাড়ি।

কলকাতায় সাততলা আটতলা কত বাড়ি দেখেছে বিনু, তাদের ছাদগুলো যেন আকাশের মেঘেদের ছুঁয়ে আছে। কিন্তু টিনের তেতলা এই প্রথম দেখল। অবাক চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল সে।

অধর সাহার বাড়িটার মাথায় প্যাগোডার মতন নকশা-করা টিনের চাল। তার দু'ধারে দুটো টিনের ময়ূর পেখম মেলে আছে। দেওয়ালগুলো অবশ্য কাঠের।

বাড়ির ভেতরটা ঢুকে অধর বলল, 'চলেন, দোতালায় যাই।'

হেমনাথ বললেন, 'আবার টঙে ওঠাবে?'

'উপরে না গেলে তো জিনিসগুলান দেখাইতে পারুম না।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে ওপরে উঠতে লাগল অধর। হেমনাথরা তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ করল, বাড়িটা আশ্চর্য রকমের নির্জন আর স্তব্ধ। অধর সাহা ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, শিশু-বৃদ্ধ-যুবক বা যুবতীর কণ্ঠস্বর কোনো দিক থেকেই ভেসে আসছে

না। রূপকথার যক্ষপুরীর মতন এখানে জীবনের কোনো অস্তিত্ব বুঝি নেই।

খানিক আগে বিনুরা রামকেশবের বাড়িতে ছিল। অনেক মানুষ অজস্র হইচই বা ফেনায়িত কোলাহল—সব মিলিয়ে যেন একটা সজীব রঙিন মেলার ভেতর অনেকখানি সময় কাটিয়ে এসেছে। তুলনায় এ বাড়ির নির্জনতা স্তব্ধতা চোখকানে বিঁধতে লাগল।

একটু পর অধরের পিছু পিছু মস্ত একখানা ঘরের মধ্যে চলে এল বিনুরা। ঘরটার একধারে চেলা কাঠের পাহাড়, খুব সম্ভব দু-তিনটে বড় বড় গাছ কেটে ওভাবে রাখা হয়েছে। আরেক পাশে সারি সারি সাজানো অনেকগুলো পেতলের নতুন কলসি, কাঁসার থলা-বাটি-গেলাস, আর নতুন নতুন খাট। তা ছাড়া আরো অসংখ্য জিনিস।

এক পলকে সব দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে অধরের দিকে তাকালেন হেমনাথ।

মুখ কাঁচুমাচু করে অধর বলল, 'আপনের লগে পরামশ্য না কইরাই এইসব কিনাকাটা সারছি বড়কত্তা।' একটু থেমে আবার বলল, 'দ্যাখেন জিনিসগুলান—এক্কেবারে বাছা বাছা, পছন্দসই। কোনো শালায় কইতে পারব না অধর সা' দানে খারাপ জিনিস দিছে।'

হেমনাথ বিমূঢ় সুরে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

হেমনাথের চোখে চোখ রেখে অধর শুধলো, 'বুঝতে পারেন নাই?'

'না।' ধীরে ধীরে হেমনাথ মাথা নাড়লেন।

একটু চুপ করে থেকে অধর বলল, 'দানসাগর ছাদ্দ করুম।'

'শ্রাদ্ধ!'

'হ।'

'কার?'

'কার আবার, আমার।' নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে অধর সাহা ফিসফিস করল।

আর হেমনাথ যেন কথা বলতে ভুলে গিয়ে একেবারে বোবা হয়ে রইলেন। তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হল এমন আজগুবি কথা চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে আর কখনও শোনেন নি।

একটু কি ভেবে নিয়ে অধর আবার বলল, 'ঐ যে লাকড়ি (চেলা কাঠ) দেখতে আছেন এগুলান দিয়া আমি মরলে আমারে পোড়ান হইব। আর এই নৃতন খাটপালং থাল-ঘটি-গেলাস-বাটি—সব দানের জিনিস। ছাদ্দের সময় বামনগো দিমু। বুঝলেন নি বড়কত্তা, মরার আগেই নিজের ব্যবস্থা নিজেই কইরা রাখলাম। এমন কি আগামী বচ্ছর গয়ায় গিয়া নিজের পিন্ডটাও দিয়া আসুম।'

নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলেন হেমনাথ। এতক্ষণে কথা বললেন, 'হঠাৎ তোমার ঘাড়ে এ পাগলামি চাপল কেন?'

ঠিক এভাবে হেমনাথ বলবেন তা যেন আশা করে নি অধর। আহত সুরে বলল, 'এরে আপনে পাগলামি ক'ন!'

'তা ছাড়া কী?'

হেমনাথের কথার উত্তর না দিয়ে অধর বলল, 'আপনে তো সগলই জানেন বড়কত্তা—'

হেমনাথ বললেন, 'কী জানি?'

'আমার পোলা দুইখান ক্যামন।' অধর সাহা বলতে লাগল, 'দশ বছর তারা আমার লগে সম্পক্ক রাখে নাই। তাগো ভরসা করি না। কিন্তুক—'

হেমনাথ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কী?'

'হিন্দু হইয়া জন্মাইছি। মরার পর কে ছাদ্দ করব, কে পিন্ডি দিব তার তো ঠিক নাই। ঐটুকের লেইগা, আত্মার সদ্গতি হইব না! পরকাল বইলা তো একখান কথা আছে।'

'তোমার ভালমন্দ কিছু হলে ছেলেরা আসবে না, এমন কথা আগে থেকেই ভবছ কেন? তা

ছাড়া বলতে নেই, তোমার স্বাস্থ্য বেশ ভালই। বয়েসেও আমার চাইতে ঢের ছোট হবে। এর ভেতর মরার চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকল কী করে?'

দার্শনিকের মতন মুখ করে অধর বলল, 'বড় কত্তা, মাইন্‌ষের জীবন বড় তাজ্জবের বস্তু। এই আছে, এই ফক্কা। কার কখন ওপারের ডাক আইব, কেউ জানে না। রাবণের সিড়ির লাখান শ্রাদ্দশান্তি আমি ফেলাইয়া রাখুম না।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

বিনুর এইসব কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। টিনের তেতলা দেখার বিস্ময়টাও ধীরে ধীরে কখন ফিকে হয়ে গেছে। সে উসখুস করতে লাগল। এদিকে অবনীমোহন, সুধা আর সুনীতি চুপচাপ। তাদের মুখচোখ দেখে প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না।

অধর আবার বলল, 'ভাবতে আছি পুজোর পরেই একটা ভাল দিন দেইখা ছাদ্দটা চুকাইয়া ফেলুম। একশ'জন ভাল বামন ভোজন করামু। আইচ্ছা বড় কত্তা, কারে কারে ডকা যায় ক'ন তো?'

হেমনাথ বললেন, 'এখনও তো দেরি আছে। পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে। এখন আমরা যাই।'

'অখনই যাইবেন?'

'হ্যাঁ। আজ আর দেরি করতে পারব না।' বিনুদের নিয়ে হেমনাথ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে একতলায়। তারপর সুপসি বাগান পেরিয়ে সোজা দক্ষিণগামী বড় রাস্তায়।

অধরও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সে বলল, 'দুই চাইর দিন পর আমি কিন্তুক আপনের বাড়িত্ যামু।'

হেমনাথ বললেন, 'এস।'

'ছাদ্দশান্তির ব্যাপারে আপনের লগে অনেক পরামশ্য আছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—'

অধর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। হেমনাথ বললেন, 'কথা তো হয়ে গেল। এই রোদের ভেতর কষ্ট করে আর তোমাকে যেতে হবে না।'

অধর দাঁড়িয়ে পড়ল। হেমনাথরা এগিয়ে গেলেন।

দাদুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অধর সাহার কথা কিন্তু ভাবছিল না বিনু। বার বার ঝিনুকের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল। এ পাড়ায় আসা হল, সেই সকাল থেকে এতখানি বেলা পর্যন্ত রামকেশব আর অধর এই দুটো লোক তাদের আটকে রাখল অথচ ঝিনুকদের বাড়িতেই শুধু যাওয়া হল না। বার বছরের বিনুর ছোট্ট উষ্ণ কোমল মনটা সেজন্য ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

খানিক যাবার পর অবনীমোহন শুধোলেন, 'লোকটা অদ্ভুত তো—'

বিনু বুঝল, অধরের কথা বলছেন অবনীমোহন। সে জানে মানুষ মরে-টরে গেলে অন্যেরা তার শ্রদ্ধা করে। কিন্তু একটা লোক জীবিত অবস্থায় নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করতে যাচ্ছে দেখেও বিনু খুব অবাক হল না, তেমন কৌতূহলও বোধ করল না। ঝিনুক যেন চারদিকের সব কিছু থেকে তাকে অন্যমনস্ক করে রেখেছে।

হেমনাথ মৃদু হাসলেন, 'তা একটু—'

অবনীমোহন বললেন, 'এমন লোক আগে আর কখনও দেখি নি।'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ হাসতে লাগলেন।

অবনীমোহন আবার বললেন, 'ছেলেদের ওপর তো খুব রাগ দেখলাম। কারণটা কী?'

'সে অনেক ব্যাপার, পরে বলব।'

'আর কেউ নেই ওঁর?'

'না। স্ত্রীকে ঢের আগেই খেয়ে বসেছে।'

অবনীমোহন আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, হেমনাথ তার আগেই বলে উঠলেন, 'যাই, আড়ত

থেকে মাছগুলো নিয়ে আসি। আয় দাদাভাই—' বলেই বিনুকে নিয়ে ডানদিকে নদীর ঢালে নেমে গেলেন।

কথায় কথায় কখন তাঁরা নৌকোঘাটায় এসে গিয়েছিলেন, অবনীমোহনের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, যাবার সময় মাছের জন্য আড়তে পয়সা দিয়ে গিয়েছিলেন হেমনাথ।

নৌকোঘাটাটা রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচে, নদীর জল জায়গাটা ছুঁয়ে আছে। তার গা ঘেঁষে সারি সারি মাছের আড়ত।

যাবার সময় আড়তগুলোর গায়ে যত জেলেডিঙি বিনুরা দেখে গিয়েছিল, এখন তার দশ গুণ জমা হয়েছে। নদীর দূর দূরান্ত থেকে চিত্রবিচিত্র পাল তুলে আরো অগণিত নৌকো এদিকে ছুটে আসছে। ইলিশ মাছের ভারি আঁশটে গন্ধ এখানে বুঝি বারোমাস অনড়, নদীর এলোমেলো দুরন্ত বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারছে না।

আড়তে যেতেই সেই লোকটাকে দেখতে পেল বিনু, হেমনাথ এর হাতেই মাছের পয়সা দিতে গিয়েছিলেন।

লোকটা মাঝবয়সী। থলথলে মাংসল চেহারা, গায়ের রং কালো। সব সময় জলের কাছে থাকার জন্যই বোধহয় চামড়া রুক্ষ, খসখসে। গ্রীষ্ম বর্ষা হাজার নখে তারা গা চিরে চিরে দিয়েছে। পরনে আধময়লা ধুতি ছাড়া আর কিছুই নেই। হাতে চৌকো সোনার তাবিজ, গলায় সরু হার, মোটা মোটা গাঁটওলা আঙুলে পলা আর গোমেদের আংটি।

কোলের কাছে টিনের ক্যাশবাক্স আর লাল হিসেবের খাতা নিয়ে একটা তক্তপোশে বসে ছিল লোকটা, বিনুদের দেখেই লাফ দিয়ে নেমে এল। আপ্যায়নের সুরে ব্যস্তভাবে বলল, 'আসেন—আসেন। বসেন বড়কত্তা—'

হেমনাথ বললেন, 'এখন আর বসব না নকুল, তাড়াতাড়ি মাছ দাও—'

'তাই কখনও হয়। আড়তে আপনের পায়ের ধূলা পড়ল, একদণ্ড বইসা না গেলে শান্তি পামু ক্যান?' বলতে বলতে নকুলের কি যেন মনে পড়ে গেল। বিনুকে দেখিয়ে বলল, 'নাতিরেই খালি আনছেন, জামাই আর নাতিনরা কই?'

রাস্তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হেমনাথ বললেন, 'ওখানে।'

'পথে খাড়া করাইয়া আইছেন! ক্যান, আমার এইখানে বসনের জায়গা আছিল না?' নকুলকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখাল।

হেমনাথ বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে তাই আর আনি নি। আনলে আরো দেরি হয়ে যাবে।'

'এট্টু দেরি হইব বইলা আনবেন না। পরথম দিন আমার আড়তের দুয়ারে ওনারা আইলেন, দুইটা মিঠাই না খাওয়াইয়া ছাড়তে পারি! আপনের নাতি-নাতিন-জামাইর উপুর আমার জোর নাই? যাই ওনাগো ডাইকা আনি।'

নকুল রাস্তার দিকে ছুটতে যাচ্ছিল, তার আগেই খপ করে তার একখানা হাত ধরে ফেললেন হেমনাথ, 'আজ থাক নকুল। একদিন তোমার বাড়িতে ওদের নিয়ে যাব। তখন যত পার খাইও—'

একটু ভেবে নকুল বলল, 'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

'কথা দিলেন কিন্তুক।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, কথার খেলাপ হবে না। তুমি মাছ দাও—'

বিনু অবাক হয়ে দেখছিল। আড়তদার এই লোকটাকে তার খুব ভাল লাগছে। তার মধুর ব্যবহার, তার আন্তরিকতা বুঝিয়ে দিচ্ছে দাদুকে কতখানি ভালবাসে সে, কতখানি শ্রদ্ধা করে। শুধু কি এই

লোকটাই, হিরণ, মজিদ মিঞা, মজিদের বোনাই হাসেম আলি, রামকেশব—সারা রাজদিয়াই হয়তো হেমনাথের জন্য হৃদয় পেতে রেখেছে। বিনু টের পেল তাদের যে এত খাতির এত মর্যাদা—সব, সব দাদুর জন্য।

নকুল ডাকল, 'আহেন, মাছ বাইছা নিবেন—'

আড়তটার সামনের দিকে রাস্তা, পেছনে নদী। দুটো দিকই খোলা। নকুলের সঙ্গে যেতে যেতে বিনু লক্ষ করল, পেছন দিকে ইলিশের পাহাড় জমে আছে—পূর্ব বাংলার চকচকে লোভনীয় রুপোলি ফসল।

আড়তের তলায় সারি সারি জেলে ডিঙি। আট-দশটা লোক ডিঙিগুলো থেকে মাছ গুনে গুনে ইলিশের পাহাড়টার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। মাছির ভনভনানির মতন অবিরাম শোনা যাচ্ছে, 'রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন—'

আরেক দল লোক কাঠের প্যাকিং বাক্সে পরল পরল বরফের তলায় মাছ সাজাচ্ছে। বিনু জানে ঐ বাক্সগুলো কলকাতায় চালান যাবে।

একসময় রুপোর পাহাড়টার কাছে এসে পড়ল বিনুরা—একসঙ্গে এত মাছ, এমন ঝকঝকে জীবন্ত জলের ফসল আগে আর কখনও দেখে নি সে।

নকুল বিনুকে বলল, 'পাচখান মাছ বাইছা লও ছোট কত্তা—'

বিনু লজ্জা পেয়ে গেল। মাছ তো বাছলই না, দাদুর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

হেমনাথ এই সময় বললেন, 'পাঁচটা মাছ কেন ? তিনটের দাম তো তোমায় দিয়ে গেছি।'

নকুল বলল, 'আইজ জবর মাছ উঠতে আছে বড় কত্তা। দরও ঝপর ঝপর নামতে আছে। অখন ট্যাকায় দশটা বিকাইতে আছে, রাইতের দিকে বিশটা কইরা বেচতে হইব।'

হেমনাথ কিছু বললেন না।

নকুল এবার বিনুকে নিয়ে পড়ল, 'কই, মাছ বাছলা না ?'

বিনু একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিনুর মনোভাব বুঝতে পেরে নিজেই এবার সেরা ছ'টা মাছ বেছে বেঁধে দিল নকুল।

হেমনাথ বললেন, 'আবার ছ'টা কেন ?'

হেসে নকুল বলল, 'ছোট কত্তা পয়লা দিন আমার আড়তে আইল। তার সোম্মান নাই ? একটা মাছ তারে খাইতে দিলাম।'

মাছ নিয়ে রাস্তায় আসতে সুধা বলল, 'এত দেরি করলে কেন দাদু ?'

হেমনাথ বললেন, 'আর বলিস না ভাই। ঐ আড়তদার মানে আমাদের নকুলটা কিছুতেই ছাড়ে না। তোদের আড়তে নিয়ে মিষ্টি খাওয়াবার বাই তুলেছিল। কত কষ্টে যে ঠেকিয়েছি। তবে একটা কড়ার করিয়ে নিয়েছে, একদিন ওর বাড়ি তোদের নিয়ে যেতে হবে।'

অবনীমোহন ওধার থেকে বললেন, 'এখানকার মানুষ বড় ভাল।'

আবেগময় সুরে হেমনাথ উত্তর দিলেন, 'সত্যিই ভাল অবনীমোহন—'

এরপর ইলিশ মাছ নিয়ে কিছুক্ষণ উচ্ছ্বসিত আলোচনা চলল। আট আনায় পাঁচটা বড় বড় ইলিশ, তার ওপর একটা ফাউ—অবনীমোহন ভাবলেন, এ যেন এক স্বপ্নের দেশ।

একসময় স্টিমারঘাটা, সারি সারি সেই মিষ্টির দোকান, খোয়া বাঁধানো পথ আর নদীটা পেছনে ফেলে সেই কাঠের পুলটার কাছে এসে পড়ল বিনুরা। ঠিক সেই সময় শোনা গেল, 'হেম—হেম' পেছন থেকে কে যেন খুব চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছে।

হেম নিশ্চয়ই হেমনাথ। তাঁকে যিনি নাম ধরে ডাকতে পারেন হয় তিনি বন্ধুস্থানীয়, নতুবা গুরুজন টুরুজন হবেন।

সবাই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। আর ঘুরতেই বিনু দেখতে পেল, দূরে পথের বাঁকে কালকের সেই জারাজীর্ণ দুর্বল ঘোড়াটা তার চাইতেও পুরনো ভাঙাচোরা গাড়িটাকে টেনে নিয়ে আসছে। কালকের সেই কোচোয়ানটাকে দেখা যাচ্ছে না, চালকের জায়গায় ধবধবে সাদা একটি মানুষ বসে আছেন।

হেমনাথ বললেন, 'লালমোহন আসছে।'

লালমোহন অর্থাৎ ডেভিড লারমোর। কাল এঁর কথা অনেক শুনেছে বিনু। যৌবনের মধ্যদিনে সুদূর আয়ার্ল্যান্ড থেকে পূর্ব বাংলার এই প্রান্তে এসেছিলেন, তারপর যুগ যুগ কেটে গেছে। তাঁকে মুখোমুখি দেখবার জন্য বিনুর ছোট্ট হৃৎপিন্ড যেন লাফাতে লাগল।

কিছুক্ষণের ভেতর ফিটনটা কাছে এসে থামল। কোচোয়ানের সিট থেকে একরকম লাফ দিয়েই নেমে এলেন লারমোর।

হেমনাথ বললেন, 'বয়স কত হল হে?'

লারমোর হেসে বললেন, 'তোমার চাইতে গুনে গুনে চার বছরের বড়।'

'কিন্তু যেভাবে নামলে তাতে তিরিশ বছরের ছোট বলে মনে হচ্ছে। বুড়ো হাড়ে একবার চোট লাগলে দেখতে হবে না, ছ'মাসের জন্যে বিছানা নিতে হবে।'

তাচ্ছিল্যভরে লারমোর বললেন, 'কিচ্ছু হবে না।'

দু চোখে অসীম বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল বিনু। লালমোহনের চুল, ঘন জোড়া ভুরু, গায়ের রং, ঋষিদের মতন লম্বা দাড়ি—সব কিছু দুধের মতন সাদা। ভুরুর তলায় স্বচ্ছ জলে আলোর নাচনের মতন দু'টি স্নিগ্ধ চোখ। পিঠ সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। গা-ময় এত কুঞ্চন যাতে চামড়া সোনার জালি জালি মনে হয়। পরনে ধুতি আর কামিজ, পায়ে লাল কাপড়ের জুতো। গলায় কালো কারে রূপোর ক্রুশ ঝুলছে।

বড়দিনে কলকাতার সাহেবপাড়ায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে আলো-টালো দিয়ে 'ক্রিসমাস ট্রি' সাজায়, তার সঙ্গে ধবধবে দাড়িওলা এক বুড়োও থাকে। বিনু বুড়োর নামটা মনে করতে পারল—সান্টাক্লজ। পোশাকটুকু বাদ দিলে লারমোর যেন অবিকল সান্টাক্লজ।

হেমনাথ বললেন, 'এস পরিচয় করিয়ে দিই—'

লারমোর বললেন, 'তোমার আর কষ্ট করতে হবে না, ওটা আমিই পারব।' বলে অবনীমোহনের দিকে ফিরলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাদের জামাই।' সুধা-সুনীতি-বিনুকে বললেন, 'আর তোমরা অবশ্যই দাদাভাই দিদিভাই। তোমাদের নাম তো জানি না, নামগুলো বল—'

অবনীমোহনের হঠাৎ কি হয়ে গেল, ঋষির মতন দেখতে এই বয়স্ক বিদেশি মানুষটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। দেখাদেখি সুধা-সুনীতি-বিনুও প্রণাম করল। তারপর একে একে সবাই নিজের নিজের নাম বলল।

সবাইকে আশীর্বাদ করে লারমোর অবনীমোহনের উদ্দেশে বললেন, 'কাল স্টিমারঘাটে তোমাদের আনতে যেতে পারি নি, বিশেষ দরকারে হাটে গিয়েছিলাম-'

অবনীমোহন বললেন, 'মামাবাবু সে কথা বলেছেন।'

'কাল হাট থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে উঠেই চলে আসব ভেবেছিলাম, তখনও কতকগুলো ঝঞ্ঝাট এসে জুটল। সব মিটিয়ে বেরুতে বেরুতে দুপুর হয়ে গেল। ভাল কথা, রমু কোথায়? তাকে তো দেখছি না।'

হেমনাথ বললেন, 'সে বাড়িতে আছে।'

লারমোর শুধোলেন, 'তোমরা গিয়েছিলে কোথায়?'

'রাজদিয়া শহরটা ওদের একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম।'

লারমোর এবার অবনীমোহনকে সাক্ষী মানলেন, 'শোন তোমার মামাবাবুর কথা। আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেছি বলে তো খুব উপদেশ ঝাড়া হল। আর উনি যে বুড়ো হাড়ে মাইল মাইল

হেঁটে এলেন, তার বেলা কী হবে ?'

সবাই হাসতে লাগল। লারমোর আর হেমনাথের ভেতর বন্ধুত্বটা যে কতখানি নির্মল, স্বচ্ছ আর প্রীতিপূর্ণ তা যেন অনায়াসে টের পাওয়া যাচ্ছে।

বিব্রত মুখে হেমনাথ বললেন, 'লাফানো আর হাঁটা—কিসে আর কিসে। সে যাক গে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর একটা কথাও না।'

লারমোর কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় হেমনাথের হাতে ইলিশ মাছগুলো দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখে হাসির ছটা ঝলমলিয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত খুশির গলায় তিনি বললেন, 'নজর পড়েছে তা হলে—'

'ঢের আগেই পড়া উচিত ছিল। পেটিগুলো, ভাতে দিলে যা হয় না— একেবারে হেভেন।' চোখ বুজে বুঝিবা স্বর্গসুখটা কল্পনা করতে লাগলেন লারমোর।

ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বোধহয় পেটিগুলো ভাতে দেওয়া যাবে না, সেজন্যে বাড়ি যাওয়া দরকার।'

লারমোর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, গাড়িতে ওঠ সব।' বলে নিজেই ফিটনের দরজা খুলে দিলেন।

অবনীমোহন, হেমনাথ আর সুধা-সুনীতি উঠতেই দেখা গেল, গাড়িতে আর জায়গা নেই, লারমোর বললেন, 'বিনুদাদা কোচোয়ানের সিটে আমার পাশে বসে যাবে।'

পাশাপাশি যেতে যেতে বার বার মুখ তুলে লারমোরকে দেখতে লাগল বিনু। চোখাচোখি হলেই অবশ্য মুখটা সরিয়ে নিচ্ছে।

এই মুহূর্তে বিনুর মন থেকে রামকেশব, রুমা-ঝুমা, অধর সাহা, নকুল, রুপোর পাহাড়ের মতন ইলিশের স্তূপ, মনোরম নদীতীর, এমন কি ঝিনুক পর্যন্ত মুছে গেছে। তার বার বছরের অপরিণত অস্তিত্বের পুরোটাই দখল করে নিয়েছেন এই বিস্ময়কর চমকপ্রদ মানুষটি, যাঁর নাম ডেভিড লারমোর।

বারকয়েক চোখাচোখির পর বিনু ধরা পড়ে গেল। সস্নেহ হেসে লারমোর শুধোলেন, 'কী দেখছ ?'

লজ্জা পেয়ে বিনু তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল, উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার তাকাতে লাগল বিনু। তার মনের কথাটা বোধহয় পড়তে পারলেন লারমোর। বিনুর দিকে খানিক ঝুঁকে বললেন, 'আমায় কিছু বলবে ?'

এই মানুষটি সম্বন্ধে এই মুহূর্তে বিনুর মনে অনেক জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতূহল। ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে সে জানাল, বলবে।

লারমোর বললেন, 'বল না—'

এতক্ষণে গলার স্বর ফুটল বিনুর। ফিসফিসিয়ে বলল, 'পরে।'

'পরে কেন, এখনই বলে ফেল।'

বিনু চুপ।

একটু ভেবে হাসতে হাসতে লারমোর বললেন, 'আচ্ছা, পরেই বোলো।'

এক সময় ফিটনটা বাড়ি পৌঁছে গেল।

ভেতর বাড়ির উঠোনে এসে ফিটন থামালেন লারমোর। তারপর খানিক আগের মতন লাফ দিয়ে নেমে চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'রমু কই রে—আমার সুরমা কোথায় ?'

সুরমা কাছেই ছিলেন। দক্ষিণ দুয়ারী বড় ঘরখানার বারান্দায় পিঠময় চুল মেলে দিয়ে শিবানী আর স্নেহলতার সঙ্গে চাল বাছতে বাছতে গল্প করছিলেন, ডাকটা কানে যেতে চকিত হয়ে মুখ ফেরালেন। উঠোনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, লারমোর দাঁড়িয়ে আছেন। আশ্বিনের এলোমেলো বাতাসে তাঁর সাদা দাড়ি এবং চুল উড়ছে।

এতকাল পরও লারমোরকে দেখেই চিনতে পারলেন সুরমা। নিমেষে তাঁর বয়েস থেকে কুড়ি-পঁচিশটা বছর যেন মুছে গেল। কৈশোর যৌবনের মাঝামাঝি একটা সময় কিছুকাল রাজদিয়ায় কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তখন সুরমা নীরোগ, সুস্থ, পরিপূর্ণ উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে ঝলমল করতেন। প্রাণবন্ত চঞ্চল পাখিটির মতন সারাদিন ছিল তাঁর ছোটাছুটি, ছেলেমানুষির খেলা। বিশেষ করে লারমোরকে কাছে পেলে আবদার আর লাফালাফির মাত্রাটা যেত হাজার গুণ বেড়ে।

এতদিন পর লারমোরকে দেখে সেই উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দিনগুলোর ভেতর যেন ফিরে গেলেন সুরমা। রাজদিয়ায় এসে বার বার নিজের বয়েস ভুলছেন। অসুস্থ রুগ্ন শরীরের কথা ভুলছেন, পারিবারিক মর্যাদার কথা ভুলছেন। আজও সব ভুলে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের মতন কিশোরীটি হয়ে উড়তে উড়তে ছুটতে ছুটতে উঠোনে নেমে এলেন। লারমোরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই তো আমি লালু মামা—'

এক মুহূর্ত সুরমার দিকে তাকিয়ে রইলেন লারমোর, তারপরেই নির্মল স্নেহের আলোয় মুখখানা ভরে গেল। সুরমাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে একসঙ্গে কত কথা যে বলে গেলেন। স্নেহলতা, শিবানী বা হেমনাথ যা যা বলেছিলেন সেই সব কথা। এতকাল কেন রাজদিয়ায় আসেন নি সুরমা, শরীর কেন এত রোগা হয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লারমোরের বুকের ভেতর থেকে সুরমা একে একে উত্তর দিতে লাগলেন।

এদিকে ফিটন থেকে সুধা-সুনীতি-বিনু আর অবনীমোহনও নেমে এসেছেন। ইলিশমাছ হাতে ঝুলিয়ে হেমনাথ নেমেছেন। ওধারের বারান্দা থেকে স্নেহলতা শিবানী পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস খানিক কেটে গেলে বন্দিনী সুরমা লারমোরের বুকের ভেতর থেকে মুক্তি পেলেন। আর তখনই চোখ পাকিয়ে তর্জনী নাচিয়ে স্নেহলতা এগিয়ে এলেন, 'এই যে সাহেব—'

দু'পা পিছিয়ে লারমোর ভয়ে ভয়ে শুধোলেন, 'এমন রণরঙ্গিণী মহিষমর্দিনী রূপে কেন? আমার বুক কিন্তু কাঁপছে।'

আগের সুরেই স্নেহলতা বললেন, 'ক'দিন পর এ বাড়িতে আসা হল?'

'বোধহয় ছ'সাত দিন।'

'মোটেও না।'

ঢোক গিলে লারমোর বললেন, 'তবে?'

স্নেহলতা বললেন, 'বার দিন।'

'অত দিন আসি নি!'

'নিশ্চয়ই, আমি গুনে রেখেছি।'

গলাটাকে খাদের ভেতর নামিয়ে লারমোর এবার বিড়বিড় করলেন, 'আবার গোনাগুনির কী দরকার ছিল?'

স্নেহলতার চোখ আরো বড় হল, গলা আরো তিন পর্দা চড়ল, 'গুনে রেখে অন্যায় করেছি?'

অসহায়ের মতন এদিক-সেদিক তাকিয়ে লারমোর কোনোরকমে বলতে পারলেন, 'না মানে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই স্নেহলতা ঝলকে উঠলেন, 'কী কথা হয়েছিল শুনি? ঠিক ছিল, এবার থেকে এ বাড়িতে খাওয়া হবে। আমি রোজ দু'বেলা করে বার দিন চব্বিশ বেলা ভাত ফুটিয়ে মরছি আর আসল মানুষের টিকির দেখা নেই।'

লারমোর উত্তর দিলেন না।

স্নেহলতা থামেন নি, একবার অবনীমোহনকে, একবার সুরমাকে, একবার সুধা-সুনীতিকে সাক্ষী মেনে সমানে গজগজ করতে লাগলেন। তিনি যা বললেন, সংক্ষেপে এই রকম। লারমোরের কেউ নেই, একা-একা রাজদিয়ার আরেক প্রান্তে পড়ে থাকেন। তার ওপর যথেষ্ট বয়সেও হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওঁর গাড়ির বুড়ো কোচোয়ানটা যেদিন চাট্টি ভাত ফুটিয়ে দেয় সেদিন খান, নইলে দু'দিন হয়তো খেলেনই না। এমন করলে শরীর টেকে? তাই স্নেহলতা ক'দিন আগে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন, এবার থেকে তাঁর কাছে দু'বেলা খেয়ে যাবেন লারমোর। কথা দিয়ে ভদ্রলোক সেই যে উধাও হয়েছেন, বার দিন পর আর আবার তাঁকে দেখা গেল। কাজেই স্নেহলতার রেগে যাবার কারণ আছে।

লারমোর আধবোজা চোখ আঁটা-ঠোঁটে চুপচাপ সব শুনে গেলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'তোমাকে যখন একবার পেয়েছি সাহেব, চব্বিশ বেলার ভাত একসঙ্গে খাওয়াব।'

পাশ থেকে শিবানী আস্তে করে বললেন, 'আমি একটা মোটা লাঠি জোগাড় করে রেখেছি বৌদি। খেতে না পারলে—'

স্নেহলতা বাকিটুকু পূরণ করে দিলেন, 'ঐ লাঠিটা দিয়ে আমরা ননদ-ভাজে গলার ভেতর গুঁজে গুঁজে দেব।'

হঠাৎ দু'হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে লারমোর বলে উঠলেন, 'তার চাইতে আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হোক মহারানী।'

স্নেহলতা রাগ করতে গিয়েও এবার হেসে ফেললেন, 'খুব হয়েছে। কত রঙ্গই যে জানো সাহেব!'

সমস্ত ব্যাপারটাই যে নির্মল কৌতুকের খেলা, চারধারে দাঁড়িয়ে বিনুরা বেশ বুঝতে পারছিল। হেমনাথদের সঙ্গে লারমোরের সম্পর্কটা কতখানি মধুর আর মনোরম তাও টের পাচ্ছিল। যাই হোক, স্নেহলতাকে হাসতে দেখে সবাই হেসে উঠল।

হাসতে হাসতেই স্নেহলতা বললেন, 'নেহাত ভাগনী, ভাগনীজামাই, নাতি নাতনীরা কলকাতা থেকে এসেছে তাই ছুটে আসা হয়েছে। নইলে কবে আসত তার কি কিছু ঠিক আছে। সারা দিন এত রাজকার্য করতে হয়ে যে দু' বেলা দু'মুঠো খেয়ে যাবার ফুসরত হয় না।'

এই সময় পিছন থেকে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'রমুদের জন্যেই শুধু না গো গিন্নি, ইলিশের গন্ধেও লালমোহন ছুটে এসেছে।' বলে হাতের ইলিশগুলো তুলে দেখালেন।

ইলিশ দেখাতে গিয়ে এমন বিপদ হবে, কে জানত। বেশ আড়ালে আড়ালে ছিলেন হেমনাথ, একেবারে তোপের মুখে পড়ে গেলেন। স্নেহলতার মনোযোগ লারমোরের দিক থেকে এবার তাঁর ওপর এসে পড়ল। চোখ কুঁচকে স্নেহলতা বললেন, 'এই যে আরেক জন—'

ভীত সুরে হেমনাথ বললেন, 'আমি আবার কী করলাম?'

'সেই সকাল থেকে কোন দিগ্বিজয় করে আসা হল শুনি? এখন কত বেলা হয়েছে হুঁশ আছে?'

হেমনাথ ভেবেছিলেন, ইলিশের কথা তুললে লারমোরকে নিয়ে মজাটা আরো জমবে। কিন্তু সেটা পুরোপুরি তাঁর বিরুদ্ধেই গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'ওদের রাজদিয়া দেখাতে দেরি হয়ে গেল। তা ছাড়া রামকেশবটা—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে স্নেহলতা গলা চড়ালেন, 'চান নেই খাওয়া নেই, ঘুরে ঘুরে আমার সোনাদের মুখগুলো কালো হয়ে গেছে। এদিকে রমুটাও না খেয়ে বসে আছে—অসুস্থ রোগা মানুষ। বাড়ি থেকে একবার বেরুতে পারলে ফেরার কথা কি তোমার মনে থাকে!'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভরসা হল না হেমনাথের, ইলিশ মাছ নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে রান্নাঘরের

দিকে অদৃশ্য হলেন।

স্নেহলতা ঠোঁট টিপে হেসে ফেললেন, 'যাবার রকম দেখ না! সারাদিন চড়ায়-বড়ায় ঘুরে এখন ইলিশ দিয়ে ভোলাতে এসেছে। ভেবেছে ইলিশ দেখলে আমি স্বর্গে চড়ব।' বলতে বলতে লারমোরের দিকে তাকালেন, 'এই যে সাহেব, আর সঙের মতন দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে আসা হোক। ভাল কথা, আমি কিন্তু এ বেলা ইলিশ রেঁধে খাওয়াতে পারব না।'

লারমোর বললেন, 'বেশ তো, রাত্তিরেই খাব। ও যখন চোখে একবার দেখেছি, না খেয়ে যেতে পারব না। গুরুর বারণ।'

'ইলিশের নামে জিভ একেবারে সাত হাত।' মধুর ভ্রুভঙ্গে লারমোরকে বিদ্ধ করে বিনুদের দিকে চোখ ফেরালেন স্নেহলতা, 'এস দাদারা, এস অবনী—'

এ বেলার খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে বেলা হেয়ে গেল। পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রং এখন কাঁচা হলুদের মতন। গাছের পাতাগুলো দিনশেষের আলোয় যেন সোনালি ঝালর হয়ে উঠেছে। দুটো পাখি ওধারের ঘরের চালে বসে ছিল। হঠাৎ কি হল, একটা পাখি চঞ্চল ডানায় তার সঙ্গীকে ঘিরে কিছুক্ষণ উড়ে উড়ে মুখোমুখি বসল, তারপর ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে সোহাগ জানাতে লাগল, আদর কতে লাগল। বুঝিবা আশ্বিনের এই বিকেল তাদেব জাদু করেছে।

উঠোনের এক ধারে আঁচিয়ে অবনীমোহনরা পুবের ঘরের ঢালা তক্তপোশে এসে বসলেন। সবাই এসেছেন, শুধু সুধা বাদ। অবশ্য স্নেহলতা, শিবানী এবং সুরমাও আসেন নি। তাঁদের এখনও খাওয়া হয় নি। হেমনাথদের খাইয়ে এই সবে তাঁরা খেতে বসেছেন।

পুবের ঘরে এসে কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর লারমোরই শুরু করলেন। প্রথমে বিনু আর সুনীতির সঙ্গে ঠাট্টাটাট্টা করে অবনীমোহনের সঙ্গে কলকাতার গল্প জুড়ে দিলেন। হালকাভাবে হিটলার, ইওরোপ এবং যুদ্ধের প্রসঙ্গও এল।

বড় বড় পলকহীন চোখে লারমোরের দিকে তাকিয়েই আছে বিনু। এই মানুষটি সম্বন্ধে তার বিস্ময় আর কাটছে না। কলকাতায় হাজার হাজার সাহেব দেখেছে সে। কিন্তু এদেশের পোশাক, এদেশের ভাষা, এদেশের অন্ন এমন নিষ্ঠায় এমন মমতায় গ্রহণ করে এরকম বাঙালি হয়ে যেতে আগে আর কাউকে দেখে নি।

কলকাতার গল্প যুদ্ধের গল্প শেষ করে লারমোর হেমনাথের দিকে ফিরলেন, 'বুঝলে ভাই—'

হেমনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী বলছ?'

'ওষুধ তো ফুরিয়ে গেছে।'

'ফুরিয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ, হেম।' আস্তে করে মাথা নাড়লেন লারমোর।

বালিশে শরীর সঁপে দিয়ে আধশোয়ার মতন ছিলেন হেমনাথ। এবার উঠে বসলেন, 'কুড়ি দিনও হয় নি, ঢাকা থেকে আড়াই শো টাকার ওষুধ তোমাকে আনিয়ে দিয়েছি, এর ভেতর খতম করে ফেললে!'

লারমোর হাসলেন, 'কী করব বল?'

অবাক চোখে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল বিনু, এবার বিমূঢ়ের মতন লারমোরকে দেখতে লাগল। আড়াই শো টাকার ওষুধ তো একটুখানি ব্যাপার না, লারমোর কি কুড়ি দিনে সব খেয়ে ফেলেছেন! বিনুর একবার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই অবনীমোহন শুধোলেন, 'এত ওষুধ দিয়ে কী হল?' বিনুর মতন তিনিও বুঝিবা কিছুটা বিমূঢ় হয়েছেন।

হেমনাথ বললেন, 'বিরাট লাভের কারবার ফেঁদেছে যে লালমোহন।'

লারমোর হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, 'তা যা বলেছ হেম। পনের দিন, বিশ দিন পর পর ঢাকা থেকে দেড়শো দুশো টাকার করে ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছ আর চক্ষের পলকে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি। কারবারটা লাভের বৈকি!'

অবনীমোহনের মুখ দেখে মনে হল, কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাঁর মনের কথা খানিক আন্দাজ করে হেমনাথ বললেন, 'আমি মুখে আব কতটুকু বলতে পারব? লারমোরকে ক'দিন দেখ, এত ওষুধ নিয়ে ও কী করে নিজেই বুঝতে পারবে।'

অবনীমোহন বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে করে সুরমা আর স্নেহলতা এ ঘরে এলেন। শিবানী অবশ্য আসেন নি।

ঘরে পা দিয়েই স্নেহলতা বললেন, 'এ বেলা তো বাচা মাছ, সরপুঁটি মাছ আব পাবদা মাছ খাওয়া হল। ওবেলা কী হবে?'

হেমনাথ বললেন, 'কেন ইলিশ মাছই তো আছে—'

স্নেহলতা কিছু বলবার আগেই হঠাৎ সুর করে ছড়া কেটে উঠলেন লারমোর:

পয়লা পাতে কিছু তিক্ত
ঘৃত দুই হাতা।
তাহার পর মুগ দাইল (মুগ ডাল)
সহ ইলিশ মাথা।
সরিষার পাক দিয়া ইলশার ঝাল,
কাঁচা মরিচ ফোড়ন দিয়া ইলশার ঝোল,
এর সাথে পাই যদি ভাজা খান চার,
স্বর্গ তো থাকে না রামা বেশি
দূরে আর
শাস্ত্রমতে রাইন্ধো ইলিশ
অন্যথা না হয়
অন্যথা করিবে যে আমার
মাথা খায়।

চোখ এবং ঠোঁট কুঁচকে শুনে গেলেন স্নেহলতা। তারপর বললেন, 'আজকাল বুঝি খুব মঙ্গলকাব্য পড়া হচ্ছে!'

ঘাড় কাত করলেন লারমোর, 'হ্যাঁ, খুব ভাল জিনিস।'

'কী ভাল?' চোখের তারা তীক্ষ্ণ করে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'সারা মঙ্গলকাব্য, না তার ভেতর বেছে বেছে এই ইলিশ মাছের জায়গাটা?'

এক গাল হেসে লারমোর বললেন, 'ইলিশ মাছের জায়গাটা। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এমন বস্তু আর সৃষ্টি হয় নি।'

সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'একটি মেছো বেড়াল।'

লারমোর কী বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিনুর চোখ জানলার বাইরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল সে। দূরে বাগানের ভেতর ডালপালাওয়ালা ঝুপসি মতন কি যেন টেনে টেনে আনছে যুগল।

আজ এই প্রথম যুগলকে দেখল বিনু। সকালবেলা হেমনাথের সঙ্গে রাজদিয়া দেখতে বেরিয়েছিল তারা। নদীতীর, স্টিমারঘাটা, মাঝিঘাটা, আশ্বিনের জাদুভরা নীলাকাশ, ইলিশ মাছের আড়ত, রামকেশব,

রুমা-ঝুমা—নানা দৃশ্য, বিভিন্ন মানুষ, বিচিত্র সব ঘটনা বিনুকে এত মুগ্ধ এবং বিস্মিত করে রেখেছিল যে যুগলের কথা একবারও তার মনে পড়ে নি। অথচ রাজদিয়াতে এসে যাকে সব চাইতে অর ভাল লেগেছে, বিস্ময়কর মনে হয়েছে, সে যুগল।

জানলার বাইরে থেকে চোখদুটো এবার ভেতরে নিয়ে এল বিনু, একবার লারমোরকে দেখে নিল। এই মানুষটিও তার কাছে কম বিস্ময়কর না। যুগল এবং লারমোর—দু'ধারের দুই বিস্ময়ের টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত যুগলই জিতল। পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এসে এক ছুটে বিনু বাগানে এসে হাজির।

দূর থেকে ঝুপসি জঙ্গল মতন মনে হয়েছিল। কাছে এসে বিনু দেখতে পেল, সরু সরু লম্বা পাতা আর কাঁটাভর্তি মোটা মোটা অসংখ্য লতা স্তূপাকার হয়ে গেছে। রুপোর মতন চকচকে ধারাল দা দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে পাতাটাতা ছেঁটে যুগল লতাগুলো একধারে সাজিয়ে রাখছিল। বিনুকে দেখে মুখ ভরে হাসল সে, 'এই যে ছুটোবাবু, সকাল থিকা আপনের দেখা নাই। কতবার যে খোঁজ করছি।'

বিনু বলল, 'আমরা দাদুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম।'

'সে তো জানিই, আপনেরা রাইজদা দেখতে গেছিলেন। তা অ্যাত দেরি করলেন ক্যান ?'

দেরি হবার কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিল বিনু।

যুগল শুধলো, 'আমাগো রাইজদা ক্যামন দেখলেন ছুটোবাবু ?' বলে এমনভাবে তাকাল যেন বিনুর 'ভাল-মন্দ' বলার ওপর তার বাঁচামরা নির্ভর করছে।

'বড্ড ছোট।' অন্যমনস্কের মতন উত্তর দিয়ে কাঁটালতাগুলো দেখিয়ে বিনু বলল, 'এগুলো কী ?'

'ব্যাত, ব্যাতের লতা।'

'কী হবে এগুলো দিয়ে ?'

রহস্যময় হেসে যুগল বলল, 'হইব এটা জিনিস। এট্টু খাড়ন, নিজের চৌখেই দেখতে পাইবেন।'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল আবার বলল, 'বেথুন খাইছেন ছুটোবাবু ?'

'বেথুন' শব্দটা জীবনে এই প্রথম শুনল বিনু। অবাক হয়ে সে বলল, 'বেথুন কী ?'

'ব্যাতের ফল।'

'বেতফল আবার খায় নাকি ?'

'খায়, খায় ছুটোবাবু। এমুন বস্তু না খাইলে জীবন এক্কেরে বিথা।' বলে চোখ বুজে মুখের ভেতর যেন বেতফলের স্বাদ নিতে লাগল যুগল।

বেতফল কখনও খায় নি বিনু। ওটা না খেলে জীবন বৃথা হয়ে যায় কিনা এই মুহূর্তে বুঝতে পারল না সে। আস্তে করে শুধু বলল, 'কেমন লাগে খেতে ?'

'নিজের মুখে আর কী কমু ছুটোবাবু, চত্তির মাসে ব্যাতফল পাকব। তখন খাইয়া দ্যাখবেন।'

বিনু বুঝল যুগলের কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে হলে চৈত্র মাস পর্যন্ত তাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এখন সবে আশ্বিন।

দেখতে দেখতে সবগুলো বেতের লতা থেকে পাতাটাতা ছেঁটে ফেলল যুগল। লতাগুলোর গায়ে অবশ্য চোখা চোখা ধারাল কাঁটা থেকেই গেল, সেগুলো আর চাঁছল না। পাতা হলে কাঁটাসুদ্ধ একেকটা বেত নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে এক ধরনের বিচিত্র গোল ঠোঙা তৈরি করতে লাগল যুগল। ঠোঙাগুলোর একটা দিক খুব সরু, তারপর বেতের পাক ক্রমশ বড় হয়ে হয়ে মুখের কাছটা মস্ত হয়ে উঠেছে। মুখটার ব্যাস প্রায় পৌনে এক হাতের মতন।

পঁচিশ-তিরিশটা ঠোঙা তৈরি হলে প্রতিটার সরু দিকে একটা করে লম্বা দড়ি বাঁধতে লাগল যুগল।

চুপচাপ বিনু দেখে যাচ্ছিল। দড়ি বাঁধা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় কোথা থেকে যেন সুধা

এসে হাজির। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'এগুলো কী?'

যুগল বলল, 'ফান্দ্ (ফাঁদ)।'

'কী হবে এসব দিয়ে?'

বিনুকে যেভাবে বলেছিল তেমনি রহস্যের সুরে হেসে হেসে যুগল সুধাকে বলল, 'অখন কমু না।'

সুধা ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'বললে কী হবে?'

'আগে থিকা কইলে গুণ নষ্ট হইয়া যাইব।'

সুধার চোখমুখ বিরক্ত, কিছুটা বা বিমূঢ় দেখাল। আর কিছু বলল না সে।

দড়ি বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। যুগল বলল, 'আসেন ছুটোবাবু, আসেন ছুটোদিদি, ফান্দগুলির ব্যবস্থা কইরা আসি।'

সুধা আর বিনুকে নিয়ে পুকুরপারে চলে এল যুগল। তারপর বেতের ফাঁদগুলো জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। লম্বা দড়ির একদিক দিয়ে ফাঁদগুলো বাঁধা, দড়ির অন্য প্রান্তগুলো চারদিকের গাছপালার সঙ্গে বেঁধে রাখল যুগল।

বিনু বলল, 'এগুলো জলে ফেললে যে?'

যুগল বলল, 'সাতটা দিন সবুর করেন ছুটোবাবু, তারপর বুঝতে পারবেন ক্যান ফালাইছি।'

ফাঁদটাঁদ ফেলা হয়ে গেলে সুধা-বিনু-যুগল কথা বলতে বলতে আবার বাগানে ফিরে এল। আর তখনই দেখা গেল রাস্তার দিক থেকে মস্ত একটা বাক্স হাতে ঝুলিয়ে হিরণ আসছে। বিনুরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাছাকাছি এসে একমুখ হাসল হিরণ। সুধার চোখে চোখ রেখে খুব খুশি গলায় বলল, 'আরে আপনি! বাগানে কী করছেন?'

কেমন করে যেন হাসল সুধা। রাজহাঁসের মতন গলাটা ঈষৎ বাঁকিয়ে বলল, 'আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।'

'আমার জন্যে।'

'হ্যাঁ স্যার—'

'আমি এখন আসব, আপনি জানতেন?'

স্বরে দীর্ঘ টান দিয়ে সুধা বলল, 'হুঁ—'

হিরণ বলল, 'কেমন করে জানলেন?'

'হাত গুনে—'

হিরণ আর কিছু বলল না, উজ্জ্বল হাসিভরা চোখে তাকিয়ে রইল।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর হিরণের হাতের বাক্সটা দেখিয়ে সুধা বলল, 'ওটা কী?'

'গ্রামোফোন, আপনাদের জন্যে নিয়ে এলাম।'

পাশ থেকে যুগল বলে উঠল, 'গামাফোন কী হিরু দাদা?'

হিরণ বলল, 'কলের গান'

যুগল এবার প্রায় লাফিয়ে উঠল 'গান শুনুম, গান শুনুম—'

সুধা হিরণকে বলল, 'বাগানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, ঘরে গিয়ে গান শোনা যাক।'

'চলুন—'

চারজনে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। সুধা আর হিরণ আগে আগে, যুগল বিনু পেছনে।

যেতে যেতে হিরণের সঙ্গে খুব কথা বলতে লাগল সুধা আর হাসতে লাগল। এমনিতেই প্রচুর কথা বলে সে, দিনরাতই বকবকায়মান। কিন্তু এখনকার প্রগলভতার তুলনা নেই।

পেছন থেকে আড়ে আড়ে বিনু দেখতে লাগল, ছোটদির চোখে-মুখে হাসি নাচছে, আর কি এক অলৌকিক আলো খেলে যাচ্ছে। সুধার মুখে এমন হাসির ছটা আলোর খেলা আগে আর কখনও দেখে নি বিনু।

হিরণ আর সুধা সোজা পুবদুয়ারী ঘরখানায় চলে এল, তাদের পিছু পিছু বিনুও। যুগলও সঙ্গে এসেছিল। সে ভেতরে ঢুকল না। দরজার কাছে উদগ্রীব দাঁড়িয়ে থাকল।

অবনীমোহন কি লারমোর, সুরমা কিংবা স্নেহলতা—সবাই ঢিলেঢালাভাবে তক্তপোশে বসে ছিলেন আর এলোমেলো গল্প করছিলেন।

হিরণকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন লারমোর, উচ্ছ্বাসের সুরে বললেন, 'আরে শ্যামচন্দর যে! আয় আয়।'

ঘাড় বাঁকিয়ে হাসিমুখে হিরণ বলল, 'আমি তো শ্যামচন্দর—কালো কুটকুটে। তুমি কি?'

সুর করে এক কলি গেয়ে উঠলেন লারমোর, 'আমি গোরাচাঁদ হে—'

'তাই নাকি!'

'নিশ্চয়ই, বিশ্বসংসার সে কথা বলবে।' নিজের একখানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে লারমোর বললেন, 'দ্যাখ কেমন ধবধবে—'

ঠোঁট কুঁচকে কপট তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে লালমোরের হাতখানা ঠেলে দিল হিরণ, 'এ হাত বার করে আর রঙের গর্ব করতে হবে না। গোরাচাঁদ একদিন হয়তো ছিলে, এখন আর নেই। এদেশে থাকতে থাকতে—'

সন্দিগ্ধ চোখে লারমোর তাকালেন, 'থাকতে থাকতে কী?'

'আমাদের মতন কষ্টিপাথর হয়ে গেছ।'

'বলছিস, বলছিস?'

'একবার কেন, হাজার বার বলছি।'

একটু আগে লারমোরের চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে লঘু কৌতুকের আভা ছিল, এবার তাতে ভিনভাবের রং লাগল। আবেগপূর্ণ সুরে তিনি বলতে লাগলেন, 'কষ্টিপাথরই আমি হতে চেয়েছিলাম রে। যেদিন প্রথম এদেশে আসি সেদিন থেকেই আমার সাধ বাঙালি হব। তারপর চল্লিশ বছর ধরে সেই চেষ্টাই করে আসছি। নিজের বলতে যা ছিল সব ফেলে দিয়ে সব ভুলে গিয়ে এ দেশের অন্ন-বস্ত্র-ভাষা মাথায় তুলে নিয়েছি। প্রাণভরে সারা গায়ে এখানকার আলো-বাতাস ধুলো-কাদা মেখেছি। বাকি ছিল গায়ের রংটা। তুই তো বলছিস, রঙের গর্ব আমার ঘুচেছে। এতদিনে আমি কি তবে পুরোপুরি এদেশের মানুষ হতে পারলাম?'

লারমোরের আবেগ হিরণের বুকের অতলে সব চাইতে স্পর্শকাতর তারটাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। গভীর গলায় সে বলল, 'তুমি শুধু এদেশের মানুষ না—লালমোহন দাদু, সব দেশের সব কালের মানুষ। তুমি বাঙালি হতে চেয়েছ, তার বদলে আমরা যদি তোমার মতন হতে চাইতাম, জীবন ধন্য হয়ে যেত।'

খানিক আগের ঘোরটা হঠাৎ কেটে গেল। হালকা গলায় লারমোর বললেন, 'থাক, আমাকে আর আকাশে তুলতে হবে না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'যার মতন হলে সত্যি সত্যি ধন্য হতে পারতুম সে আমি না, ঐ মানুষটা—'

লারমোর আঙুল দিয়ে হেমনাথকে দেখিয়ে দিলেন।

বিব্রতভাবে চেঁচামেচি করে উঠলেন হেমনাথ, 'বেশ তো দু'জনের ভেতর হচ্ছিল। তার মধ্যে আমাকে আবার টানাটানি কেন? হিরণ তোমাকে আকাশে চড়াতে চাইছে, একলাই ওঠ না বাপু। ঐ জায়গাটার ওপর আমার লোভ নেই।'

আপন মনেই এবার বুঝি লারমোর বললেন, 'আমি যদি এ দেশের মানুষ হতে পেরে থাকি তা ঐ হেমের জন্যে। আমার সব কাজ সব ভাবনার পেছনে ঈশ্বরের দূত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে।'

হেমনাথ চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠলেন,'আবার—'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

এর ভেতর সুধা আর বিনু তক্তপোশে উঠে সুনীতির গা ঘেঁষে বসে পড়েছে।

একসময় হিরণের চোখে চোখ রেখে হেমনাথ ডাকলেন, 'অ্যাই শিম্পাঞ্জি—'

মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়ে হেসে হেসে হিরণ বলল, 'চমৎকার খেতাব, এই মাথা পেতে নিলাম।'

হিরণ এমনভাবে এমন সুরে বলল যে সবাই হেসে উঠল।

হাসাহাসির ভেতর লারমোর বললেন, 'তুমি দেখছি হিরুটাকে মানুষের ভেতরেই রাখতে চাও না হেম। নাম কেটে একেবারে শিম্পাঞ্জির দলে নামিয়ে দিলে!'

'দেব না?' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'কাল রাত্তিরে সেই যে গেল বাঁদরটা, তারপর আজ এই এতক্ষণে আসার সময় হল। অথচ বলে গিয়েছিল, সকালবেলা আসবে, আমাদের সঙ্গে রাজদিয়া বেড়াতে যাবে। হেন তেন কত কী। একটা কথার যদি ঠিক থাকে!' বলতে বলতে হিরণের দিকে ফিরে চোখ পাকালেন, 'সারাদিন কোন রাজ্যিতে থাকা হয়েছিল শুনি? মিথ্যে কথা বললে কিন্তু মাথা ভেঙে দেব।'

হিরণ চোখ তুলে একবার সুধাকে দেখে নিল। সুধার টেপা ঠোঁটে এবং চোখের তারায় শব্দহীন হাসি খেলে যাচ্ছিল, তার লাঞ্ছনায় মেয়েটা বুঝিবা খুব খুশি। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে কপট ভয়ে হিরণ বলল, 'ভোর রাত্তিরে উঠে গয়নার নৌকো করে সিরাজদীঘায় আহাদ কাকার বাড়ি গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ফিরতি নৌকায় সকাল সকাল চলে আসতে পারব। আহাদ কাকা দুপুরে না খাইয়ে ছাড়ল না। তাই তো ফিরতে দেরি হয়ে গেল।'

হেমনাথ বললেন, 'আহাদের ওখানে কোন রাজকার্যটা ছিল?'

গ্রামোফোনের বাক্সটা তুলে ধরে হিরণ বলল, 'এইটা আনতে গিয়েছিলাম। গেল মাসে আহাদ কাকার মেয়ের বিয়ে গেছে না, তখন এটা নিয়ে গিয়েছিল।'

'আজই ওটার কী দরকার পড়ল?'

লারমোর এই সময় বলে উঠলেন, 'গ্রামোফোন দিয়ে কী হয়? ছেলেটা ঘরে পা দিতে না দিতে তুমি যে মোক্তারের জেরা শুরু করে দিলে হেম। বোস রে হিরু—'

হিরণ তক্তপোশের একধারে বসল।

গ্রামোফোনের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন লারমোর। বললেন, 'আজ একটু গানবাজনা হোক তা হলে।'

হিরণ বলল, 'সেই জন্যেই এটা নিয়ে এলাম।'

লারমোর শুধোলেন, 'কী কী রেকর্ড আছে রে?'

'রবীন্দ্রসঙ্গীতই বেশি।'

'রবীন্দ্রসঙ্গীত!' মন্ত্র জপ করার মতন করে লারমোর বললেন, 'মানুষের পৃথিবীতে নিষ্পাপ পবিত্র জিনিস খুব বেশি নেই। অল্প যে ক'টা আছে তার ভেতর রবীন্দ্রনাথের গান একটা, না কি বল হেম?' বলে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

আস্তে করে মাথা নাড়লেন হেমনাথ, 'হ্যাঁ। ঐ গানগুলো দিয়ে ঈশ্বরকে যেন ছোঁয়া যায়।'

'ঠিক বলেছ।' লারমোর আবার হিরণের দিকে ফিরলেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কী আছে? কীর্তন?'

হিরণ বলল, 'আছে দু'-চারখানা।'

'ভাটিয়ালি?'

'আছে।'

এ যে একেবারে মহোৎসবের ব্যাপার রে। দে, লাগিয়ে দে।'

স্নেহলতা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার বলে উঠলেন, 'উঁহু-উঁহু, এখন না।'

লারমোর বললেন, 'তবে কখন?'

'সন্ধের পর। ইলিশ মাছগুলো রাত্তিরে খেতে হবে তো।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'কাঁচা নিশ্চয়ই খাওয়া যাবে না। যাই, কি রকম কী রান্না হবে ওদের বলে আসি।' বলতে বলতে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়লেন স্নেহলতা।

আকুল সুরে লারমোর বললেন, 'ইলিশ ভাতে আর ইলিশের ডিম দিয়ে টক যেন অবশ্যই হয়।'

বর দেবার ভঙ্গিতে স্নেহলতা বললেন, 'হবে।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই সন্ধে নেমে গেল। অন্ধকারটা কোথায় যেন হাত-পা গুটিয়ে চুপটি করে বসে ছিল, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে চোখের পলকে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। খুব ঘন করে বোনা কালো শাড়ির মতন আশ্বিনের সন্ধে চোখের সামনের সজল শ্যামল দৃশ্যপটকে দ্রুত মুড়ে ফেলতে লাগল।

এতক্ষণ জোনাকিদের দেখা পাওয়া যায় নি। হঠাৎ তারা উঠোনে, দূর ধান-বনে, বাগানের নিবিড় গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে নাচানাচি শুরু করে দিল।

এদিকে স্নেহলতা ইলিশ মাছের ব্যবস্থা করে ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর দরজায় দরজায় জলছড়া দিয়ে সন্ধেবাতি দেখিয়ে পুবদুয়ারী ঘরে চলে এলেন। তক্তপোশের একধারে বসতে বসতে হিরণকে বললেন, 'নে, এবার আরম্ভ কর।'

গ্রামোফোনে দম দিয়ে নতুন পিন-টিন লাগিয়ে রেকর্ড বাজাতে শুরু করল হিরণ। একের পর এক গান—সাহানা দেবীর, নীহারবালার, অমলা দত্তর, কনক দাসের। সবগুলোই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান।

প্রায় সবাই তন্ময় হয়ে শুনছিল। কিন্তু তক্তপোশের দূর প্রান্তে যেখানে সুধা-সুনীতি বসে আছে সেখানকার হাওয়ায় ফিসফিসানির মতন একটা শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিনুও সুধা-সুনীতির কাছেই এতক্ষণ বসে ছিল, এখন শুয়ে পড়েছে। সারাদিন ঘোরাঘুরি গেছে, আর বসে থাকতে পারছিল না সে। চোখের পাতা ধীরে ধীরে ভারি হয়ে জুড়ে আসছিল।

এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা বাজছে, 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে—'

আধো ঘুমে বিনু শুনতে পেল সুনীতি সুধাকে বলছে, 'অ্যাই ছুটকি—'

সুধা বলল, 'কী বলছিস?'

'বেছে বেছে কিরকম গান এনেছে দেখেছিস?'

'কিরকম ?'

গলা আরো নামিয়ে সুনীতি বলল, 'একেবারে সুধামাখানো।'

আড়ে আড়ে একবার স্নেহলতা-সুরমাদের দেখে নিয়ে জিভ ভেংচে দিল সুধা, 'ভাল হবে না বলছি দিদি—ই-হি-হি-হি—'

আগের গানটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হিরণ রেকর্ড বদলে দিল। নতুন গানটায় মৃদু নেশার মতন আলতোভাবে কি যেন জড়ানো।

'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে,
আমার এই রীতি, তোমা বই জানি নে।
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি,
দেখা দিতে আসি নে।'

ছোট বোনের গালে আস্তে করে টোকা দিয়ে সুনীতি বলল, 'শুনছিস, শুনছিস—'

সুনীতির দিকে মুখ না ফিরিয়ে ঈষৎ ঝাঁঝালো গলায় সুধা বলল, 'শুনছি। তুই আর বকবক করিস না।'

সুনীতির ঠোঁটে মুখে, চোখের কালো তারায় দুষ্টুমি নাচছিল। এমনিতে সে বেশ গম্ভীর। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রগলভতা যেন তার ওপর ভর করে বসেছে। সুধার কানের কাছে মুখটা নিবিড় করে সে বলল, 'এই সব গান খুঁজে খুঁজে কার জন্যে এনেছে জানিস ?'

'কার জন্যে ?'

'তোর জন্যে।'

চাপা গলায় সুধা ঝঙ্কার দিল, 'তোকে বলেছে।'

সুনীতি হেসে হেসে বলল, 'মুখে ফুটে ঠিক বলে নি। তবে—'

'কী ?'

'তোকে ছাড়া আর কাকেই বা এসব গান শোনাতে পারে বল ?'

সুধার মাথায় এবার দুষ্টুমি ভর করল, 'কেন, তোকেও তো পারে।'

মাথাটা আস্তে করে দুলিয়ে সুনীতি বলল, 'উঁহু—'

সুধা এবার আর কিছু বলল না, স্থির দৃষ্টিতে বড় বোনের দিকে তাকাল।

সুনীতি বলল, 'কাল থেকে তোর আর হিরণকুমারের ভেতর যা চলছে তাতে এই গানগুলো না শোনালে আমি ওর প্রাণদণ্ড দিতাম।'

সুধা চকিত হল। তার বিব্রত মুখে, চোখের তারায় ভয়ের মতন কি যেন ফুটল। কাঁপা গলায় সুধা শুধলো, 'কী চলছে আমাদের ভেতর ?'

'কাল ফিটনে করে আসবার সময় দু'জনে মুখোমুখি বসে শুধু গল্প আর গল্প। বাড়ি ফিরেও সে গল্প থামে না। আজও বাগানের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে দু'জনে কথার ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলি। আর—'

'আর কী !'

'একজন আরেক জনের দিকে কেমন করে তাকিয়েছিলি জানিস ?'

'কেমন করে ?'

'একেবারে মুগ্ধ, মুগ্ধ, মুগ্ধ হয়ে—'

সুধা ঠোঁট টিপল। চোখের নীলাভ তারা নাচিয়ে বলল, 'যেমন করে তুই আনন্দবাবুর দিকে তাকিয়েছিলি, না ?'

চোখ পাকিয়ে সুনীতি কি বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় গ্রামোফোনে কড় কড় করে খানিকটা কর্কশ আওয়াজ তুলে গান বন্ধ হয়ে গেল। সুধা-সুনীতি চমকে সেদিকে তাকাল। বিনুও মাথা তুলতে চেষ্টা করল, পারল না। চোখ দুটোয় ঘন আঠা লাগিয়ে কেউ যেন আরো বেশি করে জুড়ে দিচ্ছে।

উদ্বেগের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'কী হল রে হিরু?'

খানিকক্ষণ গ্রামোফোনটা নাড়াচাড়া করে হিরণ বলল, 'স্প্রিং আর একটা ছোট কল কেটে গেছে।'

'তা হলে?'

'না সারালে রেকর্ড বাজবে না। কালই নারাণগঞ্জ থেকে এটা সারিয়ে আনব।'

লারমোর ওধার থেকে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'এমন জমজমাট আসরটা একেবারে মাটি হয়ে গেল।'

হেমনাথ বললেন, 'মাটি বলে মাটি—'

স্নেহলতা, সুরমা, শিবানী—সবাই মগ্ন হয়ে শুনছিলেন। এমন চমৎকার গানের আসর মাঝপথে ভেঙে যাওয়াতে তাঁরাও দুঃখিত হলেন।

হঠাৎ সুধা বলে উঠল, 'গান কিন্তু এখনও চলতে পারে।'

হিরণ উৎসুক হল, 'কিভাবে?'

সুধা বলল, 'দিদি খুব ভাল গাইতে পারে। যদি একটা হারমোনিয়াম—'

তার কথা শেষ হবার আগেই চাপা গলায় সুনীতি বলতে লাগল, 'এই সুধা, এই—এই—'

হিরণ হাসিমুখে বলল, 'ওঁকে এই-এই করছেন কেন? আমাদের বাড়ি হারমোনিয়াম আছে। এক্ষুণি নিয়ে আসছি।'

'না—না, কিছুতেই না—' সুনীতি দু'হাত সমানে নাড়তে লাগল।

'না কি হ্যাঁ, পরে বোঝা যাবে'খন। আগে তো হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসি।' হিরণ উঠে দাঁড়াল।

'আমি গাইব না, কিছুতেই না।' সুনীতি প্রায় চেঁচাতেই লাগল, 'শুনুন, আমার চাইতে সুধা ঢের, ঢের ভাল গাইতে পারে, অভিনয়ও করতে পারে। কলেজের ফাংশনে গান গেয়ে অভিনয় করে কত কাপ-মেডেল পেয়েছে।'

হিরণের চোখের তারা এবার সুধার দিকে ঘুরল। মুখ দেখে মনে হল, এতখানি বিস্মিত আগে আর কখনও হয় নি হিরণ। আস্তে করে বলল, 'অভিনয় করতে পারেন? তাহলে তো পুজোয় একটা ভাল নাটক করতেই হয়।'

হঠাৎ এই সময় হেমনাথ বললেন, 'আমাদের সুধাদিদি আর হিরণের মধ্যে দেখছি অনেক মিল। দু'জনেই কথাসরিৎসাগর, আবার দু'জনেই অভিনয় করতে পারে।'

সুরমা অবাক হয়ে বললেন, 'হিরণ অভিনয় করতে পারে!'

'পারে আবার না!' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'প্লে বলতে তো ও একেবারে অজ্ঞান, নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যায়। পুজোর ছুটিতে রাজদিয়ার সবাই ফিরে আসুক, তখন দেখবে হিরণচন্দর নাটক বগলে করে এ-বাড়ি ও-বাড়ি কেমন ছোটাছুটি করছে। তখন চলা-ফেরা-চাউনি দেখলে মনে হবে স্বয়ং শিশির ভাদুড়ি।'

ঈষৎ অসহিষ্ণু সুরে হিরণ বলল, 'নাটক এখন থাক, আমি ছুটে গিয়ে হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসছি।'

সুধা হাসল, 'নীহারবালা, কনক দাসের রেকর্ড শোনার পর আমার গান কারো ভাল লাগবে না। না-না, হারমোনিয়াম আনবেন না, কিছুতেই না।'

এরপর হিরণ কী বলল, বিনু শুনতে পেল না। গাঢ় ঘুম চারদিক থেকে তখন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, মনে নেই। একসময় আবছাভাবে পর পর ক'টা ডাক বিনুর কানে এল, 'এই বিনু—বিনু, দাদাভাই—দাদাভাই—'তারপরেই হাত ধরে কে যেন তাকে বসিয়ে দিলেন।

চোখভর্তি ঘুম। বসে বসেই ঢুলতে লাগল বিনু। সেই গলাটা আবার শোনা গেল, 'চোখে জল দে দাদাভাই। এই যে জল—'

নিজে থেকে জল দেবার মতন অবস্থা নয়। যিনি কথা বলছিলেন তিনিই তার চোখেমুখে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিলেন।

এবার ঘুম অনেকখানি ছুটে গেল। চোখ মেলে বিনু দেখতে পেল, হেমনাথ।

হেমনাথ বললেন, 'খাবি না? চল চল সবাই খেতে বসে গেছে।'

দু'হাতে বিনুকে কোলে তুলে হেমনাথ রান্নাঘরের বারান্দায় চলে এলেন। এখানে সারি সারি নকশা-কাটা আসন পাতা। অবনীমোহন, সুধা, সুনীতি, হিরণ, লারমোর—সবাই একেকটা আসন দখল করে বসে আছেন। সামনের দিকে স্নেহলতা, সুরমা এবং এ-বাড়ির দু'টি আশ্রিতা বিধবা ভাতটাত নিয়ে প্রস্তুত। এখন হেমনাথ আর বিনু বসে গেলেই হয়।

কোণের দিকের দুটো আসন ফাঁকা। হেমনাথ একটা আসনে নিজে বসলেন, অন্যটা কাছে টেনে এনে বিনুকে বসালেন।

স্নেহলতা হেমনাথের উদ্দেশে বললেন, 'দাদাভাই কি তোমার সঙ্গে খাবে?'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'রাত্তিরবেলা কাঁটা-টাটা বেছে খেতে পারবে না। তার ওপর চোখে ঘুম রয়েছে। আমিই ওকে খাইয়ে দেব'খন।'

ঘরশত্রু ছোটদিটা এই সময় নাক কুঁচকে বলে উঠল, 'এতবড় ধেড়ে ছেলে, তাকে আবার খাইয়ে দিতে হয়।'

বিনুর কান লাল হয়ে গেল। লজ্জায় ঘাড় গুঁজে জোরে জোরে প্রবল বেগে সে মাথা নাড়তে লাগল, 'না-না—'

হেমনাথ খানিক আন্দাজ করেছিলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'কী হল দাদাভাই?'

বিনু মুখ না তুলে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে খাব না।'

সবার চোখেমুখে কৌতুকের হাসি খেলে যাচ্ছিল। হেমনাথ ঈষৎ ঝুঁকে বললেন, 'তবে কার সঙ্গে খাবি?'

'কারো সঙ্গে না, আলাদা খাব।'

'কিন্তু ইলিশ মাছে বড্ড সরু সরু কাঁটা, বেছে খেতে কি তুই পারবি দাদা? একটা যদি গলায় ফুটে যায়—'

ক্লাস সেভেনে পড়ে বিনু। কিন্তু এখনও কাঁটা বেছে খেতে শেখে নি, কাঁটা সম্পর্কে তার দারুণ ভয়। বিনু কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই চিমটি কাটার মতন করে সুধা বলল, 'একলা খেলে নির্ঘাত ও কাঁটা ফোটাবে। তারপর চেঁচিয়ে মেচিয়ে এক কান্ড করে বসুক। মাঝখান থেকে লাভ হবে এই, আমরা ভাল করে খেতে পারব না। এতখানি বয়েস হলে কি হবে, এখনও একেবারে কচি খোকা।'

বিনু এবার মুখ তুলল, এমনভাবে সুধার দিকে তাকাল যেন ভস্মই করে ফেলবে। জিভ ভেংচে

কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এইসময় মৃদু ভর্ৎসনার সুরে অবনীমোহন সুধাকে বললেন, 'কী হচ্ছে সুধা, কেন ওর পেছনে লেগেছিস?'

সুধা আর কিছু বলল না। তবে ঠোঁট উলটে দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ নাক কুঁচকে কেমন করে যেন বিনুকে একবার দেখে নিল, তারপর অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

হেমনাথ বললেন, 'তা হলে আমার সঙ্গেই খা দাদাভাই—'

আড়ে আড়ে সুধার দিকে তাকিয়ে বিনু বলল, 'কিন্তু ছোটদিটা—'

'না না, সুধা কিছু বলবে না।'

বিনু চুপ করে রইল। বোঝা গেল, হেমনাথের সঙ্গে খেতে তার আর আপত্তি নেই।

সবাই বসে পড়েছে। স্নেহলতা পাতে পাতে গরম ভাত দিতে লাগলেন—জুঁই ফুলের মতন ধবধবে সাদা ভাত। তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন সুরমা। নির্দেশমত সেই বিধবা দু'টি রান্নাঘর থেকে মাছ-ডাল-ভাজা-টাজা নিয়ে আসতে লাগল।

প্রথমে সরবাটা ঘি, জলসেঁচি শাক ভাজা, উচ্ছে ভাজা, আলুভাজা, মানকচুর বড়া। তারপর এল ইলিশমাছ ভাজা।

ইলিশ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন লারমোর। একটুকরো ভাজা মাছ ওপরে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে একেবারে গানই জুড়ে দিলেন।

'এসো মনোহর রসের আগর,
নবনী-মাখানো অঙ্গ।
তোমারে দেখিয়া তোমারে চাখিয়া,
মোহিত এ-ভূমি বঙ্গ।'

গানের মধ্যে সবাই মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। লারমোর থামলে হেমনাথ বললেন, 'ইলিশ দেখে যে খেপে উঠছ?'

বিনু লক্ষ করেছে, দেখেই শুধু নয়, ইলিশের কথা উঠলেই লারমোর একেবারে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন।

হাসিমুখে লারমোর বললেন, 'ব্যাপার কি জানো হেম, এ মাছটা দেখলে আমার আর জ্ঞান থাকে না।'

'সে তো বুঝতেই পারছি।'

লারমোর থামেন নি। গলায় ঈষৎ উত্তেজনা মিশিয়ে বলতে লাগলেন, 'পৃথিবীতে কোনো খাদ্যবস্তু নিয়ে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে কিনা, জানি না। আমার ধারণা ইলিশ মাছ নিয়ে একখানা মহাকাব্য রচনা করা যেতে পারে।'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ তো, নতুন মহাভারত শুরু করে দাও।'

'লাইনে লাইনে মিল দিয়ে পদ্য ফাঁদতে পারলে কি এতদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি?'

লারমোর আরেক প্রস্থ ইলিশের গুণগান করতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে হেমনাথ বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার খাও দেখি। ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে।'

'আরে তাই তো—' চকিত লারমোর আবার থালায় মনোনিবেশ করলেন।

তারপর একে একে ইলিশভাতে এল, ইলিশের ঝোল এল, ইলিশের ডিম দিয়ে টক এল। খেতে খেতে একসময় মুখ তুলে অবনীমোহনের দিকে তাকালেন লারমোর, 'আচ্ছা অবনী—'

'আজ্ঞে—' অবনীমোহন সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন।

'রাজদিয়ায় এবারই তো প্রথম এলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অবনীমোহন ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'রাজদিয়া কেন, পূর্ববাংলাতেই এই আমার প্রথম

আসা।'

'তোমাদের দেশ ছিল কোথায়?'

'শুনেছি বীরভূম জেলায়।'

'শুনেছি মানে?'

'কোনোদিন যাই নি কিনা, দু'পুরুষ ধরে আমরা কলকাতাতেই আছি।'

লারমোর শুধোলেন, 'দেশে যাও নি কেন?'

অবনীমোহন বললেন, 'ঠাকুরদা সত্তর আশি বছর আগে বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। দেশে বাড়িঘর বলতে কিছুই নেই, কোথায় যাব?'

'তা বটে।'

একটুক্ষণ নীরবতা। খানিক ভেবে নিয়ে লারমোর বললেন, 'তোমরা তো খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয়—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' অবনীমোহন হাসলেন।

'আমাদের ইস্টবেঙ্গল কিরকম দেখছ বল।'

'কতটুকু আর দেখেছি। স্টিমারে আসতে আসতে যেটুকু চোখে পড়েছে আর মামাবাবু আজ যেটুকু ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন তার বাইরে সবই এখনও অদেখা, অজানা। তবে সামান্য যা দেখেছি তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কি ভাল যে লাগছে—'

'কিছুই তো দেখা হয়নি।' বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন লারমোর, 'দেখ, দেখ, ঘুরে ঘুরে এর আকাশ দেখ, মেঘ দেখ, ফুল দেখ, ধানের খেত, খাল-বিল-নদী আর মানুষ দেখ। শুধু দেখলেই চলবে না, বুকের ভেতর তাকে অনুভবও করতে হবে। বুঝলে অবনী, ইস্টবেঙ্গল না দেখলে, তাকে না জানলে বাংলাদেশকে দেখা বা জানা সম্পূর্ণ হয় না। বাংলাদেশই বা বলি কেন, সারা ভারতবর্ষের সব চাইতে সরস আর প্রাণবন্ত অংশটাই অদেখা, অজানা থেকে যাবে।'

লারমোরের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, আশ্বিনের বাতাসে ভেসে ভেসে যা সবার বুকে ঢেউ তুলে যেতে লাগল। অবনীমোহন বা অন্য কেউ কিছু বললেন না, অভিভূতের মতন বসে থাকলেন। একজন বিদেশি মানুষ এদেশকে কতখানি ভালবেসেছেন, আপন অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিয়ে কিভাবে নিজেকে পূর্ববাংলার পাখি-মেঘ-ফুল-ফসল-মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন—অবনীমোহন যত ভাবছিলেন ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। এখানকার আকাশে-বাতাসে, মাঠে-ঘাটে, শ্যামল বনানীতে নিজেকে শুধু হারিয়ে ফেলেন নি লারমোর, এই সজল সরস বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর গৌরবেরও শেষ নেই।

লারমোর আবার বললেন, 'জানো অবনী, যৌবনে আমি এদেশে এসেছিলাম। তারপর চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে পূর্বাবাংলাকে দেখছি, দেখেই যাচ্ছি। প্রথম দিন দেখে যতখানি মুগ্ধ হয়েছিলাম বিস্মিত হয়েছিলাম, আজও সেই মুগ্ধতা সেই বিস্ময় আমার কাটে নি।' বলতে বলতে হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, 'হেম—'

পাতের ভাত নাড়াচাড়া করছিলেন হেমনাথ। চোখ তুলে বললেন, 'কী বলছ?'

'দিনরাতই তো তুমি চরকি কলে ঘুরছ। দু-চারটে দিন ঘোরাফেরা একটু বন্ধ রেখে অবনীমোহনদের চারদিক ভাল করে দেখিয়ে দাও।'

'চরকি কলে আমি একলাই ঘুরি? তুমি ঘোরো না?'

বাঁ হাতে ঘাড় চুলকাতে চুলকোতে লারমোর হেসে ফেললেন, 'তা অবশ্য ঘুরি।'

হেমনাথ বললেন, 'ভাগনী ভাগনী-জামাই নাতি-নাতনী আমার একার নয়, তোমারও। ঘুরিয়ে তোমাকেও দেখাতে হবে।'

লারমোর উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, 'হাজার বার।' বলে কি একটু ভেবে আবার শুরু করলেন, 'শুভস্য

শীগ্রম। কাল থেকেই শুরু করে দেওয়া যাক। কাল সুজনগঞ্জের হাট আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে। মেয়েরা তো এদেশে হাটে-বাজারে যায় না, কাজেই রমুরা যাবে না। অবনীকেই নিয়ে যাব। আর—'

হেমনাথ বললেন, 'কী ?'

'তোমাকেও ছাড়ব না, আমাদের সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে।'

হেমনাথ বললেন, 'তুমি নিয়ে যাবে কি, নিজের গরজেই কাল আমাকে সুজনগঞ্জ যেতে হবে।'

লারমোর শুধোলেন, 'তোমার আবার কিসের গরজ ?'

'একটা কোষ নৌকো কিনতে হবে, সুবিধেমতো পেলে একজোড়া হালের বলদ কিনব। কিছু মসলাপাতি আনাজ-টানাজ কেনা দরকার। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া ?'

'সুজনগঞ্জের দোকানীরা এবার দুর্গাপুজো করতে চাইছে। সে ব্যাপারে আমার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করবে। তাই—'

কিছু না বলে লারমোর হাসতে লাগলেন।

ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'হাসছ যে !'

'হাসি পেলে কী করব ?'

'শুধু শুধু লোকের হাসি পায় ?'

'তাই কখনও পায় পেল তোমার কথায়। মসলাপাতি-নৌকো-বলদ কেনাটা বাজে ব্যাপার। আসলে দুর্গাপুজোর পরামর্শ দিতেই সুজনগঞ্জে যাচ্ছ।'

হেমনাথ হঠাৎ রেগে গেলেন, 'তোমার কি ধারণা চারদিকে পরামর্শ দিয়ে বেগার খেটে বেড়ানোই আমার কাজ ? নিজের বাড়ির কিছুই দেখি না ? তাহলে এই সংসার চলছে কি করে ?'

স্নেহলতা এবার উত্তরটা দিলেন, 'ভূতে চালাচ্ছে সংসার।'

চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তা যা বলেছ। আমার ভরসায় থাকলে এ সংসার আর চলত না।'

হেমনাথের দেখাদেখি আর সবাই হেসে উঠল।

খানিকক্ষণ হাসাহাসির পর লারমোর বললেন, 'অবনীকে নিয়ে তুমি তৈরি থেকো। আমি খুব ভোর ভোর এসে তোমাদের নিয়ে যাব।'

হেমনাথ বললেন, 'তুমি কি নৌকো নিয়ে আসবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তোমার নৌকোতেই সুজনগঞ্জে যাওয়া যাবে।'

অনেক আগেই বিনুর ঘুম ছুটে গিয়েছিল। খেতে খেতে অবনীমোহন, লারমোর, হেমনাথ আর স্নেহলতার কথাবার্তা শুনছিল সে। কিছু কিছু বুঝেছিল, কিছু কিছু আবার বুঝছিল না। নৌকোয় করে সুজনগঞ্জ যাবার কথা কানে যেতে আর চুপ করে থাকতে পারল না বিনু। আচমকা বলে উঠল, 'আমিও হাটে যাব।'

লারমোর বললেন, 'তুই হাটে যেতে চাইছিস দাদা ? নাই বা গেলি—'

'তুমি তো তখন বললে মেয়েরা হাটে যায় না। আমি মেয়ে ? তবে কেন যাব না ?'

'রাইট। আমারই ভুল হয়েছিল, তুমি একেবারে খাঁটি মাসকিউলিন জেন্ডার। কিন্তু—'

'কী—'

'ভারি কষ্ট হবে যে তোর। আমরা বেরুব সেই ভোরবেলায়, ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

'হোক রাত, আমার একটুও কষ্ট হবে না।'

'ঠিক তো?'

হাল ছেড়ে দেবার মতন করে লারমোর বললেন, 'তাহলে তুমিও তৈরি থেকো।'

কাল প্রথম নৌকায় চড়বে, আনন্দে বিনুর বুকের ভেতরটা ঢেউয়ের মতন দুলতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠোনের একধারে আঁচাতে আঁচাতে হঠাৎ চঞ্চল হলেন লারমোর, 'এখন কত রাত হবে বল তো হেম?'

চারদিক নিঝুম নিষুতি হয়ে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বললেন, 'দু প্রহর পেরিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে।'

'ইস, এত রাত হয়েছে। কথায় কথায় গল্পে গল্পে একদম খেয়াল ছিল না। এক্ষুণি আমাকে ফিরতে হবে। কাদেরের সকাল থেকে ধুম জ্বর, ফিরে গিয়ে ওকে ওষুধ খাওয়াতে হবে, বার্লি-টার্লি জ্বাল দিয়ে দিতে হবে।'

বিনু শুনেছে লারমোরের কেউ নেই। অথচ এই রাত্রিবেলা ফিরে গিয়ে তাঁকে বার্লি জ্বাল দিতে হবে, কাদের নামে একটা লোককে ওষুধ খাওয়াতে হবে। নিতান্ত আপনজন না হলে কেউ কারো জন্য এতখানি চঞ্চল বা চিন্তিত হয় না।

বিনু শুধলো, 'কাদের কে?'

লারমোর বললেন, 'কাদের মিঞা। আমার গাড়ি চালায়।'

সেই বুড়ো রুগ্ন মুসলমান কোচোয়ানটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিনু বলল, 'তোমার কাছেই থাকে কাদের মিঞা?'

'কোথায় আর থাকবে বল দাদা?' লারমোর বলতে লাগলেন, 'তিরিশ বছর ধরে আমার কাছেই আছে। আমার মতো সংসারে ওরও কেউ নেই।'

লারমোর কোথায় থাকেন, বিনুর একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। কি ভেবে আর করল না।

লারমোর এবার হেমনাথের দিকে ফিরলেন, 'সেই কথাটা কিন্তু ভুলে যেও না হেম।'

হেমনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কোনটা বল তো?'

'ঐ যে তখন বললাম, ওষুধ-টোষুধ সব ফুরিয়ে এসেছে। দু' চারদিনের ভেতর কিছু যদি আনিয়ে না দাও খুব মুশকিল হবে। বাসাইলের চন্দ্র ভুঁইমালী, সিরাজদীঘার ফণি শেখ, হাসড়ার মানিক মিঞা, রসুনিয়ার গোঁসাইদাস সা, আরো কতজনের নাম বলব—সবারই কঠিন অসুখ। ঠিকমত ওষুধ না পড়লে লোকগুলো মরবে।'

হেমনাথ বললেন, 'ওষুধের একটা লিস্ট করে দিও। পরশু হিরণকে দিয়ে আনিয়ে দেব। কি রে হিরণ, পরশু একবার ঢাকা যেতে পারবি না?'

হিরণ কাছেই ছিল। বলল, 'পারব।'

'তাহলে এখন চলি।'

বিনুরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা ভেতর-বাড়ির উঠোন। পুবদুয়ারী ঘরটার ওধারে যে মস্ত উঠোনটা তার একধারে অন্ধকারে সেই ফিটনটা দাঁড়িয়ে আছে। লারমোর সেদিকে চলতে লাগলেন।

হেমনাথ যুগলকে ডেকে বললেন, 'একটা হারিকেন নিয়ে আয়।'

হারিকেন এলে সবাই ওধারের উঠোনের দিকে গেল। পেছনে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে স্নেহলতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'কাল থেকে কিন্তু এ বাড়িতে খাচ্ছেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে হাসতে হাসতে লারমোর বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'রান্নাবান্না করে ভাত-তরকারি যদি আবার ফেলতে হয় তা হলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে সাহেব।'

'আমি শিরশ্ছেদের জন্য প্রস্তুত মহারানী।'

এধারের উঠোনে এসে দেখা গেল, ফিটনের তলায় বুড়ো দুর্বল ঘোড়াটা নির্জীবের মতন দাঁড়িয়ে আছে। লারমোর ডাকলেন, 'গোপাল—এই গোপাল—'

ঘোড়াটা প্রথমে কান খাড়া করল, তারপর মুখ উঁচু করে চোখ মেলে তাকাল।

লারমোর বললেন, 'একটু কষ্ট করে চল দাদা। একেবারে বাড়ি গিয়েই ঘুমোস।'

ঘোড়াটা আস্তে আস্তে চোখ মেলে।

বিনু অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। ঘোড়ার যে আবার নাম থাকতে পারে, তার সঙ্গে কেউ যে কথা বলে, বিনুর কাছে এসব পরম বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। সে বলল, 'তোমার কথা ঘোড়াটা বুঝতে পারে লালমোহন দাদু?'

অন্যমনস্কর মতন লারমোর বললেন, 'পারে বৈকি। পনের ষোল বছর আমার কাছে রয়েছে, দুটো কথা বুঝতে পারবে না?' বলেই আবার ঘোড়াটার দিকে ফিরলেন, 'তোর নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে, দাঁড়া চাট্টি ছোলা দি।'

ফিটনের ভেতর থেকে ছোলাভর্তি একটা থলে বার করে এনে মুখের সামনে ধরলেন লারমোর। ঘোড়াটা মুখ ফিরিয়ে নিল, অর্থাৎ খাবার ইচ্ছে নেই।

লারমোর বললেন, 'আমার হাতে তুই তো আবার খাস না। চল্ কাদেরই তোকে খাওয়াবে'খন।' ছোলার থলেটা ফিটনের ভেতর রেখে ঘোড়াটাকে গাড়ির সঙ্গে জুতে চালকের জায়গায় গিয়ে বসলেন লারমোর।

হিরণ হঠাৎ বলে উঠল, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব লালমোহন দাদু। আমাদের বাড়ির সামনে একটু নামিয়ে দিয়ে যেও।'

লারমোর ডাকলেন, 'আয়—'

হিরণ ওপরে উঠে লারমোরের পাশে গিয়ে বসল।

হেমনাথ তলা থেকে বললেন, 'তোর রেকর্ড-টেকর্ড, গ্রামোফোন সব পড়ে রইল যে—'

হিরণ বলল, 'থাক। কাল এসে নিয়ে যাব।'

একটু পর ঝুমঝুম ঘুন্টি বাজিয়ে ফিটন চলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে বাগানের ঝুপসি অন্ধকারে লারমোররা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হিরণরা চলে গেলে বাইরের উঠোন থেকে ভেতর-বাড়ির দিকে ফিরে আসছিল সবাই। হঠাৎ ফিসফিসানির মতন একটা আওয়াজ শুনতে পেল বিনু, 'ছুটোবাবু—ছুটোবাবু—'

চমকে ডান ধারে তাকাতেই বিনু দেখতে পেল যুগল তার খুব কাছে ঘন হয়ে এসেছে। চোখাচোখি হতে গলা আরো নামিয়ে বলল, 'কাইল সুজনগঞ্জের হাটে আপনে আমার নায়ে যাইবেন।'

বিনু কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কাল হাটে যাবে নাকি?'

'নিয্যয়। বড় কত্তা হাটে গেলে তেনার লগে আমারে যাইতেই হয়। বড় কত্তায় তো লালমোহন সাহেবের নায়ে যাইব। আমি আরেকখান ছোট কোষা নায়ে যামু, আমার লগে আপনে যাইবেন।' একটু থেমে কি ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'বড় কত্তার লগে গেলে আপনেরে 'ছই'য়ের বাইরে বাইর হইতে দিব না, চুপচাপ বইসা থাকতে হইব। আমার লগে গেলে মেলা (অনেক) মজা পাইবেন।'

'ছই' কী, বিনু জানে না, উৎসাহিত হয়ে সে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গেই যাব যুগল।'

কথায় কথায় একসময় তারা ভেতর-বাড়িতে ফিরে এল।

এ-বাড়িতে ছোটবড় মিলিয়ে মোট আটখানা ঘর। পশ্চিমের ভিটের একখানা ঘরে সেই আশ্রিতা বিধবা দু'জন থাকে। যুগল আর করিম থাকে বাইরের দিকের দুটো ঘরে। শিবানী থাকেন দক্ষিণের

ভিটের একটা ঘরে। স্নেহলতা-হেমনাথের জন্য পুবদুয়ারী বড় ঘরখানা নির্দিষ্ট। বাকি ঘরগুলো এতকাল ফাঁকাই পড়ে থাকত। অবনীমোহনরা আসার পর একটা ঘর তাঁকে আর সুরমাকে দেওয়া হয়েছে, আরেকটা দেওয়া হয়েছে সুধা-সুনীতিকে। বিনু অবশ্য আলাদা ঘর পায় নি, হেমনাথ-স্নেহলতার ঘরখানাই দখল করে বসেছে, তাঁদের মাঝ-মধ্যিখানে শুয়ে ঘুমোয় সে।

কাল শুতে শুতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সকাল হলেই নৌকোয় করে সুজনগঞ্জের হাটে যাবে, সেই উত্তেজনায় বাকি রাতটুকু ভাল করে ঘুমোতে পারেনি বিনু। শিয়রের দিকে একটা জানলা, বার বার তার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে—কখন সকাল হয়, কখন সকাল হয়।

সারারাত চোখ টান টান করে থেকে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিনু, হেমনাথের ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল।

রগড়ে রগড়ে চোখ থেকে ঘুমের শেষ রেশটুকু মুছে বিনু যখন তাকাল তখন পুব আকাশে আলো আলো আভা ফুটেছে।

হেমনাথ বললেন, 'চল দাদা, মুখটুখ ধুয়ে সূর্যস্তবটা সেরে নিই।'

বিনুর মনে পড়ল, কাল হেমনাথ বলেছিলেন তাকে সূর্যস্তব শিখিয়ে দেবেন। তক্তপোশ থেকে নামতে গিয়ে সে দেখতে পেল স্নেহলতা বিছানায় নেই। কখন তাঁর ঘুম ভেঙেছে, কখন উঠে বেরিয়ে গেছেন, কে জানে।

বাইরে এসে বিনুরা মুখটুখ ধুয়ে নিল। তারপর উঠোনের একধারে দোলমঞ্চের কাছে গিয়ে পুবদিকে মুখ করে চোখ বুজে হাত জোড় করে দাঁড়াল। তারও পর হেমনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল, 'ওঁ জবাকুসুমং সঙ্কাশং—'

সূর্যমন্ত্র শেষ করে ফিরতেই দেখা গেল অবনীমোহন আর সুরমা উঠে পড়েছেন। উঠোনের একধারে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিলেন অবনীমোহন। চোখাচোখি হতে হেসে বললেন, 'দাদুর কাছে এসে বিনুবাবু দেখছি গুড বয় হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় তো আটটার আগে বিছানা ছাড়ত না, এখানে ভোর না হতেই ঘুম ভাঙছে। শুধু তাই নয়, সূর্যস্তবও আওড়ানো হচ্ছে।'

বিনু লজ্জা পেয়ে গেল। হেমনাথ কিছু না বলে হাসলেন।

দেখতে দেখতে যুগল, করিম, শিবানী, সুধা, সুনীতি—একে একে সবাই উঠে পড়ল।

এ বাড়িতে এতকাল চায়ের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ, অবনীমোহনরা আসার পর এই পর্বটা নতুন শুরু হয়েছে।

চিঁড়েভাজা, নারকেল কোরা আর ক্ষীরের নাড়ুর সঙ্গে চা খাওয়া যখন শেষ হয়েছে সেই সময় হই হই করতে করতে লারমোর এসে হাজির, 'হেম, অবনী, বিনুদাদা—সবাই রেডি তো?'

হেমনাথ বললেন, 'ঘোড়ায় একেবারে জিন দিয়ে এসেছ, দেখছি।'

'ঐ রকমই। সুজনগঞ্জ কি এখানে? সাত মাইল উজানে গেলে, তবে। যেতে কতক্ষণ লাগবে, খেয়াল আছে? নাও নাও, তাড়াতাড়ি উঠে পড়।'

স্নেহলতা এই সময় বলে উঠলেন, 'একটু চা খেয়ে যান।'

লারমোর আঁতকে ওঠার মতন করে বললেন, 'কি সর্বনাশ, আমি পি.সি.রায়ের ইনডাইরেক্ট শিষ্য।

আমাকে চা খাবার কথা বলছেন!'

অবনীমোহন বললেন, 'ইনডাইরেক্ট শিষ্য কিরকম?'

লারমোর জানালেন, 'চায়ের ব্যাপারে হেমনাথ পি.সি.রায়ের সাক্ষাৎ শিষ্য। আমি আবার হেমনাথের শিষ্য। ইনডাইরেক্ট হলাম না?'

লারমোরকে চা খাওয়ানো গেল না, বসানোও না। চিঁড়েভাজা, ক্ষীরের নাড়ু খাবার কথা বলতে খানিক চঞ্চল হলেন তিনি। তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দিন, এখন খাব না। সঙ্গে নিচ্ছি। রাস্তায় যেতে যেতে খাব।'

স্নেহলতা বেতের ডালা বোঝাই করে চিঁড়েভাজা আর নাড়ু দিলেন। লারমোর সেগুলো ঢেলে ফতুয়ার পকেট ভর্তি করে নিতে নিতে তাড়া লাগালেন, 'চল হেম, চল—'

হেমনাথ, অবনী, বিনু—যারা যারা হাটে যাবে উঠোনে নেমে এল।

এই সময় স্নেহলতা স্বামীর উদ্দেশে বললেন, 'হাটে তো চললে, কী কী আনতে হবে মনে আছে?'

হেমনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে। একটা কোষা নৌকো, একজোড়া হালের বলদ, আনাজ, মসলাপাতি—এই তো?'

স্নেহলতা বললেন, 'উঁহু, আরো আছে। এই মাসে নিত্য দাসের মেয়ের সাধ, তার জন্য একখানা শাড়ি আনবে। ঠাকুরঝির কাপড় নেই, দু'জোড়া থান কিনতে হবে। দুর্গাপুজো সামনে, নারকেল আট দশ গন্ডা এনো—'

তালিকা শেষ হবার আগেই হেমনাথ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'যুগল—যুগল—'

যুগল কাছেপিঠে কোথাও ছিল, ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। হেমনাথ বললেন, 'তোর ঠাকুমা কী কী বলে শুনে নে। হাটে গিয়ে মনে করে কিনবি, একটা যদি ভুল হয়ে যায় আস্ত রাখব না।'

স্নেহলতা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, 'দেখ, দেখ তোমরা। সংসারটা কার আর কাকে মনে করে জিনিস কিনতে হবে?' বলে স্বামীর দিকে ফিরে মধুর ভ্রূভঙ্গ করলেন।

হেমনাথ রেগে উঠলেন, 'কেন, যুগল এ সংসারের কেউ নয়? ক'টা জিনিসের কথা মনে করে রাখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?' বলে আগুন হয়ে যুগলের দিকে ফিরলেন, 'কি রে হারামজাদা, বল তুই কোন সংসারের লোক?'

যুগল উত্তর দিল না। মুখ নিচু করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উঠোনের মাটি তুলতে লাগল। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, হেমনাথের এ জাতীয় রাগটাগ তার কাছে নতুন নয়, বরং এতেই চিরদিন অভ্যস্ত সে।

বিনুর কেন যেন সন্দেহ হল, মুখ নামিয়ে যুগল হাসছে। মাথা হেলিয়ে একবার যুগলের মুখটা দেখতে চেষ্টা করল সে। হেমনাথের রাগ যুগলের কাছে হয়তো ভয় বা দুশ্চিন্তার ব্যাপার নয়, রীতিমত মজাদার ঘটনা।

হেমনাথ আরো উত্তেজিত হতে যাচ্ছিলেন, লারমোর মাঝখান থেকে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এই সকালবেলা আর তোমাকে চেঁচামেচি করতে হবে না হেম। আমিই সব মনে করে রাখছি। বলুন গো বৌ-ঠাকরুন, হাট থেকে কী আনতে হবে—' বলতে বলতে স্নেহলতার দিকে তাকালেন।

স্নেহলতা মুখ বাঁকিয়েই ছিলেন। বললেন, 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে। খোঁড়ার সাহায্যে ল্যাংড়া এগিয়ে এলেন। ভুলে টুলে গিয়েও ও তবু কিছু আনত, আপনাকে বললে কিছু আর এসে পৌঁছবে না।'

'তা যা বলেছেন—'লারমোর হাসতে লাগলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'যা বলবার যুগলকেই আমি বলে দিচ্ছি।'

হাটের ফর্দ শুনে নিয়ে যুগল ফিসফিস করে বিনুকে বলল, 'দেখলেন তো ছুটোবাবু, বড়কত্তায় হাটে গেলে আমারে লগে যাইতেই হয়।'

একটু পর হেমনাথদের পিছু পিছু বিনু পুকুরঘাটে চলে এল। ঘাটের পাড়ে দুটো নৌকো লগির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। একটা নৌকা বেশ বড় সড়, লম্বা ধাঁচের। মাঝখানে কাঁচা বাঁশের গোল ছাউনি। যুগল যে 'ছই'-এর কথা কাল বলেছিল, খুব সম্ভব ওটা তাই। গলুইর কাছে পাটাতনের ওপর দুটো মাঝি বসে আছে। এই নৌকোটা বোধহয় লারমোর নিয়ে এসেছেন। অন্য নৌকাটা বিনুর চেনা, তাতে গলুই বা ছাউনি কিছুই নেই, তেমন লম্বাও না, অনেকটা গোল ধরনের। প্রায় সারা দিনই এ নৌকোটা এই ঘাটে বাঁধা থাকে।

ছাউনিহীন নৌকোটায় এক লাফে উঠে পড়ল যুগল, তারপর চোখের ইশারায় বিনুকে উঠতে বলল।

এদিকে লারমোর, হেমনাথ আর অবনীমোহন দ্বিতীয় নৌকোটায় উঠে পড়েছেন। হেমনাথ বিনুকে ডাকলেন, 'আয় দাদা—'

বিনু বলল, 'আমি যুগলের নৌকোয় যাব।'

'না-না, ও বাঁদরের সঙ্গে যেতে হবে না। চারদিকে অথৈ জল, শেষে বিপদ আপদ ঘটে যাবে। ওটার আবার হুঁশটুশ কম।'

বিনু কিন্তু শুনল না। কেঁদে টেদে জেদ ধরে যুগলের নৌকোতেই উঠল। অগত্যা হেমনাথ যুগলকে সতর্ক করে দিলেন, 'সাবধানমতো দাদাভাইকে নিয়ে যাবি।'

'আইচ্ছা—'যুগল ঘাড় কাত করে বলল, 'আপনে ভাইবেন না।'

একসময় বাঁধন খুলে নৌকো চলতে শুরু করল। হেমনাথদের নৌকোটা আগে আগে চলছে, বিনুদেরটা পেছনে।

দু'জন মাঝি হেমনাথদের নৌকো বাইছে, চোখের পলকে পুকুর পেরিয়ে সেটা ধানখেতের ভেতর ঢুকে গেল। বিনুদের নৌকোটা এখনও মাঝপুকুরেই রয়েছে। হঠাৎ ঝুমঝুম ঘন্টির আওয়াজে যুগল এবং বিনু পেছন ফিরে তাকাল। দেখা গেল, বাগানের গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে ঝিনুকদের সেই চমৎকার ঝকঝকে ফিটনটা বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। গাড়ির জানালায় ভবতোষ আর ঝিনুকের মুখও দেখতে পাওয়া গেল।

যুগল বলল, 'বড় কত্তায় তো বাইর হইল, ওদিকে ঝিনুক দিদিরা আইছে—'

সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, রুপোর কাজললতার মতন চোখ, গোলগাল জাপানি পুতুলের মতন মেয়েটা আবার এসেছে। বিনু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।
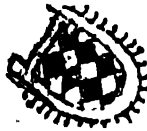
খুব বেশিক্ষণ ঝিনুকের কথা বিনুর মনে থাকল না।

জীবনে এই তার প্রথম নৌকোয় ওঠা। ব্যাপারটা খুবই লোভনীয়, এর জন্য কাল সমস্ত রাত উত্তেজনায় ঘুমোতে পারে নি। কিন্তু নৌকোয় উঠবার পর দেখা গেল, জলের ওপর সেটা ভীষণ দুলছে। ফলে মজার বদলে ভয় করতে লাগল বিনুর। মনে হল এই বুঝি পড়ে যায়, এই বুঝি পড়ে যায়। প্রাণপণে দু হাতে পাটাতনের কাঠ চেপে ধরল সে।

লগি বাইতে বাইতে যুগল লক্ষ করেছিল। বলল, 'ডর নি লাগে ছুটোবাবু ?'

অন্য সময় হাজার ভয় পেলেও মুখ ফুটে বলত না বিনু। আর যার কাছেই হোক, যুগলের কাছে ভয়ের কথা বলতে মাথা কাটা যেত। কিন্তু জীবনে এই প্রথম টলমলে নৌকোয় উঠে বীরত্বের একটি

কণাও নিজের ভেতর খুঁজে পেল না সে। কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ। নৌকোটা বড্ড দুলছে।'

'ডর নাই। পথ্থম পথ্থম ঐরকম মনে হইব। দুই চাইর দিন নায়ে চড়েন, ঠিক হইয়া যাইব।'

যুগল আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু খুব একটা ভরসা বিনু পেয়েছে বলে মনে হয় না। বরং পাটাতন আরো জোরে আঁকড়ে ধরল।

কিন্তু ভয়ের ভাবটাও বিনুকে বেশিক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখতে পারল না। কেননা, যেদিকে যতদূর চোখ যায়, শরৎকাল তার সবটুকু মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে নীল নয়নের চকিত চাহনির মতন আশ্বিনের আকাশ। মেঘ ছাড়া ওখানে পাখিও আছে—চেনা অচেনা কত যে পাখি! আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাখি আর মেঘেরা বাতাসে গা ভাসিয়ে রেখেছে।

নিচে শুধু জল আর ধানের খেত। মাঝে মাঝে নলখাগড়া, জলঘাসের বন, ঝাড়ওলা ধঞ্চে আর কালো মুত্রার ঝোপ। আর আছে বউন্যা গাছ, কাউফলের গাছ, লাল ফুলে-ভরা মান্দার গাছ। আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমেছে, সারি সারি তালগাছ সেখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। জলঘাসের মাথায়, মুত্রাঝোপে এই সকালবেলায় রাশি রাশি ফড়িং উড়ছে—নানা রঙের চিত্রবিচিত্র ফড়িং। তাদের ধরবার জন্য এসেছে ছোট ছোট বগাই পাখি।

ইতিমধ্যে রোদ উঠে গিয়েছিল। তরল সোনার মতন আলোয় চারদিক ভরে গেছে। এই আশ্বিনে জল যেন চকমকে আরশি, তাতে বউন্যাগাছের ছায়া, কাউফল গাছের ছায়া, নলখাগড়ার ছায়া কাঁপছে।

কলকাতা থেকে এতদূরে এই জল-বাংলায় শরৎকালটা বুঝিবা এক আশ্চর্য জাদুকর। ঝাঁপির ভেতর থেকে একের পর এক বিস্ময় বার করে খুব দ্রুত বিনুকে জয় করে নিতে লাগল সে।

কখন মস্ত পুকুরটা পেরিয়ে এসেছিল, বিনুর মনে নেই। নৌকোর তলায় এবং দু'ধারে সরসর আওয়াজে এক সময় চমকে উঠল সে। দেখল, তারা ধানখেতের ভেতরে এসে পড়েছে।

সমানে লগি ঠেলছিল যুগল। নিবিড় ধানবন দু'ধারে সরে সরে নৌকোটাকে পথ করে দিচ্ছে।

ধানগাছ কি আর দেখে নি বিনু? অনেক বার দেখেছে। বাসে করে বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার যাবার সময় রাস্তার দু'পাশে অবারিত ধানের খেত চোখে পড়েছে। কিন্তু সে তো দূরে থেকে দেখা। এত কাছে বসে দেখার কথা আগে কখনও কল্পনাই করে নি বিনু।

বিনুর ইচ্ছে হল, ঘন সবুজ ধানপাতাগুলোকে একবার ছুঁয়ে দেখে। হাতও বাড়িয়েছিল সে, কিন্তু ধরবার আগেই যুগল চেঁচিয়ে উঠল, 'ধইরেন না ছুটোবাবু, ধইরেন না—'

চকিত বিনু তক্ষুণি হাতটা সরিয়ে আনল। বলল, 'কেন?'

'ধরলেই হাত কাইটা যাইব, ধানের পাতায় জবর ধার।'

বিনু আর কিছু না বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকল।

বাড়ি থেকে মনে হয়েছিল, ধানের খেত একটানা দিগন্ত পর্যন্ত বুঝি ছুটে গেছে। কিন্তু তা না, খানিক দূর যাবার পর দেখা গেল ধানবন শেষ। তারপর শুধু জল আর জল। কাচের মতন স্বচ্ছ টলটলে জল পারাপারহীন সমুদ্র হয়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে আছে। আশ্বিনের এলোমেলো অস্থির বাতাস তার ওপর অবিরাম ছোট ছোট ঢেউ তুলে যাচ্ছে। ঢেউ ছাড়া এখানে যা আছে তা রাশি রাশি শাপলা ফুল, আর আছে বড় বড় পদ্মপাতা, ফাঁকে ফাঁকে থোকা থোকা কচুরিপানা। কচুরিপানার মাথায় মুকুটের মতন সজীব নীলাভ ফুল। ফুলে ফুলে এই দূরবিস্তৃত জলরাশি ছেয়ে আছে।

যুগল লগি ছেড়ে এখন বৈঠা বাইছে। নৌকোর তলায় ছপ ছপ করে একটানা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বিনুর বড় লোভ হল দুটো শাপলা তুলে নেয়। হাত বাড়াতে গিয়ে এবারও বাধা পড়ল। যুগল চেঁচিয়ে উঠল, 'ধুইরেন না ছুটোবাবু, ধুইরেন না। শাপলার লতা টানতে গেলে পইড়া যাইবেন, এখানে কিন্দাম আথাই (অথৈ) জল। আপনে তো আবার সাতর জানেন না।' একটু থেমে আবার বলল,

'আমিই তুইল্যা দিতে আছি।'

নৌকো বাইতে বাইতে টপাটপ অনেকগুলো শাপলা তুলে বিনুর দিকে ছু'ড়ে দিল যুগল।

কিন্তু নিজে তুলতে না পারলে সুখ কোথায় ? বিরস মুখে চুপচাপ বসে থাকল বিনু।

যুগল বলল, 'পদ্মফুল নিবেন ছুটোকত্তা ?'

ভারী গলায় বিনু বলল, 'না।'

'শালুক ?'

'না।'

'কচুরি ফুল ?'

'না।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর আর ক্রমাগত 'না' 'না' শুনে বিনুর মনোভাব খানিক যেন আন্দাজ করতে পারল যুগল। চিন্তিত মুখে বলল,'গুসা নি হইছেন ছুটোবাবু ?'

বিনু চুপ।

এবার একেবারে উদার হয়ে গেল যুগল। বরদানের ভঙ্গিতে বলল, 'আইচ্ছা তোলেন দুই চাইরটা, তয় (তবে) বেশি ঝুইকেন না।'

বলামাত্র পদ্ম শাপলা এবং কচুরি ফুলে নৌকো বোঝাই করে ফেলল বিনু।

যুগল বলল, 'এইবার খুশি তো ?'

বিনুর মুখে হাসি ফুটল। কিছু বলল না সে।

জলজ ফুলের বনে আরো কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ এক জায়গায় এসে নৌকো থামিয়ে দিল যুগল।

অবাক হয়ে বিনু শুধালো, 'কী হল ?'

সামনে দিকে আঙুল বাড়িয়ে চাপা গলায় যুগল বলল, 'ঐ দ্যাখেন ছুটোকত্তা—' তার স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলার মতন টান টান হয়ে গেছে। দৃষ্টি পলকহীন, প্রখর। সর্বাঙ্গ ঘিরে বিচিত্র এক সংকেত ফুটে বেরিয়েছে যেন।

যুগলের আঙুল যেদিকে, সেদিকে তাকিয়ে বিনু দেখতে পেল বড় একটা পদ্মপাতার কাছে তামাটে রঙের অসংখ্য মাছের ছানা কিলবিল করছে। বিনু শুধলো, 'কী ওগুলো ?'

'চিনতে পারলেন না ?'

'না।'

যুগল বলল, 'হেই তো, আপনে চিনবেন ক্যামনে ? আপনে কইলকাতার মানুষ। ঐগুলি শৈলের (শোলমাছের) পোনা।'

বিনু বলল, 'শোলের পোনা তো বুঝলাম, নৌকো থামালে কেন ?'

'দ্যাখেন না কী বাহারের মজা হয়—' রহস্যময় হেসে পাটাতনের তলা থেকে দশ বার হাত লম্বা একটা সরু বাঁশের টুকরো বার করল যুগল, সেটার মাথায় অনেকগুলো ধারাল লোহার ফলা আটকানো।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী ?'

'ট্যাটা।'

'কী হবে এটা দিয়ে ?

'ইট্টু সবুর করেন ছুটোবাবু, নিজের চৌখেই দেখতে পাইবেন।' বলতে বলতে পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়াল যুগল, হাতে সেই তীক্ষ্ণমুখ অস্ত্রটা।

নৌকোটা থেমে গিয়েছিল ঠিকই, তবে স্থির হয়ে নেই। হাওয়ার টানে জলের ওপর সেটা দুলছিল। ট্যাটাটা বাগিয়ে ধরে নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তামারঙের শোলের ছানাগুলোর দিকে তাকিয়ে কী দেখল যুগল, তারপর শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ট্যাটাটা ছুঁড়ে দিল।

জলের তলায় কী ঘটল, বিনু বুঝতে পারল না। তবে চারদিক তোলপাড় করে প্রকাণ্ড দানবের মতন কি যেন একটা সমানে আছাড়-খেতে লাগল। তার ফল হল এই, অনেকখানি জায়গা জুড়ে পদ্ম আর শাপলার বন ভেঙেচুরে ছিঁড়ে খুঁড়ে একেবারে তছনছ। আর যুগলের সেই ট্যাটার বাঁশটা একবার জলের তলায় ডুবতে লাগল, আবার ওপরে ভেসে উঠতে লাগল। ডোবা আর ভাসা চলল অনেকক্ষণ ধরে।

এদিকে খুশিতে দু হাত ওপরে তুলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে যুগল, 'পড়ছে, পড়ছে। শালার শৈল (শোল) যাইবা কই ?'

কিছুক্ষণ পর পদ্মবন শান্ত হয়ে এল। ট্যাটার বাঁশটা এখন জলের ওপর অল্প অল্প কাঁপছে। শোলের সেই পোনাগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বৈঠা বেয়ে নৌকোটাকে ট্যাটার কাছে নিয়ে এল যুগল। জল থেকে অস্ত্রটা যখন ওপরে টেনে তুলল, দেখা গেল, সেটার ধারাল ফলায় আড়াই হাতের মতন লম্বা একটা শোল মাছ বিঁধে আছে।

ক্ষিপ্র হাতে ট্যাটার মুখ থেকে মাছটা খুলে নিয়ে পাটাতনের তলায় ঢুকিয়ে দিল যুগল। তারপর ফলাগুলো ধুয়ে ট্যাটাটা মাছের পাশে রাখতে রাখতে বলল, 'বুঝলেন নি ছুটোবাবু—'

'কী বলছ ?' তক্ষুণি সাড়া দিল বিনু।

'বষ্যাকালে শৈলমাছে পোনা ছাড়ে। যত দিন না পোনাগুলান ডাঙ্গর (বড়) হয়, নিজে নিজে ঘুইরা ফিরা খাইতে শিখে ততদিন মা-মাছটা তাগো লগে লগে থাইকা পাহারা দ্যায়।'

'তাই নাকি ?'

'হ।' যুগল মাথা নাড়ল, 'ইট্টু আগে যে পোনাগুলো দেখছেন, এই মাছটা তাগো মা।'

বিনু হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল, বিমর্ষও। বলল, 'মাছটাকে তো মেরে ফেললে, ওর বাচ্চাগুলোর এখন কী হবে ?'

'কি আবার হইব, অন্য মাছে ওগো খাইয়া ফালাইব।'

'ইস !' বিনুর চোখেমুখে কষ্টের রেখা ফুটল।

'ছুটোবাবুর শরীলে বড় দয়ামায়া—' যুগল হেসে ফেললে, 'বাচ্চার কথা ভাইবা যদি মাছ না মারি, আমরাই বা খামু কী? এই লইয়া মন খারাপ কইরা থাইকেন না ছুটোবাবু, পিথীমিতে একজনেরে না মারলে আরেকজন বাচে না।'

তবু বিনুর মন ভরাক্রান্ত হয়ে থাকল।

ইতিমধ্যে যুগল আবার নৌকো বাইতে শুরু করেছে। অনেকখানি যাবার পর সে ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু তাকাল।

যুগল বলল, 'এই মাছটা লইয়া অখন কী করি ক'ন দেখি। অখন তো হপায় (সবে) সকাল, হাট সাইরা ফিরতে ফিরতে রাইত দুফার হইয়া যাইব। ততক্ষণে মাছ যাইব পইচা।' তাকে বেশ চিন্তিত দেখাল।

সত্যিই তো, মাছটা নিয়ে এখন কী করা উচিত বিনুও ভেবে পেল না।

হঠাৎ সমস্যাটার যেন কিনারা করে ফেলেছে এমনভাবে যুগল বলে উঠল, 'হইছে ছুটোবাবু, হইছে—'

'কী হয়েছে ?' বিনু জিজ্ঞেস করল।

'পথে আমার এক কুটুমবাড়ি পড়ব। আমার পিসাত (পিসতুতো) বইনের হউর (শ্বশুর) বাড়ি। ভাবতে আছি, মাছটা সেইখানে দিয়া যামু। শুধাশুধি পচাইয়া লাভ কী ?'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'হাটে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে না ?' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়তে সামনের দিকে

তাকাল বিনু।

খানিক আগেও হেমনাথদের নৌকাটা তাদের সামনে শ'খানেক গজের ভেতর ছিল। এখন অনেক দূর চলে গেছে, এখান থেকে শুধু বিন্দুর মতন দেখাচ্ছে সেটা। বিনু চঞ্চল হল, 'দাদুদের নৌকো কোথায় চলে গেছে দেখ—'

চোখের কাছে হাত এনে যুগল একবার দেখে নিল। তারপর হেসে বলল, 'যাউক না, হাটের পথ কি আমি চিনি না? কুটুমবাড়ি থনে (থেকে) বাইর হইয়া একখান বাদাম খাটাইয়া দিমু, বড় কত্তাগো আগে হাটে পৌছাইয়া যামু।'

বিনু চুপ করে রইল। তার মুখচোখ দেখে মনে হল না, যুগলের কথায় খুব একটা ভরসা পেয়েছে।

আশ্বিনের সূর্য পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। রোদে আর কোমল সোনালি আভা নেই, স্নিগ্ধতা মুছে গিয়ে তাতে ঝকঝকে ধারাল রং লেগেছে। যতদূর তাকানো যায়, ছোট ছোট ঢেউ-এর মাথায় ঝকমকানি নেচে বেড়াচ্ছে। সেদিকে বেশিক্ষণ কেউ চোখ পেতে রাখবে, সাধ্য কী।

বৈঠা টানতে টানতে যুগল বলল, 'ছুটোবাবু আমার মনে একখান সাধ হইছে।'

'কী?' বিনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আপনেরে একখান গীত শুনামু।'

'গান শোনাতে চাইছ?'

'হ।'

সেদিন গানের কথা বলছিল বটে যুগল। সারি-জারি-রয়ানি-ভাটিয়ালি, হেন গান নাকি নেই যা সে জানে না। বিনু বলল, 'বেশ তো, গাও না—'

বৈঠাটা নৌকার ওপর তুলে বাঁ হাতে বাঁ কানখানা চেপে ডান হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে গান ধরল যুগলঃ

'ও ভাইটাল গাঙ্গের নাইয়া,
ময়ূরপঙ্খী নাও রে বাইয়া
কুন্ বা দ্যাশে যাও।
এই ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা,
আমার একখান কথা লও।
এ তো নদীর উজান বাকে
সোনার বালুচর।
সেইখানেতে আছে আমার
পরান বন্দুর ঘর।
কইও খবর বন্দুর কাছে,
জলছাড়া মীন কয়দিন বাচে,
বাচে রে এ-এ-এ—
এই কথাটি না যদি কও,
আমার মাথা খাও।
ও ভাইটাল গাঙ্গের নাইয়া,
নাইয়া রে-এ-এ-এ—'

বেশ সুরেলা ভরাট গলা যুগলের। চারদিকের পদ্ম আর শাপলা বন, কচুরি ফুলের বেগুনি শোভা, ঝকঝকে নীলাকাশ, তার গায়ে থোকা থোকা সাদা মেঘ, দিগদিগন্তে ছুটে-যাওয়া আশ্বিনের অথৈ জলরাশি,

উড়ন্ত পাখির ছায়া—পূর্ব বাংলার এই সজল শ্যামল ভুবনটির সঙ্গে যুগলের গানের আশ্চর্য মিল রয়েছে। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু।

গান শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার রেশ এখনও জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁপছে। যুগল সাগ্রহে শুধলো, 'গান ক্যামন শুনলেন ছুটোবাবু ?'

বিনু মুগ্ধ হয়েই ছিল। বলল, 'খুব ভাল।'

'দেখলেন তো আপনেগো যুগইলা হেই দিন মিছা কয় নাই। এমুন গান আমার মেলা জানা আছে। আপনেরে শিখাইয়া দিমু ছুটোবাবু, যা যা জানি বেবাক শিখাইয়া দিমু।' বলে আবার বৈঠা জলে নামাল যুগল।

সীমাহীন এই শাপলা-পদ্মের বনে বসে যেদিকেই তাকানো যায়, শুধু জল। দূরে ধানের খেত, আরো দূরে নীলাভ বনরেখা। এর ভেতর কোথাও লোকালয় থাকতে পারে, তা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু আছে, মাঝে মাঝে দু'-চারখানা কৃষাণগ্রাম দ্বীপের মতন মাথা তুলে রয়েছে।

কোণাকুণি দক্ষিণে পাড়ি দিয়ে একটা গ্রামে এসে পড়ল যুগলরা। গ্রাম আর কি, বিশ পঁচিশখানা টিনের বাড়ি এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।

যুগল যে বাড়িতে এনে নৌকো থামাল সেটা অদ্ভুত। এমন বাড়ি আগে আর কখনও দেখে নি বিনু। উঁচু ভিতের ওপর মোট খানচারেক ঘর। উঠোন বলতে কিছু নেই—ঘর ছাড়া বাদ বাকি সব দু'তিন হাত জলের তলায় ডুবে আছে। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য উঠোনের ওপর দিয়ে সাঁকো পাতা।

এই সকালবেলা দু'তিনটে কালো কালো আধ-ন্যাংটো ছেলেমেয়ে সাঁকোর ওপর বসে বঁড়শি বাইছিল। উঠোনের জলে পুঁটি আর বাঁশপাতা মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বঁড়শিতে ভাত গেঁথে ফেলার শুধু অপেক্ষা—সঙ্গে সঙ্গে মাছ এক হ্যাঁচকা টানে জলতল থেকে উঠে আসছে।

যুগল নৌকো ভেড়ানোমাত্র ছেলেমেয়েগুলো চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'যুগলামামায় আইছে, যুগলামামায় আইছে—'

নৌকোটাকে সাঁকোর বাঁশে বাঁধতে বাঁধতে যুগল বলল, 'তগো বাপে কই ?'

সবাই সমস্বরে উত্তর দিল, 'বাড়িত্ নাই।'

'মা ?'

ছেলেমেয়েগুলো চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'মা, দেইখা যাও ক্যাঠা আইছে—'

একটু পর সামনের একখানা ঘর থেকে মাঝবয়সী একটি মেয়েমানুষ বেরিয়ে এল। তেলহীন রুক্ষ চুল তার। এই আশ্বিনেও গা-ভর্তি ঘামাচি, ফলে চামড়া খসখসে, খই-ওড়া। গাল ভাঙা, চোখের কোল বসে গেছে, রংটি এক সময় মাজা মাজাই হয়তো ছিল। পরনে ময়লা ডুরে শাড়ি ছাড়া কিছুই নেই। এসব সত্ত্বেও তাকে ঘিরে নিভু-নিভু একটু লাবণ্য এখনও টিকে আছে।

মেয়েমানুষটার দু'ধারে লম্বা লাউয়ের মতন স্তন চুষতে চুষতে দুটো তিন-চার বছরের ন্যাংটো বাচ্চা ঝুলছিল। দেখে মনে হল, সবসময় ওরা ঐভাবেই ঝোলে। সাঁকোর ওপর উঠে এসে মেয়েমানুষটি বলল, 'আ রে যুগলা পোড়াকপাইলা, রোজাই নি আমাগো বাড়িত আসস!' বলে একমুখ হাসল।

বিব্রত যুগল তাড়াতাড়ি পাটাতনের তলা থেকে শোলমাছ বার করে বলল, 'আইতে আইতে এই মাছটা মারলাম, ভাবলাম তগো দিয়া যাই।'

হাত বাড়িয়ে মাছটা নিতে নিতে মেয়েমানুষটি বলল, 'রোজই দেখি মাছ মাইরা দিয়া যাইতে আছস।'

যুগল হাত কচলাতে কচলাতে বলতে লাগল, 'ভাইগনা -ভাগনীগো মাছ খাওয়াইতে বুঝিন সাধ যায় না আমার?'

চোখের তারা নাচিয়ে, ঠোঁট উলটে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করল মেয়েমানুষটি, 'আহা লো সোনো লো, ভাইগনা-ভাগনীগো লেইগা বুকের ভিতর একেরে ফাত ফাত করে। আসলে কারে মাছ খাওয়াইতে আসো, হে কি বুঝি না?'

যুগলের মুখচোখের চেহারা এই মুহূর্তে অবর্ণনীয়। ঘাড় ভেঙে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। জড়সড় হয়ে সে বলতে লাগল, 'কারে আবার খাওয়াইতে আনি?'

'কমু?'

মাথা আরো নুয়ে পড়েছে। আধফোটা গলায় যুগল কী বলল, বোঝা-গেল না।

মেয়েমানুষটি এ ব্যাপারে আবার কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখমুখ কুঁচকে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'খাইল, রাইক্ষইসা গুষ্টি আমারে চাইটা চাইটা শ্যাষ করল। যা মড়ারা, যা—' বলে যে ছেলেদুটো ঝুলে ঝুলে স্তন চুষছিল, তাদের ঝেড়ে ফেলার মতন করে ঠেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা গিয়ে পড়ল উঠোনের জলে।

বিনু নৌকোর মাঝখানে বসে ছিল, ভয়ে চোখ বুজে ফেলল, বুকটা খুব জোরে ঢিব ঢিব করতে লাগল। উঠোনে জল তো কম না, প্রায় এক মানুষের মতন। ছেলেদুটো যদি ডুবে যায়!

একটু পর ভয়ে ভয়ে চোখের পাতা অল্প ফাঁক করতেই বিনু অবাক। সেই ছেলেদুটো সাঁতরে ওপরে উঠে পড়েছে। সাঁকো বেয়ে তারা মায়ের কাছে চলে এল এবং আগের মতন স্তনে মুখ দিয়ে ঝুলতে লাগল।

এটুকুন ছেলে সাঁতার কাটতে পারে, নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না বিনু। এমন বিস্ময়কর দৃশ্য আগে কখনও দেখে নি, চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে থাকল। থাকতে থাকতে মনে পড়ল, এখনও সাঁতারটা শিখে উঠতে পারে নি। তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দেবার জন্য আজই যুগলকে ধরতে হবে।

মেয়েমানুষটি এবার আর ছেলেদের জলে ছুঁড়ে দিল না। বিরক্ত কটু গলায় গজগজ করতে লাগল, 'খা-খা, আমারে খাইয়া ঠান্ডা হ নিঃবইংশারা। প্যাটে যে কী কাল ধরছিলাম!'

ছেলেদুটোর ভ্রূক্ষেপ নেই। কুকুরছানার মতো চোঁ চোঁ করে তারা দুধ খেতে লাগল।

ছেলেদের ছেড়ে আবার যুগলকে নিয়ে পড়ল মেয়েমানুষটি, 'পোড়াকপাইলা যুগলা, আমারে চোখে তুই ধূল-পড়া দিবি? কই তা হইলে, নামখান কই। পাখিরে খাওয়াইতে আনস মাছ।'

যুগল বলতে লাগল, 'কী যে কইস টুনি বইন, কী যে কইস—'

মেয়েমানুষটির নাম জানা গেল—টুনি। এ-ই তবে যুগলের পিসতুতো বোন। বিনু অবশ্য আগেই তা আন্দাজ করেছিল।

টুনি বলল, 'অবিয়াত (অবিবাহিত) মাইয়ারে রোজ রোজ মাছ খাওয়ান ক্যান? আ রে ডাকরা, আ রে যুগলা, তর মনে কী আছে রে—' শরীর বাঁকিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল টুনি।

যুগলের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। যাইতে যাইতে সে বলল, 'এমুন কথা যদি কইস আমি আর আসুম না তগো বাড়িত।'

'আবি আবি (আসবি আসবি), ঠিকই আবি। না আইয়া কি পারবি সোনা?'

'ক্যান, পারুম না ক্যান?'

'পাখি যে তরে গুণ করছে।'

'হ, তরে কইছে!'

টুনি আগের মতন হাসতে লাগল, কিছু বলল না।

পাখি কার নাম, কেমন করে সে যুগলকে গুণ করেছে, বুঝতে পারছিল না বিনু।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার চলছিল। যুগল ঘামছিল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল—সবই ঠিক। তারই ভেতর চোরা চোখে এদিক সেদিক তাকিয়ে ব্যাকুলভাবে কাকে যেন খুঁজছিল।

তার এই আড়ে আড়ে তাকানোটা লক্ষ করেছিল টুনি। রঙ্গ করে বলল, 'টালুমালু কইরা চাইর দিকে দ্যাখস কী?'

যুগল চমকে উঠল, 'কী আবার দেখি? কই, কিছু না—'

'কিছু না!'

'না-ই তো।'

'যারে বিচরাইতে আছস (খুঁজছিস) হ্যায় নাই। পাখি উড়াল দিছে।'

নিমেষে মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল যুগলের। আবছা গলায় সে বলল, 'তার লেইগাই য্যান আইছি!'

টুনি চোখ টিপল, 'বুঝছি রে ছ্যামরা, বুঝছি। পাখি গেছে গা শুইনা মুখখান কালা হইয়া গেল।'

'কালা হইছে! তরে কইছে।' যুগল হাসতে চেষ্টা করল।

টুনি আবার কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। খানিক অবাক হয়ে সে বলল, 'পোলাটা কে রে যুগলা? ক্যামন ফুটফুইটা!

কালো কালো যে ছেলেগুলো সাঁকোর ওপর বসে পা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বঁড়শি বাইছিল তাদের ভেতর থেকে একজন বলল, 'কী ধলা (ফর্সা), এক্কেরে সাহেবগো লাখান।'

আরেকটা ছেলে বলল, 'পিরানটা (জামাটা) দেখছস বেঙ্গা, দুইখান জেব (পকেট) আছে।'

টুনি তাকে ফুটফুটে বলেছে, তার ছেলেরা বলেছে সাহেবের মতন। নিজের চেহারার এমন খোলাখুলি প্রশংসায় বিনু লজ্জা পেয়ে গেল। মুখ নামিয়ে সে নখ খুঁটতে লাগল।

যুগল বলল, 'উনি বাবুগো পোলা।'

টুনি শুধলো, 'কোন বাবুগো?'

'কইলকাতার বাবুগো। হ্যাম কত্তার নাতি।'

'হ্যাম কত্তার তো পোলামাইয়া নাই, তার আবার নাতি হইল কই থনে?'

'উনি হ্যাম কত্তার ভাগ্নীর পোলা।'

'কইলকাতায় থাকে বুঝি?'

'হ কইলাম তো।'

'আইছে কবে?'

'তিন চাইর দিন হইল।'

'একলাই আইছে?'

'না। ঐটুক মাইন্সে একলা আইতে পারে?'

'তয়?'

'ওনার বাপ-মায়ের লগে আইছে।'

টুনির কৌতূহল অসীম। বলতে লাগল, 'বাপ-মাই খালি আইছে নিহি?'

যুগল মাথা নাড়ল, 'না। দু'গা বইনও আইছে।'

'থাকব কদ্দিন?'

'হে আমি কি জানি—'

'শোনস নাই ?'

'না।'

একটু কি ভেবে টুনি বলল, 'ঐ রে যুগল—'

যুগল তক্ষুণি সাড়া দিল, 'কী ?'

'বাবুগো পোলা নি আমাগো ঘরে আইসা বইব ?'

'অহন না।'

'তয় ?'

'আরেক দিন নিয়া আসুম।'

'আনিস কিলাম (কিন্তু), মাথা খাস।'

বিরক্ত সুরে যুগল বলল, 'আনুম তো কইলাম।'

টুনি বলল, 'ঘরে নাইকলের লাড়ু আছে, বাবুগো পোলারে নি দুইটা দিমু ?'

'না।'

আহত সুরে টুনি বলল, 'ক্যান রে ?'

যুগল বলল, 'কইলকাতার বাবুরা লাড়ু খায় না।'

টুনির মুখখানা হঠাৎ ভারি হয়ে গেল। বিষণ্ন গলায় সে বলল, 'তাইলে কী খাইতে দেই ক' দেখি—'

'অহন তরে কিছু দিতে হইব না।'

টুনির মুখচোখের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভারি মায়া হতে লাগল বিনুর। একবার ইচ্ছে হল নাড়ু চেয়ে খায়, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারল না।

ওদিকে টুনি আবার বলল, 'হ্যাম কত্তার নাতি পথম দিন আইল, কিছুই হাতে দিতে পারলাম না।'

'রসগুল্লা পানিতুয়া, আইনা রাখিস। আরেক দিন যখন নিয়া আসুম তখন ছুটোবাবুরে দিস।'

'আননের আগে আমারে খবর দিবি কিলাম।'

'দিমু।'

টুনির সব কথারই উত্তর দিচ্ছে যুগল, তবে কেমন যেন অন্যমনস্কের মতন। তার চোখদুটো খাঁচার পাখির মতন অনবরত দিগ্বিদিকে ছোটাছুটি করছে। বেশ বোঝা যায়, পিসতুতো বোন কিংবা তার মাগুর মাছের মতন কালো ছেলেমেয়েগুলোর জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব না যুগল। আসলে যার জন্য তার এ বাড়িতে আসা, তাকে এখনও খুব সম্ভব দেখতে পায় নি। ফলে ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

একটু ফাঁক পেয়ে যুগল বলল, 'অই লো টুনি বইন—'

'কী ?'

'জামাইরে যে দেখি না—'

'হাটে গেছে।'

'সুজনগুঞ্জের ?'

'হ।'

'তগো বাড়িটা বড় নিঝ্ঝুম টুনি বইন—'

ঠোঁটে ঠোঁট টিপে দুষ্টমির সুরে টুনি বলল, 'হ। বড় নিঝ্ঝুম।'

যুগল টুনির মুখভঙ্গি বা বলার ধরন লক্ষ্য করে নি। আপন মনে বলল, 'তর হউরে কই (তোর শ্বশুর কোথায়) ?'

'উত্তরের ভিটির ঘরে বইসা তামুক খাইতে আছে।'

'হাউরিরেও (শাশুড়িকেও) তো দেখি না।'

'হ্যায় বইছে পুবের ভিটির ঘরে।'

'করে কী?'

'কাইল রাইতে স্বর আইছিল, কাথা মুড়ি দিয়া শুইয়া শুইয়া কোকাইতে আছে (ককাচ্ছে)।'

'ইস—'

'কী হইল?'

'হাউরিরে ডাক্তর দেখাইছস?'

ঘাড় বাঁকিয়ে গালে একখানা হাত রাখল টুনি, 'অই রে কালামুইখা যুগলা, ক'স কী তুই?'

যুগল চকিত হল, 'কী কই?'

'একদিনের স্বরে ডাক্তর দেখামু, আমরা নি তেমুন বড় মানুষ! আমাগো নি তেমুন সুখের শরীল! স্বর আইছে, আবার যাইব গা। তার লেইগা ডাক্তর কিয়ের (কিসের)? ওমুধ কিয়ের? শুনালি একখান কথা যুগলা, বাপের জন্মে একখান কথা শুনলাম।'

যুগল বলল, 'কী এমুন কইলাম যা বাপের জন্মে শোনাস নাই?'

'তুই চুপ যা তো ছ্যামরা। মায়ের পোড়ে না, বাপের পোড়ে না, মাসির বুক স্বইলা যায়। আপন কেউ না, পিসাতো বইনের হাউরির লেইগা আমাগো ফুগলার পবান ফাত ফাত করে। অই রে যুগলা, অই রে ড্যাকরা—'

'কী?'

'হাউর-হাউরি থুইযা আসল কথাখান ক'। তর পরানে যা আছে ক'। যার বিহনে এই পুরী নিঝ্ঝাম তার কথা ক'।'

'কার বিহনে আবার এই পুরী নিঝ্ঝাম?'

'পরের মুখে নামখান শুনতে বুঝি মিঠা লাগে? তা হইলে কই—পাখি, পাখি, পাখি—'

যুগল বলল, 'আমার পিছনে যদি অমন কইরা লাগস তয় কিলাম যামু গা।'

কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুনি বলল, 'পাখি নাই, থাইকা আর কি করবি সোনা? আইজ বিহান বেলায় অর বাপের লগে গেছে গা।'

যুগলের মুখ আরো কালো হয়ে গেল। ভারী গলায় সে বলল, 'বার বার ঐ কথা কইলে সত্যসত্যই যামু গা, আর কুনোদিন আমু না।'

বলছে বটে, যাবার কোনো লক্ষণই কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এমন কি সাঁকোর বাঁশে নৌকোটা যে বেঁধে রেখেছিল যুগল, সেটা বাঁধাই আছে। দড়িটা পর্যন্ত খোলে নি।

এই সময় একটা ছেলে বলে উঠল, 'না গো যুগলমামা, পাখিপিসি যায় নাই। মায় তোমারে ভাটকি দিছে (মিথ্যে বলে ঠাট্টা করেছে)।'

খুব নির্লিপ্ত মুখে যুগল বলল, 'থাউক যাউক, হেয়াতে আমার কী?'

টুনি বলল, 'আ লো আবার সোনা লো, কিছু বুঝি হয় না তর? পাখি গেছে গা শুইনা তো বুকখানে ঢেকির পাড় পড়তে আছিল।' বলেই গলা চড়িয়ে ডাকতে লগল, 'পাখি—পাখি—পাখি—'

সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

টুনি আবার ডাকল, 'আ লো ছেমরি আয়, লাজসরম বন্যার জলে ভাসাইয়া আইসা পড়। পরানের বান্ধব তরে না দেইখা কিলাম এইবার মূচ্ছা যাইব।'

এবারও উত্তর মিলল না।

টুনি এবার তার এক ছেলেকে বলল, 'যা রে খোকা, পাখিপিসিরে ধইরা নিয়া আয়।'

সব চাইতে বড় ছেলেটা ছিপ-টিপ একধারে গুটিয়ে উত্তর দিকের উঁচু ঘরখানায় চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে বলল, 'পিসি আইব না।'

টুনি শুধলো, 'ক্যান, আইব না ক্যান?'

বেঙ্গা বলল, 'চাউলের মটকিগুলার (জালাগুলোর) পিছে পলাইয়া রইছে।'

টুনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আ লো ছেমেরি, আয় আয়। লাজে তো তুই গেলি!'

হাজার ডাকাডাকিতেও পাখি এল না।

অগত্যা হতাশ বিমর্ষ যুগল অনেকখানি গলা তুলে বলল, 'যাই গা টুনি বইন, যাই গা—' এবার সত্যি সত্যি নৌকোর বাঁধন খুলে ফেলল সে।

টুনি হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তে বলল, 'আরেটু জোরে চিল্লা যুগলা, যারে শুনাইতে চাস হ্যায় শোনে নাই।'

'কইলাম তো তরে, আর কাউরে শুনাইতে চাই না।'

টুনি হাসি থামিয়ে এবার অন্য কথা পাড়ল, 'অহন যাবি কই?'

'হাটে।'

'সুজনগুঞ্জে?'

'হ। হ্যাম কত্তায়, লালমোহন সাহেব আর এই ছুটোবাবুর বাবায় আরেক নায়ে আগেই গেছে গা। আমরা গিয়া তাগো ধরুম।'

'হাটে গেলে তোগো জামাইর লগে দেখা হইব।'

'হ।'

পাটাতনের তলা থেকে বৈঠাখানা বার করে বাইতে শুরু করল যুগল।

সাঁকোর ওপর থেকে টুনি আরেক বার বলল, 'বাবুগো পোলারে একদিন নিয়া আবি, নিষ্যস আনবি।'

'আনুম।'

টুনিদের উঠোন থেকে বেরিয়ে নৌকাটা বাইরের অথৈ অসীম জলপূর্ণ প্রান্তরে এসে পড়ল।

আস্তে আস্তে নৌকা বাইছে আর পেছন ফিরে ব্যাকুল হয়ে বার বার কী দেখছে যুগল। টুনিদের বাড়ি ছাড়িয়ে খুব বেশিদূর এখনও যায় নি, হঠাৎ যুগলের হাতের বৈঠা থেমে গেল। তার চোখের তারায় আলো নাচতে লাগল।

দ্রুত ঘুরে বসে টুনিদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাতছানি দিতে লাগল যুগল। তার হাতের দিকে লক্ষ করতেই বিনু দেখতে পেল, টুনিদের উত্তরের ভিটের ঘরখানার পেছনের দরজায় কোমরখানি ঈষৎ বাঁকিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চয়ই পাখি।

দরজার ফ্রেমের ভেতর প্রথমটা মনে হল ছবি। কত বয়েস হবে পাখির, ষোল-সতেরর বেশি না।

গায়ের রংখানি মাজা মাজা। চামড়া এত টানটান, মসৃণ এবং চকচকে যে মনে হয়, মেয়েটির সারা গায়ে প্রতিমার মতন ঘামতেল মাখানো। হাত-পায়ের শক্ত শক্ত গড়নের মধ্যে লাবণ্য যত, তার চাইতে ঢের বেশি বলশালিতা। ঘন পালকে-ঘেরা বড় বড় চোখ, তার মাঝখানে কুচকুচে কালো মণি দু'টো যেন ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। চোখ দু'টি সর্বক্ষণ যেন জগতের সব কিছুর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে আছে। মোটা ঠোঁট, সরু চিবুক, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঘের শুরু হয়ে পিঠের ওপর নিবিড় মেঘের মতন সেই চুল ছড়িয়ে আছে। ছোট হলেও নাকটিতে ধারাল টান আছে, তার বাঁ-ধারের পাটায় সবুজ পাথর বসানো নাকছাবি। হাতে লাল বালা আর এক গোছা রুপোর চুড়ি, কানে কুমারী মাকড়ি।

কাছাকাছি বসে সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল বিনু। আলাদা আলাদা করে দেখলে নাকে-মুখে হাতে-পায়ে হাজারটা খুঁত বার করা যাবে। কিন্তু সব মিলিয়ে তাকে ঘিরে কোথায় যেন অলৌকিকের একটুখানি ছোঁয়া আছে যা চোখ এবং মন একসঙ্গে জুড়িয়ে দেয়।

নীল ডোরা-দেওয়া হলুদ শাড়ি আর খাটো লাল জামা আঁটোসাঁটো করে পরা। মেয়েটির চোখেমুখে

বেশবাসে আশ্বিনের টমললে সোনালি রোদ এসে পড়েছে, ফলে তাকে এ জগতের মানবী মনে হয় না।

মেয়েটা যেখানে দাঁড়িয়ে তার ঠিক তলাতেই জল। নীলচে কাচের মতন স্বচ্ছ টলমলে জলের আরশিতে তার ছায়া কাঁপছে।

সমানে হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে যুগল আর মেয়েটাও তার একখানি হাত বুক পর্যন্ত তুলে নেড়ে নেড়ে ইশারায় না না করে যাচ্ছে। তার ঠোঁটে, চোখের তারায় সরল মধুর হাসির ছটা ঝিকমিক করছে।

যুগল হাত নেড়ে নেড়ে ডাকল, 'আসো—'

মেয়েটি বলল, 'না।'

'নাও নিয়া তোমার কাছে যামু?'

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখে নিল মেয়েটা। মুখচোখের চেহারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ব্যাকুলভাবে বলল, 'না—না—না, কেউ দেইখা ফেলব।'

যুগল বলল, 'দেখুক—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই সেই উঁচু দরজার ভেতর থেকে জলে ঝাঁপ দিল মেয়েটা। ঝপাং করে একটা শব্দ হল, জল ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বিনু দেখতে পেল, কখনও পানকৌড়ি মতন, কখনও লাল-হলুদ অলৌকিক একটা মাছের মতন পাখনা মেলে সাঁতার কাটতে কাটতে নিমেষে নৌকোর কাছে চলে এসেছে মেয়েটা।

যুগলের চোখে যে আলো খেলছিল সেটা চকমক করতে লাগল। মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আসো—'

হাত ধরে মেয়েটা নৌকোর ওপরে উঠে এল। যুগল বলল, 'ইস, এক্কেরে ভিজা গেলা। নাও লইয়া কাছে গেলে আর ভিজতে হইত না।'

মেয়েটি বলল, 'ভিজছি, বেশ করছি। আমার মন হইছে, তাই ভিজছি। নাও লইয়া গেলে কেউ দেইখা ফেলাইলে আমি গলায় দড়ি দিতাম।'

মেয়েটার শাড়ি থেকে, জামা থেকে, চুল থেকে জল ঝরে ঝরে নৌকোর পাটাতন ভেসে গেল। সে ব্যস্তভাবে বলতে লাগল, 'নাওটা এট্টু দূরে লইয়া যাও মাঝি।'

যুগলকে তা হলে 'মাঝি' বলে মেয়েটা। যুগল বলল, 'দূরে যামু ক্যান?'

'বাড়িত্ থনে এই জায়গাটা দেখা যায়।'

'দ্যাখনের ডর?'

'হ।'

'আমাগো কথা সগলে জানে।'

'জানুক, তুমি নাওখান দূরে লইয়া যাও। নাইলে-'

'নাইলে কী?'

'আমি কিলাম ফির বাড়িত্ যামু গা।'

'আইচ্ছা আইচ্ছা—'

চারধারে পদ্মবন, শাপলা আর শালুকের অরণ্য। নৌকো বেয়ে অনেকটা দূরে চলে এল যুগল। তারপর বলল, 'টুনি বইনে তখন অত কইরা ডাকল, আইলা না ক্যান?'

মেয়েটা বলল, 'আমার বুঝি সরম লাগে না?'

'থুইয়া দাও তোমারে সরম। আমি খুব গুসা হইছি।'

'শুদাশুদি গুসা হইও না মাঝি। আমি নি মাইয়া মানুষ, তোমাগো যা সাজে মাইয়া মাইনষের নি জ [illegible]!'

যুগল কি উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ বিনুর সম্বন্ধে সচেতন হল। এতক্ষণ বিনুর কথা বুঝি তার খেয়াল ছিল না। তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে দেখিয়ে সে বলে উঠল, 'ছুটোবাবু, এই হইল পাখি।'

মেয়েটা যে পাখি, আগেই তা আন্দাজ করেছিল বিনু। সে একদৃষ্টে পাখির দিকে তাকিয়ে থাকল।

যুগল এবার বিনুকে দেখিয়ে পাখিকে শুধলো, 'এনি কে, জানো?'

'জানি—' পাখি ঘাড় হেলিয়ে দিল।

'কে?'

'তুমি যে বাড়িতে থাকো হেই বাড়ির বাবুর নাতি। কইলকাতা থনে আইছে।'

'তুমি জানলা ক্যামনে?'

'উত্তরের ঘরের দরজার ফাক দিয়া দেখছি।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর গাঢ় গলায় পাখি ডাকল, 'মাঝি—'

'কও—' যুগল মুখ তুলল।

'পূজার সময় বাপে আমারে নিতে আইব।'

যুগল চমকে উঠল, 'যাইবা গিয়া?'

চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে পাখি বলল, 'নিতে আইলে থাকুম ক্যামনে? তয়—'

'তয় কী?'

'কেও যদি জোর কইরা ধইরা রাখত, থাইকা যাইতাম।'

বিনুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পাখির কানের কাছে মুখ নামাল যুগল। ফিসফিস গলায় বলল, 'রাখুম, জোর কইরাই ধইরা রাখুম।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর পাখিই প্রথম কথা বলল, 'মাঝি—'

'কী?'

'হেই, হেইদিন তুমার টুনি বইনের যেদিন পোলা হইল, রয়ানি গীত শুনাইছিলা, মনে আছে?'

'আছে।'

'কতকাল তোমার গীত শুনি না, আইজ একখান শুনতে সাধ লয়।'

'শুনবা?'

'হু।'

মনে মনে সুর ভেঁজে যুগল শুরু করে দিলঃ

'চান্‌বদনী তুই লো আমার
জীবন মরণ কাঠি,
তোরে না দেখিলে পরে
মরি লো বুক ফাটি।
তালুক মুলুক তুই লো আমার,
তুই লো ট্যাহার তোড়া,
নামাবলী তুই লো আমার
তুই লো ভাঙ্গা বেড়া।
তুই যে আমার রসগুল্লা
মোন্ডা মিঠাই ছানা,
শীতের কাথা তুই যে আমার
রইদের মিছরি পানা।
বষ্যাকালে তুই লো আমার

তালপাতার ছাতি,
তোরে পাইলে ফস্যা হয় লো
ঘোর আন্দার রাতি।
চান্‌বদনী তুই লো আমার—'

গান শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ দূরবিসারী পদ্মবনের ওপর তার রেশ দুলতে থাকল।

একসময় পাখি বলল, 'এইবার যাই গা মাঝি।'

যুগল বলল, 'আরেটু বস।'

'না। কতক্ষণ আইছি খেয়াল আছে? তোমরা হাটে যাইবা না?'

'হ-হ—' যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'চল তোমার বাড়িত্ দিয়া আসি।'

'না মাঝি, তোমারে আর দিয়া আইতে হইব না। নিজেই যাইতে পারুম।' বলেই জলে ঝাঁপ দিল পাখি।

তারপর নৌকো থেকে বিনু আর যুগল দেখল, পানকৌড়িও না, নীল-হলুদ অলৌকিক মাছও না, স্বপ্নলোকের জলপরীর মতন পদ্মবনের ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে দূরে, আরো—আরো দূরে চলে যাচ্ছে পাখি। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, একদৃষ্টে বিনুরা তাকিয়ে থাকল।

পদ্ম আর শাপলার বনে যতক্ষণ দেখা যায়, বিনুরা তাকিয়ে থাকল। একসময় অনেক, অনেক দূরে, টুনিদের বাড়িটা যেদিকে দ্বীপের মতন ভেসে আছে, হলুদ বিন্দু হয়ে পাখি মিলিয়ে গেল।

পাখি নেই, এই জলপূর্ণ চরাচরের কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবু যেন সে আছে, বিনুর চোখের ভেতর হলুদ জলপরীটি হয়ে অবিরাম সাঁতার কেটে চলেছে।

ওধার থেকে যুগল ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

ঘোরটা কেটে গেল, চমকে মুখ ফেরাল বিনু।

যুগল বলল, 'পাখি কে বুঝতে নি পারলেন?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল বিনু, 'না।'

'আমার পিসাতো বইন টুনিরে দেখলেন তো?

'হ্যাঁ—'

'পাখি টুনি বইনের ননদ। আপন ননদ না, অর মাসি হাউরির মাইয়া।'

'ও।'

যুগল একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'পাখি এইখানে থাকে না, ওগো বাড়ি ভাটির দ্যাশে।'

বিনু শুধলো, 'ভাটির দেশটা কোথায়?'

'উই দক্ষিণে—' দূর দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল যুগল, 'ঐখানে খালি জল আর মাছ। ভাটির দ্যাশেরে জল আর মাছের দ্যাশও কইতে পারেন। কত কিসিমের যে মাছ! যদিন একবার যান ছুটোবাবু ফিরতে আর মন চাইব না।' বলতে বলতে উৎসাহিত হয়ে উঠল যুগল, তার চোখ চকচক করতে লাগল, গাঢ় গভীর এক স্বপ্নের ভেতর ডুবে গেল যেন সে।

একটুক্ষণ নীরবতা।

তারপর যুগলই আবার বলল, 'ভাটির দ্যাশের কথা অখন থাউক। পাখির কথাই কই।'

বিনু উৎসুক চোখে তাকাল।

যুগল বলল, 'কয় দিনের লেইগা টুনি বইনের বাড়িত্ বেড়াইতে আইছে পাখি।'

'তাই বুঝি—'

'হ—' বলেই শুধরে নেয় যুগল, 'ঠিক বেড়াইতে না—'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'তবে?'

'টুনি বইনের তো বচ্ছর বচ্ছর পোলামাইয়া হয়। এইবারও শাবন মাসে এউক্কা মাইয়া হইছে। বইনের একলার সংসার। হ্যায় (সে) গেল আশুচ ঘরে (আঁতুড় ঘরে)। এইদিকে সংসার দ্যাখে কে? রান্ধনবাড়ি করে কে? তাই ভগ্নিপতি ভাটির দ্যাশে গিয়া পাখিরে নিয়া আইছে।'

'ও।'

'হেই আষাঢ় মাসে পাখি আইছে, অখন আশ্বিন। তিন চাইর মাস এইখানে থাইকা গেল। এইবার যাইব গা, অর বাপে আইসা নিয়া যাইব।'

বিনু আর কি বলবে, চুপ করে থাকল।

যুগল থামে নি, 'বইনে খালাস হইয়া গেছে, দরকার মিটা গেছে। পরের বাড়িত্ মাইন্‌ষে আর কয়দিন থাকে?' বলতে বলতে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে চকিত হল, 'ইস, বেলা তো দেখি মেলা চইড়া গেছে!'

এতক্ষণ মনোহর এক স্বপ্নের ভেতর যেন ডুবে ছিল বিনু। চমকে মুখ তুলে সেও ওপর দিকে তাকাল। পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। আর দু'পা এগুলেই মধ্যাকাশ। দুপুর হতে খুব বেশি বাকি নেই।

যদিও আশ্বিন মাস, অকূল জলের মাঝখানে বিনুরা বসে আছে, তবু ভরদুপুরের আগের এই সময়টায় রোদে বেশ ধার এসে গেছে, গায়ে তার তাত লাগছে। জোলো হাওয়া দাহ জুড়িয়ে দিতে পারছে না। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে সামনের দিকে তাকাল বিনু। যতদূর দৃষ্টি যায়, একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত, অবনীমোহনদের নৌকোটার চিহ্ন নেই। দিগন্তপ্রসারী অথৈ চরাচরে কোথায় সেটা হারিয়ে গেছে কে বলবে।

সন্ত্রস্তভাবে বিনু বলল, 'দাদুদের নৌকোটা তো দেখতে পাচ্ছি না।'

যুগল বলল, 'হাটের দিকে গেছে গা।'

'আমরা এখন কি করব?'

'কী আর করুম, হাটে যামু।'

'পৌঁছুতে পৌঁছুতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে!'

'ইট্টুও না।' যুগল বলল, 'বাতাসের গতিক দেখছেন ছুটোবাবু?'

একটু খেয়াল করতেই বিনু বুঝতে পারল। খানিক আগেও বাতাসটা ছিল ঝিরঝিরে, এই দুপুরবেলা তাকে যেন নিশিতে পেয়েছে। শাপলাবন শালুকবন ছুঁয়ে অগাধ জলের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সেটা।

যুগল আবার বলল, 'ক্যামন জোর বাতাস দিছে। বাদাম খাটাইয়া দেই, দেইখেন বড়কত্তাগো আগেই হাটে পৌঁছাইয়া যামু।

হঠাৎ কি মনে পড়তে ব্যস্তভাবে বিনু বলে উঠল, 'তুমি চিনে যেতে পারবে তো?'

এমন মজার কথা বুঝিবা আগে আর কখনও শোনে নি যুগল। একটুক্ষণ অবাক হয়ে বিনুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বলল, 'কথা শোন ছুটোবাবুর, কয় চিনা নি সুজনগুঞ্জের হাটে যাইতে পারুম!' বলে হেসে হেসে নৌকোর ওপর গড়িয়ে পড়ে আর কি।

বিনুর অস্বস্তি হতে লাগল, 'হাসছ যে!'

যুগল বোধহয় শুনতে পেল না। আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'আমি যুগল—জলের পোক একখান। সমস্ত দিন এই জলের দ্যাশ মইয়াইয়া বেড়াইতে আছি। ছুটোবাবুর সন্দ, সুজনগুঞ্জের হাট চিনা যাইতে পারুম না। আপনে এক কাম করেন বরম্—'

'কী?'

'কাপড় দিয়া আমার চৌখ বাইন্ধা দ্যান, দেখবেন ঠিক গেছি গা—'

এই পারাপারহীন অশেষ জলরাশির কোন দিকে পাড়ি দিলে সুজনগঞ্জের হাট, কে জানে। সবিস্ময়ে বিনু বলল, 'বল কী!'

'ঠিকই কই ছুটোবাবু—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল যুগল। একটানে পরনের কাপড়খানা খুলে ফেলল। তলায় ছোট্ট একফালি নেংটি।

নৌকোর মাঝখানটায় ক্ষিপ্র হাতে লগি খাড়া করে বাঁধল যুগল, তারপর কাপড় দিয়ে বাদাম খাটিয়ে হালের কাছে বৈঠা নিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তীরের মতন জল কেটে নৌকো ছুটল।

পদ্মবনের ওপর দিয়ে যাচ্ছে বিনুরা, নৌকোর তলায় সর সর শব্দ হচ্ছে।

যুগল বলল, 'আরেকখান গীত কই ছুটোবাবু।'

যত গান জানা আছে, সব এক দিনেই শুনিয়ে দিতে চায় নাকি যুগল! বিনু কিছু বলবার আগেই সে শুরু করে দিলঃ

'যহন বন্দু স্বলব পরান, আমারি
নাম লইও,
আমার দেওয়া মালার সনে দুঃখের কথা কইও
বন্দু আমারি নাম লইও।
আমি রইব তোমার লেইগা,
তুমি রইবা আমার লেইগা—'

হঠাৎ গানটা থামিয়ে দিয়ে যুগল বলল, 'গীত থাউক ছুটোবাবু—'

বিনু বলল, 'থাকবে কেন, গাও না—'

'না। একদিনে এত গান নিয্যস আপনের ভাল লাগতে আছে না।'

'লাগছে লাগছে, তুমি গাও।'

'না, গীতে আর মন লাগে না ছুটোবাবু। তার থিকা—'

'কী?'

'অন্য কথা কই।'

বিনু চুপ করে রইল।

একটু ভেবে নিয়ে যুগল আবার বলল, 'বুঝলেন নি ছুটোবাবু—'

'বল—' বিনু তাকাল।

তক্ষুণি কিছু বলল না যুগল। কিছুক্ষণ পর লাজুক সুরে আরম্ভ করল, 'উই পাখির লগে, বুঝলেন নি ছুটোবাবু—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল।

'পাখির সঙ্গে কী?'

'এইখানে—উই টুনি বইনের বাড়িত্, আমার দেখাশুনা—'

'তাই নাকি?'

'হ। এইর আগে পাখিরে আর দেখি নাই।'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল বলতে লাগল, 'পাখিরে দেখার পর থিকা পেরায়ই টুনি বইনের বাড়িত্ যাই। না গিয়া থাকতে পারি না ছুটোবাবু। এই নিয়া টুনি বইনে ঠাট্টা করে, ঠিসারা করে, আলঠায় (পেছনে লাগে)।'

বিনু বলল, 'তা তো দেখলামই।'

'হ,' বড় সরম লাগে ছুটোবাবু। তবু না গিয়া পারি না।'

একটু নীরবতা।

তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে যুগল বলল, 'আইচ্ছা ছুটোবাবু—'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যাতে বিনু অবাক হয়ে গেল। বলল, 'কী বলছ?'

চকিত দৃষ্টিতে একবার বিনুর দিকে তাকিয়ে দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল যুগল। নৌকোয় পাটাতনের সঙ্গে যেন মিশে যেতে যেতে বলল, 'পাখিরে কেমুন দেখলেন?'

'খুব ভাল। কি সুন্দর সাঁতার কাটতে পারে।'

নিচের দিকে চোখ রেখেই যুগল শুধলো, 'আপনের তা হইলে পছন্দ হইছে?'

প্রশ্নটার ভেতর গভীর কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা, বিনু বুঝতে পারল না। বুঝবার বয়েসও তার না। তবে খানিক আগে দরজার ফ্রেমে পাখিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সে, সেই ছবিটা এখনও চোখ জুড়ে আছে। যে মেয়ে গাছকোমর করে হলুদ শাড়ি পরে, লাল জামা গায়ে দেয়, নাকে যার সবুজ পাথরবসানো নাকছাবি, চোখ যার ছায়াচ্ছন্ন অতল সরোবর, যে মেয়ে হলুদ জলপরী হয়ে পদ্মবনে সাঁতার কাটে তাকে যেন পৃথিবীর মানুষ মনে হয় না। স্বপ্নের অলৌকিক মানবী হয়ে নিমেষে মুগ্ধ বিনুকে সে জয় করে নিয়েছে।

ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে বিনু জানাল, পাখিকে তার খুব পছন্দ হয়েছে।

এবার মুখ তুলল যুগল, চোখমুখে আলোর ছটা খেলে যাচ্ছে। উৎসাহের সুরে সে বলল, 'নিচ্চিন্ত করলেন ছুটোবাবু, নিচ্চিন্ত করলেন—'

কিভাবে যুগলকে ভাবনাশূন্য করেছে, বিনু বুঝতে পারল না। খানিক অবাক হয়ে সে তাকিয়ে থাকল।

যুগল বলতে লাগল, 'আপনেরা কইলকাতার মানুষ, আপনাগো চৌখই আরেক রকম। আপনাগো চৌখে যহন পাখিরে ভাল লাগছে তহন আর চিন্তা নাই আমার।'

বিনু কিছু বলল না।

খানিক ইতস্তত করে যুগল আবার বলল, 'টুনি বইনে কী কয় জানেন?'

জিজ্ঞাসু সুরে বিনু বলল, 'কী?'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে লাজুক হাসল যুগল। বলল, 'পাখির লগে আমারে নিকি খুব মানায়। দুইজনের নিকি খুব মিল হইব।'

কথাটা বুঝতে পারলা না বিনু।

যুগল আরো বলল, 'টুনি বইনের কী ইচ্ছা জানেন ছুটোবাবু?'

'কী?'

'কইতে সরম লাগে।'

'লজ্জা কিসের, বল না—'

'টুনি বইনের ইচ্ছা, পাখির লগে আমার বিয়া হউক।'

'তাই নাকি?'

'হ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল যুগল, 'পাখির বাপের নাম তো আপনে জানেন না।'

বিনু বলল, 'কেমন করে জানব?'

'হে তো ঠিকই। পাখিরেই এই পখম দেখলেন। তার বাপের সম্বাদ তো দূরের কথা। পাখির বাপের নাম গোপাল দাস। টুনি বইনে কইছে গোপাল দাস যহন ভাটির দ্যাশ থিকা মাইয়ারে নিতে আইব

তহন আমারেও দেইখা যাইব।'

'তোমাকে দেখে যাবে কেন?' বিনুর চোখে মুখে এবং কণ্ঠস্বরে আবার বিস্ময় ফুটল।

নাক কুঁচকে বিচিত্র ভঙ্গি করল যুগল। ফিসফিস গলায় বলল, 'ছুটোবাবু কিছু বোঝেন না, একেরে পোলাপান।'

পোলাপান অর্থাৎ ছেলেমানুষ বলতে রেগে উঠতে যাচ্ছিল বিনু। তার আগেই যুগল আবার বলল, 'আমার হাতে মাইয়া দিব। আমি পোলাখান ক্যামন, রোজগারপতি ক্যামন করি, খাওয়াইতে-টাওয়াইতে পারুম কিনা—এই সব দেইখা-শুইনা-বাজাইয়া নিতে হইব না? বাপ হইয়া মাইয়ারে তো আর জলে ফালাইয়া দিতে পারে না।'

এবার অনেকখানি বুঝল বিনু। যুগলের ওপর আর তার রাগ থাকল না।

প্রকাণ্ড মাছের মতন জল কেটে কেটে নৌকোটা ছুটে চলেছে। পালে সোঁ সোঁ বাতাস বেজে যাচ্ছে একটানা, যতিহীন। শুনতে শুনতে বিনুর মনে হতে লাগল, নিরবধি কাল বাতাস ওভাবে বেজে যাচ্ছে আর আদিগন্ত জলের মাঝখানে বসে সেও তার বাজনা শুনে চলেছে।

পদ্মবন শালুকবন আর শাপলাবনই শুধু না, মাঝে মাঝে নলখাগড়ার ঝোপ, চাপ-বাঁধা কচুরিপানা এবং ধানখেতও পড়ছে। আর পড়ছে মুত্রাবন। মুত্রার কালো কালো নিটোল ডাঁটাগুলো দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, তাদের মাথায় থোকা থোকা সাদা ফুলের সমারোহ। এসবের ওপর দিয়ে নৌকোটা যেন পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে।

বাদাম খাটিয়ে দেবার পর বেশিক্ষণ লাগল না। সূর্যটা মধ্যাকাশের দেউড়িতে পা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিনুরা যেখানে এসে পৌঁছুলো সেখানে আর ধানখেত নেই। মুত্রা বা পদ্ম, শাপলা কিংবা শালুকের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না। ধানবন শাপলাবন পার হয়ে এখান থেকে নদী শুরু হয়েছে।

নদী অবশ্য এখানে খুব চওড়া না, তবে গভীর। কেননা জলের রং গহীন কালো—অনেকটা মেঘের মতন।

যুগলরা যেখানে, সেখান থেকে ওপারটা স্পষ্ট দেখা যায়। বড় বড় চোখদু'টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে ছিল বিনু। ওপারে বিশাল উঁচু ভূখণ্ডের শিয়র দিয়ে নদীটা গেছে, জায়গাটা ঘিরে সারি সারি অগণিত নৌকা লগি পুঁতে রয়েছে। নদীর নানা দিক থেকে আরো কত নৌকো যে ওখানে চলেছে, হিসেব নেই। নৌকোয় নৌকোয় জল দেখা যায় না।

ওপার থেকে মৌচাকের গুঞ্জনের মতন একটানা ভনভনানি ভেসে আসছে আর দেখা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ।

ধানবন পদ্মবন পেরিয়ে নদীতে পড়তেই বাদাম নামিয়ে ফেলেছিল যুগল। পালের কাপড়টা মালকোঁচা দিয়ে পরতে পরতে বলল, 'উই—উইটা হইল সুজনগুঞ্জের হাট।'

বিনু তাই ভেবেছিল। বলল, 'ও—'

কাপড় পরা হয়ে গিয়েছিল। আয়েস করে বৈঠা বাইতে বাইতে যুগল বলল, 'আপনে তো ভাবনায় পইড়া গেছিলেন, আমি নি চিনা সুজনগুঞ্জ আইতে পারুম? দ্যাখেন, আইসা পড়ছি—'

বিনুকে স্বীকার করতেই হল, সত্যি সত্যিই যুগল পথ চিনে আসতে পেরেছে। পরক্ষণেই আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। চিন্তিত মুখে বিনু বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'দাদুরা কোথায়? তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'হাটেই আইছে। নিচ্চিন্ত থাকেন ছুটোবাবু।'

বিনু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। উদ্বিগ্ন স্বরে শুধলো, 'কী করে খুঁজে বার করবে?'

বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে যুগল হাসল, 'দ্যাখেন না ক্যামনে বিচরাইয়া বাইর করি।' বলেই জিজ্ঞেস

করল, 'ছুটোবাবু আপনে নাও চিনেন?'

'না।'

'আসেন চিনাইয়া দেই—' আঙুল বাড়িয়ে একখানা নৌকো দেখিয়ে যুগল বলল, 'উই নাওটার নাম 'গাছি'। আরেকটা দেখিয়ে বলল, 'এইটা 'শালতি'।'

তারপর কোনটা 'একমাল্লাই', কোনটা 'দো-মাল্লাই', কোনটা 'কোষ', কোনটা 'মহাজনী'—ছইওলা এবং ছইবিহীন নানা গড়নের নৌকোর কুলশীল গোত্রের খবর দিয়ে যেতে লাগল যুগল।

নৌকো চিনতে চিনতে মজা লেগে গেল বিনুর, উৎসুক মুখে নিজেই একেকটা অচেনা নৌকো দেখিয়ে নাম জিজ্ঞেস করতে লাগল। অবনীমোহন হেমনাথদের কথা আপাতত খেয়াল নেই তার।

নৌকো চেনার ফাঁকে নদী পেরিয়ে একসময় হাটের তলায় এসে পড়ল যুগলরা। অন্য সব নৌকোর গা ঘেঁষে লগি পুঁতে নিজেদের নৌকোটা বেঁধে ফেলল যুগল। আর তখনই হাটের ভনভনানি ছাপিয়ে ঢ্যাড়-ঢ্যাড় করে ঢেঁড়া পেটার প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল যুগল। ব্যস্তভাবে বলল, 'চলেন চলেন ছুটোবাবু, ঢেরা দিতে আছে।'

দেখাদেখি বিনুও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'কিসের, 'ঢেঁড়া?'

'নিয্যস মজার ব্যাপার আছে। আসেন—' বলেই নৌকো থেকে লাফ দিয়ে ডাঙায় নামল যুগল, হাত ধরে বিনুকেও নামাল। তারপর দু'জনে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাটের দিকে ছুটল।

নৌকোঘাটা থেকে যুগলের সঙ্গে ওপরে উঠেই বিনু অবাক। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, সারি সারি হাটের চালা।

চালা বলতে বাঁশের খুঁটির মাথায় একটু করে হোগলার ছাউনি, আর সব দিক খোলা, বেড়া-টেড়া কিছু নেই। সেগুলোর তলায় অস্থায়ী দোকান বসেছে। কোথাও একটানা অনেকগুলো চালা জুড়ে কাঁচা আনাজের বাজার, কোথাও তামাক হাটা, কোথাও মরিচ হাটা, কোথাও মাছের বাজার, কোথাও ক্ষীরাইয়ের (এক জাতীয় শসা) বাজার। আবার কোথাও বা রঙিন কাচের চুড়ি, লাল ঘুনসি, আয়না-কাকুই ফুলেল তেল, এমনি নানান মনোহারী জিনিসের পসরা সাজানো।

দু'ধারে হাটের চালা, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ দিগ্বিদিকে ছুটে গেছে।

দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে চোখ পেতে যে বিনু সুজনগঞ্জের হাটটা দেখবে তার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা যুগল তাকে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে দিচ্ছে না, একখানা হাত ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

ছুটতে ছুটতে বিনু লক্ষ করল, সে আর যুগলই শুধু না, হাটের সব মানুষই ছুটছে।

ঢেঁড়ার শব্দ ক্রমশ আরো জোরাল হয়ে উঠেছে। যুগল ছোটার গতি আরো বাড়িয়ে দিল, দেখাদেখি বিনুকেও বাড়াতে হল। পাশাপাশি যে হাটুরে লোকগুলো ছুটছিল তাদের ভেতর থেকে কেউ চেঁচিয়ে বলল, 'আ রে ধলা মিঞা, হইল কী? ঢেরা পড়ে ক্যান?'

ধলা মিঞাই খুব সম্ভব উত্তর দিল, 'নিয্যস রংতামসার ব্যাপার আছে।'

'তাই মনে লয়।'

আরেকজন বলল, 'অনেক কাল পর ঢেরা পড়ল সুজনগঞ্জে—'

অন্য একজন ব্যস্তভাবে বলল, 'হ, অখন দৌড়াও দেখি সোনাভাই—'

বেশ খানিকক্ষণ ছুটবার পর হাটের মাঝমধ্যিখানে এসে পড়ল বিনুরা। এখানে হাটের চালা নেই। একটা প্রাচীন বট তার বিপুল বিস্তার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর খুশিমতন যেখানে পেরেছে ঝুরি নামিয়েছে। এই দুপুর বেলাতেও, সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপর, বটতলা শীতল, ছায়াচ্ছন্ন। তার একধারে পুরনো ভাঙাচোরা একটা মন্দির, কিসের মন্দির বিনু বুঝতে পারল না।

মন্দিরটার সামনের দিকে মস্ত পুকুর, তারপর অনেকখানি জায়গা খোলামেলা। সেখানে এই মুহূর্তে মেলা বসে গেছে যেন। অসংখ্য মানুষ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ঝকমকে চোখে মাঝখানে তাকিয়ে আছে। বিনুকে টানতে টানতে যুগল সেখানে নিয়ে এল। তারপর কনুই দিয়ে ঠেলে ঠেলে অদ্ভুত কৌশলে ভিড়ের ভেতর পথ করে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল।

ভেতরে বেশ খানিকটা জায়গা গোলাকার এবং ফাঁকা, মানুষের ভিড় সেটা ঘিরে। ফাঁকা জায়গায় তিনটে মোটে লোক। দু'জনের মাথায় কোঁচকানো বাবরি, একেবারে কাঁধ পর্যন্ত নেমে গেছে। বড় মোটা জুলপি তাদের, পাকানো গোঁফ। গায়ে জামাটামা নেই, পরনে মালকোঁচা দেওয়া খাটো ধুতি। দু'জনেরই হাতে রুপোর চৌকো তাবিজ, গলায় সোনাবাঁধানো বাঘনখ। গায়ের রং এত কালো আর চকচকে, মনে হয়, গর্জনতেল মেখে আছে।

বাবরিওলারা বেশ জোয়ান, লম্বাচওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। তাদের গলায় মস্ত ঢাক বাঁধা। এই মুহূর্তে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আর নেচে নেচে প্রচন্ডভাবে পিটিয়ে চলেছে। দু'জনে ঢাকদুটো না ফাঁসানো পর্যন্ত থামবে না বোধ হয়।

দেখতে দেখতে বিনুর মনে হল, ওরা যেন যমজ। কুমোরের দোকানের মানিকজোড় পুতুলের মতন একই ছাঁচে গড়া।

ওরা ঢাক বাজাচ্ছে আর তৃতীয় মানুষটি একটা উঁচু প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার শরীরে রসকষ কিছু নেই। ঢ্যাঙা তালগাছের মতন চেহারা। আখমাড়াই কলে ফেলে সবটুকু সার বার করে নেওয়া হয়েছে, ফলে ছিবড়েটুকু পড়ে আছে। লোকটার গাল ভাঙাচোরা, চুল পাঁশুটে রঙের। সেই চুলই তেলে জবজবে করে পরিপাটি টেরি কেটেছে। কত বয়স, কে জানে। হাড় এমন পাকা, মনে হয়, টোকা দিলেই টং করে বেজে উঠবে। পরনে চিটচিটে ঢোলা পাজামা আর রংবেরং-এর হাজারটা তালি দেওয়া আলখাল্লা, খালি পা। সার্কাস দলের ক্লাউনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তার হাতে লম্বা একটা চোঙা।

এমন যার চেহারা তার চোখের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। সে দুটো যেমন রসালো তেমনি ঢুলুঢুলু।

লোকটা প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড় হেলিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। যখন দেখল, হাটের প্রায় সব লোক চারপাশে জড়ো হয়েছে, হাতের ইশারায় বাবরিওলা দুটোকে থামিয়ে দিল। তারপর মুখের কাছে চোঙাটা ধরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'হিন্দু ভাইরা, মিঞাভাইরা, অনেক দিন পর আপনেগো সুজনগুঞ্জে ঢেরা দিতে আইলাম।'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে বলল, 'হ, অনেক দিন পর আইলা। হেই গেল সনের আগের সন চৈত মাসে নীল পূজার সময় আইছিলা। হেইর পর এই আইলা।'

আরেকজন বলল, 'অ্যাতদিন আছিলা কই?'.

ঢ্যাঙা লোকটা মুখ থেকে চোঙা নামিয়ে বলল, 'এই দ্যাড় বচ্ছরে কই কই মুল্লুক ঘুরলাম। হেই নুয়াখালি জিলা, ফরিদপুর জিলা, ত্রিপুরা জিলা, কুমিল্লা, চানপুর, বরিশাল, আর হেইদিকে উজানে ভাটির দ্যাশ—না গেছি কুনখানে?'

'ঢেরা দিতে গেছ?'

'এ ছাড়া আর কোন কামে যামু ক'ন? এই কিকাই তো আমার রুজি-রুজগার, ভাত-কাপড়।'

ভিড়ের মধ্যেকার প্রশ্নকর্তা লোকটা মাথা নাড়ল, 'হ—'

বোঝা যায়, দেশে দেশে ঢেঁড়া দিয়ে বেড়ানোই ঢ্যাঙা লোকটার কাজ এবং জীবিকা।

ভিড়ের অন্য সবাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। তারা চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'গপ থুইয়া অহন আসল সম্বাদখান কও। শুইনা যাইগা। উইদিকে আবার হাটের বেলা যায়।'

'হ-হ'-, হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঢ্যাঙা লোকটা হাতের লম্বা চোঙাখানা মুখের কাছে আনল, তারপর কণ্ঠস্বর একেবারে চুড়োয় তুলে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মিঞাভাইরা, হিন্দুভাইরা, আপনেরা নাজিরপুরে নাম শুনছেন?'

'কোন নাজরপুর?'

'নবীগুঞ্জ থানার ভিত্‌রে পড়ে, পেল্লয় গেরাম।'

ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ জানাল, নাজিরপুরের নাম শনেছে। তবে বেশির ভাগই শোনে নি।

ঢ্যাঙা লোকটা বলল, 'বাবু ভুবনমোহন দত্তচধ্‌রি (দত্ত চৌধুরী) নাজিরপুরের জমিন্দার। বয়েস হইব ষাইট। তেনির দারুণ দাপট। এমুন দাপট যে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়। কিন্তুক—'

ভিড়টা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কিন্তুক কী?'

'গেল সন জমিন্দারবাবু তেজপক্ষের (তৃতীয় পক্ষের) বিয়া সারছেন। এই পক্ষের বউ একেবারে লক্ষ্মী পর্‌তিমার লাহান দেখতে। বয়সখানও কম, মোটে ষোল। এই নিয়া একখান কথা রটছে—'

চারদিক থেকে চড়বড়িয়ে খই ফোটার মতন অসংখ্য কণ্ঠস্বর ফুটতে লাগল, 'কী কথা? কী কথা?'

ঢ্যাঙা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে সেই ঢাকী দুটোকে চোখের ইশারা করল। কথাবার্তার ফাঁকে বসে বসে তারা জিরিয়ে নিচ্ছিল। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র দামড়া মোষের মতন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবং উদ্দামভাবে বাবরি ঝাঁকিয়ে ঢাক পেটাতে লাগল।

উৎসাহ দেবার জন্য বোধ হয় ঢ্যাঙা লোকটা প্যাকিং ব্যাক্স থেকে নেমে পড়ল। হাতে হাতে তালি বাজাতে বাজাতে বলতে লাগল, 'জোরে ব্যাটারা, আরো জোরে—'

ঢাকী দুটো উৎসাহিত হয়ে এমন বাজাতে লাগল যে হাত দেখা যায় না।

ঢ্যাঙা লোকটা আগের মতনই তালি দিতে দিতে বলতে লাগল, 'ঘুইরা ফিরা হালারা, নাইচা নাইচা—'

ঘুরে ফিরে ঢাকীদের নাচ শুরু হল।

বেশ খানিকক্ষণ বাজনার পর বাবরিওলা দুটোকে থামিয়ে আবার প্যাকিং বাক্সের মাথায় উঠল ঢেঁড়াদার। ততক্ষণে সবার কৌতূহল চূড়ান্তে পৌঁছেছে। চারধার থেকে ভিড়টা চেঁচাতে লাগল, 'কও, এইবার কও—'

ধীরেসুস্থে চোঙাটা মুখের কাছে এনে ঢ্যাঙা লোকটা বলতে লাগল, 'নাজিরপুরের বাবু ভুবনমোহন দত্তচধ্‌রির নামে যে কথাখান রটছে, তা হইল—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল।

'কী? কী?'

'তেজপক্ষের বিয়ার পর তেনি নিকি মাউগা হইয়া গেছেন। (তৃতীয় পক্ষের বিয়ের পর তিনি নাকি স্ত্রৈণ হয়ে গেছেন)। কথাখান নারায়ণগুঞ্জ-মুন্সিগুঞ্জ মানিকগুঞ্জ—জগৎ-মত্ত সবখানে রইটা গেছে।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর শীর্ষবিন্দুতে তুলল ঢেঁড়াদার, 'কিন্তুক কথাখান সত্য না। হিন্দুভাইরা, মিঞাভাইরা, কেউ যদি এমুন কথা আপনেগো কয় বিশ্বাস করবেন না।'

সবাই বলল, 'ক্যান, বিশ্বাস করুম না ক্যান?'

'শত্তুরে শত্তুরতা কইরা এই কথা রটাইছে। আপনেরা শুইনা রাখেন, সগ্‌গলে জাইনা রাখেন, নাজিরপুরের জমিন্দার বাবু ভবনমোহন দত্তচধ্‌রি মাউগা (স্ত্রৈণ) না—মাউগা না—'

লোকটা থামতে না থামতেই চারধারে হাসির রোল পড়ে গেল। রসিক কেউ একজন হরিধ্বনি

দিয়ে উঠল, 'বল হরি—'

ঢেঁড়া দেওয়া হয়ে গেছে। চারপাশের ভিড়টা জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতন এবার হাটের দোকানপসারের দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

লোকগুলো যাচ্ছে আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, 'বড় বাহারের সম্বাদ, বড় বাহারের সম্বাদ—'

একজন বলল, 'হালায় বাপের জম্মে এমুন কথা শুনি নাই।'

আরেকজন বলল, 'মাউগা না, হেই কথা হাটে হাটে ঢেরা পিটাইয়া নি কইতে হয়!'

দেখতে দেখতে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল, দামড়া মোষের মতই সেই জোড়া বাবরিওলাকে নিয়ে ঢ্যাঙা লোকটাও কখন যেন উধাও হয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে যুগলও হাসছিল। হাসতে হাসতে তার হিলহিলে বেতের মতন শরীর বেঁকেচুরে যাচ্ছে।

এতগুলো লোক কেন হাসছিল, ঢেঁড়াদারের ঘোষণায় কৌতুককর ব্যাপারটা কী ছিল, কিছুই বুঝতে পারেনি বিনু। সে শুধু বিমূঢ়ের মতন একবাব এর মুখের দিকে একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

সবাই চলে গেলে বিনু যুগলকে বলল, 'অ্যাই অমন হাসছ কেন?'

'হাসুম না, ক'ন কী ছুটোবাবু?' হাসির বড় একটা ঢেউ এসে যুগলের স্বর বুজিয়ে দিল।

বিনু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

হাসিটা খানিক সামলে নিয়ে যুগল বলল, 'এমুন হাসনের কতা তিরভুবনে কেউ কুনোদিন শোনে নাই ছুটোবাবু। কয় কিনা জমিন্দারবাবু মাউগা না—' বলে হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ে আর কি।'

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল বিনুর। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'আচ্ছা, মাউগা মানে কী? লোকটা বলছিল—'

'বোঝেন নাই?'

'না।'

হাসি থামিয়ে যুগল সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু চিন্তা করে বলল, 'আপনের না বুঝনেরই কথা ছুটোবাবু।'

কলকাতার ছেলে বিনু ক্লাস সেভেনে পড়ে। যে কথা যুগল বুঝতে পারে, জলবাংলার এই অশিক্ষিত গেঁয়ো হাটুরে লোকগুলো বুঝতে পারে—সেই কথাটা সে বুঝতে পারবে না। অব্যয়ীভাব আর কর্মধারয় সমাস বোঝে সে, পাটিগণিতের বাঘা বাঘা অঙ্ক বোঝে, নেসফিল্ডের গ্রামার থেকে জিরান্ড, অ্যাপ্রপ্রিয়েট প্রিপজিসন বুঝে বসে আছে, আর তুচ্ছ মাউগা শব্দটা অবোধ্য থেকে যাবে? নাক মুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় বিনু বলল, 'কেন, বুঝতে পারব না কেন?'

'আপনে পোলাপান যে।'

পোলাপান অর্থে ছেলেমানুষ। আষাঢ় মাসে বার পেরিয়ে তেরয় পা দিয়েছে বিনু, মাথায় ছোটদিকে ছাপিয়ে গেছে, তবু কিনা তাকে ছেলেমানুষ ভাবে যুগল। মনে মনে খুব রেগে নিয়ে সে বলল, 'ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ করবে না।'

তার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে যুগল চমকে উঠল। বলল, 'আইচ্ছা, আর কমু না। এইবারটার লাখান মাপ কইরা দ্যান।'

বিনু খুশি হল। সহজ সদয় গলায় বলল, 'ঠিক আছে। এখন 'মাউগা'র মানে বল।'

যুগল বলল, 'ছুটোবাবু মাউগা তারেই কয় যে তমস্ত দিন বউয়ের আচলের তলে থাকে, তার পিছে পিছে বিলাই-ছাওয়ের লাখান (বেড়াল-বাচ্চার মতন) ঘোরে। বউ যা কয় তাই করে। মোট কথা বউ-অন্ত পরান। একদণ্ড বউরে না দেখলে মুচ্ছা যায়।'

তবু ব্যাপারটা বিশেষ বোধগম্য হল না। 'মাউগা' শব্দটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে হাটুরে লোকগুলোর মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেই কথাটা মনে হতেই বিজ্ঞের মতন একবার হেসে নিল বিনু।

ভাবখানা, আমিও সব বুঝি। ছেলেমানুষ যা ভেবেছ, আমি তা আদপেই নই।

যাই হোক ঢেঁড়ার পর্বটা শেষ হয়েছে। হঠাৎ হেমনাথাদের কথা মনে পড়েগেল বিনুর। তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে সে বলে উঠল, 'দাদু, বাবা আর লালমোহনদাদুকে খুঁজে বার করবে না?'

যুগল বলল, 'হ। চলেন।'

'চল—'

দু'পা এগিয়েছে, এমন সময় উঁচু গলার ডাক ভেসে এল, 'যুগল, এই যুগল—'

ডান দিকে তাকাতেই বিনুরা দেখতে পেল খানিক দূরে অবনীমোহন, লারমোর আর লারমোরের নৌকোর সেই মাঝি দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। মাঝিদের মাথায় দুটো বড় বড় টিনের বাক্স। চোখাচোখি হতেই লারমোর হাতছানি দিলেন।

বিনুরা বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল।

লারমোর যুগলের উদ্দেশে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলি রে হাতভাগা, এত দেরি হল?'

নিচের দিকে তাকিয়ে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে যুগল বলল, 'পথে এক কুটুমের লগে দেখা, হ্যায় আমারে তার বাড়িত্ ধইরা নিয়া গেল। তাই ইট্টু দেরি হইছে।'

কুটুমবাড়ি যাবার কথাটা সত্যি। তবে তার সঙ্গে দেখা হওয়া এবং ধরে নিয়ে যাওয়ার কথাটা ডাহা মিথ্যে। বিনু একবার ভাবল, যুগলের মিথ্যেটা ধরিয়ে দেয়। কিন্তু ধরিয়ে দিলে তার ফলাফল কী হবে ভেবে চুপ করে থাকল।

লারমোর আবার বললেন, 'নৌকোয় উঠলে, জল পেলে, তুই আর মানুষ থাকিস না। তোর তো কিচ্ছু হবে না, পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী আর সারা বর্ষার জলের সাধ্যি নেই তোর কিছু করতে পারে। ভয় ঐ দাদাভাইটাকে নিয়ে—' আঙুল দিয়ে বিনুকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমরা এসেছি আর সারাক্ষণ ওর কথা চিন্তা করছি।'

যুগল ফিসফিসিয়ে বলল, 'চিন্তার কিছু আছিল না, ছুটোবাবুরে আমার নায়ে তুলছি, আমার এট্টা দায়িত্ব নাই?'

লারমোর সকৌতুকে হাসলেন, 'আছে নাকি! জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল।' বলতে বলতে বিনুর দিকে ফিরলেন, 'তারপর দাদাভাই—'

বিনু তাকাল।

লারমোর বললেন, 'ঢেঁড়া শুনেছ?'

বিনু ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ।'

'কী শুনলে বল তো।'

'নাজিরপুরের জমিদার মাউগা না।'

সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগল। হেসে হেসে লারমোর শুধোলেন, 'মানে বুঝেছ?'

'হুঁ।'

হাসিটা হঠাৎ থমকে গেল লারমোরের। ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে শুধোলেন, 'কী?'

'মাউগা' শব্দের ব্যাখ্যা যুগলের কাছে যা শুনেছিল, গড়গড় করে বলে গেল বিনু। শুনে কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে রইলেন লারমোর। অবনীমোহনেরও সে একই অবস্থা। কিছুক্ষণ পর লারমোর বললেন, 'এতসব কথা তুমি কেমন করে জানলে দাদাভাই? কে শিখিয়েছে?'

শেখানোর কৃতিত্বটা আর যুগলকে দিতে মন চাইল না, বিজ্ঞের মতন মুখ করে গম্ভীর চালে বিনু বলল, 'কেউ শেখায় নি, আমি নিজেই জানি।'

লারমোর আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, অনেকগুলো হাটুরে লোক পুরনো ভাঙা মন্দিরটার দিক থেকে ডাকাডাকি করতে লাগল, 'লালমোহন সাহেব লালমোহন সাহেব, তাড়াতাড়ি আসেন। বেলা যে

যায়—'

লারমোর চঞ্চল হলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'চল, চল সব—' বলে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন।

ঐ লোকগুলো কেন লারমোরকে ডাকছে, বিনু বুঝতে পারল না। যাই হোক লারমোর আর অবনীমোহন আগে আগে চলেছেন। ওদের পেছনে বাক্স মাথায় সেই মাঝি দুটো। সবার শেষে বিনু এবং যুগল।

যেতে যেতে অবনীমোহনের গলা শুনতে পেল বিনু। চাপা স্বরে তিনি লারমোরকে বলছেন, 'এমন ঢেঁড়াও লোকে দ্যায় ?'

লারমোর বললেন, 'মজার ব্যাপারটা সবাই জানল। অথচ তোমার মামাশ্বশুরই শুধু জানতে পারল না। হেমটা একেবারে পাগল। নৌকো থেকে নেমে সেই ঘাড় বেঁকা করে কোন দিকে যে ছুটল!'

'মামাবাবু তো বললেন, নিত্য দাস না কার দোকানে যাবেন।'

'তুমিও যেমন অবনীমোহন, মামাবাবুটিকে তো এখনও চেন নি। নিত্য দাসের দোকান পর্যন্ত একবারে ও পৌঁছুতে পারবে ? তার আগেই হয়তো গোঁসাইদাস ভূঁইমালী ধরে নিয়ে নিজের দোকানে বসাবে। সেখানে এক দুপুর কাটিয়ে দেবে হেম।'

হেমনাথ সম্বন্ধে ঠিক এইরকম অনুযোগই করেছিলেন স্নেহলতা। অবনীমোহন হাসলেন।

লারমোর বলতে লাগলেন, 'চল্লিশ বছর ধরে দেখছি হেমকে। ঐ এক রকমই থেকে গেল। কোনো পরিবর্তন নেই।'

হঠাৎ কি ভেবে অবনীমোহন বললে, 'তা হলে তো ভারি মুশকিল হবে লালমোহন মামা—'

'কিসের মুশকিল ?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন লারমোর।

'এক জায়গায় যেতে গিয়ে আরেক জায়গায় যদি আটকে যান, বার করব কী করে ?'

'খুঁজে বার করতে হবে না। হেমই আমাদের খুঁজে বার করবে।'

'আমরা কোথায় আছি, উনি কেমন করে জানবেন ?'

লারমোর বললেন, 'ও জানে। সুজনগঞ্জের হাটে এলে মন্দিরের পাশে ঐ বটগাছতলায় আমি বসি। দেখো, ঠিক এসে পড়বে।'

এদিকে যুগল বিনুকে বলছিল, 'জানেন ছুটোবাবু, কয়দিনে আপনে বেশ চালাক-চতুর হইয়া উঠছেন।'

বিনু রেগে গেল, 'আমি আগেও চালাক ছিলাম।'

যুগল বলল, 'হেয়া তো জানি, তয় এই কয়দিনে আরো চালাক হইছেন।'

ঈষৎ নরম হয়ে বিনু বলল, 'কী করে বুঝলে ?'

'উই যে লালমোহন সাহেবরে যখন মিছা কইরা কইলাম, রাস্তা থিকা আমার কুটুমে আমাগো ধইরা নিয়া গেছিল তখন আপনে চুপ কইরা থাকলেন। সত্য কথাখান কইলে লালমোহন সাহেব খুব রাইগা যাইত।'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল আবার বলল, 'যহন যহুন দরকার হইব, এইরকম বুদ্ধি খেলাইবেন ছুটোবাবু।'

একসময় তারা মন্দিরের কাছাকাছি সেই ঝুপসি বটগাছটার তলায় এসে পড়ল।

খানিক আগে বিনু এই জায়গাটার ওপর দিয়ে ছুটে গেছে। তখন চোখে পড়েনি, এখন দেখা গেল, একটা শস্তা ছোট টেবিলের মুখোমুখি দু'খানা হাতল ভাঙা চেয়ার সাজানো। সামনের দিকে জনাকয়েক লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের সবাই গরিব গেঁয়ো চাষী শ্রেণীর। সিকিভাগের মতন হিন্দু, বাদবাকি মুসলমান। চেহারা তাদের রুগ্ন, দুর্বল। চোখেমুখে অসুস্থতার ছাপ মাখানো। লারমোরকে দেখে সবার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এক পলক চেয়ার-টেবিলের দিকে তাকিয়ে থেকে লারমোর বললেন, 'এতে তো হবে না, আরো

দু'খানা চেয়ার লাগবে।'

যে মাঝিদুটো মাথায় করে বাক্স নিয়ে এসেছিল তারা চঞ্চল হল, তাড়াতাড়ি বাক্স নামিয়ে হাটের দিকে ছুটল।

সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে লারমোর অবনীমোহনকে বললেন, 'বোসো অবনী-'

অবনীমোহন বসলেন। তাঁর মুখোমুখি বসতে বসতে লারমোর এবার বিনুকে বললেন, 'যতক্ষণ না চেয়ার আসে ততক্ষণ আমার কোলে বোসো দাদাভাই। এস—' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কারো কোলে বসতে ঘোরতর আপত্তি বিনুর। কিছুতেই লারমোরের কাছে গেল না সে। নিচের ঘাসের ওপর যুগল বসে পড়েছিল, সে তার গা ঘেঁষে গিয়ে বসল।

বিনুর দিকে তাকিয়ে মধুর হাসলেন লারমোর, 'দাদাভাই মস্ত বড় হয়ে গেছে! কোলে বসতে তার খুব লজ্জা।'

বিনু চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকল।

ওদিকে সেই গ্রাম্য অসুস্থ লোকগুলো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তারা গুঞ্জনের মতন শব্দ করে বলতে শুরু করল, 'এইবার আমাগো দ্যাখেন লালমোহন সাহেব।'

স্নেহময় সুরে লারমোর বললেন, 'এতক্ষণ বসে আছিস, আরেকটু সবুর কর বাবারা, চেয়ারটা অসুক। না এলে কোথায় বসিয়ে তোদের দেখব ?'

লোকগুলো শান্ত হল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর একটু কি ভেবে গভীর স্বরে লারমোর ডাকলেন, 'অমনীমোহন—'

'আজ্ঞে—' অবনীমোহন তক্ষুণি সাড়া দিলেন।

'এটা কত সাল ?'

'উনিশ শ চল্লিশ।'

'ঠিক চল্লিশ বছর আগে উনিশ শ সালে, তার মানে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি সবে শুরু হয়েছে—সেই সময় আমি রাজদিয়ায় এসেছিলাম। তখন আমার বয়েস পঁচিশ। রাজদিয়ায় আসার পরের দিন থেকেই আমি সুজনগঞ্জের হাটে আসছি। এই যে বটগাছটা দেখছ, এর তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই যুবক বয়েসে আমি খ্রিস্টধর্ম প্রিচ করতাম।'

'এখন প্রিচ করেন না ?'

'না।'

'তবে ?'

লারমোর হাসলেন, 'এখন যা করি একটু পরেই দেখতে পাবে।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'এখন আর প্রিচ করেন না কেন ?'

লারমোর হাসলেন। বললেন, 'খুব কঠিন প্রশ্ন করেছ অবনী। এর উত্তর তো এক কথায় দেওয়া যাবে না। দিতে গেলে আমার সারা জীবনের কথা বলতে হবে।'

উৎসুক সুরে অবনীমোহন, 'বেশ তো, বলুন না। আমার খুব জানবার ইচ্ছে।'

সামনের অসুস্থ উদ্বিগ্ন লোকগুলোকে দেখিয়ে লারমোর বললেন, 'এখন যদি গল্প জুড়ে দিই ওরা আমাকে আস্ত রাখবে না। পরে আরেক দিন শুনো—'

'আচ্ছা।' অবনীমোহন বললেন, 'পরেই শুনব।'

যুগলের কাছে বসে উদ্গ্রীব তাকিয়ে ছিল বিনু। লারমোর নামে এই মানুষটি সম্বন্ধে তার মনে অসংখ্য জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতূহল। লারমোরের কথা জানবার জন্য প্রথম দিন থেকেই উন্মুখ হয়ে আছে সে। ভেবেছিল তার কৌতূহল এবার মিটবে। কিন্তু লারমোর নিজের সম্বন্ধে কিছুই বললেন না, ফলে বিনুর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল।

অবনীমোহন আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই মাঝি দুটো দু'খানা হাতল-ভাঙা চেয়ার নিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল।

লরমোর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিনুকে একটা চেয়ারে বসতে বলে ভিড়ের ভেতর থেকে একজনকে ডেকে অন্য-চেয়ারটায় বসালেন। তারপর মাঝিদুটোর উদ্দেশে বললেন, 'বাক্স খোল—'

মাঝিরা সেই বড় টিনের বাক্সদুটো খুলে ফেলল। বিনু দেখতে পেল তার ভেতর নানারকম ওষুধবিষুধ, নাক-কান-গলা-জিভ এবং বুক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, ইঞ্জেকসানের ছোট চ্যাপ্টা লম্বাটে বাক্স।

যন্ত্রপাতি আর ইঞ্জেকসানের বাক্সটা টেবিলের ওপর সাজিয়ে অন্য চেয়ারের লোকটার দিকে তাকালেন, 'কেমন আছিস রে জিগিরালি ?'

লোকটা মধ্যবয়সী। মুখময় কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি খাড়া হয়ে আছে, ফলে সজারুর কাঁটার মতন দেখায়। চোখদু'টি ঘোলাটে এবং রুগ্ন। কাতর সুরে জিগিরালি বলল, 'ভাল না সাহেব।'

লারমোর শুধোলেন, 'কী হল আবার ?'

'তিন দিন ধইরা ধুম জ্বর। হেই জ্বর আর ছাড়ে না।'

বুকটুক পরীক্ষা করতে করতে লারমোর বললেন, 'গেল হাটে দেখে গেছি, ভাল। এর ভেতর জ্বর বাধালি কী করে ?' বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে গেল, 'এ কি !'

জিগিরালি বলল, 'কী সাহেব ?'

'বুকে বিশ পাসারি (এক পাসারি—মানে আড়াই সের) কফ জমল কি করে ! গেল হাটে তো কফ দেখি নি।'

জিগিরালি চুপ।

লারমোর ধমকে উঠলেন, 'হারামজাদা, মুখ বুজে থাকলে চলবে না। বল, কী করেছিলি—'

ভয়ে ভয়ে একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল জিগিরালি। অস্ফুট গলায় বলল, 'মাছ মারতে নদীতে নামছিলাম, তাই—'

নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন লারমোর। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'তোকে না বলেছিলাম, ঠান্ডা লাগাবি না—'

'কী করুম সায়েব, মাছ না মারলে, হেই মাছ হাটে হাটে গিয়া না বেচলে সংসার চলবে ক্যামনে ? পোলাপান খাইব কী ?'

'কেন, তোর বড় ছেলেটা করে কী ? দুটো দিন সংসার চালিয়ে নিতে পারে না সে ?'

জিগিরালির মুখে নৈরাশ্যের ছায়া পড়ল। তিক্ত স্বরে সে বলল, 'হয় তো বাইচা যাইতাম। হ্যায় চালাইব সোমসার ! তাইলে আমার দুঃখু ঘুচব ক্যান। ভাবছিলাম পোলা ডাঙ্গর হইছে, এইবার সুখের লাগুর (নাগাল) পামু। আ আমার অদিষ্ট !' কপালে একটা চাপড় মেরে আবার শুরু করল, 'পোলায় হইছে কবিদার (গ্রাম্য কবিগান রচয়িতা এবং গায়ক)। মাথায় গন্ধত্যাল মাইখ্যা চোখে সুর্মা লাগাইয়া হ্যায় আসরে গান গায়। বাপের আসান করতে জলে লামব, মাছ মারব—এই সগল কি তারে মানায় ! সোম্মানে লাগে না !'

লারমোর রেগে গেলেন, 'বাপ এদিকে মরছে আর উনি কবিদার হয়ে বসেছেন ! কোথায় সেই উল্লুকটা ?'

'আসনের সোমায় বাড়িতেই দেইখা আইছি।'

'কালই আমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দিবি।'

'হ্যায় কি আইব ?'

'তার ঘাড় আসবে। আমার কথা বলবি। বলবি লালমোহন সাহেব যেতে বলেছে। বাঁশডলা দিয়ে তার কবিয়ালি ছুটিয়ে দেব।'

লালমোরের যে চেহারাটা বিনুর মনে গভীর রেখায় আঁকা হয়ে গেছে সেটা মধুর স্নেহময় একটি মানুষের চেহারা। তার বাইরেও যে তাঁর আরেকটা রূপ আছে, তিনি যে এত রেগে যেতে পারেন, বিনু তা কল্পনাই করতে পারে নি। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে থাকল।

পরীক্ষা-টরীক্ষা করে জিগিরালিকে ওষুধ দিতে দিতে লারমোর বললেন, 'দিনে তিন বার খাবি। সকালে-দুপুরে-রাত্তিরে। আর সংসার রসাতলে যাক, জাহান্নামে যাক, না খেয়ে গুষ্টিসুদ্ধু মরুক, তবু ঘর থেকে বেরুবি না। যদি শুনি এই জ্বর নিয়ে আবার জলে নেমেছ লাঠি দিয়ে পা দু'খানা গুঁড়ো করে দিয়ে আসব।'

জিগিরালি মাথা নেড়ে জানাল তিনবার করে ওষুধ খাবে এবং ঘর থেকে বেরুবে না। বলল, 'অহন তাইলে যাই। আদাব লালমোহন সাহেব—'

'যাবি তো পথ্যের পয়সা আছে?'

জিগিরালি উত্তর দিল না, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

লারমোর বললেন, 'পয়সা চাইতে বুঝি মিঞা সাহেবের মানে লাগে?' পকেট থেকে একটা সিকি বার করে দিতে দিতে বললেন, 'এই নে। বার্লি টার্লি কিনে নিস।'

জিগিরালি এবারও কিছু বলতে পারল না। ঠোঁটদুটো থরথর করল শুধু আর কৃতজ্ঞতায় চোখ সজল হয়ে উঠল।

জিগিরালি চলে গেলে ভিড়টার দিকে তাকিয়ে লারমোর ডাকলেন, 'বুধাই পাল এস—'

যে উঠে এল তার বয়স ষাটের কাছাকাছি। খালি গা, খালি পা। গায়ের চামড়া খসখসে, খই-ওড়া। গোল গোল হলদে চোখ। জয়ঢাকের মতন মস্ত পেটের ওপর সরু হাড় জিরজিরে বুক। গলাটাও সরু, তার ওপর প্রকান্ড মাথা—পাঁশুটে রঙের চুলে সেটা ঝুপসি হয়ে আছে। আচ্ছাদন বলতে নেংটির চাইতে সামান্য বড় একটা ময়লা চিটচিটে টেনি।

জিগিরালির খালি চেয়ারখানা দেখিয়ে লারমোর বললেন, 'বোসো—'

বুধাই পাল বসল না।

লারমোর বললেন, 'কী হল, বোসো—'

ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বিনীত সুরে বুধাই পাল বলল, 'আইজ্ঞা না, আপনের সামনে আমি চ্যারে (চেয়ারে) বইতে পারুম না।'

'কেন হে?'

'আপনের সামনে চ্যারে বসুম, আপনের এট্টা সোম্মান নাই?'

'ঠিকই তো, ঠিকই তো।' রহস্য করে হাসতে হাসতে বুধাই পালের একাখানা হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন লারমোর।

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল বুধাই পাল, 'এইটা কী করলেন লালমোহন সাহেব, এইটা করলেন কী?'

'ভয় নেই। তুমি চেয়ারে বসলে আমার সম্মানের একটুও ক্ষতি হবে না।'

বাড়তি দু'খানা চেয়ারের কী প্রয়োজন, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে বিনু। একটা তার জন্য, আরেকটা রুগীদের জন্য। প্রিচ করার বদলে আজকাল হাটে এসে লারমোর কী করেন, তা-ও টের পাওয়া গেল। চারদিক থেকে সুজনগঞ্জের হাটে যত রুগী আসে তিনি তাদের চিকিৎসা করে থাকেন।

লারমোর বললেন, 'তারপর পালমশাই, ক'মাস পর দেখা দিলেন?'

'আইজ্ঞা, দুই মাস।'

'এতদিন ছিলেন কোথায়?'

'গাওয়ালে গেছিলাম।'

এই সময় বিনু হঠাৎ বলে উঠল, 'গাওয়াল কী?'

লারমোর বিনুর দিকে ফিরে হাসলেন, 'কুমোরেরা মাটির হাঁড়ি-কলসী-পাতিলে বড় বড় নৌকো বোঝাই করে নদীর চরের দিকে পাড়ি দেয়। হাঁড়ি-কলসীর বদলে ওরা পয়সা নেয় না, ধান নেয়। দু-চার মাস পর নৌকো ভর্তি ধান নিয়ে তারা চর থেকে ফিরে আসে। একে বলে গাওয়াল করা।'

'ও।'

এতক্ষণ বুধাই পাল খেয়াল করে নি। এবার তার চোখ এসে পড়ল বিনু আর অবনীমোহনের ওপর। হাতজোড় করে বলল, 'এনারা?'

লারমোর বললেন, 'তোমাদের হেম কর্তার নাতি আর জামাই।'

খুব ব্যস্তভাবে এবং সম্ভ্রমভরে উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে দিল বুধাই পাল, 'পন্নাম হই গো জামাইবাবু নাতিবাবু? কি সুভাগ্যি, আমাগো হ্যাম কত্তার নাতি-আর জামাইরে দেখলাম।'

ঠিক এই সময় জিগিরালি আবার ফিরে এল। মুখ কাঁচুমাচু করে লারমোরকে বলল, 'বড় অন্যায় হইয়া গেছে গো সাহেব।' অবনীমোহনদের দেখিয়ে বলল, 'এনাগো কথা জিগাইতে একেরে ভুইলা গেছি।'

লারমোর অবনীমোহনদের পরিচয় দিলেন।

এরপর জিগিরালি আর বুধাই পাল, দু'জনে মিলে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগল। অবনীমোহনরা কোথায় থাকেন? কলকাতায় থাকেন শুনে বলল, এতকাল আসেন নি কেন? এসেছেন যখন দু-চার মাস অন্তত এই জলের দেশে থেকে যেতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্নোত্তরের পর সসম্ভ্রমে সেলাম করে জিগিরালি চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, 'শরীলটা ইট্টু ভাল হইলে হ্যাম কত্তার বাড়িত্ যামু। আপনেগো লগে দুইখান কথা কইলেও পরান জুড়ায়।'

অবনীমোহন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, একটা অসুস্থ রুগ্ন মানুষ শুধু তাঁদের পরিচয় জানবার জন্য জ্বর গায়ে আবার ফিরে এসেছে, আগে তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিল বলে অসীম সঙ্কোচে বিব্রত হয়ে আছে—ভাবতেই অবাক হয়ে গেলেন তিনি। গাঢ় গলায় বললেন, 'তোমার আসতে হবে না, আমরাই একদিন তোমার বাড়ি যাব।'

'যাইবেন তো, যাইবেন তো?' চোখ আলো হয়ে উঠল জিগিরালির।

'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

জিগিরালি চলে গেলে লারমোর বুধাই পালকে বললেন, 'আর অন্য কথা না, এইবার আপনার পেটের কথা বলুন পালমশাই। কেমন আছেন তিনি?'

মাঝে মাঝে বুধাই পালকে 'আপনি' করে বলছেন লারমোর। বিনু বুঝল, ওটা ঠাট্টা।

এদিকে পেটের কথায় মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল বুধাই পালের।

নাকের ভেতর থেকে দুর্বল একটা সুর বার করে সে বলল, 'প্যাটের গতিক সুবিধা বুঝি না লালমোহন সাহেব।'

'কেন?'

বুধাই পাল চুপ।

লারমোর বললেন, 'সামনে এস, পেটখানা দয়া করে দেখাও—'

ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বুধাই পাল। লারমোর পেটে হাত দিতে না দিতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'উ-উ, লাগে—'

'লাগে নাকি?'

'হ সাহেব, বেজায় লাগে।'

পেটটা আস্তে আস্তে টিপে লারমোর আঁতকে উঠলেন, 'দু'মাসে পেটটাকে করেছ কী!'

'আইজ্ঞা—'

'তোমার পেটে ক'টা পিলে হে?'

'সাহেবের যেমুন কথা!' বুধাই পাল ফোকলা মাড়ির ওপর ক'টা হলদে দাঁত বার করে হাসতে লাগল, 'মাইন্ষের আবার কয়টা পিলা হয়? একটাই পিলা আমার।'

লারমোর বললেন, 'একটাই ছিল, তবে এই দু'মাসে গাওয়ালে গিয়ে আরো গোটা পাঁচ-সাতেক জুটিয়ে এনেছ। আর এক-একটা পিলে গায়েগতরে কোল বালিশের মতন।'

বিনু, যুগল, অবনীমোহন, এমন কি অদূরে সেই অসুস্থ রোগগ্রস্ত লোকগুলোও হাসতে লাগল। সবার সঙ্গে বুধাই পালও পাল্লা দিয়ে হাসছে।

লারমোর শুধোলেন, 'পেটটার এমন দশা করলে কেমন করে? গাওয়ালে গিয়ে ভেবেছিলে, লালমোহন সাহেব তো সামনে নেই, কে আর বকাঝকা করবে। প্রাণের সুখে অপথ্য-কুপথ্য করে গেছ, না?'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে একসঙ্গে হাত এবং মাথা ঝাঁকিয়ে বুধাই বলল, 'গুরুর কিরা (দিব্যি) সাহেব, আপনে যা যা খাইতে কইছিলেন তার বাইরে দাতে কিছু কাটি নাই।'

'কিছু না?'

'না।'

'সরষে দিয়ে ইলিশ-ভাতে খাও নি?'

'ঐ জিনিস না খাইয়া পারি?'

'পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে শুটকি মাছ?'

'ঐটাও খাইতে চাই নাই। তয়—'

'তবে খেলে কেন?'

কিছুক্ষণ হাত কচলে নিজের বুকে একখানা আঙুল রাখল বুধাই পাল। করুণ গলায় বলল, 'এইর ভিতরে যার বাস হেই আত্মায় চাইল যে। আমি কী করুম?'

'তাই তো, কি আর করা। তা হ্যাঁ হে পালমশাই, তেঁতুল দিয়ে পুঁটি মাছের টকের কথাটা বল—'

বুধাই পাল চুপ।

লারমোর বললেন, 'লজ্জা কি, লজ্জা কি, বলেই ফেল না। পুঁটি মাছের টকটাও নিশ্চয়ই পরমাত্মা চেয়েছিল?'

বুধাই এবার আর মুখ খুলল না, আস্তে করে মাথা হেলিয়ে বুঝিয়ে দিল।

লারমোর আঙুল দিয়ে তার চিবুকটা ঠেলে উপর দিকে তুললেন, তারপর চোখের ভেতর তাকিয়ে বললেন, 'পালমশাই, ধন্বন্তরির বাপেরও সাধ্যি নেই আপনার রোগ সারায়। এক কাজ করুন—'

বিপন্ন মুখে বুধাই পাল তাকিয়ে থাকল।

লারমোর বলতে লাগলেন, 'যমরাজকে খবর দিন, খুব তাড়াতাড়ি তিনি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে একটা পুষ্পকরথ পাঠান।'

হঠাৎ উবু হয়ে বসে লারমোরের দু'খানা পা চেপে ধরল বুধাই পাল। কাতর মিনতিপূর্ণ সুরে বলল, 'আমারে বাচান সাহেব, প্যাটে বড় যন্তন্না। এইবার থিকা আর আপনের অবাইধ্য হমু না। যেমন কইবেন তেমুন চলুম।' আর অবাইধ্য হমু না।'

'তোমার কথায় বিশ্বাস নেই।'

'আরেক বার, খালি আরেকটা বার—গুরুর কিরা, আর ঐ সগল খামু না।'

'ঠিক?'

'ঠিক সাহেব।'

ওষুধ-টষুধ দিয়ে লারমোর বললেন, 'তেল-টেল, পেঁয়াজ-রসুন, সব বাদ। তিন মাস শুধু দুধ-ভাত

খাবে। নইলে পেটের পিলে আর ঘা তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে।'

বুধাই পাল বলল, 'দুধ খাওনের ক্ষ্যামতা কি আমাগো লাগান মাইনষের আছে?'

লারমোর বললেন, 'না থাকে, দু'মাসে তুমি আমার কাছে এসে থাকো। আমার তিনটে গরু আছে, সাত-আট সেরের মতন দুধ হয়।'

বিনুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, স্নেহলতা লারমোরকে তাঁদের বাড়ি গিয়ে থাকতে বলেছেন। তাই নিয়ে স্নেহলতার কত রাগ, কত অভিমান। আর লারমোর কিনা তাঁর কাছে গিয়ে থাকবার জন্য লোক জোটাচ্ছেন! ব্যাপারটা ভাবতেই ভারি মজা লাগল বিনুর।

বুধাই পাল বলল, 'বাড়িঘর ফালাইয়া আপনের কাছে গিয়া কি থাকতে পারি? সোমসার দেখব কে?'

'তা হলে এক কাজ করো, তোমার নাতিকে আমার ওখানে রোজ সকালে পাঠিয়ে দিও। দুধ দিয়ে দেব।'

'হেই ভাল। তাহলে অহন যাই। পন্নাম সাহেব, পন্নাম জামাইবাবু, নাতিবাবু—' বুধাই পাল চলে গেল।

বুধাই পালের পর ডাক পড়ল সোনা মিঞার, তারপর চন্দ্র ভুঁইমালীর, তারপর রজবালি তালুকদারের। এইভাবে একের পর এক রুগী দেখা চলল।

বুক-পেট পরীক্ষা করতে করতে শুধু রোগ সম্বন্ধেই খোঁজখবর নিচ্ছেন না লারমোর, অন্য কথাও বলেছেন। রজবালিকে তিনি হয়তো বললেম, 'এবার কত কানি (চার বিঘেতে এক কানি) জমিতে পাট বুনেছিলি?'

রজবালি জবাব দিল, 'আড়াই কানি।'

'গেল বার তো পাট বুনে লোকসান দিয়েছিলি, এবার লাভ থাকবে?'

'মনে তো লয়, অহন খোদার ইচ্ছা।'

'হ্যাঁ। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কী আর বল—'

চন্দ্র ভুঁইমালীকে হয়তো বললেন, 'এবারে বর্ষায় তোমার দক্ষিণের ভিটের ঘরখানা না পড়ে গিয়েছিল চন্দর?'

'হ।' চন্দ্র মাথা নাড়ে।

'সেটা উঠিয়েছ?'

'আপনেগো আশীর্বাদে উঠাইছি লালমোহন সাহেব। আগে চালে আছিল ছন, এইবার টিন দিছি—নয়া ঢেউ-খেলাইনা (ঢেউ-খেলানো) টিন। খুব পোক্ত হইছে ঘর।'

'খুব ভাল, খুব ভাল।'

'একদিন গিয়া দেইখা আইসেন সাহেব, হ্যামকত্তারেও কইছি পায়ের ধূলা দিতে।'

'যাব যাব, নিশ্চয়ই যাব। হেমকে নিয়ে একদিন তোমার নতুন ঘর দেখে আসব।'

অসুখ আর অসুখের বাইরে অন্য সব কথার ফাঁকে রুগীরা অবনীমোহন এবং বিনুর সঙ্গে যেচে আলাপ করে নিচ্ছে। হেমনাথের জামাই আর নাতি শুনে তাদের কি আনন্দ আর সমাদর!

দেখতে দেখতে ভিড়টা ফাঁকা হয়ে গেল। এখন আর একটিও রুগী নেই। বিনু লক্ষ করেছে, রুগী দেখে একটা পয়সাও নেন নি লারমোর। বরং বিনা পয়সায় সবাইকে ওষুধ দিয়েছেন, কাউকে কাউকে পথ্যের জন্য ফতুয়ার পকেট থেকে পয়সা বার করে দিয়েছেন। বিনুর মনে হল, একেই সেদিন লাভের কারবার বলে ঠাট্টা করেছিলেন হেমনাথ।

ওদিকে অবনীমোহনও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এবার বললেন, 'আপনি তো দেখলাম ঐ রুগীদের সবাইকে চেনেন।'

লারমোর হাসলেন, 'চিনি বৈকি।'

'নামও তো জানেন।'

'জানাই উচিত। চল্লিশ বছরের মতো এখানে কেটে গেল।' বলতে বলতে চোখের মণিতে যেন ঘোর লেগে গেল লারমোরের, 'যখন এসেছিলাম তখন আমি যুবক, আর আজ বৃদ্ধ।'

লারমোর যা বলে গেলেন, সংক্ষেপে এইরকম। রাজদিয়াকে ঘিরে ষাট-সত্তর মাইলের ভেতর যত গ্রাম, যত জনপদ, যত মানুষ, এমনকি প্রতিটি বৃক্ষলতা আর পাখি—সব, সব তাঁর চেনা। এই সজল বিশাল ভূখণ্ডে আয়ুর প্রায় সবটুকুই তো কাটিয়ে দিলেন। এখানে কোথায় কোন বাড়িতে শিশু জন্মাচ্ছে, কোথায় মৃত্যু ঘটছে —সমস্তই জানেন লারমোর। জন্ম-মৃত্যু—কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে হবার উপায় নেই। পূর্ব বাংলার এই কোমল সজল অংশের ওপর তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

বলতে বলতে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ ঘোরটা কেটে গেল। লারমোর চঞ্চল হলেন, 'ইস, বেলা হেলে গেল! এখনও হেমের দেখা নেই।'

সত্যি সত্যিই সূর্যটা এখন আর মধ্যাকাশে নেই, পশ্চিমের আকাশ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রংও গেছে বদলে। তাতে নরম সোনালি আভা লেগেছে। ফলে চারদিকের গাছপালার পাতা সোনার ঝালর হয়ে দুলছে।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে লারমোর বললেন, 'হেমের একটা খোঁজখবর নেওয়া দরকার। কোথাও বসে গেলে উঠবার নাম নেই তার।' বলতে বলতে বিনুর সম্বন্ধে সচেতন হলেন, 'আরে, দাদাভাইটার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। শুকোবার কথাই। কখন দু'টি খেয়ে এসেছে! এই যুগল, চট করে দাদাভাইয়ের জন্যে রসগোল্লা আর সন্দেশ নিয়ে আয়। মনা ঘোষের দোকান থেকে আনবি।' পয়সা বার করতে পকেটে হাত পুরলেন লারমোর।

এতক্ষণ দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে চুপচাপ বসে ছিল যুগল, বলামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আর সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল বিনুর, সেটা ধরা পড়ে যাওয়াতে লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকল সে।

লারমোর কিন্তু পয়সা বার করতে পারল না। তার আগেই বাধা পড়ল। অবনীমোহন বললেন, 'খাবার আনতে হবে না। আমি বরং বিনুকে খাইয়ে আনি, যুগলও সঙ্গে যাক।'

'তুমি আবার কষ্ট করে যাবে কেন?'

'কষ্ট কিছু না। আসলে—'

লারমোর জিজ্ঞাসু চোখ তাকালেন, 'কি?'

অবনীমোহন বললেন, 'পূর্ব বাংলায় এই প্রথম এলাম। এখানকার হাট-টাট কিছুই তো দেখি নি। বিনুকে খাওয়াতে গিয়ে হাটটা ঘুরে দেখব।'

লারমোর উৎসাহের সুরে বললেন, 'খুব ভাল। রুগীর কাছে বসে না থেকে একটু ঘুরে এস।'

'তা ছাড়া—'

'কী?'

'ঘুরতে ঘুরতে যদি মামাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—'

'তবে তো আরো ভাল। যাও—যাও—'

একটু ভেবে নিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'আপনিও চলুন না লালমোহন মামা—'

লালমোহন বললেন, 'আমি কি করে যাব?'

'আপনার রুগী-টুগী তো এখন নেই'

'তা নেই। কিন্তু যে কোনো সময় এসে যেতে পারে। এত দূর দূর জায়গা থেকে ওরা আসে। সপ্তাহে একদিন মোটে হাট। আমাকে না পেলে ওদের কত কষ্ট হবে বল তো?'

দু'চোখে অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে সেবাব্রতী নিঃস্বার্থ মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন অবনীমোহন। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, 'কতক্ষণ এখানে থাকবেন ?'

'সেই সন্ধে পর্যন্ত। হাট ভাঙলে উঠব।'

'আপনিও তো সেই সকালবেলা খেয়ে এসেছেন। আমি কিন্তু খাবার নিয়ে আসব।'

লারমোর মধুর হাসলেন, 'বেশ তো, এনো।'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না, বিনু আর যুগলকে নিয়ে হাটের দিকে চললেন।

আগে আগে চলেছেন অবনীমোহন, পেছনে যুগল আর বিনু।

একটু পর তারা সেই পুরনো আধভাঙা মন্দিরটার সামনে এসে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে অবনীমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিসের মন্দির যুগল ?'

যুগল বলল, 'বিষহরির।'

বিনু বুঝতে পারে নি। সে তাড়াতাড়ি শুধলো 'বিষহরি কী ?'

'মা মনসা।' যুগল বলতে লাগল, 'আইতেন শাবণ মাসে, দেখতেন এইখানে পূজার কি ধূম। রাইজ্যের মানুষ ঐ সময়টায় পাথরের খাদাভরা (পাথরের বাটিভর্তি) দুধ আর সবরি কলা নিয়া ভাইঙ্গা পড়ে।'

মন্দিরের পর খানিকটা জঙ্গল মতন। ছোট বড় ক'টা তেঁতুল গাছ, কিছু আগাছা, কিছু বুনো কচু, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর থেকেই হাটের চালা শুরু হয়েছে।

আশ্বিন মাসের এই পড়ন্ত বেলায় রোদের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে আসছে, চারদিকের গাছগাছালির মাথায় সোনালি আভা লেগেছে। এই সময় সুজনগঞ্জের হাট জমে উঠেছে। দরাদরি আর চেঁচামেচি-চিৎকারে চারদিক সরগরম।

বিনুরা এখন হাটের যে অংশে সেটা তরিতরকারির বাজার। চারদিকে বড় বড় বেতের ধামা আর বাঁশের চাঙাড়িতে সজীব পরিপুষ্ট শাক এবং আনাজ সাজানো। ব্যাপারীরা সবাই চাষী শ্রেণীর মানুষ।

যেতে যেতে একটা ব্যাপারীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন অবনীমোহন। বললেন, 'তোমার বেগুন কত করে ?

লোকটা বলল, 'ড্যাড় পহা স্যার (সের)।'

অবনীমোহন অবাক, 'দেড় পয়সা !'

'হ, তয় আপনে যদি এক পাসারি কিনেন তিন পহায় দিয়া দিমু।'

'পাসারি কী ?'

'আড়াই স্যার।'

'আড়াই সের বেগুন তিন পয়সা। বল কী !'

'দর নি বেশি কইলাম বাবু। তাইলে এক পাসারি দুই পহাই দিয়েন।'

'এত শস্তা !'

ব্যাপারী লোকটা মুসলমান। বিস্ময়-ভরা চোখে ভাল করে অবনীমোহনকে দেখে নিয়ে বলল, 'এরেই শস্তা কইলেন বাবু !'

অবনীমোহন হতবাক, 'শস্তা না !'

'উঁহু, গেল সন এই আশ্বিন মাসে পহায় দুই স্যার কইরা বাগুন বেচছি। আইজ হেই বাগুনের পাইকারি দর উঠছে পহা পহা স্যার। দিনকাল যে কী পড়ল! হাটখান ঘুইরা দ্যাখেন, জিনিসপত্তরে আর হাত দ্যাওন যায় না। সগল কিছু আক্কারা, এক্কেরে আগুন।'

অবনীমোহনের বিস্ময় বাড়ছিলই। বললেন, 'গেল বছর পয়সায় দু সের বেগুন ছিল!'

'তয় আর কই কী?' ভাল করে অবনীমোহনকে আরেক বার দেখে নিয়ে বেগুন ব্যাপারী বলল, 'বাবু নিয্যস আমাগো এইদিকে থাকেন না?'

'না।'

'আমিও তাই ভাবছি। এইখানের হইলে পহায় দুই স্যার বাগুন শুইনা আটাশ যাইতেন না (অবাক হতেন না)। বাবু থাকেন কই?'

'কলকাতায়।'

'কইলকাতার মাইন্‌ষের কথাই ভিন্ন।'

'কেন?'

'দশ পহা স্যার বাগুন হইলেও তাগো কাছে শস্তা। এক এক পূজায় তেনারা কইলকাতার থনে আসে আর এইখানে জিনিসপত্তরের দাম চইড়া যায়।' বলতে বলতে ব্যাপারী একটু থামল। তারপরেই কি ভেবে ডাকল, 'আইচ্ছা বাবু—'

'কী?'

'শুনছি কইলকাতায় নি পহা দিয়া মাটি কিনতে হয়!'

হেসে অবনীমোহন মাথা নাড়লেন।

দু'ধারে হাটের চালা, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ। যেতে যেতে চোখের সামনে যা পড়ছে—মানকচু, মেটে আলু, পটল, শুকনো লঙ্কা, নতুন আউশ চাল, মিঠে কুমড়ো—সব কিছুর দর করছেন অবনীমোহন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে যেন মজার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উনিশ শ' চল্লিশ সালে চারদিকে যখন দুর্মূল্যের আঁচ লাগতে শুরু করেছে তখন কলকাতা থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে পূর্ববাংলার সজল শ্যামল ভুবনটিতে সমস্ত কিছুই আশ্চর্য রকমের সুলভ। এত প্রাচুর্য এমন সুলভতা আগে আর কখনও দেখেন নি অবনীমোহন। জীবনে এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা তাঁর।

এদিকে খিদেটা অনেকক্ষণ আগেই পেয়েছিল বিনুর। অবনীমোহনের পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে পেটের ভেতরটা জ্বালা করছে। আর চলতে পারছিল না সে। তাকে খাওয়ানো এবং হেমনাথকে খুঁজে বার করবার জন্যই লারমোরের কাছ থেকে উঠে এসেছিলেন অবনীমোহন। জিনিসপত্রের দর করতে করতে এমন মজা পেয়ে গেছেন যে সে কথা খুব সম্ভব আর মনে নেই তাঁর।

এক সময় বিনু আস্তে করে ডাকল, 'বাবা—'

অবনীমোহন যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পেছন ফিরে বললেন, 'কী রে?'

'বড্ড খিদে পেয়েছে।'

এবার মনে পড়ে গেল অবনীমোহনের। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো। আমি একদম ভুলে গেছলাম।' বলেই যুগলের দিকে তাকালেন, 'মিষ্টির দোকান কোথায় রে?'

নদীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুগল বলল, 'উই দিকে—'

'নিয়ে চল তো।'

নদীর শিয়রে যেখানে মাঝিঘাটা, তার এক ধারে সারি সারি হোগলার ছাউনিতে অস্থায়ী মিষ্টির দোকান বসেছে। গামলা ভর্তি ধবধবে রসগোল্লা, বড় বড় কাঠের বারকোশে লম্বা লম্বা বাদামী চমচম, পাতক্ষীর আর মাথা-সন্দেশ সাজানো রয়েছে। প্রথম দিন পূর্ববাংলার মাটিতে পা দিয়ে রাজদিয়ার স্টিমারঘাটায় এই রকম মিষ্টির দোকান দেখেছিল বিনু।

কাছাকাছি আসতে চারদিক থেকে দোকানীরা ডাকাডাকি করতে লাগল, 'এই দিকে আসেন বাবু, এই দিকে—'

সামনে যে দোকানটা পাওয়া গেল, বিনুদের নিয়ে অবনীমোহন সেখানেই ঢুকে পড়লেন।

দোকানী লোকটা মধ্যবয়সী। পরনে আধময়লা খাটো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় তিন লহর তুলসীর মালা। চোখেমুখে বিনীত ভঙ্গি। সে বলল, 'বসেন বাবুরা, বসেন—'

দোকানের ভেতরে দু'খানা বেঞ্চি পাতা ছিল, অবনীমোহনরা বসলেন।

দোকানী এবার শুধলো, 'কী দিমু বাবু?'

অবনীমোহন বিনু-যুগলের দিকে তাকালেন, 'কী খাবি রে তোরা?'

বিনু কিছু বলবার আগেই যুগল তার কানে ফিসফিস করল, 'অমস্ত দিন রৈদে (রোদে) ঘুরাঘুরি গেছে ছুটোবাবু, রসগোল্লা-পানিতুয়া খাওনের আগে এট্টু মাঠা খাইয়া লন।'

অবনীমোহন শুনে ফেলেছিলেন। বললেন, 'মাঠা কী?'

যুগল লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকল। বিনুকে বলেছে বটে, তার নিজের মনেও কি মাঠার জন্য একটু লোভ ছিল না?

যুগলের হয়ে দোকানীই যেন জবাব দিল, 'মাঠা হইল দইয়ের ঘোল।'

অবনীমোহন উৎসাহিত হলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে মাঠাই দাও—'

খুব ভাল করে তিনটে কাচের গেলাস ধুয়ে ননীভরা সাদা-ধবধবে ঘোলে ভর্তি করল দোকানী। বিনুদের দিতে দিতে বলল, 'খান বাবুরা, তারপর মাখম দিমু।'

ঘোলের গেলাস শূন্য হয়ে গেলে দোকানদার কলার পাতায় করে সবার হাতে এক দলা করে মাখন দিল।

অবনীমোহন বললেন, 'আবার মাখন কেন? মিষ্টিই তো খাব—'

'মাঠা আর মাখন আমরা একলগেই দেই। তার লেইগা ভিন্ন পয়সা লাগে না।'

মাঠা-মাখনের পর কিছু রসগোল্লা আর চমচম নিলেন অবনীমোহনরা। দু-একটা খাওয়া হলে দোকানী শুধলো, 'মিঠাই কেমুন খাইতে আছেন বাবু?'

অবনীমোহন বললেন, 'চমৎকার। তোমার দোকান কতদিনের?'

'অনেক বচ্ছরের। জ্ঞান হওয়া ইস্তক এই কামই করতে আছি। এ আমাগো জাত-ব্যবসা।'

'সুজনগঞ্জের হাটেই দোকানদারী কর?'

'আইজ্ঞা না।' দোকানী হাসল, 'হপ্তায় তো এইখানে মোটে একদিন হাট। একদিনের বিকিকিনিতে কি সংসার চলে বাবু?'

'তবে?'

'আইজ সুজনগুঞ্জ, কাইল গিরিগুঞ্জ—এইভাবে হপ্তায় সগল দিনই কুনোখানে না কুনোখানে হাট থাকে। রোজ একেক খানে ঘুইরা দোকানপাতি করি।'

অবনীমোহন বললেন, 'এই সব মিষ্টি কোথায় তৈরি করেছ? এখানে তো কোনোরকম সরঞ্জাম দেখতে পাচ্ছি না।'

দোকানী বলল, 'মিঠাই বানাই বাড়িতে। হাটের থন রাইতে বাড়িত্ গিয়া বানাইতে বসি। পরের দিন সকালে হেই সগল নায়ে তুইলা হাটে যাই।'

অবনীমোহনের মনে হল, এই সুলভ প্রাচুর্যের দেশেও কারো কারো জীবনযাত্রা রীতিমত কষ্টকর। তিনি বললেন, 'দিনরাত্রি তোমাকে তো বেশ খাটতে হয়।'

'হ বাবু—' দোকানদার হাসল, 'না খাটলে চলব ক্যান?'

একটু চুপ করে থেকে অবনীমোহন বললেন, 'তা তো ঠিকই।'

খাওয়া হলে লারমোর আর হেমনাথের জন্য দুটো ছোট মাটির হাঁড়িতে মিষ্টি নিলেন অবনীমোহন। হাঁড়ি দুটো যুগলের হাতে দিয়ে দাম মিটিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আলাপ- টালাপ হল, তোমার নামটাই জানা হয় নি।'

দোকানী বলল, 'আমার নাম হারান ঘোষ। হাটে আইলে আমার দোকানে আবার আইবেন বাবু।'

'আসব।'

'পন্নাম বাবু—'

'নমস্কার।'

মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে নদীর পাড় ধরে ধরে অবনীমোহন হাঁটতে লাগলেন। বিনু দেখতে পেল, হাটের তলার সেই মাঝিঘাটায় আরো অসংখ্য নৌকো এসে জমেছে। নৌকোয় নৌকোয় নদীর জল দেখা যাচ্ছে না। মাঝিঘাটার মাথায় খয়েরি রঙের চিল উড়ছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, শ'য়ে শ'য়ে।

একটু পর নদীর পার থেকে হাটের ভেতর ঢুকে পড়ল সবাই। অবনীমোহন আবার দর শুরু করে দিলেন। যে জিনিসটি চোখের সামনে পড়ছে, ছেলেমানুষের মতন একবার হাতে তুলে দামটা জেনে নেওয়া চাই তাঁর।

মানুষের স্রোতে লক্ষ্যহীনের মতন কিছুক্ষণ ঘুরবার পর বিনু ডাকল, 'বাবা—'

'কী রে?' অবনীমোহন অন্যমনস্কের মতন উত্তর দিলেন।

'বিকেল হয়ে গেল। দাদুকে খুঁজে বার করবে না?'

'তাই তো, চল-চল—' বলতে বলতে যুগলের দিকে ফিরলেন,'হ্যাঁ রে যুগল, নিত্য দাসের দোকানটা কোন দিকে?'

'অহনই যাইবেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখনই।'

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে বিনুদের নিয়ে নদীর আরেক ধারে এসে পড়ল যুগল। এখানে সারি সারি ধান চালের আড়ত। সেগুলোর ছাউনি মজবুত টিনের, বেড়াও টিনের, গায়ে শাল কাঠের শক্ত খিলান। রীতিমত স্থায়ী বন্দোবস্ত।

আড়তগুলো ঠিক নদীর ধার ঘেঁষে। তার ঠিক তলাতেই বড় বড় হাজার মণী পাঁচশ' মণী মহাজনী নৌকো অগণিত মাস্তুল আকাশের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দেখা গেল একটা আড়তের সামনে খোলামেলা খানিকটা জায়গা। সেখানে বড়সড় একখানা চেয়ারে বসে আছেন হেমনাথ আর তাঁকে ঘিরে অনেক মানুষ ঘন হয়ে বসে আছে। দেখেই টের পাওয়া যায় লোকগুলো সুজনগঞ্জের দোকানী এবং আড়তদার। তাঁদের ভেতর গভীর কোনো পরামর্শ চলছিল।

বিনু ছুটে হেমনাথের কাছে চলে গেল। এতক্ষণ বিনুদের কথা খুব সম্ভব খেয়ালই ছিল না। একটুক্ষণ অবাক থেকে তিনি বললেন, 'দাদাভাই, তুই এখানে!' তারপরেই বুঝিবা সব মনে পড়ে গেল, 'যুগল কোথায়?'

বিনু দেখিয়ে দিল, 'ঐ তো—'

ঘাড় ফেরাতেই যুগলকে দেখতে পেলেন হেমনাথ। খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'এই হারামজাদা, হাটে আসতে এত দেরি করলি কেন? গিয়েছিলি কোথায়?'

ভয়ে ভয়ে যুগল বলল, 'ছুটোবাবুরে নিয়া আমি তো অনেকক্ষণ আইছি।'

'অনেকক্ষণ এসেছিস তো, ছিলি কোথায়?'

কোথায় ছিল, যুগল বলল।

এবার অবনীমোহনের দিকে চোখ পড়ল হেমনাথের। বললেন, 'যুগল সত্যি কথা বলছে অবনী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে এলেন।

যে লোকগুলো হেমনাথকে ঘিরে বসে ছিল, অবনীমোহনদের দেখে তারা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। মুখে অবশ্য কিছু বলছে না, দৃষ্টি কিন্তু অত্যন্ত উৎসুক। হেমনাথ তাদের মনের কথা যেন পড়তে পারলেন। বললেন, 'এরা আমার জামাই আর নাতি। দিন দুই হল কলকাতা থেকে এসেছে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'খানা চেয়ার এসে গেল। বিনু আর অবনীমোহন বসলেন। রাজদিয়ায় পা দেবার পর থেকে যে যত্ন, যে সমাদর আর মর্যাদা পেয়ে আসছেন এখানেও তাই পেলেন অবনীমোহনরা। সেই এক মনোরম অভিজ্ঞতা।

সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর হেমনাথ অবনীমোহনকে বললেন, 'তোমরা একটু বসো অবনী। এদের সঙ্গে একটা কথা হচ্ছিল, সেটা সেরে নিই।'

অবনীমোহন বললেন, 'আচ্ছা—'

হেমনাথ এবার চারধারের লোকগুলির দিকে তাকালেন, 'তা হলে ঐ কথাই পাকা তো?'

সবাই সমস্বরে বলল, 'নিয্যস পাকা। আপনে যা কইবেন বড়কত্তা, তার উপুর কোন শালায় রাও (শব্দ) করব?'

হেমনাথ বললেন, 'না-না, যদি কোনোরকম আপত্তি বা অনিচ্ছা থাকে, নিশ্চয়ই বলবে। এখন আরেক বার সবাই শুনে নাও। হাটের পুজোয় আড়তদারেরা পাঁচ টাকা করে চাঁদা দেবে, আর দোকানীরা দেবে আট আনা করে। চাঁদা তুলবার ভার নেবে হরিপদ, মহেন্দ্র, প্রাণবল্লভ, নিবারণ, বিনোদ—এই পাঁচজন। কে কী করবে তা ঠিক করে দেবে নিত্য দাস।'

সকলে মাথা নাড়ল, 'হ-হ, এইর থনে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হয় না।'

হেমনাথ বললেন, 'ভাল করে ভেবেচিন্তে দেখ, কারো কিছু বলবার আছে কিনা—'

চারদিকের ভিড়টা হইচই করে উঠল, 'না, আমাগো কিছু কওয়ার নাই।'

একটুক্ষণ নীরবতা। বোঝা গেল দুর্গাপুজোর ব্যাপারে পরামর্শ-সভা বসেছে। হাটে আসার সময় এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হেমনাথ।

এক সময় কে যেন বলে উঠল, 'হুধা (শুধু) দুগ্‌গা পূজাই হইব বড়কত্তা? অন্য বছরের লাখান আর কিছু হইব না?'

'আর কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ।

লোকটা বলল, 'দরিদ্র নারাণের সেবা করলে ক্যামন হয়?'

হেমনাথ উৎসাহের সুরে বললেন, 'খুব ভাল কথা। পুজো হবে, ধুমধাম হবে, আর গরিবেরা দুটো খেতে পাবে না?

লোকটা বলল, 'চাউল-ডাইল যা লাগে আমি দিমু।'

হেমনাথ বললেন, 'তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ নিত্য দাস।'

এই তা হলে নিত্য দাস। লোকটার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, ছোটখাটো মজবুত চেহারা। পরনে ধুতি আর মোটা কাপড়ের নিমা (একজাতীয় জামা)। লোকটার চোখেমুখে সর্বাঙ্গে বিনয় এবং স্নিগ্ধতা মাখানো।

হেমনাথের কথায় কী প্রেরণা ছিল, কে জানে। আরেকটা লোক বলল, 'মসলাপাতি আর আনাজপাতির খরচ আমার।'

ভিড়ের দূর প্রান্ত থেকে অন্য একজন বলে উঠল, 'পূজা হইব আর এক রাইত যাত্রা হইব না? সগল বারই হয় কিলাম।'

হেমনাথ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের কী মত?'

সবাই বলল, 'অন্য অন্য বার যহন যাত্রা হয় তহন এইবারও হইব।'

'বেশ।'

কে একজন বলে উঠল, 'বরিশালের নট্ট কোম্পানির যাত্রা চাই। আর এক রাইত কবিগান।'

অন্য একজন বলল, 'এক রাইত কাচ নাচ হইক—'

আরেকজন বলল, 'এক রাইত কিলাম সারি গানও দিতে হইব বড়কত্তা—'

কাজেই স্থির হল ষষ্ঠী-সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী, পর পর এই চার রাত যাত্রা কবিগান-কাচনাচ এবং সারিগানের আসর বসবে।

শুনতে শুনতে বিনুর চোখ চকচক করতে লাগল। মনে পড়ল যুগলও সেদিন যাত্রাপালা আর কবিগানের কথা বলেছিল। যুগল ভরসা দিয়েছিল, পুজোর সময় একদিন সুজনগঞ্জে নিয়ে আসবে। তবু দাদুকে ধরতে হবে। যাত্রা এবং কবিগানের জন্য, কাচনাচ আর সারিগানের জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে।

পুজোর ব্যাপারে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে চঞ্চল হলেন হেমনাথ। দ্রুত অবনীমোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'বিনুদাদা তো সেই সকালবেলা চাট্টি খেয়ে বেরিয়েছে, তুমিও তাই। কিছু খেয়ে—'

তাঁর কথা শেষ হল না, তার আগেই অবনীমোহন বলে উঠল, 'আমরা এইমাত্র খেয়ে এসেছি। আপনার জন্যে আর লালমোহন মামার জন্যে মিষ্টি এনেছি।'

হেমনাথ বললেন, 'আমি তো বাইরে বিশেষ খাই না। বরং লালমোহনকে পাঠিয়ে দাও—'

যুগলকে দিয়ে লারমোরের কাছে মিষ্টির হাঁড়ি পাঠিয়ে দিলেন অবনীমোহন। এদিকে কে যেন বলে উঠল, 'আশ্বিনের আইজ পাচ তারিখ, পূজা পড়ছে আটাইশ তারিখে। অহনও তো পরতিমা বানাইতে দেওয়া হইল না—'

হেমনাথ বললেন, 'গেল বার ঠাকুর বানিয়েছিল কে ?'

'নগা পাল।'

'কোন নগা ? তালতলির ?'

'হ।'

'রাজদিয়া ফেরার পথে তো তালতলি পড়বে, যাবার সময় নগাকে প্রতিমা বানাতে বলে যাব।'

'তাহলে তো খুব ভাল হয়—'

আবাব পুজোর কথায় মেতে উঠলেন হেমনাথ। ইতিমধ্যে লারমোরকে খাবার দিয়ে ফিরে এসেছে যুগল।

এদিকে সূর্যটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পশ্চিমের গাছগাছালির ওপারে সেটা অদৃশ্য হয়েছে। সূর্য নেই কিন্তু তার শেষ আভাটুকু এখনও চারদিক ছুঁয়ে আছে। হঠাৎ-লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মতন আকাশটা এখন লাল টুকটুকে। এরই মধ্যে পাখিরা অধীর হয়ে উঠেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

বেলাশেষের নিবু-নিবু রক্তিম আলোর দিকে তাকিয়ে অবনীমোহন চঞ্চল হলেন। আস্তে করে ডাকলেন, 'মামাবাবু—' হেমনাথ তাকালে বললেন, 'সন্ধে হয়ে আসছে। মামীমা কিসব কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন—'

হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে দাঁড়ালেন হেমনাথ, 'ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ।' বলেই ভিড়টার উদ্দেশে বললেন, 'আজ আর নয়। তোমরা কেউ না কেউ রোজ একটা না একটা ব্যাপারে জড়াচ্ছ, আর বাড়িতে প্রত্যেক দিন গৃহযুদ্ধ বাধছে।'

সবাই একসঙ্গে বলল, 'আপনে ছাড়া আর কার কাছে যামু বড়কত্তা ?'

'খুব হয়েছে। এখন চলি—'

বিদায় নিয়ে অবনীমোহনদের সঙ্গে করে হাটের মাঝখানে চলে এলেন হেমনাথ। তারপর ঘুরে ঘুরে আনাজ কিনলেন, মসলা কিনলেন, পান-তামাক কিনলেন, ধুতি-টুতি কিনলেন। মাছ কিনলেন

দু'রকমের—কই আর চিতল। কই মাছ কেনার সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

হেমনাথ জেলেকে বললেন, 'তিন বাইশা কই দে—'

বিনু শুধলো, 'বাইশা কি দাদু?'

'বাইশা মানে বাইশ।'

কিন্তু দেখা গেল বাইশের বদলে জেলেটা তিন বার ছাব্বিশটা করে মাছ দিল। বিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদু লোকটা বেশি মাছ দিয়েছে—'

হেমনাথ হাসলেন, 'বাইশার মানে যদিও বাইশ তবু ছাব্বিশটা করে দেওয়া এদেশে নিয়ম।'

কথাটা মনঃপূত হল না বিনুর। বাইশের জায়গায় কেন ছাব্বিশটা মাছ দেবে, সে ভেবে পেল না।

মাছটাছ কেনা হলো সুজনগঞ্জের আরেক প্রান্তে নৌকোহাটায় এলেন হেমনাথরা। বিভিন্ন চেহারা আর নামের নতুন নতুন অগণিত নৌকোয় মেলা বসেছে যেন এখানে।

দেখে শুনে বিনুর পছন্দমতন একখানা নৌকো কিনলেন হেমনাথ। নৌকোটা একমাল্লাই এবং ছইওলা। সঙ্গে একটা বৈঠা আর তল্লি বাঁশের লগি পাওয়া গেল।

নৌকোর দাম চুকিয়ে হেমনাথ যুগলকে বললেন, 'তুই নৌকোটা নিয়ে নদী ঘুরে মাঝিঘাটায় আয়। আমরা লালমোহনকে নিয়ে আসছি।'

হাটের সওদা নিয়ে যুগল নতুন নৌকোয় উঠল। আর অবনীমোহনদের নিয়ে সেই বটগাছটার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন হেমনাথ।

আশ্বিনের সন্ধেটা যেন সরু সুতোয় ঝুলছিল, কেনাকাটা সেরে লারমোরের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সুতোটা ছিঁড়ে ঝপ করে কোন পাতালে নেমে গেল।

হাটের চালায় চালায় বিকিকিনি বন্ধ হয়ে গেছে। সারা সুজনগঞ্জ জুড়ে এখন ভাঙা আসর। দরাদরি-চিৎকারের সেই একটানা ভনভনে আওয়াজটাও নেই, তার বদলে মৃদু অবসন্ন একটা গুঞ্জন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সারাদিন ধরে এখানকার সুর যেন খুব চড়া একটা তারে বাঁধা ছিল। অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দ্রুত স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে।

হাটুরে লোকগুলো বেশির ভাগই মাঝিঘাটায় চলে গেছে। এখানে সেখানে দু-চারজন ব্যাপারী কুপি জ্বালিয়ে পয়সা গুনছে, সারাদিনের বেচাকেনার হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে।

বটগাছতলায় এসে দেখা গেল, একটা রুগীও নেই। সেই মাঝিদুটোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে লারমোর টিনের বাক্স গুছোচ্ছেন।

হেমনাথ বললেন, 'সমস্ত দিন বনের মোষ তাড়ানো হল?'

লারমোর হাসলেন, 'তা একরম হল। তোমার ঘোড়ার ঘাস কাটার খবর বল—'

হেমনাথ হো-হো করে মনের সব ক'টি দরজা-জানলা খুলে হেসে উঠলেন, 'ঘোড়ার ঘাস কাটা! বেড়ে বলেছ।' বলেই হঠাৎ হাসি থামিয়ে গভীর স্বরে বললেন, 'কিন্তু সত্যিই কি আমরা ঘোড়ার ঘাস কাটি, বনের মোষ তাড়াই লালমোহন?'

হেমনাথের কণ্ঠস্বরের গভীরতা লারমোরকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'না।'

একটু চুপচাপ। হেমনাথ বললেন, 'নাও এখন চল—'

'যাবে তো, বৌঠাকরুন যা-যা বলে দিয়েছিল, কিনেছ? নইলে আবার হোম ফ্রন্টে লড়াই বেধে যাবে।'

'কিনেছি কিনেছি। যুগলকে দিয়ে সে সব মাঝিঘাটায় পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার চিন্তা করতে হবে না। এখন চল।'

মাঝিঘাটায় এসে মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু। নৌকোয় নৌকোয় আলো জ্বলছে। নদীজলে সেই আলো

পড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে।

মাঝিঘাটে এখন ঘরে ফেরার তাড়া। একের পর এক নৌকো ছেড়ে দিচ্ছে। কাছে দূরে যেদিক যতদূর চোখ যায় শুধু আলোর বিন্দু। ওগুলো যে নৌকোর আলো, বিনু জানে। তবু মনে হয় ওরা যেন রহস্যময় কোন সংকেত, নদীময় ছোটাছুটি করে কাদের যেন বিভ্রান্ত করে চলেছে।

যে নৌকোগুলো এখনও রয়েছে তাদের কোনোটা থেকে মাছের খোলের উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে, কোনোটা থেকে আসছে শান্ত অজানা সুর, কোনোটা থেকে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তনের পদ। ওরা বোধহয় আজ সুজনগঞ্জেই থেকে যাবে।

হেমনাথ খুঁজে খুঁজে যুগলকে বার করলেন। দেখা গেল বুদ্ধি করে নতুন একমাল্লাই নৌকা, নিজের ছোট কোষা নৌকো আর লারমোরের নৌকো—তিনটেকে পাশাপাশি এনে রেখেছে সে। অসংখ্য নৌকোর জঙ্গল থেকে কি করে যে লারমোরের নৌকাটাকে যুগল খুঁজে বার করল, কে বলবে।

নৌকো তিনটে, বাইবার লোকও মোট তিনজন। যুগল আর লারমোরের সেই মাঝি দুটো। স্থির হল, তিনজন তিনটে নৌকো বাইবে। যুগল বাইবে নিজের সেই কোষা নৌকোটা, মাঝি দু'জন বাকি নৌকো দুটো।

বিনুর ইচ্ছে ছিল, ওবেলার মতন এবারও যুগলের নৌকোতেই যায়। সে কথা বলতেই হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'উঁহু রাত্তিরবেলা ঐ বাঁদরের সঙ্গে নৌকোয় যেতে হবে না।'

বিনুর মনে হল, হেমনাথের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যা অমান্য করা যায় না। হেমনাথ আবার বললেন, 'এই, সবাই উঠে পড়।'

লারমোরের সেই নৌকোটায় একে একে সবাই উঠতে যাবে সেই সময় চিৎকার শোনা গেল, 'লালমোহন সাহেব—লালমোহন সাহেব—'

সকলে চকিত হয়ে ফিরে দাঁড়াতেই দেখা গেল তিন-চারটি মুসলমান চাষী ছুটে আসছে। তাদের একেবারে সামনে যে রয়েছে তার বয়েস কম—যুবক। ছুটতে ছুটতে এসে লারমোরের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল, 'বাচান আমার বাজানরে, বাচান সাহেব—'

বিব্রতভাবে লারমোর বললেন, 'কে রে, কে?'

'আমি আপনেগো গহরালি—'

লারমোর বললেন, 'কোন গহরালি রে? ওঠ—ওঠ—'

সঙ্গের মুসলমান মাঝি দুটো একসঙ্গে বলে উঠল, 'চরবেউলার গহউরা—'

'তোরাবালি মন্ডলের ছেলে?'

'হ।'

গহরালি পা জড়িয়ে পড়েই ছিল। লারমোর ব্যস্তভাবে বললেন, 'পা ছাড় গহর। ওঠ—' বলে কাঁধ ধরে তুলবার জন্য ঝুঁকলেন।

গহরালি উঠল না। পায়ের কাছে জোর করে পড়েই থাকল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'আগে কথা দ্যান, বাজানেরে বাচাইবেন, নাইলে উঠুম না, পায়ে মাথা কুটুম।' বলে সত্যি সত্যি লারমোরের পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

লারমোর অত্যন্ত বিব্রতভাবে বললেন, 'কী হয়েছে তোর বাজানের ?'

'দুই দিন ধইরা গলা দিয়া খালি লৌ উঠতে আছে। হুশ-জ্ঞান কিছু নাই।'

এক মুহূর্ত কি ভেবে লারমোর বললেন, 'আমার পা ধরে পড়ে থাকলে তো বাপের রোগ সারবে না। উঠে দাঁড়া।' হেমনাথের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে এখন আর যাওয়া হল না হেম। ওদের সঙ্গে চরবেহুলা ছুটতে হবে।'

হেমনাথ মৃদু হাসলেন, 'সে আমি বুঝেছি।'

লারমোর বললেন, 'বৌঠাকরুনকে বুঝিয়ে বোলো, আজ আর তাঁর হাতের রান্না খাওয়া হল না। ফিরে এসে খাব।'

হাত জোড় করে হেমনাথ বললেন, 'মাপ কর ভাই। তোমার আর তোমার বৌঠাকরুনের ব্যাপারে আমি নেই। শুধু শুধু গলা বাড়িয়ে কোপ খেতে যাবে কোন মূর্খে ? ফিরে এসে তুমিই বুঝিয়ে বোলো।'

সবাই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে লারমোর বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খুব বন্ধু হয়েছিলে! বিপদে পড়লে, উদ্ধার করতে পার না।'

হেমনাথ হাসিলেন। বললেন, 'ফিরছ কবে ?'

'চার পাঁচ দিনের আগে নিশ্চয়ই না, দেরিও হতে পারে। চারবেহুলায় যেতেই তো লাগবে একদিন, ফিরতে আরেক দিন। দুটো দিন পথেই কাটবে। তারপর তোরাবালির অবস্থা বুঝে বেশিদিন থাকা না-থাকা নির্ভর করছে।'

'তা বটে। যেতে যখন হবে, আর দেরি করো না।'

এদিকে গহরালি পা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। লারমোর তাকে বললেন, 'তোদের সঙ্গে নৌকো আছে ?'

'আছে।'

'ভালই হয়েছে। ঐ বাক্স দুটো নিয়ে চল—' যে বাক্স দুটোয় ওষুধপত্তর যন্ত্রপাতি আছে তা দেখিয়ে দিলেন লারমোর।

গহরালিরা বাক্স মাথায় তুলে নিল।

লারমোর হেমনাথদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলি হেম, চললাম অবনী, চলি রে দাদাভাই—'

অবনীমোহন বললেন, 'আসুন।'

হেমনাথ বললেন, 'এস। সাবধানমতন থেকো। বেশি অনিয়ম টনিয়ম করো না। তোমার তো আবার নিজের সম্বন্ধে খেয়াল কম।'

বিনু কিছু বলল না।

নীরব হেসে গহরালিদের সঙ্গে মাঝিঘাটার দূর প্রান্তে চলে গেলেন লারমোর।

কোথায় চরবেহুলা কে বলবে। চর শব্দটা বিনুর অজানা নয়, চারদিকে অসীম অথৈ জলের মাঝখানে উন্মনা ভুঁইচাঁপাটির মতন চরবেহুলা কোথায় ফুটে আছে বিনু জানে না।

লারমোর বলেছিলেন, পুরো একটি দিন লাগে সেখানে যেতে। তার মানে আসছে কাল সন্ধেবেলা তিনি চরবেহুলা পৌঁছুবেন। বিনু কোনোদিন চর দেখে নি। নদীর মাঝমধ্যিখানে উত্থিত একটুকরো ভূমির জন্য সে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে। লারমোর অবশ্য সঙ্গে নিতেন না, অবনীমোহন আর হেমনাথও যেতে দিতেন না, তবু চরবেহুলা যাবার জন্য একবার বায়না ধরলে হতো।

আগেই ঠিক করা ছিল, যুগল আর সেই মাঝি দুটো অর্থাৎ তিনজন তিনখানা নৌকো বাইবে।

যুগল একটা নৌকোয় বসে ছিল। লারমোরের নৌকোর সেই মাঝি দুটো পাড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাদের দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে ? নৌকোয় উঠে আলো জ্বাল।'

মাঝি দুটো দুই নৌকোয় উঠে হারিকেন জ্বালল। হেমনাথরা উঠতে যাবেন, সেই সময় একটা ডাক দূর থেকে ভেসে এল, 'হেই—হেই মাঝি—ই—ই—ই—'

হেমনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখাদেখি অবনীমোহন আর বিনুও দাঁড়াল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছুটতে ছুটতে যারা সামনে এসে পড়ল, তাদের সঙ্গে যে আরেক বার দেখা হয়ে যাবে, বিনু কল্পনাই করতে পারে নি। সেই লোকটা, দুপুরবেলা বটগাছের কাছে দাঁড়িয়ে যে ঢেঁড়া দিয়েছিল, আর দামড়া মোষের মতন তার দুই বাবরিওলা ঢাকী এসেছে। ঢাকী দুটো এখন খালি গায়ে নেই, লম্বা ঝুলের কুর্তামতন হাফশার্ট পরেছে। অবাক বিস্ময় বিনু তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

দেখা গেল, তালগাছের মতন ঢ্যাঙা চেহারার ঢেঁড়াদার লোকটা হেমনাথকে চেনে। সে বলল, 'হ্যামকত্তায় নিহি? আন্ধারে দূর থনে ঠাওর করতে পারি নাই।' বলে ঝুঁকে হেমনাথকে প্রণাম করল। দেখাদেখি বাবরিওলা দুটোও প্রণাম করল।

হেমনাথ বললেন, 'হরিন্দ যে, কী ব্যাপার?'

লোকটার নাম তা হলে হরিন্দ। সে একবার যা বলল, সংক্ষেপে এই রকম। তাদের নিজেদের নৌকো নেই, অথচ নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। হেমনাথকে পেয়ে ভাল হয়েছে। হরিন্দরের ইচ্ছা হেমনাথের নৌকোয় যায়।

হরিন্দ বলল, 'দয়া কইরা আপনেগো লগে যদি আমাগো নেন—'

'তোমরা যাবে কোথায়?'

'অহন যামু ইসলামপুর।'

'ইসলাম পুর তো উত্তরে, 'আমরা যাব পশ্চিমে।'

হরিন্দ বলল, 'পথে অন্য নাও ধইরা নিমু। সুজনগঞ্জ থনে সিধা ইসলামপুরের নাও পাইলাম না।'

হেমনাথ বললেন, 'তা হলে ওঠ।'

সবাই উঠলে হেমনাথ আবার বললেন, 'দেখ বাপু, আমার নৌকোয় যাবে তাতে আপত্তি নেই। তবে একটা কথা—'

'ক'ন হ্যামকত্তা—'

'আমার একজন মোটে মাঝি। একা মানুষের পক্ষে এত লোক নিয়ে নৌকো বাওয়া তো সম্ভব না। তোমাদেরও বৈঠা ধরতে হবে।'

হরিন্দ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ-হ, হেই কথা আর কইতে।' বলেই জোড়া বাবরিওয়ালার দিকে ফিরল, 'কাগা-বগা, তর গিয়ে হালে ব'।'

জোড়া মোষের মতন ঐ ঢাকী দুটোর নাম তা হলে কাগা আর বগা! অদ্ভুত নাম। বিনু এমনিতেই অবাক হয়ে ছিল, তার বিস্ময় আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

ঢাক নামিয়ে কাগা-বগার একজন বৈঠা নিয়ে বসল সামনের গলুইতে, আরেকজন পেছনে। সেই মাঝিটাকে কিছুই করতে দিল না।

মাঝিটা বলল, 'আমার আইলসা (আলস) বানাইয়া রাখবা নিহি?'

কাগা-বগা একসঙ্গে বলল, 'বইয়া বইয়া অহন তুমি তামুক খাও। আমরা গেলে গা নাও বাইও।'

'দ্যাখো দেখি কান্ড! অকম্মা হইয়া বইয়া থাকতে ভাল লাগে!'

একসময় নৌকো চলতে শুরু করল।

ছইয়ের তলায় হারিকেনের আলো ঘিরে এখন বসে আছে চারজন। বিনু, হরিন্দ, অবনীমোহন এবং হেমনাথ। দুই তাগড়া জোয়ান বৈঠা বাইছে। নৌকো যেন জলের ওপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে চলেছে।

হেমনাথ বললেন, 'এবার অনেক দিন পর এদিকে এলে হরিন্দ।'

'আইজ্ঞা—' হরিন্দ মাথা নাড়ল।

'ঢেঁড়া দিয়েছ শুনলাম।'

'আইজ্ঞা, আপনে ঢেরোর জায়গায় যান নাই?'

'না। একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। তা কী ঢেঁড়া দিলে?'

কী ঢেঁড়া দিয়েছে বিশদভাবে বলল হরিন্দ। শুনে মৃদু হাসলেন হেমনাথ, তাঁর চোখেমুখে কৌতুকের আলো খেলতে লাগল।

একটু নীরবতা। তারপর হেমনাথ বললেন, 'কত বছর ধরে ঢেঁড়া দিচ্ছ যেন?'

'তা আইজ্ঞা বিশ পঁচিশ বচ্ছর তো হইবই।'

'জীবনটা ঢেঁড়া দিয়ে দিয়েই কাটিয়ে দিলে!'

'তা একরকম দিলাম হ্যামকত্তা—' হরিন্দ হাসল, 'ঢেরো দেওয়ার কামটা আমার বড় ভাল লাগে। এক মাইন্‌ষের কথা কত মাইন্‌ষেরে শুনাইতে পারি। এক দ্যাশের বাত্তা মুখে কইরা কত দ্যাশে লইয়া যাই। কি ভাল যে লাগে!'

হরিন্দর চোখ চকচক করতে লাগল, উত্তেজনায় খাড়া হয়ে বসল সে।

'এতে রোজগার কিরকম হয়?

'ঐ একরকম।'

'সংসার-টংসার চলে তো?'

'চলে আর কই। ঢাকীগো দিয়া থুইয়া কিছুই আর থাকে না। বাপের আমলের কয়েক কানি ধান জমিন আছে, তাই রক্ষা। নাইলে গুষ্টি সুদ্ধা না খাইয়া মরতে হইত।' বলে একটু থামল হরিন্দ। পরক্ষণেই আবার শুরু করে দিল, 'তয় যে এই আকাম কইরা বেড়াই,—নিশা (নেশা) হ্যামকত্তা, নিশা। পাও পাইতা বইসা দুই দণ্ড যে জিরামু, চাষবাস-সংসার দেখুম—ভাল লাগে না, ভাল লাগে না। কিয়ে জানি সগল সময় আমারে ছুটাইয়া নিয়া বেড়ায়। ঘরে বইতে দ্যায় না।'

হেমনাথ বললেন, 'তোমার বাড়ি তো ফরিদপুর?'

'হ।' ঘাড় কাত করল হরিন্দ, 'পালং থানা, গেরামের নাম ভোজেশ্বর। কবে কইছিলাম, আপনের মনে আছে দেখি!'

'তা আছে।' হেমনাথ হাসলেন, 'বাড়ির খবর কী? সবাই ভাল তো?'

বিব্রত মুখে হরিন্দ বলল, 'বাড়ির খবর জিগাইলে লজ্জা পামু হ্যামকত্তা।'

'কেন হে?'

'ছয় মাস বাড়ি ছাড়া। ভাল মন্দ কিছু জানি না।'

'বড় আজব্বের মানুষ তুমি!'

'এই কথাখান আমার সম্পক্কে সগলেই কয়।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'শিগ্‌গির দেশে ফিরছ?'

হরিন্দ জানাল, 'তা তো কইতে পারুম না। ঢেরো দিতে দিতে যদি ফরিদপুর যাওন হয়, একবার বাড়িত্ যাইতেও পারি।'

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন, 'তোমরা তো এখন ইসলামপুর চললে?'

'আইজ্ঞা—'

'কাল ইসলামপুরের হাট আছে। সেখানে ঢেঁড়া দেবে বুঝি?'

'আইজ্ঞা। সেইখান থনে যামু হাসাড়া, তারপর রসুইনা, তারপর গিরিগুঞ্জ। এই রাইজ্যে সেইখানে

যত হাটগুঞ্জ আছে ঘুইরা ঘুইরা ঢেরা দিতে হইব।'

কি যেন ভেবে নিয়ে হেমনাথ বললেন, 'কতকাল তোমাকে দেখছি। পরের নৌকোয় ঘুরে ঘুরেই ঢেঁড়া দিয়ে বেড়ালে। নিজের নৌকো নিশ্চয়ই এখনও তোমার হয়নি?'

'হইল আর কই। সমস্ত জীবনে কুনোদিন আট দশটা ট্যাকা একলগে করতে পারি নাই, নাও হইব কই থনে? আট ট্যাকার কমে কি নাও হয় হ্যামকত্তা?'

'তা তো বটেই।' হেমনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

বড় বড় চোখ মেলে বিনু হরিন্দর দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে বিস্ময় আর কাটছে না। এই অবারিত জলের দেশে যুগযুগান্ত ধরে দিগ্বিদিকে পাড়ি দিয়ে চলেছে লোকটা, অথচ তার নিজের একটা নৌকোও নেই। হেমনাথ যাবেন পশ্চিমে—সেই রাজদিয়াতে, হরিন্দ যাবে উত্তরে। তার বিশ্বাস, রাস্তায় উত্তরগামী একটা নৌকো পেয়ে যাবেই, তাতে করে ইসলামপুর চলে যেতে পারবে।

যদি পথে নৌকো না মেলে? তবে তো ইসলামপুরে যেতে পারবে না হরিন্দ। ভাবতে গিয়ে মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠল বিনু।

এদিকে যার সম্বন্ধে বিনুর এত অস্থিরতা তার কিন্তু কোনোরকম দুর্ভাবনাই নেই। এত অনিশ্চয়তা, তবু পরম নিশ্চিন্তে হেমনাথের সঙ্গে কেমন গল্প জুড়ে দিয়েছে হরিন্দ।

হরিন্দ বলছে, 'আমার কথাই খালি জিগাইতে আছেন, আপনার কথা কিছুই জানা হইল না। মা-ঠাইরন কেমুন আছেন?'

হেমনাথ বললেন, 'ভালই।

আবার কি বলতে গিয়ে চনমনে চোখে ছইয়ের বাইরে সীমাহীন জলের দিকে তাকাল হরিন্দ। নৌকোটা এর ভেতর সুজনগঞ্জের হাট পেছনে ফেলে অনেক দূর চলে এসেছে। যেদিকে চোখ যায়, গাঢ় অন্ধকার জল আর আকাশকে একাকার করে রেখেছে। নৌকোটা এখন কোথায়, নদীতে অথবা আশ্বিনের জলেডোবা প্রান্তরে—কে বলবে। নদী, জলপূর্ণ মাঠ ঘাট, শষ্যক্ষেত্র কিংবা আকাশকে এখন আর আলাদা করে বুঝবার উপায় নেই।

তবে মাথার ওপর অগণিত স্থির আলোর বিন্দু দেখে টের পাওয়া যায় ওখানে আকাশ আর ওগুলো তারা। নিচেও চোখ পাতলে দূরে দূরে আলোর সঞ্চরণ চোখে পড়ে। বিনু জানে ওগুলো নৌকো—কোনোটা একমাল্লাই, কোনোটা কোষা, কোনোটা বা মহাজনী।

বাইরের অফুরন্ত জলের দিকে একবার তাকিয়ে হরিন্দ কাগা-বগার উদ্দেশে বলল, 'হুশ রাখিস শুয়োরেরা। বাত্তি দেখলে খোজ লইস ইসলামপুরের নাও কিনা।'

কাগা-বগা সমস্বরে বলল, 'আইচ্ছা।'

চোখ দুটো আবার ছইয়ের ভেতর নিয়ে এল হরিন্দ। বলল, 'যে কথা কইতে আছিলাম, মা-ঠাইরন তাইলে ভাল আছেন।'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ ঘাড় কাত করলেন।

'হেইবার, বড় তুফানের সোমায় আপনেগো বাড়িত্ গেছিলাম। মা-ঠাইরনের হাতের ভাত-ব্যন্নন খাইয়া আইছিলাম। ব্যান অমত্ত (অমৃত)। অহনও মুখে লাইগা আছে। কতবার ভাবছি আরেক দিন গিয়া মা-ঠাইরনের হাতের পাক খাইয়া আসুম।'

'আজই চল না।'

'না হ্যামকত্তা, আইজ না। অন্য দিন যামু।'

হরিন্দ বলবার পর কাগা-বগা নৌকো বাইতে বাইতে মাঝে মাঝে চিৎকার করছিল, 'মাঝি হে-এ-এ-এ—'

দূর দিগন্ত থেকে সাড়া ভেসে আসছিল, 'কিবা কও ও-ও-ও—'

'নাও যায় কই?'

'সুবুইড্যার চরে।

কখনও উত্তর আসছিল, 'রসুলপুর।' কেউ বা বলছিল, সাভার। কেই বলছিল, নারায়ণগঞ্জ।

এদিকে ছইয়ের ভেতর হেমনাথ তখন হরিন্দকে বলছেন, 'অন্য দিন আর গেছ! দেড় বছর পর সুজনগঞ্জে এলে। আবার ক'বছর পর এদিকে আসবে তার কিছু ঠিক আছে?' সেই সময় কাগা-বগার চিৎকার শোনা গেল, 'মাঝি হে-এ-এ-এ-এ-'

হাওয়ার স্রোতে ভাসেতে ভাসতে উত্তর এল, 'কিবা কও-ও-ও-ও—'

'কাগো নাও।'

'বেবাইজাগো (বেবাজিয়াদের)।'

'যায় কই?'

'ইসলামপুর।'

ছইয়ের ভিতর হরিন্দ বোধ হয় কান খাড়া করেই ছিল। ইসলামপুরের নামটা শুনতেই হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে চলে গেল। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'নাও থামাও বেবাইজারা।' আলোর একটা বিন্দু দেখিয়ে কাগা-বগাকে বলল, 'উইদিকে বা (বেয়ে যা)।'

হেমনাথ বললেন, 'আজ ইসলামপুর না গেলে চলত না?'

হরিন্দ বলল, 'আজই না গেলে কাইলের হাট ধরতে পারুম না। ইসলামপুরের হাট আবার মাসে দুই বার। কাইলের হাট না পাইলে আবার পনর দিনের ধাক্কা।'

'তা হলে যাও।'

আলোর বিন্দুটা যত দূরে মনে হয়েছিল, আসলে কিন্তু তত দূরে না। একটু পরেই কাগা-বগা একটা বিরাট নৌকোর গায়ে এসে নৌকো ভেড়াল। কাছাকাছি আসতে টের পাওয়া গেল বিরাট নৌকো। একটাই না, পর পর অনেকগুলো। সব মিলিয়ে বিশাল এক বহর।

বড় নৌকোটা থেকে কে যেন বলল, 'নাও থামাইতে কইলেন ক্যান?'

হরিন্দ বলল, 'তোমরা ইসলামপুর যাইবা তো। আমরাও যামু, আমাগো যদি এট্টু লইয়া যাও।'

'নিয্যস নিমু, আহেন।'

হরিন্দ এবার হেমনাথের দিকে ফিরে বলল, 'যাই হ্যামকত্তা—'

'এস।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'সুযোগ-টুযোগ করে একবার আমাদের বাড়ি যেও।'

'যামু।' হেমনাথকে প্রণাম করে জোড়া বাবরিওলাকে নিয়ে 'বেবাইজা'দের নৌকোয় গিয়ে উঠল হরিন্দ।

কাগা-বগা চলে গেছে, কাজেই সেই মাঝিটা বৈঠা নিয়ে হালে বসল। এতক্ষণ আয়েশ করে তামাক টানছিল সে।

দেখতে দেখতে বেবাজিয়াদের নৌকোগুলো গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একসময় অবনীমোহন বললেন, 'অদ্ভুত মানুষ তো!'

হেমনাথ হাসলেন, 'হ্যাঁ—'

হঠাৎ বিনু বলে উঠল, 'দাদু, বেবাইজা কাকে বলে?'

অবনীমোহনও তাড়াতাড়ি বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ বেবাইজা কী?'

হেমনাথ বললেন, 'শব্দটা বেবাইজা না, 'বেবজিয়া'। মানে বেদে। জিপসি।'

বিনু বই-পড়া বিদ্যে থেকে বলল, 'জিপসিরা তো হেঁটে হেঁটে বেড়ায়, তাঁবুতে থাকে। নৌকোয়

করে ঘোরে নাকি ?'

'দাদাভাই, এ দেশটা তো জলের দেশ। এখানে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবে কোথায় ? তাই নৌকোয় করে ঘুরতে হয়।'

বিনু আর কিছু বলল না। বার বার তার মনে হতে লাগল, হরিন্দ আর কালা-বগার মতন সে-ও যদি বেদেদের নৌকোয় পাড়ি দিতে পারত!

অন্ধকারে আশ্বিনের পরিপূর্ণ নদী অথবা প্রান্তরের ওপর দিয়ে নৌকো চলেছে। এখন কত রাত, কে জানে। একটানা জলের আঘাতে নৌকোর তলায় ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে।

এখন বেশ হাওয়া দিয়েছে। জলের মাঝখানে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, গায়ে লেগে সিরসির করছে।

সেই সকাল থেকে ঘোরের ভেতর যেন ছুটছিল বিনু। চান নেই, ভাত খাওয়া নাই, বিশ্রাম নেই। বার বছরের জীবনে গোটা একটা দিন এভাবে আর কখনও ছোটাছুটি করে বেড়ায় নি সে।

অনেক আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বিনু। কিন্তু পাখি, যুগলের সেই বোম, সাঁকোর বাঁশে বসে কালো ছেলেদের বঁড়শি বাওয়া, সুজনগঞ্জের হাট, ঢেঁড়া-দেওয়া, লারমোরের রুগী দেখা, বুধাই পাল, হরিন্দ, দামড়া মোষের মতন তার দুই ঢাকী, মিষ্টির দোকনে বসে ধবধবে-মাঠা খাওয়া, বেবাজিয়াদের বহর—অসংখ্য মানুষ আর অগণিত ঘটনা ক্লান্তির কথা তাকে বুঝতে দেয় নি। এক উত্তেজনা থেকে আরেক উত্তেজনা, এক কৌতূহল থেকে আরেক কৌতূহল তাকে অবিরাম ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। চোখ টান করে অপার বিস্ময়ে সে শুধু দেখে গেছে, কান পেতে শুনে গেছে।

হরিন্দরা বেদে-নৌকোয় উঠবার পর আর বসে থাকতে পারল না বিনু। হাজারো বিস্ময় যে ক্লান্তিকে দূরে ঠেলে রেখেছিল, এবার তারা বড় বড় পা ফেলে তাকে ঘিরে ফেলতে শুরু করল। হাত-পা যেন আলগা হয়ে যেতে লাগল বিনুর। জলের একটানা ছপছপানি শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুমের ভেতরেই বিনু টের পেল, বাড়ি ফিরেছে। ঘুমোতে ঘুমোতেই দাদুর সঙ্গে বসে খেল সে। খেতে খেতে দু-একবার ঝিনুকের নাম কানে এল। তখুনি তার মনে পড়ে গেল, সকালবেলা যখন সুজনগঞ্জের হাটে যায়, ঘোড়ার গাড়ি করে ঝিনুককে আসতে দেখেছে। ঘুম চোখেই আলোর ছোটাছুটি দেখল সে, স্নেহলতা-শিবানী-সুরমা আর সুধা-সুনীতির গলা শুনতে পেল। ওরা কী বলছে তা অবশ্য বুঝতে পারল না।

তারপর রাত্রিবেলা হেমনাথের কাছে শুয়ে তাঁর বুকে হাত রাখতেই বিনু টের পেল একটা চুড়ি-পরা ছোট কচি হাত তার হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

গভীর ঘুমে ডুবে যেতে যেতে বিনুর মনে হল, কচি হাতখানা ঝিনুকের। হেমনাথের ভাগ নিয়ে ঘুমের ভেতরেই কি মেয়েটা হিংসে শুরু করে দিল ?

কানের কাছে মুখ এনে কোমল গলায় কেউ যেন অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলছে। স্বরটা বিনুর খুব চেনা কিন্তু কথাগুলো সে বুঝতে পারছে না। চোখ মেলে তাকিয়ে যে দেখবে, তেমন শক্তিটুকুও তার নেই। গভীর ঘন ঘুম আঠার মতন চোখে জড়িয়ে আছে।

গলার স্বরটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল, সেই সঙ্গে হাতে মৃদু ধাক্কা অনুভব করল বিনু। এবার

তার মনে হল, কান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে দু-একটা শব্দ ভেতরে ঢুকছে।

অনেক কষ্টে চোখের পাতা দুটো টেনে তুলল বিনু, আর তখনই দেখতে পেল হেমনাথ ঈষৎ ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

এখনও ভাল করে ভোর হয় নি। ঘরের ভেতরটা আবছা। শিয়রের দিকে একটা জানলা খোলা রয়েছে। তার বাইরে যতদূর চোখ যায়, উঠোন-বাগান-পুকুর, ওপারের ধানবন—সব কিছু ঝাপসা, নিরাকার। ঝুপসি আমবাগানে আর ঢ্যাঙা সুপুরি গাছের পাতার ভেতর এখনও থোকা থোকা অন্ধকার।

চোখ মেলতেই হেমনাথ আরো একটু নীচু হলেন, 'দাদাভাই, উঠবি না?'

আধবোজা ঘুমন্ত গলায় বিনু বলল, 'কেন?'

'বা রে, ভোর হয়ে গেছে। এক্ষুণি রোদ উঠে যাবে। তার আগে সূর্যস্তব সেরে নিতে হবে না?'

রাজদিয়ায় আসার পর হেমনাথের সঙ্গে ভোরবেলায় উঠছে বিনু, নিয়মিত সূর্যবন্দনা করছে।

কাল সমস্ত দিন যা ছোটাছুটি করেছে তাতে হাত-পাগুলো যেন আলগা হয়ে গেছে। বিনুর সারা গায়ে পুরো একটি দিনের ক্লান্তি মাখানো। রাত্তিরে ঘুমোতে ঘুমোতে সুজনগঞ্জের হাট থেকে রাজদিয়া ফিরেছিল সে, সেই ঘুম এখনও কাটে নি। বিছানা ছেড়ে উঠতে একটুও ইচ্ছা করছে না।

হেমনাথ আবার তাড়া দিলেন, 'ওঠ দাদা, তাড়াতাড়ি ওঠ—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবার উঠে বসল বিনু। দু হাতে চোখ রগড়ে রগড়ে যতখানি পারল ঘুম তাড়াল, তারপর করুণভাবে একবার বিছানার দিকে তাকাতে গিয়েই দেখতে পেল—সেই মেয়েটা পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। সেই মেয়েটা যার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, জাপানি পুতুলের মতন মুখ, টলটলে কালো দুটো চোখের মণি, আরে যার নাম ঝিনুক।

বিনুর মনে পড়ে গেল, কাল ঘুমের ঘোরে দাদুর বুকের ওপর থেকে এই হিংসুটি মেয়েটাই তার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল।

বিনু বলল, 'ঝিনুক বুঝি কাল এখানে শুয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'তুই শুয়েছিলি আমার বাঁ ধারে, ঝিনুক ডান ধারে।'

অপ্রসন্ন চোখে ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে কী বলবে ভাবতে লাগল বিনু। সেই ফাঁকে হেমনাথ বললেন, 'আর দেরি করিস না দাদা, মুখটুখ ধুতে ধুতে কিন্তু রোদ উঠে যাবে।'

নিঃশব্দে এবার বিছানা থেকে নেমে হেমনাথের পিছু পিছু ঘরের বাইরে চলে এল বিনু।

এই ভোরবেলায় ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে। এত ঠাণ্ডা, মনে হয়, আশ্বিনের সকালেই সে সারা গায়ে পৌষের মেজাজ নিয়ে এসেছে। বাতাসটা গায়ে লাগতে চামড়া কুঁকড়ে যাচ্ছে।

বারান্দার এক কোণে মাটির হাঁড়িতে জল আর নিমের দাঁতন ছিল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে হেমনাথের সঙ্গে উঠোনের শেষ প্রান্তে এসে পুবদিকে মুখ করে দাঁড়াল বিনু।

এর মধ্যেই স্নেহলতা উঠে পড়েছেন। পুকুর থেকে চান সেরে এইমাত্র বাড়ি এসে ঢুকলেন তিনি এবং উঠোনে ভিজে পায়ের ছাপ আঁকতে আঁকতে উত্তরদুয়ারী ঘরের দিকে চলে গেলেন।

এ বাড়িতে স্নেহলতাই বোধহয় সবার আগে ওঠেন। ঘুম থেকে উঠবার পর কোনোদিন তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখেনি বিনু। এর ভেতর হয় তাঁর চান সারা হয়ে যায়, নতুবা চান সেরে ভিজে কাপড়ে পুকুর থেকে ফেরেন। সূর্যোদয়ের আগেই এই কাজটি স্নেহলতার চুকিয়ে ফেলা চাই।

আজ একা স্নেহলতাই বিনুদের আগে ওঠেন নি, শিবানীও উঠেছেন। হেমনাথের আশ্রিত দু'টি বিধবাও উঠে পড়েছে।

এই মুহূর্তে শিবানী বাসি উঠোনে জলছড়া দিচ্ছেন। আর সেই বিধবা প্রৌঢ়া দু'টি তকতকে করে ঘরের পিড়া (ভিত) লেপছে।

পুব দিকটা একেবারে ফাঁকা। যতদূর চোখ যায়, সেই দিগন্ত পর্যন্ত বাধা দেবার মতন কিছু নেই,

অবশ্য দু-চারটে তাল-সুপুরি ঢ্যাঙা পায়ে ডিঙি মেরে অনেক উঁচুতে কী দেখবার চেষ্টা করছে। ঐটুকু বাদ দিলে সব অবারিত।

এই বিশাল ব্যাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হেমনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একসময় সূর্যবন্দনা শুরু করল বিনু, 'ওঁ জবাকুসুম—'

দু চারটে অক্ষর সবে উচ্চারণ করেছে সেই সময় পেছন থেকে কচি গলায় ডাক শোনা গেল, 'দাদু, ও দাদু—'

হেমনাথ ফিরেও তাকালেন না, তন্ময় হয়ে সূর্যস্তব আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন।

ডাকটা আবার শোনা গেল, 'দাদু, ও দাদু, ও দাদু—'এবার সেটা খুবই অস্থির, অসহিষ্ণু।

কে ডাকছে, বিনু বুঝতে পারল। চোখের পাতা অল্প ফাঁক করে একবার হেমনাথকে দেখে নিল সে। হেমনাথের চোখ আগের মতনই বোজা, আগের মতনই ধ্যানস্থ হয়ে আছেন তিনি। পেছনের ডাকটা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হয় না।

সূর্যস্তব আওড়াতে আওড়াতে টুক করে একবার মাথাটা ঘুরিয়ে পেছন দিকে দেখে নিল বিনু। যা ভেবেছিল, ঝিনুক—ঝিনুকই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ কোঁচকানো, মুখ থমথমে।

এক পলক ঝিনুককে দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজে সামনের দিকে তাকাল বিনু এবং হেমনাথের সঙ্গে সূর্যস্তব আবৃত্তি করতে লাগল। আর পেছনে ঝিনুকের গলার সেই ডাকটা একটানা বেজে চলল।

সূর্যবন্দনা শেষ হতে হতে আলোর আভা ফুটে গেল। সারারাত সূর্যটা কোথায় ছিল, কে জানে। দিগন্তের তলা থেকে সোনার গোল ঘটের মতন হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে এল। তার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে হেমনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি রে, অত ডাকাডাকি কেন?'

ভারি গলায় ঝিনুক বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না। কক্ষণো না, কিছুতেই না।

'কেন? কী হয়েছে।'

'না-না, কথা বলব না।' বলেই দুপ-দাপ পা ফেলে ঘরের দিকে চলল ঝিনুক। বোঝা গেল, খুব রাগ করেছে সে।

হেমনাথের দেখাদেখি সূর্যপ্রণাম করে বিনুও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এই সকালবেলায় ঝিনুকের এত রাগের কারণ সে বুঝতে পারল না। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

লম্বা পায়ে ছুটে গিয়ে ঝিনুককে ধরে ফেললেন হেমনাথ, তারপর টপ করে একেবারে কোলে তুলে নিলেন।.

ঝিনুক সমানে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, 'ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও বলছি। তোমার কোলে আমি উঠব না, তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

হেমনাথ ছাড়লেন না। বরং কোলের ভেতর ঝিনুককে চেপেচুপে রেখে হেসে হেসে ছড়া বলতে লাগলেন:

রাগ করছেন রাগুনি,
রাঙা মাথায় চিরুনি,
বর আসবে এক্ষুণি
নিয়ে যাবে তক্ষুণি।'

ঝিনুকের দাপাদাপি আর হাত-পা ছোঁড়া আরো বেড়ে গেল। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন হেমনাথ। বললেন,'সকালবেলায় ঝিনুক দিদির এত রাগ কেন, এবার বল দিকি?'

ঝিনুক বলল, 'তুমি আমায় ডেকে তোল নি কেন?'

'কখন রে?'

'একটু আগে।'

'আমাকে ডাকো নি কেন?'

'তখন তুই ঘুমোচ্ছিলি যে—'

কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে ঝিনুক বলল, 'উঁহু—উঁহু—'

হেমনাথ সবিস্ময়ে বললেন, 'ঘুমোচ্ছিলি না!'

'না।' ঝিনুক বিনুকে দেখিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি ওকে ডাকলে, আমাকে ডাকলে না।'

'ওকে ডেকেছি, তুই জানিস?'

'হ্যাঁ জানি। একশ' বার জানি।'

'জানিস যদি উঠে পড়লি না কেন?'

'উঠব না, কিছুতেই না।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'ওকে ডেকে তুলবে আর আমাকে ডাকবে না! না ডাকলে উঠব কেন?'

এবার ব্যাপারটা খানিক আন্দাজ করতে পারলেন হেমনাথ। চোখ বড় বড় করে সকৌতুকে বললেন, 'বিনু দাদাকে ডাকলে তোকেও ডাকতে হবে, এই তো?'

'হুঁ।' ঝিনুক মাথা নাড়ল, 'ওকে নিয়ে তুমি 'জবাকুসুম' করলে—'

'জবাকুসুম' অর্থে সূর্যস্তব। হেমনাথ আগের সুরেই বললেন, 'তোকে নিয়েও বুঝি 'জবাকুসুম' করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ কাল থেকে ভোরবেলা উঠবি। ডাকামাত্র উঠে পড়তে হবে।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরবতা। তারপর ঝিনুকের চিবুকে আঙুল দিয়ে ঠেলে তুলে হেমনাথ বললেন, 'পেট বোঝাই তোমার হিংসে।'

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল। খানিক আগেও আমবাগান, পুকুর, ধানবন, সুদূর আকাশ—সব কিছু ঝাপসা হয়ে ছিল। এখন চারদিক স্পষ্ট, গাছের চকচকে সজীব পাতাগুলো পর্যন্ত আলাদা করে গুনে নেওয়া যায়। সারাটা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে এই আশ্বিনে আকাশখানি বড় উজ্জ্বল, বড় ঝকমকে। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত সে নীল চাঁদোয়া টাঙিয়ে রেখেছে।

এ বাড়িতে এখন আর কেউ ঘুমিয়ে নেই। অবনীমোহন, সুরমা, সুধা, সুনীতি, সবাই উঠে পড়েছে। পুবের ঘরের বারান্দায় পিঁড়ি পেতে বসে এই মুহূর্তে সকালবেলার খাওয়ার পর্ব চলছে।

খেতে খেতে হেমনাথ বললেন, 'কাল রাত্তিরে ঝিনুকের কথা কী যেন বলছিলে, ঠিক খেয়াল করি নি।'

স্নেহলতা বললেন, 'ও এখন কিছুদিন এখানে থাকবে।'

'বেশ তো।'

'ঝিনুক বাড়ি থাকলে ভবতোষ কোথাও বেরুতে টেরুতে পারে না। বেরুলেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয়। ছেলেটা ভারি মুশকিলে পড়ে গেছে।'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'কাল কখন ঝিনুককে দিয়ে গেছে?'

স্নেহলতা বললেন, 'তোমরাও বেরিয়েছ, ওরাও এসেছে।'

'ভবতোষ আর কী বললে?'

'কী ব্যাপারে?'

'বৌমার কোনো খবর আছে?'

'না। ও মেয়ে সংসার করবার মেয়ে নয়। চলে যে গেছে, সে একরকম ভালই হয়েছে।'

খানিক গাঢ় বিষাদ আশ্বিনের এই ঝলমলে সকালটাকে যেন নিমেষে মলিন করে দিল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হেমনাথ একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চ'লে গেলেন। সুরমার দিকে ফিরে বললেন, 'ক'দিন তো এখানে এসেছিস—'

সুরমা বললেন, 'তিন চার দিন।'

'বলতে নেই, এই ক'দিনে তোকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে। সেই ফ্যাকাসে রুগ্ন ভাবটা নেই। স্টিমার থেকে যখন নামলি মুখখানা এই এতটুকু। গায়ে রক্ত নেই, হাঁটতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছিলি।'

স্নেহলতা এই সময় ঝংকার দিয়ে উঠলেন, 'বলতে নেই বলতে নেই করে তো সবই বলে ফেললে। ভাল-ভাল বলে রোগা মেয়েটার দিকে নজর দিতে হবে না।'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'বেশ, আর বলব না। নজরও দেব না।'

সুরমা বললেন, 'কেন বলবে না, নিশ্চয়ই বলবে। ভাল হলে ভাল বলবে না? সত্যি, আগের চাইতে অনেক সুস্থ লাগছে।'

হেমনাথ বাড়িয়ে কিছু বলেন নি। সামান্য কয়েকটা দিনে সুরমার চেহারায় সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে গেছে যেন। তাঁকে রীতিমত উজ্জ্বল আর সজীব দেখাচ্ছে। পরিবর্তনটা বেশ চোখে পড়ে।

অবনীমোহন এতক্ষণ চুপ করে খেয়ে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'রাজদিয়া সত্যি সত্যি টনিকের কাজ করতে শুরু করেছে।'

আসবার সময় স্টিমারে টনিকের কথা অবনীমোহনও বলেছিলেন, সুরমা হাসলেন, কিছু বললেন না।

হঠাৎ হেমনাথের কী মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ভাল কথা—'

স্নেহলতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী?'

'দু'দিন ধরে সেই বাঁদরটাকে তো দেখছি না। কোথায় গা ঢাকা দিলে সে?'

'কার কথা বলছ?'

'কার আবার, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই হিরণ ছোঁড়ার।' বলে আড়ে আড়ে সুধার দিকে একপলক তাকিয়ে নিলেন।

সুধা, সুনীতি আর বিনু একধারে বসে খাচ্ছিল। বিনু শুনতে পেল, চাপা গলায় সুনীতি সুধাকে বলছে, 'দাদু তোর দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছে।'

মুখ নিচু করে সুধা বলল, 'তাকাগ গে।'

'সেই বাঁদরটা কোথায় গেছে জানিস?'

ঠোঁট উল্টে সুধা বলল, 'জানতে বয়ে গেছে।'

মুখ টিপে সুর টেনে টেনে সুনীতি বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই।'

এই সময় স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'সত্যিই তো, ছেলেটা গেল কোথায়? রোজ দু'বেলা হাজিরা দিচ্ছিল। হঠাৎ হল কী?' বলতে বলতে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'যুগল, যুগল—'

আশেপাশে কোথাও ছিল যুগল। ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী ক'ন ঠাউরমা?'

'হিরণদের বাড়ি একবার যা, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।'

যুগল ছুটল।

এরপর সুজনগঞ্জের হাটের কথা উঠল, লারমোরের কথা হল, কালকের সেই মজার ঢেঁড়াটার কথা নিয়ে অনেক হাসাহাসি চলল। এসবের ফাঁকে হেমনাথ টুক করে একবার বললেন, 'ভাবছি, আমিও একটা ঢেঁড়া দেব কিনা।'

হাসতে হাসতে থমকে গেলেন স্নেহলতা। কিছু একটা আন্দাজ করেছেন তিনি। তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটিতে

স্বামীকে বিদ্ধ করতে করতে বললেন, 'তুমি আবার কিসের ঢেঁড়া দেবে?'

'এখনই শুনবে?'

'এখনই শুনব।'

'নির্ভয়ে বলি?'

'খালি প্যাকনা (ন্যাকামো)।'

হেমনাথ বললেন, 'ঢেঁড়াটা হবে এইরকম। জেলা ঢাকা, থানা মুন্সিগঞ্জ, শহর রাজদিয়ার শ্রীহেমনাথ মিত্রের বড় বিপদ। কী বিপদ? না চল্লিশ বছর ঘর করার পরও সে তার বউর মন পায় নি। আপনারা জেনে রাখুন—মিঞা ভাইরা, হিন্দু ভাইরা—হেমকর্তার ধর্মপত্নীর মন অন্য পুরুষে মজেছে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই হাসির ধুম পড়ে গেল। অবনীমোহন আর সুরমা অবশ্য মুখ টিপে হাসছেন, ভেতরের উচ্ছ্বসিত কৌতুকটাকে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছেন না। সুধা-সুনীতি কিন্তু হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ছে। বিনু প্রায় কিছুই না বুঝে আর সবার দেখাদেখি বিজ্ঞের মতন হাসছে।

আড়ে আড়ে সুধা-সুনীতির দিকে একবার তাকিয়ে হেমনাথ বললেন, 'ঢেঁড়ার কথা কিন্তু শেষ হয় নি, আরো একটু আছে।'

হাসতে হাসতেই সুধা-সুনীতি বলল, 'আরো কী?'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'মিঞা ভাইরা, হিন্দু ভাইরা—সাকিন রাজদিয়ার হেমকর্তা এই বিপদে তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই সে ঠিক করেছে পুরনো বউকে তালাক দিয়ে আগামী অঘ্রান মাসে একজোড়া তরুণী ভার্যা ঘরে তুলবে। তাদের একজনের নাম সুধামুখি, আরেক জনের সুনীতিলতা।'

স্নেহলতা মধুর কৌতুকময় হেসে বললেন, 'ঢেঁড়াতে আমার আপত্তি নেই।'

হেমনাথ বললেন, 'প্রস্তাবটা তা হলে অনুমোদন করছ?'

'করছি।'

এদিকে সুধা-সুনীতির হাসি থেমে গিয়েছিল। তারা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'বুড়োর ভার্যা হতে আমাদের বয়ে গেছে।'

করুণ মুখে হেমনাথ বললেন, 'বুড়ো বলে দাগা দিলে দিদিরা। সত্যিই কিন্তু আমি বুড়ো হই নি। এই দেখ, একটাও দাঁত পড়ে নি, মাড়ি কি মজবুত!'

সুধা বলল, 'বুড়ো তো হন নি, তবে চুল সাদা হল কী করে?'

'বয়েসের জন্যে না রে দিদি, কুপিত বায়ুর দোষে।'

'আর চামড়া কোঁচকানো কেন?'

'হজমের গোলমালে।'

গল্পে গল্পে, হাসাহাসি আর লঘু কৌতুকে সকালটা কাটতে লাগল। খাওয়ার পালা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় বাইরে বাগানের দিক থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'জেঠামশায়—জেঠামশায়—'

হেমনাথ ঘুরে বসে সাড়া দিলেন, 'কে রে?'

'আমি শিশির!'

'আয় আয়—' হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠোনে নামলেন।

একটু পর শিশিররা ভেতরে চলে এলেন। দেখা গেল, শিশির একাই নন, তাঁর সঙ্গে স্মৃতিরেখা, রুমা-ঝুমা এবং তাদের মামা আনন্দও এসেছে।

শিশির বললেন, 'আপনার বৌমাদেরও নিয়ে এলাম।'

'আনবিই তো। আনতেই তো বলেছিলাম। এস, এস সবাই—'

এদিকে বারান্দার আরেক কোণে একটা মজার ব্যাপার চলছিল। বিনু দেখতে পেল, আনন্দকে দেখিয়ে

সুধা সুনীতিকে বলছে, 'দিদি সেই ভদ্রলোক এসেছে। যার দিকে—'

ভুরু কুঁচকে সুনীতি বলল, 'যার দিকে কী?'

ঠোঁটের ফাঁকে প্রগল্ভ একটি হাসি টিপে রেখে সুধা বলল, 'যার দিকে তাকিয়ে সেদিন তুই একেবারে মুগ্ধ, মুগ্ধ, মুগ্ধ—মুগ্ধ—'

কথা শেষ হবার আগেই সুধার পিঠে দুম করে কিল পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'এখানে না। চল ঘরে গিয়ে বসি—'

শিশিরদের সঙ্গে নিয়ে সামনের বড় ঘরখানায় গিয়ে ঢুকলেন হেমনাথ। স্নেহলতা সুরমা অবনীমোহনরাও পিছু পিছু এলেন। সুধা-সুনীতি, ঝিনুক কিংবা বিনু বাইরে বসে থাকল না, তারাও এল।

স্নেহলতা-শিবানী শিশিরকে চেনেন, স্মৃতিরেখাকে চেনেন, রুমা-ঝুমাকে চেনেন। না চিনে যাবেন কোথায়? এই রাজদিয়ারই তো ছেলে শিশির, ছেলেবেলা থেকে তাঁকে দেখে আসছেন। চাকরির খাতিরেই না হয় ক'বছর দেশছাড়া শিশির।

স্নেহলতা-শিবানী আনন্দকে চিনতেন না, হেমনাথ তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুরমা কাউকেই চেনেন না, তাঁর সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। আর অবনীমোহনদের সঙ্গে শিশিরদের তো আগেই আলাপ হয়ে গেছে।

এ ঘরে ঢালা তক্তপোশ পাতা, হেমনাথ বললেন, 'বোসো সব, বোসো—'

সবাই বসলে শিশির-স্নেহলতা-শিবানীর উদ্দেশে বললেন, 'কেমন আছেন পিসিমা? কেমন আছেন জেঠাইমা?'

শিবানী বললেন, 'ভাল আছি বাবা। তোরা সবাই ভাল তো?'

শিশির বললেন, 'হ্যাঁ।'

স্নেহলতা বললেন, 'আমি কিন্তু ভাল নেই শিশির।'

ঈষৎ উদ্বেগের সুরে শিশির শুধোলেন, 'কেন?'

'ছেলেরা যদি দেশের বাড়ি ছেড়ে দূরে গিয়ে থাকে, মা-জেঠিরা ভাল থাকতে পারে না।'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে শিশির বললেন, 'কী করব, চাকরি। চাকরির জন্যেই দূরে গিয়ে থাকতে হয়। নইলে আপনাদের ছেড়ে কলকাতায় থাকতে কি আমার ভাল লাগে?'

স্নেহলতা হাসলেন, 'বুঝলাম।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোর ওপর আমি কিন্তু খুব রাগ করেছি।'

শিশির তটস্থ হয়ে উঠলেন, 'কেন?'

'খবর পেয়েছি চার-পাঁচ দিন আগে রাজদিয়া এসেছিস। আজ আমার সঙ্গে দেখা করার সময় হল বুঝি?'

বিব্রতভাবে শিশির বললেন, 'রোজই ভাবি আসব। বেরুবার মুখে কেউ না কেউ এসে পড়ছে, আসাই আর হচ্ছে না। আজ তাই ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে পড়েছি।'

শিবানী বললেন, 'কেউ এসে পড়বার আগেই, না রে?'

শিশির হাসলেন, 'হ্যাঁ।'

স্নেহলতা কিন্তু এই কৈফিয়তে খুশি হলেন না। অভিমানের সুরে বললেন, 'দায় সারতে যখন এসেছিস তখন বোস, আমি আসছি।' দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দুপুরবেলা দয়া করে এখানে দু'টি খেয়ে যাবার সময় হবে তো?'

তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে শিশির বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি না বললেও খাব। না খেয়ে এখান থেকে যাচ্ছি না।'

খুব ব্যস্তভাবে এইসময় স্মৃতিরেখা কী বলতে যাচ্ছিলেন, ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দিলেন শিশির।

আর কিছু না বলে স্নেহলতা চলে গেলেন। তখন আস্তে আস্তে স্মৃতিরেখা বললেন, 'তুমি কী বল তো! আজ এখানে থেকে বেরিয়ে গুহদের বাড়ি যাবার কথা ছিল না? সেদিন ওরা অত করে বলে গেল।'

শিশির বললেন, 'এখান থেকে না খেয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই। গুহদের বাড়ি আরেক দিন যাওয়া যাবে।'

'বেশ বললে! ওঁরা আমাদের জন্যে বসে থাকবেন না?'

'আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলে শিশির হেমনাথের দিকে তাকালেন, 'জেঠামশায় আপনাদের সেই ছেলেটা কোথায়? কী যেন নাম—'

হেমনাথ বললেন, 'যুগলের কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ, যুগল—'

'ওকে হিরণদের বাড়ি পাঠিয়েছি। অনেকক্ষণ গেছে, এখুনি ফিরে আসবে।'

হেমনাথের কথা শেষ হতে না হতেই যুগল এসে পড়ল। ছুটতে ছুটতে এসেছে, ফলে হাঁপাচ্ছিল। বলল, 'হিরণদাদায় বাড়িত্ নাই।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'গেছেন কোথায় বাবু?'

'বিষ্যুদ্‌বার মানিকগুঞ্জে গেছে, অহন তরি ফিরে নাই।'

'কবে ফিরবে, বলে গেছে?'

'না।'

হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা, এখন শিশির কী বলছে শোন—'

শিশির যুগলকে গুহদের বাড়ি পাঠালেন। বলে দিলেন, দু-তিন দিন পর তাঁদের ওখানে যাবেন। বলামাত্র যুগল ছুটল।

একটু পর বড় বড় কাঁসার থালায় চিড়ের মোয়া, মুড়ির মোয়া, কদমা, পাতক্ষীর, সন্দেশ আর দোভাজা চিড়ে, নারকেল কোরা সাজিয়ে নিয়ে এলেন স্নেহলতা। একা তো আর অতগুলো থালা আনা যায় না। সেই বিধবা দু'টিও ক'টা থালা নিয়ে এসেছে।'

এ ঘরে ঢুকেই স্নেহলতা বললেন, 'যুগলের গলা পাচ্ছিলুম যেন—'

'হ্যাঁ—' হেমনাথ মাথা নাড়লেন।

'গেল কোথায়?'

যুগল কোথায় গেছে, হেমনাথ বললেন।

স্নেহলতা শুধোলেন, 'হিরণের খবর কী?'

'মানিকগঞ্জে গেছে।'

'হঠাৎ মানিকগঞ্জে?'

'কি জানি, যুগল কিছু বলত পারল না।'

'বাবুর কবে ফেরা হবে?'

'হিরণই জানে, বাড়িতে কিছু বলে যায় নি।'

এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না স্নেহলতা। রুমা-ঝুমা-আনন্দ, সবার হাতে হাতে একটা করে কাঁসার থালা দিয়ে যেতে লাগলেন। দেওয়া হয়ে গেলে স্মৃতিরেখাকে ডাকলেন, 'বৌমা—'

স্মৃতিরেখা তাকালেন। চোখে চোখ পড়তে বললেন, 'তোমার কাছে আমার একটা অভিযোগ আছে।'

স্মৃতিরেখা হকচকিয়ে গেলেন, 'কী ব্যাপারে?'

'তোমারই ব্যাপারে। এই বয়সে তোমরা কি আমার ঘর ভাঙাতে চাও?'

মুখচোখ লাল হয়ে উঠল স্মৃতিরেখার। শিথিল কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কী বলছেন, বুঝতে

পারছি না।'

ঘরের অন্য সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্নেহলতার স্বভাব এত কোমল এত মধুর যে সরাসরি এমন আক্রমণ করে বসতে পারেন, তা যেন ভাবাই যায় না।

স্নেহলতা বললেন, 'বুঝতে যখন পারছ না তখন বুঝিয়ে দিচ্ছি।' তারপর রুমা-ঝুমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই সব সুন্দর সুন্দর পরীদের সামনে এনে ধরছ, এরপর আমার ওপর বুড়োর মন কি থাকবে?' বলে হেমনাথের দিকে আড় চাহনির বাণ হানলেন।

এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেল। সবাই উঁচু গলায় শব্দ করে হেসে উঠল।

হাসির শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতে স্নেহলতা আবার বললেন, 'রমু তো আগেই আমার সর্বনাশ করে রেখেছে। ঐ দু'টিকে নিয়ে এসেছে—' আঙুল বাড়িয়ে সুধা-সুনীতিকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'সব সময় ওদের ভয়ে আমি কাঁটা হয়ে আছি। তা ছাড়া ঐ পুচকেটাকে দেখ—'

স্নেহলতার আঙুল অনুসরণ করে সবার দৃষ্টি পড়ল ঝিনুকের ওপর।

স্নেহলতা বললেন, 'উনিও কম যান না, ঐ ছোট্টটাও আমার সতীন হতে চায়।'

হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'ভাবছি এদের দিয়ে একটা মোগল হারেম খুলবই খুলব। তুমি হবে হেড বেগম, বাকি সবাই তোমার বাঁদী।'

কথাটা শেষ হল কি হল না, তার আগেই ঘরময় চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। রুমা-ঝুমা-সুধা-সুনীতি একসঙ্গে গলা মেলাল, 'বাঁদী হতে আমাদের বয়ে গেছে। কক্ষণো না, কক্ষণো না।'

হালকা হাওয়ায় সবাই যখন রঙিন প্রজাপতিটি হয়ে ভেসে চলেছে সেইসময় ঝিনুককে দেখিয়ে শিশির বললেন, 'এই মেয়েটা কে, জেঠামশায়?'

হেমনাথ বললেন, 'তোদের বলি নি বুঝি?'

'আজ্ঞে না।'

'ও হল ভবতোষের মেয়ে—'

'লাহিড়ী বাড়ির ভবতোষ?'

'হ্যাঁ।'

'সে এখানকার কলেজে প্রফেসারি করে না?'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন।

'ভবতোষের মেয়ে এখানে যে?'

হেমনাথ বললেন, 'ও মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকে। মেয়েটাকে নিয়ে ভব বড় মুশকিলে পড়েছে।'

শিশির কৌতূহলী হলেন, 'কিসের মুশকিল?'

হেমনাথ লক্ষ করলেন, একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে বিনু। ঈষৎ স্খলিত গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা ভারি স্যাড। এখন না, তোকে পরে বলব।'

একটু নীরবতা। তারপর প্রসঙ্গটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য স্ত্রীর দিকে ফিরে হেমনাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'তোমাকে একটা খবর দেওয়া হয় নি।'

স্নেহলতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী?'

'আনন্দ মস্ত শিকারী। সুন্দরবনে গিয়ে বড় বড় বাঘ মেরে এসেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ—' হেমনাথ মাথা হেলিয়ে বলতে লাগলেন, 'সেদিন শিশিরদের বাড়ি গিয়েছিলাম, আনন্দের নিজের মুখে গল্প শুনে এসেছি।'

স্নেহলতা এবার পরিপূর্ণ চোখে আনন্দের দিকে তাকালেন, 'বাঘ মেরেছে, এমন লোক আগে আর দেখি নি। এই প্রথম দেখলাম।'

আনন্দ হাসল।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'অবশ্য মুখে বাঘ-ভাল্লুক মারে এমন মানুষ সর্বক্ষণই দেখছি।' বলে চোরা চোখের দৃষ্টি হেনে স্বামীকে বিদ্ধ করলেন।

হেমনাথও কম যান না। আনন্দের উদ্দেশে বললেন, 'তোমাকে দেখবার ঢের আগেই আমি বাঘশিকারী দেখেছি, আর তাকে নিয়েই সারাজীবন—'

অনন্দ শুধালো, 'সারা জীবন কী?'

'ঘর করছি।'

কোতুকের একটি ফোয়ারা কোথায় কোন অদৃশ্যে যেন ফুটি ফুটি করছে।

যে কোনো মুহূর্তে সহস্র ধারায় সেটা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে। সবাই তা টের পেয়ে গেছে বুঝি, আর গেছে বলেই তাদের ঠোঁটে চোখে হাসি ছলকে যাচ্ছে।

স্নেহলতা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তাই নাকি? আমি বাঘ মেরেছি?'

'নিশ্চয়ই—' হেমনাথ বললেন, 'বিয়ের আগে বাঘই ছিলাম গো।'

'তারপর?'

'তুমি এসে সেই বাঘটাকে মেরে একেবারে পোষা বেড়াল করে ছেড়েছ। তোমার কথায় সে এখন ওঠে, বসে। তোমার পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে। চোখ পাকালে ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে পর্যন্ত।'

যে হাসিটা এতক্ষণ আধোগোপান ছিল, এবার তা আতসবাজির মতন ফস করে স্বলে উঠল।

স্নেহলতা কপট রাগে আরেক বার ভ্রুভঙ্গ করতে গিয়ে নিজেও হেসে ফেললেন। বাইরে বিব্রত, অথচ তলায় সুখী—এমন একটা ভাব করে বললেন, 'হয়েছে, খুব হয়েছে।'

হাসিটা খানিক স্তিমিত হয়ে এলে স্নেহলতা আনন্দকে বললেন, 'বাঘ মারার গল্প আমাকেও কিন্তু বলতে হবে।'

আনন্দ খুব সপ্রতিভ ছেলে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই বলব। এখুনি শুনবেন?'

স্নেহলতা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সুধা বলল, 'হ্যাঁ, এখনই আমরা শুনব। জানেন—'

সুধা-সুনীতি-বিনু এবং ঝিনুক শিশিরদের সঙ্গে ঘরের ভেতর পর্যন্ত আসে নি, দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে ছিল। আনন্দ মুখ ফিরিয়ে সুধার দিকে তাকাল।

সুধা বলল, 'দিদি না—'

কথাটা শেষ হল না। সুধার একটা হাত ধরে জোরে টান লাগাল সুনীতি। চাপা গলায় বলল, 'ভাল হবে না কিন্তু সুধা।'

সুধা গ্রাহ্যও করল না। আড়ে আড়ে সুনীতিকে একবার দেখে নিয়ে খুব নিরীহ মুখ করে বলল, 'সেদিন শিকারের গল্প শুনে দিদি না একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আপনার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। বলুন শিকারের যত গল্প আপনার জানা আছে বলে যান।'

হাসিভরা উজ্জ্বল চোখে সুনীতিকে এক পলক দেখে নিল আনন্দ, কিছু বলল না।

লজ্জায় সুনীতির মুখ এখন আরক্ত, কারো দিকে তাকাতে পারছিল না সে। নতচোখে ফিসফিসিয়ে শুধু বলতে পারল, 'বাঁদর মেয়ে, ওরা যাক। তারপর তোমার একদিন কি আমার একদিন।'

সুধা গলা নামিয়ে বলল, 'তখন বুঝি মনে ছিল না?'

সুনীতি বলল, 'কী?'

'হিরণবাবুর নাম করে আমার পেছনে লেগেছিলি।'

'শোধ তুললি বুঝি?'

'নিশ্চয়ই। জানিস না ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।'

'জানতাম, মনে ছিল না।'

'এখন থেকে মনে করে রাখিস।'

এদিকে স্নেহলতা বললেন, 'এখন তো আমি বসতে পারব না, রান্নাবান্না আছে। তুমি ওদের সঙ্গে গল্প-টল্প কর আনন্দ, আমি পরে শুনে নেব।'

'আচ্ছা—' অনন্দ মাথা নাড়ল।

স্নেহলতা শিবানী আর সেই বিধবা মেয়ে দু'টিকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, এখন পর্যন্ত কেউ খাবারের থালায় হাত দেয় নি।

ব্যস্তভাবে তিনি বললেন, 'ঐ দেখ, তোমাদের শুধু বকিয়েই মারছি। খাও-খাও—' বলে চলে গেলেন।

অবনীমোহন উৎসাহের সুরে বললেন, 'খেয়েদেয়ে একটা ভাল দেখে শিকার কাহিনী আরম্ভ কর আনন্দ।'

আনন্দ নিঃশব্দে হাসল, অর্থাৎ এ প্রস্তাবে তার আপত্তি নেই। ওদিকে আরেকটা ব্যাপার চলছিল। খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে যাচ্ছিল ঝুমা আর বাঁ হাত দিয়ে সমানে বিনুকে ইশারা করছিল।

প্রথমটা লক্ষ করে নি বিনু। হঠাৎ একসময় চোখে পড়ে গেল। চোখাচোখি হতেই জোরে হাতছানি দিতে লাগল ঝুমা।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বিনু, তারপর পায়ে পায়ে ঝুমার কাছে এসে দাঁড়াল।

ঝুমা এই বয়েসেই বেশ পাকা। সে বলল, 'বারে, তোমাদের বাড়ি এলাম, আর তুমিই ওখানে দাঁড়িয়ে আছ?'

বিনু বলল, 'তুমি খাচ্ছিলে কিনা—'

ঝুমা খেতে খেতে বলল, 'তোমার ওপর আমি খুব রাগ করেছি।'

'কেন?'

'তুমি তো আমাদের বাড়ি গেলে না। তোমার জন্যে এয়ারগান ঠিক করে রেখেছিলাম। ক্যারম খেলব ভেবেছিলাম, লুডো খেলব ভেবেছিলাম—'

'আমি তো তোমাদের বাড়ি চিনি না।'

চোখ বড় করে টেনে টেনে ঝুমা বলল, 'চেনা না!'

'না।'

'সেদিন গেলে না?'

'মোটে তো একদিন।' বলতে বলতে কী মনে হতে অদূরে দরজার কাছটায় তাকাল বিনু। দেখল, সুধা সুনীতির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঝিনুক, চোখের পাতা পড়ছে না মেয়েটার।

ঝুমা গম্ভীর গলায় বলল, 'একদিন গেলেই চিনে রাখা যায়। এই যে আজ তোমাদের বাড়ি এলাম, আর আমাকে চিনিয়ে দিতে হবে না। দেখবে, ঠিক চলে এসেছি।'

ঝিনুকের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বিনু বলল, 'দাদুকে বলব, তোমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে—'

কণ্ঠস্বরে লম্বা টান দিয়ে ঝুমা বলল, 'এ মা—'

বিনু অবাক। বলল, 'কী হল?'

'বুড়ো ধাড়ি ছেলে, একা একা যেতে পারবে না। আবার দাদুকে সঙ্গে চাই!' নাক কুঁচকে ধিক্কার দিয়ে দিয়ে হেসে উঠল ঝুমা।

মুখ লাল হয়ে গেল বিনুর। কী বলতে চেষ্টা করল, পারল না।

এদিকে আনন্দর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অবনীমোহন যেন উন্মুখ হয়েই ছিলেন। বললেন, 'শিকার-কাহিনী শুরু করে দাও—'

ঝুমা বিনুর দিকে আরেকটু এগিয়ে এসে নিচু গলায় ডাকল, 'এই—'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বিনু।

আগের স্বরেই ঝুমা বলল, 'চল, আমরা পালাই—'

আধফোটা গলায় বিনু শুধলো, 'কোথায় ?'

'ঐ বাগান টাগানে—' সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলে ঝুমা।

'শিকারের গল্প শুনবে না ?'

'আমরা ঢের শুনেছি।'

বিনুর যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে বলল, 'আমি তো শুনি নি।'

'তোমাকে পরে বলে দেব। এখন ওঠ তো।' ঝুমা তাড়া লাগাল, ওঠ না—'

বিনু উঠতে যাবে, তার কানে ঝুমা ফিসফিস করল, 'মামার গল্প একদম বিশ্বাস করবে না।'

অপার বিস্ময়ে বিনু বলল, 'কেন ?'

'দিদি বলে মামা কোনোদিন কিচ্ছু মারে নি।'

আড়চোখে একবার রুমাকে দেখে নিয়ে বিনু বলল, 'তা হলে এই সব গল্প—'

'একেবারে গাঁজা। বানিয়ে বানিয়ে বলে। নাও, এখন চল—'

ঝুমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল বিনু। যেতে যেতে দরজার কাছটায় এসে লক্ষ করল, ঝিনুক সেইরকম পলকহীন তাকিয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে বিনুরা উঠোনে নেমে গেল।

উঠোনের শেষ মাথায় এসে মনে হতে লগেল, আলতোভাবে তার পিঠটা কেউ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল কেউ না। শুধু দূরে দরজার ওপর ডিঙি মেরে দাঁড়িয়ে আছে ঝিনুক, সেই একইভাবে তাকিয়ে রয়েছে, এখনও মেয়েটার চোখে পলক পড়ে নি।

বাগানে এসে ঝুমার সঙ্গে ছোটাছুটি করে ফড়িং ধরল বিনু। কোথায় কোন অলক্ষ্যে বসে ঝিঁঝিরা একটানা করুণ সানাই বাজিয়ে যাচ্ছিল, তাদের খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল, পারল না অবশ্য। করমচা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়ল রাশি রাশি, জামরুল পাতা কুচিকুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে লাগল। ডুমুর গাছের মগডালে জোড়া জোড়া মোহনচূড়া পাখি বসে ছিল, তাদের দিকে ঢিল ছুঁড়ল। অনেক উঁচুতে সুপুরি গাছের মাথায় বসে ছিল কয়েকটা হলদিবনা। সবটুকু জোর দিয়ে ঢিল ছুঁড়েও যখন নাগাল পাওয়া গেল না তখন হুস হুস শব্দ করে চেঁচিয়ে তাদের উড়িয়ে দিল।

গাছপালা তছনছ করে, পতঙ্গ আর পাখিদের রাজ্যে আতঙ্ক ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ ঝুমার নজর গেল পুকুরঘাটের দিকে। খুশি গলায় সে চেঁচাল, 'এই—'

'কী ?' বিনু তাকাল ঝুমার দিকে।

'ঐ দেখ কী মজা।' বলে আঙুল বাড়িয়ে দিল ঝুমা।

বিনু দেখল, পুকুরঘাটে নৌকা বাধাঁ রয়েছে—নতুন নৌকো। কাল হাট থেকে হেমনাথ এটা কিনে এনেছেন।

হাততালি দিতে দিতে ঝুমা বলল, 'চল, নৌকো চড়ব—'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'নৌকো তো চড়বে, চালাবে কে ?'

'কেন, তুমি আর আমি।'

'আমি নৌকো চালাতে পারি না।'

'আমিও পারি নাকি ?'

'তা হলে ?'

'চালাতে চালাতে শিখে যাব।'

ঝুমার তর সইছিল না। বিনুর একটা হাত ধরে টানতে টানতে অস্থির গলায় বলল, 'চল না—'

ঝুমার সঙ্গে যেতে যেতে বিনু বলল, 'যদি আমরা নৌকো থেকে জলে পড়ে যাই?

'পড়ে গেলে সাঁতরে উঠে পড়বে। তুমি সাঁতার জানো না?'

এইটুকুন পুচকে মেয়েটা সাঁতার জানে, আর সে জানে না—এই কথাটা কিছুতেই বলতে পারল না বিনু। মনে মনে ভাবল, যুগলকে আর ছাড়াছাড়ি নেই, সাঁতারটা তাকে শিখে নিতেই হবে।

বিনু সাঁতার জানে কি জানে না, শুনবার সময় নেই ঝুমার। জোর করে মেয়েটা তাকে নৌকোয় তুলল। তারপর দড়ির বাঁধন খুলে, বৈঠা দিয়ে অপটু হাতে চালাতে শুরু করল।

জল ঠেলে ঠেলে একসময় মাঝপুকুরে নৌকোটাকে নিয়ে এল ঝুমা।

এর আগে যদিও একবার নৌকোয় উঠেছে তবু ভয় করতে লাগল বিনুর। সে পাটাতনের মাঝখানে কাঠ হয়ে বসে আছে। আশ্বিনের শান্ত জলেও নৌকোটা টলমল করছে।

ঝুমা বলল, 'ভারি মজা, না?'

বিনু চুপ।

ঝুমা বলল, 'জানো, এই আমি প্রথম নৌকোয় চড়লাম। তুমি এর আগে চড়েছ?'

বিনু আস্তে করে বলল, 'চড়েছি।'

হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে ঝুমা বলল, 'বা রে, আমি একাই বাইব নাকি? তুমি একটা বৈঠা নাও।'

কথামতন আরেকটা বৈঠা তুলে নিল বিনু। ঝুমা নামের এই মেয়েটা সাঙ্ঘাতিক, কিছুতেই তার অবাধ্য হওয়া যায় না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সে যা বলে তা না করে যেন উপায় নেই।

দুই আনাড়ি নেয়ে সমানে বৈঠা চালাচ্ছে। বাইতে বাইতে বিনুর মনে হল ঝুমা তাকে গভীর জলের কোনো অজানা রহস্যের দিকে নিয়ে চলেছে।

অপটু হাতে নৌকো বাইতে বাইতে দু'জন পুকুর পেরিয়ে ধানখেতে এসে পড়ল। ঘন ধানবন ঠেলে ঠেলে একটু পর তারা যেখানে এল সেখানে আশ্বিনের শান্ত জলে শুধু পদ্ম আর শাপলা, আর আছে চাপ চাপ কচুরিপানা, সেগুলোর মাথায় থোকা থোকা নীল ফুল, মাঝে মাঝে মুত্রা আর নলখাগড়ার ঝোপ। এক-আধটা মান্দার গাছও চোখে পড়ে, লাল ফুলে ফুলে তাদের ডালপালা ছেয়ে আছে। কিছু কিছু বউন্যা গাছও ইতস্তত ছড়ানো। বউন্যার নিচু ডালগুলো থেকে শক্ত শক্ত অসংখ্য গোলাকার ফল জলের কাছাকাছি ঝুলছে। আর মুত্রাঝোপ তো সাদা ফুলের মুকুট পরে গরবিনী হয়েই আছে।

শুধু ফুলই না, কত যে পাখি গাছের মাথায় মাথায় আর আকাশময় রঙিন পাপড়ির মতন উড়ছে তার হিসেব নেই।

ঝুমা খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'ইস, কত ফুল! কত পাখি!'

এ দৃশ্য বিনুর অচেনা নয়। কালই চারদিকের এই ঝোপঝাড়, ফুলফল এবং পাখিদের রাজ্য পাড়ি দিয়ে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল সে। যেতে যেতে প্রতিটি গাছ প্রতিটি লতা আর পাখির নাম শিখিয়েছিল যুগল। সে সব ঠিক ঠিক মনে আছে বিনুর। ঐ যে ঐ পাখিটা হল মাছরাঙা, ঐটা হলদিবনা, ঐটা পাতিবক—

পরিচিত দৃশ্য, তবু মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু।

ঝুমা আবার বলল, 'কি সুন্দর জায়গাটা, না?'

'হ্যাঁ—' বিনু মাথা নাড়ল।

'আমি জোর করে ধরে আনলাম বলে তো, নইলে কি কখন এখানে আসতে?'

বিনু বলল, 'কালই এসেছিলাম।'

'সত্যি!' ঘাড় বাঁকিয়ে ঝুমা তাকাল। তার গলার স্বরে এবং চোখের তারায় অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ, সত্যি। মা কালীর দিব্যি।'

মা কালীর নামে যখন দিব্যি কেটেছে তখন আর সন্দেহ করা চলে না। ঝুমা শুধলো, 'কার সঙ্গে এসেছিলে?'

কার সঙ্গে এসেছিল, বিনু বলল।

'কী জন্যে এসেছিলে?'

বিনু তা-ও জানালো।

যুগলের নৌকোয় সুজনগঞ্জে পাড়ি দেবার কথা শুনে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ঝুমা। তারপর ঈর্ষা এবং লোভ-মেশানো গলায় বলল, 'সুজনগঞ্জের হাট কোথায়?'

'অনেক দূর।' বিনু বলতে লাগল, 'সকালবেলা বেরুলে যেতে দুপুর হয়ে যায়।'

সুর টেনে টেনে ঝুমা বলল, 'এ-ত-দূ-র!'

'হুঁ—'

'সেখানে কী দেখলে?'

কাল হাটে গিয়ে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে, বলে গেল বিনু। মন দিয়ে শুনে ঝুমা বলল, 'যুগলকে একটা কথা বলবে?'

'কী?'

'আমাকে একদিন সুজনগঞ্জে নিয়ে যেতে।'

'বলব।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

একটুক্ষণ চুপ।

তারপর চারদিকের অসংখ্য পাখি দেখতে দেখতে ঝুমা বলল, 'ইস, আমার এয়ারগানটা যদি আনতাম—'

বিনু শুধলো, 'তা হলে কী হতো?'

'দেখতে এতক্ষণে কতগুলো পাখি শিকার করে ফেলতাম—'

'তুমি বন্দুক ছুঁড়তে পার!'

চোখ বড় করে মাথা নাড়তে নাড়তে ঝুমা বলল, 'তোমার বুঝি কিছু মনে থাকে না! একেবারে হাঁদারাম সিকদার—'

বিনুর মুখ লাল হয়ে উঠল। থতমত খেয়ে সে বলল, 'কী মনে থাকে না আমার?'

'সেদিন তোমাকে এয়ারগান ছোঁড়ার কথা বললাম না?'

এবার মনে পড়ে গেল। বন্দুক ছোঁড়ার কথা বলেছিল বটে ঝুমা। তা ছাড়া যার মামা বাঘ-ভাল্লুক মারতে পারে, তার ভাগনী কি আর দু-একটা পাখি শিকার করতে পারবে না?'

ঝুমা আবার বলল, 'কি মশাই, মনে পড়েছে?'

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করল বিনু।

ঝুমা পাখি-শিকার নিয়ে আর কিছু শুধলো না। চারদিকে ফুটন্ত ফুলের মেলার দিকে তাকিয়ে বলল,

'এয়ারগান যখন আনি নি তখন ফুল তুলি এস—'

বিনু উৎসাহিত হয়ে নৌকোর ধারে এসে ঝুঁকে বসল। ঝুমাও বসল তার পাশে। তারপর ক্ষিপ্র হাতে দু'জনে ফুল ছিঁড়তে লাগল। চোখের পলকে শাপলা আর পদ্মে, মুত্রা এবং কচুরিফুলে নৌকো বোঝাই হয়ে গেল।

ফুলটুল তুলতে তুলতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঝুমা, 'ওটা কী গাছ জানো?' বলে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

অথৈ জলের মাঝখানে গাছটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, ডিঙি মেরে আকাশের ওপারের কোনো রহস্য বুঝি দেখতে চেষ্টা করছে। কালই গাছটা চিনিয়ে দিয়েছিল যুগল। বিনু বলল, 'ওটা কাউ গাছ।'

গাছটার সারা দেহ ফলে বোঝাই। হলুদ আভা-মাখানো সবুজ রঙের ফলগুলো সরু বোঁটায় ঝুলছে। সেগুলো দেখিয়ে ঝুমা বলল, 'ওগুলো খায়?'

'হ্যাঁ—'

'তুমি খেয়েছ?'

'না।'

'তবে কি করে বুঝলে খায়?'

'যুগল বলেছে।'

'খেতে কিরকম লাগে জানো?'

'খুব টক।'

লোভে চোখ চকচক করতে লাগল ঝুমার। দ্রুত চাপা স্বরে সে বলল, 'চল, ক'টা কাউ পাড়ি। বাড়ি গিয়ে নুন দিয়ে খাব।'

ব্যাপারটা খুবই লোভনীয়। বিনু তক্ষুণি রাজি হয়ে গেল, 'আচ্ছা—'

বৈঠা টেনে টেনে নৌকোটাকে কাউ গাছের কাছে নিয়ে এল দু'জনে। আনা মাত্র হাত বাড়াল ঝুমা, কিন্তু ফলগুলো ধরতে পারল না। কাজেই পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে আরো খানিক লম্বা হয়ে নিল, এবারও ফলগুলো ছোঁয়া গেল না।

অগত্যা বিনুর দিকে তাকাল ঝুমা। করুণ হেসে বলল, 'পারলাম না।'

বিনু বলল, 'তুমি বেঁটে যে—'

'তুমি তো লম্বা—'

গম্ভীর চালে বিনু বলল, 'তোমার চাইতে অনেক—'

চোখ কুঁচকে বিনুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল ঝুমা। তারপর বলল, 'কেমন লম্বা এবার দেখব। পাড় তো ঐ কাউটা—'

নৌকোর একেবারে ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। খানিক ঝুঁকে গাছের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ অঘটন ঘটে গেল। টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে সোজা জলে গিয়ে পড়ল সে।

এখানে অগাধ জল, পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেল না বিনু। একবার ডুবে যাচ্ছে সে, পরক্ষণেই ভেসে উঠছে। আর সমানে হাত-পা ছুঁড়ছে। হাত বাড়িয়ে কিছু একটা যে ধরবে তেমন কিছুই নেই কাছাকাছি। এরই ভেতর অনেকখানি জল খেয়ে ফেলল সে।

খানিক পর বিনুর মনে হল, জলের ওপর আর মাথা তুলতে পারছে না। এবার সে নির্ঘাত ডুবে যাবে। নৌকোটা কিংবা কাউফলের গাছটা কোথায় কোনদিকে, সে বুঝতে পারছে না, দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে সেদিকে যেতে চেষ্টা করত। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল বিনুর, আঙুলের ডগাগুলো ঝিনঝিন করতে লাগল, কানের কাছে একসঙ্গে হাজার ঝিঁঝি একটানা ডেকে চলল। অথৈ জলে ডুবে যেতে যেতে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল বিনু, 'মরে গেলাম, মরে গেলাম। আমাকে বাঁচাও—'

আর তখনই সে শুনতে পেল, কেউ যেন ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়েছে। পরমুহূর্তেই টের পেল তার চুলগুলো কার হাতের মুঠোয়। জলের ওপর তাকে ভাসিয়ে রেখে চুল ধরে কেউ টেনে নিয়ে চলেছে।

যে চুল ধরেছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল বিনু, কিন্তু সে এমনভাবে রয়েছে যে ধরা যাচ্ছে না।

ধরাই যখন যাচ্ছে না তখন আর সে চেষ্টা করল না বিনু। এখন সে ভেসে থাকতে পারছে। বুক ভরে হাওয়া টানতে টানতে হঠাৎ তার মনে হল, ঝুমা আর সে ছাড়া এখানে তো কেউ ছিল না। তবে কি ঝুমাই তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছে?

যতখানি পারল মাথাটা উঁচু করে একবার নৌকার দিকে তাকাল বিনু। সেখানে কেউ নেই। ঝুমা—নিশ্চয়ই ঝুমা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

বিনু ডাকল, 'ঝুমা—'

পাশ থেকে ঝুমাই সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'তুমি আমাকে বাঁচালে। নইলে—'

বিনুর কথা শেষ হবার আগেই ঝুমা বলে উঠল, 'এখন কথা বলতে হবে না, আগে নৌকায় উঠে নাও—'

এক সময় তারা নৌকোর কাছে এসে পড়ল। গলুই দেখিয়ে ঝুমা বলল, 'এটা ধর।'

বিনু গলুই ধরল।

ঝুমা আবার বলল, 'আমি তোমার কোমর ধরে ওপর দিকে ঠেলে দিচ্ছি, তুমি নৌকায় ওঠ।'

দু-তিনবার চেষ্টা করেও বিনু উঠতে পারল না। ঝুমা তখন বলল, 'গলুইটা খুব শক্ত করে ধরে থাকো। আমি তোমোকে ছেড়ে দিয়ে নৌকোয় উঠি।'

ভীত সুরে বিনু বলল, 'আমাকে ছেড়ে দেবে?'

'বা রে, ছেড়ে না দিলে নৌকোয় উঠব কি করে?' আমি উঠে তোমায় টেনে তুলব। কিছু ভয় নেই—'

ভরসা দিয়ে বিনুকে ছেড়ে দিল ঝুমা। তারপর ডুব-সাঁতারে নৌকোর ওধারে গিয়ে চোখের পলকে বেয়ে বেয়ে ওপরের পাটাতনে উঠে পড়ল।

প্রাণপণে দু'হাত দিয়ে গলুইটা ধরে ছিল বিনু। জলে পড়ে যাবার পর থেকেই সীমাহীন এক ভয় তাকে ঘিরে আছে। ঘোরের ভেতর সে ঝুমার সাঁতার কাটা, নৌকায় ওঠা দেখতে লাগল।

এদিকে পাটাতনে উঠেই বিনুর দিকে অনেকখানি ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ঝুমা। সে বলল, 'আমাকে ধরে ওঠ।'

ঝুমার হাত ধরে আস্তে আস্তে নৌকোয় উঠল বিনু। উঠেই টের পেল, পেটটা খুব ভারি লাগছে। মনে পড়ল, খানিক আগে প্রচুর জল খেয়েছে। বুকের ভেতরটা তার থরথর করছিলই, নিরাপদ জায়গায় উঠবার পর কাঁপুনিটা হাজার গুণ বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ নির্জীবের মতন বসে থেকে ক্লান্ত গলায় বিনু বলল, 'তুমি না থাকলে আমি আজ মরে যেতাম।'

গলা ঝাঁকিয়ে ঝুমা বলল, 'যেতেই তো। ধাড়ী ছেলে, এখনও সাঁতার শেখ নি!'

মুখ নিচু করে বিনু বলল, 'তুমি কিন্তু খুব ভাল সাঁতার কাটতে পার।'

'পারিই তো।'

'কোথায় শিখলে?'

'কলকাতায়। একটা সাঁতারের ক্লাবে। কী করে জল থেকে মানুষ তুলতে হয় তাও শিখেছি। ভাগ্যিস শিখেছিলাম!'

বিনু চুপ করে থাকল। এতক্ষণ কিছুই দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিল না সে। বুঝতেও না। তার সামনে থেকে পাখি-ফুল-ধানখেত, পেঁজা তুলোর মতন সাদা মেঘ এবং ঝকঝকে নীলাকাশ দিয়ে ঘেরা জলবাংলার এই আশ্চর্য রূপের জগৎটি মুছে গিয়েছিল। জলের ভেতর থাকার সময় একটুখানি শক্ত নিরাপদ মাটি আর বুকভরা হাওয়ার জন্য সে ছটফট করছিল।

এখন ভয়টা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। স্পষ্ট করে সব কথা ভাবতে পারছে বিনু। কিভাবে অথৈ জল থেকে চুলের মুঠি ধরে ঝুমা তাকে তুলে এনেছে, এই কথাটা যতই সে ভাবল ততই অপার বিস্ময় যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে লাগল। কৃতজ্ঞ চোখে দুঃসাহসী মেয়েটাকে একবার দেখে নিল বিনু।

গম্ভীর চালে ঝুমা বলল, 'সাঁতারটা তাড়াতাড়ি শিখে নেবে, বুঝলে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল বিনু।

ঝুমা আবার বলল, 'কাউফল খেয়ে আর কাজ নেই, কি বল?' বলে ফিক করে হেসে ফেলল।

বিনু চুপ, ঘাড় নিচু করেই ছিল সে। এবার আরো একটু নুয়ে পড়ল।

ঝুমা ঠোঁট কুঁচকে হেসে বলল, 'তখন তো পাড়তে গিয়ে উল্টে-মুল্টে জলে পড়লে। আবার পাড়তে গেলে কী করে যে বসবে! তার চাইতে চল, বাড়ি যাই।' হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'উহুঁ—উহুঁ—'

বিনু এবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল।

ঝুমা বলল, 'এক্ষুণি তো যাওয়া হবে না।'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটল বিনুর। অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

আঙুল দিয়ে নিজের এবং বিনুর ভিজে জামাটামা দেখিয়ে বলল, 'এগুলো আগে শুকিয়ে নিই। নইলে—' বলে চোখের একটা ইঙ্গিত করল।

ইঙ্গিতটা বুঝল বিনু। একটু হেসে অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

ঝুমা ডাকল, 'অ্যাই—'

খানিক দূরে নলখাগড়া ঝোপের মাথায় এক ঝাঁক ফড়িং পাতলা ফিনফিনে ডানায় উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে বিনু সাড়া দিল, 'কী?'

ঝুমা বলল, 'তুমি যে জলে পড়ে গিয়েছিলে, একথা কিন্তু কাউকে বোলো না। আমার মা যদি জানতে পারে তোমাকে নিয়ে এসেছি, কাউফল পাড়তে বলেছি, আর সেই জন্যেই তুমি জলে পড়ে গেছ, তা হলে কী হবে জানো?'

ফড়িংদের দিক থেকে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বিনু বলল, 'কী?'

'মা আমাকে ঠিক মেরে ফেলবে।'

বিনু বলল, 'জানতে পারলে আমার মা-বাবাও খুব বকবে। আর কক্ষণো নৌকোয় উঠতে দেবে না।'

কী একটু ভেবে ঝুমা বলল, 'জলে পড়ে যাবার কথাটা খালি তুমি আর আমি জানবো, আর কেউ না।'

'আচ্ছা—' বিনু ঘাড় কাত করল। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল, বার বছরের জীবনে কোনোদিন কোনো কথা মা-বাবার কাছে লুকোয় নি সে। কিন্তু এই কথাটা গোপন রাখতেই হবে। নইলে বাইরে বেরুবার পথ আজ থেকে তার বন্ধ, সব সময় কেউ না কেউ তাকে পাহারা দিয়ে রাখবে।

সব চাইতে মজার ব্যাপার, ঝুমাকে সে ভাল চেনে না, জানে না। রাজদিয়াতে এসেই তাকে প্রথম দেখেছে। অথচ এই প্রায়-অচেনা মেয়েটা তার লুকনো কথাটা জানবে, আর কেউ না।

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে জামাপ্যান্ট যখন শুকিয়ে গেল, জলে ডোবার কোনো চিহ্নই যখন আর নেই, সেই সময় ঝুমা বলল, 'চল, এবার যাই।'

বিনু বৈঠা নিয়ে তখনকার মতন গলুইর কাছে যাচ্ছিল, ঝুমা চেঁচিয়ে উঠল, 'না—না—'

চমকে বিনু তাকাল, 'কী হল?'

'তোমাকে আর ওস্তাদি করে নৌকো বাইতে হবে না। মাঝখানে বসে থাক। বৈঠা চালাতে গেলে আবার যদি পড়ে যাও—'

ঝুমা যেভাবে যে কণ্ঠস্বরে কথা বলছে তাতে মনে হয় সে বিনুর চাইতে অনেক বড়। বিনু তার কাছে যেন অবোধ শিশু। ঝুমার চালচলন ভাবভঙ্গি সব কিছুই সুচতুরা বয়স্কা মহিলার মতন।

সাঁতার না জেনে অথৈ জলে পড়ে যাওয়া খুব লোভনীয় ব্যাপার নয়। একটু আগে বিনুর সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। কাজেই বৈঠা ফেলে ঝুমার কথামতন তাড়াতাড়ি নৌকোর মাঝখানে এসে বসল সে।

একা একা জল ঠেলে নৌকোটাকে পুকুরঘাটে নিয়ে এল ঝুমা। আর আসতেই দেখা গেল, বাগানের ভেতর সুধা-সুনীতি আনন্দ-রুমা এবং ঝিনুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিকার-কাহিনীর আসর তা হলে ভেঙেছে।

সুধারাও বিনুদের দেখতে পেয়েছিল, দেখামাত্র ছুটে এল। উদ্বেগের গলায় সুধা বলল, 'এই, তোরা কোথায় গিয়েছিলি রে?' সুনীতি-আনন্দ-রুমাও সেই একই প্রশ্ন করল। ঝিনুক অবশ্য কিছু বলল না, তীক্ষ্ণ কুটিল চোখে ঝুমা আর বিনুকে দেখতে লাগল।

বিনু নীরব। ঝুমা লাফ দিয়ে নৌকো থেকে মাটিতে নামল। তারপর বলল, 'আমরা ফুল তুলতে গিয়েছিলাম। এই দেখ কত নিয়ে এসেছি—' পদ্ম-শাপলা আর কচুরি ফুলে নৌকো বোঝাই হয়ে আছে, সেগুলো দেখাল ঝুমা।

রুমা বলল, 'কি দস্যি মেয়ে তুই!'

এদিকে নিঃশব্দে বিনুও নেমে এসেছিল। সুধা তাকে ধরল, 'ঐটুকুন বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে গিয়েছিলি, যদি জলে পড়ে যেতিস? তুই তো সাঁতার-টাঁতার জানিস না!' বলতে বলতে তার চোখ প্রখর হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'এদিকে আয় তো—'

ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে গেল বিনু। ছোটদির যা চোখ, ওকে বিশ্বাস নেই। হয়তো তার জলে ডোবার ব্যাপারটা ধরেই ফেলেছে। দূর থেকেই সে বলল, 'না, যাব না।'

'তোর চুল কিরকম ভেজা-ভেজা, জামা-প্যান্ট কেমন কোঁচকানো মোচকানো। জলে ভিজেছিলি নাকি?'

আরেকটু দূরে সরে আবছা গলায় বিনু কী বলল, বোঝা গেল না।

সন্দিগ্ধ চোখে বিনুর হাবভাব দেখতে দেখতে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল সুধা, এই সময় রুমা বলে উঠল, 'এই ঝুমা, তোর চুলগুলোও তো ভেজা-ভেজা, ইজের-ফ্রক কোঁচকানো-কোঁচকানো। কী করছিলি বল তো তোরা?'

বিনু লক্ষ করল, ঝুমা একটুও ভয় পেল না। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাবে নিরীহ ভালমানুষের মতন মুখ করে ডাহা মিথ্যে বলে গেল, 'বিনুদাদা না আমার গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল, আমিও ওর গায়ে দিয়েছি। তাই ভিজে গিয়েছিলাম।'

'পাজি মেয়ে—'

ব্যাপারটা আরো কিছুক্ষণ হয়তো চলত, তার আগেই আনন্দ বলে উঠল, 'আমার একটা প্রস্তাব

আছে।'

সবাই উৎসুক চোখ তার দিকে ফিরল। সুধা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের প্রস্তাব?'

কবজি উল্টে ঘড়িটা দেখে নিয়ে আনন্দ বলল, 'সবে এগারটা বাজে। খাওয়া-দাওয়ার এখনও দেরি আছে। ততক্ষণ নৌকোয় করে আমরা একটু ঘুরে আসি না কেন?'

সুধা বলল, 'খুব ভাল, খুব ভাল—'

সুনীতি কিছু বলল না। তবে ঘাড় কাত করে জানাল, এ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

রুমা তো প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল, 'আমরা নৌকোয় চড়ব। কি ভাল যে লাগছে!'

আনন্দ বলল, 'সবাই যখন রাজি তখন আর দেরি করে দরকার নেই। আসুন—আসুন—'

সুনীতি আগে আগে ছিল। সে প্রথমে নৌকোয় উঠল। তারপর উঠল আনন্দ। আনন্দর ঠিক পরেই ছিল সুধা। নৌকোর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল সে।

আনন্দ বলল, 'কী হল?'

সুধার মাথায় ততক্ষণে অনেকখানি দুষ্টুমি ভর করে বসেছে। কৌতুকের আভায় তার নীলচে চোখ ঝিকমিক করছে। ঠোঁট টিপে সে বলল, 'কিছু হয় নি।'

'তা হলে উঠে পড়ুন।'

ভুরু কুঁচকে কেমন করে যেন আনন্দের দিকে তাকাল সুধা। বলল, 'উঠব?'

আনন্দ বলল, 'বাঃ, বেশ! নৌকোয় করে ঘোরা হবে বলে কথা হল। না উঠলে ঘুরবেন কি করে?'

সুধা উত্তর দিল না। কেউ কিছু বুঝবার আগেই হঠাৎ এক কান্ড করে বসল সে। গলুই ধরে জোর ধাক্কায় নৌকোটাকে গভীর জলের দিকে ঠেলে দিল।

আনন্দ প্রথমটা বিমূঢ়, তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কী হল, এটা কী হল!'

সুধার ষড়যন্ত্রটা ধরতে পেরে সুনীতিও চিৎকার করছে, 'বাঁদর মেয়ে, পাজি মেয়ে—'

সুধা পুকুরঘাট থেকে গলা তুলে বলতে লাগল, 'আনন্দদা, দিদি আপনার শিকারের গল্প খুব ভালবাসে। শুনতে শুনতে একেবারে মুগ্ধ-মুগ্ধ-মুগ্ধ হয়ে যায়। সুযোগ করে দিলাম, যত পারেন শুনিয়ে দেবেন।' বলে হেসে হেসে গলে পড়তে লাগল।

পুকুরের মাঝখান থেকে সুনীতি সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে,'শয়তান মেয়ে, মাকে বলে তোমার ফাজলামি বার করে ছাড়ব।'

আনন্দ বিব্রত, বিমূঢ়। কী করবে তা যেন ভেবে উঠতে পারছে না। হাতের ইশারায় সুধা তাকে নৌকো নিয়ে দূরে পাড়ি দিতে বলল। তারপর রুমার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছ—'

রুমা বলল, 'এ মা, শুধু শুধু রাগ করব কেন?'

'নৌকো করে বেড়াতে পারলে না বলে।'

'নৌকোয় আমি ঢের চড়েছি। আজ না হয় নাই চড়লাম।' রুমা বলতে লাগল, 'আমি কি ছেলেমানুষ যে এই জন্যে রাগ করব?'

একটু চুপ করে থেকে সুধা বলল, 'ব্যাপারটা কী জানো ভাই—'

'কী?'

'তোমার মামাটি আমার দিদিভাইয়ের—' এই পর্যন্ত বলে সুধা চোখ টিপল।

রুমাও চোখ নাচাল। সুর টেনে বলল, 'সত্যি!'

মাথা অল্প কাত করে হেসে সুধা বলল, 'সত্যি—'

'তাই বুঝি দু'জনকে চাল করে দিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মতো দয়ালু মেয়ে আর কক্ষণো দেখি নি।'

'বলছ!'

'হু-উ-উ—'

একটু চুপ করে থেকে রুমা আবার বলল, 'তোমার কথা জানা রইল। দরকার হলে আমাকেও এইরকম চাল-টাল করে দিও—'

সকৌতুক রসালো গলায় সুধা বলল, 'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। কবে দরকার হচ্ছে?'

চোখ ছোট করে রুমা বলল, 'এক্ষুণি ঠিক বলতে পারছি না।'

কি বলতে যাচ্ছিল সুধা, হঠাৎ দেখতে পেল বিনু, ঝুমা আর ঝিনুক পলকহীন তাকিয়ে আছে। সুধা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'কী শুনছিস রে তোরা? এই উল্লুক ছেলে—'

বিনু বলল, 'তোরা যা বলছিস তাই শুনছি।'

সুধা তাড়া লাগাল, 'খুব পাকা হয়েছ, না? যা-যা, এখান থেকে ভাগ—'

তোরা ভাগ—'

সুধা রেগেমেগে উঠতে যাচ্ছিল, রুমা তার আগেই বলে উঠল, 'চল চল, আমরা ঐ বাগানের দিকটায় যাই—'

উত্তর দিকে বাগানটা যেখানে বেতের লতা আর হলুদ রঙের লটকা ফলের গাছে ঘন হয়ে আছে সুধারা সেদিকে চলে গেল।

বিনুরা দাঁড়িয়েই ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে পুকুরটার দিকে তাকাতে গিয়েই সে অবাক, আনন্দদের নৌকোটার চিহ্নমাত্র নেই, ধানখেতের ভেতর কোথায় কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে কে জানে।

বিনুর দেখাদেখি ঝুমাও পুকুরের দিকে তাকাল। বলল, 'কী খুঁজছ?'

বিনু বলল, 'নৌকোটা কোথায় গেল বল তো—'

ভুরু নাচিয়ে ঠোঁট টিপে চাপা গলায় ঝুমা বলল, 'আমার মামা তোমার দিদিকে নিয়ে হয়তো—'

'কী?'

'আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে চলে গেছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে ভয়ে ভয়ে বিনু বলল, 'জানো, আমার বড়দিটা না আবার সাঁতার জানে না। ফুল তুলতে গিয়ে কি কাউফল পাড়তে গিয়ে যদি জলে পড়ে যায়?'

ঝুমা বলল, 'এই জন্যে তুমি ভয় পাচ্ছ?'

'হুঁ—'

'কোনো ভয় নেই। আমার মামাই তো সঙ্গে আছে।'

'তোমার মামা বুঝি সাঁতার জানে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মতো?'

'আমার চাইতে ঢের ঢের ভাল। তোমার দিদি যদি জলে পড়ে যায় মামা ঠিক তুলে আনবে।'

আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে খুব আস্তে আস্তে বিনু বলল, 'যেমনি করে তুমি আমায় তুলে এনেছিলে?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে ঝুমা বলল, 'কেমন করে আনবে জানি না। একেক জন একেক রকম করে তুলে আনে। আমি তো তোমার চুলের মুঠি ধরে তুলেছিলাম। কেউ কেউ আবার জড়িয়ে ধরেও তোলে।'

হঠাৎ গলা চড়িয়ে বিনু বলে উঠল, 'কক্ষণো না।'

ঝুমা অবাক, 'কী!'

'তোমার মামা আমার দিদিকে কক্ষণো জড়িয়ে ধরে তুলবে না।'

'যেমন করে পারে তুলুক, তাতে তোমার কী, আমার কী। চল এখন বাড়ি যাই—'

আগে আগে বিনু আর ঝুমা চলেছে। পেছনে ঝিনুক।

যেতে যেতে সরু গলায় ঝুমা ডাকল, 'অ্যাই—'

বিনু অন্যমনস্কের মতন হাঁটছিল, তাড়াতাড়ি চোখ তুলে পাশের দিকে তাকাল।

ঝুমা বলল, 'সেই কথাটা কিন্তু কাউকে বোলো না।'

'কোন কথাটা?'

'হাঁদারাম সিকদার। একটু আগে কাউফল পাড়তে গিয়ে কী হয়েছিল মশাই?'

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে ঝিনুককে দেখে নিল বিনু। মেয়েটা গোয়েন্দা চোখে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি বিনু বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে আছে।'

'সেই কথাটা বললে দু'জনেরই কিন্তু—'

'কী?'

কানের কাছে মুখ এনে ঝুমা ফিসফিস করল, 'মার হবে।'

সেই অবস্থাতেই বিনু যতখানি পারল, মাথাটা নেড়ে ঝিনুককে দেখতে চেষ্টা করল। মেয়েটা ঝুমার কথা শুনবার জন্য কান খাড়া করে আছে।

একসময় তারা বাড়ি এসে গেল।

দুপুর পেরিয়ে সূর্যটা যখন পশ্চিমে অনেকখানি ঢলে পড়েছে, রোদের রঙে যখন হলুদ আভা, সেই সময় খাবার ডাক পড়ল।

রান্নাঘরের লম্বা বারান্দায় সারি সারি আসন পড়েছে। সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

আনন্দ-সুধা-সুনীতি-ঝুমা-রুমা আর ঝিনুক বসেছে একদিকে। আরেক দিকে অবনীমোহন শিশির এবং হেমনাথ।

খেতে খেতে আড়ে আড়ে সুধা আর রুমা আনন্দ এবং সুনীতিকে দেখতে লাগল। তাদের চোখেমুখে ঝিকমিক দুষ্টুমির হাসি আঠার মতন মাখানো।

সুনীতি চোখ তুলে কারও দিকে তাকাচ্ছে না, ঘাড় গুঁজে পাতের ওপর ঝুঁকে আছে আর খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়ে যাচ্ছে। ভাত-ডাল-মাছভাজা দিয়ে সাজানো প্রকাণ্ড একখানা কাঁসার থালা ছাড়া তার আশেপাশে সামনে-পেছনে আর কিছুই যেন নেই, বিশ্বসংসার সব মুছে গেছে।

সুধা দু-চারবার ডাকাডাকি করে যখন সুনীতির সাড়া পেল না তখন আনন্দর দিকে ফিরল। গলার খুব গভীর থেকে ডাকল, 'এই যে—এই মশাই—'

আনন্দ তাকাল। হেসে হেসে বলল, 'কী বলছেন?'

'আছেন কেমন?'

'ভালই।'

চোখের তারাদুটো খঞ্জনপাখির মতন কিছুক্ষণ নেচে বেড়াল সুধার। তারপর সে বলল, 'নৌকোভ্রমণ কেমন লাগল?'

আধবোজা চোখে আধফোটা গলায় আনন্দ বলল, 'ঐ একরকম।'

অবাক হবার মতন করে সুধা বলল, 'একরকম কি মশাই!'

'তবে কী রকম?'

'বলুন চমৎকার।'

ঘাড়খানা খানিক বাঁকিয়ে হাসতে হাসতে আনন্দ বলল, 'বেশ, তাই—'

সুধা বলল, 'কিরকম একখানা সুযোগ করে দিলাম বলুন তো?'

'ধন্যবাদ।'

'শুধু ধন্যবাদে চলবে না।'

'তবে?'

'তার জন্যে পুরস্কার চাই।'

'কী পুরস্কার?'

'সে আপনি জানেন।'

একটু কি ভেবে নিয়ে আনন্দ বলল, 'এক্ষুণি তো আর দেওয়া যাবে না, পুরস্কারের কথাটা মনে থাকল। আমাকে যেরকম সুযোগ করে দিয়েছেন তেমনি একটা সুযোগ টুযোগ আপনাকেও—'

সরু করে জিভ বার করে দ্রুত ভেংচে দিল সুধা, 'এ-হে-হে-' তারপর সুনীতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নৌকোয় সময়টা বেশ কাটল, না রে দিদি?'

সুনীতি চুপ। পাতের দিকে ঝুঁকেই ছিল সে, আরো অনেকখানি নুয়ে পড়ল।

ওদিকে বারান্দার দূর প্রান্তে আরেকটা খেলা চলছে। বিনু খুব মনোযোগ দিয়ে সুধাদের কথা শুনছিল। আর তার পাশ থেকে একটু পর পরই ফিস ফিস গলায় ডেকে যাচ্ছিল ঝিনুক, 'অ্যাই—অ্যাই—অ্যাই—'

ক'দিন হল বিনুরা রাজদিয়া এসেছে, এর ভেতর তার সঙ্গে একটি কথাও বলে নি ঝিনুক। আজ তাকে ডাকতে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিনু। কিন্তু তার চাইতেও বড় বিস্ময় ছিল সুধাদের দিকে। বিনুর চোখ-কান-মন, সব সুধারাই আকর্ষণ করে রেখেছিল। ফলে ঝিনুকের ডাকটা শুনতে পেলেও সে সাড়া দিচ্ছিল না, অন্যমনস্কের মতন বসে ছিল।

সুধা একটু থামলে ঝিনুকের দিকে ফিরল বিনু। সুধাদের কথা শুনতে শুনতে আবছাভাবে যে বিস্ময়টা সে অনুভব করছিল এবার তা মুখেচোখে খুব স্পষ্ট ফুটে বেরুল।

ঝিনুক তাকিয়েই ছিল। চোখাচোখি হতে বলল, 'কতক্ষণ ধরে তোমায় ডাকছি, শুনতে পাও না?'

বিনু বলল, 'ডাকছ কেন?'

'তখন নৌকোয় করে তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?'

'ঐ ধানখেতের ওধারে।'

'কী করতে?'

কী করতে গিয়েছিল, বিনু বলল।

ঝিনুক বলল, 'খুব ফুলটুল তুললে তা হলে।'

'হুঁ—' বিনু ঘাড় কাত করল।

একটু চুপ করে থেকে ঝিনুক বলল, 'কাউফুল পাড়তে গিয়ে তোমার কী হয়েছিল?'

বিনু ভীষণ চমকে উঠল। ভীত চোখে ঝিনুককে দেখতে দেখতে বলল, 'কী আবার হবে? কিছু হয় নি তো—'

বিনুর চোখের ভেতর তাকিয়ে ঝিনুক বলল, 'নিশ্চয়ই হয়েছে।'

কাঁপা সুরে বিনু বলল, 'সত্যি বলছি হয় নি।'

'তা হলে ও তোমাকে কী একটা কথা বলতে বারণ করল কেন?' বলে আড়চোখে ঝুমাকে দেখিয়ে দিল ঝিনুক।

চট করে মনে মনে বানিয়ে নিয়ে বিনু বলল, 'ও—হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। কাউফল পাড়তে যখন যাই একটা কাক আমার মাথায় ঠুকরে দিয়েছিল। সেই কথাটা বলতে বারণ করেছে ঝুমা।'

একদৃষ্টে তাকিয়েই ছিল ঝিনুক। খুব আস্তে আস্তে সে মাথা নাড়ল, 'উঁহু—উঁহু—উঁহু—'

'কী ?'

'কাক না।'

'তবে কী ?'

'আর কিছু হয়েছে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ।'

'না না, আর কিচ্ছু হয় নি।'

'মা কালীর দিব্যি বল।'

'তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'মা কালীর দিব্যি বললে বিশ্বাস হবে।'

ওধার থেকে হেমনাথ ডেকে উঠলেন, 'আনন্দ—'

সুধা-আনন্দ-সুনীতি আর রুমার মধ্যে সেই মজার খেলাটা চলছিলই। চাপা মৃদু গলায় তারা কথা বলছিল, হাসাহাসি করছিল। ডাকটা শুনতে পায় নি আনন্দ।

হেমনাথ রগুড়ে গলায় আবার ডাকলেন, 'এই যে বাঘ-ভাল্লুক-মারিয়ে—'

চমকে আনন্দ তাকাল, 'আজ্ঞে, আমায় ডাকছেন ?'

হেমনাথ ঘাড় কাত করলেন, ইঙ্গিতময় সুরে বললেন, 'আপনি কি ওদিকে খুব ব্যস্ত ?'

আনন্দ হকচকিয়ে গেল। মুখ ঈষৎ নত করে আস্তে আস্তে বলল, 'আজ্ঞে না। এমনি গল্প করছিলাম।'

হেমনাথ বললেন, 'কী গল্প ?'

'এই নানারকম, আজে বাজে—'

'যুবক-যুবতীদের কথায় আমাদের থাকতে নেই। সে যাক গে—'

এই সময় সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি দাদু !'

সুধার গলায় এমন একটা সুর ছিল যাতে থতিয়ে গেলেন হেমনাথ। বললেন, 'কী রে ?'

'তখন না বললেন আপনি ইয়ং ম্যান, একটা দাঁত পড়ে নি, চামড়া কোঁচকায় নি, চশমা ছাড়া দশ মাইল দূরের জিনিস দেখতে পান। আরো কত কী। আমাদের নিয়ে একটা মোগল হারেমও খুলতে চেয়েছিলেন। এখন বলছেন যুবক-যুবতীদের কথায় থাকেন না। তবে কি আপনি বুড়ো ?'

'খুব ধরেছিস দিদি, খুব ধরেছিস—' হেমনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন। শরতের দমকা হাওয়ায় তাঁর হাসির শব্দ এদিক-সেদিক ভেসে বেড়াতে লাগল।

হাসি থামলে আবার আনন্দকে নিয়ে পড়লেন হেমনাথ, 'তুমি তো ইস্টবেঙ্গলে এই প্রথম এলে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' আনন্দ মাথা নাড়ল।

'কেমন লাগছে জায়গাটা ?'

'ভাল। তবে বড্ড জল, কোথাও বেরুনো যায় না।'

'এলেই তো বর্ষার সময়, জল থাকবে না ?'

'বর্ষা কোথায়, এ তো আশ্বিন মাস—শরৎকাল।'

'আমাদের বর্ষা আরম্ভ হয় আষাঢ়ের গোড়ায়, চলে একটানা কার্তিক মাস পর্যন্ত। শীতের সময় কি গরমে এলে দেখতে মাঠে জল নেই, চারদিক শুকনো খটখটে।'

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলল, 'জামাইবাবু বলেছিলেন, এ সময় এলে ভাল গেম হবে। আমি ছর‍্রা-টর‍্রা, কার্তুজ-বন্দুক, সব নিয়ে এসেছি। বাঘটাঘ দূরে থাক, এই জলের ভেতর কোথায় গিয়ে যে দুটো পাখি মারব তাই ভেবে পাচ্ছি না।'

হেমনাথ অবাক। বললেন, 'পাখি শিকারের জায়গাও তোমায় কেউ দেখিয়ে দেয় নি!'

'আজ্ঞে না।'

'ঠিক আছে, যুগলের সঙ্গে তোমাকে নিশিন্দার চরে পাঠিয়ে দেব। কত পাখি মারতে পার, একবার দেখব।'

আনন্দ প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'কবে পাঠাবেন?'

'যেদিন বলবে।'

'কাল?'

'বেশ তো।'

এই সময় শিশির বললেন, 'কাল কেমন করে যাবে? কাল বারোড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন আছে না?'

আনন্দ বলল, 'তা হলে পরশু-টরশু—' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল, 'এক কাজ করলে কী হয়?'

হেমনাথ, শিশির, অবনীমোহন—সবাই উৎসুক হলেন।

আনন্দ বলতে লাগল, 'একা একা আমি না গিয়ে সবাই মিলে গেলে দিনটা দারুণ কাটবে। সকালবেলা খাবার-দাবার নিয়ে বেরিয়ে যাব, পাখি-টাখি শিকার করে ফিরব সেই রাত্তিরে।'

অবনীমোহন বিপুল উৎসাহে সমর্থন জানালেন, 'চমৎকার আইডিয়া। সবাই মিলে একসঙ্গে একটা দিন হই হই করে কাটানো যাবে।'

অবনীমোহন সেই মানুষ সব সময় চমকপ্রদ কিছুর জন্য যাঁরা উন্মুখ হয়ে আছেন, হাতের কাছে যখন যে স্রোতটি পান তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছোট-বড় যেরকম ঢেউই উঠুক না, তাঁকে দুলিয়ে যায়। তিনি বলতে লাগলেন, 'জানো আনন্দ, কম বয়েসে দু-চারটে পাখি আমিও মেরেছি।'

এবার আনন্দর অবাক হবার পালা, 'তাই নাকি!'

ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'তোমার কাছে এক্সট্রা বন্দুক-টন্দুক আছে?'

'আছে।'

'খুব ভাল, খুব ভাল। বুড়ো বয়সে একবার চাঁদমারি করে দেখা যাবে কেমন হয়।'

সুরমা স্নেহলতা গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নাক কুঁচকে, চোখের মণিতে আলতো করে কপট তাচ্ছিল্য মিশিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'তুমি মারবে পাখি, তবেই হয়েছে! গাছের ডালে পাখির মনে পাখি বসেই থাকবে, তোমার গুলি যাবে তিন মাইল দূর দিয়ে। শুধু শুধু ছর্‌রা নষ্ট।'

হেমনাথ বললেন, 'না পারলেই বা কী। আনন্দ করতে যাওয়া, সেটা হলেই হল।'

স্নেহলতা বললেন, 'আমাকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে নাকি?'

অবনীমোহন বললেন, 'নিশ্চয়ই। সবাই যাবে আর আপনি বাড়ি বসে থাকবেন, তা হতে পারে না। তা হলে আনন্দের অর্ধেকটাই মাটি।'

'আমি কিন্তু পরশুদিন যেতে পারব না।'

হেমনাথ বললেন, 'কেন?'

'আমার সেদিন উপোস।'

'তা হলে কবে যাবে?'

'এক্ষুণি কি করে বলি? এমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকলে চলে?'

ঠিক হল, কালও না পরশুও না—পরে সুবিধে মতন একটা দিন ঠিক করে নিশিন্দার চরে শিকারে যাওয়া হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সারা বিকেল গল্প করে সন্ধের আগে আগে শিশিররা চলে গেলেন। তারপরও অনেকক্ষণ ওদের কথা হল, বিশেষ করে আনন্দর।

অবনীমোহন বললেন, 'বেশ ছেলেটি।'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, খুব স্মার্ট। সুপুরুষ।'

এদিকে একধারে বসে চাপা আধফোটা গলায় সুধা সুনীতিকে বলতে লাগল, 'শুনছিস দিদি, শুনছিস—'

অস্বস্তির গলায় সুনীতি বলল, 'কী আবার শুনব?'

'বাবা কেমন আনন্দবাবুর ভক্ত হয়ে উঠেছে।'

'উঠেছে তো বেশ করছে।'

'আমার কী মনে হয় জানিস?'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সুনীতি বলল, 'জানতে চাই না।'

সুনীতির মুখ যেদিকে সেদিকে গিয়ে আঙুলের ডগায় তার চিবুকটা তুলে ধরল সুধা। হালকা গলায় বলল, 'আনন্দবাবুকে বাবা বোধহয় জামাই করে নেবে।'

সুনীতি ভেংচে ভেংচে বলল, 'তোকে বলেছে!'

'এখনও বলে নি। তবে বাবার ভাবগতিক দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

চট করে কী ভেবে নিয়ে তরল পরিহাসের চোখে বোনের দিকে তাকাল সুনীতি, 'বাবার ভাবগতিক দেখে আমার কিন্তু আরেকটা কথা মনে হয়—'

ঠিক বুঝতে না পেরে সুধা বলল, 'কী?'

'আনন্দবাবুর আগে হিরণবাবুকেই বাবা জামাই করে নেবে।'

চোখ পাকিয়ে সুধা বলল, 'ভাল হবে না বলছি দিদি।'

কাছাকাছি বসে শুনতে শুনতে বিনু টের পাচ্ছিল আনন্দ আর হিরণকে নিয়ে দুই দিদির ভেতর এক মজার খেলা শুরু হয়েছে।

শিশিররা যখন যান তখনও একটু রোদ ছিল—শরৎকালের বেলাশেষের কুণ্ঠিত একটু আলো। দেখতে দেখতে সেটুকুও আর থাকল না। লাটাইতে সুতো গুটনোর মতন গাছপালার মাথা থেকে, ঝকঝকে নীলাকাশ থেকে, তুলোর পাহাড়ের মতন ভারহীন মেঘেদের গা থেকে, কেউ যেন অতি দ্রুত অবেলার রোদ টেনে নিতে লাগল। তারপরেই সমস্ত চরাচর জুড়ে একখানা কালচে রঙের অদৃশ্য জাল এসে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে রৌদ্রময় আকাশ, গাছগাছালি, দূরের জলপূর্ণ প্রান্তর—সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেল। আশ্বিনের সন্ধে লম্বা পায়ে নেমে আসতে লাগল।

ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে যেমন জল ঝরে যায় তেমনি করে হই চই, হুল্লোড়, ছোটাছুটির ভেতর দিয়ে দিনটা কখন ফুরিয়ে গেছে টের পাওয়া যায়নি। সন্ধের পর যখন আকাশের দূর প্রান্তে এক টুকরো চাঁদ উঠল, আবছা আলোয় অন্ধকারটাকে জলো-কালির মতন মনে হতে লাগল, ধানের খেতে জোনাকি জ্বলতে লাগল মিটমিটিয়ে আর অবনীমোহনদের গল্প, সুধা-সুনীতির লঘু সুরের পরিহাস জমে উঠতে লাগল, সেই সময় চোখের পাতা জুড়ে এল বিনুর। বসে বসেই ঢুলতে লাগল সে।

স্নেহলতা দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন, 'এই দাদাভাই—'

চোখ পুরোপুরি মেলে তাকাতে চেষ্টা করল বিনু, পারল না। আধফোটা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই আবার চোখ বুজল।

স্নেহলতা বললেন, 'ঘুম পেয়েছে?'

'হুঁ—'অস্ফুটে উত্তর দিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল বিনু।

সুরমা বললেন, 'ঘুম পাবে না তো কী, সারা দিনে এক মুহূর্তও কি পা পেতে বসে! সবসময় খালি হুড়োহুড়ি, হুটোপুটি—সন্ধে হলেই আর তাকিয়ে থাকতে পারে না।'

অবনীমোহন বললেন, 'রাজদিয়া আসা থেকে তো বইটইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে। পড়া নেই শোনা নাই, ফিরে গিয়ে অ্যানুয়েল পরীক্ষাটা তো দিতে হবে।' বলতে বলতে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, 'বাক্স থেকে ওদের বই বার করেছ?'

সুরমা বললেন, 'না।'

'আজ রাত্তিরেই বার করে রাখবে।'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খালি বেড়ালেই চলবে না, পড়াশোনাও করতে হবে। চর্চা না থাকলে সব ভুলে যাবে। কাল থেকে সকালবেলাটা শুধু লেখাপড়া।'

স্নেহলতা বললেন, 'কালকের কথা কালকে হবে। আয় রে দাদাভাই, ঝিনুকও আয়—তোদের একবারে খাইয়ে বিছানায় পাঠিয়ে দিই।'

ঘুমের ঘোরেই খেয়ে নিল বিনু। অস্পষ্টভাবে টের পেল তার পাশে বসে ঝিনুকও খাচ্ছে, নিজে খাচ্ছে না, কেউ খাইয়ে দিচ্ছে। কে দিচ্ছে, বোঝা গেল না। বুঝতে চেষ্টা করল না বিনু।

রাত্তিরে বিনু আর ঝিনুক পুবের ঘরে হেমনাথের কাছে শোয়। দু'জনকে খাইয়ে দাইয়ে সেখানে দিয়ে গেলেন স্নেহলতা। হেমনাথের শুতে এখনও অনেক দেরি। হাতমুখ ধোবেন, কিছুক্ষণ বই টই পড়বেন। তারপর তো শোওয়া।

স্নেহলতার সঙ্গে ঢুলতে ঢুলতে এ ঘরে এসেছিল বিনু। চোখ দুটো জুড়েই ছিল। বিছানায় পড়ামাত্র রাজ্যের ঘুম চারদিক থেকে তাকে যেন ঘিরে ধরল।

অথৈ ঘুমে ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ বিনুর মনে হল, ছোট ছোট হাত দিয়ে কেউ তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। সমানে বলছে, 'অ্যাই-অ্যাই-অ্যাই—'

এ ঘর প্রায় অন্ধকার। মাথার দিকের টেবিলে একটা হারিকেন নিবু-নিবু হয়ে জ্বলছে, স্নেহলতা যাবার সময় চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওটার জোর কমিয়ে দিয়ে গেছেন।

অস্পষ্ট আলোয় চোখ মেলে একবার দেখে নিল বিনু। এমনিতে হেমনাথ মাঝখানে শোন, তাঁর দু'ধারে তারা দু'জনে থাকে। আজও মাঝখানে হেমনাথের জায়গা রেখে বিনুরা শুয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঝিনুকটা অনেকখানি কাছে সরে এসেছে। সে-ই তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, ডাকাডাকি করছে।

চোখ মেলতেই চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক বলল, 'তোমার বড় ঘুম, ভোঁসভোঁস করে খালি নাক ডাকে।'

বিরক্ত জড়ানো গলায় বিনু বলল, 'ঠেলছ কেন?'

'তখন তো মা কালীর দিব্যি বললে না—'

বিনু ভুলে গিয়েছিল। বলল, 'মা কালীর দিব্যি বলব কেন?'

ঝিনুক অবাক, 'বা রে, মনে নেই!'

'উঁহু—'

'ঝুমার সঙ্গে কাউফল পাড়তে গিয়ে কী হয়েছিল, তখন জিজ্ঞেস করলাম। তুমি বললে, কিছুই হয় নি। তখন মা কালীর দিব্যি বলতে বললাম। এবার মনে পড়ছে?'

বিনু হতভম্ব। কী শয়তান মেয়ে রে! কথাটা একদম ভোলে নি, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ঝিনুক বলল, 'বল, মা কালীর দিব্যি বল—'

মা কালীর নামে দিব্যি করতে বিনুর খুব আপত্তি। দেবতাদের মধ্যে কালীকেই তার সব চাইতে বেশি ভয়। হাতে খড়্গ, গলায় অসুর মুন্ডের মালা—এই ভয়ঙ্করী দেবীটি সম্বন্ধে অনেক সাঙ্ঘাতিক

গল্প বিনুর জানা। সেই জন্যেই তাকে ঘাঁটাতে চায় না সে।

বিনু বলল, 'শুধু শুধু দিব্যি কাটব কেন? তোমাকে তো বললাম, কাউ পাড়তে গিয়ে কিছু হয় নি।'

চাপা গলায় ঝিনুক বলল, 'বুঝেছি।'

'কী?'

'দিব্যি দিতে ভয় পাচ্ছ। নিশ্চয়ই কাউ পাড়তে গিয়ে কিছু হয়েছে। শিগগির আমাকে বল, নইলে—'

'নইলে কী?'

'আমি তোমার মা বাবাকে বলে দেব।'

বিনু চমকে উঠল, 'কী বলবে?'

ঝিনুক বলতে লাগল, 'তোমার চুলগুলো আর জামা-প্যান্ট কেমন দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয়, তুমি জলে পড়ে গিয়েছিলে।'

কাজেই আর গোপন রাখা গেল না। কাউফল পাড়ার সময় যা-যা ঘটেছিল সব বলে ফেলল বিনু।

সমস্ত শুনে ঝিনুক বলল, 'খুব তো লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলে, পারলে?'

বিনু চুপ।

ঝিনুক আবার বলল, 'জানো, আমায় কেউ ফাঁকি দিতে পারে না।'

কথাটা যে হাজার বার সত্যি, মনে মনে বিনুকে তা মানতেই হল।

ঝিনুক বলল, 'আর কখনও আমাকে ফাঁকি দেবে না, বুঝলে?'

'আচ্ছা—' সুবোধ ছেলের মতন ঘাড় কাত করল বিনু।

'দিতে চেষ্টা করলে কিন্তু ঠিক ধরে ফেলব।'

একটু চুপ করে থেকে করুণ অনুনয়ের সুরে বিনু বলল, 'তোমায় সব বললাম, জলে পড়ার কথাটা মা-বাবাকে বোলো না কিন্তু—'

'বললে কী হবে?'

'খুব মারবে।'

'আচ্ছা বলব না। তবে—'

'কী?'

'আমি যা বলব তাই করবে তো?'

যে কোনো শর্তেই এখন বিনু রাজি। তক্ষুণি ঘাড় কাত করল সে, 'হ্যাঁ।'

একটু ভেবে ঝিনুক বলল, 'আমার ঘুম পেয়েছে, আর কথা বলতে পারছি না।'

বিনু বলল, 'আমিও।'

'এস ঘুমিয়ে পড়ি।'

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বিনুর মনে হল, ঝিনুকের কাছে কিছুই গোপন করা যাবে না। যে সিন্দুকেই পুরে রাখুক না, কুলুপ ভেঙে মেয়েটা সেটি ঠিক বার করে নেবেই।

কাল রাত্তিরেই বই বার করে রেখেছিলেন সুরমা।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে হেমনাথ আর ঝিনুকের সঙ্গে প্রথমে সূর্যস্তব সেরে নিল

বিনু। তারপর পড়তে বসল। পুজোর ছুটির পর স্কুল খুললেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। এখন থেকেই একটু-আধটু পড়াশোনা না করে গেলে ডাহা ফেল।

বিনু একাই না, সুধা-সুনীতিও আজ তাড়াতাড়ি উঠে বই নিয়ে বসেছে। কলেজ খুললেই অবশ্য তাদের পরীক্ষা নয়। তবু চর্চাটা রাখা ভাল। নইলে সব ভুলে বসে থাকবে।

পুবের ঘরের বারান্দায় তিন ভাই-বোন পড়তে বসেছিল। দূর প্রান্তে বসে ছিলেন হেমনাথ, তাঁর পাশে ঝিনুক।

পড়ার ফাঁকে বিনুর চোখ বার বার ঝিনুকের দিকে চলে যাচ্ছিল। ঝিনুকও একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বিনু শুনতে পেল, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর নিচু গলায় ঝিনুক হেমনাথকে ডাকল, 'দাদু—'

হেমনাথ দূরে ধানখেতের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কী রে—'

'আমি পড়ব।'

'খুব ভাল কথা, পড় না—'

'আমাকে বই দাও—'

'কোথায় তোর বই ?'

'আমাদের বাড়িতে।'

'আচ্ছা আনিয়ে দেব'খন। তখন পড়িস।'

ঝিনুক শুনল না। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বায়না জুড়ে দিল, 'এক্ষুণি আনাও, এক্ষুণি আনাও—'

হেমনাথ বললেন, 'এক্ষুণি তোদের বাড়ি কে যাবে ? ওবেলা—'

'না না—'

'আরে বাপু, একবেলা না পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

বায়নার সঙ্গে এবার কান্না জুড়ে দিল ঝিনুক, 'বিনুদাদা পড়ছে যে—'

চোখ বড় বড় করে বিস্ময়ের গলায় হেমনাথ বললেন, 'ও, বিনুদাদা পড়ছে বলে পড়তে হবে !'

'হ্যা—'ঝিনুক ঘাড় কাত করল।

'হিংসের জ্বালা কত !' বলেই গলা তুলে ডাকতে লাগলেন হেমনাথ, 'স্নেহ—স্নেহ—'

স্নেহলতা ভেতর বাড়িতে ছিলেন, বড় বড় পা ফেলে এলেন। তাঁর সঙ্গে সুরমা।

স্নেহলতা বললেন, 'এত চেঁচামেচি কেন ? হয়েছে কী ?'

'তাড়াতাড়ি খেতে দাও, আমি বেরুব।'

'কী রাজকার্য আছে শুনি ?'

রাজকার্যটা কী, হেমনাথ বললেন।

শুনে হাসলেন স্নেহলতা, 'তা হলে তো যেতেই হবে।'

কোমল গলায় ওধার থেকে সুরমা বললেন, 'আহা পড়ুক, পড়ুক। বিনুকে হিংসে করে মেয়েটা যদি মায়ের কথা ভুলে থাকে তো থাক। ওর অন্যমনস্ক হওয়া দরকার।'

সুরমারা চলে গেলেন।

একটু পর সকালবেলার খাবার এসে গেল।

খাওয়া যখন আধাআধি হয়ে এসেছে সেই সময় বাগানের দিক থেকে অবনীমোহন এলেন।

হেমনাথ বললেন, 'কি ব্যাপার অবনী, ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে ?'

অবনীমোহন বললেন, 'ঘুম থেকে উঠে রাস্তা ধরে একা একা অনেকখানি ঘুরে এলাম। ভারি ভাল লাগছিল। কলকাতার ধোঁয়া নেই, ভিড় নেই, গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কি নেই—মনে হয় এখানেই থেকে যাই। আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

হালকা গলায় হেমনাথ বললেন, 'বেশ তো, থেকে যাও না।' তারপরেই কি মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'মুখ টুখ ধুয়েছ?'

'আজ্ঞে না।'

'চট করে ধুয়ে খেয়ে নাও। তোমাকে নিয়েই বেরুই—'

'কোথায় যাবেন?'

হেমনাথ বললেন।

অবনীমোহন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'ঐ সঙ্গে একবার শিশিরবাবুদের বাড়িটা ঘুরে আসব।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'কেন বল তো?'

'আনন্দর কাছ থেকে একটা বন্দুক চেয়ে আনব। কাল নিশিন্দার চরে যাবার কথা হল না? অনেকদিন তো প্র্যাকটিশ নেই, আগে থেকে একটু মহড়া দিয়ে রাখব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল।'

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে সকালবেলার খাওয়া যখন শেষ করে এনেছেন অবনীমোহন, বিনু পড়াটড়া ছেড়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদু—'

হেমনাথ তার দিকে ফিরে বললেন, 'কি বলছিস দাদাভাই?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।'

হেমনাথ বললেন, 'তুই তো এখন পড়ছিস, আমাদের সঙ্গে গেলে পড়াটা নষ্ট হবে।'

ওধার থেকে অবনীমোহন বললেন, 'এখন যেতে হবে না।'

বিনু বলল, 'ওবেলা ঠিক পড়ব।'

এবার রাগের গলায় অবনীমোহন বললেন,'ওবেলা টোবেলা নয়। পড়তে বসেছ, পড়ে যাও। ক'দিন তো বই টই খুলে দ্যাখো নি। আজ যদিও বা বসলে, বাঁদরামি শুরু করে দিয়েছ। বেলা দশটা পর্যন্ত কোনোদিকে আর তাকাবে না, মন দিয়ে শুধু পড়া। ছুটির পরেই পরীক্ষা, খেয়াল যেন থাকে।'

বিনু এবার লাফালাফি শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে নাকি সুরের একটানা ঘ্যানঘ্যানানি চলল, 'আমি যাব, আমি যাব—'

অবনীমোহন ধমক দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'লম্ফ-ঝম্ফ আর কান্নাকাটি থামা বাপু—'

'বল, নিয়ে যাবে—'

'যাব। তবে এক শর্তে—'

দাদু যখন ভরসা দিয়েছেন তখন যাওয়া নিশ্চয়ই হবে। তাঁর ওপর আর অবনীমোহন কথা বললেন না কিন্তু শর্তটা কী, বোঝা যাচ্ছে না। লাফ-ঝাঁফ থামিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

হেমনাথ বললেন, 'শর্তটা হল, এখন যদি যাও দুপুর-সন্ধে দু'বেলাই পড়তে হবে। তখন কিন্তু গোলমাল করতে পারবে না।'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, মোটে গোলমাল করব না। দুপুরবেলা সন্ধেবেলা যতক্ষণ পড়তে বলবে ততক্ষণ পড়ব।'

'এখন তো খুব ভাল ভাল কথা বেরুচ্ছে। ফিরে এসে দেখা যাবে,খন।' হেমনাথ হাসলেন, 'যা, জামা প্যান্ট বদলে আয়।'

বিনু ভেতর-বাড়ির দিকে ছুটতে যাচ্ছিল, সেই সময় তীক্ষ্ণ চাপা গলায় ঝিনুক চেঁচিয়ে উঠল, 'না না—'

হেমনাথ বললেন, 'তোর আবার কী হল,রে?'

ঝিনুক আগের সুরেই বলল, 'বিনুদা যাবে না—'

একে তো অনেক কষ্টে বহু কান্নাকাটির পর বেড়াতে যাবার সনদ মিলেছে আর ঝিনুক কিনা তার পায়ে বেড়ি পরাতে চাইছে! মাথার ঠিক থাকল না বিনুর। জিভ ভেংচে চেঁচিয়ে উঠল, 'যাবে না! ইল্লি রে! যাব তো, নিশ্চয়ই যাব।' বলেই আর দাঁড়াল না, লম্বা পা ফেলে চোখের পলকে ভেতর-বাড়িতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চোখ কুঁচকে বিনুর যাওয়া দেখল ঝিনুক। তারপর আস্তে আস্তে হেমনাথের পাশ থেকে উঠে ভেতরে চলে গেল।

ঝিনুক যখন বিনুকে খুঁজে বার করল তখন তার প্যান্ট-জামা পরা শেষ, নটি বয় শু পায়ে দিয়ে ফিতে বাঁধছে। সোজা গিয়ে ঝিনুক তার মুখোমুখি দাঁড়াল এবং কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় হেলিয়ে দেখতে লাগল।

ফিতে বাঁধতে বাঁধতে একবার ঝিনুককে দেখে নিল বিনু। তারপর খুব বিরক্তভাবে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল।

ঝিনুক ডাকল, 'অ্যাই—'

না তাকিয়েই বিনু সাড়া দিল, 'কী?'

'তুমি তা হলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কথা শুনবে না?'

'না।'

'বেশ, আমি মাসিমাকে সেই কথাটা বলে দিচ্ছি।'

বিনু শুধলো, 'কোন কথাটা?'

খুব আলতো করে ঝিনুক বলল, 'সেই যে জলে পড়ে গিয়েছিলে—'

বিনু ভয় পেয়ে গেল। অনুনয়ের সুরে বলে, 'না না, বোলো না।'

'আমার কথা না শুনলে বলবই।'

বিনু এবার বোঝাতে চেষ্টা করল। সে গেলে ঝিনুকের তো কোনো ক্ষতি নেই। ঝিনুক কিন্তু বুঝল না। বলল, 'তুমি গিয়ে ঝুমার সঙ্গে দেখা করবে। ওর এয়ার গান আছে, লুডো আছে, ক্যারাম আছে, আমি সব জানি।'

বিনু অবাক। হতভম্বের মতন বলল, 'ঝুমার সঙ্গে খেললে তোমার কী?'

'ন্‌না—'

'কী?'

'তুমি ওর সঙ্গে খেলতে পারবে না।'

পুবের ঘরের বারান্দা থেকে হেমনাথের গলা ভেসে এল, 'কী হল রে দাদাভাই, জামা-প্যান্ট পরতে কতক্ষণ লাগছে? শিগ্‌গির আয়—'

ঝিনুক বলল, 'বলে দাও তুমি যাবে না।'

বিনু বিদ্রোহ করতে যাচ্ছিল। তার চোখমুখ লক্ষ করে ঝিনুক দ্রুত বলে উঠল, 'না বললে সেই কথাটা কিন্তু—'

বিনু ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। মনে মনে বানিয়ে গলা তুলে বলল, 'আমি যাব না দাদু, বড় পেট ব্যথা করছে।' বলে ধীরে ধীরে একে একে জুতো জামা খুলে ফেলতে লাগল। ভাবল, ঝিনুক নামে এই মেয়েটা বয়সে ছোট হলে কী হবে, অত্যন্ত সাংঘাতিক। একটা আমোঘ অস্ত্র পেয়ে গেছে সে। সেটা দেখিয়ে চিরকাল হয়তো ঝিনুক নিজের ইচ্ছেমতন বিনুকে চালিয়ে যাবে।

একটু নীরবতা। তারপর বিনু ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'যেতে তো দিলে না, এখন আমি কী করব?'

খুব নিরীহের মতন মুখ করে ঝিনুক বলল, 'পড়বে। পড়া হলে আমার সঙ্গে খেলা করবে।'

রাগে বিনুর গা জ্বলতে লাগল। পারলে ঝিনুকের ঝুঁটি ছিঁড়ে দিত। তার বদলে চেঁচিয়ে মেচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল, 'বয়ে গেছে এখন পড়তে, বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে খেলতে।'

দুপুরবেলা ঝিনুকের বই আর একখানা বন্দুক নিয়ে ফিরে এলেন হেমনাথরা। তারপর বাকি দিনটা বন্দুকের পরিচর্যা করে কাটালেন অবনীমোহন, সেই সঙ্গে সমানে শিকারের গল্প চলল। জিম করবেট থেকে শুরু করে পৃথিবীর বাঘা বাঘা শিকারীদের চমকপ্রদ কীর্তিকাহিনী বলে গেলেন তিনি। শুনতে শুনতে মনে হল, পশুপাখির প্রাণ নেওয়া ছাড়া জগতে অন্য কিছু জানা নেই অবনীমোহনের। সারা জীবন এই একটা কাজই তিনি করেছেন। মোট কথা, যখন যে স্রোতটি আসে তাই অবনীমোহনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে আরো চার-পাঁচ দিন রঙিন প্রজাপতি হয়ে চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গেল।

এর ভেতর প্রায় রোজই বিনুরা বেড়াতে বেরিয়েছে। হেমনাথদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টিমারঘাটা পার হয়ে স্কুল-সেটেলমেন্ট অফিস-থানা-আদালত পেছনে ফেলে নদীপারের সুদূর ঝাউবন পর্যন্ত একটানা পাড়ি। ফলে রাজদিয়াকে খুব ভাল করেই চেনা হয়ে গেছে। কতটুকুই বা শহর! মেরুদণ্ডের মতন একটা বড় রাস্তার দু'ধারে সরু সরু শাখা-প্রশাখায় যতখানি সম্ভব, তার চাইতেও অনেক কমই বেড়েছে রাজদিয়া। এ শহর বড় কুণ্ঠিত, তার স্বভাব অসীম সঙ্কোচ দিয়ে ঘেরা। সবাই যখন বাড়ে, প্রগলভ হয়, তখন ভীরুতার ভেতর সে মূক হয়ে থাকতে ভালবাসে।

শুধু রাজদিয়ার ভূগোলটাকে ভাল করে জেনে নেওয়া নয়, এই চার-পাঁচ দিন আরো একটা ব্যাপার ঘটেছে। দল বেঁধে সবাই একদিন নিশিন্দার চরে গিয়ে পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এসেছে বিনুরা।

নদীর মাঝমধ্যিখানে সুবিশাল ভূখণ্ড জুড়ে শুধু শ্যামল বনানী। এখানে মানুষের বসতি এখনও গড়ে ওঠে নি। মানুষ আসার আগেই—পৃথিবীর আদি সন্তান উদ্ভিদেরা এসে গেছে। হেমনাথ জানিয়েছেন, এখানকার মাটি ফসল ফলানোর যোগ্য হয়ে উঠলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ হানা দেবে।

নিশিন্দার চরের ঝোপঝাড় বনভূমি জুড়ে শুধু পাখি। হরিয়াল, ঘুঘু, ডাহুক, দোয়েল, পাতিবক, মোহনচূড়া—চেনা-অচেনা কত যে পাখি তার হিসেব নেই।

শিকারী বলতে বিনুদের দলে মোটে দু'জন—অবনীমোহন আর আনন্দ। অবনীমোহন তবু দু'চারটে হরিয়াল-টরিয়াল মেরেছেন, আনন্দ কিন্তু একটা গুলিও নিশানায় লাগাতে পারে নি। এই নিয়ে সবাই, বিশেষ করে সুধা আর হেমনাথ আনন্দর পেছনে লেগেছিল।

ঠোঁট টিপে বিদ্রূপের গলায় সুধা বলেছে, 'কি মশাই, আপনি না বাঘ মেরেছেন, গণ্ডার মেরেছেন, হেন মেরেছেন, তেন মেরেছেন—আজ যে একটা পাখিও মারতে পারলে না!'

হেমনাথ বলেছেন, 'ও কি করবে বল দিদি? পাখিগুলো যা বদমাইস, ওর গুলির সামনে বুক পেতে দিচ্ছে না।'

মুখ লাল হয়ে উঠেছে আনন্দর। বিব্রতভাবে সে জানিয়েছে, কিছুদিন ধরে তার চোখটা ভাল যাচ্ছে না, সব ঝাপসা দেখছে, কাজেই নিশানা ঠিক করতে পারে নি। তুচ্ছ পাখি মেরে কি হবে, সত্যিকারের

বাঘ মেরে সে দেখিয়ে দেবে।

সুধা বলেছে, 'এখানে বাঘ কোথায় পাবেন? চারদিকে জল, আপনার হাতে মরবার জন্য জল সাঁতরে আসতে তাদের বয়ে গেছে।'

হেমনাথ সকৌতুকে বলছেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, একটা বাঘটাঘ যোগাড় করতে পারি কিনা দেখি। বেচারা অত করে বললে মরবে—'

সবাই হো হো করে হেসে উঠেছে। আনন্দ আর মুখ তুলতে পারে নি।

নিশিন্দার চরে আরো একটা ব্যাপার হয়েছে। সেটা এই রকম। অবনীমোহন-আনন্দ হেমনাথ-সুধারা যখন শিকার-টিকার আর ঠাট্টায় ব্যস্ত সেই সময় ঝুমা বিনুকে নিয়ে বালুকাময় প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি হুটোপুটি করে বেড়িয়েছে। ছোটাছুটির ফাঁকে বিনু লক্ষ করেছে, যেখানে যেখানে তারা গেছে ঝিনুক ঠিক ছায়ার মতন তাদের পিছু নিয়েছে। কিছুই বলে নি ঝিনুক, শুধু চোখ কুঁচকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। ফলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছে বিনু।

আজকাল আড়ালে বিনুর সঙ্গে কথা বলে ঝিনুক, কিন্তু ঝুমা কাছে থাকলে সে একবারে বোবা।

পাখিশিকার, রাজদিয়াকে ভাল করে চেনা—এসব তো হয়েছেই এই ক'দিন, সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটি বিনুর জীবনে ঘটেছে তা হল যুগলের কাছে সাঁতার শেখা। ডুব সাঁতার, চিত সাঁতার, বুক সাঁতার, —তিন রকম সাঁতার শিখে ফেলেছে বিনু।

আরো দিনকয়েক পর এক সকালবেলায় হঠাৎ হিরণ এসে হাজির। বিনুরা পুবের ঘরের বারান্দায় পড়তে বসেছিল। অবনীমোহন নেই। আজকাল সকাল হলে আর বাড়ি থাকেন না তিনি, বেরিয়ে পড়েন। কোনোদিন একা একাই রাজদিয়ার নিরালা পথে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে হাঁটেন, কোনোদিন বা যুগলকে নিয়ে নৌকায় করে জলমগ্ন প্রান্তরে পাড়ি জমান। পূর্ববাংলা তার রমণীয় আকাশবাতাস, ধানবন, আশ্বিনের মেঘ, স্নিগ্ধ দৃশ্যপট দিয়ে তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে।

হেমনাথ কোথাও বেরুতে যাচ্ছিলেন, হিরণকে দেখে একেবারে চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'আসুন আসুন, হিজ ম্যাজেস্টির আসতে আজ্ঞা হোক।' বলেই স্নেহলতাকে ডাকতে লাগলেন, 'ওগো, দেখে যাও কে এসেছে।'

ভেতর-বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন স্নেহলতা। তাঁর পিছু পিছু শিবানী আর সুরমা।

হিরণকে দেখে স্নেহলতা ভারি খুশি, কিছুটা অবাকও। এই মুহূর্তে তাকে প্রত্যাশা করেন নি বোধহয়। বললেন, 'বলা নেই কওয়া নেই, কোথায় গিয়েছিলি রে হনুমান?'

হিরণ হাসিমুখে বলল, 'ঢাকা—'

'সে তো জানি। যুগলকে সেদিন তোদের বাড়ি পাঠানো হয়েছিল, সে এসে বলল। ঢাকা যাবার কী দরকারটা ছিল শুনি?'

'বই কিনতে গিয়েছিলাম।'

'বই কিনতে ক'দিন লাগে? সকালবেলা এখান থেকে বেরুলে সন্ধেবেলা ফিরে আসা যায়। তুই এলি ক'দিন পর?' স্নেহলতা চোখ পাকালেন।

হাত জোড় করে কাঁচুমাচু মুখে হিরণ বলল, 'প্রসন্ন হও দেবী, প্রসন্ন হও। অত রাগারাগি করলে আমি কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে যাব।'

তার ভাবভঙ্গি দেখে সবাই হেসে ফেলল।

স্নেহলতাও হাসলেন, 'তোকে নিয়ে আর পারি না। আমি গুনে রেখেছি, আট দিন তুই ঢাকায় গিয়েছিলি। কেন?'

'বললাম তো বই কিনতে গিয়েছিলাম। তারপর পড়লাম বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায়, তারা আসতে দিতে

চায় না।'

হেমনাথ এই সময় বললেন, 'উনি বন্ধু বান্ধব নিয়ে ফূর্তি করছেন। আমরা এদিকে ভেবে মরছি। হ্যাঁ রে বাঁদর, ঢাকা থেকে কী বই কিনে আনলি?'

'এই যে—' বগলের তলা থেকে দু'খানা বই বার করল হিরণ। বলল, 'একটা শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র নাট্যরূপ। আরেকটা রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা খণ্ড, এতে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটা আছে।'

'কী হবে এ সব দিয়ে?'

'বা রে, পুজোর সময় নাটক-টাটক হবে না?' হিরণ বলতে লাগল, 'অন্য বার শুধু নাটক হয়, এবার এমন একটা কিছু করব যা রাজদিয়াতে কোনোদিন হয়নি।'

হেমনাথ চোখ কুঁচকে শুধোলেন, 'সে বস্তুটা কী?'

'ড্যান্স ড্রামা—'

'সেটা কিরকম?'

রহস্যময় হেসে হিরণ বলল, 'যথাসময়ে দেখতে পাবেন।'

হেমনাথও হাসলেন, 'বেশ, তাই হবে। আমি এখন চলি, তোরা কথাবার্তা বল। এতদিন পর এলি, একেবারে খাওয়া-দাওয়া করেই যাস।'

'খাওয়া-দাওয়ার কথা বলতে হবে না। সেটি না করে আমি নড়ছি না। আমি এলাম আর আপনি চললেন কোথায়?'

'লালমোহনের খোঁজে।'

হিরণকে চিন্তিত দেখাল, 'খোঁজে মানে?'

'আর বলিস না, ক'দিন আগে সুজনগঞ্জের হাট থেকে রুগী দেখতে চরবেহুলা গিয়েছিল, বলেছিল পরের দিন ফিরবে। সাত-আট দিন পার হতে চলল, এখনও পাত্তা নেই।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'রোজ একবার করে খবর নিচ্ছি। আজও যদি না এসে থাকে কাউকে চরবেহুলা পাঠাতে হবে।'

'হ্যাঁ, পাঠানো তো দরকারই। দেখুন গিয়ে লালমোহনদাদু এসেছেন কিনা—'

হেমনাথ চলে গেলেন। স্নেহলতাও হিরণকে বসতে বলে ভেতর-বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। এখন সুধা, সুনীতি, ঝিনুক, সুরমা এবং হিরণ ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।

বারান্দার একধারে বসতে বসতে হিরণ বলল, 'অন্য অন্য বার আমরা ঐতিহাসিক নাটক করি। এবার সুধাদেবী সুনীতিদেবী এসেছেন, তাই বেছে বেছে সামাজিক নাটক আর নৃত্যনাট্য কিনে এনেছি। দেখবেন চারদিকে কেমন সাড়া পড়ে যায়। আমি তো ঢাকায় বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন পর্যন্ত করে এসেছি। সপ্তমী আর অষ্টমীর দিন ওরা নাটক দেখতে আসবে। একবার দেখলে বাছাধনদের মাথাটি ঘুরে যাবে।'

বিনুদের পড়াশোনা থেমে গিয়েছিল। সুনীতি আঁতকে ওঠার মতন করে বলল, 'আবার নেমতন্নও করে এসেছেন!'

উৎসাহের সুরে হিরণ বলল, 'বা রে, করব না! শুধু ঢাকায় নাকি, নারায়ণগঞ্জেও করে এসেছি। কাল পরশু মুন্সিগঞ্জ-মীরকাদিম-ব্রজযোগিনী, এই সব জায়গাতেও খবর পাঠাব—'

'আপনার বুঝি ধারণা, আমরা দারুণ নাচতে, গাইতে আর অভিনয় করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাদের নাচও দেখেন নি, গানও শোনেন নি, অভিনয়ও দেখেন নি। তবু কী করে যে এমন ধারণা হল! শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারি হবে।'

নিরুদ্বেগ গলায় হিরণ বলল, 'শেষ পর্যন্ত কী হবে, আমি জানি। সে জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। শুধু আমি যা বলি সেইটুকু করে যাবেন।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'কদিন ছিলাম না, এর ভেতর কারা কারা কলকাতা থেকে রাজদিয়ায় এসেছে জানি না। আজই খোঁজ নিয়ে অ্যাক্টর অ্যাকট্রেসদের একটা লিস্ট করে ফেলতে হবে। পুজোর আর দেরি নেই। কাল থেকে রিহার্সালে বসতে

হবে।'

গান-বাজনা নাটক-টাটকে বিশেষ আগ্রহ ছিল না সুরমার। একটু সুযোগ পেতেই তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাদের বাড়িটা কোন দিকে হিরণ ?'

হিরণ সুরমার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আজ্ঞে, স্টিমারঘাটার কাছাকাছি—'

'রাজদিয়া আসার পর অনেকেই তাদের বাড়ি যেতে বলে গেছে, যাওয়া হয় নি। ভেবে রেখেছি আগে তোমাদের বাড়ি যাব, তারপর অন্যদের—' হিরণকে ঘিরে সুরমার মনে রঙিন বাসনার আভা লেগেছে।

বিব্রত মুখে হিরণ বলল, 'আমাদের বাড়ি যাবেন ?'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে আহত হলেন সুরমা। বললেন, 'তোমার আপত্তি থাকলে অবশ্য যাব না।'

হিরণ চকিত হয়ে দু'হাত নাড়তে লাগল, 'না না, আপত্তি নয়। তবে—'

'তবে কী ?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু গলায় হিরণ বলল, 'বুড়ো অথর্ব ঠাকুরদা আর এক বিধবা জেঠাইমা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই।'

সুরমা চমকে উঠলেন, 'কেন, তোমার বাবা-মা, ভাই-বোন ?'

'আমার জন্মের পরই বাবা-মা মারা গেছেন। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান।' হিরণ বলতে লাগল, 'ঠাকুরদাও আজ দশ বার বছর পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। জেঠাইমার মারাত্মক রকমের শুচিবাই, কেউ বাড়ি ঢুকলে গোবর জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেয়। সেই জন্যে কাউকে নিয়ে যেতে চাই না।'

সহানুভূতিতে সুরমার মুখ আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। কোমল সুরে তিনি বললেন, 'কিছু মনে কোরো না বাবা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—'

'বেশ তো করুন না।'

'তুমি ঢাকায় থেকে পড়, ঠাকুরদার ঐ অবস্থা, জমিজমা বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করে কে ?'

হিরণ হাসল, কিছু বলল না।

সুরমা শুধোলেন, 'হাসলে যে ?'

'ছোট একখানা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই আমাদের।'

'তা হলে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন সুরমা।

'আপনি কী বলতে চান, বুঝেছি। জমিজমা নেই, বিষয়-সম্পত্তি নেই, তবু আমাদের সংসার কেমন করে চলে, এই তো ?'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন সুরমা, অর্থাৎ তাই।

গভীর গলায় হিরণ বলল, 'হেমদাদু চালান। আমাদের সংসার, আমার পড়াশোনা—সব তাঁর দয়ায় চলছে। খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, এই রাজদিয়ার কত মানুষকে হেমদাদু বাঁচিয়ে রেখেছেন। উনি না থাকলে আমরা মরে যেতাম। অবশ্য—'

সুধা-সুনীতি আর বিনু হেমনাথের কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তারা কিছু বলছিল না, এবারও বলল না। সুরমা বললেন, 'অবশ্য কী ?'

সামান্য হেসে হিরণ বলল, 'আমার ব্যাপারে হেমদাদুর একটু স্বার্থ আছে।'

'কিরকম ?'

'এম. এ-টা যদি পাশ করতে পারি রাজদিয়া কলেজে আমাকে পড়াতে হবে, অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'যদি ভাল চাকরি পাও ?'

'তবুও না। হেমুদাদু বলেন, সবাই যদি টাকা পয়সার লোভে দেশ ছেড়ে চলে যায়, দেশ চলবে কেমন করে?'

সুরমা বললেন, 'সে তো ঠিকই—'

প্রসঙ্গটা আরো কিছুক্ষণ হয়তো চলত। এই সময় অবনীমোহন ফিরে এলেন। হিরণকে দেখে খুব আনন্দিত তিনি। বললেন, 'ঢাকা থেকে কবে এলে?'

হিরণ বলল, 'আজই। সকালবেলা ফিরেছি, ফিরেই আপনাদের বাড়ি এসেছি।'

'বেশ করেছ। ঢাকা গিয়েছিলে কেন?'

কেন গিয়েছিল, হিরণ বলল। নাটকের কথা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন অবনীমোহন। হইচই বাধিয়ে দিলেন, 'অভিনয় দেখেছি বটে শিশির ভাদুড়ি মশায়ের।' তারপর একে একে গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফি, দানীবাবু, কর্ণার্জুন, মিশরকুমারী, নীলদর্পণ, আলমগীর—উচ্ছ্বসিত সুরে কত দিগ্বিজয়ী অভিনেতা আর নাটকের নাম যে করে গেলেন, হিসেব নেই।

এই অবনীমোহনই ক'দিন আগে শিকার ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। পশু-পাখিদের প্রাণহনন ছাড়া অন্য কোনো স্বপ্ন দেখতেন না। এখন সে সবের বিন্দুমাত্রও মনে নেই তাঁর। এখন তাঁর চোখ জুড়ে শুধু রঙ্গমঞ্চের মোহভরা জগৎ।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে আর বসল না হিরণ, চলে গেল। ফিরে এল রাত্তিরে। জানিয়ে গেল নাটক এবং নৃত্যনাট্যের জন্য অভিনেতা অভিনেত্রী ঠিক হয়ে গেছে। সুধা একাই 'শ্যামা'তে শ্যামা, 'দত্তা'র নাট্যরূপ 'বিজয়া'তে বিজয়ার ভূমিকা পেয়েছে। দুটো বইয়েরই নামভূমিকা তার। অবনীমোহন পেয়েছেন 'বিজয়া'তে দয়ালের ভূমিকা। সুনীতি করবে 'বিজয়া'তে নলিনী, 'শ্যামা'য় তার কোনো ভূমিকা নেই। অবশ্য তাকে পশ্চাৎপটে বসে 'শ্যামা'র গানগুলো গাইতে হবে।

সব শুনে সুধার কানে মুখ গুঁজে দিল সুনীতি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'পক্ষপাতিত্বটা দেখলি? সব মেইন মেইন রোল তোর জন্যে, আমার বেলা ঘুঁটেকুড়ুনির পার্ট।'

সুধা বলল, 'হিংসে হচ্ছে? বলিস তো, তোকে শ্যামা আর বিজয়ার রোল দুটো দিতে বলি।'

'অত কাঙাল নই আমি।' বলেই গলাটা আরো অতলে নামিয়ে দিল সুনীতি, 'দেখিস ও শ্যামাতে বজ্রসেন, বিজয়ায় নরেনের রোল নেবে। দু'জনে না—'

'কী?'

'জমিয়ে দিবি।'

সুধা বলল, 'হিংসে করিস নি দিদিভাই, অনন্দবাবুকে বলব দুটো বাঘ মেরে যেন বলে একটা তুই মেরেছিস। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। জমবে ভাল।'

সুনীতি হাসতে হাসতে বলল, 'থাম বাঁদর মেয়ে—'

দেখতে দেখতে আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। রাজদিয়ার প্রবাসী সন্তানেরা প্রায় সবাই পুজোর ছুটিতে দেশে ফিরেছে। শহর এখন জমজমাট। কুমোরপাড়ার প্রতিমাগুলোতে এক-মেটে দু-মেটে তে-মেটের পর অঙ্গরাজ শুরু হয়েছে। এদিকে হিরণদের নাটকের রিহর্সাল চলেছে পুরোদমে।

মহালয়ার যখন দিনতিনেক বাকি, সেই সময়ে দুটো চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল।

আগে প্রথম ঘটনাটির কথা।

সেদিন অধর সাহা যা বলেছিল শেষ পর্যন্ত তা করে ছাড়ল। মহালয়ার দিনকয়েক আগে স্বয়ং

সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের শ্রাদ্ধ চুকিয়ে ফেলল। যেমন তেমন করে নয়, রীতিমত ধুমধাম করে দানসাগর শ্রাদ্ধ। এই কাজটা আর ভরসা করে ছেলেদের জন্য ফেলে রাখল না সে।

রাজদিয়ার হেন মানুষ নেই যাকে নেমন্তন্ন করে নি অধর সাহা। শুধু রাজদিয়া কেন, আশেপাশের আট-দশটা গ্রামগঞ্জের তাবৎ বাসিন্দাকে নেমন্তন্ন করে এসেছিল সে।

একজন জীবন্ত মানুষ তিন-তিনটে ছেলে বেঁচে থাকতে এই মর্তলোকেই নিজের পারলৌকিক কাজ সেরে যাচ্ছে, এমন বিস্ময়কর ঘটনা রাজদিয়াতে আর কখনও ঘটে নি। নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত, চেনা-অচেনা, এই শ্রাদ্ধের খবর যার কানে গেছে সে-ই অধর সাহার বাড়ি ছুটেছে।

বিনুরাও হেমনাথের সঙ্গে গিয়ে শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো মজার।

মহালয়ার ঠিক আগের দিন দুপুরবেলা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। স্নেহলতা এবং শিবানী ছিলেন ভেতরে। রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বাকিটুকু দু'জনে ক্ষিপ্র হাতে সেরে ফেলছিলেন।

বিনু জানতে এসেছিল, কখন খেতে দেওয়া হবে। এর আগে ঘণ্টাদুয়েকের মতন পুকুরে পড়ে ছিল, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চারদিক উথল-পাথল করে তুলেছে। চোখদুটো এখন টকটকে লাল। এত পরিশ্রমের পর খিদে পেয়ে গিয়েছিল খুব।

বিনু কিছু বলবার আগেই বাগানের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে যুগল এসে হাজির। ভেতর-বাড়ির উঠোনে এসে চাপা উত্তেজিত গলায় সে ডাকতে লাগল, 'ঠাউরমা—ঠাউরমা—'

বিনু চমকে ঘুরে দাঁড়াল। শিবানী এবং স্নেহলতাও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

যুগলের পরনে একটা নেংটি মতন, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। সারা গায়ে পচা ভিজে পাটের ফেঁসো লেগে আছে, দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। আশ্বিনের শুরুতে রাজদিয়ায় এসে বিনু দেখেছিল, পচা পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছে যুগল। এখনও তা শেষ হয় নি।

চোখের পলকে কাছে এসে পড়ল যুগল। আগের সুরেই বলল, 'সব্বনাশ হইয়া গেছে ঠাউরমা, সব্বনাশ হইয়া গেছে—'

স্নেহলতা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'অরা আইসা গেছে। অখন আমি কী করি?'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'কারা এসেছে রে?'

যুগল মুখ নামিয়ে ফিসফিস করল, 'টুনি বইনের জামাই আর—'

'আর কে?'

'গোপাল দাস।'

ভুরু কুঁচকে স্নেহলতা একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, 'কোন গোপাল দাস রে?'

নতমুখেই যুগল বলল, 'উই যে ভাটির দ্যাশের। গেরামের নাম মোহনগুঞ্জ—'

'বুঝেছি—' চোখের তারায় কৌতুক ঝিকমিকিয়ে উঠল স্নেহলতার, 'পাখির বাপ তো?'

'হ।' আস্তে করে ঘাড় কাত করল যুগল।

বোঝা গেল, পাখির ব্যাপারটা জানেন স্নেহলতা। বললেন, 'গোপাল দাস বলিস যে? শ্বাশুরমশাই বলতে বুঝি লজ্জা লাগে।'

যুগল পারলে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। সে বলল, 'অখনও তো হয় নাই।'

'কী হয় নি।'

'হউর।'

'ও—' কণ্ঠস্বরে দীর্ঘ টান দিয়ে স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'পাখির সঙ্গে বিয়ে নাহলে বুঝি শ্বশুর বলবি না?'

'হেই কী কওন যায়!' বলতে বলতে হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে যেতে যুগলের মুখ অত্যন্ত

করুণ আর বিপন্ন হয়ে উঠল, 'অখন আমি কী করি ঠাউরমা?'

'কেন, তোর আবার কী হল?'

'ওনাগো কাছে কেমনে গিয়া খাড়ামু?'

'ছোঁড়া তো লজ্জায় গেলি। পুরুষমানুষ না তুই!' বলেই হাসতে শুরু করলেন স্নেহলতা। ডাকতে লাগলেন, 'ওগো এদিকে একটু শুনে যাও—'

হেমনাথ-অমনীমোহন উত্তরের ঘরে ছিলেন। সুধা-সুনীতিরা কোথায় কে জানে। উত্তরের ঘর থেকে হেমনাথ সাড়া দিলেন, 'যাই—'

যুগল চকিত হল, 'ঠাউরদা আহে, আমি পলাই—'

'পালাবি কেন, দাঁড়া—'

যুগল দাঁড়াল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির পেছন দিকে ছুট লাগাল। স্নেহলতা এবং শিবানী হাসতে লাগলেন।

বিনু খিদের কথা ভুলে গেছে। জলের মাঝমধ্যিখানে দ্বীপের মতন টুনিদের বাড়িটা তার চোখের সামনে ভাসছিল। বার বার পাখির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। দরজার ফ্রেমে ছবির মতন পাখির দাঁড়িয়ে থাকা, স্বপ্নালোকের জলপরীর মতন আশ্বিনের টলটলে শান্ত জলে সাঁতার কেটে নৌকোয় আসা, যুগলের গান—এসব যেন দিনকয়েক আগের ব্যাপার না, এখন এই মুহূর্তে ঘটে চলেছে।

উত্তরের ঘর থেকে হেমনাথ এসে পড়লেন। বললেন, 'ডাকছ কেন?'

শিবানী এবং স্নেহলতা সমানে হাসছিলেন, হাসিটা এমন প্রবল উচ্ছ্বাসময় যে উত্তর দিতে পারলেন না।

চোখ কুঁচকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন হেমনাথ। তারপর বললেন, 'এত হাসাহাসি কেন?'

এতক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছেন স্নেহলতা। খুব মজার গলায় বললেন, 'আমাদের যুগল তো মহা বিপদে পড়েছে।'

'কিসের বিপদ।'

বিপদটা কী, স্নেহলতা বুঝিয়ে দিলেন।

সব শুনে হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন,'গোপাল দাস আর যুগলের বোনাই কোথায়।'

'তা তো জানি না। তাদের কোথায় যেন দেখে ছুটে এসেছিল যুগল।' স্নেহলতা বললেন।

হেমনাথ বিরক্ত হলেন, 'লোক দুটো এল। তাদের বসানো হল কি হল না, সেদিকে হুঁশ নেই। তোমরা ঠাট্টা-তামাশা হাসাহাসি নিয়েই আছ।' বলে আর দাঁড়ালেন না, বড় বড় পা ফেলে পুকুরঘাটের দিকে চলে গেলেন। খুব সম্ভব গোপাল দাসদের অভ্যর্থনা করে আনতে।

বিনু মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। সেও আর দাঁড়িয়ে থাকল না। খানিক আগে যুগল যেদিকে গেছে সেদিকে ছুট লাগাল।

যুগল গিয়েছিল বাড়ির পেছন দিকে। জায়গাটা চোখ-উদানে আর সোনালের জঙ্গলে ঝুপসি হয়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে পিঠক্ষীরা এবং লটকা ফলের গাছ। তাদের মাথায় গুচ্ছগুচ্ছ বনজ ফুল ফুটে আছে, ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি আর ফড়িং ফুলের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে।

জঙ্গলের পর মস্ত খাল।

বাড়ির পেছন দিকে এসে এদিকে সেদিকে তাকাতেই বিনু দেখতে পেল, খালে নেমে সমানে ডুবের পর ডুব দিয়ে যাচ্ছে যুগল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে খালের পারে এসে পড়ল বিনু। যুগলকে না ডেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

এক নিশ্বাসে প্রায় শ'খানেক ডুব দিয়ে যুগল থামল। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি খাল থেকে উঠে এল। পাড়ে আসতেই সে অবাক, 'ছুটোবাবু যে, কখন আইছেন!'

'অনেকক্ষণ।'

'আমি ট্যারই পাই নাই।'

বিনু হাসল, 'টের পাবে কী করে? যা ডুব দিচ্ছিলে!'

'হ। এক উয়াসে বিশ পঞ্চাশটা ডুব না দিলে ছান কইরা আরাম পাই না।' যুগল হাসল। তারপর বলল, 'আপনে এট্টু খাড়ন ছুটোবাবু, আমি একখান বস্তু লইয়া আসি।'

'কী?'

'আনলেই দেখতে পাইবেন।'

যুগল পলকে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পর যখন সে ফিরে এল, তার হাতে একটা গন্ধসাবান।

সাবানটা দেখে ফেলেছিল বিনু। বলল, 'চান তো একবার করলে, আবার সাবান মাখবে?'

যুগল বিনুর দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতেই দ্রুত মুখ নামিয়ে সলজ্জ অস্ফুট গলায় বলল, 'ছান করার সময় সাবানের কথা মনে আছিল না, মনে পড়তেই লইয়া আইলাম।'

অন্য দিনও যুগলকে চান করতে দেখেছে বিনু। কিন্তু সে চানের সঙ্গে সাবান এবং তেলের সম্পর্ক নেই। কোনো রকমে গামছাটি কোমরে জড়িয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঘণ্টা দেড় দুই খাল বিল তোলপাড় করে যখন ডাঙায় ওঠে তখন চোখ দুটো রক্তজবা। এই তো তার চানের নমুনা।

হঠাৎ কেন যে আজ গন্ধসাবান মাখার মতন এতখানি সৌখিন হয়ে উঠল যুগল, সেইটাই বোঝা যাচ্ছে না। বিনু সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল।

বিনুর মনোভাব বুঝতে পেরেছিল যুগল। তখনকার মতন লাজুক সুরে বলল, 'আইজের দিন গোন্ধসাবান মাখুম না তো কবে আর মাখুম! ছুটোবাবু বুঝমান মানুষ হইয়া বোঝেন না ক্যান? আইজ—' বলতে বলতে চুপ করে গেল।

বিনু বলল, 'আজ কী?'

'আমার হউরে নি আইছে।'

এতক্ষণে যুগলের সৌখিনতার কারণটা টের পাওয়া গেল। বিপুল উৎসাহে বিনু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই তো সাবান মাখার দিন।'

অতএব আরো অনেকটা সময় লাগিয়ে গোটা সাবানের আধখানা গায়ে ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে দিল যুগল। তারপর পঞ্চাশ-ষাটটা ডুব দিয়ে পাড়ে উঠল। ভাল করে গা-মাথা মুছে বলল, 'চলেন ছুটোবাবু, আমার ঘরের চলেন।'

যুগল থাকে এ বাড়ির দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে। দু'জনে সোজা সেখানে চলে এল।

এ ঘরে আরো অনেক বার এসেছে বিনু। যুগলের সম্পত্তি বলতে এখানে যা আছে তা হল একটা তক্তপোষ, গোলাপফুল-আঁকা একটা টিনের সুটকেস, একটা হাত-আয়না, কাঠের চিরুনি, খানকতক জামাকাপড়।

টিনের বাক্স থেকে সব চাইতে ফর্সা জামা আর ধুতি বার করল যুগল। বলল, 'এইগুলাই পরি ছুটোবাবু?'

বিনু সায় দিয়ে বললে, 'পরো।'

'আরেক খান কথা—'

'কী?'

'চত্তির মাসে নীলপূজার মেলায় এক শিশরি গোন্ধত্যাল কিনছিলাম। আইজ এট্টু মাখুম। আপনে কী ক'ন?'

'নিশ্চয়ই মাখবে।'

টিনের বাক্সের কোণ থেকে সন্তর্পণে একটা ফুলেল তেলের শিশি বার করে আনল যুগল। চৈত্র মাসে কিনেছে, এখনও তার ছিপি খোলা হয় নি। শিশিটা আস্তই আছে।

শিশি খুলে হাতে একটু তেল নিয়ে মাথায় মাখল যুগল। তারপর হাত-আয়নাটা মুখের সামনে ধরে পরিপাটি করে টেরি কেটে আঁচড়াতে লাগল।

আঁচড়ানো-টাঁচড়ানো হয়ে গেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখখানা কতবার যে আয়নায় দেখল যুগল তার ঠিক নেই। তারপর ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকামাত্র সাড়া দিল।

যুগল বলল, 'আপনেরা নি কইলকাতার মানুষ! কত কিছু দ্যাখেন, কত কিছু শোনেন, জানেন। আমরা গেরামে পইড়া থাকি, ফ্যাচন-ফুচন (ফ্যাশন-ট্যাশন) তো জানি না। দ্যাখেন দেহি, আমারে কেমুন লাগে। ঠিক য্যামন লাগে ত্যামন কইবেন। মন রাখা কথা কইবেন না।'

অন্য সময়ের তুলনায় যুগলকে সত্যিই ভাল দেখাচ্ছিল। হবু শ্বশুরমশায়ের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কম কান্ড তো করে নি। বিনু বলল, 'খুব ভাল দেখাচ্ছে।'

থুতনি নুয়ে পড়ল যুগলের, 'সত্য ক'ন?'

'সত্যি।'

'হউরে আমারে পছন্দ করব নি?'

'নিশ্চয়ই করবে।'

'নিচ্চিন্ত করলেন ছুটোবাবু, নিচ্চিন্ত করলেন।' নিজের সাজসজ্জা সম্বন্ধে আর কোনো দুর্ভাবনাই নেই যুগলের। সে বলতে লাগল, 'আপনেরা কইলকাতার মানুষ, আপনেগো চৌখে যহন ভাল লাগছে তহন উই গোপাল দাসের চৌখে কি আর লাগব না? করে তো হাইলা চাষার (হেলে চাষা) কাম, ফ্যাচনের হ্যায় কী বোঝে?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'সে তো ঠিকই।'

একটু ভেবে নিয়ে যুগল এবার বলল, 'আরেকখান কথা ছুটোবাবু—'

'কী?'

'এই যে গোন্ধসাবান গোন্ধত্যাল মাখছি, এই সগল কথা কারোরে কইবেন না কিন্তুক। ভগবানের কিরা (দিব্যি)।'

'বললে কী হবে?'

'সগলে আমার পিছে লাগব, আলঠাইব। আমারে এক্কেরে পাগল কইরা মারব।'

মনে মনে ভেবে নিল বিনু, কথাটা মিথ্যে নয়। ব্যাপারটা একবার সুধা বা সুনীতির কানে তুলে দিলে দেখতে হবে না, যুগলকে বাড়িছাড়া করে দেবে। তার চাইতেও বড় কথা, যে যুগল বিনুকে এত সম্মান দেয়, এত বিশ্বাস করে, যত্ন করে তাকে সাঁতার শিখিয়েছে, নৌকোয় চড়িয়ে দিগ্বিদিকে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছে, জল-বাংলার পাখি-পতঙ্গ-গাছপালা-সরীসৃপ চিনিয়েছে, তার গোপন খবর ঢাক বাজিয়ে অন্যকে জানানো উচিত নয়। এতে বিশ্বাঘাতকতা করা হয়।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি তো কাউকে বলব না। কিন্তু—'

দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল যুগল।

বিনু বলতে লাগল, 'ফুলেল তেল আর সাবানের গন্ধ ঢাকবে কী করে?'

যুগলকে চিন্তিত দেখাল, 'হেই কথা তো ভাবি নাই ছুটোবাবু—'

সমস্যাটার কোনো সমাধানই যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই সময় স্নেহলতার গলা শোনা গেল, 'বিনু কোথায় রে, বিনু? অ্যাই দাদাভাই, শিগ্‌গির খেতে আয়। ভাত বাড়া হয়ে গেছে।'

বিনু ছুটল। ভেতর- বাড়িতে এসে দেখল, রান্নাঘরে দাওয়ায় সারি সারি আসন পড়েছে। হেমনাথরা

খেতে বসে গেছেন। একধারে আরো দুটো পাত পড়েছে, সেখানে বসেছে দু'জন অচেনা মধ্যবয়সী লোক। দেখেই বোঝা যায় চাষী শ্রেণীর গ্রাম্য মানুষ। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। পরনে ক্ষারে-কাচা ধুতি এবং ফতুয়া। চুলে চিরুনি চালিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলো এমন দুর্বিনীত যে হেলানো যায় নি, আকাশের দিকে খাড়া হয়ে আছে। নিশ্চয়ই যুগলের বোনাই এবং ভাবী শ্বশুর গোপাল দাস। কে বোনাই আর কে শ্বশুর তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

বিনু লক্ষ করল, সুধা-সুনীতি লোকদু'টিকে আড়ে আড়ে দেখছে আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে। এমন কি সুরমা-স্নেহলতা-শিবানীরাও মুখ আড়াল করে হাসছে। হাসির কারণটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারল বিনু।

গোপাল দাসদের দিকে চোখ রেখে সুধা-সুনীতির পাশের খালি আসনটায় গিয়ে বসে পড়ল বিনু।

অবনীমোহন হেমনাথের পাশে বসেছিলেন। বললেন, 'কোথায় ছিলি রে? ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না।'

বিনু বলল, 'যুগলের ঘরে ছিলাম।'

অবনীমোহন কিছু বলবার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'যুগল কী করছে রে দাদাভাই?'

সাজসজ্জার কথা বলেই ফেলত বিনু, এই সময় যুগলের করুণ অনুরোধ মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'বসে আছে।'

'চান-টান করেছে?'

'হ্যাঁ।'

হেমনাথ স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, 'যুগলকেও না হয় আমাদের সঙ্গেই দিয়ে দাও। শ্বশুর-জামাই এক আসরে বসে খাক।'

স্নেহলতা বললেন, 'খুব ভাল কথা।'

গলা চড়িয়ে হেমনাথ ডাকতে লাগলেন, 'যুগল—যুগল—'

যুগল সহজে এল না, অনেক ডাকাডাকির পর চোখ নামিয়ে জড়সড় হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তেল এবং সাবানটা যদিও সস্তা, সেগুলোর গন্ধটা কিন্তু উগ্র। যুগল এসে দাঁড়াতেই চারদিকের বাতাস ভারি হয়ে উঠল।

প্রথমটা কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। সবাই চোখ বড় বড় করে অবাক বিস্ময়ে যুগলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হেমনাথই সুর টেনে টেনে বলে উঠলেন, 'করেছিস কি যুগলা, অ্যাঁ! মাথায় টেরি, গায়ে ফুল-হাতা জামা, নতুন কাপড়, ভুরভুরে তেল-সাবানের গন্ধ—একেবারে রাজবেশ যে রে ব্যাটা।'

দুরন্ত হাসির একটা স্রোত এতক্ষণ পাথরের আড়ালে আটকে ছিল যেন, হঠাৎ আড়ালটা সরে গিয়ে চারদিক থেকে কলকল করে ফেনায়িত উচ্ছ্বাসে বেরিয়ে এল।

সবাই হেসে হেসে গলে পড়তে লাগল। তার ভেতরেই হেমনাথের গলা আবার শোনা গেল, 'শ্বশুরকে দেখেই এই রকম সেজেছিস যুগলা, শ্বশুরের মেয়েকে দেখলে কী যে তুই করবি!'

যুগল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল, 'যুগল—যুগল—যুগল—'

যুগলের আর সাড়া পাওয়া গেল না। খুব সম্ভব বাড়ির সীমানা পেরিয়ে গেছে সে। ঠাট্টা এবং হাসিহাসি খানিক স্তিমিত হয়ে এলে হেমনাথ অচেনা লোকদুটোর দিকে ফিরে ডাকলেন, 'গোপাল—'

দু'জনের মধ্যে যে লোকটা মোটাসোটা সে তাকাল। বোঝা গেল, এ-ই গোপাল দাস এবং হেমনাথ তাকে চেনেন।

হেমনাথ বললেন, 'তারপর যে কথা হচ্ছিল, যুগলের বিয়ের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে আসতে

গেলে কেন? ওর মা-বাবাই তো আছে।'

বিনুর মনে হল, যুগলের বিয়ে-টিয়ে নিয়ে দু'জনের ভেতর আগেই কিছু কথা হয়েছে। ভূমিকা করেই রাখা হয়েছিল, এখন তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে।

গোপাল দাস বলল, 'যুগলের বাপের কাছে গেছিলাম। হ্যায় কইল, আপনের কাছে আইতে। আপনে যা কইবেন, তা-ই হইব। আপনের কথার উপুর তার কুনো কথা নাই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'যুগলের সঙ্গে তোমার মেয়ের কবে বিয়ে দিতে চাও?'

গোপল দাস তৎক্ষণাৎ বলল, 'আপনে যেইদিন কইবেন।'

হেমনাথ হাসলেন, 'তোমরা দেখি দু'জনেই আমার ঘাড়ে দায় চাপাতে চাও।'

দ্বিতীয় লোকটি অর্থাৎ যুগলের বোনাই বলল, 'আপনে ছাড়া আমাগো আর আছে কে? আপনের উপুর সগল দায় দিয়া আমরা নিচ্চিন্ত।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'আমার কথা যদি শোন, তাড়াতাড়ি কিন্তু বিয়ে হবে না।'

গোপাল দাস বললে, 'তারাতরির ঠেকা নাই। তবু কী মাস তরি হইব যদি ক'ন—'

হেমনাথ বললেন, 'সেই ফাল্গুন মাসে, ধান উঠবার পর।'

'এইটা হইল আশ্বিন মাস, হেইর পর কাত্তিক-অঘ্রাণ-পৌষ-মাঘ। মইধ্যখানে চাইরখান মোটে মাস। দেখতে দেখতে কাইটা যাইব। ফাল্গুন মাসে আমার আপত্তি নাই।'

'তিন চার মাস সময় নিলাম কেন জানো?'

'ক্যান?'

'যুগল তো বৌ নিয়ে আমার কাছেই থাকবে। নতুন বৌর জন্য নতুন ঘরদোর তুলতে হবে। তা ছাড়া আমার এক শ' দেড়শ' কানি ধানজমি আছে। মাঝখানে মোটে একটা মাস, তারপরেই ধান উঠবে। ধান ওঠার সময় আমি কোনো দিকে নজর দিতে পারব না। ধানের ঝঞ্ঝাট কাটবার পর নিশ্চিন্ত হতে হতে সেই মাঘ-ফাল্গুন।'

একটু নীরবতা।

তারপর হেমনাথই আবার শুরু করলেন, 'তোমার মেয়ের জন্যে পণ দিতে হবে তো?'

গোপাল দাস এক গাল হাসল, 'হ, হে তো দিতেই হইব।'

'কিরকম পণ চাইছ?'

সোজাসুজি প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে গোপাল দাস বলল, 'বাপ হইয়া আমি তো কইতে পারি না। তবে পাচজনে কয় মাইয়া আমার সোন্দরী। কথাখান ঠিক কি বেঠিক, তুমিই কও—' বলে সঙ্গীর দিকে তাকাল।

যুগলের বোনাই সায় দিয়ে বলল, 'ঠিকই।'

হেমনাথ বললেন, 'সুন্দরী যে আগেই বুঝেছি।'

গোপাল দাস বলল, 'আপনে দেখছেন?'

'না।'

'তয়?'

রহস্যময় হেসে হেমনাথ বললেন, 'তোমার মেয়ে ঐ ওর বাড়ি এসে আছে তো?' বল যুগলের বোনাইকে দেখিয়ে দিলেন।

গোপাল দাস ঘাড় কাত করল, 'হ—'

'খবর পাই, আমাদের যুগল ঘুরে ফিরে রোজই একবার ওখানে যায়। তোমার মেয়েকে দেখে মাথাখানা না ঘুরে গেলে কি রোজ বাঁদরটা যেত? সে যাক, কত পণ চাও বল—'

'হে আপনে বিচার কইরা দিয়েন।'

হেমনাথ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'দেনা-পাওনার কথা পরে হবে। তার জন্যে আটকাবে না। তুমি বরং পৌষ মাসের শেষ দিকে একবার এস।'

গোপাল দাস বলল, 'সেই ভাল। আমি কিন্তুক আপনের ভরসায় থাকুম বড়কত্তা—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কথার নড়চড় হবে না।'

দ্রুত জিভ কেটে গোপাল দাস বলল, 'হে তো আমি জানিই।'

হেমনাথ কিছু বললেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আর বসল না গোপাল দাস। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যুগলের বোনাইকে নিয়ে চলে গেল।

তারপরও বাকি দিনটা যুগলকে এ বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখা গেল না।

মহালয়ার পর থেকেই পড়াশোনা একরকম বন্ধ করে দিল বিনুরা। যে বইগুলো বাক্স থেকে বার করা হয়েছিল সেগুলো আবার বাক্সে গিয়ে ঢুকল না অবশ্য, তাকের ওপর সারি সারি গিয়ে জমা হল। সেগুলোর ওপর আশ্বিনের ধুলো জমতে লাগল।

মহালয়ার দিন থেকেই রাজদিয়ার রং গেছে বদলে। বর্ষার নতুন জলের মতন দিগ্বিদিক থেকে প্রবাসী সন্তানেরা সবাই ফিরে এসেছে।

রাজদিয়ার এপাড়া-সেপাড়া থেকে এখন ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসে। আশ্বিনের শেষাশেষি বাতাস যেন সানাই হয়ে উঠেছে। আর রোদটা যেন সারা গায়ে কাঁচা হলুদ মেখে এসে দাঁড়ায়। শিউলি গাছগুলোর পাতা আর দেখা যায় না, ফুলে ফুলে সেগুলো ছেয়ে গেছে। নদীতীরে আর খালের পাড়ে কাশবন তাদের শেষ ফুলটিও ফুটিয়ে দিয়েছে। আকাশের নীল এখন আরো ঝকমকে, আরো উজ্জ্বল। পেঁজা তুলোর মতন মেঘগুলো আরো শুভ্র আরো ভারহীন মনে হয়। হলদিবনা আর মোহনচূড়া পাখিগুলো, হরিয়াল-টুনটুনি-ঝুটকলি এবং দানিভোলার ঝাঁক নিতান্ত অকারণেই নেশা-প্রমত্তের মতন আকাশময় উড়ে উড়ে বেড়ায়।

এ সময় বইয়ের পাতায় কারো মন বসে!

তা ছাড়া নাটকের ব্যাপার আছে। বেশির ভাগ দিনই রিহার্সালের আসর বসে হেমনাথের বাড়িতে। বিকেলবেলা রাজ্যের মানুষ জুটিয়ে এনে হিরণ নাটকের মহড়া শুরু করে দেয়। এ ব্যাপারে সব চাইতে বেশি উৎসাহ অবনীমোহনের, হেমনাথও কম মাতেন নি। হইচই, চিৎকার, হাসাহাসি এবং পরিহাসে আসর সরগরম হয়ে ওঠে। রিহার্সাল ভাঙতে ভাঙতে রাতদুপুর।

এত হুল্লোড়ে পড়াশোনা হবার কথা নয়। বিনুর আজকাল সারাদিনই ছুটি। 'বিজয়া' নাটকে ছোট একটা রোল পেয়েছে সে। সেটুকু রিহার্সাল দিতে কতক্ষণ আর লাগে। নইলে বাকি দিনটা যুগলের সঙ্গে কিংবা একা একাই ঘুরে বেড়ায়। ছোট্ট নগণ্য রাজদিয়া শহরের সব কিছুই চিনে ফেলেছে বিনু। নদীতীর, চিত্রবিচিত্র পালতোলা অসংখ্য নৌকো, ইলশেডিঙি, স্টিমারঘাটা, কাশফুল, শিউলি বনে আশ্বিনের মোহিনী মায়া—এ সবের আকর্ষণ তো আছেই। সব চাইতে বড় আকর্ষণ যেটা হল তা প্রতিমা।

রাজদিয়ায় মোট সাতখানা পুজো হচ্ছে। দুটো বারোয়ারি, বাকিগুলো বংশ পরম্পরায় বাড়ির পুজো।

পটুয়াদের এখন আর ব্যস্ততার শেষ নেই। সারাদিনই প্রতিমার গায়ে রং লাগাচ্ছে, শোলা দিয়ে

জরি দিয়ে ডাকের সাজ তৈরি করছে। সারা রাজদিয়া টহল দিয়ে প্রায় সমস্ত দিনই প্রতিমা দেখে বেড়ায় বিনু।

এইভাবে চলছিল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা স্নেহলতা হেমনাথকে বললেন, 'তুমি কী বল তো ?'

হেমনাথ হকচকিয়ে গেলেন।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'একটু হুঁশ-টুঁশও যদি তোমার থাকে! পুজো এসে গেল, এখনও নতুন কাপড়-চোপড় কিছুই কেনা হল না। ওরা এই প্রথম দাদু-দিদার কাছে এল, ষষ্ঠীর দিনে ওদের হাতে একটু নতুন সুতো দিতে হবে না ?'

অপরাধীর মতন মুখ করে হেমনাথ বললেন, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আজই কমলাঘাটের বাজারে গিয়ে কিনে নিয়ে আসব।'

'নিশ্চয়ই।'

বেলা একটু চড়লে অবনীমোহনকে নিয়ে কমলাঘাট রওনা হলেন হেমনাথ। বিনুকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, রাজদিয়ার একচালির বিশাল বিশাল প্রতিমাগুলি ছেড়ে সে যেতে রাজি হল না।

আজ রিহার্সাল বসেছিল হেমনাথদের বাড়ি। শুরু হয়েছিল সেই সন্ধেবেলায়, একটানা ঘণ্টাতিনেক চলবার পর সে পালা চুকল। তারপর আরো কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে হিরণরা চলে গেল।

হিরণরা যখন যায় তখন দুপুর রাত। চারদিকের ঝোপঝাড় বাগান-পুকুর এবং ধানখেত—সব একাকার হয়ে এখন যেন নিঝুতিপুর।

হেমনাথরা সকালবেলা সেই যে কমলাঘাটের গঞ্জে পুজোর জামাকাপড় কিনতে গিয়েছিলেন, এখনও ফেরেন নি। তাঁদের জন্য বিনুদের আর অপেক্ষা করতে দিলে না স্নেহলতা। সুধা-সুনীতি ঝিনুক-বিনু, এমন কি সুরমাকেও খেতে বসিয়ে দিলেন।

সুরমা আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, স্নেহলতা শুনলেন না। বললেন, 'তুমি রোগা মানুষ, রাতদুপুর পর্যন্ত আর না খেয়ে জেগে বসে থাকতে হবে না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরমা তবু খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, 'মামারা এখনও ফিরলেন না। পুরুষমানুষদের কারো খাওয়া হল না, আর আমি আগেই গিলতে বসে যাই!'

'পুরুষমানুষদের জন্যে তো অত ভাবনার দরকার নেই। সে জন্যে আমি আছি, ঠাকুরঝি আছে। তোর খাওয়া তুই খেয়ে নে তো—'

না না করেও স্নেহলতার ভয়ে সুরমাকে খেতে বসতে হল।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় হইচই করতে করতে হেমনাথরা ফিরে এলেন। পুকুরঘাট থেকে তাঁর গলা পাওয়া গেল, 'কোথায় রে আমার দাদাভাই দিদিভাইরা ? যুগল কোথায় ? সব ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ?'

সকালবেলা যুগল তাঁদের সঙ্গে কমলাঘাটের গঞ্জে যায় নি। নিজের ঘরে বসে এই মুহূর্তে কী যেন করছিল। ডাক শোনামাত্র হারিকেন নিয়ে ছুটল।

বিনুরা ধীরে ধীরে গল্প করতে করতে খাচ্ছিল, এখন গোগ্রাসে শেষ ভাত ক'টা মুখে পুরতে লাগল। তাদের খাওয়ার মধ্যেই হেমনাথরা ভেতর- বাড়ির উঠোনে এসে পড়লেন।

হেমনাথ অবনীমোহন সামনের দিকে ছিলেন। তাঁদের ঠিক পেছনে আরেক জন কেউ আছে, অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

স্নেহলতা লক্ষ করছিলেন। স্বামীর উদ্দেশে বললেন, 'তোমাদের পেছনে কে গো ?'

রহস্যময় হেসে হেমনাথ বললেন, 'তোমার আসামী।'

'মানে ?'

'আলোটা তুলে দেখই না—'

দাওয়ার দু'ধারে দুটো হারিকেন জ্বলছিল। একটা নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরলেন স্নেহলতা। আর তখনই দেখা গেল, হেমনাথদের পেছনে যিনি গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে আছেন তিনি আর কেউ নন—লারমোর।

ঘাড়খানা বাঁকিয়ে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ লারমোরকে দেখলেন স্নেহলতা। তারপর ডাকলেন, 'ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি—'

শিবানী কাছাকাছি ছিলেন, ছুটে এলেন।

লারমোরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে স্নেহলতা বললেন, 'দেখ দেখ, কেমন গরুচোরের মতন দাঁড়িয়ে আছে!'

শিবানীও তাঁর সঙ্গে তাল দিয়ে বেজে উঠলেন, 'যা বলেছ। ঠিক গরুচোর—'

স্নেহলতা এবার সোজাসুজি লারমোরকে বললেন, 'আর রঙ্গ করতে হবে না সাহেব, আড়াল থেকে বেরিয়ে এস। নতুন করে রূপ দেখে চোখ জুড়োই—'

ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বেরিয়ে এলেন লারমোর। তাঁর ভঙ্গি দেখে স্নেহলতা হেসে ফেললেন।

স্নেহলতা বললেন, 'আর পারি না আপনাকে নিয়ে।'

স্নেহলতা কখনও লারমোকে 'আপনি' বলেন, কখনও 'তুমি।' দু'জনের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর এবং নির্মল। মাঝে মধ্যে স্নেহলতা রেগে যান ঠিকই, তার ভেতর কিন্তু দাহ নেই। যা আছে তা হল কৌতুক—মলিনতাহীন স্নিগ্ধ পরিহাস।

লারমোর বললেন, 'এই বারটা, শুধু এইবারটা ক্ষমা করে দিন বৌঠাকরুন। আর কখনও এরকম হবে না।'

তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটিতে লারমোরকে বিদ্ধ করতে করতে স্নেহলতা বললেন, 'চল্লিশ বছর ধরে খালি 'এইবারাটা' 'এইবারটা' শুনছি। এবাড়ির সীমানা পেরুলে আমার কথা কি আপনার মনে থাকে?'

'এবার থেকে ঠিক থাকেবে।'

'ঠিক যে কত থাকবে, সে আমি জানি।' স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'সুজনগঞ্জের হাট থেকে সেদিন ফিরে আসার কথা ছিল না?'

'ছিল—' লারমোর মাথা নাড়লেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কিন্তু সুজনগঞ্জের হাট থেকে এক রুগীর জন্যে চরবেহুলা যেতে হল যে। সে কথা তো হেম জানে। আপনাকে বলে নি?'

'থাক, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটাকে ডাকতে হবে না। এখন দয়া করে হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নিন।'

হাতমুখ ধোয়া হয়ে গেলেও রেহাই পেলেন না লারমোর। স্নেহলতা সমানে বলতে লাগলেন, 'খালি রুগী—রুগী—রুগী! নিজের ঘুম-বিশ্রাম-স্বাস্থ্য—কোনোদিকে নজর নেই। রুগীরা স্বর্গে বাতি দ্বেলে দেবে!'

লারমোর চুপ।

কি ভেবে স্নেহলতা প্রশ্ন করলেন, 'বয়েস কত হল শুনি?'

লারমোর বললেন, 'ষাট পঁয়ষট্টি হবে।'

'জোয়ান বয়সে যা মানাত এখন আর তা মানায় না, বুঝলেন মশাই। দৌড়ঝাঁপ লাফালাফিগুলো একটু থামান। একবার বিছানায় পড়লে এই বয়সে আর উঠতে হবে না।'

'হ্যাঁ—'

স্নেহলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'কী হ্যাঁ?'

লারমোর ভীরু গলায় বললেন, 'এবার থেকে নিজের দিকে খুব নজর দেব। আমারই যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয়ে যায় দেখবে কে? রুগী ধুয়ে তখন কি জল খাব?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না স্নেহলতা। ঘাড়খানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক থেকে সেদিক থেকে লারমোরকে

দেখতে লাগলেন। পরে বললেন, 'বেশ ভাল ভাল কথা বেরুচ্ছে মুখ থেকে। কিন্তু আমি তো জানি—'

'কী জানেন?'

'স্বভাব যায় না মরলে, আর—'

স্নেহলতাকে শেষ করতে দিলেন না লারমোর, তার আগেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'দেখে নেবেন, এবার থেকে গুড বয় হয়ে যাব।'

অবিশ্বাসের গলায় স্নেহলতা বললেন, 'দেখা যাবে।'

বিনুদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আঁচিয়ে টাঁচিয়ে তারা হেমনাথদের কাছে এসে দাঁড়াল।

দু'চোখে অবাক বিস্ময় মেখে অপলক তাকিয়ে ছিল বিনু। লারমোরকে প্রথম যেদিন দেখে সেদিন থেকেই যে বিস্ময় আর মুগ্ধতার শুরু, এখনও তা কাটে নি। বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে।

একটা কথা জানবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল বিনুর। সুজনগঞ্জের হাট থেকে গহর আলিদের সঙ্গে সেই যে লারমোর চলে গিয়েছিলেন তারপর এ ক'দিন কোথায় কাটালেন? চরবেহুলাতেই কী?

বিনু হয়তো জিজ্ঞেস করত। তার মনের কথাটা অন্তর্যামীর মতন আগে ভাগে জানতে পেরে বুঝি স্নেহলতা সেই প্রশ্নটাই করলেন।

লারামোর যা উত্তর দিলেন তা এইরকম। চরবেহুলায় তিনি ছিলেন মোটে দু'দিন। তাঁর যাবার খবর আগেভাবেই রটে গিয়েছিল। ফলে চারপাশের গ্রাম গঞ্জে যত যত রুগী আছে তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে ছেঁকে ধরেছিল। একবার যখন ওদিক যাওয়াই হয়েছে তখন তো আর অসুস্থ শয্যাশায়ী মানুষগুলোকে ফেলে আসতে পারেন না লারমোর। কাজেই চরবেহুলা থেকে তাঁকে যেতে হয়েছে কুকুটিয়া, সেখান থেকে রসুনিয়া, রসুনিয়া থেকে আউটশাহী। এইভাবে নানা জায়গা ঘুরে আজ দুপুরে এসেছিলেন কমলাঘাটের গঞ্জে। রাজদিয়াগামী নৌকো খুঁজছিলেন তিনি। এদিকে যারা আসবে তাদের কারো সহযাত্রী হবেন, এইরকম ইচ্ছে। এমন সময় হেমনাথদের সঙ্গে দেখা, তাঁদের সঙ্গে সারাদিন ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করেছেন লারমোর। তারপর সন্ধের আগে আগে নৌকোয় উঠেছেন।

স্নেহলতা বললেন, 'অনেক বক্তৃতা হয়েছে। এবার খেতে চলুন।'

আচমকা যেন মনে পড়ে গেছে এমনভাবে লারমোর বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

খেতে খেতে বিনুর সঙ্গে, সুধা-সুনীতির সঙ্গে, সুরমা-শিবানী-ঝিনুকের সঙ্গে অনেক গল্পটল্প করলেন লারমোর। তারপর হঠাৎ অবনীমোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা তো একদিনও আমার ওখানে গেলে না?'

স্নেহলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'যেতে কখনও বলেছেন যে যাবে?'

ধবধবে ফর্সা মানুষটি একেবারে লাল হয়ে গেলেন। বিব্রত মুখে বললেন, 'যেতে যে বলব, নানা ঝঞ্ঝাটে একেবারেই মনে ছিল না।'

স্নেহলতা বললেন, 'রমু না হয় আরো এসেছে। কিন্তু অবনী-সুধা-সুনীতি-বিনু, ওরা তো এই প্রথম রাজদিয়া এল। কোথায় তাদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে, তা না। অজ চরবেহুলা, কাল রসুনিয়া, এই করে বেড়াচ্ছে!'

লারমোর বললেন, 'সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে।' বলেই অবনীমোহনের দিকে ফিরলেন, 'কবে আমার ওখানে যাচ্ছ বল। সকালবেলা চলে যাবে, সারাদিন থাকতে হবে।'

অবনীমোহন বললেন, 'তাড়া কি, যাব একদিন।'

'একদিন ট্যাকদিন না, ঠিক তারিখটা জানতে চাই।'

হেমনাথ এতক্ষণ চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি বললেন, 'পুজোর ভেতর একদিন যাবে। ধর, সপ্তমীর দিন।'

লারমোর বললেন, 'বেশ, পাকা কথা তো?'

অবনীমোহনদের হয়েই হেমনাথ জবাব দিলেন, 'পাকা কথা।'

খাওয়া-দাওয়ার পর লারমোর বললেন, 'এখন তা হলে আমি চলি—'

স্নেহলতা বললেন, 'এত রাত্তিরে কোথায় যাবেন ?'

'আমার গীর্জায়।'

'আজ আর যেতে হবে না। বিছানা করে দিচ্ছি, শুয়ে পড়ুন, কাল সকালবেলা উঠে চলে যাবেন।'

দু'হাত জোড় করে লারমোর বললেন, 'আজ আর থাকতে বলবেন না বৌ-ঠাকরুন, চরবেহুলা যাবার আগে কাদেরের জ্বর দেখে গিয়েছিলাম ক'দিন তার খবর জানি না। বড্ড চিন্তা হচ্ছে।'

'এতদিন হুঁশ ছিল না, রাজদিয়ায় পা দিতেই বুঝি কাদেরের জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল!'

'না না, সব সময় ওর কথা ভেবেছি। কিন্তু কী করব, রুগী ফেলে তো আর আসা যায় না। রাজদিয়ায় যখন এসেই পড়েছি তখন—'

এই সময় বিনু বলে উঠল, 'কাদের কে ?'

লারমোর বললেন, 'আরেক দিনও তার কথা জিজ্ঞেস কারছিলি দাদা ভাই, কাদের আমার ফিটন গাড়িটা চালায়। আমার কাছেই থাকে ও।'

এবার বিনুর মনে পড়ে গেল। আর কিছু বলল না সে।

স্নেহলতা আরো দু-একবার রাতটা কাটিয়ে যেতে বললেন, লারমোর রাজি হলেন না।

অগত্যা হেমনাথ বললেন, 'একা একা এতটা পথ অন্ধকারে যাবে, যুগল বরং হারিকেন নিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

লারমোর বললেন, 'যুগল যাবে! এই রাত্তিরবেলা ছেলেটাকে আবার কষ্ট দেওয়া।'

হেমনাথ বললেন, 'কিছু কষ্ট না। তুমি একটু দাড়াও, ও খেয়ে নিক।' তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'তাড়াতাড়ি যুগলকে খেতে দাও—'

তিন থাবায় খাওয়া শেষ করে লারমোরের সঙ্গে চলে গেল যুগল। একটু পর বাগানের দূর প্রান্ত থেকে লারমোরের গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। অন্ধকারে নির্জন পথে যেতে যেতে তিনি খ্রিস্টবন্দনা শুরু করেছেন :

> Hear the right O Lord.
> Attend unto my cry.
> Give ear unto my prayer.
> That goeth not out of feigned lips.

কাল রাত্তিরে কমলাঘাটের বন্দর থেকে বড় বড় দুটো বাক্স বোঝাই জামাকাপড় কিনে এনেছিলেন হেমনাথরা। সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুক—বাড়ির সবার জন্য তো নতুন পোশাক এসেছেই, তা বাদে অসংখ্য শাড়ি-ধুতি, নানা মাপের ফ্রক-ইজের-শার্টও আনা হয়েছে। এত জামা-টামা দিয়ে কী হবে বিনু বুঝতে পারে নি, অবশ্য জিজ্ঞেসও করে নি।

আজ সকালেলা ঘুম থেকে উঠে ঝিনুক আর হেমনাথের সঙ্গে সূর্যস্তব করবার পর স্নেহলতার সঙ্গে দেখা।

অন্যদিনের মতন এর ভেতরেই চান সেরে ফেলেছেন স্নেহলতা। পরনে পাটভাঙা লালপাড় শাড়ি, গরদের জামা, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর টানা। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, নির্মল আকাশে সূর্যোদয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। খোঁপা বাঁধেন নি, দু'একবার চিরুনি টেনে ভিজে চুলগুলো পিঠময় ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রান্তে আলগা করে গিঁট বাঁধা।

স্নেহলতা গলা তুলে ডাকতে লাগলেন, 'ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি, গৌরদাসী—উমা—'

শিবানী-উমা-গৌরদাসী, সবাই ছুটে এল। এমন কি সুরমা-অবনীমোহনরাও এসে পড়েছেন। উমা

আর গৌরদাসী সেই আশ্রিত বিধবা দু'টির নাম।

স্নেহলতা বললেন, 'আজ আমার ছুটি।'

শিবানী হাসলেন,'বেশ তো।'

'রান্নাবান্না-সংসার সব আজ তোমরা চালাবে। রোজ রোজ এই চরকি কলে ঘুরতে পারব না। এক-আধদিন আমারও ছুটিছাটার দরকার, বুঝলে?'

'বুঝলাম—' শিবানী হাসতে লাগলেন, 'এই সক্কালবেলা এমন সাজের বাহার, ব্যাপার কী?

সুধা-সুনীতিকে দেখিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ওরা দিনরাত সাজছে, আমার বুঝি একটু-আধটু সাজগোজ করতে ইচ্ছে করে না? সাজলে আমাকে খুব খারাপ দেখায় নাকি?

সুধা-সুনীতি কলকল করে উঠল, 'আমাদের হিংসে হচ্ছে?'

'হচ্ছেই তো।'

শিবানী বললেন, 'পটের বিবি হয়ে পায়ের ওপর পা'টি তুলে তুমি বসে থাকো, আমরা যাই। রান্নাবান্না চড়াতে হবে তো।'

স্নেহলতা দু'ধারে মাথা নাড়লেন, 'উঁহু—'

'কী?'

'বসে থাকব না।'

'তবে?'

'বেরুতে হবে।'

'কোথায়?'

স্নেহলতা বললেন, 'কাল জামা-কাপড় কিনে আনা হল না? পুজোপার্বণের দিনে সবাই আশা করে বসে আছে, তাদের হাতে দিয়ে আসতে না পারলে ভাল লাগছে না।'

শিবানী বললেন, 'এই তোমার ছুটি নেওয়া!'

স্নেহলতা হেসে ফেলেন।

শিবানী আবার বললেন, 'রাজদিয়া জুড়ে তোমার রাজ্যপাট আর ছেলেমেয়ে। যাও, সবার মনোবাসনা পূর্ণ করে এস।'

স্নেহলতা হাসতে হাসতে ডাকলেন, 'যুগল—যুগল—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুগল এসে হাজির। কাল রাত্তিরে লারমোরকে পৌঁছে দিয়ে কখন সে ফিরে এসেছে, বিনু জানে না। তার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

স্নেহলতা বললেন, 'পুবের ঘরে দুটো কাপড়ের গাঁটরি আছে, সে দুটো নৌকোয় নিয়ে যা।'

কাপড়ের গাঁটরি মাথায় চাপিয়ে পুকুরঘাটের দিকে চলে গেল যুগল।

স্নেহলতা এবার বিনুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে তোরা কে কে যাবি?'

বেড়াতে যাবার নামে বিনু-ঝিনুক নেচে উঠল, 'আমি যাব, আমি যাব—'

'যাবি—যাবি—' স্নেহলতা তাদের শান্ত করে সুধা-সুনীতিকে বললেন, 'তোরা দিদিভাই?'

সুধা-সুনীতি জানাল, তারা যাবে না। ছুটির কিছুদিন পরেই পরীক্ষা। রাত্তিরবেলা তো রিহার্সালের জন্য বই ছুঁতেই পারে না। সকালে যদি একটু-আধটু না পড়ে, তবে নির্ঘাত ফেল।

স্নেহলতা এবার সুরমাকে বললেন, 'তুই চল রমু—'

'আমি?'

'হ্যাঁ। রাজদিয়ায় আসার পর একদিন মোটে বেরিয়েছিস। সবাই তোকে যেতে বলে। ঘুরেটুরে পাঁচজনের সঙ্গে কথা বললে দেখবি ভাল লাগবে।'

'চল তা হলে।'

বিনু-ঝিনুক-সুরমাকে নিয়ে একটু পর পুকুরঘাটে চলে এলেন স্নেহলতা।

সেদিন সুজনগঞ্জের ঘাট থেকে যে নতুন নৌকোখানা কিনেছিলেন হেমনাথ তার গলুইতে উন্মুখ হয়ে বসে ছিল যুগল। স্নেহলতারা উঠতেই নৌকো ছেড়ে দিল। বলল, 'কই যাইবেন ঠাউরমা?'

স্নেহলতা বললেন, 'আগে কুমোরপাড়ায় চল—'

পুকুরটার পুব দিকে ধানের খেত, উত্তরে খাল। অবশ্য আলাদা আলাদা করে খাল এবং পুকুরকে চিনবার উপায় নেই। এই আশ্বিনে অথৈ জলে সব সীমারেখা ডুবে গেছে। নৌকো নিয়ে যুগল খালের ভেতর এসে পড়ল।

খালের গা ঘেঁষে সেই রাস্তাটা, মেরুদন্ডের মতন যেটা রাজদিয়ার মাঝখান দিয়ে গেছে। প্রথম দিন থেকেই এ রাস্তা বিনুর চেনা। ঐ পথটা ধরে যেতে যেতে জলের মাঝখানে খন্ড খন্ড দ্বীপের মতন অনেক বসতি তার চোখে পড়েছে।

এক সময় নৌকোটা রাস্তার কাছ থেকে সরে এসে বসতিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

চারদিকে সেই পরিচিত দৃশ্য। হেলেঞ্চা লতা, জলঘাস আর ধঞ্চের বন উদ্দাম হয়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে নলখাগড়ার ঘন ঝোপ। আজ পাখি চোখে পড়ছে না তেমন। মাঝে-মধ্যে দু'একটা মৌটুসকি কি মাছরাঙা, কদাচিৎ শালিক অথবা চড়ুই। তবে পতঙ্গরা আছে, নলখাগড়ার দীর্ঘ সজীব ডাঁটাগুলোর মাথায় নাচানাচি করে বেড়াচ্ছে।

রাজদিয়ায় আসার পর কতবার এই ছবি দেখেছে বিনু, তবু তার মুগ্ধতা কাটল না। সে পাখি দেখতে লাগল, ফুল দেখতে লাগল। যে সব আগাছা কোনোদিন কারো প্রয়োজনে লাগবে না, অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

পাশে বসে স্নেহলতা-সুরমা-ঝিনুক সমানে কথা বলে যাচ্ছে। লতাপাতা-পাখি-পতঙ্গ সব একাকার হয়ে জলবাংলার মনোরম দৃশ্য বিনুকে এমন মুগ্ধ করে রেখেছে যে সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ যুগলের উঁচু গলা কানে এল, 'বুধাই পালের ঘাটে নাও ভিড়াই ঠাউরমা?'

স্নেহলতা বললেন, 'ভেড়া—'

বুধাই পাল। নামটা কোথায় শুনেছে, এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না বিনু। ঘুরেফিরে তার কথাই ভাবতে লাগল সে।

খালের পাড়ে খানিক পর পরই নারকেলগুঁড়ি দিয়ে ঘাটলা পাতা রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যুগল একটা ঘাটে নৌকো থামাল।

স্নেহলতা বললেন, 'কাপড়ের একটা গাঁটরি নিয়ে আমার সঙ্গে আয় যুগল।'

লগি পুঁতে নৌকো বেঁধে কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে পাড়ে নামল যুগল। তারপর নামলেন স্নেহলতারা।

খালপাড়ে ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে পথ। পথটার যেখানে শেষ, সেখান থেকেই কুমোরপাড়া শুরু।

কুমোরপাড়ার বাড়িগুলো গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি আর কি. জীর্ণ টিনের চাল আর ক্যাচাবাঁশের বেড়ায়-ছাওয়া এলোমেলো বিক্ষিপ্ত কতকগুলো ঘর। সেগুলোর আবার দরজা-জানালার বালাই নেই। জানালা বলতে ক'টা ফোকর। দরজাগুলোও ফোকরই, তবে তুলনায় জানালার চাইতে বড়। সারা বছর সেগুলোর ভেতর দিয়ে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা অজস্র ধারায় তাদের করুণা এবং অভিশাপ বর্ষণ করে চলেছে।

কুমোরপাড়ার সর্বাঙ্গে যে নিদারুণ ঈশ্বর আপন শীলমোহর মেরে রেখেছে তার নাম দারিদ্র্য।

মানুষ তার গৃহকে সুসজ্জিত করে তুলবার জন্য যুগ যুগ ধরে সাধনা করে চলেছে। তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে নগর-বন্দর এবং রম্য জনপদের। কুমোরপাড়ার বাড়িগুলোর পেছনে তেমন সুচারু সাধনা, তেমন পরিকল্পনার চিহ্নমাত্র নেই। সেই আদিম যুগের মতন যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করে মাথা

গোঁজার জন্যে আস্তানা খাড়া করা ছাড়া আর কোনো গভীর উদ্দেশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না এখানে।

জায়গাটা যে কুমোরপাড়া, বলে দিতে হয় না। সারা গায়ে সে তার বিজ্ঞাপন মেরে রেখেছে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, সমাপ্ত-অসমাপ্ত হাঁড়ি-কলসি ছড়িয়ে আছে। কোথাও চাক-ঘর, কোথাও 'পইত্না' আর গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো হাঁড়িকড়ার ছাঁচ। কোথাও বা 'পুইন (এর ভেতর মাটির হাঁড়ি-টাড়ি পোড়ানো হয়), কোথাও এঁটেল মাটির পাহাড়।

কুমোরপাড়ায় স্নেহলতারা পা দিতেই সাড়া পড়ে গেল। হাতের কাজ ফেলে বৌ-ঝিরা ছুটে এল, এল পুরুষমানুষেরা, আর এল কালো কালো মাটি মাখা এক পাল আধোলঙ্গ ছেলেমেয়ে।

সবার আগে যে রয়েছে, দেখামাত্র তাকে চিনতে পারল বিনু। সেদিন সুজনগঞ্জের হাটেও একে দেখেছিল। লোকটা বুধাই পাল। খানিক আগে নামটার সঙ্গে তাকে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না।

বুধাই পাল চেঁচিয়ে উঠল, 'মা জননী আইছে, মা জননী আইছে—'

স্নেহলতা বললেন, 'তোমরা কেমন আছ?'

সকলের প্রতিনিধি হিসেবে বুধাই পাল বলল, 'আপনে আর হ্যামকত্তা মাথার উপুর থাকতে মোন্দ থাকনের জো আছে?'

স্নেহলতা তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললেন, 'আমরা ভাল রাখার কে? ক্ষমতা কতটুকু আমাদের? ভাল-মন্দ যা রাখবার তা রাখেন ওপরওলা—' বলে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

'কথাখান ঠিকই মা-জননী, তবে উপরঅলারে তো চৌখে দেখি নাই। দেখছি আপনেগো—'

বাধা দিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'হয়েছে হয়েছে, রাস্তায় দাঁড় না করিয়ে এখন কোথায় নিয়ে বসাবে চল।'

বুধাই পাল ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আমি কি আহাম্মক! পথেই খারা করাইয়া রাখছি। আসেন মা জননী, আসেন—'

স্নেহলতারা চলতে লাগলেন। জনতা হই হই করতে করতে তাঁদের সঙ্গ নিল।

বুধাই পাল সোজা নিজের বাড়িতে এনে তুলল স্নেহলতাদের। উঠোনের তিন কোণে তিনটে বাতাবীলেবু গাছ ছাতা ধরে আছে। ফলে জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন, তার তলায় ক'খানা জলচৌকি পেতে দেওয়া হল। স্নেহলতারা বসলেন। কুমোরপাড়ার জনতা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকল।

বুধাই পাল বলল, 'মা-জননী অন্য বচ্ছর মহালয়ার আগেই আসেন। এইবার কিন্তুক দেরি কইরা আইছেন। ইদিকে নয়া জামা-কাপড়ের লেইগা পোলাপানগুলান মাথা খাইয়া ফালাইতে আছে। তাগো ডর, এইবার বুঝিন আপনে কুমারপাড়ার কথা ভুইলা গেছেন। আমি যত বুঝাই তারা শোনে না।'

জনতার মধ্য থেকে সবাই সায় দিয়ে উঠল, 'হ হ, পোলাপানগুলা বুঝ মানে না।'

স্নেহলতা বললেন, 'তোমাদের কথা কখনও ভুলতে পারি? এবার এরা এসেছে, তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।' বলে সুরমাদের দেখিয়ে দিলেন।

বুধাই এবং ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ কেউ বলল, 'আপনের ভাগ্নী, না?'

'হ্যাঁ।'

'শুনছি ওনারা আইছেন। ভাগনী, ভাগনীজামাই, নাতি-নাতনী—'

'হ্যাঁ।'

'থাকব তো কিছুদিন?'

'হ্যাঁ।'

'যামু একদিন দেখতে।'

'যেও।'

হঠাৎ বুধাই পাল বিনুকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'আমি এনারে চিনি, জামাইবাবুরেও চিনি। হেইদিন

হাটে দেখছিলাম, না?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

কথা হচ্ছিল পুরুষদের সঙ্গে। সুরমাদের সম্বন্ধে মেয়েমহলেও কৌতূহল অসীম। চাপা গলায় তারা ফিসফিস করছে, 'কইলকাতার মানুষ ওনারা—'

'বড় লোক—'

'কেমুন সোন্দর, দেখছ।' ইত্যাদি ইত্যাদি—

তাদের কথা শুনতে শুনতে আমোদ লাগছিল বিনুদের। স্নেহলতা, সুরমা হাসছিলেন। কখনও এক-আধটা রসালো মন্তব্য করছিলেন।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে একটি মধ্যবয়সিনী সামনে এগিয়ে এল। এই বয়সেও তার বড় লজ্জা। নাক পর্যন্ত ঘোমটা টানা, জড়সড় পুঁটলির মতন দেখাচ্ছে তাকে।

স্নেহলতা বললেন, 'কে? নিবারণের বউ না?'

ঘোমটার তলা থেকে মধ্যবয়সিনী বলল, 'হ।'

'কিছু বলবে?'

'হ। আমার মাইয়া বিন্দি চাইর বচ্ছর মাঘ-মন্ডলের বরতো (ব্রত) করছে। সগল বচ্ছরই আপনে আইছেন। এইবার তার বরতো সাঙ্গ হইব। আপনেরে আইতে হইব কিলাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব। সেই মাঘ মাসে তো—'

'হ। আমি আগে থাকতে কইয়া রাখলাম।

চারদিকের জনতাকে দেখে নিয়ে স্নেহলতা শুধালেন, 'বিন্দি কই? তাকে তো দেখছি না।'

মধ্যবয়সিনী বলল, 'বাড়িত্ নাই। খালপারে সেচি শাক তুলতে গেছে।'

একটু নীরবতা।

তারপর স্নেহলতা বললেন, 'আর বসতে পারব না, অনেক জায়গায় যেতে হবে। তোমাদের জামাকাপড়গুলো নিয়ে যাও।' যুগলকে বললেন, 'কাপড়ের গাঁটরিটা খোলা।'

ছেলেমেয়ে বুড়ো-বাচ্চা সবাইকে ডেকে নিজের হাতে নতুন জামাকাপড় দিলেন স্নেহলতা।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলল, 'পুজার সময় আপনে আসেন মা, সারা বচ্ছরে এই একবার এট্টু নয়া সুতা গায়ে ওঠে। কত আশা বুকে লইয়া যে এই দিনটার লেইগা বইসা থাকি।'

এত জামাকাপড় কেন কেনা হয়েছে, এবার বুঝতে পারল বিনু। আরো বুঝল, রাজদিয়ার ঘরে ঘরে স্নেহলতার অসংখ্য সন্তান। প্রতি বছর পুজোর সময় গরিবের চাইতেও গরিব, নগ্ন শীর্ণ মানুষগুলোকে নতুন আভরণে সাজাতে না পারলে তাঁর সুখ নেই।

স্নেহলতাকে এই মুহূর্তে রাজেশ্বরীর মতন মনে হতে লাগল বিনুর।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সবাই উঠল।

শুধু কুমোরপাড়াই না, কামারপাড়া, যুগীপাড়া, বারুইপাড়া—নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাপড়চোপড় বিলোলেন স্নেহলতা। সমস্ত বছর রাজদিয়ার মানুষগুলো তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল যেন। যেখানেই স্নেহলতা গেছেন, দু'দন্ড বসেছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলের সুখ-দুঃখের খবর নিয়েছেন।

এই রাজদিয়ার সবখানেই স্নেহলতার জন্য হৃদয় পাতা রয়েছে। তার ওপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে স্বর্গের দেবীর মতন তিনি সকলের প্রাণের গভীর অন্তঃপুরে চলে যান।

ঘুরতে ঘুরতে দুপুর হয়ে গেল। নিটোল পেয়ালার মতন শরতের ঝকঝকে নীল আকাশের ঠিক মাঝমধ্যিখানে সূর্যটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে টের পাওয়া যায় নি।

এইমাত্র স্নেহলতারা বারুইপাড়া থেকে বেরিয়ে নৌকোয় উঠলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ইস, অনেক বেলা হয়ে গেল। এখনও নাপিতপাড়া-আচার্যিপাড়া বাকি আছে। এদিকে

বিনু-ঝিনুকের নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে। আজ থাক, কাল ওদের জামাকাপড় দিয়ে যাব। চল যুগল, বাড়ি যাই—'

নৌকো এগিয়ে চলল। খানিকটা যাবার পর স্নেহলতা হঠাৎ বললেন, 'এ পাড়ায় এলাম, ভব'টাকে একবার বরং দেখে যাই। সেই যে ঝিনুককে দিয়ে সে চলে এল, আর যায় নি। এই ঝিনুক, বাবার কাছে যাবি ?'

ঝিনুক মাথা নাড়ল, অর্থাৎ যাবে।

স্নেহলতা যুগলকে বললেন, 'ভব'দের ঘাটে নৌকো লাগা।'

ভবতোষদের বাড়িতে আগে আর কখনও যায় নি বিনু। ভবতোষ অবশ্য যেতেও বলেন নি। বিনুর ধারণা ছিল, বাড়িটা আদালতপাড়ার কাছাকাছিই হবে। কিন্তু সে তো বড় রাস্তা ধরে হেঁটে আসতে হয়। নৌকোয় করেও খাল দিয়ে যে আসা যায়, বিনু জানত না।

ঝিনুকদের বাড়ি আসার কথা তেমন করে কখনও মনে হয় নি বিনুর। তাদের কথা গভীরভাবে কোনোদিন ভাবেও নি সে। তেমন করে ভাববার বয়েসও নয় তার। ঝিনুকের মা চলে গেছেন, তার বাবার বিষণ্ণ চেহারা, মেয়েকে তিনি অন্যের বাড়ি ফেলে রেখেছেন, এই সবের জন্য দুঃখ হয়েচে বিনুর, ঝিনুকের জন্য খানিক সহানুভূতি বোধ করেছে সে। এই পর্যন্ত।

কিন্তু এই মুহূর্তে ঝিনুকদের বাড়ির কাছাকাছি এসে সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে হল বিনুর, কেন হল সে নিজেই জানে না।

একটু পর নৌকোটা যেখানে ভিড়ল সেটা কাঠের তক্তা দিয়ে বাঁধানো ঘাটলা। খাল ধরে আসতে আসতে এই রকম ঘাটলা অনেক দেখেছে বিনু। বুঝেছে দু'ধারে যাদের বাড়ি এই রকম ঘাট পেতে খালটাকে তারা ব্যবহার করে।

নৌকো ভিড়তেই স্নেহলতা বললেন, 'তোর আর গিয়ে কাজ নেই যুগল। একটু বোস। আমি ওদের নিয়ে ভবতোষের সঙ্গে দেখা করে আসি। যাব আর আসব।'

যুগল বসে থাকল। বিনুদের সঙ্গে নিয়ে স্নেহলতা ওপরে উঠলেন। কয়েক পা যেতেই ছোট্ট একখানা বাড়ি। তার মেঝে পাকা, চারধারে কঁ্যাচা বাঁশের রং-করা বেড়া, মাথায় নকশা-কাটা ঢেউটিনের চাল।

স্নেহলতা ডাকলেন, 'ভব—ভব—' ডেকে অবশ্য দাঁড়ালেন না, ভেতরে চলে এলেন।

ভবতোষ বেরিয়ে আসছিলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি খুড়িমা!'

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি।'

আরো কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন ভবতোষ, সুরমাদের দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'আসুন—আসুন। ঘরে চলুন—'

বিনু লক্ষ করল, ভবতোষের চোখ মুখ মলিন, দীপ্তিহীন। কপালে কালো কালো ছোপ পড়েছে। দাড়ি গোঁফ কতদিন যে কাটা হয় নি, অযত্নে অবহেলায় সেগুলো বেড়েই চলেছে। চেহারাও আগের চাইতে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। কৃশ, করুণ এবং অত্যন্ত অসহায় দেখাচ্ছে তাঁকে। কিছুটা কুঁজোও যেন হয়ে পড়েছেন, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটছেন। পরনে খদ্দরের ময়লা পাজামা আর পাঞ্জাবি।

একটা ঘরে এনে সবাইকে বসালেন ভবতোষ। আসবাব বলতে এখানে একটা খাট, তার ওপর নোংরা ধামসানো বিছানা। একধারে খনকতক চেয়ার, একটা টেবিল। আর চার-পাঁচটা আলমারি বোঝাই বই। বিনু শুনেছে, ভবতোষ এখানকার কলেজে পড়ান।

স্নেহলতা বললেন, 'সেই যে মেয়েটাকে দিয়ে এলে, তারপর আর দেখা নেই। ব্যাপারটা কী ?'

মৃদু গলায় ভবতোষ বললেন, 'দু'একদিনের ভেতর যাব যাব ভাবছিলাম।'

'আমরা এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।'

'বেশ করেছেন। কিন্তু—'

ভবতোষের মনের কথাটা যেন পড়তে পারলেন স্নেহলতা। বললেন, 'আমাদের জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা এক্ষুণি উঠব।'

ভবতোষ বললেন, 'আপনার জন্যে ভাবছি না। ওঁরা প্রথম দিন এলেন—'

স্নেহলতা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ওদের জন্যেও ভাবাভাবি করতে হবে না।' একটু থেমে আবার, 'চেহারাখানা তো চমৎকার দাঁড় করিয়ে ফেলেছ!'

ভবতোষ হাসলেন।

'খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখে তো মনে হয়, হচ্ছে না। রসিক সাহার বিধবা বউটা কাজ করছে?'

'করছিল। দু'দিন হল বেতকায় তার এক বোনের বাড়ি গেছে। থাকবে ক'দিন।'

'এ দু'দিন রান্নাবান্না করল কে?'

'আমিই করেছি।'

স্নেহলতা রেগে উঠলেন, 'আমরা কি মরে গিয়েছিলাম? আমাদের ওখানে চলে যেতে পার নি?'

ভবতোষ বললেন, 'ঝিনুককে দিয়ে এসেছি। তার ওপর আরো ঝঞ্ঝাট বাড়াতে ইচ্ছে হয় না।'

এবার এক কান্ড করে বসলেন স্নেহলতা। এমনিতে তাঁর স্বভাব খুব মৃদু, কোমল। জোরে কখনও কথা বলেন না, হাসেন না। এই মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন যেন। স্বভাববিরুদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন, 'পারব না, পারব না তোমার মেয়ের দায়িত্ব নিতে। ঝিনুক থাকল, আমরা চললাম।'

অজান্তে কোথাও আঘাত দিয়ে ফেলেছেন, নিমেষে বুঝতে পারলেন ভবতোষ। স্নেহলতার পা ছুঁয়ে বললেন, 'আমার অন্যায় হয়েচে খুড়িমা। কাল থেকে দু'বেলা আপনার কাছে গিয়ে খেয়ে আসব। আমাকে ক্ষমা করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতার সব রাগ, অভিমান শান্ত হয়ে গেল। স্নেহের সুরে বললেন, 'যতদিন রসিক সাহার বউ না আসছে আমার ওখানে খাবে।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপ।

তারপর স্নেহলতা বললেন, 'বৌমার কোনো খবর-টবর আর পেয়েছ?'

বিমর্ষ মুখে ভবতোষ বললেন, 'না।'

আবার কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন ভবতোষ, এই সময় ফিসফিস করে ঝিনুক বিনুকে ডাকল, 'এই—এই—'

বিনু খুব মনোযোগ দিয়ে ভবতোষের কথা শুনছিল। এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী বলছ?'

'চল, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

'কী?'

'চলই না।'

একরকম জোর করেই বিনুকে বাইরে নিয়ে এল ঝিনুক।

বিনু বলল, 'কী দেখাবে, দেখাও—'

'আগে আমাদের বাড়িটা দেখাব। তারপর—'

'তারপর?'

'সেই জিনিসটা।'

এ-ঘর, সে-ঘর, ফুলফলের ছোট্ট বাগান—সব দেখানো হলে একটা ছোট্ট ঘরে বিনুকে নিয়ে এল ঝিনুক। এখানে হাতল-ভাঙা সাইকেল, ছেঁড়া তোষক, ভাঙা আলুর পুতুল—সংসারের যাবতীয়

বাতিল জিনিস স্তূপীকৃত হয়ে আছে। আবর্জনার তলা থেকে ফ্রেমে-বাঁধানো একটা ফোটো বার করে আনলো ঝিনুক। ফোটোটা এক তরুণীর। বড় বড় চোখের পাতায়, ঠোঁটে হাসির আলো মাখানো। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঘের। গলায় প্রকাণ্ড লকেটওলা সীতাহার। কপালে সিঁদুরের টিপ।

ঝিনুক বলল, 'এই ফোটোটা আমি লুকিয়ে রেখেছি। বাবা জানতে পারলে বকবে।'

বিনু শুধলো, 'কার ফোটো এটা?'

'আমার মায়ের।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'মায়ের সব ফোটো বাবা ফেলে দিয়েছে। খালি এটা পারে নি।'

বিনু একদৃষ্টে ফোটোর দিকে তাকিয়ে ছিল, কিছু বলল না।

ঝিনুক আবার বলল, 'জানো, আমার মা চলে গেছে। আর কক্ষণো আসবে না।'

সান্ত্বনা দেবার মতন করে বিনু বলল, 'আসবে, আসবে—'

ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে ঝিনুক বলল, 'না না, কক্ষণো না—'

একসময় স্নেহলতার গলা ভেসে এল, 'বিনু, ঝিনুক, কোথায় গেলি রে তোরা?'

তাড়াতাড়ি ফোটোটা আবর্জনার তলায় ঢাকা দিয়ে বিনুকে নিয়ে বেরিয়ে এল ঝিনুক। স্নেহলতা ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। বললেন, 'চল চল, অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

নৌকোয় করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বার বার ঝিনুকের মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বিনুর। জলের দিকে তাকিয়ে, দু'ধারের পরিচিত দৃশ্যগুলির দিকে তাকিয়ে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে।

হঠাৎ সুরমার গলা শোনা গেল, 'ঐটা কিসের চূড়ো মামিমা?'

দূরমনস্কের মতন একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিনু, খানিকটা দূরে কিসের একটা ধারাল মাথা আকাশকে বিদ্ধ করে আছে।

স্নেহলতা বললেন, 'ওটা গির্জা, লালমোহন সাহেব ওখানে থাকে।'

লারমোরের কথা শুনেও খুব আগ্রহ বোধ করল না বিনু। ঝিনুকের মায়ের কথাই করুণ গানের কলির মতন ঘুরে ঘুরে তার মনের ভেতর হানা দিতে লাগল।

অমন সুন্দর স্নেহময় যাঁর চেহারা, তিনি কেমন করে ঝিনুককে ফেলে চলে গেলেন? হঠাৎ বিনুর মনে হল, তার মা-ও যদি এরকম তাকে ফেলে চলে যেতেন? পরক্ষণেই সে ভাবল, তার মা কখনই এমন নিষ্ঠুর হবেন না।

ঝিনুকের জন্য এতদিন দুঃখ বোধ করেছে বিনু, আজ অসীম মমতায় তার মন ভরে গেল।

দূর আকাশের পট থেকে গির্জার চূড়ো ততক্ষণে মুছে গেছে।

মহালয়ার পর থেকে দিনগুলো যেন পাখায় ভর করে উড়তে লাগল। দেখতে দেখতে চতুর্থী, পঞ্চমী, এমন কি ষষ্ঠীও পেরিয়ে গেল।

ক'দিন আগে হঠাৎ হঠাৎ ঢাক বেজে উঠত, সেটা ছিল মহড়া। এখন প্রায় সারাদিনই রাজদিয়ার আকাশ-বাতাস জুড়ে কখনও ঢিমে তালে, কখনও দ্রুতলয়ে ঢাকের শব্দ শোনা যায়। প্রতিমাগুলোর

অঙ্গরাগ-করবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মার্জনার পর ঘামতেল লাগিয়ে তাদের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। তারপর খুব যত্ন করে পরানো হয়েছে রঙিন পাটের শাড়ি আর জরির অলঙ্কার। মাথায় তাদের কারুকার্যময় মুকুট, হাতে গোছা গোছা চুড়ি কঙ্কণ এবং অঙ্গদ। নাকের পাটায় প্রকান্ড নথ, কানে কর্ণভূষণ, কণ্ঠ বেষ্টন করে চিক এবং সাতনহর হার। পায়ে মঞ্জীর। এ বেশ দেবীমূর্তিগুলির। কার্তিক এবং গণেশের চুড়ি কঙ্কণ নথ বা কণ্ঠবেষ্টণী নেই। তবে বীরবৌলি আছে।

পূর্ববাংলার প্রতিমাগুলি কলকাতার মতন নয়। কলকাতার বেশির ভাগ জায়গায় নকল পাহাড় বানিয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ এবং দুর্গাকে আলাদা আলাদা বসানো হয়। এখানকার সব মূর্তিই কিন্তু এক চালির ভেতর।

পেছনে নকশা-করা প্রকান্ড চালচিত্র। তার মাথায় মহাদেবের ছবি। সামনের দিকে প্রতিমা। পূর্ববাংলার মূর্তিগুলি বিরাট বিরাট, সাত-আট হাতের মতন লম্বা। বড় বড় বিশাল চোখ তাদের, সেদিকে তাকালে ভয়ও করে, ভক্তিও হয়।

রাজদিয়ায় এখনও বিজলি আলোর দাক্ষিণ্য এসে পৌঁছয় নি। কাজেই রাত্তিরবেলায় পুজোমণ্ডপগুলিতে হ্যাজাক কি ডে-লাইট জ্বলতে থাকে। ডাকের সাজে ঝলমলে দেবীমূর্তিগুলিকে তখন কি সুন্দরই না দেখায়।

সাতখানা তো মোটে প্রতিমা।

সেই এক-মেটে দু-মেটে তে-মেটের সময় থেকেই দেখে আসছে বিনু। তার চোখের সামনে মূর্তিগুলিতে রং লাগানো হল, রঙিন পাটের শাড়ি এবং ডাকের সাজ পরানো হল, চালচিত্র আঁকা হল।

কতবার দেখেছে, তবু বিস্ময় আর মুগ্ধতা যেন কিছুতেই কাটছে না বিনুর। পঞ্চমীর দিন প্রতিমাগুলিকে পুজোমন্ডপে আনবার পর থেকে বাড়িতে আর এক মুহূর্তেও থাকছে না সে, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখতে চলে আসছে।

আজ সপ্তমী।

আশ্বিনের শুরু থেকে ঝকমকে নীলাকাশ, নরম তুলোর মতন থোকা থোকা মেঘ, নদীতীরের কাশ ফুল, হলুদ বোঁটার মাথায় রাশি রাশি হাসিমুখ শিউলি, অল্প অল্প শিশির—যার জন্য এত আয়োজন তা যেন আজ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। সকাল থেকে ঢাকের শব্দে কান আর পাতা যায় না। রাজদিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে দত্তদের বাড়ি, বংশ পরম্পরায় সেখানে পুজো হয়ে আসছে। এবার তাদের পুজোর ঘটা কিছু বেশি। ঢাকা থেকে তারা ব্যান্ডপার্টি আনিয়েছে। চারদিকের ঢাকের শব্দের সঙ্গে ব্যান্ডপার্টির বাজনা মিশে আকাশ-বাতাস উৎসবময় হয়ে উঠেছে।

রাজদিয়ার কোনো মানুষই, বিশেষ করে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আজ আর বাড়িতে নেই। দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়েছে, মন্ডপে মন্ডপে ঘুরছে।

বিনুরা সারাদিন সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াল, বহুবার দেখা প্রতিমাগুলি আরো বহুবার দেখল। তারপর সন্ধের আগে আগে বাড়ি ফিরে এল।

বাড়িতে তখন সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। হেমনাথ, সুরমা, সুধা, সুনীতি, ঝিনুক, অবনীমোহন, স্নেহলতা, সবাই বেরুবার জন্য প্রায় প্রস্তুত। বিনুর জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন।

বিনুকে দেখে সকলে একসঙ্গে চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'কী ছেলে রে তুই! সেই পঞ্চমীর দিন থেকে দু'দন্ড যদি বাড়িতে পা পেতে বসছে!'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

বিনু বলল, 'ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম।'

'ঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর! দিন রাত খালি ঠাকুর—'

হেমনাথ সস্নেহে বললেন, 'পুজোর এই ক'টা দিনই তো। আহা, দেখুক দেখুক—'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না।

হেমনাথ এবার বিনুর দিকে ফিরলেন। এক পলক তাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'জামা-প্যান্টগুলো তো চটকে-মটকে নোংরা করে ফেলেছিস। শিগ্‌গির ওগুলো বদলে ভাল জামা-প্যান্ট পরে নে।'

বিনু বলল, 'কেন।'

'কেন আবার, আমাদের সঙ্গে যাবি।'

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বিনু, এক্ষুণি আর বেরুবার ইচ্ছা ছিল না তার। তবু বলল, 'কোথায় যাব তোমাদের সঙ্গে ?'

হেমনাথ বললেন, 'বা রে, তোর কিছুই দেখি মনে থাকে না দাদাভাই। আজ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য হবে না ?'

বিনুর মনে পড়ে গেল। আগে থেকেই ঠিক করা আছে সপ্তমীর দিন রাত্তিরবেলা হবে 'শ্যামা', অষ্টমীর রাত্রে 'বিজয়া'। স্টিমারঘাট পেরিয়ে সারি সারি মাছের আড়ত এবং বরফ-কল পেছনে ফেলে একটুখানি গেলেই রাজদিয়ার সব চাইতে বড় বারোয়ারি পুজো। সেখানেই নাটক-টাটকগুলো হবে। পঞ্চমীর দুপুর থেকে পুজোমন্ডপের সামনের মাঠে স্টেজ বাঁধা শুরু হয়েছিল, আজ সকালবেলা শেষ হয়েছে। হিরণই দলবল নিয়ে ওটা বেঁধেছে। নাটক নির্বাচন, রিহার্সাল, স্টেজ বাঁধা—সব কিছুর পেছনেই একটি মানুষ। সে হিরণ।

শাধু রিহার্সাল-টিহার্সালই না, রাজদিয়ার সদর রাস্তার দু'ধারে বড় বড় গাছগুলো রেহাই পায় নি। তাদের গায়ে কত যে রঙিন পোস্টার পড়েছে, হিসেব নেই। পোস্টারগুলোতে লেখা আছে:

আসুন আসুন, দলে দলে যোগদান করুন।

স্থানঃ রাজদিয়া বারোয়ারি পূজামন্ডপ।

সময়ঃ মহাসপ্তমী রাত্রি আটটা।

ও

মহাষ্টমী রাত্রি সাতটা।

বিষয় ঃ সপ্তমীর রাত্রে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য।

অষ্টমীর রাত্রে 'বিজয়া' নাটক।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ ঃ কলিকাতার নৃত্যগীত পটীয়সী শ্রীমতী সুধা ও শ্রীমতী সুনীতি বসু। (হেমকর্তার নাতনী)। তৎসহ আরো অনেকে।

এ সবই হিরণের কাজ। বিনু শুনেছে, শুধু রাজদিয়াতেই নয়, সুজনগঞ্জ-কমলাঘাট, ওদিকে বেতকা-আউটশাহী, সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে যাকে পেয়েছে তাকেই নিমন্ত্রণ করে এসেছে হিরণ। ফলে নৃত্যনাট্য এবং নাটকের ব্যাপারে চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে।

বিনুকে আর তাড়া দিতে হল না। এক ছুটে ঘরে গিয়ে জামা প্যান্ট বদলে তক্ষুণি ফিরে এল।

হেমনাথ বললেন, 'তা হলে এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

সবাই সায় দিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরি করে কী হবে।'

ঘরে ঘরে তালা লাগানো হল। পুজোর দিনে কেউ বাড়িতে বসে থাকবে, তা হয় না। তা ছাড়া নাটকের ব্যাপার আছে। সুধা-সুনীতি অভিনয় করবে, রাজ্যের মানুষ দেখবে আর যুগল-টুগলরা দেখতে পাবে না, তা কী করে হয় ? শখ-টখ তাদেরও তো আছে। কাজেই কাউকে আর বাদ দেন নি হেমনাথ, বাড়ি ফাঁকা করেই বেরিয়ে পড়েছেন।

রাস্তায় এসে কী মনে পড়তে তাড়াতাড়ি সুরমাকে ডাকলেন হেমনাথ, 'অ্যাই রমু, অ্যাই—'

'কী বলছ মামা ?' সুরমা তাকালেন।

'তুই কি হেঁটে হেঁটে অতখানি পথ যেতে পারবি ?'

'পারব।'

'অনেকখানি রাস্তা কিন্তু—'

'কতখানি আর, স্টিমারঘাটার কাছাকাছি তো?'

'খুব কাছাকাছি না, স্টিমারঘাটা পেরিয়ে বেশ খানিকটা। এক কাজ করি বরং—'

'কী?'

'সবাই নৌকোয় করে যাই।'

সুরমা জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'না মামা, নৌকোর দরকার নেই। রাজদিয়ায় এসে বেশ ভাল আছি। এই রাস্তাটুকু হেঁটেই যেতে পারব। তা ছাড়া—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ।

সুরমা বলতে লাগলেন, 'কতকাল দেশের পুজো দেখি না। নৌকোয় করে গেলে ঘুরে ঘুরে দেখতে পাব না।'

'তবে হেঁটেই চল।'

হইচই করতে করতে হেমনাথরা এগিয়ে চললেন। সবাই প্রায় কথা বলছে। হেমনাথ-সুধা-সুনীতি-অবনীমোনহ—সব্বাই। এলোমেলো, টুকরো-টুকরো, বিচ্ছিন্ন সব কথা। ফাঁকে ফাঁকে ফস করে আলো জ্বলে ওঠার মতন হাসি।

চলতে চলতে উঁচু গলায় হেমনাথ বললেন, 'তোদের নৃত্যনাট্য ক'টার সময় রে?'

সুধা বলল, 'আটটায়।'

'তা হলে তো ঢের সময় আছে। ঠাকুর-টাকুর দেখে ধীরে-সুস্থে গিয়ে পৌঁছুলেই হবে।'

'উঁহু উঁহু—'

'কী?'

'সাড়ে ছ'টার ভেতর না গেলে—'

'না গেলে কী?'

সুধা উত্তর দিল না। তার পাশ থেকে চোখের পাতা নাচাতে নাচাতে চাপা সকৌতুক গলায় সুনীতি বলে উঠল, 'হিরণবাবু একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।'

বিনু কাছেই ছিল। লক্ষ করল, সবার অগোচরে সুনীতিকে চোরা চিমটি কষাল সুধা।

সুনীতি আধফোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'উ-হু-হু-হু—'

হেমনাথ বললেন, 'কী হল রে?'

সুনীতি মুখ খুলবার আগেই সুধা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কিছু হয়নি দাদু।'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন হেমনাথ। বুঝতে চেষ্টা করলেন দুই বোনের ভেতর কিছু একটা চলছে—গভীর এবং গোপন। বললেন, 'কিছু হয় নি মানে? নিশ্চয় হয়েছে। সুনীতিদিদি কী যেন বলছিল, সাড়ে ছ'টার ভেতর না পৌঁছলে হিরণটার যেন কী হবে?'

সুধা হকচকিয়ে গেল। বিব্রত মুখে বলল, 'বা রে, হিরণবাবু কতবার করে দুপুরবেলা বলে গেলেন না, তুমি তো তখন শুনলে। সাড়ে ছ'টার ভেতর না গেলে কখনও হয়? মেক-আপ টেক-আপ নিতে সময় লাগবে না?'

'ঠিক ঠিক—' গম্ভীর চালে মাথা নাড়লেন হেমনাথ। কিন্তু তার ভেতর কোথায় একটা ধারাল কৌতুক কাঁটার মতন মাথা তুলে থাকল।

আরো কিছুটা যাবার পর হঠাৎ একটা গাছের দিকে আঙুল বাড়িয়ে হেমনাথ বললেন, 'দ্যাখ দ্যাখ—'

নাটক আর নৃত্যনাট্যের পোস্টারগুলোর দিকে সবার দৃষ্টি ফিরল। হেমনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই হিরণটার কাজ।'

বিনু এই সময় বলে উঠল, 'ছোটদি আর বড়দির নাম লেখা আছে, দেখেছ দাদু?'

'তা আর দেখি নি! ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ—' চারদিকের গাছগুলো বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ, আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেগুলো দেখাতে লাগলেন হেমনাথ। বলতে লাগলেন, 'চারদিকে সুধা-সুনীতির নামাবলী লাগিয়ে রেখেছে। হতচ্ছাড়াটার কান্ড দেখেছ!'

হতচ্ছাড়াটা কে সবাই বুঝতে পারল।

নিজের নামের দিকে তাকিয়ে সুধা-সুনীতি প্রথমে অবাক। তারপর চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'এ মা, আমাদের নাম এইরকম করে লিখে রেখেছে!'

হেমনাথ হাসলেন, 'ভালই তো করেছে, কেমন ফেমাস হয়ে গেছিস বল দেখি। তোদের দাদু হিসেবে আমিও বিখ্যাত হয়ে গেলাম।'

'হিরণবাবুর সঙ্গে একবার দেখা হোক না—'

এদিককার প্রতিমা দেখে স্টিমারঘাটের কাছে যখন হেমনাথরা পৌঁছুলেন, আশ্বিনের সন্ধে ধীর পায়ে নেমে আসতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই নদীপারের সারি সারি দোকানগুলিতে, স্টিমারঘাটায়, বরফ-কলে আলো জ্বলে উঠেছে। বেশির ভাগই গ্যাসবাতি, তবে হ্যাজাক এবং ডে লাইটও আছে। নদীর খাড়া পাড়ের তলায় নৌকোঘাটা। নৌকোগুলোতে মিটমিটে জোনাকির মতন হয় হারিকেন, নয়তো কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। চারদিকের এত আলো নদীর কালো জলে প্রতিফলিত হয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খেয়ে চলেছে।

হেমনাথ যতই ঠাট্টা-টাট্টা করুন, আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'তাড়াতাড়ি একটু পা চালাও সবাই। আর দেরি করলে সত্যি সত্যিই কিন্তু হিরণ ভিরমি খাবে।'

একটু পর বরফ-কল, মাছের আড়ত পেছনে ফেলে সবাই বারোয়ারী পুজোমন্ডপে এসে পড়ল।

সামনের দিকের খোলা মাঠটায় যেখানে বাঁশ-টাঁশ পুঁতে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি হয়েছে সেখানে ইতিমধ্যেই ভিড় জমতে শুরু করেছে। দূরদূরান্ত থেকে হারিকেন ঝুলিয়ে দলে দলে আরো অনেক লোক আসছে। তাদের বেশির ভাগই জেলে-মাঝি, চাষী-কৃষাণ ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ। একধারে, খানকতক চেয়ার পাতা। সেগুলো রাজদিয়ার সম্ভ্রান্ত মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট। দেখা গেল দত্তবাড়ি, মল্লিকবাড়ি, গুহবাড়ি, সোমেদের বাড়ি—এমনি নানা বাড়ি থেকে বৌ-ঝিরা সেজেগুজে এসে চেয়ার দখল করে বসেছে। এমন কি রুমা-ঝুমারাও এসে গেছে। আনন্দ-স্মৃতিরেখা- শিশিরকেও দেখা গেল।

চারধারে খুঁটি পুঁতে সেগুলোর মাথায় হ্যাজাক টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা হ্যাজাকের তলায় দলবল নিয়ে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে ছিল হিরণ আর বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। হেমনাথদের দেখতে পেয়ে ছুটে এল। স্বস্তির সঙ্গে খানিক অনুযোগ মিশিয়ে বলল, 'আসতে পারলেন তা হলে!'

হেমনাথ বললেন, 'পারলাম।'

'ক'টার সময় আসবার কথা ছিল?'

'সাড়ে ছ'টায়।'

'এখন ক'টা বাজে বলুন তো?'

'সাড়ে ছ'টা।'

'মোটেও না। সাতটা বেজে গেছে।'

'আধ ঘণ্টার জন্যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।' বলেই আরো কাছে এসে খুব মনোযোগ দিয়ে হিরণকে দেখতে লাগলেন হেমনাথ।

হিরণ অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, 'কী দেখছেন অমন করে?'

'তোকে।'

'আমাকে যেন আগে আর কখনও দেখেন নি?'

'সে দেখা নয়।'

'তবে?'

'দেখছি তুই ভিরমি খেয়েছিস কিনা—' আড়ে আড়ে সুধা-সুনীতির দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'সুধাদিদি—সুনীতিদিদি বলছিল—'

অন্যমনস্কের মতন হিরণ শুধলো, 'কী বলছিলেন ওঁরা?'

'সাড়ে ছ'টার ভেতরে আমরা না এলে তুই অজ্ঞান হয়ে যাবি।'

লক্ষ্যভেদ যেখানে হবার সেখানে ঠিকই হল। হেমনাথকে চোরা চোখের অগ্নিবাণে বিদ্ধ করে দ্রুত অন্যদিকে মুখ ফেরাল সুধা, সুনীতি ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

নেপথ্যে কী আছে, কোন গভীর সঙ্গোপন কৌতুক, অতশত জানে না হিরণ। জানবার কথাও নয়। একটু খেয়াল করলে হেমনাথের চোখেমুখে কিছু একটা ষড়যন্ত্র অনায়াসেই ধরে ফেলতে পারত সে, অন্তত তার আভাস পেত। কিন্তু সে সব লক্ষ করবার সময় এখন নেই। ব্যস্তভাবে হিরণ বলল, 'আরেকটু দেরি করলে সত্যিই ভিরমি খেতাম। আটটায় শো আরম্ভ করার কথা। ঠিক সময় আরম্ভ করতে না পারলে—'

'না পারলে কী?'

এ ধারের জনতাকে দেখিয়ে হিরণ বলল, 'ওরা আমার গর্দান নেবে।'

লঘু সুরে হেমনাথ বলল, 'হ্যাঁ, ওরা তো ঘণ্টা-সেকেণ্ড মিলিয়ে চলে! আটটার এক মিনিট দেরি হলে বাবুদের সম্পত্তি নীলাম চড়ে যাবে।'

হিরণ আর কথা বাড়াল না। ব্যস্তভাবে বলল, 'আসুন, আসুন'—সবাইকে নিয়ে স্টেজের পেছন দিকে গ্রীনরুমে চলে গেল সে।'

স্টেজের মতন গ্রীনরুমটা অস্থায়ী। সেখানে আরো ক'টি ছেলেমেয়েকে দেখা গেল। যেমন দত্তদের বাড়ির যমুনা, সোমেদের বাড়ির লতিকা, গুহদের বাড়ির মাধুরী। রুমাও কখন চলে এসেছে এখানে। ছেলেদের মধ্যে আছে আচার্যবাড়ির নরেন, সেনেদের বাড়ির শৈলেন, এমনি আরো অনেকে। সবাই এরা কলকাতা-প্রবাসী, পুজোর ছুটিতে রাজদিয়া বেড়াতে এসেছে। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে কারো ভূমিকা নর্তকীর, কারো গায়কের।

সমস্ত কান্ডখানা যার নির্দেশে চলছে সে হিরণ। যারা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে নাচবে-গাইবে, তারা বাদে বাকি সবাইকে তাড়া দিয়ে স্টেজের সামনের দিকে পাঠিয়ে দিল সে। তারপর নাচিয়ে-গাইয়েদের বলল, 'আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি সবাই রেডি হয়ে নিন।'

আজকের নৃত্যনাট্যে বিনুর কোনো ভূমিকা নেই। কালকের 'বিজয়া' নাটক থেকেও তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দিনকয়েক রিহার্সালের পর দেখা গেছে তার অভিনয় ঠিক হচ্ছে না। যাই হোক, হিরণের তাড়া সত্ত্বেও সে গ্রীনরুম থেকে যায় নি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল, সুধা-সুনীতি হিরণকে ঘিরে ধরেছে। সুধা বলল, 'এটা কিরকম হল?'

তার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠল হিরণ। বলল, 'কোনটা?'

এতক্ষণ হেমনাথরা ছিলেন, তাই সুযোগ পাওয়া যায় নি। পাওয়া মাত্র সুধারা আক্রমণ করে বসেছে।

সুধা বলল, 'ঐ যে গাছে গাছে আমাদের নামে বিজ্ঞাপন লাগিয়েছেন—'

ঢোক গিলে হিরণ বলল, 'ভালই তো হয়েছে। দেশসুদ্ধু লোক একদিনে আপনাদের চিনে ফেলবে।'

রাতারাতি বিখ্যাত হবাব কথা হেমনাথও বলেছিলেন। সুধা বলল, 'খুব অন্যায় করেছেন। আমাদের বুঝি লজ্জা করে না?'

'কিসের লজ্জা?'

এবার সুনীতি বলল, 'বা রে, আমরা দু'বোনেই শুধু অভিনয়-টভিনয় করছি নাকি? আরো অনেকেই করছে। তাদের নাম কোথায়? লোকে কী বলবে জানেন?'

'কী?' হিরণ তাকাল।

'আমাদের ব্যাপারে আপনার পক্ষপাতিত্ব আছে।' বলতে বলতে সুনীতির মাথায় হঠাৎ দুষ্টমি ভর করল। আড়চোখে বোনকে একবার দেখে নিয়ে সে বলতে লাগল, 'সুধার নামটা রেখে আমার নামটা বাদ দিলে পারতেন।'

সুধা এমনভাবে সুনীতির দিকে তাকাল, যেন ভস্মই করে ফেলবে।

দুই বোনের ভেতর কী হয়ে গেল, হিরণ খেয়াল করে নি। চিন্তাগ্রস্তের মতন সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। যারা যারা অভিনয় করছে কালই তাদের নাম দিয়ে নতুন পোস্টার লাগাব।'

এই সময় সুধা বলল, 'আগেভাগে নাম দিয়ে আমাদের ভারি বিপদে ফেলে দিয়েছেন। এটা ভারি অন্যায়।'

হিরণ ভীরু সংশয়ের চোখে তাকাল। আক্রমণটা আবার কোন দিক থেকে আসছে সে বুঝতে পারল না।

সুধা বলল, 'আমাদের নামে অত ঢাক পিটিয়েছেন, লোকে ভাবছে না জানি আমরা কী ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়ে। যখন সত্যি সত্যি নাচতে গাইতে দেখবে ঠিক ঢিল ছুঁড়বে। আমার বুক ঢিব-ঢিব করছে।'

শো আরম্ভ হবার সময় হয়ে আসছে। মনে মনে বুঝিবা অস্থির হয়ে উঠল হিরণ। তাড়াতাড়ি সে বলল, 'ঢিল ছুঁড়বে কি ফুল ছুঁড়বে, দেখা যাবে'খন। যান যান, শিগ্‌গির মেক-আপ নিয়ে নিন।'

একটু দূরে দত্তবাড়ির যমুনা বসে ছিল। সুধাদের আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে হিরণ তার দিকে ছুটল। মনে হল পালিয়েই যেন গেল সে।

তাকিয়ে তাকিয়ে একটু দেখল সুধা, আজকের নৃত্যনাট্যের ব্যাপারে খুব মনোযোগ দিয়ে যমুনাকে তালিম দিচ্ছে হিরণ। এখন কোনোদিকে তার নজর নেই। মৃদু হাসল সুধা। সে জানে শেষ মুহূর্তে এত তালিমের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনটা কেন, তার অজানা নয়।

হিরণ যমুনাকে নিয়ে ব্যস্ত। অগত্যা সুধা আর কী করে? সাজসজ্জায় মন দিল সে। 'শ্যামা' নাটকে নামভূমিকা তার। সুনীতির মেক-আপের দরকার নেই, সে নেপথ্যে বসে গান গাইবে।

এদিকে চঞ্চল পায়ে আরো কিছুক্ষণ গ্রীনরুমে ঘোরাঘুরি করল বিনু। তারপর পাখির মতন ফুড়ুত করে স্টেজের সামনে চলে এল।

ইতিমধ্যে ভিড় আরো বেড়েছে। একটা চেয়ারও আর খালি পড়ে নেই। ভিড়ের প্রতিটি মানুষ কথা বলছে, ফলে চারদিক জুড়ে গুঞ্জন উঠছে।

স্টেজের তলায় এত ভিড় যে একটুও জায়গা নেই। চারধার থেকে জনতা চাপ বেঁধে স্টেজটাকে ঘিরে ধরে আছে।

কোথায় বসবে, কোথায় বসলে ভাল করে দেখা যাবে, ঠিক করতে পারল না বিনু। এদিকে-সেদিকে হতাশভাবে তাকাচ্ছিল সে, হঠাৎ একটা গলা কানে ভেসে এল, 'বিনুদা, অ্যাই বিনুদা—'

মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনু দেখতে লাগল। গলাটা আবার শোনা গেল, 'এই যে, এখানে—'

এবারে দেখতে পাওয়া গেল, স্টেজের ঠিক তলায় বসে আছে ঝুমা। চোখাচোখি হতেই সে হাতছানি দিল।

বিনু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'যাব কি করে? এত ভিড়!'

ঝুমাটা আস্ত ডাকাত। সে পরিচয় আগেও পেয়েছে বিনু, আজও আরেক বার পেল। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে একে সরিয়ে, ওকে ধাক্কা মেরে, তাকে কাত করে একটা রাজপথ বানিয়ে ফেলল সে।

প্রথমটা বিনু বিমূঢ়। তারপর পায়ের সামনে একটা রাস্তা পেয়ে গেলে কে আর দাঁড়িয়ে থাকে?

চোখের পলকে ঝুমার কাছে গিয়ে বসে পড়ল সে।

বিনু বসবার পর ঝুমাও বসল। চারদিকে হইচই চেঁচামেচি চলছে। সে সব ছাপিয়ে ঝুমার গলা উঠল, 'তুমি একটি হাবা গঙ্গারাম—'

এমন একটি সম্ভাষণে খুশি হবার কথা নয়। রাগের গলায় বিনু বলল, 'হাবা-টাবা বলবে না।'

'নিশ্চয় বলব। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে না! কী করে রাস্তা করে নিতে হয় বুঝেছ?'

অপ্রসন্ন মুখে মাথা নাড়ল বিনু, অর্থাৎ বুঝেছে।

একটু চুপ। তারপর ঝুমা আবার বলল, 'তুমি বড্ড মিথ্যেবাদী।'

বিনু হকচকিয়ে গেল, 'কেন?'

'সেদিন বললে আমাদের বাড়ি যাবে, খুব গেলে তো!'

বিনু মনে মনে বানিয়ে নিয়ে বলল, 'একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

'খালি খালি তুমি ভুলে যাও। সেবারও গেলে না, এবারও এলে না।' ঝুমা বলতে লাগল, 'একা একা আমাদের বাড়ি আসতে ভয় করে নাকি?'

ভয়ের কথাটা আরেক দিনও বলেছিল ঝুমা। বীরের মতন মুখ করে বিনু বলল, 'মোটেও না। একা একা আমি সব জায়গায় যেতে পারি আজকাল। দেখবে কালই তোমাদের বাড়ি চলে গেছি।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

ঝুমা আবার কি বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় পর্দা সরে গিয়ে নৃত্যনাট্য শুরু হয়ে গেল। শ্যামা, উত্তীয়, বজ্রসেন, কোটাল, শ্যামার সহচরীরা—দৃশ্যের পর দৃশ্যে মনোহর নৃত্যভঙ্গিমায় সবাই এক রমণীর স্বপ্নলোক সৃষ্টি করতে লাগল। নেপথ্যে বসে গাইছে সুনীতিরা। নাচ আর গান, একই তালে একই সুচারু ছন্দ চলছে। অগণিত মানুষ আচ্ছন্নের মতন পলকহীন তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে দর্শকদের মধ্যে থেকে মুগ্ধ কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসছে 'কোন দুইজন হ্যামকত্তার নাতনী?'

আরেক জন বলল, 'কে বা জানে!'

'কইলকাত্তার মাইয়ারা কিবা নাচে!'

'হ।'

'কিবা গীত গায়।'

'হ।'

একসময় নৃত্যনাট্য শেষ। দূরদূরান্তের দর্শকরা চলে যেতে লাগল। ভিড় পাতলা হলে বিনু আর ঝুমা গ্রীনরুমের দিকে ছুটল। সেখানে আসতেই পেছন দিকের নিরালা অন্ধকারে একটা নিভৃত দৃশ্য চোখে পড়ে গেল।

গ্রীনরুমের ডানদিকে ছোটোখাটো ঝোপের মতন। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। দূরে একটা হ্যাজাক জ্বলছে, তার আলো এখানে এসে পৌঁছয়নি। ফলে আবছা অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে আছে।

ঝোপের গা ঘেঁসে হিরণ এবং সুধা দাঁড়িয়ে ছিল। বিনুরা ছুটে আসতে আসতে তাদের দেখে থমকে গেল।

হিরণ বলছিল, 'তখন তো খুব বলেছিলেন, আপনার নাচ দেখলে লোকে ঢিল ছুঁড়বে। এখন?'

সুধা ঠোঁট টিপে গরবিনীর মতন হাসল। উজ্জ্বল চোখে এক পলক হিরণকে দেখে নিয়ে বলল, 'এখন কী?'

'সবাই আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছে।'

কপট ভয়ের গলায় সুধা বলল, 'ও মা, কেন?'

একটু রহস্য করে হিরণ বলল, 'কেন, আপনিই ভেবে দেখুন।'

'আমি ভাবতে পারছি না।'

'তবে আমিই বলি। তারা একবার খালি আপনাকে দেখতে চায়। রাজদিয়ার লোক একেবারে পাগলা হয়ে গেছে।'

'নাকি?'

'ইয়েস।'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এবার বেশ কিছুক্ষণ হিরণকে দেখল সুধা। চতুর সুরে বলল, 'আর আপনি?'

'আমি?' ঘন আবেগের গলায় হিরণ বলতে লাগল, 'আমিও ম্যাড, বুঝলেন? এমন নাচ আগে আর কখনও দেখি নি।'

খুব আস্তে করে সুধা বলল, 'দেখবেন বেশি ম্যাড-ট্যাড হবেন না। তাতে বিপদ আছে।'

হিরণ শুনতে পেল কিনা, কে জানে। বলল, 'আমার কী ইচ্ছে জানেন?'

মুখ তুলে সুধা বলল, 'কী?'

'বললে আপনি হাসবেন।'

'হাসার মতন কিছু করবেন নাকি?'

'আগে শুনুন না—'

'আচ্ছা বলুন।'

হিরণ বলল, 'ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে মাথায় তুলে সারা রাজদিয়া এক পাক ঘুরে আসি।'

দুই চোখ কপালে তুলে সুধা বলল, 'দৃশ্যটা কিন্তু—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল।

'দৃশ্যটা কী?'

'খুব মনোরম হবে না।'

'না হোক।'

'তা ছাড়া—'

'আবার কী?'

ঘাড় বাঁকিয়ে সুধা বলল, 'একটু আগে যা বলছিলেন তার লক্ষণ কিন্তু দেখা দিয়েছে। খুব সাবধান।'

কপাল কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল হিরণ। পরে বলল, 'অর্থাৎ পাগলামির?'

'ইয়েস স্যার।'

'দিক দেখা—' সুধার কাছে আরেকটু নিবিড় হয়ে এল হিরণ। গাঢ় গলায় ডাকল, 'সুধা—'

একটু দূরে বিনু আর ঝুমা দাঁড়িয়ে ছিল। ঝুমা ফিসফিস করে ডাকল, 'এই বিনুদা—'

বিনু মুখ ফেরাল।

ঝুমা বলল, 'ওরা কারা? সুধাদি আর হিরণদা?'

অন্যমনস্কের মতন বিনু বলল, 'হুঁ। কী করছে?'

সুধার কাছে হিরণ যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে এল তখন থেকেই বিনুর মনে হচ্ছে, কেন হচ্ছে কে জানে, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। সে বলল, 'কী করছে, কে জানে। চল—'

ঝুমাকে নিয়ে ঝোপের ওধারে যেতেই আবার সেই দৃশ্য, অবিকল একরকম। তবে পাত্র-পাত্রী আলাদা। ওখানে ছিল সুধা-হিরণ। এখানে আনন্দ-সুনীতি। বিনুরা আগের মতন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চাপা আবেগপূর্ণ গলায় আনন্দ বলছিল, 'আপনার মতো গাইতে আর কাউকে শুনি নি। মানুষ যে এমন গাইতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।'

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে নাচের ভূমিকা ছিল না সুনীতির, নেপথ্যে বসে সে গেয়েছিল। যাই হোক সুনীতি লজ্জা পেয়ে গেল, মনে মনে খুশিও। আনন্দকে এক পলক দেখে নিয়ে বিচিত্র লীলাভরে বলল, 'ছাই গাইতে জানি।'

আনন্দ এবার কিছু বলল না, সুনুতির কাছে আরেকটু এগিয়ে গেল।

বিনুর পাশ থেকে ঝুমা বলল, 'আমার মামা আর তোমার দিদি!'

বিনু ঘাড় কাত করল, 'হুঁ—'

'অন্ধকারে ওরা কী করছে?'

'কে জানে।'

আরো কিছুক্ষণ পর সবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল বিনু। আগে আগে ছিলেন হেমনাথ, অবনীমোহন, সুরমা, স্নেহলতা। মাঝখানে বিনু, ঝিনুক, গৌরদাসী এবং উমা। একেবারে পেছনে সুধা-সুনীতি-যুগলরা।

সবাই প্রায় কথা বলছে। আজকের নৃত্যনাট্যে কার ভূমিকা কিরকম হল, কে কেমন নাচল, কেমন গাইল—তারই রসালো আলোচনা চলছে। ফাঁকে ফাঁকে লঘু পরিহাস, উচ্ছ্বাসময় সকৌতুক হাসি।

নদীপারের পথ দিয়ে অন্যমনস্কের মতন হাঁটছিল বিনু। বরফ-কল, সারি সারি মাছের আড়ত, স্টিমারঘাটা, কাঁচা বাঁশের বেড়ায় ছাওয়া মিষ্টির দোকানগুলো একে একে পেরিয়ে এসে এখন তারা বাঁকের মুখে। রাস্তাটা এখান থেকেই বাঁ দিকে ঘুরেছে। পথের দু'ধারের কোনো ছবি বিনুর চোখে পড়ছিল না। হেমনাথের হাসাহাসি, ঠাট্টা-টাট্টা কিংবা কণ্ঠস্বরও সে শুনতে পাচ্ছিল না। ঘুরে ঘুরে গ্রীনরুমের নিরালা ঝোপের অন্ধকারে সেই নিভৃত দৃশ্য দু'টি চোখে ভেসে উঠছে। বার বার বিনুর মনে হচ্ছিল, সুধা-সুনীতির কাছে হিরণ আর আনন্দ যেন দুটো মুগ্ধ, লোভী পতঙ্গ।

সুধা-সুনীতি মোটামুটি ভালই নাচে, ভালই গায়। কিন্তু তারা যে এমনই নিপুণা কলাবতী, সে-কথা আনন্দ-হিরণ গদগদ আবেগের গলায় না বললে কোনোদিনই জানতে পারত না বিনু।

নদীর বাঁক পেছনে ফেলে আরো অনেক দূর চলে এসেছে বিনুরা। সামনেই সেই কাঠের পুলটা। দু'ধারে গাছপালা-বনানীর ভেতর থোকা থোকা অন্ধকার জমে আছে, আর আছে জোনাকিরা। সপ্তমীর রাত্রিটাকে বিঁধে বিঁধে আলোর পোকাগুলো একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। জ্বলা আর নেভার এই খেলা চলছে সেই সন্ধে থেকে। যতক্ষণ অন্ধকার আছে, এই খেলাও আছে।

হঠাৎ চাপা গলায় ঝিনুক ডেকে উঠল, 'বিনুদা—'

সুধা-সুনীতি হিরণ-আনন্দর কথা ভাবতে ভাবতে সব ভুলে গিয়েছিল বিনু। চমকে ঝোপঝাড় জোনাকির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল। বলল, 'ডাকছ কেন?'

আগের গলায় ঝিনুক বলল, 'তোমার ওপর আমি রাগ করেছি।'

'কেন।'

'তখন তোমায় অত করে ডাকলাম, তুমি শুনতেই পেলে না।'

'কখন আবার ডাকলে!' বিনু সত্যি সত্যিই অবাক। দু চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে অন্ধকারে সে তাকিয়ে থাকল।

'ঐ যে যখন নাচ-গান হচ্ছিল—'

'তাই নাকি!'

'হুঁ—'ঝিনুক ঘাড় কাত করল, 'আমি তোমার জন্যে জায়গা রেখে কত ডাকাডাকি করলাম আর

তুমি কিনা ঝুমার কাছে গিয়ে বসলে!'

বিনু অবাক হয়েই ছিল। তার বিস্ময় আরো বাড়ল, 'আমার জন্যে কোথায় জায়গা রেখেছিলে?'

'চেয়ারে।'

'সত্যি তোমাকে আমি দেখতে পাইনি, তোমার ডাকও শুনতে পাইনি।'

হিংসের গলায় ঝিনুক বলল, 'ঝুমাকে ঠিক দেখতে পেয়েছিলে, ঝুমার ডাক ঠিক শুনতে পেয়েছিলে।'

বিনু আর কিছু বলল না। দেখতে পেল, অন্ধকারে জাপানি পুতুলের মতন মেয়েটার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

পরের দিন অর্থাৎ অষ্টমীর রাত্তিরে 'বিজয়া' নাটক।

আজ আসর আরো জমজমাট। সন্ধের আগে থেকেই পুজোমণ্ডপের স্টেজটাকে ঘিরে যেন মেলা বসে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে—কোথায় বেতকা, কোথায় পাইকপাড়া, কোথায় কাজির পাগলা আর কোথায় মীরকাদিম—নৌকোয় করে দলে দলে লোক আসছে তো আসছেই। তা ছাড়া রাজদিয়ার মানুষ তো আছেই। আজ আর এ শহরের কেউ বুঝি বাড়ি বসে নেই। পুজোমণ্ডপের স্টেজটা হাতছানি দিয়ে তাদের ঘরের বার করে এনেছে।

শিশির-স্মৃতিরেখা-আনন্দরা তো এসেছেই, আজ রামকেশবকেও দেখা গেল। অধর সাহা, ভবতোষ—কে না এসেছেন! এমন কি লারমোরও বাদ নেই। কাল অবশ্য তাঁকে দেখা যায়নি।

কালকের মতন রাত করে হেমনাথরা আজ আসেননি, বেলা থাকতে থাকতেই এসে পড়েছেন। স্টেজের কাছাকাছি আসতেই লারমোরের সঙ্গে দেখা।

সবার আগে ছিলেন অবনীমোহন, একেবারে তোপের মুখে পড়ে গেলেন। লারমোর বললেন, 'এই যে অবনী, এর মানেটা কী?'

অবনীমোহন হকচকিয়ে গেলেন, 'আজ্ঞে—'

হেমনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন, ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলেন।

লারমোর বললেন, 'সপ্তমীর দিন আমার ওখানে তোমাদের যাবার কথা ছিল না?'

অবনীমোহন অপ্রস্তুত। বিব্রত লজ্জিত মুখে বললেন, 'একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কেউ আমায় মনেও করিয়ে দেয়নি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন লালমোহনমামা।

ক্ষুব্ধ গলায় লারমোর বললেন, 'সপ্তমীর দিন সকাল থেকে পথের দিকে চেয়ে আছি, এই আসো আসো, শেষ পর্যন্ত এলে আর না। ওদিকে কত মাছটাছ যোগাড় করেছিলাম—'

এতক্ষণে হেমনাথ কথা বললেন, 'সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আজ তো অষ্টমী। দশমীর পরদিন অবনীরা তোমার ওখানে যাবে, আমি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

'ঠিক তো? আবার ভুলে যাবে না?'

'না না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

কালকের মতন হিরণরা স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল না। গ্রীনরুমে ছিল। হেমনাথদের আসার খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল। সুধা-সুনীতি-অবনীমোহন বাদে সবাইকে দর্শকদের চেয়ারে বসিয়ে বলল, 'আপনারা বসুন, আমি আমার আর্টিস্টদের নিয়ে যাচ্ছি।'

স্নেহলতা বললেন, 'আজ তোদের প্লে কখন শুরু হচ্ছে?'

'তাড়াতাড়িই। সাতটার ভেতর।'

'শেষ ক'টায়?'

'সাড়ে দশটা-এগারটা হবে।'

'সে তো মাঝ রাত।'

হিরণ হাসল, 'অতবড় বই, তার আগে কী করে শেষ করব!' বলে আর দাঁড়াল না। সুধা-সুনীতিদের নিয়ে সাজঘরের দিকে চলে গেল। হেমনাথরা বসে বসে গল্প করতে লাগলেন।

হেমনাথ শুধোলেন, 'কাল নৃত্যনাট্য দেখতে এসেছিলে লালমোহন?'

লারমোর বললেন, 'না।'

'জিনিসটা চমৎকার হয়েছিল।'

'শুনলাম। সুধাদিদি নাকি খুব নেচেছে?'

'হ্যাঁ। সুনীতি আর রুমা দারুণ গেয়েছে।'

'তাও শুনেছি। শুনে আর লোভ সামলাতে পারি নি, আজ ছুটে এসেছি।'

ওধারে রামকেশব বসে ছিলেন। বললেন, 'কাল আমিও আসি নি। আজ আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না।'

স্নেহলতা বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলো যা কান্ড করছে! এমন আনন্দের ব্যাপার রাজদিয়াতে আর কখনও হয় নি। আমার মাথায় যে অতবড় সংসার, আমিও কি বাড়ি বসে থাকতে পেরেছি? দু'দিন ধরে নাচতে নাচতে চলে আসছি।'

এদিকে আরো একটা মজার খেলা চলছিল। আজ আর সাজঘর কি স্টেজের কাছে ঘোরাঘুরি করতে পারে নি বিনু। প্রথম থেকেই ঝিনুক নিজের কাছে তাকে বসিয়ে রেখেছে। একটু দূরে স্টেজের ঠিক তলায় কালকের মতন বসে ছিল ঝুমা, সমানে বিনুকে ডাকডাকি করছে সে আর হাতছানি দিচ্ছে, 'বিনুদা বিনুদা—এখানে এস। তোমার জন্যে জায়গা রেখেছি।'

স্টেজের খুব কাছে বসে নাটক দেখতে ভারি লোভ হচ্ছিল বিনুর। সে উঠতে যাচ্ছিল, চাপা গলায় ঝিনুক বলল, 'তুমি যাবে না।'

চোখ কুঁচকে বিনু বলল, 'কেন?'

'কাল তুমি ওখানে বসেছ, আজ এখানে বসবে।'

দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে বিনু বলল, 'আমি এখানে বসব না। এখান থেকে ভাল দেখা যায় না।'

ঝিনুক বলল, 'ওখানে গেলে সেই কথাটা তোমার মাকে বলে দেব।'

'কোন কথাটা?'

'সেই যে জলে ডুবে গিয়েছিলে।'

বার বার একই অস্ত্র দেখিয়ে মেয়েটা তাকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখবে, তা তো হতে পারে না। হাত-পা ছুঁড়ে বিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'বল গে। আমি তোমার কাছে কিছুতেই বসব না।' বলল বটে বসবে না, কিন্তু বসেই থাকল।

হিরণ বলেছিল, সাতটার ভেতর নাটক শুরু করবে। আরম্ভ করতে করতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। শেষ হল বারটায়।

'বিজয়া' নাটকে বিজয়া-র ভূমিকায় অভিনয় করেছে সুধা, হিরণ করেছে নরেনের রোল। সুনীতি হয়েছে নলিনী, অবনীমোহন দয়াল। সবার অভিনয়ই চমৎকার। দু'তিন হাজার লোক মুগ্ধ হয়ে দেখেছে।

নাটক শেষ হলে হেমনাথরা বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন, রামকেশব ফিরতে দিলেন না। বললেন, 'এত রাত্তিরে আর ফিরতে হবে না হেমদাদা। ভোর হতে কতক্ষণই বা বাকি! এই ক'ঘণ্টা আমার ওখানেই থেকে যান।'

হেমনাথ বললেন, 'কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু না।'

'বাড়িটা যে খালি পড়ে থাকবে।'

'রাজদিয়ার হেমকর্তার বাড়িতে চোর আসবে না। ধনদৌলত, সোনাদানা উঠোনে ফেলে রাখলে

কেউ সেদিকে তাকাবে না। আপনি আসুন তো।'

একরকম জোর করেই হেমনাথদের নিজের বাড়ি নিয়ে তুললেন রামকেশব। তারপর হই হই করতে করতে রান্নাবান্না খাওয়া। খাওয়ার পালা চুকতেই শোবার ব্যবস্থা হল। দোতলার ঘরে ঘরে ঢালা বিছানা পড়ল।

বিনুরা এসেছে, তাদের বাড়ি রাত্তিরে থাকবে। ঝুমা ভারি খুশি। সে বলল, 'চল, আমরা ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।'

বিনু বলল, 'চল।'

ঝিনুকটা আশেপাশে কোথায় ছিল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

ঝুমার তাতে আপত্তি নেই, 'এস না।'

তিনজনে দোতলায় এসে ঢালা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মাথার দিকের জানালাগুলো খোলা। সেখানে সারি সারি সুপারিগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে, আশ্বিনের এলোমেলো বাতাস পাতার ভেতর খেলে বেড়াচ্ছে। এই মধ্যরাতে আকাশের মাঝখানে চাঁদ দেখা দিয়েছে। আবছা আলোয় সুপারিগাছের ছায়া এসে পড়েছে ঘরে। ওধারে কোথায় যেন শিউলি ফুটেছে, তার গন্ধে বাতাস আকুল।

পাশাপাশি শুয়ে কত কথা যে বলছে ঝুমা। আবোল-তাবোল হাজার রকমের গল্প। বিনুও সমানে বকবক করে যাচ্ছে। ঝিনুক কিন্তু একেবারে চুপ।

গল্প করতে করতে একসময় বিনু আর ঝুমার গলা জড়িয়ে এল। গাঢ় গভীর ঘুম সরোবর হয়ে তাদের যেন অতলে টানতে লাগল।

বিনুরা প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ শিয়রের দিক থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু—ছুটোবাবু—'

প্রথমে আবছাভাবে কানে এসেছিল। তারপরেই চট করে ঘুমটা ভেঙে গেল বিনুর। চমকে মাথার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, সব চাইতে কাছের সুপারি গাছটায় কেউ বসে আছে। ভয় পেয়ে কাঁপা গলায় বিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'কে। কে ওখানে?'

ইতিমধ্যে ঝুমাও উঠে পড়েছে। ঝিনুকের কিন্তু নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। বিছানার একধারে অসাড় পড়ে আছে সে।

সুপারি গাছে চড়ে দোতলা পর্যন্ত যে উঠেছে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি যুগলা। ডর নি পাইছেন ছুটোবাবু?'

ভয় সত্যিই পেয়েছিল বিনু। যুগলের কথায় উত্তর না দিয়ে সে বলল, 'তুমিও ওখানে উঠেছ কেন?'

'আপনার লেইগা—'

'আমার জন্যে!' বিনু অবাক।

'হ।' অন্ধকারে মাথা নাড়ল যুগল।

'কেন?'

'আপনেরে একখান কথা দিছিলাম, মনে আছে?'

'কী কথা?'

'ছুটোবাবুর কিছুই মনে থাকে না। কইছিলাম না, পূজার সোমায় আপনেরে যাত্রা দেখামু।'

এইবার মনে পড়ে গেল। উৎসাহের গলায় বিনু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু দেখালে না তো।'

'হেই লেইগাই তো দুফার রাইতে গাছ বাইয়া আপনারে ডাকতে আইছি। আইজ সুজনগুঞ্জে ভাল পালা আছে। যাইবেন?'

প্রস্তাবটা লোভনীয়। কিন্তু যাবার পথে যে হাজার কাঁটা ছড়ানো। বাবা-মা এত রাত্তিরে কিছুতেই

যেতে দেবেন না। অথচ সুদূর সুজনগঞ্জ থেকে আলোকোজ্জ্বল যাত্রার আসরটা তাকে অবিরত হাতছানি দিতে লাগল।

তার মনোভাবটা যেন বুঝতে পারল যুগল। বলল, 'আপনে কি আপনের বাপ-মা'র কথা ভাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভাবনের কিছু নাই। নিচে নাইমা পাছ-দুয়ার দিয়া আইসা পড়েন। এহানে খাল আছে, আমি নৌকা আইনা রাখছি। আপনে আইলে বাদাম খাটাইয়া দিমু। চোখের পাতা পড়তে না পড়তে সুজনগঞ্জ পৌছাইয়া যামু।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'বাবা-মা?'

'তাগো কওয়ার দরকার নাই। লুকাইয়া আইসা পড়েন।'

দ্বিধাটা তবু কাটল না। বিনু বলল, 'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'বাবা-মা যখন জানতে পারবে?'

'আইজ রাইতে তো আর জানতে আছে না।'

'কাল যখন জানবে?'

যুগল এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'তা হইলে ঘুমান, আমি যাই।' বলে তর তর করে সুপারি গাছ বেয়ে খানিকটা নেমেও গেল যুগল। নামতে নামতে বলল, 'রাইত কইরা নদীর উপুর দিয়া নৌকায় যাওন, হে যে কী মজা, বুঝতে পারলেন না ছুটোবাবু। আপনে পইড়া পইড়া ঘুমান।'

মুহূর্তে সব দ্বিধা কেটে গেল। কাল ধরা পড়লে কী হবে, কাল দেখা যাবে। খোলা নদীর ওপর দিয়ে বাদাম টাঙিয়ে যাওয়া, আবছা আবছা জ্যোৎস্না, যাত্রার আসর—এসব ছাড়া চোখের সামনে এখন আর কিছুই নেই। সব একাকার হয়ে বিনুকে যেন তারা আচ্ছন্ন করে ফেলল, তারপর জাদুকরের মতন কী এক অমোঘ আকর্ষণে টানতে লাগল।

বিছানার আর বসে থাকতে পারল না বিনু। ছুটে জানালার কাছে চলে গেল। ততক্ষণে যুগল অনেক নিচে নেমে গেছে।

বিনু ডাকল, 'যুগল—'

তলা থেকে সাড়া এল, 'কী ক'ন?'

'একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।'

'সত্যই যাইবেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাইলে তরাতরি আহেন।'

জানালার কাছে থেকে এধারে আসতেই ফিস ফিস করে ঝুমা বলল, 'আমিও যাব।'

একটু ভেবে নিল বিনু। দু'জনে গেলে মার-টার বকুনি-টকুনিগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে, নইলে পুরোটাই একার ওপর এসে পড়বে। সে বলল, 'আচ্ছা চল।' বলেই কি মনে পড়তে গলাটা অনেক নিচুতে নামাল, 'যাচ্ছি যে, ঝিনুক যেন টের না পায়।' বলতে বলতে আপনা থেকে তার মাথাটা ডানদিকে ঘুরল।

কি আশ্চর্য। বিছানাটা একেবারে খালি, ঝিনুক নেই। একটু আগেই তো মেয়েটা ছিল, নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিল। এর ভেতরে কোথায় গেল সে?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'ভালই হয়েছে। চল, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি। ঝিনুকরা

দেখতে পেলে সবাইকে বলে দেবে, আর যাওয়া হবে না।'

পা টিপে টিপে খুব সন্তর্পণে দু'জনে একতলায় এল। বাঁদিকে লম্বা বারান্দা। শেষ প্রান্তে রান্নাঘর। সেখানে আলো জ্বলছে, অবনীমোহনদের গলাও ভেসে আসছে। ওঁরা এখনও শুতে যান নি।

বিনুরা ডান দিকে ঘুরে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়ল। আসতেই যুগলের সঙ্গে দেখা।

যুগল বলল, 'আহেন, আহেন—'

তার পিছু পিছু ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এক সময় খালপাড়ে এসে পড়ল বিনুরা। একটু আগে যুগল নৌকোর কথা বলেছিল, সেটা জলের ওপর ভাসছে।

যুগল বলল, 'নায়ে ওঠেন—'

উঠতে গিয়ে থমকে গেল বিনু, তার পেছনে ঝুমাও। নৌকোর ঠিক মাঝখানে কে যেন বসে আছে।

বিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

নৌকো থেকে উত্তর এল, 'আমি ঝিনুক।'

কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বিনুরা। তারপর বলল, 'তুমি কখন এখনে এসেছ!'

ঝিনুক বলল, 'ঐ যে যুগলদাদা বলছিল যাত্রা শুনতে যাবে, বাড়ির পেছন দিকে নৌকো বাঁধা আছে, তাই শুনেই তো চলে এলাম।'

'একলা এসেছ?'

'হুঁ।'

কি দুর্জয় সাহস মেয়েটার! এই নিশুতি রাতে ঝুমাদের বাড়ি থেকে নির্জন খালপারে বিনু নিজেই কি একা একা আসতে পারত?

এই সময় যুগল ডেকে উঠল, 'ঝিনুকদিদি—'

ঝিনুক তক্ষুণি সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'এত রাইত কইরা তোমারে সুজনগুঞ্জ যাইতে হইব না। শুইয়া থাকো গা। আরেক দিন তোমারে যাত্রা শুনাইয়া আনুম।

'না না—' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে লাগল ঝিনুক।

যুগল শুধলো, 'কী হইল?'

'আমি আজই যাব।'

যুগল হয়তো ভাবল, খোলা নৌকোয় তিনটে বাচ্চাকে বসিয়ে জলপূর্ণ প্রান্তর পাড়ি দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। বিনু ছাড়া আর কাউকেউ নেবার ইচ্ছা ছিল না তার, ঝুমাটা নেহাত জোর করেই সঙ্গ নিয়েছে। সে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'ঝিনুকদিদি, তুমি সুনা (সোনা) বইন তো—'

যুগলের গলায় তোষামোদের সুর শুনে কিছু একটা আন্দাজ করল ঝিনুক। ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে সমানে বলতে লাগল, 'না না না না—'

তারই ভেতর যুগল বলল, 'না না করে না। লক্ষ্মী বইন, তুমি পোলাপান মানুষ, রাইত জাগলে শরীল খারাপ হইব।'

হঠাৎ মাথা ঝাঁকিনি বন্ধ করে ঝিনুক বলল, 'তা হলে ও যাচ্ছে কেন? ও কি বুড়োমানুষ?'

'কার কথা কও?'

ঝিনুক ঝুমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

নিজের ফাঁদে এমন করে জড়িয়ে পড়বে, যুগল ভাবে নি। ছেলেমানুষ হলে যাওয়া যদি নাকচ হয়ে যায়, ঝুমা যাচ্ছে কি করে?

ঝিনুক বলল, 'ও গেলে আমিও যাব। আমাকে যদি না নাও—'

যুগল শুধলো, 'না নিলে কী?'

'চেঁচিয়ে এক্ষুণি সবাইকে ডাকব, তোমাদের যাত্রা শোনা বেরিয়ে যাবে।'

কাজেই ঝিনুককে নৌকো থেকে নামানো গেল না, তার সঙ্গে রীতিমত সন্ধি করে নিতে হল।

যুগল বলল, 'বেশ, তোমারে লইয়া যামু কিন্তুক দুষ্টমি করতে পারবা না।'

যে কোনো শর্তেই এখন ঝিনুক রাজি। মাথা হেলিয়ে সে বলল, 'আচ্ছা।'

'আমি যা ক'মু তা ই করতে হইব।'

'আচ্ছা।'

যুগল এবার বিনুদের দিকে তাকাল, 'উঠেন ছুটোবাবু, নায়ে উঠেন।'

নৌকোয় উঠতে উঠতে বিনুর মনে হল, ঝিনুকের চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছু করবার উপায় নেই, সে ঠিক ধরে ফেলবে।

সবাই উঠলে আর এক মুহূর্তেও দেরি করল না যুগল। নৌকো ছেড়ে দিল। গলুইর ওপর বসে সবল হাতে জোরে জোরে বৈঠা বাইছে সে, নৌকোটা যেন পাখির মতন ডানায় ভর করে উড়ে চলেছে।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বিনুরা খাল পেরিয়ে পারাপারহীন প্রান্তরে এসে পড়ল।

আশ্বিনের শেষাশেষি এই নিশুতি রাতে বাতাস যেন কেমন কেমন, তাকে বুঝি বা ডাকিনীতে পেয়েছে। জলময় মাঠের ওপর দিয়ে নেশাপ্রমত্তের মতন দিগ্বিদিকে সে ছুটে বেড়ায়। বিনুরা যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানে কোথাও পদ্মবন, কোথাও শাপলাবন, মাঝে মাঝে ধানের খেত। পদ্মবনে-শাপলাবনে কিংবা ধানের পাতায় হাওয়া লেগে শব্দ ওঠে সাঁই সাঁই।

চন্দনের ফোঁটার মতন আকাশময় যে কত তারা সাজানো! তার মাঝখানে একটুখানি চাঁদ। আশ্বিনের শেষাশেষি এই সময়টায় হিম পড়তে শুরু করেছে। ফলে কুয়াশার ভেতর দিয়ে যে চাঁদের আলোটুকু এসে পড়েছে তাতে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। ধানখেত, দূরের বনানী, শাপলা-পদ্মের বন—এই মুহূর্তে সব ঝাপসা, রহস্যময়, কুহেলিবিলীন।

সমুদ্রের মতন এই অথৈ অপার জলরাশির মাঝখানে বসে শীত-শীত করে, হাওয়া লেগে গায়ে কাঁটা দেয়।

নৌকোর মাঝখানে বিনু ঝুমা আর ঝিনুক কুঁকড়ি-সুকড়ি মেরে বসে ছিল। যুগল ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু বলল, 'কী বলছ?'

'শীত নি করে?'

'হ্যাঁ।'

'বুদ্ধি কইরা যদি চাদর-চুদর লইয়া আইতেন—'

'আমি কি জানি, এইরকম শীত করবে? তোমার বলা উচিত ছিল।'

একটু নীরবতা।

তারপর যুগলই শুরু করল, 'আইজ বড় উল্টোপাল্টা বাতাস, তা এক কাম করি ছুটোবাবু—'

'কী?'

'বাদাম খাটাইয়া দেই।'

'দাও।'

সেদিন যা করেছিল, আজও তাই করল যুগল। পরনের কাপড়খানা ফস্ করে খুলে বাদাম খাটাতে খাটাতে বলল, 'এইবারে ছোত্ (চট) কইরা চইলা যামু।'

বিনু কিছু বলল না।

বাদাম টাঙিয়ে বৈঠা নিয়ে হালে বসল যুগল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'চুপচাপ বইসা থাকতে ভাল লাগে না ছুটোবাবু—'

'তবে কী করতে চাও ?'

'একখানা গীত কই ?'

ঝুমা হঠাৎ বলে উঠল, 'গান ?'

যুগল বলল, 'হ ঝুমাদিদি—'

'তুমি গান জানো!' ঝুমা অবাক।

ঝুমার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে আহত হল যুগল। বলল, 'জানি কি না জানি, ছুটোবাবুরে জিগাইয়া দেখ।'

বিনু তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল গাইতে জানে। গাও যুগল, শুরু করে দাও—'

ছোটবাবু তার গানের তারিফ করেছে, যুগল মনে মনে খুশি হল। একটু চুপ করে থেকে সুর ধরল:

'বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্দুরে,
ও আমার পরান বন্দুরে—
বিধি যদি দিত রে পাঙ্খা,
উইড়া গিয়া দিতাম দেখা,
আমি উইড়া পড়তাম
সোনা বন্দুর দ্যাশে।
বন্দু যদি আমার হও,
নিজে আইসা দেখা দ্যাও,
আমার পরান—'

গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গেল যুগল।

বিনুদের খুব ভাল লাগছিল। বিনু, ঝুমা, এমন কি ঝিনুক—তিনজনে একই সঙ্গে বলে উঠল, 'থামলে কেন ? গাও—'

যুগল কিন্তু আর গাইল না। আস্তে করে ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বলল, 'কী বলছ ?'

'অখন আমরা কুন খানে আছি, ক'ন তো ?'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আছি ?'

যুগল বলল, 'ভাল কইরা এট্টু ঠাওর করেন, বুঝতে পারবেন।'

বিনু চারদিকে তাকাতে লাগল। আবছা আবছা চাঁদের আলো চোখের সামনের সব কিছু ঢেকে রেখেছে। দূরের ঝোপঝাড়, বনভূমি, ধানের খেত কিংবা অগাধ জলরাশি, সমস্ত একাকার হয়ে এই মুহূর্তে এক রহস্যময় স্বপ্নের দেশ।

এই আদিগন্ত রহস্যময়তার মাঝখানে তাদের নৌকোটা যে কোথায়, বিনু কিছুতেই ঠিক করতে পারল না।

যুগল আবার বলল, 'বুঝতে নি পারলেন ছুটোবাবু ?'

বিনু বলল, 'না।'

'আপনে কিন্তু এইখানে আরেক দিন আইছিলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ।' যুগল মাথা নাড়ল, 'আমিই আপনেরে লইয়া আইছিলাম। দ্যাখেন দ্যাখেন, আবার ঠাওর করেন।'

আরেক বার জায়গাটা দেখে নিল বিনু কিন্তু আগের মতনই তা অচেনা থেকে গেল।

হালের বৈঠাটা এক হাতে চেপে, আরেকটা হাত এবার ডান দিকে বাড়িয়ে দিল যুগল। দূরে খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝুপসি অন্ধকার। সেটা দেখিয়ে যুগল শুধলো, 'দ্যাখেন তো, ঐটা চিনতে পারেন কিনা—'

বিনু বলল, 'না।'

'হায় রে আমার কপাল, দেখাইয়া দিলেও চিনতে পারে না।'

'কী ওটা?'

বিনুর কৌতূহল শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল। এতক্ষণে বুঝি করুণা হল যুগলের। সে বলল, 'ঐটা টুনি বইনের বাড়ি।'

এই অস্পষ্ট রহস্যের জগৎ থেকে টুনিদের বাড়িটা কেমন করে যে যুগল খুঁজে বার করল, কে বলবে। টুনিদের বাড়ি বলার সঙ্গে সঙ্গে বিনুর চোখের সামনে দ্বীপের মতন ভাসমান ক'টি ঘর, উঠোনের ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো, ভাতের টোপ দিয়ে কালো ছেলেদের পুঁটি আর বাঁশপাতা মাছ ধরা—এমনি অসংখ্য ছবি মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়ল পাখিকে। উত্তরের ঘরের পাছ-দুয়ার থেকে ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়েছিল পাখি, লালের ছোপ-দেওয়া হলুদ মাছের মতন সাঁতার কেটে কেটে যুগলের নৌকোয় এসে উঠেছিল। গাঢ় গলায় তার কানে কত কথা বলেছিল যুগল, একখানা গানও গেয়েছিল। তারপর যেমন এসেছিল আবার তেমন করেই কাচের মতন স্বচ্ছ জলে সাঁতার কেটে কেটে ফিরে গিয়েছিল পাখি।

বিনু বলল, 'তোমার টুনি বোনের বাড়ি যাবে?'

যুগল বলল, 'না। এত রাইতে মাইন্‌ষের বাড়িত্ যায়! অরা ঘুমাইয়া আছে না?'

কথাটা ঠিক। মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে উঠিয়ে গল্প করতে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। বিনু চুপ করে থাকল।

যুগল আবার বলল, 'হে ছাড়া—'

'কি?' বিনু উন্মুখ হল।

'শুদাশুদি তাগো বাড়িত্ গিয়া কী লাভ? যার লেইগা যাওন হ্যায় তো নাই।'

'কার কথা বলছ?'

'পাখির।'

বিনু কথাটা জানত না। অবাক হয়ে বলল, 'এখানে নেই তো কোথায় গেছে?'

যুগল বলল, 'আপনের কিছুই মনে থাকে না ছুটোবাবু। হেই দিন গোপাল দাসেরে দেখলেন না, ঐ যে আমাগো বাড়িত্ গেছিল—'

বিনুর মনে পড়ে গেল। যুগলের বিয়ের কথাবার্তা বলতে লোকটা হেমনাথের কাছে গিয়েছিল। বিনু বলল, 'গোপাল দাস কী করেছে?'

'হ্যায় তো পাখির বাপ।'

'তা তো জানি।'

'পাখিরে লইয়া গোপাল দাস নিজের বাড়িত্ হেই ভাটির দ্যাশে গেছে গা।'

'কবে?'

'হেই দিনই। কুন দিন বুঝছেন?'

বিনু বলল, 'বুঝেছি। যেদিন গোপাল দাস আমাদের বাড়ি গিয়েছিল।'

'হ।' যুগল বলল, 'কয়দিন আর মাইন্‌ষে কুটুমবাড়ি থাকে ক'ন! টুনি বইনেরে খালাস করতে আইছিল। খালাস হইয়া গেছে, আর থাকনের কাম কী?'

বিনু মাথা নাড়ল, কিছু বলল না।

যুগল বলতে লাগল, 'আইজ কাইল আমি আর টুনি বইনের বাড়িত্ যাই না ছুটোবাবু।'

'কেন? আগে তো রোজ যেতে।'

'পাখি নাই, গিয়া আর কী করম্। বুঝমান মানুষ হইয়া বোঝেন না ক্যান? আমি কি টুনি বইনের লগে প্যাচাল পারতে যাইতাম নিহি? যাইতাম পাখির লেইগা।'

বিনু উত্তর দিল না।

হঠাৎ ঝুমা বলে উঠল, 'পাখি কে?'

বিনু জানাল, 'যুগলের বউ।'

যুগল তক্ষুণি শুধরে দিল, 'অহনও হয় নাই ঝুমাদিদি। কথা-বাত্‌রা চলতে আছে। মাঘ-ফাগুনে বিয়া হইব।'

বিনুরা যখন সুজনগঞ্জ পৌঁছুল, রাত ভোর হ'তে খুব বেশি বাকি নেই। যুগল তাদের নিয়ে সোজা নিত্য দাসের ধানচালের আড়তগুলোর কাছে চলে এল।

হ্যাজাক আর ডে লাইটের আলোয় আলোয় জায়গাটা যেন দিন হয়ে উঠেছে। তার ভেতর দেখা গেল লাল সালুর প্রকান্ড সামিয়ানা খাটানো, তলায় যাত্রার আসর বসেছে। আসরটাকে ঘিরে কত যে দর্শক! দোকানদার-ব্যাপারী-পাইকার -আড়তদার থেকে শুরু করে সুজনগঞ্জের তাবত মানুষ এখানে ভেঙে পড়েছে। এত মানুষ, তবু এতটুকু শব্দ নেই। মন্ত্রমুগ্ধের মতন সবাই পালা শুনছে।

বিনুদের সঙ্গে করে ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে এসে বসল যুগল। এই মুহূর্তে আসরের মাঝখানে দুই রাজার যুদ্ধ চলছে। তাদের মাথায় রাংতার মুকুট, গায়ে ঝলমলে পোশাক, কাঁধে তূণীর, হাতে টিনের তলোয়ার। তাদের বুকে আবার অনেকগুলো করে জাপানি সিলভারের মেডেল আঁটা, আলো পড়ে সেগুলো ঝকমকিয়ে উঠছে। রণাঙ্গনটাকে বাস্তব করে তুলবার জন্য কয়েকটা মৃত সৈনিকও ইতস্তত শুয়ে আছে।

আসরের একধারে বসেছে বাজনদাররা। কত রকমের যে বাজনা তার হিসেব নেই। কর্নেট, ফ্লুটবাঁশি, ক্ল্যারিওনেট, হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, খঞ্জনি ইত্যাদি ইত্যাদি। পালাগানের তালে তালে কখনও ঢিমে সুরে, কখনও দ্রুত লয়ে কনসার্ট বেজে চলেছে।

বাজনদারদের ঠিক পাশেই একটা লোক বসে। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথায় ঢেউ-খেলানো বাবরি, জুলপি দুটো গালের মাঝামাঝি নেমে এসেছে। লোকটা বেশ শৌখিন। পরনে তার ধুতি আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। গলায় চুনোট-করা চাদর, ফাঁক দিয়ে সোনার মফচেন দেখা যাচ্ছে। দু হাতে পাঁচ-সাতটি আংটি। মস্ত বড় দুই চোখ ঈষৎ আরক্ত। ঠোঁটের উপর পাকানো গোঁফ। সব মিলিয়ে তার সর্বাঙ্গে নিদারুণ এক ব্যক্তিত্বের আভাস রয়েছে।

লোকটার হাতে একখানা বই ছিল। মাঝে মাঝে সেটা থেকে সে প্রম্পট্ করে যাচ্ছে আর আসরের দুই রাজা কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে:

'রে রে রক্ষোকুলাধম
পামর রাবণ,
তোরে আজ বধিব পরানে।'

শুধু প্রম্পট্ই না, অঙুল নেড়ে নেড়ে বাজনাদারদের নির্দেশও দিচ্ছে। তার সামান্য আঙুলি হেলনে

এতগুলো লোক যন্ত্রের মতন গাইছে, বাজাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হল, এই লোকটাই আসল অর্থাৎ অধিকারী।

ইতিমধ্যে দর্শকদের কারো কাছ থেকে খবর যোগাড় করে যুগল বিনুকে জানাল, আজ 'রাবণ বধ' পালা চলছে এবং এটাই শেষ দৃশ্য।

বিনুর, কোনো দিকে লক্ষ্য নেই। যুগলের কথা হয়তো শুনতেই পেল না। একদৃষ্টে পলকহীন আলোকোজ্জ্বল আসরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। জীবনে এই তার প্রথম যাত্রা দেখা। রাম-রাবণের ঝলমলে পোশাক, ঝকমকে মেডেল, কনসার্টের উত্থান-পতন—সব একাকার হয়ে এই আসরটা যেন আশ্চর্য এক মায়ালোক। ঝুমা এবং ঝিনুকও সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল।

লড়াইটা হচ্ছিল খুব নিরীহ রকমের। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রাম-রাবণ এমনভাবে কনসার্টের তালে তালে তলোয়ার চালাচ্ছিল যে, হাজার বছর যুদ্ধ চললেও কারো গায়ে সামান্য আঁচড়টুকু লাগার সম্ভাবনা নেই। তবু ভাল লাগছিল বিনুর, মুগ্ধ বিস্ময়ে সে দেখেই যাচ্ছিল। বাজনার সুরে সুরে তার বুকের ভেতরটা যেন দুলছিল।

আধ ঘণ্টাখানেক যুদ্ধ চলবার পর হঠাৎ রাম করল কি, ঈষৎ ঝুঁকে সেই লোকটাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতক্ষণ চালামু অধিকারীমশাই ?'

অধিকারী চট করে সামিয়ানার বাহিরে আকাশটাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'অহনও আন্ধার আছে, ভোর তরি চালাইয়া যা। দিনের আলোও ফুটব, রাবণও মরব, তার আগে থামন নাই। থামলে চাইরদিকের মাইন্‌ষে আমারে খাইয়া ফেলাইব।' বলেই বাজনদারদের দিকে ফিরে দ্রুত আঙুল নাড়তে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে চড়া সুরে কনসার্ট বেজে উঠল, রাম-রাবণের তলোয়ার জোরে জোরে ঘুরতে লাগল। নিস্তেজ আসর নিমেষে সজীব হল।

আরো কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল। তারপর আবার এক কান্ড। ঘুরতে গিয়ে অসাবধানে রাবণের পা গিয়ে পড়ল এক মৃত সৈনিকের ঘাড়ে। বেচারা নিঃসাড়ে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। একে শেষ রাত, তাতে নদীপারের আরামদায়ক জলো হাওয়া, ঘুমিয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

ঘাড়ে পা পড়তে খুব সম্ভব তার ঘুমে বিঘ্ন ঘটে থাকবে, তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ছোকরা। গালাগাল দিয়ে কটু গলায় বলল, 'হারামজাদা বান্দর, তগো লেইগা কি এট্টু ঘুমাইতেও পারুম না ?'

নিস্তব্ধ মন্ত্রমুগ্ধ জনতার মধ্যে হাসির রোল উঠল, 'শালার কাটা সৈনিক লম্ফ দিয়া উইঠা দেহি কথা কয় !'

ওদিকে লালচে চোখ পাকিয়ে বাঘের মত গলা করে হুমকে উঠেছে অধিকারী, 'হারামজাদা, বাপের জমিন্দারি পাইছ ? শুইয়া থাকতে কইছিলাম, নোয়াবের ছাও ঘুমাইয়া পড়ছ ! শুলি কুত্তা, শুলি ! পালা একবার ভাঙ্গুক, জুতাইয়া পিঠের ছাল তুইলা ফেলামু আইজ।'

বিমূঢ় মৃত সৈনিক একটুক্ষণ ফ্যালাফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল, তারপর কাটা কলাগাছের মতন ধপাস করে আসরে শুয়ে পড়ল, আর নড়ল না।

তাল কেটে গিয়েছিল। কাঝেই একটানা কিছুক্ষণ ঝড়ের বেগে কনসার্ট বাজিয়ে বেসুরো অবস্থাটা কাটিয়ে নেওয়া হল। তারপর আবার শুরু হল সম্মুখসমর। এবার আর কোনো ব্যাঘাত ঘটল না। ভোর পর্যন্ত নিরাপদ যুদ্ধ চালিয়ে, যখন পুব দিকটা ফরসা হতে শুরু করেছে সেই সময় টিনের তলোয়ারের সামান্য একটু খোঁচা খেয়েই রাবণ বধ হয়ে গেল।

যাত্রা শুনে তার পরের দিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা দুপুর। তেমন হাওয়া থাকলে বাদাম খাটিয়ে ঢের আগে পৌঁছুনো যেত। কিন্তু আশ্বিনের এই দিনটা একেবারেই বুঝি বায়ুশূন্য, সারাটা পথ যুগলকে নিতান্ত হাতের জোরে বৈঠা বেয়ে আসতে হয়েছে।

রাজদিয়ায় পা দিতেই টের পাওয়া গেল চারদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। থানায় থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। তাদের খোঁজে সারা শহর তোলপাড় করে ফেলা হয়েছে। এখন কান্নাকাটি চলছে।

সোজা ঝুমাদের বাড়িতেই চলে এসেছিল বিনুরা। হেমনাথরা এখন ওখানে আছেন, বিনুদের দেখামাত্র তাঁরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর বাকি দিনটা সমানে বকুনি-শাসানি আর শাসন চলল। সব চাইতে বড় ঝড়টা গেল যুগলের ওপর দিয়ে।

অষ্টমীর পর নবমী। নবমীর পর দশমী। রাজদিয়ার পুজোমন্ডপগুলো শূন্য করে সন্ধেবেলায় প্রতিমাগুলোকে হাজারমণী মহাজনী নৌকোয় তোলা হল, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত নদীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিসর্জন দেওয়া হল। তারও পর হেমনাথের সঙ্গে রাজদিয়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজয়া করার সে কি ধুম! শুধু কি বিনুরাই গেছে, রাজদিযার সব মানুষ তাদের বাড়ি এসেও বিজয়া করে গেল।

দশমীর পর একাদশী।

একাদশীর দিন তখনও ভাল করে সকাল হয় নি, লারমোরের জীর্ণ ফিটন গাড়িটা এসে হাজির।

বিনুর তখনও ঘুম ভাঙে নি। হেমনাথ ডাকতে লাগলেন, 'ওঠ দাদাভাই, ওঠ। লালমোহন দাদুর ওখানে যাবি না? সে ফিটন পাঠিয়ে দিয়েছে।'

চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল বিনু। মনে পড়ল, আজ তাদের লারমোরের গির্জায় যাবার কথা।

আজ আর না গিয়ে উপায় নেই। পাছে অবনীমোহনরা ভুলে যান, তাই এই ভোর বেলাতেই ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন লারমোর। চালক সেই বুড়ো রুগ্ন কাদের।

বাড়িতে ঢুকেই কাদের তাড়া দিতে শুরু করেছে, 'চলেন হ্যামকত্তা, চলেন।'

হেমনাথ বললেন, 'তুই যে একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস কাদের। এতখানি পথ এলি, দু দন্ড জিরিয়ে নে, কিছু খা। তারপর তো যাবার কথা—'

'না।' কাদের ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল।

'না কেন?'

'হুকুম নাই।'

হেমনাথ ঈষৎ অবাক, 'কিসের হুকুম?'

কাদের বলল, 'পা পাইতা বসনের, জিরানের, খাওনের।'

হেমনাথ কৌতুক বোধ করছিলেন। চোখ কুঁচকে বললেন, 'তবে কী হুকুম আছে শুনি?'

'আমারে এক দন্ড দেরি করতে নিষেধ করছে লালমোহন সাহেব, আইসাই আপনাগো গাড়িতে তুইলা নিয়া যাইতে কইছে।'

'জোর তলব দেখছি।'

'হ।' কাদের হাসল।

হেমনাথ বললেন, 'তা হলেও কিছুক্ষণ তোকে বসতে হবে।'

'ক্যান?'

'বা রে, আমাদের এখনও মুখটুখ ধোয়া হয় নি। তা ছাড়া বাচ্চাগুলো অতখানি রাস্তা যাবে, যেতে

যেতে খিদে পেয়ে যাবে। ওরা কিছু খেয়ে নিক।'

'উহুঁ-উহুঁ—' প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকাতে লাগল কাদের।

হেমনাথ শুধোলেন, 'আবার কী হল রে?'

'হুকুম নাই। লালমোহন সাহেব কইয়া দিছে, খালি মুখ ধোওনের সময় দিতে। খাওন-দাওন হগল কিন্তুক আমাগো গির্জায় গিয়া।'

চোখ বড় বড় করে হেমনাথ বললেন, 'বাব্বা!'

হেমনাথের মনোভাব খানিক আন্দাজ করতে পেরেছিল কাদের। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'লালমোহন সাহেব যা কইয়া দিছে তাই কইলাম।'

'বেশ বাবা, বেশ। হিজ ম্যাজিস্টি যখন হুকুম দিয়েছেন তখন তো নড়চড় হবার জো নেই। মুখ ধুয়েই তোমার পুষ্পক রথে উঠছি।'

এ বাড়ির সবার এখনও ঘুম ভাঙে নি। যারা ঘুমোচ্ছিল তাদের জাগিয়ে মুখটুখ ধুয়ে নিতে বললেন হেমনাথ। নিজেও ধুয়ে নিলেন, দেখাদেখি ঝিনুক বিনুও ধুল। তারপর হেমনাথ ওদের দু'জনকে নিয়ে সূর্যবন্দনা সেরে নিলেন।

এদিকে সারা বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। সুধা-সুনীতি-অবনীমোহন, প্রায় সকলেই জামাকাপড় পরে বেরুবার জন্য তৈরি। স্নেহলতা অবশ্য যাবেন না। সপ্তমী-অষ্টমী পর পর দু'দিন থিয়েটার আর নৃত্যনাট্য দেখতে গিয়েছিলেন। বাড়ির কর্ত্রী তিনি, সর্বময় ঈশ্বরী। রোজই যদি সবার সঙ্গে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়েন এত বড় সংসার চলে কী করে? সবে নতুন পাট উঠেছে, সেগুলো ধোয়ার ব্যাপার আছে, শুকোবার ব্যাপার আছে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের ডোল বোঝাই আউশ ধান ভানিয়ে রাখতে হবে। তা ছাড়া ক'দিন পর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। খই ভাজতে হবে, মুড়ি ভাজতে হবে। পঞ্চাশটা নারকেলের নাড়ু পাকানো আছে, চন্দ্রপুলি, ছাপা সন্দেশ বানানো আছে, মুড়কি বানানো আছে, চিড়ে কোটা আছে, খই-মুড়ি-চিড়ে দিয়ে তিন রকমের মোয়া পাকানো আছে। কাজ কি তাঁর এক-আধটা? দায়িত্ব কি সামান্য? কোন দিকে তাঁর নজর না দিলে চলে!

স্নেহলতা যাবেন না। কাজেই শিবানী জানিয়ে দিলেন, তিনিও যাবেন না। সম্পর্কটা যদিও ননদ-ভাজের, আসলে তাঁরা যেন অভিন্নহৃদয় দুই সখী। স্নেহলতা না বেরুলে কার সাধ্য শিবানীকে নড়ায়।

দু'রাত গায়ে-মাথায় হিম লেগে শরীর খারাপ হয়েছে সুরমার। তিনিও বেরুবেন না।

যাবার মধ্যে সুধা-সুনীতি-অবনীমোহন-ঝিনুক আর বিনু। দেরি না করে তাদের নিয়ে ফিটনে উঠলেন হেমনাথ। ওঠার শুধু অপেক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে দিল কাদের।

স্টিমারঘাটা, তারপর বরফ কল, মাছের আড়ত, সেটেলমেন্ট অফিস, আদালত পাড়া পর্যন্ত বিনুর দৌড়। সে সব পেছনে ফেলে ফিটন আরো অনেক দূরে এগিয়ে গেল। জায়গাটা ক্রমশ সরু হয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেটাই গির্জা। তারপর থেকে জল। খুব সম্ভব স্টিমারঘাটার কাছের বড় নদীটা ঘুরে গির্জার পেছনে চলে এসেছে।

গির্জার সব চাইতে বড় বিস্ময় তার তীক্ষ্ণাগ্র চুড়োটা, ধীরে ধীরে সরু হয়ে অনেক উঁচুতে আকাশের গায়ে সেটা বিঁধে রয়েছে। সেদিন স্নেহলতার সঙ্গে পুজোর কাপড় বিলোতে বেরিয়ে দূর থেকে চুড়োটা দেখতে পেয়েছিল বিনু।

গির্জার সামনের দিকে খানিক ফাঁকা জমি সবুজ ঘাসে ঢেকে আছে। কাদের ফিটন নিয়ে সোজা সেখানে চলে এল।

লারমোর বোধহয় দেখতে পেয়েছিলেন, গির্জাবু ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন। তাঁর নীলাভ চোখদুটো খুশিতে আলো হয়ে উঠল। ব্যস্তভাবে বলতে লাগলেন, 'হেম এসেছে! অবনী এসেছে! আমার দাদা-দিদিরা এসেছে! কি আনন্দ যে হচ্ছে!'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা এসেছি। সারাদিনের জন্যে নিজেদের তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। এখন যা ইচ্ছে কর।'

লারমোর কি যে করবেন, ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। ছেলেমানুষের মতন লাফ দিয়ে ফিটনের পাদানেই উঠে পড়লেন। গাড়ির ভেতর উঁকি দিয়ে অস্থির গলায় বললেন, 'এ কী!'

'কী হল?'

'রমু কোথায়!'

নিচে দাঁড়িয়ে গাড়ির ভেতরকার সবটুকু দেখতে পান নি লারমোর। পাদানে উঠতেই কারা এসেছে আর কারা আসে নি, বুঝতে পারলেন।

হেমনাথ বললেন, 'রমুটার শরীর ভাল না। আসতে অবশ্য চেয়েছিল, আমিই বারণ করেছি।'

লারমোর বললেন, 'হঠাৎ শরীরটা খারাপ হল যে?'

'নাটক-টাটক দেখে হিম লাগিয়েছিল, তাই—'

'রমু না হয় আসতে পারে নি। বৌঠাকরুন? শিবুদিদি?'

স্নেহলতা-শিবানী কেন আসেন নি, হেমনাথ বললেন।

লারমোর বললেন, 'আনন্দর অর্ধেকটাই মাটি।'

একটু নীরবতা। তারপর হেমনাথ তাড়া দিলেন, 'কি ব্যাপার, গাড়ি থেকে নামতে দেবে না? রাস্তা ছাড়—'

লারমোরের খেয়াল ছিল না, রাস্তা জুড়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বিব্রতভাবে পাদান থেকে তাড়াতাড়ি নিচে নামলেন। হেমনাথরা আর অপেক্ষা করলেন না, দরজা খুলে নেমে পড়লেন।

লারমোর বললেন, 'এস—'

তাঁর সঙ্গে যেতে যেতে হেমনাথ বললেন, 'আমাদের আনবার জন্যে ভালো লোক পাঠিয়েছিলে বটে।'

হেমনাথ কি বলতে চান বুঝতে না পেরে সন্দিগ্ধ গলায় লারমোর শুধোলেন, 'কী ব্যাপার বল তো? কাদের অন্যায় কিছু করেছে? কিন্তু ও তো সেরকম লোক না।'

হেমনাথ বললেন, 'আরে না-না, শুধু শুধু অন্যায় করতে যাবে কেন? তুমি তো ধরে আনতে বলেছিলে, ও একেবারে আমাদের বেঁধে এনেছে।'

'কিরকম?'

'কিরকম আবার, ঘুম থেকে উঠবার পর মুখটা খালি ধুতে পেরেছি। তারপর আর দাঁড়াতে দেয় নি কাদের, নিশ্বাস ফেলতে দেয় নি, টেনে তোমার ঐ গাড়িটায় তুলে ফেলেছে।'

একটু আগে সংশয় ছিল। দেখতে দেখতে লারমোরের চোখমুখের চেহারা বদলে গেল। নিশ্চিন্ত উৎফুল্ল সুরে তিনি বললেন, 'যাক, তা হলে যা বলে দিয়েছিলাম তাই করেছে কাদের।'

হেমনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'জানো, খেয়ে পর্যন্ত আসতে দেয় নি।'

'আমি তাও বলে দিয়েছিলাম।'

'যেমন মনিব তেমনি তো তার কর্মচারী হবে।'

লারমোর উত্তর দিলেন না, সকৌতুকে হাসতে লাগলেন।

হেমনাথ বললেন, 'হেসো না তো। ছেলেমেয়েগুলো এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে আছে। ওদের কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।'

আড়ে আড়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে লারমোর বললেন, 'আর তোমার?'

'আমারও।'

'সেই কথাটাই বল। এই জন্যেই এত রাগ?'

হেমনাথ হেসে ফেললেন।

হাসতে হাসতে লালমোর বললেন, 'চল। গিয়েই খেতে দিচ্ছি।'

ঘাসের জমিটার পরই চার্চ। এটুকু পথ লারমোরের পিছুপিছু সবাই সেখানে চলে এল।

গির্জাটা কত কালের, কে জানে। তার বয়সের বুঝি আদি-অন্ত নেই। দেওয়ালের গা থেকে বালির আস্তর খসে খসে নানা জায়গায় ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। সে ইঁটও নোনা-ধরা। শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা-শরৎ মৌসুমী বাতাসের আঘাতে আঘাতে আর জলের ছাটে ছাটে কত জায়গা যে ভেঙেচুরে ক্ষয়ে গেছে। দরজা-জানালাগুলোও আস্ত নেই, উইদের দাঁতে তারা নিশ্চিহ্ন হবার পথে। অশ্বত্থেরা ভিতের তলায় তলায় শিকড় চালিয়ে ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে।

গির্জাবাড়িটা কতকাল যে সারানো হয় নি, কতকাল যে তার কলি ফেরানো হয় নি!

ভেতরের চেহারাও বাইরের মতনই। দেওয়ালের কোণে কোণে বছরের পর বছর ঝুল জমছে, মাকড়সারা জালের পর জাল বুনে যাচ্ছে। ঘুলঘুলিতে পায়রা আর চড়াইরা বংশপরম্পরায় বাসা বাঁধছে। দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে এ-বাড়িতে তাদের স্বত্ব কায়েম হয়ে গেছে যেন।

গির্জায় ঢুকলেই প্রথমে যা চোখে পড়ে তা হল প্রকাণ্ড বেদীর ওপর যিশু-মূর্তি, মানবপুত্র ওখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছেন। সর্বাঙ্গে কোথাও যন্ত্রণার চিহ্ন নেই, ক্ষমাসুন্দর চোখে মূঢ় অন্ধকার জগতের দিকে তিনি যেন তাকিয়ে আছেন, তাঁকে ঘিরে স্নিগ্ধ এক জ্যোতির্বলয়।

মূর্তিটির দিকে তাকালে স্বর্গীয় সুষমায় মন ভরে যায়, উত্তেজিত রিপুতাড়িত স্নায়ুর ওপর প্রশান্তি নেমে আসে।

লারমোরের সঙ্গে আসতে আসতে খ্রিস্টমূর্তির কাছে কিছুক্ষণ সবাই থমকে দাঁড়াল।

ভক্তিপূর্ণ মুগ্ধ স্বরে অবনীমোহন বললেন, 'চমৎকার মূর্তি। তাকালেই প্রাণ ভরে যায়।'

হেমনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। আমি মাঝে মাঝে এসে ঐ মূর্তিটার সামনে বসে থাকি। কী মনে হয় জানো অবনী? মনে হয়, পৃথিবীতে কোনো হীনতা নেই, নীচতা নেই, নোংরামি নেই। এখানে এলে নিজের ভেতর অনেকখানি শক্তি পাওয়া যায়।'

অবনীমোহন উত্তর দিলেন না, একদৃষ্টে মানবপুত্রের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

লারমোর ডাকলেন, 'এস।'

যিশুমূর্তির পেছন দিকে খানিকটা গেলে দু'খানা বড় বড় ঘর। লারমোর একটা ঘরে অবনীমোহনদের নিয়ে এলেন। এক ধারে ছোট্ট তক্তপোশ, তার ওপর এলোমেলো ময়লা বিছানা। আরেক ধারে হাতলভাঙা ক'খানা বেতের চেয়ার, একটা মাঝারি টেবিল, দুটো আলমারি বোঝাই বই আর গদিমোড়া একখানা ইজিচেয়ার। আরেক কোণে দেয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি খাটানো রয়েছে, তাতে খানকতক ক্ষারে-কাচা ধুতি এবং ফতুয়া ঝুলছে। এখানে ওখানে এক-আধটা বাক্স, মাটির একটা কলসী, দুটো চীনে মাটির গেলাস, কালি-পড়া হারিকেন ইতস্তত ছড়ানো।

লারমোর বললেন, 'এই আমার সাম্রাজ্য। বসো তোমরা, বসো—'

সবাই বসলে লারমোর দরজার দিকে মুখ করে ডাকতে লাগলেন, 'পরানের মা, পরানের মা—'

ওদিকের কোথা থেকে সাড়া এল, 'যাই—'

একটু পর একজন বিধবা মধ্যবয়সিনী এ ঘরে এসে দাঁড়াল। নাক পর্যন্ত তার ঘোমটা টানা। লারমোর শুধোলেন, 'রান্নাবান্নার কতদূর?'

মৃদু গলায় বিধবাটি বলল, 'বসাইয়া দিছি।'

'মাছ-তরকারি ভাতটাত তুমি রাঁধো। পায়েসটা আমি করব। গরুগুলো দোয়ানো হয়েছে?'

'না।'

'ঠিক আছে, আমি দুইয়ে নিচ্ছি। এখন আমাদের খেতে-টেতে দাও। কাল রাত্তিরে পাতক্ষীর আর

চমচম এনে রেখেছিলাম, সে সব দিও।'

মেয়েমানুষটি স্বল্পভাষিণী। এত লোকজন দেখে সে জড়সড় হয়ে গেছে। ঘোমটার ভেতর মাথা নেড়ে জানাল, লারমোর যেমন বলছে, ঠিক তেমন তেমনই দেবে।

লারমোর আবার বললেন, 'ডাল হবে, ভাত হবে, বেগুন ভাজা আলু ভাজা, পাঁচ রকমের মাছ—এত সব হবে। রান্না শেষ হতে বেলা হেলে যাবে। এখন পেট ভরে না খেলে বাচ্চারা খিদেয় কষ্ট পাবে। যাও যাও, বেশি করে খাবার নিয়ে এস—'

লারমোর তাঁরা কথায় সায় দিলেন।

বিধবাটি চলে গেল।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন হেমনাথ। বাললেন, 'একে কোথায় পেলে লালমোহন? কাজির পাগলার সনাতনের বউ না, যে গেল বছর বর্ষাকালে উদরীতে মরেছে?'

'হ্যাঁ।' লারমোর বলতে লাগলেন, 'স্বামী মরবার পর থেকে মেয়েছেলেটার দুর্গতির শেষ নেই। শরিকেরা যা করবার করেছে, ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে ওকে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে। তারপর দু মুঠো ভাতের জন্যে আজ এ বাড়ি, কাল ও বাডি করে বেড়াচ্ছিল। উদয়াস্ত খাটত। তবু যদি কেউ একটু ভাল মুখে কথা বলত! উঠতে বসতে খালি লাথি আর ঝ্যাঁটা। এভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে?'

'তারপর—'

'তারপর আর কি, পরশু দিন রুগী দেখতে কাজির পাগলা গিয়েছিলাম, সনাতনের বউ এসে আমাকে ধরল। বলল, আমি তার ধর্মবাপ! তাকে আমার কাছে আশ্রয় দিতে হবে। এ অবস্থায় তো ফেলে আসতে পারি না, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তুমিই বল হেম, ঠিক করি নি?'

'ঠিকই করেছ। আচ্ছা—'

'বল—' লারমোর উন্মুখ হলেন।

হেমনাথ বললেন, 'পরান বলে ওর একটা ছেলে ছিল না?'

'ছিল তো। সে মানুষ হলে তার মায়ের দুঃখ তো ঘুচেই যেত।'

'সে ছোকরা কোথায়?'

'বছর তিনেক আগে এক ঢপের দলে গিয়ে জুটেছিল, তারপর থেকে তার পাত্তা নেই।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

লারমোর আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, পরানের মা বেতের সাজিতে সাজিতে চিঁড়ে-মুড়ি-ক্ষীর-চমচমের ফলার সাজিয়ে নিয়ে এল। সবার হাতে একটা করে সাজি দিয়ে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল সে, লারমোর ডাকলেন, 'তুমি খেয়েছ?'

পরানের মা উত্তর দিল না, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

লারমোর বললেন, 'এখন গিয়ে খেয়ে নেবে, বুঝেছ? মোটে লজ্জা করবে না। এখন থেকে এটা তোমার নিজেরই বাড়ি।'

আধফোটা বিব্রত স্বরে পরানের মা বলল, 'আইচ্ছা।' বলে আর দাঁড়াল না।

খাওয়া দাওয়ার পর লারমোর বললেন, 'এতখানি বেল হল, গরুগুলো গোয়ালে আটকে রয়েছে। দুধ দুয়ে ওদের ছেড়ে দিই গে। যাবে না কি তোমরা?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

অবনীমোহন বললেন, 'ঘরে বসে থেকে আর কী করব, চলুন আপনার দুধ দোয়া দেগি গে—'

এইসময় সুধা বলে উঠল, 'আপনি সত্যিই দুধ দুইতে পারেন লালমোহন দাদু!' সে ভারি অবাক হয়ে গেছে।

মধুর হেসে লারমোর বললেন, 'গাই দোয়া কি খুব কঠিন কাজ রে দিদি! আমি না পারি কী?'

'কী কী পারেন তার একটা লিস্ট দিন দেখি—' ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে সুধা বলল।

'সব পারি রে দিদি, সব পারি। ধান ভানতে পারি, চিঁড়ে কুটতে পারি, জলসই-এর গান গাইতে পারি, আবার পায়েসও রাঁধতে পারি।'

'সে পায়েস খাওয়া যাবে তো?'

'খেয়েই বলিস। ওটা তো আজ আমিই রাঁধব।'

একটু ভেবে নিয়ে সুধা বলল, 'আমার মতন নাচতে পারেন আপনি?'

মাথাটা সামনের দিকে অনেকখানি নিচু করে লারমোর বললেন, 'ঐখানটায় তোর জিত দিদিভাই। এই বয়সে কোমর আর ঘোরে না। যদি সেই বয়েসে তোর সঙ্গে দেখা হতো রে—'

সুধা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তা হলে কী হত শুনি?'

'সে কথা কি হাটের মাঝখানে বলা যায়?'

'তবে কোথায় বসে বলা যায়?'

'নির্জনে দু'জনে—'

লারমোরের কথা শেষ হবার আগেই হেমনাথ হুঙ্কার দিলেন, 'আ্যাইও—'

লারমোর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'কী হল হে? অমন হুমকে উঠলে? ল্যাজে পা পড়েছে মনে হচ্ছে।'

'একশো বার পড়েছে। আমার হেড বেগমের কানে নির্জনে কী বলতে চাও হে বেয়াদপ? জানো তোমার গর্দান চলে যেতে পারে।'

'দুঃখিত, দুঃখিত। একে যে তোমার হেড বেগম করে বসে আছ, বুঝতে পারি নি।' বলতে বলতে করুণ চোখে সুধার দিকে তাকালেন লারমোর। হেমনাথকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ কালো কষ্টিপাথরটাকে মন-প্রাণ সঁপে না দিয়ে—'

সুধা ভেংচে উঠল, 'আহা—হা—'

লারমোর এবার নিজের বুকে আঙুল রেখে আবেগপূর্ণ গলায় বললেন, এই গোরাচাঁদের গলায় যদি বরমাল্য দিতিস রে সুধারানী—'

সুধা আগের মতনই ভেংচাতে লাগল, 'অসভ্য কোথাকার—'

সবাই হাসছিল। হাসাহাসির ভেতর একসময় লারমোর গির্জার পেছন দিকে এসে পড়লেন।

গির্জার পর অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, তারপর নদী। মাঠটার এক ধারে সারি সারি খানকতক টিনের ঘর। একটা ঘরে দেখা গেল অনেকগুলো ধানের ডোল, আরেক ঘরে চার-পাঁচটা গরু বাঁধা, এটাই সম্ভবত গোয়াল।

গোয়ালঘরের কাছে এসে লারমোর ডাকতে লাগলেন, 'কাদের, কাদের—'

তৃতীয় ঘরখানা থেকে কাদের বেরিয়ে এল। কখন কোন পথ দিয়ে সে এখানে এসে ঢুকেছিল, কেউ টের পায় নি।

লারমোর বললেন, 'দুধ দোয়াব, পেতলের দুটো বালতি আর তেলের বাটি নিয়ে আয়।'

কাদের চলে গেল।

বিনু হঠাৎ বলে উঠল, 'কাদের তো আপনার কাছে থাকে, না লালমোহনদাদু?'

'হ্যাঁ।' যে ঘরটা থেকে কাদের বেরিয়ে এসেছিল সেটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে লারমোর বললেন, 'ওটা কাদের আর চম্পকের ঘর।'

'চম্পক কে?'

'ঐ যে ঘোড়াটা, যেটা আমাদের ফিটন টানে—'

বিনু অবাক। ঐ রোগা চেহারার বুড়ো হাড্ডিসার ঘোড়াটার যে একটা নাম থাকতে পারে, তাও ঐ রকম চমকপ্রদ শৌখিন নাম—কে ভাবতে পেরেছিল! বিমূঢ়ের মতন বিনু তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ

পরে বলল, 'ঘোড়াটা আর কাদের এক ঘরে থাকে!'

'হ্যাঁ।'

অন্য সকলেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সমস্বরে তারা বলল, 'কেন?'

'আর বোলো না—' লারমোর বলতে লাগলেন, 'চম্পককে ছাড়া এক মুহূর্ত সে থাকবে না। ঘোড়ার জন্যে আলাদা ঘর করে দিতে চেয়েছিলাম, কাদের রাজি না। ঐ চম্পকের সঙ্গেই তার ওঠা-বসা, চলা-ফেরা। এমন কি ওটার সঙ্গে কথাও বলে সে। পনের বছর আগে ঘোড়াটা কেনা হয়েছিল। তখন থেকেই সে কাদেরের বন্ধু, সঙ্গী।'

বালতি আর তেলের বাটি নিয়ে কাদের ফিরে এল। তার সামনে ঘোড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ আর কিছু বলল না।

দুধ দোয়াবার সরঞ্জাম এসে গেছে। লারমোর গোয়ালে ঢুকলেন। তাঁর পিছু পিছু বিনুরাও গেল।

গরুর বাঁটে তেল মেখে দুই হাঁটুর ফাঁকে বালতি নিয়ে নিপুণ হাতে দুইতে শুরু করলেন লারমোর। পাঁচটা গরুর দুধে দুটো বালতি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

দুধটা কাদেরকে দিয়ে পরানের মায়ের কাছে পাঠিয়ে গরুগুলোকে ছেড়ে দিলেন লারমোর। তারা ছুটে গিয়ে সামনের মাঠে শরতের কোমল সজীব ঘাসে মুখ ডুবিয়ে দিল।

লারমোর বললেন, 'একটা বড় কাজ হল। চল, জায়গাটা তোমাদের ভাল করে ঘুরিয়ে দেখাই।'

গির্জার চারধার, এখানকার নদীতীর, একটু দূরের ঝাউবীথি—দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে গেল। ঝকঝকে নীলাকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে।

আশ্বিন যায় যায়, এখনও রোদে বেশ ধার আছে। সবার কপালে ঘামের দানা জমেছে। হেমনাথ বললেন, 'আর না, এবার ফেরা যাক।'

গির্জায় ফিরে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর অবনীমোহন বললেন, 'আচ্ছা লালমোহন মামা—'

'বল—' লারমোর উন্মুখ হলেন।

'এই গির্জায় আপনি কতদিন আছেন?'

মনে মনে হিসেব করে লারমোর বললেন, 'প্রায় চল্লিশ বছর। এইটিন নাইনটি নাইনে এখানে এসেছিলাম, আর এটা হল গিয়ে নাইনটিন ফরটি।'

হঠাৎ কি মনে পড়তে অবনীমোহন বললেন, 'একটা কথা জানবার খুব ইচ্ছে আমার। যতবারই জানতে চেয়েছি, বলেছেন, পরে বলবেন। আজ কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না।'

'কী কথা বল তো?'

'আপনার জীবনের কথা।'

স্নিগ্ধ হেসে লারমোর বললেন, 'শোনাবার মতন কথা কিছুই নেই। অতি তুচ্ছ জীবন আমার।'

অবনীমোহন বললেন, 'তুচ্ছ কিনা, সে আমরা বুঝব। আপনি বলুন—'

'বেশ, তোমার যখন এত আগ্রহ, শোন—' লারমোর নিজের জীবন-কথা শুরু করলেন।

জন্মসূত্রে লালমোর আইরিশ। ঐ পর্যন্তই। আয়ার্ল্যান্ডের কথা আজকাল তাঁর বিশেষ মনেও পড়ে না।

জন্মভূমির নামে মানুষের বুকে আবেগের নদী দুলতে থাকে। তেমন কোনো অনুভূতি লারমোরের মধ্যে অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ।

থাকবেই বা কী করে? সেই কবে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছেন লারমোর, সে কি আজকের কথা! একটা শতাব্দীর প্রায় আধাআধি তো তাঁর এ দেশেই কেটে গেল।

এসেছিলেন যৌবনের শুরুতে, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখন তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন। এখানে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরলে জন্মভূমির সেই দেশটাকে ধুধু স্বপ্নের মতন মনে হয়।

লারমোরের স্মৃতি থেকে কত কিছুই তো মুছে গেছে। তবু মনে পড়ে, খুব ছেলেবেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়েছেন। তারপর খুব দূর সম্পর্কের এক কাকা তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের কাছে বলতে চার্চে।

কাকা বিয়েটিয়ে করেন নি। তিনি ছিলেন গির্জাবাসী সন্ন্যাসী—সেবাব্রতী এবং ধর্মযাজক। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করা।

লারমোরের দিকে তাকাবার সময় কাকার ছিল না, চার্চের নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে সর্বক্ষণ তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হতো। চার্চে একটা অরফ্যানেজ ছিল, কাকা তাঁকে সেখানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। অনেকগুলো অনাথ পিতৃপরিচয়হীন শিশুর সঙ্গে লারমোরের প্রথম জীবন কাটতে শুরু করেছিল।

মনে পড়ে, অরফ্যানেজে ভর্তি করে দিয়েই কাকা তাঁর কর্তব্য শেষ করে ফেলেন নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু-চার মাস পর পর এসে লারমোরের খোঁজও করতেন। বলতেন, 'বাবা-মা নেই বলে দুঃখ করো না, প্রভুর হয়তো এটাই ইচ্ছে।'

সেই বয়সে লারমোর বুঝতে পারতেন না, বড় বড় অবোধ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতেন।

কাকা আবার বলতেন, 'চারদিকে তাকিয়ে দেখ, জগতে কত ছেলে অনাথ। তোমার তো তবু বলবার মতো একটা পিতৃপরিচয় আছে, ওদের তা-ও নেই। প্রভু করুণাময়, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখো। সব দুঃখ ঘুচে যাবে।'

সেদিন না হলেও, বড় হয়ে কাকার কথাগুলো বুঝতে পেরেছিলেন লারমোর।

ছাত্র হিসেবে চিরদিনই তিনি অসাধারণ মেধাবী। স্কুলের জীবন শেষ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। চার্চই তাঁর পড়ার খরচ চালাত।

জগতে এত শাস্ত্র থাকতে কেন লারমোর চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুরাগী হয়েছিলেন তার কারণ আছে। কারণটা তাঁর পরিবেশ। ছেলেবেলা থেকেই লারমোর তাঁর চারধারে যা দেখেছেন তা হল কল্যাণময় সেবার জগৎ। দেখেছেন সুখ-সাধ-কামনা-বাসনা, নিজেদের বলতে যা কিছু সব বিসর্জন দিয়ে সর্বত্যাগী মিশনারির দলকে পরার্থে জীবন সঁপে দিতে। পবিত্র গির্জা, কল্যাণব্রতী ফাদারের দল এবং কাকা—এঁরা সবাই মিলে তাঁর অস্তিত্ব যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। তাঁদের প্রভাব এত বিপুল, এমন সর্বব্যাপী যে তার বাইরে পা বাড়াবার উপায় ছিল না লারমোরের। অমোঘ নিয়তির মতন তাঁরা যেন লারমোরের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করেছিলেন।

লারমোর তখন ভাবতেন ডাক্তার হতে পারলে মানুষের যতখানি সেবা করা যায়, আর কিছুতেই তা সম্ভব না। তাই স্কুলের পড়া শেষ করেই মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছিলেন। সেই বয়সেই নিজের ভবিষ্যৎ মোটামুটি স্থির করে ফেলেছিলেন লারমোর।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়তে পড়তে হঠাৎ আরেক দিকে চোখ পড়েছিল তাঁর। চার্চে ভারতবর্ষের ওপর লেখা কিছু বই ছিল। নিতান্ত কৌতূহলের বশে একদিন সেগুলো নিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করেছিলেন। ওলটাতে ওলটাতে কখন যে ইন্ডোলজির বইগুলো তাঁকে একেবারে কুহকিত করে ফেলেছে, লারমোর নিজেই জানেন না।

ভারতবর্ষের মানুষ, তার গাছপালা, তার দারিদ্র্য, তার পরাধীনতা, তার রূপকথা, সামাজিক রীতিনীতি—সব মিলিয়ে ভারতবর্ষ যেন এক বিচিত্র স্বপ্নের দেশ। পড়তে পড়তে কখনও ব্যথিত হয়েছেন লারমোর, কখনও অস্থির, কখনও বিহ্বল, কখনও বা মুগ্ধ।

চার্চে ক'খানাই বা বই ছিল! যেখান থেকে পারতেন ইন্ডোলজির আরো বই যোগাড় করে পড়তেন লারমোর। পূর্ব গোলার্ধের এক অজানা দেশ তাঁর নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল যেন। কয়েক হাজার দূর থেকে ভারতবর্ষ তাঁকে অবিরত হাতছানি দিয়ে যাচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ আগেই স্থির হয়ে ছিল। কাকা তখনও জীবিত। মেডিক্যাল কলেজের রেজাল্ট বেরুবার

পর লারমোর তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কাকা বললেন, 'তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছ। আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি মাই বয়। অরফ্যানেজে থেকে অনেক কষ্ট করেছ, প্রভু করুণাময় আজ সে কষ্টের পুরস্কার দিয়েছেন। এখন তোমার কাছে সুখ-অর্থ-প্রতিষ্ঠা, সব কিছুর দরজা খোলা। জীবনে উন্নতি কর, এই আমি চাই।'

মৃদু গলায় লারমোর বলেছিলেন, 'অর্থ-সুখ-প্রতিষ্ঠায় আমার লোভ নেই। আমি—'

'তুমি কী?'

'আমি আপনার মতন মিশনারি হতে চাই।'

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কাকা লারমোরকে বুকের ভেতর টেনে নিয়েছিলেন। আবেগের সুরে বলেছিলেন, 'গড ব্লেস ইউ বয়। প্রার্থনা করি, জগতের সব চাইতে শ্রেষ্ঠ আনন্দ তুমি লাভ কব।'

লারমোর তাঁর বুকের ভেতর থেকে বলেছিলেন, 'একটা কথা—'

'বল।'

'মিশনারি হয়ে আমি এদেশে থাকতে চাই না।'

'তবে কোথায় যাবে?'

'ইন্ডিয়ায়।'

দু চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিলেন কাকা, 'ইন্ডিয়া!'

লারমোর বলেছিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি আমাকে অনুমতি দিন।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

দ্বিধান্বিত সুরে কাকা বললেন, 'নিজের দেশ থাকতে ইন্ডিয়া কেন? সেখানকার কতটুকু জানো তুমি?'

লারমোর বলেছিলেন, 'ওরা বড দুঃখী, বড় গরিব আর পরাধীন।' ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা জানতেন সব বলে গিয়েছিলেন তিনি।

কাকা অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'এত সব কী করে জানলে?'

'বই পড়ে।'

একটু নীরব থেকে কাকা বলেছিলেন, 'যদি মনে করো, ভারতবর্ষের কিছু ভাল করতে পারবে, যাও। আমার আপত্তি নেই। কে কোন জাত, কার গায়ের রং কী, কে কোথাকার বাসিন্দা—এ সব বড় কথা নয়। আসল কথা হল মানুষের কল্যাণ, মানুষের সেবা।'

কাকার সম্মতি পাওয়া গেছে, আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছাও তিনি জানিয়েছেন। কাজেই কোথাও কোনো বাধা ছিল না। মিশনারি হয়ে সোজা ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিলেন লারমোর।

ভারতবর্ষের আর কোথাও না, প্রথমেই তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। সেখানে দিন তিন-চারেক থেকে পূর্ব বাংলায়—এই রাজদিয়াতে।

আজ রাজদিয়ার এই গির্জাটার জরাজীর্ণ করুণ দশা, সেদিন কিন্তু এরকম ছিল না। চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক তকতক করত। দেওয়ালগুলোর পলেস্তারা এমন করে খসে পড়েনি। নতুন কলিতে গির্জাবাড়িটাকে চমৎকার দেখাত।

তখন এখানে ছিলেন ফাদার পারকিন্স। পারকিন্সের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এদেশে থাকতে থাকতে একখানা খানদানী ম্যালেরিয়া বাধিয়ে ফেলেছিলেন, তার ওপর ছিল বাত। বার মাসই অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে হতো। ফলে মিশনের কাজ প্রায় বন্ধ হবার দাখিল। ফাদার পারকিন্সকে সাহায্য করবার জন্যই লারমোর রাজদিয়া এসেছিলেন।

এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফাদার পারকিন্স জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইস্ট বেঙ্গলে আগে কখনও

এসেছ?'

'আজ্ঞে না।' লারমোর জানয়েছিলেন, 'ইস্টবেঙ্গল কেন, ইন্ডিয়াতেই এই আমার প্রথম আসা।'

'এখানে আসার আগে বাংলা ভাষাটা নিশ্চয়ই শিখে ফেলেছ?'

'না।'

'এখানকার হালচালও নিশ্চয়ই জানো না?'

'না।'

এবার স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছিলেন ফাদার পারকিন্স, 'এদেশের কিছুই জানা নেই, এমন আনকোরা সব ছেলে ধরে ধরে পাঠাবে। এদের দিয়ে যে কী করে কাজ চলবে!'

লারমোর উত্তর দেন নি।

ফাদার পারকিন্স আবার বলেছিলেন, 'এসে যখন পড়েছই তখন কী আর করি। প্রথমে বাংলা ভাষাটা শেখ। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে বেরুতেও হবে।'

'আচ্ছা—' তক্ষুণি ঘাড় কাত করেছিলেন লারমোর।

ফাদার পারকিন্স আর দেরি করেন নি, সেদিন থেকেই তালিম দিতে শুরু করেছিলেন।

মাসখানেকের ভেতর বাংলা ভাষাটা কাজ চালাবার মতন শিখে ফেলেছিলেন লারমোর। এর মধ্যে বারকয়েক তাঁকে বেরুতেও হয়েছিল। যেদিন জ্বরটা নতুন করে আসত না কিংবা বাতের ব্যাথাটা ঝিমিয়ে থাকত, সেদিন ফাদার পারকিন্স তাঁকে নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে অথবা দূরের কোনো হাটে পাড়ি জমাতেন। একদিন বলেছিলেন, 'আমার শরীরের অবস্থা তো দেখছ।'

ফাদার পারকিন্স কী বলতে চান বুঝতে না পেরে লারমোর বলেছিলেন, 'আজ্ঞে—'

'বয়েস হয়েছে। রোগে দুর্বল হয়ে পড়েছি। একদিন ভাল যায় তো তিনদিন বিছানায় পড়ে থাকি। আমি একরকম খরচের ঘরেই চলে গেছি। আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে চারদিক ভাল করে দেখে নাও। রাজদিয়া গির্জার সব ভার তোমাকেই নিতে হবে।'

এ দেশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি জেনে না আসার জন্য প্রথম দিন বিরক্ত হয়েছিলেন ফাদার পারকিন্স। তাতে মনে মনে দমে গিয়েছিলেন লারমোর। কিন্তু মাসখানেক নিরন্তর মেলামেশার ফলে বোঝা গিয়েছিল ফাদার পারকিন্স মানুষটি বেশ সজ্জন, বিবেচক, হৃদয়বান। কোনো ব্যাপারে লারমোরের অসুবিধা হচ্ছে কিনা, অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটছে কিনা—সে সব দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। ধীর ধীরে মানুষটিকে ভালই লেগেছিল লারমোরের।

সেদিন কথার উত্তরে লারমোর বলেছিলেন, 'এ আপনি কী বলছেন?'

'কী বলছি?'

'আপনি থাকতে গির্জার ভার আমি নেব! আমি জানিই বা কী, বুঝিই বা কী?'

ফাদার পারকিন্স হেসেছিলেন, 'আমি তো চিরকাল থাকব না। শরীরের যা অবস্থা তাতে আজ আছি কাল নেই। আমি যখন থাকব না তখন কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে।'

লারমোর ব্যথিত সুরে বলেছিলেন, 'মৃত্যুর কথা এখনই ভাবছেন কেন? অত বয়েস আপনার হয়নি।'

তাঁর পিঠে হাত রেখে ফাদার পারকিন্স বলেছিলেন, 'যতই তুমি কমাতে চাও না, যথেষ্ট বয়েস আমার হয়েছে। বয়েসটা বড় কথা নয়, শরীর যদি ভাল থাকত! অসুস্থ রুগ্ন দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। সে যাক গে, যতদিন বাঁচব রাজদিয়াতে আছি, ততদিন তোমার চিন্তা নেই।'

হাটে-গঞ্জে কি দূর নদীর চরে গিয়ে ফাদার পারকিন্স কিছুক্ষণ জিরোতেন। জিরোতে জিরোতে বলতেন, 'আমার দেশ ব্রিটেন, তোমার আয়ার্ল্যান্ড। জন্মভূমি ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে কেন আমরা এত দূরে এসে পড়ে আছি, বল তো?'

লারমোর বলতেন, 'আজ্ঞে আমরা মিশনারি, মানুষের কল্যাণের জন্যে, তাদের সেবা করতে—'

বাধা দিয়ে ফাদার পারকিন্স বলতেন, 'সেবা-টেবা তো আছেই। আরো একটা বড় ব্যাপার আছে।'

'কী?'

'প্রিচিঙ। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অন্ধকারের বাসিন্দারা কিলবিল করে বেড়াচ্ছে, তাদের আলোকমন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে। সেই জন্যেই আমরা মিশনারিরা সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়েছি। যেখানে যতদূরে যে মানুষই থাক, প্রভুর বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াতেন ফাদার পারকিন্স, 'দেখে কিভাবে প্রিচ করতে হয়, কিভাবে সল্স অফ সিনারদের আলোকের মাঝখানে নিয়ে আসতে হয়। দেখে দেখে শেখো, এরপর তোমাকেও এভাবে প্রিচ করতে হবে।'

লারমোর কিছু বলতেন না, অসীম কৌতূহলে তাকিয়ে থাকতেন।

এবার আর লারমোরের দিকে নজর থাকত না ফাদার পারকিন্সের। নদীর চর কিংবা হাটের জনতাকে ডেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতেন, 'আইস আইস পাপাচারীর সন্তানেরা, তোমাদের আমি আলোকের পথে লইয়া যাইব। প্রভু যিশুই সেই আলোক, যিশুই পথ। নিজের রক্তে তিনি এই জগৎকে শুচি করিয়া গিয়াছেন।' এইভাবে অনেকক্ষণ চেঁচাবার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়তেন। লারমোরকে বলতেন, 'দেখলে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' লারমোর মাথা নাড়তেন।

'আমার বয়েস হয়েছে, বেশিক্ষণ চেঁচাতে পারি না। বাংলা ভাষাটা তো কাজ চালাবার মতন শিখেছ। এবার তোমাকেই কিন্তু প্রিচ করতে হবে।'

'আচ্ছা—'

'আসার সময় থলে বোঝাই করে মথি আর লূক লিখিত সুসমাচার আনা হতো, নির্দেশমতন হাটুরে অথবা চরের মানুষদের হাতে হাতে বিলিয়ে দিতেন লারমোর।

এইভাবে মাস পাঁচেক কাটল। তারপর ফাদার পারকিন্স নিজের সম্বন্ধে যা আশঙ্কা করেছিলেন তা-ই ঘটল। তিনদিনের ধুম জ্বরে মারা গেলেন।

ফাদার পারকিন্সের মৃত্যুর পর রাজদিয়া গির্জার সব দায়িত্ব এসে পড়ল লারমোরের হাতে। পারকিন্স যেমন যেমন শিখিয়েছিলেন, প্রথম প্রথম তা-ই করতেন লারমোর। চার্চের সম্পত্তি দুটো নৌকো আর একখানা ফিটন ছিল। ফিটন চালাত কাদের। এখানে আসা থেকেই কাদেরকে দেখছেন লারমোর, সে তাঁর দীর্ঘকালের সহচর। খরার দিনে ফিটন, নইলে নৌকো করেই প্রচার করতে বেরুতেন লারমোর। সুজনগঞ্জে, কমলাঘাটে কি রসুলপুরের হাটে কিংবা নদীর চরে চরে ঘুরে তিনি চেঁচাতেন, 'ঐ মহাপ্রলয় আসিল, ঐ ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল। আইস আইস—'

চিৎকারের পর সুসমাচার বিতরণ। তারপর চার্চে ফিরে আসা।

এই নিয়মেই দিন যাচ্ছিল, দিন আসছিল। এর মধ্যে হঠাৎ একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

সেদিন সুজনগঞ্জে প্রিচ করছিলেন লারমোর। কৌতূহলী জনতা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল।

যথারীতি আলোকমন্ত্রে দীক্ষার কথা বলে সুসমাচার বিলি করতে শুরু করলেন লারমোর। লালচে কাগজে ছাপা চার পৃষ্ঠার পুস্তিকাগুলো প্রতি হাটেই তিনি নিয়ে যান। সবাই হাত পেতে নেয়, কিছু বলে না। সেদিন কিন্তু কালো দোহারা চেহারার একটি যুবক, তাঁরই সমবয়সী হবেন, সুসমাচারটা নিয়ে বললেন, 'আপনি বুঝি এখানে নতুন?'

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন লারমোর। ছ' আট মাস প্রিচ করছেন, সুজনগঞ্জের হাটে তাঁর চারধারে যারা ভিড় জমায় তাদের সকলেই তাঁর মুখচেনা। জনতার মধ্যে যুবকটিকে আগে আর কখনও দেখেন নি।

লারমোর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি নতুন। ক'মাস হল, এ দেশে এসেছি।'

'তাই হবে। মাসকয়েক আমি এখানে ছিলাম না, থাকলে আগেই আপনার সঙ্গে আলাপ হতো। আপনি নিশ্চয়ই রাজদিয়ার চার্চে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা একা প্রিচ করতে বেরিয়েছেন যে? ফাদার পারকিন্স কোথায়?'

'ফাদার পারকিন্সকে আপনি চেনেন!'

'চিনি বৈকি, আমাদের অনেক দিনের পরিচয়, উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

একটু চুপ করে থেকে লারমোর বলেছিলেন, 'ফাদার পারকিন্স নেই।'

যুবক যেন চকিত হয়ে উঠেছিলেন, 'মানে!'

'মাস চারেক হল মারা গেছেন।'

আক্ষেপের সুরে যুবক বলেছিলেন, 'উনি মারা গেলেন অথচ আমি জানতেই পারি নি। ওঁর কাছে কত আবদার করেছি, কত উৎপাত করেছি—' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর লারমোরই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এখানে আপনি কোথায় থাকেন?'

'রাজদিয়ায়। রাজদিয়ার দক্ষিণ দিকের শেষ বাড়িখানা আমাদের।'

'তবে তো ভালই হল। মাঝে মাঝে চার্চে আসবেন।'

'নিশ্চয়ই আসব।'

একটু ভেবে লারমোর বলেছিলেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ-টালাপ হল, নামটাই কিন্তু জানা হয় নি ভাই—'

যুবক বলেছিলেন, 'আমার নাম হেমনাথ মিত্র।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন—'

'তখন বললেন না মাঝখানে ক'মাস আপনি এখানে ছিলেন না—'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিলেন তবে?'

'ঢাকায়। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষাটা বাকি ছিল, সেটা দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে এলাম।'

'কী সাবজেক্ট ছিল আপনার?'

'দর্শন—'

'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল, আসবেন কিন্তু চার্চে। আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

সেদিন ঐ পর্যন্ত।

পরের হাটে আবার হেমনাথের সঙ্গে দেখা। 'ঐ জলপ্রলয় আসিল, ঐ ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল—' বলে কণ্ঠস্বর যখন শীর্ষবিন্দুতে তুলেছেন লারমোর সেই সময় চোখে পড়েছিল, হাটুরে জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন হেমনাথ, ঠোঁট টিপে টিপে হাসছেন।

অমন হাসির কারণ কী থাকতে পারে? মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন লারমোর।

প্রিচিংয়ের পর সুসমাচার বিতরণ-টিতরণ হয়ে গেলে লারমোর হেমনাথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, 'ভাল আছেন?'

হেমনাথ ঘাড় কাত করেছিলেন, 'আছি। আপনি?'

'ঐ একরকম। আপনাকে কিন্তু চার্চে খুব আশা করেছিলেন। রোজই ভেবেছি, আসবেন। আসেন নি।'

বিব্রতভাবে হেমনাথ বলেছিলেন, 'বাড়ির ক'টা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। দু-একদিনের ভেতর

ঠিক যাব।'

লারমোর বলেছিলেন, 'বুঝতেই পারেন, এদেশে নতুন এসেছি। আপনজন কেউ নেই। ফাদার পারকিন্স ছিলেন, তিনি তো মারাই গেছেন। চার্চে যতক্ষণ থাকি একরকম মুখ বুজে থাকতে হয়। আপনাকে কেন জানি সামান্য আলাপেই বন্ধু বলে ভাবতে শুরু করেছি।'

'নিশ্চয়ই ভাববেন। দেখবেন, এরপর থেকে চার্চে এতবার হানা দেব যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন।'

'দেখা যাবে।'

একটু চুপ। তারপর সামান্য দ্বিধার সুরে লারমোর বলেছিলেন, 'একটা ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করছে।'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আমি যখন হাটের লোকগুলোর কাছে প্রভু যিশুর কথা, বাইবেলের কথা বলছিলাম তখন হাসছিলেন কেন?'

'এমনি।'

'না, এমনি না। কারণ আছে।'

হেমনাথ স্বীকার করেছিলেন, 'আছে।'

'কী সেটা?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন লারমোর।

'তার আগে বলুন আপনি এদেশে কী করতে এসেছেন?'

'ধরুন প্রিচ করতেই।'

'তাহলে বলব আপনার আসাটা পুরোপুরি বিফলে যাবে।'

'কেন?' লারমোরের চমক লেগেছিল।

হেমনাথ বলেছিলেন, 'যে-ভাষায় আপনি ওদের বোঝাতে চাইছেন সেটা ওদের ভাষা নয়, ওরা তো বোঝে না।'

'কিন্তু—'

'বলুন।'

'এটা তো বাংলা ভাষাই।'

'একশো বার।'

'তবে?'

হেমনাথ বলেছিলেন, 'তাহলে পরিষ্কার করেই বলি। ধরুন আমি বাঙালি। এই হাটে যত মানুষ আছে তারাও বাঙালি। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। যতখানি ভাবতে পারি, বুঝতে পারি, ওরা নিশ্চয়ই তা পারে না। সাধারণ মানুষের নিজস্ব ভাষা আছে, তাদের বোঝাতে হলে সেটা জানা দরকার। সেটা না জানলে ওদের কাছে পৌঁছুনো যাবে না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'শুনেছি, ফাদার পারকিন্সও এখানে কুড়ি বছরের মতন কাটিয়েছেন। তিনিও ঐ ভাষাতেই প্রিচ করতেন। আপনার কি ধারণা কুড়ি বছর ধরে তিনি ভুল করে গেছেন?'

উত্তরা না দিয়ে একটি হাটুরে লোককে ডেকে এনেছিলেন হেমনাথ। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পাদ্রীসাহেব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যা বলছিলেন, বুঝতে পেরেছে?'

লোকটা মাথা নেড়েছে, 'আইজ্ঞা না। বড় পাদ্রীও (পারকিন্স) এইরকম খটর মটর কইরা কী জানি কইত। কার বাপের সাইধ্য বোঝে।'

'আচ্ছা, তুমি যাও।'

লারমোরের চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গিয়েছিল যেন। লোকটা চলে গেলে বলেছিলেন,

'এই জন্যেই বুঝি তখন মিটিমিটি হাসছিলেন।'

হেমনাথ ঘাড় হেলিয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাষা শিখব কি করে?'

'তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। তাদের প্রতিদিনের সুখদুঃখের ভাগীদার হতে হবে। তবেই শেখা যাবে।'

লারমোর এবার নীরব থেকেছেন।

হেমনাথ আবার বলেছিলেন, 'ফাদার পারকিন্স সম্বন্ধে আমার কী ধারণা জানেন?'

'কী?'

'কুড়ি বছর প্রিচ করেও খুব একটা কিছু উনি করতে পারেন নি।'

লারমোর চুপ।

হেমনাথ থামেন নি, 'এই প্রিচিঙের ব্যাপারে আমার একটা কথা মনে হয়।'

'কী কথা?'

বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলেন হেমনাথ। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেছিলেন, 'আপনার সঙ্গে সবে আলাপ হয়েছে, এক্ষুণি বললে আপনি আহত হবেন, ভুলও বুঝতে পারেন। তাই এখন নয়, তেমন বুঝলে পরে বলব।'

পরেই বলেছিলেন। ততদিনে লারমোরের সঙ্গে বন্ধুত্বের রং পাকা হয়ে গিয়েছিল। ভুল বোঝার অবকাশ আর ছিল না। দিনে তিনবার করে তখন তিনি চার্চে আসতেন। 'আপনি' থেকে কবে যে সম্বোধনের ভাষাটা 'তুমি'তে নেমেছিল, নিজেদেরই খেয়াল নেই।

হেমনাথ বলেছিলেন, 'আমার কী মনে হয় জানো, এই প্রিচিঙের কোনো প্রয়োজন নেই।'

ভ্রু কোঁচকানো ছোট করে লারমোর শুধিয়েছিলেন, 'কেন?'

'এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্মে নিয়ে মানুষের কোনো উপকার করা যায় বলে আমর মনে হয় না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'খ্রিস্টধর্ম জগতের সব চাইতে সেরা ধর্ম, এটা তো তুমি মানবে।'

'খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে আমার অসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু কোনো ধর্মের চাইতে কোনো ধর্ম খাটো, এ আমি মানি না।'

অনেক তর্কাতর্কির পর হেমনাথ বলেছিলেন, 'তুমি অন্য ধর্ম সম্বন্ধে কতটুকু জানো?'

'কিছু কিছু জানি।'

'আমার কাছে অনেক বই আছে, ভাল করে পড়ে দেখ। দেখবে কোনো ধর্মই অ্যান্টি-হিউম্যান নয়।'

'বেশ, বইগুলো দিও।'

অন্য ধর্ম সম্বন্ধে লারমোরের ধারণা ছিল ভাসা-ভাসা, অস্বচ্ছ। বইগুলো পড়বার পর তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল, চোখের মণিতে নতুন ছটা এসে লেগেছিল যেন। মনে হয়েছিল, প্রিচিঙ নিরর্থক। যুগ-যুগান্ত ধরে আপন পিতৃপুরুষের ধর্মবোধ নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে মানুষ হয়তো পরম শান্তিতে আছে, তাকে উন্মূল করে অন্য মাটিতে স্থাপনা করতে যাওয়া ঠিক নয়, সম্ভবত তা নিষ্ঠুরতাও। লারমোর স্থির করেছিলেন, আর প্রিচিঙ করবেন না। অন্যভাবে মানুষের কল্যাণের কথা ভাববেন। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, আলাদা কথা।

সিদ্ধান্তটা নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ ঘটেছিল। কলকাতার মিশন এখানকার গ্রান্ট বন্ধ করে দিয়েছিল। যে কথা হেমনাথকে বলতেই একখানা উষ্ণ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বাবা তখনও জীবিত। বাবাকে বলে চার্চের নামে পঁচিশ বিঘে জমি লিখে দিয়েছিলেন। ঐ জমি থেকেই চার্চের খরচ

চলবে।

লারমোর বলেছিলেন, 'খাওয়া-পরার ব্যাপারে তো নিশ্চিন্ত করলে। কিন্তু আরেক দিক থেকে যে ভাবনা বাড়ল। প্রিচিঙ ছিল, তবু একটা কাজের মধ্যে থাকতাম। এখন থেকে যে একেবারে নৈষ্কর্ম ব্রত।'

হেমনাথ বলেছিলেন, 'কে বললে? এখন থেকেই তো আসল কাজ শুরু।'

'কিরকম?'

'তুমি ডাক্তার তো?'

'হ্যাঁ।'

'এ দেশ বড় গরিব। বিনা চিকিৎসায়, বিনা ওষুধে ভুগে ভুগে কত মানুষ যে প্রতিদিন মরে যাচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে হাটে-হাটে ঘুরে তাদের সেবা শুরু কর। দেখবে কাজের অন্ত নেই।'

ঈশ্বরের নির্দেশ যেন হেমনাথের মধ্যে দিয়ে এসে গিয়েছিল। লারমোর তাঁর পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। পূর্ববাংলার গাছপালা, শস্যপূর্ণ মাঠ, নদী, বন, মনোহর পাখির ঝাঁক, এখানকার মানুষ, তাদের সুখদুঃখ, শোক-উৎসব—সমস্ত একাকার হয়ে লারমোরকে যেন মগ্ন করে রেখেছে।

কাহিনী শেষ করে লারমোর হাসলেন, 'এই আমার জীবন। অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ। নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল লাগল না।'

কেউ কোনো কথা বলল না, অভিভূতের মতন সবাই বসে থাকল।

এদিকে সূর্যটা কখন যে খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে সেদিকে চোখ পড়তেই লারমোর চঞ্চল হলেন, 'চল, চল। ঢের বেলা হয়ে গেছে। চান-টান সেরে নেওয়া যাক।'

রাজদিয়ায় দুর্গাপুজোর চাইতে লক্ষ্মীপুজোর সমারোহ অনেক বেশি। সারা রাজ্যে দুর্গাঠাকুর আর ক'টা? বারোয়ারি-টারোয়ারি ধরে মোট সাতখানা। আর লক্ষ্মীপুজো? তার লেখাজোখা নেই। বারুইপাড়ায়-যুগীপাড়ায় বামুন পাড়ায়- কায়েতপাড়ায়—সারা রাজদিয়াতে যেখানে যত বাড়ি, সব জায়গায় কোজাগরী পূর্ণিমার দিন ঘরদোর নিকিয়ে অলপনা-এঁকে লক্ষ্মী এনে বসানো হয়। এখানে ঘরে ঘরে লক্ষ্মীবন্দনা। ধন-সম্পদ আর পরিপূর্ণতার এই দেবীর আরাধনা করতে কেউ ভোলে না।

রাজদিয়ায় দুর্গাপুজো হয় প্রতিমা বানিয়ে। লক্ষ্মীর বেলায় কিন্তু অন্য নিয়ম। কেউ জলপূর্ণ ঘটে আম্রপল্লব আর শিষওলা ডাব বসিয়ে, তাতে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে পুজো সারে। তবে বেশির ভাগ লোকই কুমোরপাড়া থেকে লক্ষ্মীসরা কিনে আনে, জলচৌকি কিংবা মাটির বেদীর ওপর বসিয়ে তাব পুজো হয়।

বিনুরা লারমোর গির্জায় গিয়েছিল একাদশীর সকালে। মাঝখানে তিনটে দিন। তারপরই কোজাগরি পূর্ণিমা অর্থাৎ লক্ষ্মীপূজো এসে গেল।

মাঝের তিনদিন নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না স্নেহলতার। শুধু কি স্নেহলতার? শিবানী-উমা-গৌরদাসী—এ বাড়ির মানুষগুলো নাইতে-খেতে এমন কি চোখের পাতা এক করতেও ভুলে গিয়েছিল।

কাজ কি একটুখানি? দেড় মণ চালের মুড়ি ভাজা হয়েছে এর ভেতর, আধ মণ ধানের খই। চিঁড়েও

কোটা হয়েছে মণখানেক। তার ওপর তিলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, মুগের নাড়ু, নারকেলের সন্দেশ-চন্দ্রপুলি-ছাপা, মুড়ি-চিঁড়ে-খইয়ের মোয়া—এসব তো আছেই।

লক্ষ্মীপুজোর দিন সকালবেলা উঠেই ঘরদোর ধোয়ামোছা শুরু করলেন স্নেহলতা, অবনীমোহন আর হেমনাথকে পুজোর বাজার করতে পাঠালেন সুজনগঞ্জের হাটে। বার বার বলে দিলেন হাটে গিয়ে যেন ফেরার কথা ভুলে না যান হেমনাথ। বিকেলের ভেতর এসে না পৌঁছুলে পুজোই হবে না।

হেমনাথরা চলে গেলে স্নেহলতা সুধা-সুনীতিকে ডাকলেন, 'এই যে দিদিভাইরা, তোদের কিন্তু আজ অনেক কাজ—'

সুধা-সুনীতি বলল, 'কী কাজ দিদা ?'

'চালের গুঁড়ো গুলে রেখেছি, তাই দিয়ে সারা বাড়ি আলপনা দিতে হবে।'

'ওরে বাবা—'

'কী হল ?'

সুধা-সুনীতি একসঙ্গে হাত নেড়ে বলতে লাগল, 'ওসব আমরা পারব না।'

'পারবি না কিরকম ?' চোখ কুঁচকে স্নেহলতা তাকালেন। একটু অপ্রসন্নই হয়েছেন তিনি, 'পারতেই হবে—'

'বা রে—'

'কী ?'

'আমরা কোনোদিন আলপনা দিয়েছি নাকি !'

'না দিয়েছিস বেশ করেছিস, এখন দিতে হবে।' স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'কলকাতায় থেকে থেকে তো মেমসাহেব হয়ে উঠেছ। যতই যা-ই হও, নাচো আর গাও, উর্দু পড় আর ফারসি পড়—বাঙালির ঘরের মেয়ে তো। পুজোআর্চা, সংসারের কাজ—এ সব শিখতেই হবে। মেমসাহেবি করে দিন কাটালে চলবে না।'

সুধা-সুনীতি কিছু বলল না।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'আমার কাছে যখন এসেই পড়েছ তখন আর নিস্তার নেই। দুপুরবেলা আমি আলপনা দিতে বসব। আমারটা দেখে দেখে শিখে নেবে, বুঝলে ?'

সুধা-সুনীতি একসঙ্গে ঘাড় কাত করল, 'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা—'

'কী ?'

'সকালবেলা কিছু খেয়েছিস ?'

'না।'

'ভালই হয়েছে, কিছু খাস-টাস নি। একেবারে পুজো হয়ে গেলে খাবি।'

সুধা-সুনীতি আঁতকে উঠল, 'পুজো তো হবে সেই রাত্তিরে !'

স্নেহলতা তাকালেন, 'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে ?'

'অতক্ষণ উপোস দিয়ে থাকতে হবে।'

'কতক্ষণ আর, একটা বেলা তো মোটে।'

দুই বোনে নাকে-কান্না জুড়ে দিল, 'রাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে মরে যাব, একেবারে মরে যাব।'

স্নেহলতা ওদের কাণ্ড দেখে হেসে ফেললেন, 'মরে যাবি কি বেঁচে থাকবি দেখা যাবে'খন।'

সুধা-সুনীতির কাঁদুনির মধ্যে স্নেহলতা গলা তুলে ডাকলেন, 'বিনু—বিনু—বিনুদাদা—'

ভেতর-বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে স্নেহলতারা কথা বলছিলেন, আর বাইরের দিকে দক্ষিণের ঘরের

বারান্দায় বসে পড়ছিল বিনু। সেখান থেকে স্নেহলতাদের দেখতে পাচ্ছিল সে, কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছিল।

স্নেহলতার ডাক কানে যেতেই বিনু ছুটে এল। বলল, 'কী দিদা ?'

'আজ আর পড়তে হবে না।'

বিনু ভারি খুশি, তার চোখ চকচক করতে লাগল।

স্নেহলতা বললেন, 'একটা কাজ করতে পারবি ?'

কী কাজ না জেনেই বিনু তক্ষুণি রাজি। মাথা অনেকখানি হেলিয়ে বলল, 'হুঁ-উ-উ—'

'হুঁ তো করলি, আমি যদি বলি আকাশের চাঁদ পেড়ে এনে দে, পারবি ?'

'আহা—'

'আহা কী ?'

'তুমি অমন কথা বলবেই না।'

'আমার ওপর খুব বিশ্বাস দেখছি।'

আবার আগের মতন ঘাড় কাত করল বিনু, 'হুঁ—'

স্নেহলতা এবার কাজের কথায় এলেন, 'একবার কুমোরপাড়ায় তোকে যেতে হবে দাদাভাই। বুধাই পালকে চিনিস তো, তাদের বাড়ি।'

'কেন ?'

'আজ পুজো। লক্ষ্মীসরা আনতে হবে না ?'

'লক্ষ্মীসরা কী দিদা ?'

'কুমোরপাড়ায় গেলেই দেখতে পাবি। বুধাই পালকে বলবি, ভাল দেখে যেন সরা দেয়, বুঝলি ?'

'আচ্ছা। এক্ষুণি যাব ?'

'হ্যাঁ।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল। একটু থেমে কী ভেবে নিলেন স্নেহলতা, তারপর বললেন, 'পাঠাব তো। কিন্তু যুগলটা ওদের সঙ্গে হাটে গেল।'

বেরুবার মুখে পাছে বাধা পড়ে যায়, সেই ভয়ে বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বুধাই পালের বাড়ি আমি চিনি, ঠিক চলে যেতে পারব।'

কুমোরপাড়ায় দু'ভাবে যাওয়া যায়। নৌকোয় করে কিংবা পায়ে হেঁটে। হেঁটে গেলে অনেকখানি ঘুরতে হবে—সেই স্টিমারঘাটা, বরফ কল, মাছের আড়ত বাঁয়ে ফেলে মাইলখানেক পাড়ি দিলে তবে কুমোরপাড়া। বিনু হেঁটে যাবার কথাই ভাবছিল।

স্নেহলতা বললেন, 'কিভাবে যাবি ?'

'হেঁটে।'

'না—না, অতখানি রাস্তা হেঁটে যাওয়া-আসা সোজা নাকি। তোকে পাঠিয়ে শেষে একটা বিপদে পড়ি।'

বিনু কি বলতে যাচ্ছিল, এই সময় এ বাড়ির দ্বিতীয় কামলা করিম এসে হাজির। তাকে পেয়ে সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল।

স্নেহলতা বললেন, 'এই করিম, তোর এখন কী কাজ ?'

করিম জানাল, বাগানের দক্ষিণ কোণায় যে লেবুবতী আমের গাছটা বাজে পুড়ে ভূতের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা কেটে ফেলতে হবে। হেমনাথ তা-ই বলে গেছেন। গাছটা কাটবার জন্য একটা কুড়ুল যোগাড় করতে ভেতর-বাড়িতে এসেছিল সে।

স্নেহলতা বললেন, 'এখন তোর গাছ কাটতে হবে না। বিনুকে নিয়ে নৌকোয় করে একটু কুমোরপাড়ায় যা।'

করিম চোখেমুখে ভয় ফুটিয়ে বলল, 'আরে সব্বনাশ!'

'কী হল?'

'গাছ না কাইটা অহন যদি কুমারবাড়ি যাই বড়কত্তায় আইসা আমারে শ্যাম করব।'

'কিছু করবে না, তুই যা।'

'আপনে কিন্তুক দায়ী রইলেন। বড়কত্তায় যদি কিছু কয় আপনে আমারে বাচাইবেন।'

স্নেহলতা বললেন, 'আচ্ছা, সে ভাবনা তোকে করতে হবে না। যা বলবার আমি তাকে বলব'খন। 'বিনুকে বললেন, 'যা দাদাভাই ওর সঙ্গে—'

ছুটে দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় চলে গেল বিনু। বইপত্র ছত্রাকার হয়ে ছিল। সেগুলো গুছিয়েরেখে বেরুতে যাবে, সেই সময় কোত্থেকে ঝিনুক এসে পড়ল। তীক্ষ্ণ ধারাল চোখে বিনুকে দেখতে দেখতে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'কুমোরবাড়ি।' বলেই কারিমের সঙ্গে চলতে শুরু করল বিনু।

'কেন?'

'লক্ষ্মীসরা আনতে।'

'আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

'না।'

'হ্যাঁ যাব।'

মেয়েটা যেন আঠার মতন সব সময় পেছনে লেগে আছে। যেখানেই বিনু যাক, যা-ই করুক—তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিচ্ছু হবার উপায় নেই। মনে মনে খুব বিরক্ত হচ্ছিল বিনু। বলল, 'না।'

ঝিনুক সঙ্গ ছাড়ল না, পেছনে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল, 'নিয়ে চল না, নিয়ে চল না—'

বিনুর সেই এক উত্তর, 'না।'

আশায় আশায় পুকুরঘাট পর্যন্ত এল ঝিনুক। কিন্তু যখন দেখল সে উঠবার আগেই বিনুরা তাড়াতাড়ি উঠে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে তখন কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে জড়ানো গলায় বলল, 'সেই কথাটা তোমার মাকে বলে দেব।'

সেই কথাটা বলতে জলে ডোবার ব্যাপারটা। বার বার একই অস্ত্র দেখিয়ে মেয়েটা তাকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখবে, তা তো আর হয় না। তা ছাড়া অনেক দিন হয়ে গেছে, সেই ব্রহ্মাস্ত্রের ধারও আর তেমন নেই। তাচ্ছিল্যের সুরে বিনু বলল, 'বল গে—'

কুমোরপাড়ার কাছাকাছি আসতেই বিনুরা দেখতে পেল, খালপাড়ে কত নৌকো যে এসে জমেছে তার লেখাজোখা নেই।

বিনু অবাক। শুধলো, 'এত নৌকো কিসের করিম?'

করিম বলল, 'মনে লাগে, পিতিমা-টিতিমা নিতে আইছে।'

খালের ধারে সারি সারি বউন্যা গাছ। তাদের একটার ডালে নৌকো বেঁধে করিম আর বিনু ওপরে উঠে এল।

কুমোর পাড়ায় ঢুকতেই দেখা গেল, মেলা বসে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে কত মানুষ যে লক্ষ্মীসরা কিনতে এসেছে! পটুয়াদের ঘিরে ধরে সমানে তাড়া দিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে, 'পাল মশয় আমারে আগে দ্যান—'

আরেক জন অমনি বলে উঠল, 'না পাল মশয়, আমারে আগে। হেই ভোর রইতে আইছি, বেলা দুফার হইতে চলল।'

অন্য একজন বলল, 'পাল মশয় আমার কথাখান বিবেচনা করেন। আমারে যাইতে হইব হেই গিরিগুঞ্জে। যাইতে যাইতে বিকাল হইয়া যাইব।'

পটুয়ারা কেউ বসে নেই, রং তুলি দিয়ে বড় বড় মাটির সরার উলটো পিঠে লক্ষ্মীর চিত্র এঁকে চলেছে। ঝড়ের গতিতে তাদের হাত চলছে। এত ব্যস্ততা যে হুঁকোতে দুটো টান দেবারও ফুরসত পাচ্ছে না।

বুধাই পালের বাড়িতেও সেই একই দৃশ্য। তাকে ঘিরে প্রায় শ'খানেক লোক উদ্‌গ্রীব বসে আছে।

বুধাই পাল তার তিন ছেলেকে নিয়ে সরা চিত্তির করছিল। একা কেউ সবটা করছে না। কেউ হয়তো হাত-পা মুখ আঁকছে, কেউ চোখ ফোটাচ্ছে, কেউ প্যাঁচাটা বসাচ্ছে। প্রথম ছেলের হাত থেকে দ্বিতীয় ছেলের হাতে, তারপর তৃতীয় ছেলের হাত ঘুরে বাপের কাছে এসে ছবিটা সম্পূর্ণ হচ্ছে।

একেকটা সরা শেষ হলে তৎক্ষণাৎ সেটা কিনে নিয়ে একেক জন খদ্দের চলে যাচ্ছে।

বিনুরা একটুক্ষণ দাড়িয়ে থাকল। সরা থেকে যে চোখ তুলবে তেমন ফাঁকই পাচ্ছে না বুধাই পাল, পেলে নিশ্চয়ই তাদের দেখতে পেত।

কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়। করিম হঠাৎ ডাকল, 'পাল মশয়—'

এবার তাকাল বুধাই পাল। তাকিয়েই বিনুকে দেখে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'ওরে ক্যাঠা আছস রে, একখান জলচৌকি লইয়া আয়। হ্যামকত্তার নাতি আইছে।'

তক্ষুণি একখানা জলচৌকি চলে এল। বিনুকে তার ওপর বসিয়ে বুধাই বলল, 'কী মনে কইরা নাতিবাবু?'

বিনু বলল, 'লক্ষ্মীসরা নিতে এসেছি।'

অন্য কাজ ফেলে, সবাইকে বসিয়ে রেখে খুব যত্ন করে একখানা সরা চিত্তির করল বুধাই পাল। গোটা সরাটা একাই আঁকল সে, ছেলেদের কিছুই করতে দিল না।

অন্য খদ্দেররা অসন্তুষ্ট। চাপা গলায় তারা বলতে লাগল, 'এইটা কেমুন বিচার। আমরা এতক্ষণ বইসা আছি—'

বুধাই পাল বলল, 'বিচার-টিচার বুঝি না। হ্যামকত্তার নাতি আইছে। তারটা আগে কইরা দিতেই হইব। যদি তোমরা গোসা হও আমার কিছুই করনের নাই।'

লোকগুলোর ভেতর থেকে কেউ আর কিছু বলল না।

সরাটা আঁকা হলে বিনুর হাতে দিতে দিতে বুধাই পাল বলল, 'ধরেন নাতিবাবু—'

হাতে নিয়ে বিনু অবাক। লক্ষ্মীর ছবি না, বুধাই পাল সরার ওপর দুর্গা মূর্তি এঁকেছে। অবশ্য কার্তিক-গণেশ-সরস্বতীর মতন লক্ষ্মীও তাতে আছে। বিনু বলল, 'এ কি, এটা যে দুর্গা ঠাকুর!'

বুধাই পাল হসল, 'হ, দুর্গাঠাকুরই। কোজাগরীতে আপনের দাদুর বাড়িতে এই সরাই পূজা হয়।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি দেখলাম, কাউকে কাউকে শুধু লক্ষ্মী ঠাকুর এঁকে দিলেন—'

'তাগো তা-ই নিয়ম। হ্যামকত্তার বাড়ির নিয়ম হইল কোজাগরীতে দুর্গামূর্ত্তি পূজা। আপনে নিশ্চিন্ত মনে লইয়া যান—'

লক্ষ্মীসরা নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুপুর। পুকুরঘাটে নেমে বাগান আর বাইরের দিকে উঠোন পেরিয়ে সবে ভেতর-বাড়িতে পা দিয়েছে, সুরমা ছুটতে ছুটতে এসে তার কান টেনে ধরলেন, 'হারামজাদা বাঁদর—'

এইরকম একটা অভ্যর্থনা কল্পনাই করে নি বিনু। প্রথমটা হতভম্ব, তার পরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করেছি আমি? কী করেছি?'

'কী করেছি?' বলেই এক চড় কষালেন সুরমা, 'কেন, কেন তুই ঝিনুককে নিয়ে গেলি না? জানিস না মেয়েটার কত কষ্ট!'

বিনু লক্ষ করল, মায়ের ঠিক পিছনেই ঝিনুক দাঁড়িয়ে। রাজদিয়াতে আসার দিন থেকেই মেয়েটার

প্রতি মায়ের পক্ষপাতিত্ব। নিশ্চয়ই এমন করে সে লাগিয়েছে যাতে মা রেগে গেছেন।

ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে মাথার ভেতরটা যেন জ্বালা করতে লাগল বিনুর, তারপরেই লজ্জায় অপমানে চোখের মণিদুটো ফেটে জল বেরিয়ে এল।

আরো দু-চারটে চড়টড় হয়তো পড়ত, তার আগেই এঘর ওঘর থেকে সুধা-সুনীতি, স্নেহলতা-শিবানী—সবাই ছুটে এলেন। সুরমার হাত থেকে বিনুকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে স্নেহলতা বকাবকি করতে লাগলেন, 'এই পুজোর দিনে ছেলেটার গায়ে হাত তুললি! কী যে তোদের রাগ, বুঝি না।' ঝিনুককে দেখিয়ে বললেন, 'আর ঐ এক মেয়ে হয়েছে—'

সন্ধের পর চন্দনের পাটার মতন কোজাগরীর পরিপূর্ণ চাঁদ উঠল। আলোয় আলোয় চরাচর ভেসে যেতে লাগল। তার একটু পর এল পুরুত। আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন স্নেহলতা। পুরুত এসেই পুজোয় বসে গেল।

পুজোটুজো হয়ে গেলে প্রসাদ বিতরণের পালা। রাতদুপুর পর্যন্ত রাজ্যের লোক এসে প্রসাদ খেয়ে গেল।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ করেছে, দুপুরবেলা সেই মারধোরের পর থেকে সারাদিন অপরাধীর মতন মুখ করে তাব পেছনে ঘুর ঘুর করেছে ঝিনুক। বিনু কিন্তু নিজের মনকে পাষাণ করে ফেলেছে, একটি কথাও বলে নি। চোখাচোখি হলে তক্ষুণি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যতই ঘুরুক, যতই মুখ চুন করে থাকুক, বিনু আর তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

রাত্রিবেলা এক বিছানায় শুয়ে ঝিনুক ফিসফিস করে ডাকল, 'বিনুদাদা—'

বিনু সাড়া দিল না।

ঝিনুক বলতে লাগল, 'আর কক্ষণো মাসিমার কাছে তোমার নামে কিছু বলব না।'

বিনু এবারও চুপ।

ঝিনুক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?'

উত্তর না দিয়ে বিনু ঝিনুকের দিক থেকে এ-পাশ ফিরে শুল।

লক্ষ্মীপুজোর পরদিন বিনুদের কেতুগঞ্জে যেতে হল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বিনু-ঝিনুক-অবনীমোহন-সুধা-সুনীতি-হেমনাথ আর সুরমা নৌকোয় উঠলেন। নৌকোটা বেয়ে যাবে যুগল আর করিম।

বিনুরা রাজদিয়া আসবার দিনটি থেকে মজিদ মিঞা কতবার যে হেমনাথের বাড়ি এসেছে তার হিসাব নেই। যতবার এসেছে ততবারই অবনীমোহনকে বলছে, 'আমাগো বাড়িত্ কবে যাইবেন মিতা?'

অবনীমোহন বলেছেন, 'শিগ্‌গিরই একদিন যাব।'

'যাব যাব' করেও যাওয়া হচ্ছিল না, রোজই একটা না একটা বাধা এসে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত মজিদ মিঞা ক্ষোভে-দুঃখে রাজদিয়া আসা বন্ধই করে দিয়েছে। তার অভিমান ভাঙাবার জন্য আজ অবনীমোহনের না বেরিয়ে উপায় ছিল না।

চারদিকে অথৈ জলের মাঝখানে কেতুগঞ্জ গ্রামটা দ্বীপের মতন ভেসে আছে। মাইলের পর মাইল ধানবন, পদ্মবন, শাপলাবন আর জলমগ্ন প্রান্তর পেরিয়ে বিনুরা যখন সেখানে পৌঁছল, রোদের রং

বদলে হলুদ হয়ে গেছে। হাওয়ায় টান ধরতে শুরু করেছে। সূর্যটা পশ্চিমের আকাশ বেয়ে অনেকখানি নেমে এসেছে। এখন বিকেল।

আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। যুগলরা ঘাটে নৌকো ভেড়াতেই মজিদ মিঞা ছুটে এল। তার পিছনে নতুন জামা-টামা পরা একদল ছেলেমেয়ে, নাক পর্যন্ত ঘোমটা টানা এক প্রৌঢ়া, চোদ্দ পনের বছরের এক কিশোরীও এসেছে। তাদের সঙ্গে এসেছে এক বৃদ্ধ, গায়ের চামড়া তার কোঁচকানো, চুল পাটের ফেঁসোর মতন, চোখে পুরু সরের মতন ছানি, ঠোঁট দুটি কিন্তু পানের রসে টুকটুকে—যেন টিয়াপাখির ঠোঁট।

পরম সমাদরের গলায় মজিদ মিঞা বলল, 'আসেন আসেন।' সুধা-সুনীতি-বিনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসো গো মায়েরা, বাবারা—'

একে একে বিনুরা নৌকো থেকে নামল। সবার শেষে নামলেন অবনীমোহন। তাঁর একখানা হাত ধরে মজিদ মিঞা বলল, 'আপনে না আইলে কিন্তুক আমি আর যাইতাম না।'

হাসতে হাসতে অবনীমোহন বললেন, 'তা তো জানি, সেই জন্যেই চলে এলাম।'

বাড়ির দিকে যেতে যেতে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মজিদ মিঞা। নতুন জামা-পরা বাচ্চাগুলো তারই ছেলেমেয়ে। তাদের কারো নাম রাশেদ, কারো মতিয়া, কারো ওসমান, কারো কামরণ। বিনুরা আসবে বলেই তাদের সাজসজ্জার এমন ঘটা, নতুন জামা-টামা পরে সেই সকাল থেকে বসে আছে।

ঘোমটা-ঢাকা প্রৌঢ়াটির নাম নছিরণ—মজিদ মিঞার বিবি। তার হাত দুটোই শুধু দেখা যাচ্ছে, তাতে রুপোর কঙ্কণ আর চুড়ি, কোমরে রুপোর ভারি সেট। বৃদ্ধাটি মজিদ মিঞার মা। চোদ্দ-পনের বছরের সেই কিশোরী মেয়েটা তার মেয়ে, নাম রহিমা।

হঠাৎ কী মনে পড়তে অবনীমোহন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা মিতা—'

মজিদ মিঞা উন্মুখ হল, 'কী ক'ন ?'

'আমরা যেদিন প্রথম রাজদিয়া আসি সেদিন শুনেছিলাম কার সঙ্গে যেন জমি নিয়ে আপনার ঝগড়া হয়েছে। মামাবাবু সে ঝগড়ার মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল, যার সঙ্গে ঝগড়া তার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হবে। আপনার সেই মেয়ে কোনটি ?'

'এই যে—' বলে পেছন ফিরে মজিদ মিঞা ডাকতে লাগল, 'রহিমা কই রে, রহিমা—'

সেই কিশোরী মেয়েটা একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিল, ডাক শুনে সামনে এগিয়ে এল।

প্রথমটা রহিমাকে ভাল করে লক্ষ করে নি বিনু। এবার পরিপূর্ণ চোখে তাকাল। রহিমার গড়ন গোল গাল, গায়ের রং কাঁচা হলুদের মতন, নাকটি একটু বোঁচাই হবে। চোখ দু'টি ভারি সরল আর নিষ্পাপ—জগতের সব কিছুর দিকে তাকিয়ে সে দু'টি যেন সর্বক্ষণ অবাক হয়ে আছে। নাকে তার সোনার বেশর, কানে কানফুল, হাতের সোনার চুড়ি গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে।

মজিদ মিঞা বলল, 'এই মাইয়ার লগে নবু শালার পোলার সাদি দিমু।'

বিয়ের কথায় রহিমা ছুটে পালিয়ে গেল।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'সাদির সোমায় আপনেরে আইতে হইব কিলাম। কথা দিছিলেন।'

'নিশ্চয়ই, আমার মনে আছে।'

মজিদ মিঞার বাড়িখানা বেশ পরিচ্ছন্ন। ঢালা বড় একটা উঠোন ঘিরে ক'খানা বড় বড় তিরিশের বন্দ'র টিনের ঘর। উঠোনে মোটা মোটা আউশ ধান টাল হয়ে রয়েছে। রাজ্যের পায়রা আর শালিক এসে সোনার দানার মতন শস্য খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। দেখেই মনে হয় সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি।

বাড়ি এসে মজিদ মিঞা কী করবে, অবনীমোহনদের কোথায় বসাবে যেন ঠিক করে উঠতে পারল না। নিজেই ছুটে গিয়ে একখানা নকশা-করা চিকন্দি পেতে দিল। জলচৌকি আর হাতল-ভাঙা খানকতক

চেয়ার টেনে নিয়ে এল।

তারপর বাকি দিনটা শুধু গল্প, ঠাট্টা-ঠিসারা, হাসাহাসি। ফাঁকে ফাঁকে কতবার কত রকমের খাবার যে এল!

বিনুদের আসার খবর কেমন করে রটে গিয়েছিল। কেতুগঞ্জের মুসলমান পাড়া ভেঙে কত লোক যে তাদের দেখে গেল।

মজিদ মিঞার বাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে বিনুরা যখন রাজদিয়া ফিরল তখন নিষুতি রাত।

লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই রাজদিয়ায় ভাটার টান ধরেছে। যে প্রবাসী সন্তানেরা কয়েক দিনের জন্য এসে শহর সরগরম করে তুলেছিল, একে একে স্টিমারে করে তারা চলে যেতে লাগল। কেউ গেল আসামে, কেউ বার্মায়, তবে অধিকাংশরই গন্তব্য কলকাতা।

এর মধ্যে একদিন শিশিররা এলেন। সবাই এসেছেন—শিশির, স্মতিরেখা, রুমা-ঝুমা, আনন্দ।

খানিক এ-গল্প সে-গল্পের পর শিশির বললেন, 'আমরা কাল চলে যাচ্ছি জ্যাঠাইমা—'

স্নেহলতা বললেন, 'কালই যাবি?'

'হ্যাঁ।'

'এক বছর পর তো এলি। ক'টা দিনই বা বাড়িতে থাকলি!'

'কী করব, সরকারি চাকরি, যেতেই হবে। ছুটিও আর নেই। নিয়মমতো দশমী পর্যন্ত ছুটি, তার পরও এ ক'দিন থেকে গেলাম। আর থাকলে চাকরিটা যাবে।'

শিশিররা কথা বলছিলেন। শুনতে শুনতে হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, আনন্দ সুনীতিকে কী যেন ইশারা করছে।

একটু পর সুনীতি বেরিয়ে বাগানের দিকে গেল। তার কিছুক্ষণ পর আনন্দও বেরিয়ে পড়ল, উঠোনে খানিক ঘোরাঘুরি করে সেও বাগানের রাস্তা ধরল।

বিনু আর বসে থাকতে পারল না। বিচিত্র এক কৌতূহল যেন তাকে ঘিরে ধরছিল। এক সময় সেও উঠে পড়ল।

আশ্বিন মাসের শেষ তারিখে ছিল লক্ষ্মীপুজো। লক্ষ্মীভাসানের দিন থেকে কার্তিক মাস পড়েছে। আজ তেসরা কার্তিক।

সবে কার্তিকের শুরু, এরই মধ্যে বিকেলের হাওয়ায় হিমের ছোঁয়া টের পাওয়া যায়। রোদের রংও গেছে বদলে। শিউলি ফুলের বোঁটার মতন উজ্জ্বল হলদে আভা আর তাতে নেই, বাসি হলুদের মতন তা মলিন।

বাগানে এসে বিনু দেখতে পেল, সূর্যটা রক্তিম গোলকের মতন পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে অনেকখানি নেমে গেছে। বাগানের ভেতর এখন ঘন ছায়া। মাথার ওপর ডালপালা আর পাতার চাঁদোয়া, তার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ এসে হাওয়ায় দুলছে।

এই তো বিকেল হল, এরই ভেতর পাখিরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। কেউ সারাদিন আকাশে সাঁতার কেটেছে, কেউ মাঠে মাঠে শস্যকণা খুঁজেছে। ক্লান্ত পাখিরা এখন বাগানের গাছে গাছে তাদের

সাধের বাসায় ডানা ঝাপটাচ্ছে, কিচিরমিচির করছে। চেঁচামেচিতে চারদিক মুখর।

বাগানে এসে বিনু পাখিদের দিকে তাকাল না, অনুজ্জ্বল মলিন রোদ লক্ষ করল না, হিমেল হাওয়ার কথা ভাবল না। সে শুধু চনমন চোখে চারদিকে খুঁজতে লাগল। এইটুকু সময়ের ভেতর আনন্দ আর সুনীতি গেল কোথায় ?

বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। উত্তর দিকে যে বেতবন রয়েছে তার গায়ে ঝাঁকড়া-মাথা একটা পিটক্ষীরা গাছ, গাছটার অনেকগুলো মোটা মোটা শেকড় মাটির ওপর ছড়িয়ে আছে। দুটো শেকড়ে মুখোমুখি বসে রয়েছে সুনীতি আর আনন্দ।

জায়গাটা আড়াল মতন। পা টিপে টিপে বিনু পিটক্ষীরা গাছটার কাছে চলে এল। এমনভাবে দাঁড়াল যাতে সুনীতিরা তাকে দেখতে না পায়।

আনন্দ বলছিল, 'কালই আমরা চলে যাচ্ছি।'

মৃদু আধফোটা গলায় সুনীতি বলল, 'সে তো শুনলাম, আপনার জামাইবাবু তখন বললেন।'

আনন্দ বলল, 'তুমি কিছু বলবে না ?'

দূরে দাঁড়িয়ে বিনু অবাক। আনন্দ তো বড়দিকে 'আপনি' বলত, সম্ভাষণের ভাষাটা কবে থেকে বদলে গেল, কে জানে।

সুনীতি আগের স্বরেই বলল, 'আমি কী বলব ?'

'বা রে, চলে যাচ্ছি। ভালমন্দ কিছু বলবে না ?'

সুনীতি উত্তর দিল না।

একটু ভেবে আনন্দ বলল, 'আবার কবে দেখা হবে ?'

সুনীতি বলল, 'তা কী করে বলি—'

'তোমরা কলকাতায় যাচ্ছ কবে ?'

'বলতে পারছি না।'

'তবু ?'

'পুজোর ছুটি শেষ না হলে দাদু বোধহয় যেতে দেবেন না।'

কোন পুজোর ছুটি ? স্কুল-কলেজের, না অফিস-টফিসের ?'

'স্কুল-কলেজের।'

ঈষৎ হতাশার গলায় আনন্দ বলল, 'ওরে বাবা, সে তো এখনও অনেক দিন! সেই ভাইফোঁটার পর শেষ হবে।'

সুনীতি আস্তে ঘাড় কাত করল।

'ততদিন তা হলে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

একটু নীরবতা। তারপর আনন্দ বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে, খুব খারাপ।'

মৃদু কণ্ঠস্বরে সুনীতি বলল, 'আমারও খুব ভাল লাগছে না।'

'তোমরা কিন্তু স্বচ্ছন্দে কালই আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারতে।'

'ও ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই।'

চিন্তাগ্রস্তের মতন আনন্দ বলল, 'তা বটে।'

সুনীতি কিছু বলল না।

আনন্দ আবার বলল, 'তোমাদের কলকাতার ঠিকানা কী ?'

সুনীতি ঠিকানা জানিয়ে দিল।

আনন্দ বলল, 'ঠিকানা নিলাম, তোমাদের বাড়ি কিন্তু যাব।'

'নিশ্চয়ই আসবেন।'
'কেউ কিছু মনে করবে না তো?'
'কারো মনে করাকরিতে আপনার কিছু যাবে-আসবে?'
'তার মানে?'
সুনীতি লীলাভরে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসল, 'মানে আসবেন, যখন খুশি আসবেন।'
আনন্দ বলল, 'সে তো অনেক দেরি। মাঝখানের এই দিনগুলো—'
'কী?'
'কেমন করে কাটবে?'
'আমাকে দেখার আগে যেমন করে কাটত।'
'উঁহু—'
'কী?'
'তা আর হয় না।'
চোখের তারায় কেমন করে যেন হাসল সুনীতি। বলল, 'কেন মশায়?'
আনন্দ বলল, 'বুঝতে পারছ না?'
'না।'
'সত্যি?'
'হুঁ—'
'তা হলে কারণটি বলি?'
'বলতে হবে না।'
একটু চুপ। তারপর কি ভেবে আনন্দ বলল, 'ভাবছি কলকাতায় গিয়ে একটা কাজ করব।'
সুনীতি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী?'
আনন্দ বলল, 'তোমাকে রোজ একখানা করে চিঠি লিখব।'
সুনীতি চমকে উঠল, 'ও মা, না না—' তারপর দু হাত এবং মাথা একই সঙ্গে জোরে জোরে প্রবলবেগে নেড়ে বলতে লাগল, 'কিছুতেই না, কিছুতেই না। চিঠি টিঠি লিখবেন না।'
'কেন লিখব না?'
'সবাই কী ভাববে!'
'যা সত্যি তাই ভাববে।'
'না না, আমি ভারি লজ্জায় পড়ে যাব। কারো মুখের দিকে তাকাতে পারব না। আর সুধাটা তো—'
'সুধা কী?'
'আমাকে একেবারে পাগল করে ছাড়বে।'
আনন্দ আর সুনীতির বাকি কথাগুলো আর শোনা হল না। তার আগেই পাশ থেকে কে ডেকে উঠল, 'বিনুদা—'
চমকে পেছন ফিরতেই বিনু দেখতে পেল, ঝুমা। চোখাচোখি হতেই মেয়েটা হাসল, 'এখানে কী করছ?'
ইঙ্গিতে আনন্দ-সুনীতিকে দেখিয়ে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল বিনু। নীচু গলায় বলল, 'চুপ।'
ঝুমাটা ভারি চালাক। চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ফিসফিস গলায় বলল, 'লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের কথা শুনে কী হবে? চল আমরা ওদিকে যাই।'
আনন্দ সুনীতি এত তন্ময়, নিজেদের নিয়ে এতই মগ্ন যে বিনুদের অস্তিত্ব টের পেল না।
বিনু শুধলো, 'ওদিকে কোথায় যাবে?'

এদিক ওদিক দেখে ঝুমা বলল, 'চল, পুকুরঘাটে গিয়ে বসি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝুমার সঙ্গে যেতে হল। শান-বাঁধানো পুকুরঘাটে এসে জলে পা ডুবিয়ে পাশাপাশি বসল দু'জন।

পুকুরের ওপারে ধানের খেত। এই তো সেদিন বিনুরা রাজদিয়া এল, পুরোপুরি একটা মাসও হয় নি। তখন ধানগাছগুলো সবে শিষ ছাড়তে শুরু করেছে। আর এখন, কার্তিকের এই শুরুতে? পাতা আর দেখা যায় না। ধানের মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে চারদিক ছেয়ে গেছে। সবুজ তুষের ভেতর এখন অবশ্য দুধ জমছে, একটু টিপলেই বেরিয়ে আসে। ক'দিন পর আর এই দুধ থাকবে না, ঘন হয়ে জমাট বেঁধে একেক দানা শস্য হয়ে যাবে—মানুষের বাঁচার আশ্বাস, তার সঞ্জীবনী।

এখনও মাঠ জুড়ে সবুজের সমারোহ। যুগল বলেছে, ক'দিন পর অঘ্রান পড়লেই এ রং থাকবে না, ধান পেকে মাঠের ঝাঁপি সোনালি লাবণ্যে ভরে যাবে।

পা দিয়ে জলে ঢেউ তুলতে তুলতে ঝুমা ডাকল, 'বিনুদা—'

দূর ধানখেতের দিকে তাকিয়ে বিনু আনন্দ আর সুনীতির কথা ভাবছিল। ঝুমার ডাকে অন্যমনস্কের মতন সাড়া দিল।

ঝুমা বলল, 'আমার কিন্তু খুব মন কেমন করবে।'

'কেন?'

'কেন আবার, তোমার জন্যে।'

বিনু উত্তর দিল না।

ঝুমা আবার বলল, 'সেদিন নৌকোয় করে আমরা ফুল তুলতে গিয়েছিলাম—'

'হুঁ—'

'তুমি কাউফল পাড়তে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলে—'

'হুঁ—'

'তারপর পুজোর সময় পাশাপাশি বসে থিয়েটার দেখলাম—'

'হুঁ—'

'মাঝরাত্তিরে নৌকো চড়ে যুগলের সঙ্গে সুজনগঞ্জে যাত্রা শুনতে যাওয়া—'

'হুঁ—'

'কলকাতায় গিয়ে এই সব খুব মনে পড়বে।'

বিনু কিছু বলল না, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

ঝুমা বলল, 'তোমরা কলকাতায় যাবে না?'

বিনু বলল, 'যাব না মানে? ছুটির পর স্কুল খুললেই অ্যানুয়েল পরীক্ষা। এখনে বসে থাকলে পরীক্ষা দেবো কী করে?'

'তা তো ঠিকই। তোমরা কবে যাচ্ছ?'

'অক্টোবরের বাইশ তারিখে স্কুল খুলবে, তার আগেই যাব।'

'কলকাতায় গেলে আমাদের বাড়ি আসবে তো?'

'যাব।'

'আমাদের বাড়ি হেদোর কাছে, বত্রিশ নম্বর রামকান্ত চাটুজ্যে লেন।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে ডাক এল, 'কোথায় গেলি রে তোরা? এই বিনুদাদা—ঝুমাদিদি—শিগগির বাড়ি আয়—'

হেমনাথের গলা। বিনু বলল, 'চল, বাড়ি যাই। দাদু ডাকছে।'

যেতে যেতে ঝুমা বলল, 'আমাদের বাড়ি যাবার কথা মনে থাকে যেন। তুমি আবার বড্ড ভুলে

যাও।'

'ভুলব না। তবে—'

'কী?'

'আমি তো একা একা অতদূর যেতে পারব না। বাবাকে বলব, না নিয়ে গেলে কিন্তু যাওয়া হবে না।'

ভুরু কুঁচকে বিনুর দিকে তাকাল ঝুমা। গলার স্বরে ধিক্কার মিশিয়ে বলল, 'কী ছেলে তুমি! ভবানীপুর থেকে দু নম্বর দোতলা বাসে উঠবে, সোজা হেদোয় এসে নামবে।' একটু ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে আগে যেতে হবে না, আমরাই আগে তোমাদের বাড়ি যাব।'

'কার সঙ্গে যাবে?'

'কার সঙ্গে?' চোখের পাতা নাচাতে নাচাতে ঝুমা বলল, 'আমার মামার সঙ্গে। তখন শুনলে না, সুনীতিদিকে মামা বলছিল, তোমাদের বাড়ি যাবে। মামা গেলেই আমি তার পিছু নেব।'

'সেই ভাল।'

একটু চুপ করে থেকে ঝুমা বলল, 'আচ্ছা বিনুদা—'

'কী?'

'সুনীতিদির সঙ্গে মামার খুব ভাব, না?'

'হুঁ—'

ঘাড় কাত করে ঝুমা এবার বলল, 'তোমার সঙ্গে আমারও খুব ভাব—'

বিনু উত্তর দিল না, আড় চোখে একবার ঝুমাকে দেখে নিল।

বাড়ি ফিরবার পর ঝুমারা বেশিক্ষণ থাকল না, সন্ধে নামতে না নামতেই চলে গেল।

যাবার সময় হেমনাথ বললেন, 'তোরা কাল দুপরের স্টিমারে যাচ্ছিস তো?'

শিশির বললেন, 'হ্যাঁ।'

'যদি পারি স্টিমারঘাটায় যাব।'

'আবার কষ্ট করে—'

'কষ্ট আর কি—'

দিন দুই আগে কোজাগরী পূর্ণিমা গেছে। তার রেশ এখনও রয়েছে। সন্ধের ঠিক পরেই আকাশের গা বেয়ে রুপোর থালার মতন চাঁদ উঠে এল। চারদিকে—বাগানে, ধানখেতে, পুকুরের শান্ত স্থির টলটলে জলে জ্যোৎস্নার বান ডাকল। পাখিদের আর সাড়াশব্দ নেই, সারাদিনের ক্লান্তিমাখা দেহে তাঁদের ঘুম নেমে এসেছে। বিকেলবেলা থেমে থেমে ঝিঁঝিরা ডাকছিল, এখন আর মাঝখানে ছেদ নেই। একটানা তাদের কণ্ঠসাধনা চলছে।

ঝুমারা খানিক আগে চলে গেছে। অবনীমোহন বললেন, 'বিনু-ঝিনুক -সুধা-সুনীতি, তোরা সব পড়তে বসে যা।'

দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় পাটি পেতে দু'খানা হারিকেন জ্বেলে চারজনে পড়তে বসল। বিনুর দেখাদেখি হিংসেয় হিংসেয় আজকাল ঝিনুকও পড়তে বসে।

বিনুর কাছাকাছি বসে ছিল ঝিনুক। কিছুক্ষণ পড়ার পর সবার কান বাঁচিয়ে ঝিনুক ডাকল, 'বিনুদাদা—'

পড়ার বই থেকে মুখ তুলল বিনু, 'কী বলছ?'

'তখন তোমরা কী করছিলে?'

সেদিন লক্ষ্মীসরা আনতে যাবার সময় ঝিনুককে সঙ্গে নেয় নি, সে জন্য মায়ের হাতে মার খেতে হয়েছিল। সেই থেকে ঝিনুকের সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না বিনু, মনে মনে মেয়েটার ওপর খুব রেগে

আছে। নিস্পৃহ সুরে বিনু বলল, 'কখন?'

'বিকেলবেলা।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'তুমি আর ঝুমা পুকুরঘাটে পা ডুবিয়ে বসে ছিলে, সেই তখন?'

বিনু চমকে উঠল, 'তুমি আমাদের দেখেছ?'

'হুঁ।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'প্রথমে সুনীতিদিদি গেল, তার পেছন পেছন গেল আনন্দদাদা। আনন্দদাদার পর তুমি গেলে, তারপর ঝুমা। ঝুমার পিছু পিছু আমি গেলাম।'

অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকল বিনু।

ঝিনুক থামে নি, 'তখন তোমরা কী করছিলে, বল না?'

বিনু আস্তে করে বলল, 'গল্প করছিলাম।'

'কী গল্প?'

'সে অনেক রকম।'

'হোক অনেক রকম, তুমি বল।'

বিনু বলল, 'অত আমার মনে নেই।'

ঝিনুক নাছোড়বান্দা, 'যা আছে তাই বল।'

একটু ভেবে নিয়ে বিনু বলল, 'ঝুমারা তো কাল কলকাতা চলে যাবে, আমরাও ক'দিন পর যাচ্ছি। ঝুমা বলছিল, কলকাতায় গেলে ওদের বাড়ি যেতে, ওরাও আমাদের বাড়ি আসবে। এই সব—'

হঠাৎ আলো নিভে গেলে যেমন হয়, ঝিনুকের মুখখানা নিমেষে সেই রকম মলিন হয়ে গেল। চোখ দু'টি কেমন যেন ব্যথিত আর করুণ। কাঁপা শিথিল গলায় সে বলল, 'তোমরা কলকাতায় চলে যাবে!'

'বা রে, আমরা এখানে সারা জীবন থাকতে এসেছি নাকি?'

মুখখানা আরো বিষণ্ণ হয়ে গেল ঝিনুকের, নীলকান্ত মণির মতন চোখের তারাদুটো জলে ডুবে যেতে লাগল।

এই মেয়েটার জন্য ক'দিন আগে যে মার খেতে হয়েছিল তা আর মনে থাকল না বিনুর। ঝিনুকের জন্য হঠাৎ অত্যন্ত মমতা বোধ করল সে। গাঢ় গলায় বলল, 'তুমি কাঁদছ!'

ঝিনুকের চোখ থেকে পোখরাজের দানার মতন জলের বিন্দুগুলি টপ টপ করে ঝরতে লাগল। বিনুর দিকে সে আর তাকিয়ে তাকতে পারছিল না, আপনা থেকেই তার মাথাটা নিচের দিকে নেমে গেল।

বিনু ভীষণ বিব্রত বোধ করছিল। সবার কান বাঁচিয়ে যতখানি সম্ভব চাপা গলায় বলতে লাগল, 'এই বোকা মেয়ে, কাঁদে না।'

ঝিনুকের কান্না থামল না। শব্দ করে সে অবশ্য কাঁদছে না, নীরবে পোখরাজের দানাগুলো বিরামহীন ঝরেই যাচ্ছে।

বিনু আবার বলল, 'আরে বাপু, এক্ষুণিই তো আমরা চলে যাচ্ছি না। আরো কিছুদিন থাকব।'

পরের দিন দুপুরবেলা শিশিরদের বিদায় জানাবার জন্য হেমনাথ স্টিমারঘাটায় গেলেন। তাঁর সঙ্গে সুনীতি, ঝিনুক আর বিনু।

শিশিররা ততক্ষণে এসে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন রামকেশর আর তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ শিশিরের বাবা-মা।

শিশিররা এখনও স্টিমারে ওঠেন নি, জেটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিশিরের মা খুব কাঁদছিলেন আর আঁচলে ঘন ঘন চোখ মুছছিলেন। রামকেশবের চোখদু'টিও ফোলা ফোলা, ঈষৎ আরক্ত। বোঝা যায়,

গোপনে তিনিও কেঁদেছেন। দীর্ঘ এক বছরের জন্য ছেলে কলকাতায় চলে যাচ্ছে, বিদায়ের সময় কেউ আর স্থির থাকতে পারছেন না।

শিশির-স্মৃতিরেখা-রুমা, কারো চোখই শুকনো নেই। সবাই ভারাক্রান্ত, বিষাদমলিন। রামকেশব এবং তাঁর স্ত্রীর কান্না ওদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

হেমনাথ বললেন, 'খুব তো কান্নাকাটি চলছে। স্টিমার ক'টায় ছাড়বে হুঁশ আছে?'

শিশির যেন সময় সম্বন্ধে এতক্ষণে সচেতন হলেন। বললেন, 'সোয়া বারটায়—' বলেই পকেট থেকে চেনে-বাঁধা ঘড়ি বার করলেন, 'ইস, বারটা বাজে! আর মোটে পনের মিনিট সময় হাতে।'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ মানুষ তোরা! মালপত্র স্টিমারে তুলতে হবে না? টিকিট কাটা হয়েছে?'

শিশির জানালেন, 'টিকিটটা কালই করে রাখা হয়েছে।'

'কিসে যাচ্ছিস, ডেকে না কেবিনে?'

'ডেকে।'

মালপত্র তুলবার ব্যবস্থা কর। ছেলেপুলে নিয়ে যাবি, হাত-পা ছড়িয়ে বসবার শোবার মতন খানিকটা জায়গা তো চাই। এক রাতের মতন স্টিমারে থাকতে হবে।'

অতএব হিন্দুস্থানী কুলীদের ডাক পড়ল। মালপত্র মাথায় নিয়ে তারা স্টিমারের দিকে ছুটল। সবাইকে সঙ্গে করে হেমনাথও স্টিমারে এলেন। তাঁর নির্দেশমতন চারদিকে বাক্স-ট্রাঙ্ক-টিফিন ক্যারিয়ার, এইসব নামিয়ে রেখে কুলিরা ডেকের অনেকখানি জায়গা দখল করে ফেলল, মাঝখানে পেতে দিল ঢালা বিছানা।

হেমনাথ বললেন, 'সাবধানমতোন যাবি, কলকাতায় গিয়েই পৌঁছ-সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখবি।'

শিশির বললেন, 'লিখব।'

'এর মধ্যে ছুটিছাটা পেলে বৌমাদের নিয়ে চলে আসবি।'

'সরকারি চাকরি, ছুটিছাটা বড় কম। আসছে বছর পুজোর আগে আসার আর সম্ভাবনা নেই।'

বাড়ি আসার ব্যাপারে শিশির রামকেশব এবং হেমনাথের মধ্যে কথা হতে লাগল।

এদিকে ঝুমা বিনুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকল, 'বিনুদা—'

বিনু তার দিকে তাকাল।

ঝুমা বলল, 'সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোনটা?'

'কলকাতায় গিয়ে আমাদের বাড়ি যাবে, আমি তোমাদের বাড়ি যাব।'

'মনে আছে। তুমি কিন্তু আমাদের বাড়ি আগে আসবে।'

কথায় কথায় খেয়াল ছিল না। হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, একটু দূরে জলের কাছটায় স্টিমারের রেলিঙ ধরে সুনীতি আর আনন্দ খুব ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পর স্টিমারঘাটা থেকে ঘন্টির শব্দ ভেসে এল। হিন্দুস্থানী কুলী আর খালাসিরা চিৎকার করে উঠল, যাঁরা স্টিমারে যাবেন না তাঁরা যেন নেমে যান। কেননা গ্যাংওয়ে এক্ষুণি সরিয়ে নেওয়া হবে।

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এবার আমরা নামব শিশির। সুনীতি কোথায় রে? বিনু-ঝিনুক—'

বিনুরা কাছেই ছিল। সুনীতি ছুটে এল। তারপর আরম্ভ হল প্রণাম পর্ব। শিশিররা একে একে হেমনাথ, রামকেশব আর তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করলেন। বিদায় নিয়ে আশীর্বাদ করে হেমনাথরা জেটিঘাটে নেমে এলেন। তাঁরা নামবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্যাংওয়ে সরিয়ে নেওয়া হল। জেটি আর স্টিমারের মাঝখানে কাঠের পাটাতনের সংযোগটুকু ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর দু মিনিটও কাটল না, ভোঁ বাজিয়ে স্টিমার ছেড়ে দিল। তার দু ধারে বড় বড় চাকা দুটো নদী তোলপাড় করে বিপুল গর্জনে ঘুরে চলেছে, ফলে ঢেউ উঠছে পাহাড়প্রমাণ। আর তাতে চারদিকের নৌকোগুলো মোচার খোলার মতন দুলে চলেছে।

স্টিমারের যত যাত্রী সব এদিকের রেলিং-এর কাছে ভিড় জমিয়েছে আর সমানে হাত নাড়ছে। তাদের ভেতর ঝুমাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঝুমা হাত নাড়ছিল না, রুমাল ওড়াচ্ছিল।

ঝুমার জন্য মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেছে বিনুর, আস্তে আস্তে সেও হাত নাড়ছিল।

প্রথম দিকে স্টিমারটার গতি ছিল রাজহাঁসের মতন মন্থর, ধীরে ধীরে তাতে দুর্দম বেগ এসে যেতে লাগল। একসময় ঝুমাদের নিয়ে অনেক দূরে একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল স্টিমারটা।

এতক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন শিশিরের মা। যখন আর স্টিমারটা দেখা গেল না, আচমকা জোরে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

শিশিরের মায়ের কান্না দেখতে দেখতে, হঠাৎ, কেন কে জানে বিনুর মনে হল, তারা যখন রাজদিয়া থেকে চলে যাবে নদীতীরে দাঁড়িয়ে ঝিনুকও হয়তো এই রকম কাঁদবে।

এক দিকে ঝুমা, আরেক দিকে ঝিনুক—দুইয়ের মাঝখানে নিজেকে কেমন যেন মনে হয় বিনুর!

দুর্গাপুজোর পর কোজাগরী। তারপর একে একে কালীপুজো ভ্রাতৃদ্বিতীয়াও চলে গেল। অবনীমোহন কলকাতায় ফেরার কথা আর বলেন না।

কার্তিকের শেষাশেষি একদিন সুরমা বললেন, 'কি গো, তোমার মতলবটা কী?'

অবনীমোহন বললেন, 'কিসের মতলব?'

'কলকাতায় ফিরছ কবে?'

'কলকাতায় আর ফিরছি না।'

'তার মানে?'

'ইস্টবেঙ্গলেই থেকে যাব ভাবছি।'

সুরমা অবাক, 'কী বলছ তুমি!'

অবনীমোহন হাসতে হাসতে বললেন, 'মাথার ভেতর সেই পোকাটা নড়ে উঠেছে।'

পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে সুরমা আর অবনীমোহন কথা বলছিলেন। তাঁরা ছাড়া আরো দু'জন এখানে রয়েছে—বিনু এবং ঝিনুক। সুধা-সুনীতি কোথায় কে জানে। হয়তো ভেতর-বাড়িতে স্নেহলতা-শিবানীর সঙ্গে গল্পটল্প করছে; কিংবা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেমনাথ বাড়ি নেই, ভোরবেলা উঠেই কি একটা কাজে কমলাঘাটের গঞ্জে গেছেন। ফিরতে ফিরতে রাতদুপুর।

সময়টা বিকেল। এই তো খানিক আগে দুপুর পার হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই হেমন্তের শেষ বেলাটা দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে; রোদ কেমন যেন-মলিন আর স্তিমিত। বাগানে ছায়া ঘন হতে শুরু করেছে। অনেক দূরে—পুকুর এবং ধানখেতের ওপারে আকাশ আর দিগন্ত যেখানে একাকার, সেই জায়গাটা কেমন যেন ঝাপসা। বেলা থাকতে থাকতেই কি ওখানে হিম পড়ছে?

বিনুর কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। মা-বাবার মুখের দিকে পলকহীন সে তাকিয়ে আছে, গোগ্রাসে তাদের কথা গিলছে। ঝিনুকও একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

অবনীমোহন যখন বললেন, কলকাতায় আর ফিরবেন না, রাজদিয়াতেই থেকে যাবেন, তখন থেকেই উত্তেজনায় আনন্দে বিনুর বুকের ভেতরটা দুলতে শুরু করেছে। আদিগন্ত ধানের খেত, জলপূর্ণ প্রান্তর, পাখির ঝাঁক, লারমোর, হেমনাথ, যুগল, দ্বীপের মতন ভাসমান গ্রামগুলি, সুজনগঞ্জের হাট, যাত্রার

আসর—সব একাকার হয়ে এই স্নিগ্ধ শ্যামল দেশ বিনুকে একেবারে জাদু করে ফেলেছে। এদের ছেড়ে যেতে হলে ভয়ানক কষ্ট হতো তার।

ওদিকে সংশয়ের গলায় সুরমা বললেন, 'সত্যিসত্যিই কলকাতায় যাবে না?'

অবনীমোহন বললেন, 'কেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'কিন্তু—

'কিন্তু-টিন্তু নয়, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

'মাথার ভেতর সত্যিই তাহলে পোকাটা নড়েছে।'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

সুরমা এবার আর অবাক হলেন না, কেননা তিরিশ বছর ধরে তিনি অবনীমোহনকে দেখে আসছেন।

মানুষটি বিচিত্র। আর দশজনের সঙ্গে অবনীমোহনের মেলে না। তার স্বভাবের ভেতর কোথায় যেন একটা অস্থির যাযাবরের বাস। সেটা দু'দন্ড তাকে পা পেতে বসতে দেয় না, নিয়ত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

কেউ হয়তো কোনো অজানা দেশের গল্প করল, অমনি ঘর-সংসার ভুলে অবনীমোহন ছুটলেন। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থাকতে না পারলে তাঁর স্বস্তি নেই। কেউ হয়তো রমনীয় কোনো দৃশ্যের, কোনো পাহাড়-নদী-জলপ্রপাত কিংবা সমুদ্রের খবর নিয়ে এল। আর যায় কোথায়? অবনীমোহনের ঘুম গেল, খাওয়া গেল। জগৎ রসাতলে যাক, তিনি সে সব জায়গায় না গিয়ে পারবেন না।

আজ রামেশ্বর, কাল অমরকণ্টক, পরশু দ্বারকা—সারা বছর এ সব লেগেই আছে। চিরদিন এই ছোটাছুটির খেলা দেখে আসছেন সুরমা। এর জন্য ছেলেমেয়েদের ক্ষতিও কি কম হয়েছে?

কোথাও গিয়ে সেই জায়গাটা যদি মনে ধরে গেল, কার সাধ্য সহজে সেখান থেকে অবনীমোহনকে নড়ায়? যতক্ষণ না নতুন চমকপ্রদ কোনো অঞ্চলের খবর আসছে তিনি সেখানেই থেকে যাবেন। একবার কাশী গিয়ে তো বছর খানেকই কাটিয়ে এলেন, আরেক বার মধুপুরে থেকে এলেন ন'মাসের মতন। এই করে সুনীতির দুটো বছর নষ্ট হয়েছে। সুধার গেছে তিন বছর। নইলে এতদিনে ওরা বি.এ-টি.এ পাস করে যেত। বিনুর অবশ্য ক্ষতি হয় নি, একটা বছর যেতে যেতে কোনোরকমে বেঁচে গেছে।

দেখে শুনে একেক সময় তাঁকে দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে হয়। আসলে কিন্তু তিনি তা নন। এই যে নিয়ত ছুটে বেড়াচ্ছেন সেটা যেন পুরোপুরি সজ্ঞানে নয়, বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে। অস্থিরতার ঈশ্বর যেন তাঁকে দুই অদৃশ্য ডানা দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আর তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য রাখছেন। না, থামবার উপায় নেই অবনীমোহনের।

দূর দেশের আকর্ষণেই শুধু নয়, কলকাতা শহরেই কি কম ছোটাছুটি করে বেড়ান অবনীমোহন? বছরে কতবার করে যে বাড়ি বদলান তার আর লেখাজোখা নেই। আজ হয়তো টালিগঞ্জে আছেন, কাল লরীতে মালপত্র চাপিয়ে চলে গেলেন কসবা, পরশু পাড়ি জমালেন বাগবাজারে।

অবনীমোহনের পেছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, ছুটে ছুটে বিরক্ত সুরমা প্রথম প্রথম বলতেন, 'এক জায়গায় দু'দিন স্থির হয়ে থাকতে কি তোমার ইচ্ছে করে না?'

অবনীমোহন মাথা নাড়তেন আর হাসতেন, 'না সখী। না—'

'কি যে তোমার ঘোরার বাই! আর পারি না বাপু।'

অবনীমোহন বলতেন, 'আমার কি ভাল লাগে জানো?'

সুরমা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেন, 'কি?'

'নিত্য নতুন।'

'নিত্য নতুন কী? জায়গা না মানুষ?'

মজাটা বুঝতে পেরে হেসে হেসে অবনীমোহন বলতেন, 'দুই-ই।'

এবার সুরমার গলায় পরিহাসের ছোঁয়া লাগত, 'আমি কিন্তু পুরনো হয়ে গেছি। দেখো, এই বয়সে আর নতুনের পেছনে ছুটো না।' বলে স্বামীর দিকে তরল চোখের দৃষ্টি হানতেন।

রগড়ের গলায় অবনীমোহন বলতেন, 'তার আর উপায় নেই প্রাণেশ্বরী।'

কপট ভয়ের সুরে সুরমা বলতেন, 'উপায় থাকলে বুঝি ছুটতে?'

'ভেবে দেখিনি। এবার থেকে ভাবব।'

'ভাল কথাই মনে করিয়ে দিলাম দেখছি।'

একটু নীরব থেকে দূরমনস্কের মতন অবনীমোহন বলতেন, 'আমার স্বভাবটাই কেমন যেন সৃষ্টিছাড়া, কোথাও একটানা থাকতে ইচ্ছে করে না, এক কাজ বেশিদিন করতে ইচ্ছে করে না।'

স্বভাবের এই যাযাবর তাঁর নিজেরই কম ক্ষতি করে নি। অবশ্য এই ক্ষতিকে ক্ষতি বলেই মানেন না অবনীমোহন।

সাধারণ মানুষ পায়ের তলায় নিশ্চিন্ত একটু আশ্রয় পেলেই স্থির হয়ে বসে, সেইখানেই জীবনকে ফুলফলে ভরে তোলে। অবনীমোহন কোনোদিন তা পারলেন না। পায়ের নিচে স্থির ভূমি তো কতবারই তিনি পেয়েছেন। প্রথম জীবনে বিরাট সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন, সেটা থাকলে এতদিনে হাজার টাকার বেশি মাইনে হয়ে যেত। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চাকরি ছেড়ে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন। অধ্যাপক হিসেবে প্রচুর খ্যাতি হল কিন্তু তার আয়ুও বেশিদিন না, বড় জোর বছর চারেক। তারপর কালো কোট গায়ে চাপিয়ে উকিল সাজলেন, ওকালতিতে যথেষ্ট পয়সা হল। কিন্তু একদিন দেখা গেল, আদালত-টাদালতের বদলে শেয়ার মার্কেটে যাতায়াত শুরু করেছেন, হেসিয়ান আর বুলিয়ান মার্কেটের রহস্য কিছুদিন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

মোট কথা, কোথাও নোঙর ফেলে বসা তাঁর স্বভাবে নেই। এটা ছাড়ার জন্য তাঁর কতখানি ক্ষতি হল, ওটা পেয়ে কতখানি লাভবান হলেন—অবনীমোহন কোনোদিন তা ভাবেন না। লাভ-ক্ষতি, কোনো কিছুর জন্য তাঁর অনুশোচনা নেই, দুঃখ নেই, আসক্তি নেই।

এই বসুন্ধরায় কত দিকে কত রঙের মেলা সাজানো। এক জায়গায় থেমে থেকে জীবনকে একরঙা প্রতিমা বানাতে চান না অবনীমোহন। সমস্ত পিছুটান আর একঘেয়েমি ছিঁড়ে সামনের দিকে তিনি শুধু ছোটেন আর নিজের জন্য এক আশ্চর্য জগৎ গড়ে তোলেন।

অবনীমোহন যখন একবার স্থির করেছেন যাবেন না, তখন এই রাজদিয়াতেই থেকে যেতে হবে। যতদিন পূর্ববাংলা তাঁকে মুগ্ধ বিস্মিত চমৎকৃত করে রাখছে ততদিন এখান থেকে যাবার কোনো আশাই নেই।

তবু সুরমা বললেন, 'দুম করে তো বলে বসলে যাবে না। সব দিক ভেবে দেখেছ?'

অবনীমোহন বললেন, 'সব দিক বলতে?'

'প্রথমে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কথাই বল। বছর শেষ হতে চলল, আর ক'দিন পর পরীক্ষা। এখন এখানে থেকে গেলে নির্ঘাত একটা করে বছর নষ্ট।'

'নষ্ট যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কেমন করে?'

'মামাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।'

চিন্তিত মুখে সুরমা বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলোর যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তোমার ব্যবসা? এত খেটেখুটে দাঁড় করালে, তার কী হবে?'

রাজদিয়া আসার আগে ব্যবসা শুরু করেছিলেন অবনীমোহন—এজেন্সির ব্যবসা। কয়েকটা বড় বড় বিলিতি কোম্পানির এজেন্সি যোগাড় করেছিলেন। এজন্য তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

রাতদিন কত যে ছোটাছুটি করেছেন আর কত লোককে ধরেছেন তার হিসেব নেই।

অবনীমোহন বললেন, 'ব্যবসা আর করব না।'

এমন অক্লেশে তিনি কথাগুলো বলে গেলেন যে সুরমা একেবারে থ। বিমূঢ়ের মতন প্রতিধ্বনি করলেন, 'ব্যবসা করবে না!'

'না।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর সুরমা আবার বললেন, 'ব্যবসা না হয় নাই করলে কিন্তু কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করা আছে, সেখানে আমাদের মালপত্র রয়েছে, সে সবের কী হবে?'

অবনীমোহন বললেন, 'মাঝখানে আমি একবার কলকাতায় যাব, সমস্ত বন্দোবস্ত করে আসব।'

'যা ভাল বোঝ কর, আমি আর কী বলব।' সুরমা বলতে লাগলেন, 'এই পূর্ববাংলাই যে তোমার কতদিন ভাল লাগবে তা-ই ভাবছি। কবে আবার বলবে, এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে আরেক জায়গায় চল—'

অবনীমোহন হাসতে লাগলেন।

মৃদু ধমকের গলায় সুরমা বললেন, 'অমন হেসো না তো—'

'তবে কী করব?' হাসতে হাসতে অবনীমোহন শুধোলেন।

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুরমা বললেন, 'তোমার হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, নিঃশব্দে হাসতেই থাকলেন।

সুরমা থামেননি, 'সত্যি, একটা কথা ভাবলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।'

'কী কথা?'

'পঞ্চাশ বছর বয়েস হল তোমার, এখনও ওড়ার স্বভাব গেল না। কবে যে তোমার স্থিতি হবে!'

'ওটা বোধহয় এ জন্মে আর হবে না।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

এবার অবনীমোহন যা বললেন তা এইরকম। এই পৃথিবীতে ক'দিনের জন্যেই বা মানুষ আসে। পঞ্চাশ, ষাট কিংবা সত্তর বছর। তার বেশি তো নয়। অল্পক্ষণের এই প্রবাসে এক জায়গায় স্থির হয়ে গিয়ে জীবনকে বদ্ধজলার মতন গতিহীন বর্ণহীন করে তোলার কোনো মানে হয় না। তার চাইতে বহতা নদীর মতন দেশ দেশান্তরে ঘুরে যত দিকের যত মাধুর্য পার, লুট করে নাও।

জীবন সম্পর্কে অবনীমোহনের ধ্যানধারণার সঙ্গে সুরমার মেলে না। বিরক্ত গলায় তিনি বললেন, 'চিরকাল ঐ এক বক্তৃতা, শুনে শুনে কান পচে গেল—'

অবনীমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, ভেতর-বাড়ি থেকে স্নেহলতার গলা ভেসে এল, 'রমু—রমু—'

সুরমা উঠে পড়লেন 'মামীমা ডাকছে, যাই—' বলতে বলতে পা বাড়িয়ে দিলেন।

একটু পর অবনীমোহনও উঠলেন। তিনি অবশ্য ভেতরে গেলেন না, উঠোন পেরিয়ে বাগানের গাছপালার ভিড়ে অদৃশ্য হলেন।

তারপরও খানিকটা সময় কাটল।

হেমন্তের শেষ বেলাটা দ্রুত নিভে যাচ্ছে। লাটাইতে সুতো গুটনোর মতন কেউ যেন দিনান্তের রোদটুকু টেনে নিতে শুরু করেছে। গাছপালার মাথায়, দূরের ধানবনে গাঢ় বিষাদের মতন কী যেন নামছে।

আশ্বিন মাসে বিনুরা যখন রাজদিয়া এল, আকাশ তখন কত উজ্জ্বল। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে তার নীল রংখানি শরতে খুলে গিয়েছিল। সমস্ত দিন পরিষ্কার আয়নার মতন আকাশটা ঝকঝক করত। কিন্তু কার্তিক পড়তে না পড়তেই তার চেহারা বদলে গেছে। আকাশ এখন ধূসর, শোকাতুরের মতন সারাদিন বিষণ্ণ হয়ে থাকে।

একটু পরেই ঝপ করে সন্ধে নেমে যাবে। তার নিঃশব্দ আয়োজন চলছে চারদিকে।

হঠাৎ পাশ থেকে ঝিনুক ডেকে উঠল, 'বিনুদাদা—'

বিনু ঝাপসা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেখানে চোখ রেখেই আস্তে সাড়া দিল।

ঝিনুক বলল, 'কী মজা, না?'

'কিসের মজা?'

'বারে, মেসোমশাই কী বলল, শোন নি?'

অন্যমনস্কের মতন বিনু বলল, 'কী বলল?'

ঝিনুক বলল, 'তোমাদের কলকাতায় যাওয়া হবে না।'

বিনু উত্তর দিল না।

ঝিনুক আবার বলল, 'তোমরা এখন রাজদিয়ায় থাকবে। জানো বিনুদা—'

'কী?'

'আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমার?'

বিনুর যে আনন্দ হচ্ছিল না, তা নয়। হঠাৎ ঝুমার কথা মনে পড়ে গেল তার। বলল, 'আমাদের কলকাতায় যাওয়া না হলে ভারি মুশকিল হবে।'

ঝিনুক জানতে চাইল, 'কিসের মুশকিল?'

'ঝুমারা কলকাতায় আমাদের বাড়ি আসবে বলেছিল। আমরা না গেলে ওরা এসে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ বিনুকে দেখল ঝিনুক। মনে মনে তার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। একসময় গম্ভীর গলায় বলল, 'তা হলে রাজদিয়াতে থাকতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না, কেমন?'

বিনু ঝুমার কথা ভাবছিল, তাই সাড়া দিল না।

রাগ করে আর কোনো কথাই বলল না ঝিনুক, গাল ফুলিয়ে বসে থাকল।

হেমন্তের সন্ধেটা যেন সরু সুতোর ঝুলছিল, সুতোটা ছিঁড়ে গিয়ে ঝপ করে সেটা নেমে এল।

ঘরে ঘরে সন্ধেপ্রদীপ দেখাতে বেরিয়ে পুবের বারান্দার এসে স্নেহলতা অবাক। বিনু আর ঝিনুক তখনও বসে আছে।

স্নেহলতা বললেন, 'তোরা এখানে?'

ঝিনুক বিনু একসঙ্গে বলে উঠল, 'হুঁ—'

'ভূতের মতন চুপচাপ বসে এখানে তোরা কী করছিস?'

'এমনি বসে আছি।'

স্নেহলতা আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, ঝুম ঝুম ঘন্টির আওয়াজ ভেসে এল। মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলেন, ভবতোষদের সেই ফিটনটা উঠোনের দিকে আসছে।

ঝিনুক বিনুও সেদিকে তাকিয়ে ছিল। ঝিনুক হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—'

একটু পর ফিটনটা উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সত্যি সত্যি ভবতোষ এসেছেন, দরজা খুলে তিনি নেমে পড়লেন। ঝিনুক ছুটে গিয়ে তাঁর কোলে চড়ে বসল।

স্নেহলতা বললেন, 'এস ভব—'

পুজোর আগে ক'টা দিন ভবতোষের বাড়িতে রান্নাবান্নার লোক ছিল না, নিজেই রেঁধে খাচ্ছিলেন। স্নেহলতা রাগারাগি করতে এ বাড়ি এসে খেয়ে যেতেন। তখন পর পর ক'দিন ভবতোষকে দেখা গেছে। তারপর রান্নার লোক ফিরে এলে এ বাড়ি আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রায় কুড়ি বাইশ দিন পর আবার আজ এলেন।

পুবের ঘরে এনে ভবতোষকে বসালেন স্নেহলতা। ক্ষিপ্র হাতে হারিকেন জ্বেলে গলা তুলে ডাকতে লাগলেন, 'সুধা-সুনীতি-রমু—শিগগির আয়, ভবতোষ এসেছে। অবনীকেও ডেকে নিয়ে আয়—'

চারদিক থেকে ছোটাছুটি করে সুধা-সুনীতিরা এসে পড়ল।

সবাই এলে স্নেহলতা বললেন, 'তুমি কেমন মানুষ ভব!'

স্নেহলতা কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গেলেন ভবতোষ।

'আজ্ঞে—'

'সেই যে দশমীর দিন এলে, তারপর থেকে আর পাত্তাই নেই। ভেবেছিলাম লক্ষ্মীপুজোর দিন আসবে, তাও এলে না।'

'রোজই আসব ভাবি। আসি আসি করে আসা হচ্ছিল না।'

'কত রাজকার্য তোমার! এখন কলেজ ছুটি। কষ্ট করে হেঁটে আসতে হয় না। ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে পারলেই হল। সেটুকুও পেরে ওঠ না?'

ভবতোষ ম্লান হাসলেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন খুড়িমা?'

'কী?'

'কিছুই আজকাল ভাল লাগে না।'

একটু নীরবতা। তারপর স্নেহলতা বললেন, 'বৌমার কোনো খবর আছে?'

ভবতোষ ঘাড় কাত করলেন, 'আছে।'

এ ঘরের সবাই উদ্‌গ্রীব হলেন। উৎসুক গলায় স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী খবর?'

ভবতোষ বললেন, 'ঝিনুকের মা লোক পাঠিয়েছে।'

স্নেহলতার ভ্রূ কুঁচকে গেল। তীক্ষ্ণ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ?'

'অনেকদিন মেয়েকে দেখে নি। তাই—'

'তাই কী?'

একটু চুপ করে থেকে ভবতোষ বললেন, 'লোকটার সঙ্গে ঝিনুককে পাঠিয়ে দিতে বলেছে।'

বিদ্রূপের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'পাঠিয়ে দিতে বলেছে! নবাব-নন্দিনী নিজে আসতে পারেন নি?'

নবাব-নন্দিনী কে, বুঝতে পারলেন ভবতোষ। আবছা গলায় কী বললেন, বোঝা গেল না।

আগের সুরে স্নেহলতা আবার বললেন, 'সে এখান থেকে গেছে কতদিন?'

'মাস দেড়েকের মতন। আশ্বিনের দুতারিখে তাকে ঢাকায় দিয়ে এসেছিলাম।'

'দেড় মাসের মধ্যে বুঝি ঝিনুকের কথা তার মনে পড়ে নি!'

ভবতোষ উত্তর দিলেন না।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'এতকাল পরে মেয়ের জন্যে তার সোহাগ উথলে উঠল যে?'

ভবতোষ এবার চুপ। এ প্রশ্নের উত্তর তিনি কেমন করে দেবেন?

স্নেহলতা থামেন নি। ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচুতে উঠতে লাগল, 'আশ্চর্য মেয়েছেলে! ভগবান কী বস্তু দিয়ে যে গড়েছিলেন! স্বামীর সঙ্গে না হয় বনে নি কিন্তু মেয়েটা? দেড় মাস ঐ দুধের শিশু ছেড়ে আছে। এতদিন যখন ছেড়ে থাকতে পেরেছে তখন আর নতুন সোহাগে দরকার নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একসময় খুব আস্তে ভবতোষ ডাকলেন, 'খুড়িমা—'

স্নেহলতা তক্ষুণি সাড়া দিলেন।

বলি বলি করেও ইতস্তত করতে লাগলেন ভবতোষ। তারপর দ্বিধান্বিত সুরে শুধোলেন, 'আপনি কী বলেন ?'

'কী ব্যাপারে ? ঝিনুককে ঢাকায় পাঠাব ?'

স্নেহলতা এমনিতে প্রিয়ভাষিণী, গলা উঁচুতে তুলে কখনও কথা বলেন না। স্বভাবখানি যেমন মধুর তেমনি স্নেহময় এবং আমোদপ্রিয়। কৌতুকের একটু ছোঁয়ায় এই বয়সেও তিনি সবার সঙ্গে তাল দিয়ে বেজে উঠতে পারেন। তিনি যে পথে হাঁটেন তার দু'ধারে যেন নিমেষে থোকায় থোকায় সুগন্ধময় ফুল ফুটে যায়।

আপন স্বভাবের কথা বুঝিবা মনে থাকল না। রাগের গলায় স্নেহলতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না, কিছুতেই না। ঝিনুককে ঢাকায় পাঠাতে পারবে না।'

স্নেহলতার এমন ক্রুদ্ধ ভীষণ চেহারা আগে আর কখনও দেখেন নি ভবতোষ। তিনি প্রায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'ঝিনুককে যখন একবার দেখতে চেয়েছে—'

ভবতোষ কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই চোখ পাকিয়ে সন্দিগ্ধ সুরে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মতলবটা কী ভব ?'

কিছু হয়তো বলবার ছিল ভবতোষের কিন্তু সাহসে কুললো না। স্নেহলতার মুখের দিকেও তিনি তাকিয়ে থাকতে পারছিলেন না। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে দুরু দুরু বুকে বসে থাকলেন।

স্নেহলতা আবার বলে উঠলেন, 'তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, ঝিনুককে ঢাকায় পাঠানো চলবে না। নবাবের বেটির যদি মেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়, এখানে এসে দেখে যেতে হবে। বুঝলে ?'

ভয়ে ভয়ে ঘাড় কাত করলেন ভবতোষ, 'আচ্ছা—'

'আর এর ফলও ভাল হবে না।'

'কিসের ?'

'কিসের আবার, ঝিনুককে ঢাকায় পাঠানোর।' স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'মাকে এখন দেখে না, সে একরকম ভাল। কিন্তু দু-চারদিনের জন্যে পাঠিয়ে যদি দাও, আসবার সময় মেয়ের মন খারাপ হয়ে যাবে। এখানে আসার পরও তার রেশ থেকে যাবে। না-না, ঢাকায় পাঠিয়ে মেয়ের মন আমি নষ্ট হতে দেব না। তা ছাড়া—'

ভবতোষ উন্মুখ হলেন।

স্নেহলতা প্রশ্ন করলেন, 'ঝোঁকের মাথায় মেয়ে পাঠাতে তো চাইছ কিন্তু অন্য দিকটা ভেবে দেখেছ ?'

'কোন দিকটা ?'

'ঝিনুককে যদি ওরা ফেরত না পাঠায় ?'

এ ব্যাপারটা আগে ভাবেন নি ভবতোষ। ঈষৎ চকিত হয়ে বললেন, 'সে তো ঠিকই।'

স্নেহলতা বললেন, 'মেয়ে ছাড়া তুমি বাঁচবে ?'

'না, কক্ষণো না।'

একটু চুপ। তারপর ভবতোষ মুখ তুলে স্নেহলতাকে দেখলেন, যেই চোখাচোখি হল অমনি চোখ নামিয়ে নিলেন। বারকতক এই রকম চলল।

স্নেহলতা লক্ষ করেছিলেন। বললেন, 'আমায় কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ।' আস্তে করে মাথা নাড়লেন ভবতোষ।

'কী ?'

ভয়ে ভয়ে ভবতোষ বললেন, 'ঝিনুক তো অনেকদিন আপনার কাছে রইল। সেই পুজোর আগে থেকে আছে—'

স্নেহলতার চোখ কুঁচকে গেল, 'তাতে কী হয়েছে ?'

'কিছু না—'

'তবে ও কথা বললে যে ?'

তক্ষুণি উত্তর দিলেন না ভবতোষ। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'অনেকদিন মেয়েটা আমার কাছ ছাড়া, একেবারে ভাল লাগছে না। ভাবছি—'

'কী ?'

'আজ ওকে নিয়ে যাব। দিনতিনেক পর আমার কলেজ খুলবে। কলেজ খুললে তো রাখার অসুবিধে। এই তিনটে দিন ঝিনুক আমার কাছে থেকে আসুক।'

স্নেহলতা জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'না।'

বিমূঢ়ের মতন ভবতোষ বললেন, 'কী ?'

'ঝিনুক আজ যাবে না।'

'কেন।'

'তোমাকে তো সেই ছেলেবেলা থেকে দেখছি ভব, মানুষটা তুমি ভারি নরম। বাড়ি যেতে যেতে হয়তো মতি বদলে গেল, সেই লোকটা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঝিনুককে ঢাকায় নিয়েও যেতে পারে। লোকটাকে বিদেয় করে মেয়ে নিয়ে যেও। তার আগে না।'

অসহায়ের মতন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভবতোষ বললেন, 'তা হলে আর কি, এখন আমি যাই—'

'এখুনি যাবে ? রাত্তিরে একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে যেও।'

'না খুড়িমা, আজ আর খাব না। বাড়িতে রান্নাবান্না করা আছে, এখানে খেয়ে গেলে সব নষ্ট হবে।'

'তা হলে বাড়িতেই খেও।' স্নেহলতা হাসলেন।

এতক্ষণ স্নেহলতার সঙ্গেই কথা বলছিলেন ভবতোষ। ঘরে যে আরো মানুষ আছে সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। এবার অবনীমোহনদের দিকে ফিরলেন তিনি। মৃদু হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু খুড়িমার সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছি।'

অবনীমোহন বললেন, 'দরকার থাকলে বলতে হবে বৈকি।'

খানিক ভেবে ভবতোষ বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে আমার কিছু অভিযোগ আছে—'

অবনীমোহন চকিত হলেন, 'কী ?'

'রাজদিয়ায় এতদিন কাটালেন অথচ আমার বাড়িতে একবারও এলেন না—'

'সত্যি ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। এবার একদিন যাব।'

'যাবেন না, বুঝতেই পারছি। গেলে এতদিনে ঠিকই যেতেন।' ভবতোষ বলতে লাগলেন, 'পুজো-টুজো গেল। এবার তো কলকাতায় ফিরবেন। আমার ওখানে আর যাবেন কবে ?'

অবনীমোহন বললেন, 'কলকাতায় আমরা ফিরছি না।'

'সত্যি !' ভবতোষ অবাক।

'সত্যি।' অবনীমোহন হাসলেন, 'এবার থেকে আমরা আপনাদের রাজদিয়ার বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছি।'

'খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু—'

'কী ?'

'আপনারা শহরের মানুষ, চিরকাল কলকাতায় থেকেছেন। এই ম্যাড়মেড়ে নিঝুম গ্রামদেশ কি বেশিদিন ভাল লাগবে ?'

ওধার থেকে সুরমা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বলা মুশকিল। তবে—'

'তবে কী ?'

'মাথার ভেতর পোকাটা যতদিন কটকট করছে ততদিন এখানেই থাকবে।' বলে কৌতুকময় চোখে স্বামীকে বিদ্ধ করলেন সুরমা।

সুরমার কথাগুলো ভাল করে বুঝতে পারেন নি ভবতোষ। কিছুটা বিমূঢ়ের মত একবার তাঁর দিকে, একবার অবনীমোহনের দিকে তাকাতে লাগলেন।

এই সময় হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল অবনীমোহনের। তাড়াতাড়ি ভবতোষের দিকে ফিরে বলে উঠলেন, 'আপনাকে পেয়ে ভালই হল। আচ্ছা—'

'কী ?'

'আপনি তো এখানকার কলেজে অধ্যাপনা করেন ?'

'হ্যাঁ।'

'একটু ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে ভাই—'

ভবতোষ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অবনীমোহন বললেন, 'এই আমার মেয়েদের ভর্তির ব্যাপারে। কাল পরশুর মধ্যে মামাবাবুকে নিয়ে আপনার বাড়ি যাচ্ছি, তখন বলব।'

'আচ্ছা।'

আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে ভবতোষ উঠে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ হল, ভবতোষ চলে গেছেন। তারপরও স্নেহলতারা উঠলেন না, পুবের ঘরেই বসে থাকলেন। তাঁদের মধ্যে ভবতোষের কথাই হতে লাগল।

ভবতোষের সংসারে কথা ভেবে সবাই দুঃখিত, বিষণ্ণ, ব্যথিত। তিনটে তো মোটে মানুষ—ভবতোষ, তাঁর স্ত্রী এবং ঝিনুক। তিনজনে আজ তিন জায়গায়। একজন ঢাকায়, আর দু'জন রাজদিয়ার দুই প্রান্তে। সংসারটা তিন টুকরো হয়ে তিন দিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। অথচ কোনো অভাব ছিল না, সুখের সব উপকরণ ছিল হাতের কাছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য বনিবনা থাকলে ওরা কত সুখীই না হতে পারত।

দেখতে দেখতে হেমন্তের রাত গাঢ় হয়ে উঠল। ক'দিন আগে ছিল অমাবস্যা। আকাশের প্রান্তে যে এক ফালি ক্ষীণায়ু চাঁদ উঠেছে, জলবাংলার এই অংশটিকে তা আলোকিত করে তুলতে পারে নি। তার ওপর আছে গুঁড়ো গুড়ো হিমের রেণু। ফলে গাছপালা, আকাশ, দূরের ধানখেত—সমস্ত কিছুই ঝাপসা, অস্পষ্ট, কুহেলিবিলীন। বিচিত্র মায়াবরণের মতন এই রাত রাজদিয়াকে ঢেকে রেখেছে।

ভবতোষ যাবার পর কতক্ষণ কেটেছে, কে জানে। হঠাৎ বাইরের উঠোনে হেমনাথের গলা পাওয়া গেল, 'কোথায় রে বিনুদাদা, ঝিনুকদিদি—'

কমলাঘাটের গঞ্জ থেকে রাতদুপুরে ফেরার কথা ছিল হেমনাথের। দেখা গেল, অনেক আগেই

ফিরে এসেছেন। স্নেহলতারা হারিকেন নিয়ে ব্যস্তভাবে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

হেমনাথ একাই আসেন নি, যুগলকেও তাঁর পেছনে দেখা গেল। সকালবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে কমলাঘাট গিয়েছিলেন হেমনাথ।

কেউ কিছু বলবার আগেই লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নামল ঝিনুক। ছুটতে ছুটতে কাছে এসে হেমনাথকে জড়িয়ে ধরল, 'দাদু দাদু, একটা কথা শুনেছ?'

দু'হাত দিয়ে সস্নেহে ঝিনুককে কোলে তুলে নিলেন হেমনাথ, 'কী কথা রে দিদিভাই?'

ঝিনুক হেসে হেসে রহস্যের গলায় বলল, 'কী কথা তুমিই বল না?'

'আমি কেমন করে বলব? আমি কি অন্তর্যামী? তবে ঝিনুকদিদি যখন এত খুশি তখন নিশ্চয়ই কথাটা খুব ভাল—'

'হুঁ।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'তোমাকে বলতে হবে, কী কথা—'

'বলতেই হবে?'

'হ্যাঁ।'

মুখখানা গম্ভীর করে চোখ কুঁচকে কত না ভাবনার ভান করলেন হেমনাথ। তারপর বললেন, 'এইবার বুঝতে পেরেছি—'

সাগ্রহে ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, 'কী?' তোর দিদা আরেক বার নিকের ব্যবস্থা করেছে। তাই না রে?' বলে আড়ে আড়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন হেমনাথ।

লক্ষ্যভেদ ঠিকমতোই হয়েছিল। স্নেহলতা ঝংকার দিয়ে উঠলেন, 'আহা-হা, বুড়ো বয়সে রস একেবারে উথলে উঠেছে। মুখে কিছু আর আটকায় না।'

হেমনাথ রগড়ের গলায় বললেন, 'তোমার দিকে তাকালে রস না উথলে যে পারে না সখী। চেহারাখানা এই বয়সেও যা ডাঁটো রেখেছ।'

স্নেহলতা ধমকে উঠলেন, 'থাম, আর ফাজলামো করতে হবে না।'

হেমনাথ হাসতে লাগলেন। তিনি কি একাই, অবনীমোহন-সুরমা-শিবানী সুধা-সুনীতি—সবাই ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

হেমনাথের রসিকতা বুঝবার মতন বয়েস নয় ঝিনুকের। সে বলে উঠল, 'পারলে না দাদু বলতে, পারলে না—'

ঝিনুকের দিকে ফিরে হেমনাথ বললেন, 'পারলাম না, না? দিদুর নিকের কথাটা তা হলে ঠিক নয়?'

'না।'

'তবে কি—' আগের মতন ভাবনার অভিনয় করে হঠাৎ সকৌতুকে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'সুধা-সুনীতি, আমাকে তালাক দিয়ে আর কারো সঙ্গে ঝুলে পড়তে চাইছে? এবার ঠিক হয়েছে, না রে ঝিনুকদিদি?'

কথাটা শেষ হল কি হল না, তার আগেই সুধা-সুনীতি চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'খুব খারাপ হয়ে যাবে দাদু, খুব খারাপ হয়ে যাবে—'

যে কারণেই হোক মনটা খুব ভাল ছিল, এর-তার পেছনে লেগে মজা করতে লাগলেন হেমনাথ।

এদিকে ঝিনুক অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সে বলতে লাগল, 'তোমার একটা কথাও ঠিক হচ্ছে না।'

মুখখানা করুণ করুণ করে হেমনাথ বললেন, 'একটাও হচ্ছে না?'

'না।' ঝিনুক জোর জোর মাথা নাড়ল, 'তুমি তো পারলে না, আমিই বলে দিচ্ছি—' মনের কথাটা না বলা পর্যন্ত স্বস্তি হচ্ছিল না ঝিনুকের।

'সব শুনব, তার আগে ঘরে চল—'

ঝিনুককে কোলে নিয়েই ঘরে এলেন হেমনাথ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতারাও ভেতরে ঢুকলেন। যুগল বারান্দায় উঠে খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কোল থেকে ঝিনুককে নামিয়ে হেমনাথ বললেন, 'কী বলবি বল—'

ঝিনুক এক নিশ্বাসে বলে গেল, 'জানো দাদু, জানো—বিনুদাদারা আর কলকাতায় যাবে না, আমাদের এখানে থাকবে।' আনন্দে, উত্তেজনায় তার চোখমুখ ঝকমক করতে লাগল।

'তাই নাকি?'

'হুঁ। তুমি ওদের জিজ্ঞেস করে দেখ না—'

এই সময় অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'ঝিনুক ঠিকই বলেছে মামাবাবু। আমরা আর কলকাতায় ফিরছি না।'

এই কথাটা আগেও আরো দু'একবার বলেছিলেন অবনীমোহন। এই দেশ, পূর্ববাংলার এই শ্যামল সজল ভূখণ্ড তাঁর ভাল লেগেছে। এখান থেকে তিনি আর যাবেন না, স্থায়ীভাবে রাজদিয়াতেই তাঁর থাকার ইচ্ছে—মাঝে মাঝে এরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু সে সব নেহাতই কথাচ্ছলে বলা। হেমনাথ তেমন গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু অবনীমোহন যে সুরে আজ বললেন সেটা খুব হালকা নয়। স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেমনাথ বললেন, 'তুমি কি এ ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস?'

অবনীমোহন মাথা নাড়লেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মামাবাবু।'

'তোমারা এখানে থাকবে, সে তো খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু—'

'কী?'

একটু চুপ করে রইলেন হেমনাথ। তারপর বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

অবনীমোহন উদ্‌গ্রীব হলেন।

'হঠাৎ ইস্টবেঙ্গলে থাকা স্থির করলে কেন?' .

অবনীমোহন যা উত্তর দিলেন সংক্ষেপে এই রকম। তিনি পশ্চিম বাংলার মানুষ, আদি সাকিন বীরভূম জেলায় অর্থাৎ রাঢ়ে। তবে চাকরিবাকরির খাতিরে তিন পুরুষ কলকাতাতেই আছেন, দেশের সঙ্গে যোগসূত্র একরকম নেই বললেই হয়, ন'মাসে ছ' মাসে এক-আধবার যাওয়া হয় কিনা সন্দেহ। যত ক্ষীণই হোক, রাঢ়বঙ্গের সঙ্গে তবু কিছু সম্পর্ক আছে।

অবনীমোহন পূর্ববাংলার মেয়ে বিয়ে করেছেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে তাঁকে পদ্মা-মেঘনা পাড়ি দিতে হয় নি। কেননা সুরমার বাবা চিরকাল কলকাতাতেই কাটিয়েছেন, অবনীমোহনের বিয়েও হয়েছিল কলকাতায়।

বিয়ের পর অনেক বার, প্রায় প্রতি বছরই হেমনাথ তাঁদের পূর্ববাংলা দেখে যেতে লিখেছেন। আসি আসি করেও জীবনের অর্ধ-শতাব্দী কেটে গেছে। এতকাল পর এখানে এসে মুগ্ধ হয়ে গেছেন অবনীমোহন—মুগ্ধ, বিস্মিত, চমৎকৃত। বাংলাদেশের এমন একটা স্নিগ্ধ মনোরম রূপ যে থাকতে পারে কোনোদিন তিনি তা কল্পনাও করেন নি।

রাঢ়ে যে বাংলাদেশ রূঢ়-কর্কশ-কঠিন, সেই বাংলাই এখানে সুজলা-সুফলা, ঐশ্বর্যময়ী। শস্যে-স্বর্ণে আর অনন্ত সম্ভাবনায় তার ভাণ্ডার এখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কড়ি আর কোমলে মেশা বাংলার কত না রূপ! তার বহুরূপিণী মৃত্তিকার অর্ধেকেরও বেশি পড়েছে এই পূর্ববাংলায়।

অবনীমোহনের দুর্ভাগ্য, এতকাল তিনি এখানে আসেন নি। যখন এসেই পড়েছেন তখন জলবাংলাকে তার আপন মহিমায় চিনতে চেষ্টা করবেন। ছেলেমেয়েরা যাতে গোটা দেশকে চিনতে পারে সে জন্যও কিছুকাল তাঁদের এখানে থাকা দরকার। পূর্ববাংলাকে না চিনলে অখণ্ড বাংলাদেশকে চেনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

অবনীমোহনের ধারণা, পুব বাংলাকে চেনার মন্ত্র হেমনাথ-লারমোর-স্নেহলতার মতন মানুষদের হাতে রয়েছে এবং পুব বাংলাকে না জানলে গোটা বাংলা দেশটাকেই জানা যাবে না। তাঁর বিশ্বাস এখানে তাঁদের থাকা ব্যর্থ হবে না, অবেগপূর্ণ সুরে সেই কথাই তিনি বলে গেলেন। তারপর উৎসুক দৃষ্টিতে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

অভিভূতের মতন শুনে যাচ্ছিলেন হেমনাথ। আচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'তুমি যে এভাবে ভেবেছ, আমি চিন্তাই করিনি।'

অবনীমোহন হাসলেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, পুব বাংলাকে না জানলে গোটা বাংলাদেশকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

একটু চুপ।

তারপর অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে মামাবাবু—'

'কী সমস্যা ?'

'আমরা যদি এখানে থেকে যাই ছেলেমেয়েগুলো পরীক্ষা টরীক্ষা দিতে পারবে না। তাতে একটা করে বছর নষ্ট।'

'পরীক্ষার জন্য আটকাবে না। আমি হেডমাস্টারকে বলে দেব জানুয়ারি মাসে বিনুকে পরের ক্লাসে ভর্তি করে নেবে। অবশ্য অ্যাডমিসন টেস্ট দিতে হবে। আর সুধা-সুনীতির জন্যে তো ভবতোষই আছে। ওদের কলেজে ভর্তি হতে অসুবিধা হবে না।'

অবনীমোহন বললেন, 'ভবতোষবাবু সন্ধেবেলা এসেছিলেন। সুধা-সুনীতির ভর্তির ব্যাপারে আমি তাঁকে একটু আভাস দিয়েছি। বলেছি, দু-একদিনের ভেতর আপনাকে নিয়ে তাঁর বাড়ি যাব।'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ তো—'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে অবনীমোহনকে চিন্তিত দেখাল। বললেন, 'ভর্তি তো করব, কিন্তু—'

'কী ?'

'ওরা কলকাতা ইউনিভার্সিটির কোর্স করেছে। এখানে—'

বাধা দিয়ে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'সে জন্যে তোমার দুশ্চিন্তা নেই। এখানকার কলেজটা কলকাতা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে। ঢাকা শহর বাদ দিলে ইস্টবেঙ্গলে যত স্কুল-কলেজ আছে তার প্রায় সবগুলোই কলকাতা ইউনিভার্সিটির আওতায় পড়ে।'

'তাই নাকি ! আমার জানা ছিল না। যাক, ভালই হয়েছে।' অবনীমোহন নিশ্চিন্ত হলেন।

হেমনাথ খানিক ভেবে বললেন, 'এখানে তো থাকবে কিন্তু কলকাতায় তোমার ব্যবসা ট্যাবসা আছে না ?'

'আছে।'

'তার কী হবে ?'

'তুলে দেব। মাঝখানে একবার কলকাতায় যেতে হবে। সব বন্দোবস্ত করে সপ্তাখানেকের ভেতর

ফিরে আসব। ভাবছি—'

'কী?'

'চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে তো বসে থাকা যাবে না। এখানে কিছু ধান জমিটমি কিনে চাষবাস করব, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

'বেশ তো, কালই তোমার মিতাকে একটা খবর পাঠাচ্ছি, তার কাছে অনেক জমির খোঁজ আছে।'

'মিতা মানে মজিদ মিঞা?'

'হ্যাঁ—'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেমনাথ আর অবনীমোহনের কথা গোগ্রাসে গিলছিল বিনু। হঠাৎ কে যেন চাপা গলায় ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু—'

চমকে পেছন ফিরতেই দেখা গেল বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুগল। চোখাচোখি হতেই যুগল হাতছানি দিল।

পায়ে পায়ে ঘর থেকে বাইরে এল বিনু। বলল, 'ডাকছ কেন?'

চাপা আনন্দের গলায় যুগল বলল, 'বড় বাহারের সম্বাদ (খবর) ছুটোবাবু, বড় বাহারের সম্বাদ—'

বুঝতে না পেরে বিনু শুধলো, 'কী?'

'আপনেরা রাইজদিয়াতে থাকবেন।'

তারা রাজদিয়া-বাসী হবে, এতে সবাই খুশি। হেমনাথ-ঝিনুক-শিবানী-স্নেহলতা, সব্বাই। যুগলও যে খুশি হবে, মনে মনে বিনু তা জানত।

যুগল বলল, 'লন (চলুন) আমার লগে।'

'কেন?'

'মেলা কথা আছে।'

বিনু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। অন্ধকারে যুগলের সঙ্গে তার ঘরে চলে এল। হাতড়ে হাতড়ে কোত্থেকে একটা হারিকেন বার করে জ্বালিয়ে ফেলল যুগল। বলল, 'বয়েন—'

বিনু পা ঝুলিয়ে চৌকিতে বসল। তারপর জানতে চাইল, 'কী কথা যেন বলবে—'

'তরাতরির কী ছুটোবাবু, ধীরেসুস্থে শোনেন—'

যুগলের চোখেমুখে আলো খেলে যাচ্ছে। দুই ঠোঁটের মধ্যিখানে আধফোটা একটু হাসি। বাইরেটা দেখে মনে হয়, প্রাণের ভেতর তার আনন্দের বান ডেকেছে। উৎসুক চোখে বিনু তাকিয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পর যুগল বলল, 'আইজ বিহান বেলায় বড়কত্তার লগে কমলাঘাট গেছিলাম।'

বিনু বলল, 'জানি।'

'হেইখানে কী হইছে জানেন ছুটোবাবু?'

'কী?'

খুশির সঙ্গে খানিকটা উত্তেজনা মিশিয়ে যুগল ফিসফিস করল, 'গোপাল দাসের লগে দেখা। হ্যায়ও কমলাঘাট আইছিল।'

এত আনন্দের কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারল বিনু। তাকিয়েই ছিল। বলল, 'সেই জন্যেই বুঝি এত ফুর্তি?'

যুগল শব্দ করে হাসতে লাগল।

বিনু আজকাল বিয়ের ব্যাপারে যুগলের সঙ্গে ঠাট্টা-টাট্টা করে। রগড়ের গলায় বলল, 'শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হলে কার না আনন্দ হয়।'

যুগল বলল 'অহনও হউর হয় নাই কিলাম।'—

'দু'দিন পর হবে তো।'

'তা হইব।' যুগল তক্ষুণি ঘাড় কাত করল।

বিনু শুধলো, 'গোপাল দাস কী বললে?'

'আমারে কিছু কয় নাই। কথা-বাত্‌রা যা কিছু বড়কত্তার লগেই হইছে।' যুগল বলতে লাগল, 'গোপাল দাস কী কইছে জানেন?'

'কী?'

'বিয়ার সময় পাখিরে যা-যা গয়নাগাটি দিব, বানাইয়া ফালাইছে। হার, চুড়ি, আংটি, কানের দুল, জামাইর আংটি—কিছু আর বাকি নাই। হের পর অন্য জিনিসের কথা ধরেন। নয়া কাপড়-চোপড়, টিনের তোরঙ্গ, বিছানা-পাটি, আয়না-কাকই বাসন-কোসন—সগল কিনা (কেনা) হইয়া গেছে।' বলতে বলতে একেবারে বিভোর হয়ে গেল যুগল। তার চোখ চকচক করতে লাগল।

বিনু বল, 'এত তাড়াতাড়ি সব কিনে ফেলল?'

যুগল অবাক, 'তরাতরির কই ছুটোবাবু, দিনের হিসাব কইরা দেখছেন?'

বিনু ঘাড় নাড়ল, হিসেব করেনি।

যুগল বলল, 'কাত্তিক মাস শ্যাষ হইয়া আইল। আর ছয় দিন পর অঘ্‌ঘান পইড়া যাইব। অঘ্‌ঘানের মাঝামাঝি ধান কাটা। একবার ধান কাটা আরম্ভ হইলে উয়াস (নিশ্বাস) ফালানের সময় পাইব না গোপাল দাস। এক-আধটুক জমিন তো তার না, এক লপ্তে বিশ কানি জমিন। বিশ কানিতে কত ধান হয়, চিন্তা কইরা দ্যাখেন। হেই সগল কাইট্যা-কুইট্যা সেইত্যা ঘরে তুলতে পৌষ-মাঘ দুইখান মাস যাইব গিয়া। হের পরেই ফাল্গুন মাস। আর—'

'আর কী?' জিজ্ঞাসু চোখে বিনু তাকাল।

যুগল বলল, 'ফাল্গুন মাস পড়লেই বিয়া। এরই ভিতর কিনা-কাটা সাইরা না রাখলে চলে?'

বিনুকে মাথা নাড়তেই হল, 'তা তো ঠিকই—'

একটু ভেবে যুগল আবার বলল, 'দুই-একদিনের ভিতরেই গোপাল দাস আমাগো এইখানে আইব।'

'কেন?'

'বড় কত্তার কাছ থিকা পণের ট্যাকা আদায় করতে।'

বিনুর মনে পড়ে গেল, পাখির জন্য সেদিন আট কুড়ি টাকা পণ চেয়েছিল গোপাল দাস।

যুগল আবার বলল, 'ধান কাটার আগেই সগল ঝামেলা চুকাইয়া রাখতে চায় গোপাল দাস। হের পর ফাগুন পড়লেই পাখির আর আমার দুই জনের চাইর হাত এক কইরা দিব। ঝামেলা আগেই মিটাইয়া রাখন ভাল, না কী ক'ন ছুটোবাবু?' সমর্থনের আশায় বিনুর চোখের দিকে তাকাল সে।

বিনু মাথা নাড়াল।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর যুগলই আবার শুরু করল, 'আমার বিয়ার সময় আপনেরে কিন্তুক বরযাত্তী যাইতে হইব ছুটোবাবু। না গেলে ছাড়ুম না।'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

'আপনেরা এইখানে থাকবেন, আমার বিয়ায় যাইবেন—কী যে আনন্দ হইতে আছে ছুটোবাবু!'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল বলতে লাগল, 'পাখি আর আমার ব্যাপারটা আপনে তো সগলই জানেন ছুটোবাবু। হেই জল সাতরাইয়া পাখি আমার নায়ে আইল, তারে গান শুনাইলাম, তার লেইগা ছোক ছোক করতে করতে টুনি বইনের বাড়িত্ যাইতাম—কী না জানেন আপনে! আপনেরে যদি বিয়ার সময় না পাইতাম

কী দুঃখু যে হইত!'

বিনু এবারও চুপ করে থাকল।

ধীরে ধীরে কার্তিকের রাত গাঢ় হতে লাগল।

পরের দিন সকালেই নৌকো দিয়ে যুগলকে কেতুগঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন হেমনাথ। মজিদ মিঞাকে নিয়ে সে যখন ফিরল হেমন্তের সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে।

ক'দিন আগেও দুপুরবেলাটা অসহ্য লাগত। চারদিকে এত গাছপালা, এত জল, স্নিগ্ধ সুশ্যাম মাঠ, এমন অঢেল হাওয়া—তবু সূর্য মাথায় ওপর এলে তাতে গা পুড়ে যেত।

কার্তিক মাস পড়তেই সূর্যটা কেমন যেন জুড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। রোদের স্বভাব যাচ্ছে দ্রুত বদলে। দুপুরবেলাগুলোও এখন বেশ আরামদায়ক। হাওয়াতে টান ধরেছে। শীত যে আসছে, এ তারই ভূমিকা।

মজিদ মিঞাকে আনবার জন্যই যুগলকে পাঠানো হয়েছিল। যেতে-আসতে যুগলের দুপুর হয়ে যাবে, মোটামুটি সময়ের এই হিসেব ধরে হেমনাথ আর অবনীমোহন বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। বিনুও সেখানে ছিল।

আন্দাজটা মোটামুটি সঠিক। জানলা দিয়ে বিনুরা দেখতে পেল, যুগলের নৌকো পুকুরঘাটে এসে ভিড়েছে। ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পাড়ে নামল মজিদ মিঞা। তারপর উল্লসিত উত্তেজিত গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল, 'আমার মিতায় কই? ঠাউর ভাই কই?'

মজিদকে দেখে সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। হেমনাথ গলা তুলে বললেন, 'এই যে আমরা।'

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে মজিদ মিঞা বলল, 'কথাখান কি সত্য ঠাউর ভাই?' বলে হেমনাথের দিকে তাকাল।

হেমনাথ শুধোলেন, 'কোন কথা?'

'আমার মিতায় নিহি রাইজদিয়ায় থাইকা যাইব?'

'হ্যাঁ।'

অত বড় মানুষটা, প্রায় অবনীমোহনের সমবয়সী—আনন্দে উত্তেজনায় কী করবে, কী না করবে যেন ভেবে পেল না। ছুটে এসে বিনুকে কোলেই তুলে নিল, তারপর আবেগের গলায় বলল, 'যুগলা গিয়া যখন এই কথা কইল, আমি তো বিশ্বাসই করি নাই।'

হেমনাথ বললেন, 'ঘরে আয়—'

সবাই ঘরে গেল। মজিদ মিঞা বিনুকে ছাড়ে না, তাকে কোলে নিয়েই তক্তাপোশে বসল। বিনু বারকতক উসখুস করল কিন্তু মুক্তি পাওয়া গেল না।

মজিদ মিঞা বলল, 'বিহানবেলা বাইর হইতে আছি, যুগলা গিয়া হাজির। তারে দেইখা আমি আটাস (অবাক), মনে মনে এট্টু ডরও ধরছিল। দরকার পড়লে ঠাউর ভাই নিজেই আমার বাড়িত্ যায়, তয় যুগলা আইল কেন? কী সম্বাদ হ্যায় লইয়া আইছে, কে জানে।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'তারপর?'

মজিদ মিঞা আর বলতে পারল না। পুকুরঘাট থেকে যুগল এসে কখন যে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়েছে, কারো খেয়াল নেই। সে বলল, 'হেরপর আমি যহন কইলাম, জামাইকত্তারা (অবনীমোহনরা) এইখানেই থাকব তহন মিঞাভাই তেনার পোলাপানেরে ডাইকা, বাপেরে ডাইকা, মায়েরে ডাইকা, ভাবীজানরে ডাইকা, কেতুগঞ্জের বেবাক মাইন্ষেরে ডাইকা চাইর দিক উথাল-পাথাল কইরা ফেলাইল। মিঞাভাইর মুখে খালি একখান কথা, আমার কইলকাতার মিতায় এইবার রাইজদিয়াবাসী হইব।'

মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। তার ফাঁকে জগতের সরলতম হাসিটি হেসে মজিদ মিঞা বলল, 'কথাখান শুইনা আহ্লাদে আটখান হইয়া গেছিলাম। আহ্লাদ হইলে মাইন্ষেরে ডাইকা ডাইকা কমু না?'

মজিদের আনন্দ, মজিদের আন্তরিকতা প্রাণের ভেতরটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। অভিভূত অবনীমোহন বললেন, 'হাজার বার বলবেন—'

মজিদ মিঞা যেন শুনতে পেল না। ঘোরের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'আইজ বিহান বেলায় কার মুখ দেইখা যে উঠছিলাম। জন্ম জন্ম য্যান তার মুখ দেইখাই উঠি।'

একটুক্ষণ চুপ।

তারপর মজিদ মিঞা নীরবতা ভাঙল, 'অহন ক'ন কিসের লেইগা ডাইকা পাঠাইছেন—'

হেমনাথ বললেন, 'খুব দরকারি কথা আছে তোর সঙ্গে—'

মজিদ মিঞা উৎসুক চোখে তাকাল।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'এখন না, খাওয়াদাওয়া কর। তারপর ধীরে সুস্থে শুনিস।'

মজিদ মিঞার তর আর সয় না। বলল, 'না, অখনই ক'ন।'

এইসময় ভেতর-বাড়ি থেকে করিম এসে জানাল, রান্নাবান্না হয়ে গেছে। স্নেহলতা বলে দিয়েছেন, এক্ষুণি যেন সবাই চান-টান করে নেয়।

হেমনাথ বললেন, 'ঐ যে তলব এসে গেছে। এখন যদি বসে বসে কথা বলতে থাকি, তোর আমার কারো মাথাই বাঁচবে না।'

খাওয়াদাওয়ার পর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারল না মজিদ মিঞা। খেতে বসেই সে বলল, 'ঠাউর ভাই, আমি কিন্তুক সোয়াস্তি পাইতে আছি না।'

হেমনাথ তাকালেন, 'কেন?'

'ক্যান আবার, যে কথা কওনের লেইগা ডাইকা আনলেন অহনও তা কইতে আছেন না—'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তুই বড় অস্থির মজিদ—'

মজিদ মিঞা তক্ষুণি ঘাড় কাত করল, 'লাখ কথার এক কথা। সত্যই আমি বড় অস্থির—'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না হেমনাথ। মনে মনে খানিক চিন্তা করে একসময় শুরু করলেন, 'অবনীর খুব ইচ্ছে কিছু জমিজমা কেনে। চাষ-আবাদ করতে চায়—'

মজিদ মিঞা লাফিয়ে উঠল, 'এ তো বড় আনন্দের কথা—'

'আগে সবটা শোন। তারপর লাফাস।'

'আইচ্ছা ক'ন—'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'আমি তো জমিজমার খবর রাখি না, তুই এ ব্যাপারে দেখেশুনে কিছু ভাল জমি অবনীমোহনকে কিনে দে। দেখিস, পরে যেন আবার মামলা মোকদ্দমা না বাধে।'

মজিদ মিঞা বলল, 'জমিন কিনতে হইব না।'

হেমনাথ অবাক, 'না কিনলে পাবে কোত্থেকে?'

'আমার চাইর শ' কানি জমিন আছে। তার থিকা তিরিশ কানি মিতারে দিয়া দিমু। শখ মিটাইয়া তেনি চাষবাস করুক।'

অবনীমোহন অভিভূত। কেউ যে এমন অক্লেশে মাত্র দু'দিনের আলাপে অতখানি জমি দিয়ে দেবার কথা বলতে পারে তা যেন অভাবনীয়। তবু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন অবনীমোহন। বললেন, 'না না, আপনার জমি দেবেন কেন?'

মজিদ মিঞা বলল, 'দিলামই না হয়। আপনে আমার আপনজন না?'

'নিশ্চয়ই আপনজন। তবে—'

অবনীমোহন কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই মজিদ মিঞা বলে উঠল, 'নিজের ভাই-বন্ধুরে কেও যদি কিছু দ্যায় তা নিতে দোষের কিছু আছে?'

অবনীমোহন বললেন, 'দোষের কিছু না—'

'তয়?'

'নেবারও তো সীমা থাকা উচিত।'

মজিদ মিঞা কোনো কথাই শুনতে চায় না। বিনে পয়সায় তার জমি নিতেই হবে। না নিলে চারধারে তাবত মানুষকে বলে দেবে কেউ যেন অবনীমোহনের কাছে জমি না বেচে।

মজিদ মিঞা কিছুতেই দাম নেবে না। ওদিকে অবনীমোহনও দাম ছাড়া জমি নেবেন না।

শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে হেমনাথই মধ্যস্থতা করলেন। বললেন, 'দ্যাখ মজিদ, তোর কথাটা বুঝতে পারছি। অবনীমোহনকে তুই নিজের জন ভাবিস। সেদিক থেকে কিছু দিলে হাত পেতে নেওয়াই উচিত। কিন্তু অবনীমোহনের দিকটাও ভেবে দ্যাখ—'

'কোন দিক?'

'দাম দিয়ে না কিনলে কোনো জিনিসই নিজের মনে হয় না। মনে হয় দান নিচ্ছি। অবনী যদি দাম দিতে না পারত তা ছিল আলাদা কথা। তাই বলছিলাম কি—'

'কী?'

'বাজারে যা দাম, তুই তার চাইতে কিছু কম নে। ওটুকু সুবিধা করে দিলেই অবনী খুশি। বন্ধু ছাড়া, নিজের লোক ছাড়া কে-ই বা তা দেয়।'

একটু চুপ করে থেকে মজিদ মিঞা বলল, 'আপনে যা কইলেন তাই হইব। কুনোদিন আপনের অবাইধ্য তো হই নাই। তয় একখান কথা—'

'বল।'

'আমি যে দাম কমু তার বেশি সিকি পয়সা দিলেও কিন্তুক নিতে পারুম না।'

'বেশ, তাই হবে।' হেমনাথ হাসলেন।

মজিদ মিঞা বলল, 'তরাতরি খাইয়া-দাইয়া লন, আইজই মিতারে জমিন দেখাইয়া দিমু।'

খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া গেল না। একরকম তাড়া দিয়েই অবনীমোহন আর হেমনাথকে নৌকোয় নিয়ে তুলল মজিদ মিঞা। বিনু সঙ্গ ছাড়ল না, সেও নৌকোয় উঠল।

যুগলের এখনও চান-খাওয়া হয়নি। ঠিক হল, মজিদ মিঞা নিজেই নৌকো বেয়ে যাবে।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল, জমি দেখানোর ব্যাপারে সবার চাইতে বেশি উৎসাহ মজিদ মিঞার। অবনীমোহনরা রাজদিয়াবাসী হলে জগতে তার মতন সুখী বুঝিবা আর কেউ হবে না।

হেমন্তের প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে জমি দেখা শুরু হল। মাটি অবশ্য দেখা গেল না। কেননা, কার্তিকের শেষাশেষি এই সময়টায় মাঠে জল আছে। আর সেই জলের ওপর মাথা তুলে আছে থোকা থোকা—একটানা দিগন্ত পর্যন্ত—ধানের মঞ্জরী। যেদিকে যতদূর চোখ ফেরানো যাক, মাঠের ঝাঁপি পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

ক'দিন আগেও ধানের রং সবুজ দেখেছে বিনু। নরম তুষের ভেতর তখন সবে দুধ জমেছে। আর এখন? ধানের খেতকে আর চেনাই যায় না। কোনো জাদুকর শ্যামল মাঠকে সোনালি লাবণ্যে কখন ভরে দিল কে জানে।

জমি দেখাতে দেখাতে বিকেল হেলে গেল। ধানের মঞ্জরীর ভেতর দিয়ে পথ করে নৌকো চলেছে তো চলেছেই।

একসময় মজিদ মিঞা অবনীমোহনের উদ্দেশ্যে বলল, 'এতগুলান জমিন দেখাইলাম, কোনটা পছন্দ হইল ক'ন—'

অবনীমোহন বললেন, 'আমার তো সব জমিই ভাল লাগল। কি চমৎকার ধান হয়ে আছে।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মজিদ মিঞা বলল, 'উঁহু—'

'কী?'

'এই চকের সব জমিনই ভাল না মিতা। এইর ভিতর সরস-নীরস আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ—' মজিদ মিঞা ঘাড় কাত করল।

অবনীমোহন বললেন, 'আমি তো বুঝতে পারছি না। সব জায়গাতেই সুন্দর ধান ফলেছে।'

'মিতা আপনে ভাল কইরা ধানটা খেয়াল করেন নাই। করলে বুঝতেন, যেই জমিনে ঘন হইয়া মোটা গোছে ধানগাছ ফনফনাই উঠছে সেই জমিনই ভাল জমিন। আর যেই জমিনে ধানগাছ পাতলা পাতলা সেই জমিন তত ভাল না।'

'সত্যি, আমি অতটা খেয়াল করিনি।'

মজিদ মিঞা বলল, 'জমিন চেনা সহজ না।'

অবনীমোহন বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমি বলি কি, আর ঘোরাঘুরিতে দরকার নেই। আপনি একটা জমি পছন্দ করে দেবেন, আমি তাই নেব।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হল। মজিদ মিঞা বলল, 'হেই ভাল।'

জমি দেখার পর ফেরার পালা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে নেমে গেল।

দিন দুই পর অবনীমোহন কলকাতা রওনা হলেন। ওখানকার সব ব্যবস্থা করে ফিরতে ফিরতে এক সপ্তাহ। রাজদিয়ায় ফিরেই জমি রেজিস্ট্রি করার ইচ্ছা। হেমনাথ এবং মজিদ মিঞাকে এ ব্যাপারে সব বন্দোবস্ত করে রাখতে বলে গেছেন তিনি।

দুপুরের স্টিমারে অবনীমোহন চলে গেছেন।

বিকেলবেলা পুবের ঘরে সুধা আর বিনু বসে ছিল। সুনীতি জানলার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে গাইছিল:

'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে
আমার এই রীতি,
তোমা বই জানি নে।
বিধু মুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই তোমারে দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসি নে।'

গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গেল সুনীতি।

সুধা বলল, 'বেশ তো গাইছিলি, থামলি কেন?'

ঠোঁট টিপে সুনীতি বলল, 'তোর বিধু মুখে মধুর হাসি দেখবার জন্যে কে আসছে দ্যাখ সুধা। উঠে দ্যাখ—'

সুধা, তার সঙ্গে বিনু জানলার বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল, বাগান পেরিয়ে এদিকেই আসছে হিরণ।

অনেক দিন পর হিরণ এ বাড়িতে এল। পুজোর আগে নাটক-টাটকের ব্যাপারে নিয়মিত হানা

দিত সে। পুজোর পর বার দুই মোটে তাকে দেখা গেছে। বিজয়ার পরের দিন একবার, আরেক বার কোজাগরীর রাত্তিরে। তারপর থেকে হিরণ নিরুদ্দেশ।

এই তো সেদিন তার সঙ্গে আলাপ। দেখামাত্র বিনুদের জয় করে নিয়েছিল হিরণ। বিশেষ করে সুরমা আর অবনীমোহনের তো খুবই ভাল লেগেছে তাকে।

নিয়ম করে যে দু'বেলা আসছিল, হঠাৎ পনের কুড়ি দিন তার খোঁজখবর নেই। সুরমা এবং অবনীমোহন চিন্তিত হয়েছেন, রোজই হিরণের কথা বলাবলি করেছেন। হেমনাথের অবশ্য দুর্ভাবনা নেই। হিরণকে তিনি চেনেন। হাসতে হাসতে বলেছেন, 'ওটা এরকমই। এল তো দিনে দশ বারই এল। তারপর এমন উধাও হল যে বিশ-পঁচিশ দিন আর পাত্তাই নেই।' হিরণের স্বভাব জেনেও তার খোঁজে যুগলকে কয়েক দিন পাঠিয়েছেন। যুগল এসে জানিয়েছে, হিরণ নেই। কোথায় গেছে, বাড়ির লোকেরা জানে না।

বাগান পেরিয়ে একটু পর হিরণ পুবের ঘরে চলে এল। খুশির সুরে বলল, 'তিন ভাইবোনই এখানে আছ দেখছি।'

'হ্যাঁ।' সুনীতি ঘাড় কাত করল। কণ্ঠস্বরে দোলা দিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ লোক মশাই—'

হিরণ হকচকিয়ে গেল, 'কেন ?'

'সেই যে লক্ষ্মীপুজোর দিন এলেন, তারপর আর পাত্তাই নেই। বাড়িতে লোক পাঠিয়েও খোঁজ পাওয়া যায় না। কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন ?'

'মানিকগঞ্জে আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা কিছুতেই ছাড়ল না। দিন পনের কুড়ি কাটিয়ে আসতে হল।'

'বাঃ বাঃ, চমৎকার!'

ভয়ে ভয়ে হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

সুনীতি বলল, 'পনের কুড়ি দিন উধাও হয়ে থাকলেন। বাড়িতে একটা খবরও তো পাঠাতে হয়।'

'রোজই ভেবেছি পাঠাব। পাঠাব পাঠাব করে পাঠানো আর হয়নি, শেষ পর্যন্ত চলে এলাম।'

'বাড়ির লোকদের দুশ্চিন্তায় ফেলে কী লাভ ?'

'বাড়ির লোকেরা দুশ্চিন্তা করে না। মাঝে মাঝেই আমি ডুব দিই, সবার এতে অভ্যেস হয়ে গেছে।' হিরণ বলতে লাগল, 'সে যাক গে। আজই মানিকগঞ্জ থেকে ফিরেছি। স্টিমারঘাটে নেমে একটা সুখবর শুনলাম। শুনে আমাদের বাড়িতে একবার দেখা দিয়েই আপনাদের এখানে ছুটতে ছুটতে আসছি।'

সুনীতি শুধলো, 'কী এমন সুখবর যে ছুটে আসতে হল ?'

উৎসাহের গলায় হিরণ বলল, 'আপনারা নাকি কলকাতায় ফিরছেন না, রাজদিয়াতেই থেকে যাবেন ?'

'আপনাকে কে বললে ?'

'জীবন ঘোষ।'

'জীবন ঘোষ আবার কে ?'

হিরণ হাসল, 'সবাইকে কি আপনি চিনবেন ? স্টিমারঘাটার পাশে সারি সারি মিষ্টির দোকান দেখেছেন তো ?'

সুনীতি মাথা নেড়ে জানাল, দেখেছে।

হিরণ বলল, 'প্রথম দোকানটা জীবন ঘোষের।'

সুনীতি অবাক। বিস্ময়ের সুরে বলল, 'মিষ্টির দোকানদারদের কাছেও এ খবর পৌঁছে গেছে!'

'ইয়েস ম্যাডাম।' হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'খবরটা ঠিক তো ?'

'ঠিক।'

হিরণের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎফুল্ল সুরে বলল, 'সত্যি গুড নিউজ। আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে!

সুনীতির কপাল কুঁচকে গেল। ঘাড়খানা ঈষৎ হেলিয়ে চোখ আধাআধি বুজে নীরস গলায় শুধলো,

'আমরা থাকব, তাতে আপনার আনন্দ কেন হবে মশাই? বলেই আড়ে আড়ে সুধার দিকে তাকাল।

সুধার অবস্থা অবর্ণনীয়। মুখ নিচু করে সমানে নখ খুঁটে যাচ্ছে সে, খুঁটেই যাচ্ছে।

এদিকে হিরণ থতমত খেয়ে গেছে। ফস করে জোরালো ঝলমলে আলো নিভে গেলে যেমন হয়, তার মুখের চেহারা অবিকল সেইরকম। কাঁপা শিথিল গলায় বলল, 'বা রে, আপনারা থাকলে আমার আনন্দ হবে না?'

এমনিতে সুনীতি বেশ গম্ভীর, মৃদুভাষিণী। চপলতা তরলতা তার ধারে কাছে নেই। কিন্তু হিরণকে এতদিন পর পেয়ে আজ যেন কী হয়ে গেছে। আপন স্বভাবের কথা মনেই নেই সুনীতির। প্রগলভতার ঈশ্বর বুঝিবা তার ওপর ভর করে বসেছে। কপালে আরো ক'টা ভাঁজ ফেলে চোখ আরো ছোট করে সে বলল, 'আনন্দের একটা কারণ তো থাকবে। সেটা কী?'

সুধা আর বিনুকে দ্রুত এক পলক দেখে নিয়ে বিব্রত, বিপন্ন মুখে হিরণ বলল, 'মানে—মানে—আপনারা হেমদাদুর আত্মীয়। তাই—'

'হেমদাদুর আত্মীয় তো আপনার কী? আনন্দ হলে হেমদাদুরই হওয়া উচিত।' সুনীতি আজ বড়ই নির্দয়।

হিরণ কী বলবে, ভেবে পেল না। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, গলায় স্বর ফুটল না।

একটু নীরবতা।

তারপর অতি দ্রুত সুনীতির মুখচোখের চেহারা বদলে যেতে লাগল। গলাখানা আগের মতন ঈষৎ বাঁকিয়েই রাখল সে। চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল কালো মণির মতন কৌতুকে ঝিকমিক করতে লাগল। ঠোঁটের প্রান্তে আধোগোপন একটুখানি হাসি। তার সারা গায়ে অদৃশ্য ঢেউয়ের মতন কী যেন খেলে বেড়াতে লাগল।

খুব চাপা গলায় সুনীতি হঠাৎ ফিসফিস করল, 'বুঝলেন মশাই—'

চকিত হিরণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভীরু গলায় সাড়া দিল, 'কী?'

'খুব আনন্দ হয়েছে, না?'

হিরণ চুপ। কী উত্তর দেওয়া ঠিক হবে তা যেন স্থির করে উঠতে পারছে না। ক্ষণে নিঠুরা ক্ষণে মধুরা—সুনীতির এইরকম দ্রুত স্বভাব-বদল আগে আর কখনও দেখেনি সে।

রঙ্গিণী নায়িকার মতন লীলাভরে হাত নেড়ে সুনীতি বলল, 'পনের কুড়ি দিন উধাও হয়ে থেকে আজ এসে বলছেন, আনন্দ হয়েছে। ওভাবে আনন্দ প্রকাশ করে না মশাই—'

ইতিমধ্যে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে নিয়েছে হিরণ। মুখ তুলে একবার সুনীতিকে দেখে নিয়ে বলল, 'কিভাবে তা হলে করে ?'

'সুধার কাছে জেনে নিন।' বলেই বিনুর দিকে ফিরল সুনীতি, ' চল রে বিনু, আমরা বাগানে যাই—'

হিরণের চোখেমুখে আগের উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে। রঙ্গিণী এবং নির্দয়া, দুই রূপেই যে সুনীতি মজা করেছে, এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে হিরণ। মাথাটা সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে সে বলল, 'আপনি সত্যিই মহানুভব!'

'বলছেন?'

'একশ বার।'

বিনুকে নিয়ে দু'পা গিয়েই হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে পেছন ফিরল সুনীতি। বলল, 'দুনিয়ার সব স্কুল-কলেজ খুলে গেছে। আপনার ইউনিভার্সিটি এ বছর খোলার আশা আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।' হেসে হেসে হিরণ বলল, 'আজ থেকে তিনদিন পর খুলবে।'

'ইউনিভার্সিটি খুললেই তো ঢাকায় গিয়ে থাকবেন?'

'তা তো থাকতেই হবে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

একটু ভেবে সুনীতি বলল, 'একটানা ঢাকায় গিয়ে থাকলে চলবে না। মাঝে মাঝে এখানে এসে আনন্দ প্রকাশ করে যাবেন, বুঝলেন?'

মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে হিরণ বলল, 'আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম।'

সুনীতি আর কিছু বলল না। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে ইঙ্গিতময় একটু হেসে বাগানের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ছুটতে ছুটতে সুধা বাগানে এল। হেমন্তের বাতাসে তার পিঠময় খোলা চুল উড়ছে, চোখের তারায় আগুনের হলকা খেলে যাচ্ছে। বুকটা ঢেউয়ের দোলায় একবার উঠছে, একবার নামছে। সুধা যেন এখন রণরঙ্গিণী।

বিনু সুনীতি এখানেই ছিল। বাগানের উত্তর দিকে খালের ধার ঘেঁষে একটা রোয়াইল ফলের গাছ। হলুদ রঙের গোল গোল ফলগুলি যেমন টক তেমনি সুস্বাদু। সুনীতি কোঁচড় ভরে নিয়েছিল, বিনু নিয়েছিল পকেট বোঝাই করে। তারপর বাগানময় ঘুরে ঘুরে টপাটপ মুখে ফেলে যাচ্ছিল।

সুধা এসে সোজা সুনীতির একটা হাত চেপে ধরল। এত জোরে ধরেছে যে বাহুর কোমল মাংসে নখ বসে গেছে।

সুনীতি বলল, 'উ, লাগে। ছাড় সুধা—' যন্ত্রণায় তার চোখমুখ কুঁচকে গেছে।

সুধা ছাড়ল না। ধারাল গলায় বলল 'এটা কী হল?'

'কোনটা?'

'আমাকে আর হিরণবাবুকে ওভাবে রেখে চলে এলি যে?'

যন্ত্রণার মধ্যেও হেসে ফেলল সুনীতি। গলা নামিয়ে ফিসফিস করল, 'তোরা তাই চেয়েছিলি যে।'

সুধা খুব রেগে গেল, 'কী চাই, তোর কানে কানে বুঝি বলেছিলাম?'

'বলতে হবে কেন?'

'তবে?'

'আমি কি কচি খুকি, কিছুই বুঝি না?'

সুধা ভেংচি কাটার মতন করে বলল, 'কচি খুকি হবি কেন, তুই সব্বার ঠাকুমা। বুঝবি আবার না, একেবারে অন্তর্যামী হয়ে বসে আছিস।'

সুনীতি হাসতে লাগল, 'আছিই তো।'

সুধা এবার খেপে উঠল, 'আমাকে আর হিরণবাবুকে নিয়ে আবার যদি এরকম করিস খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

কৌতুকের গলায় সুনীতি বলল, 'সত্যি!' শেষ শব্দটার ওপর কণ্ঠস্বরের সবটুকু শক্তি ঢেলে দিল সে।

'সত্যি না তো মিথ্যে?'

সুনীতি এবার এক কাণ্ডই করল। আঙুলের ডগায় পানপাতার সরু সুছাঁদ প্রান্তের মতন সুধার মনোহর চিবুকটি তুলে ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'আমার বেলায় বুঝি মনে ছিল না?'

সুধা বলল, 'তোর সঙ্গে আবার কী করলাম?'

'এর ভেতরেই ভুলে গেলি?'

'কিছু করলে তো মনে থাকবে।'

স্বর টেনে টেনে সুনীতি বলল, 'কিচ্ছু করো নি?'

সুধা বলল, 'না।'

'আনন্দবাবু আর আমাকে নৌকোয় তুলে সেদিন ঠেলে দিয়েছিল কে? এবার মনে পড়েছে?' সুধার চিবুকটা আরেকটু ওপরে তুলল সুনীতি।

সুধা এবার হেসে ফেলল, 'তাই বুঝি শোধ তুললি?'

'ঠিক তাই। এবার থেকে মনে রাখবি, এক মাঘে শীত যায় না।'

'রাখব, তুইও রাখিস।'

দুই বোন হাত-ধরাধরি করে হঠাৎ গলা মিলিয়ে হেসে উঠল।

হিরণ ভবতোষ কিংবা মজিদ মিঞাই শুধু না, বিনুরা যে এখন থেকে রাজদিয়াতে থাকবে, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে—এ খবরটা জানতে রাজদিয়ার কারো আর বাকি রইল না। এবং মুখে মুখে দিগ্বিদিকে ছড়িয়েও পড়তে লাগল।

সকাল নেই দুপুর নেই, আজকাল লোক আসছে তো আসছেই। নিকারীপাড়া মৃধাপাড়া কুমোরপাড়া কামারপাড়া যুগীপাড়া ঋষিপাড়াই বা কেন, দূর-দূরান্তের গ্রাম গঞ্জ থেকে জলস্রোতের মতন মানুষ আসছে। বিনুরা এখানে থাকবে, তাদের প্রতিবেশী হিসেবে পাওয়া যাবে—এতে সবাই আনন্দিত, গর্বিত। আনন্দ আর গর্বের কথাটা তারা আন্তরিক সুরে বলে যেতে লাগল।

বিনুদের জন্য সারা রাজদিয়া জুড়ে উৎসব শুরু হয়ে গেছে বুঝি। তাদের থাকার কথা শুনে লোক যে ছুটে আসতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না।

বিস্মিত, অভিভূত সুরমা তো বলেই ফেলেছেন, 'যেখানকার মানুষ এত ভাল সে জায়গা স্বর্গ।'

দেখতে দেখতে অঘ্রাণ মাস পড়ে গেল।

একদিন সকালবেলা দুই দিদি আর ঝিনুকের সঙ্গে দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় পড়তে বসেছিল বিনু। কলকাতায় গিয়ে অ্যানুয়েল পরীক্ষা অবশ্য দিতে হবে না। সেদিক থেকে দুর্ভাবনা না থাকলেও জানুয়ারি মাসে অ্যাডমিসন টেস্ট দিয়ে এখানকার স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তাই বই-টইগুলোর সঙ্গে একটু-আধটু যোগাযোগ রাখা দরকার।

পড়াশোনা যখন চলছে, হঠাৎ কোত্থেকে যুগল এসে হাজির। উঠোনের কোণ থেকে ইশারায় বিনুকে ডেকে নিয়ে খুব উৎসাহের সুরে বলল, 'ছুটোবাবু, কাউঠ্যার মাংস খাইছেন কুনোদিন ?'

বিনু বলল, 'কাউঠ্যা কী ?'

'কাউঠ্যা চিনেন না ?'

'না।'

যুগল এবার এমনভাবে তাকাল যাতে মনে হয়, 'কাউঠ্যা' না চেনার ফলে জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে বিনুর। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর 'কাউঠ্যা' নামক প্রাণীটির রূপগুণ বংশ-পরিচয়ের বিবরণ দিতে শুরু করল সে, 'কাউঠ্যা জলে থাকে, গোল দেখতে। পিঠের চারাখান লোহার নাহান শক্ত। কাউঠ্যার নাহান আরেকখান জলের পোক আছে—কাছিম। কাছিমের দুই ধারে যে বাদি আছে তা খাইতে লাগে নাইরকলের নাহান। চাবাইলে কচ কচ করে।'

সবটা বলা হল না। আধাআধি শুনেই বিনু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি কচ্ছপের কথা বলছ ?'

'হ হ, কচ্ছম—'

'তাই বল। আমি ভাবলাম, না জানি কী। কাউঠ্যা কাউঠ্যা করলে লোকে কখনও চিনতে পারে ?'

এবার বিব্রত হবার পালা যুগলের। হাত কচলাতে কচলাতে সে বলল, 'কী করুম ছুটোবাবু, আমরা তো আর এংরাজি-মেংরাজি শিখি নাই। আমরা কাউঠ্যাই কই—'

ইংরেজি শেখার সঙ্গে 'কাউঠ্যা' বলার সম্পর্ক কী, বিনু ভেবে পেল না। এ-ব্যাপারে আর কিছু

জিজ্ঞেস না করে বলল, 'কচ্ছপ আমি ঢের দেখেছি, তবে তার মাংস খাইনি।'

'মাংস যদি খাইতে হয়, লন আমার লগে। এক শালারে জলের তলে উদ্দিশ কইরা এক নাইলা (যার একটিমাত্র ফলা) টেটা নিতে আইছি। গিয়াই গাথুম।' যুগল বলতে লাগল, 'টেটা নিতে আইসা আপনের কথা পনে পড়ল ছুটোবাবু, ভাবলাম ডাইকা নিয়া যাই—'

মাংসের লোভ খুব একটা নেই। জলের তলায় কোথায় কচ্ছপ দেখে এসেছে যুগল, কীভাবে সেটাকে গেঁথে ওপরে তুলবে—তাই ভেবে উত্তেজনা বোধ করতে লাগল বিনু। উৎসাহের সুরে বলল, 'চল—'

'এট্টু খাড়ন, টেটাটা লইয়া আহি।'

ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে এক ফলাওলা একটা টেটা এবং এক টুকরো চ্যাপ্টা ভারি লোহার পাত নিয়ে এল যুগল। বলল, 'লন যাই—'

বইপত্তর দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় ছড়িয়েই রইল। যুগলের পিছু পিছু ছুট লাগায় বিনু। এই মুহূর্তে, কোথায় কোন অদৃশ্যে বসে জলতলের এক প্রাণী তাকে অবিরাম হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে যেন।

উঠোন-বাগান পেরিয়ে রাস্তায় আসতেই হঠাৎ বিনুর মনে সন্দেহ দেখা দিল। আস্তে করে সে ডাকল, 'যুগল—'

যুগল তক্ষুণি সাড়া দিল, 'কী ক'ন ছুটোবাবু?'

সংশয়ের গলায় বিনু বলল, 'তুমি তো সেই কখন কচ্ছপটাকে দেখে এসেছ। সে কি এতক্ষণ আমাদের জন্যে বসে আছে! গিয়ে হয়তো দেখব, পালিয়ে গেছে।'

বিজ্ঞের মতন একটু হাসল যুগল, 'কাউঠ্যার চরিত্তির আপনে জানেন না ছুটোবাবু—'

যুগল ঠিক কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

যুগল আবার বলল, 'শালারা এমুন আইল্‌সা (অলস) যে সহজে লড়তে চায় না, দিনের পর দিন এক জায়গায় শুইয়া থাকতে ভালবাসে। আমি যে কাউঠ্যাটারে এট্টু আগে দেইখা আইছি, হেইটা ঠিকই উইখানে থাকব। তয়—'

'তবে কী?'

'আর কারো নজরে পড়লে অন্য কথা।'

বিনু শুধলো, 'আর কেউ দেখলে কী হবে?'

যুগল হাতের অস্ত্রটা দেখিয়ে বলল, 'এইরকম টেটা দিয়া গাইথা নিয়া যাইব গা।'

একটু চুপ।

তারপর যুগলই আবার শুরু করল, 'জানেন ছুটোবাবু, নানান জাতের কাউঠ্যা আছে। জউলা কাউঠ্যা, কালি কাউঠ্যা, সুন্দি কাউঠ্যা—'

এক নাগাড়ে কত নাম যে বলে গেল যুগল! শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিনু। বলল, 'এত রকম কচ্ছপ!'

'হ!'

আমাকে চিনিয়ে দেবে?'

'নিয্যস দিমু।'

যুগল আরো যা বলল তা এইরকম। পূর্ববাংলার জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যত পশুপাখি ঘুরে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়, তাদের সবাইকে চেনে সে। কেমন তাদের স্বভাব, কোথায় তাদের বসতি, কীভাবে তাদের ধরতে হয়—এসব সম্বন্ধে তার বিপুল জ্ঞান, বিশাল অভিজ্ঞতা। নিজের অভিজ্ঞতার সমস্তটুকুই অকাতরে সে ছোটবাবুর হাতে তুলে দেবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিনুরা স্টিমারঘাটার দিকে হাঁটছিল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সেই কাঠের পুলটার ওপর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যুগল, দেখাদেখি বিনুও দাঁড়াল।

যুগল বলল, 'আমরা আইসা গেছি ছুটোবাবু।'

বিনু বলল, 'এখানেই তোমার কচ্ছপ আছে?'

'হ। দেখবেন আহেন—'

পুলের তলা দিয়ে খাল গেছে। বিনুকে নিয়ে পুলের ডান দিকে একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়াল যুগল।

হেমন্তের মাঝামাঝি এই সময়টায় জল শান্ত, স্থির। কোথাও সামান্য ঢেউ পর্যন্ত নেই।

খালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুগল বলল, 'উই দ্যাখেন ছুটোবাবু, শালার কাউঠ্যা উইখানে আরাম কইরা শুইয়া আছে।'

বিনু তাকাল। পলকহীন তীক্ষ্ণ চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও অঘ্রাণের নিস্তরঙ্গ খালে অতল কালো জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

পাশ থেকে সাগ্রহে যুগল শুধলো, 'দেখতে পাইছেন?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'না।'

'ভাল কইরা ঠাওর করেন।'

চোখদুটো আরো শাণিত করল বিনু। কিন্তু কোথাও কচ্ছপের চিহ্ন নেই। সে বলল, 'কোথায় তোমার কচ্ছপ?'

ধিক্কারের গলায় যুগল বলল, 'কী চৌখ আপনের ছুটোবাবু! সামনে রইছে অথচ দেখতে পান না। ঐ যে দ্যাখেন—'

এবার বিনু দেখতে পেল, অনেকক্ষণ পর পর জলের অতল থেকে একটা দুটো করে বুদ্বুদ উঠে আসছে।

বিনু বলল, 'ওগুলো তো বুজগুড়ি—'

'হ। ঐগুলির তলেই শালার কাউঠ্যা শুইয়া রইছে আর গলা বাইর কইরা পুটুর পুটুর উয়াস ছাড়তে আছে। খাড় বউয়ার ভাই, এইবার তোমার নীলা সাঙ্গ করি—'

যুগলের হাতে যে অস্ত্রটা ছিল, তার চেহারা মোটামুটি এইরকম। সরু মতন লম্বা একটা বাঁশের মাথায় ইস্পাতের ধারাল ফলা আটকানো। ফলার কাছাকাছি জায়গায় বাঁশটাকে ঘিরে সেই ভারী লোহার পাতটা পরিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল যুগল। ফলে ওটার ওজন বেড়ে গেল অনেকখানি। তারপর পুলের কিনারে এসে বুদ্বুদগুলি নিশানা করে খুব আস্তে টেঁটাটা ছুঁড়ে দিল।

আস্তে ছুঁড়লে কি হবে, লোহার পাতের ভারে অস্ত্রটা তীরের মতন জলের অতলে নেমে গেল।

একটু পর টেঁটার বাঁশ ধরে যুগল যখন টেনে তুলল, দেখা গেল, ফলার মাথায় সত্যি সত্যিই একটা কচ্ছপ। ফলাটা তার নরম মাংসল গলা ভেদ করে ওধারে চলে গেছে।

যুগল বলল, 'অঘ্‌ঘান পৌষ মাসে জল যহন থির হইয়া যায়, হেই সময় কাউঠ্যারা কী করে জানেন ছুটোবাবু? জলের তলে গলা বাইর কইরা উয়াস ছাড়ে, হেই দেইখা ঠাওর করতে হয়। মনে থাকব তো?' বলতে বলতে ক্ষিপ্র হাতে টেঁটার ফলা খুলে দড়ি দিয়ে কচ্ছপটার চার পা বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিল।

আজ থেকেই পাঠ শুরু করে দিয়েছে যুগল। বিনু বলল, 'থাকবে।'

'লন, এইবার বাড়িত্ যাই।'

বাড়ির দিকে সবে পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ বিনু দেখতে পেল, ডান ধারে ঠিক খালের ওপারে অদ্ভুত ধরনের বড় বড় সাতখানা নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। রাজদিয়ায় আসার পর অনেক রকমের নৌকো দেখেছে বিনু—গাছি, শালতি, কোষ, মহাজনী ভর। কিন্তু এইরকম নৌকো এই প্রথম দেখল।

অপার বিস্ময়ে বিনু শুধলো, 'ওগুলো কিসের নৌকো যুগল?'

একপলক দেখে নিয়ে যুগল বলল, 'ঐগুলি বেবাইজা (বেবাজিয়া) বহর। অনেক কাল পরে বেবাইজারা রাইজদিয়ায় আইল। লন যাই, ওগো ডাইকা বাড়িত্ লইয়া যাই—' বলেই ছুটল।

যুগলের পেছনে ছুটতে ছুটতে বিনু বলল, 'বেবাইজা কী?'

'গেলেই বুঝতে পারবেন।'

খানিকটা ছুটবার পর ডান ধারে খালের ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো। সেটা পেরুলেই ওপারে সারি সারি বেবাজিয়া নৌকোর বহর।

সাঁকোর কাছাকাছি এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যুগল ডাকতে লাগল, 'বেবাইজা হে-এ-এ-এ—'

ওপার থেকে কেউ সাড়া দিল, 'কিবা কও-ও-ও—'

'কার বহর?'

'আঞ্জুমান বেবাইজানীর।'

মুখ ফিরিয়ে এবার বিনুর দিকে তাকাল যুগল, 'চিনা মানুষ। আঞ্জুমান বেবাইজানীরা বচ্ছরে একবার আমাগো এইহানে আসে—'

সেই কৌতূহলটা মনের ভেতর টগবগ করছিল। বিনু আবার শুধলো, 'বেবাইজা কী বললে না তো—'

ঈষৎ বিরক্ত হল যুগল, 'আপনের আর তর সয় না ছুটোবাবু। কইলাম, অগো বহরে গেলেই ট্যার পাইবেন। তা না—'

বিনু কিছু বলল না, ঘাড় গোঁজ করে রইল।

বিনুর চোখমুখ দেখে হয়তো করুণাই হয়ে থাকবে। যুগল বলল, 'বাইদ্যা করে কয় জানেন তো?'

এতক্ষণে মনে পড়ে গেল। বেবাইজা শব্দটা আজই প্রথম শুনছে না বিনু আগেও একবার শুনেছে। সেদিন রাত্রিবেলা সুজনগঞ্জের হাট থেকে ফেরার সময় মাঝনদীতে তাদের একটা বহরও দেখেছিল। টেঁড়াওলা হরিন্দ তার দুই সাকরেদ কাগা-বগাকে নিয়ে সেই বহরে উঠে কোন এক ইসলামপুরের দিকে পাড়ি জমিয়েছিল।

শব্দটা ঠিক বেবাইজা না, বেবাজিয়া। অর্থাৎ বেদে। এই জলের দেশে বেদেদের যে বেবাজিয়া বলে, বিনু কেমন করে জানবে? সেদিন হাট থেকে ফেরার সময় হেমনাথ তা কিছুটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

কলকাতায় ইরানী যাযাবরদের দেখেছে বিনু, ভূগোল বইতে আরব বেদুইনদের কথাও পড়েছে। তারা সব স্থলচর জীব, হেঁটে হেঁটে অথবা উটের পিঠে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই খাল-বিল-নদীর রাজ্যে তা তো আর সম্ভব না, নৌকোয় নৌকোয় জলচর পাখির মতন এখানকার বেবাজিয়ারা ভেসে বেড়ায়।

বিনু বলল, 'তোমাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। বেবাজিয়াদের আমি আগেও দেখেছি।'

যুগল বলল, 'আগে দেইখা থাকলে 'বেবাইজা কী' 'বেবাইজা কী' কইরা আমারে পাগল কইরা মারতে আছিলেন ক্যান?'

'আমার মনে পড়ছিল না যে।'

একটু নীরবতা।

'কাউঠ্যা লইয়া আর বেবাইজা বহরে যামু না। শালারে এইখানে বাইন্ধ্যা রাইখা যাই।' হাতের কচ্ছপটাকে সাঁকোর সঙ্গে দ্রুত বাঁধতে লাগল যুগল।

বিনু কিছু বলল না।

বাঁধাছাঁদা হয়ে গেলে যুগল শুধলো, 'সাকো পার হইতে পারবেন ছুটোবাবু?'

সরু একখানা বাঁশের ওপর দিয়ে ওপারে যেতে হবে। দু'ধারে যদিও ধরনি (ধরবার জন্য অন্য একটি বাঁশ) রয়েছে তবু বুক কাঁপতে লাগল বিনুর। আগে আর কখনও সাঁকো পার হয় নি সে।

অন্য সব ব্যাপারে যুগলের কাছে প্রচুর বীরত্ব দেখিয়েছে বিনু কিন্তু সাঁকো পারাপারের কথায় তার মুখখানা ভারি করুণ দেখাল। মাথা নেড়ে আস্তে করে সে বলল, 'না।'

'আপনে কুনো কামের না ছুটোবাবু। আসেন, আমার হাত ধইরা পার হইবেন।'

যুগলের হাত ধরে খাল পেরুতে পেরুতে তলার দিকে তাকাল বিনু। সাঁকোর অনেক নিচে অথৈ জল। একবার যদি হাত ফসকে যায়? যদিও সাঁতার শিখেছে, বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করতে লাগল বিনুর।

ওপারে গিয়ে যুগল চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'কই গা বেবাইজা বেবাইজানীরা, কই গেলা সগল? বাইর হও দেখি—'

যুগলের ডাকাডাকিতে নৌকোগুলোর ভেতর থেকে অদ্ভুত ধরনের জনাকয়েক মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে এল।

সেদিন রাত্রিবেলা সুজনগঞ্জ থেকে ফেরার সময় মাঝনদীতে সেই বেদে বহরটা সামনে পড়েছিল, একজন বেবাজিয়ার গলার আওয়াজও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারে তাদের স্পষ্ট দেখা যায় নি। আজ দিনের আলোয় জগতের বিচিত্র এক মানুষগোষ্ঠীর দিকে অসীম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সে।

মেয়েগুলোর পরনে ইরানী নৌকোর পালের মতন চিত্র-বিচিত্র ঘাঘরা এবং খাটো খাটো জামা। রুক্ষ চুলে কাঠের কাকুই, টানা চোখে ছুরির ধার। হাত পায়ে মেহেদি মাখা। সারা গায়ে উচ্ছল অচ্ছৃঙ্খল যৌবন। পুরুষগুলির পরনে হয় ডোরাকাটা লুঙ্গি, নতুবা কুঁচি দেওয়া ঢোলা পা-জামা। মাথায় ধনেশ পাখির পালক গোঁজা। সারা গায়ে তাদের উল্কির আঁকিবুকি। পাখি, সাপ, গরু, ছাগল—কত রকমের ছবি যে আঁকা!

মেয়ে হোক পুরুষ হোক, সবাই অত্যন্ত নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। তাদের চিটচিটে পোশাক থেকে দুর্গন্ধ উঠে আসছে। মুখটুখু ধোবার অভ্যাস নেই, দাঁতের ওপর এক ইঞ্চির মতন পুরু হলুদ রঙের সর পড়ে আছে। হাত-পায়ের নখ বড় বড়—সেগুলোর মাথা খানিক ভেঙেছে, খানিক ক্ষয়ে গেছে।

যুগল বলল, 'তোমরা রাইজদিয়া আইলা কবে?'

একটি বেদেনী উত্তর দিল, 'আইজ, বিহান বেলায়—'

'থাকবা কয় দিন?'

'চকিদারে (চৌকিদারে) যা বাইন্ধা দিছে হেই আড়াই দিন। হের বেশি তো থাকনের উপায় নাই।'

'হ। হে তো ঠিক কথাই।' যুগল মাথা নাড়ল। তারপর চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'সগলরে দেখতে পাই, কিন্তুক এই বহর যার হেই আঞ্জুমান বেবাইজানীরে তো দেখি না। হ্যায় গেল কই?'

'এই যে আমি—' পেছন দিক থেকে চিলের মতন তীক্ষ্ণ সরু গলায় কেউ চেঁচিয়ে উঠল।

মুখ ফেরাতেই বিনু দেখতে পেল, সব চাইতে বড় নৌকোটার গলুইতে একটা বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চুলগুলো পাটের ফেঁসোর মতন লালচে, জট পাকানো। গায়ের চামড়া কুঁচকে শিথিল। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ঢিলে একটা খোলসই বুঝি পরে আছে। সারা গায়ে বেবাজিয়া পুরুষদের মতন উল্কি এবং রুপোর ভারি ভারি গয়না—মেখলা, তেঁতুলপাতা হার, চুটকি, কানের চাকতি।

এত বয়েস হয়েছে আঞ্জুমানের তবু চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য সজীব। যেমন ধারাল তেমনি দূরভেদী। চিকণ তীরের মতন তা বুঝি বুকের ভিতরে বিঁধে যায়।

যুগলও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এক মুখ হেসে বলল, 'আরে, এই যে তুমি। আছ কেমুন?'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'ভালই।' বলেই ভুরুর ওপর হাত রেখে শুধলো, 'তুমি কেউগা? চিনা চিনা লাগে—'

'আমার নাম যুগল—'

'যুগল!' চোখমুখ কুঁচকে স্মৃতির ভেতর কিছুক্ষণ হাতড়ে বেড়াল আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী। তারপর বলল, 'তোমারে কই দেখছি কও তো বাসী—'

যুগল বলল, 'হ্যামকত্তার বাড়িত্। আমি তেনার ঐখানে কামলা খাটি।'

'হ হ, এইবার মনে পড়ছে।' চোখের তারায় হঠাৎ যেন আলো খেলে গেল আঞ্জুমান বেবাজিয়ানীর। সাগ্রহে শুধলো, 'হ্যামকত্তায় কেমুন আছে?'

যুগল বলল, 'ভাল, হ্যামকত্তায় কুনো সময়ে যোন্দ থাকে না।'

দেখা যাচ্ছে, এই ভবঘুরে যাযাবরের দলও হেমনাথকে চেনে। বিনু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'অ যুগলা, এই পোলাগা কেঠা?'

যুগল বলল, 'হ্যামকত্তার নাতি।'

'তাই নিহি?'

'হ।'

'কেমুন নাতি? আমি জানতাম হ্যামকত্তার পোলা-মাইয়া নাই। তয় এই নাতিখান আইল কই থনে?'

অঞ্জুমান বেবাজিয়ানী সোজা সহজ হিসেবটাই ধরে নিয়েছে। অর্থাৎ ছেলেমেয়ে থাকলে তবেই তো নাতি-নাতনীর সম্ভাবনা। যার ছেলেমেয়ে নেই তার ওসব আসবে কোত্থেকে? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই পড়তে পারে না।

বিনুর সঙ্গে হেমনাথের সম্পর্কটা বঝিয়ে দিল যুগল।

আঞ্জুমান বলল, 'হেই কও। ভাগনীর পোলা। কিন্তুক—'

'কী?'

'আমরা তো বচ্ছর বচ্ছর রাইজদিয়া আসি। আইলেই হ্যামকত্তার বাড়িত্ যাই। কিন্তুক তেনার ভাগনী, ভাগনীর ঘরের নাতি-নাতকুড়েরে তো দেখি নাই।'

যুগল বলল, 'দেখবা ক্যামনে? ওনারা তো এইখানে এই পরথম আইল।'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী শুধলো, 'আগে আছিল কই?'

বিনুরা কোথায় ছিল, যুগাল জানিয়ে দিল।

এবার বিনুর দিকে ফিরে আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী সস্নেহে ডাকল, 'আসো গো ভাই, আমাগো নায়ে আসো—'

দেশ-দেশান্তরের বেদেদের সম্বন্ধে অনেক ভয়ঙ্কর গল্প শুনেছে বিনু। আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী ডাকতে তার বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল। নিজের অজান্তে সে গিয়ে দাঁড়াল যুগালের পেছনে। ভীরু গলায় বলল, 'না।'

'এইটা কেমুন কথা হইল! তুমি আমাগো হ্যামকত্তার নাতি। এই তরি (এখান পর্যন্ত) আইসা বহরে না আইলে মন নি ভাল লাগে? আসো আসো, এট্টু মিঠাই খাইয়া যাও। তোমার নানার বাড়িত্ গিয়া আমরা কত কী খাইয়া আহি। কত আদর-যত্ন পাই।'

বিনু উত্তর দিল না, চুপ করে থাকল। তার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল যুগাল। বলল, 'আপনে কইলকাতার পোলা, বেবাইজা দেইখা ডরান?'

বিনু এবারও চুপ।

যুগল বলল, 'অরা চিনা মানুষ। লন যাই, আহ্লাদ কইরা ডাকলে যাইতে হয়।'

ভয়ও হচ্ছিল, আবার বেদেবহর সম্বন্ধে অপার কৌতূহলও বোধ করছিল বিনু। সেদিন সুজনগঞ্জ থেকে ফেরার সময় হেমনাথ জানিয়েছিলেন, এই জলের দেশে বেবাজিয়ারা নৌকোয় নৌকোয় ভেসে বেড়ায়। নৌকোতেই তাদের ঘর-সংসার। এখানে শিশু জন্মায়, বুড়োরা মরে। যৌবন অসীম সম্ভাবনায় এখানেই পুষ্পিত হয়ে ওঠে। জগতের বিচিত্র ভাসমান এই মানবগোষ্ঠী নৌকোর ওপরেই জীবনের ধারা অব্যাহত রাখে। শোক-দুঃখ, সুখ-আনন্দ, জন্ম-মৃত্যু—জীবনের এমন কোনো লীলাই নেই যা পাঁচ-সাতখানা হাজার মণী বিশাল নৌকোর মধ্যে ঘটে না যায়।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী আবার ডাকল, 'আসো গো হ্যামকত্তার নাতি। আমাগো ঘর-গিরস্থালি দেইখা যাও। ডরের কিছু নাই—'

বুড়ি বেদেনী কি অন্তর্যামী? বেদে বহরের ভেতরটা দেখার খুবই ইচ্ছা, তবু নিজের থেকে বিনু

হয়তো যেত না। ফুগলই একরকম জোর করে তাকে বেদে-বহরে নিয়ে তুলল।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী শুধলো, 'আগে কী করবা কও?'

বেদেনী কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল বিনু।

আঞ্জুমান এবার বুঝিয়ে দিল, 'আগে পান-তামুক-মিঠাই খাইবা, না আমাগো ঘর-গিরস্থালি দেখবা?'

বিনু বলল, 'পান-তামাক আমি খাই না।'

বুড়ী বেদেনী বেশ রঙ্গিণী। কপালে একটা চাপড় মেরে বলল, 'আ আমার কপাল!'

ভয়ে ভয়ে বিনু শুধলো, 'কী হল?'

রসালো কৌতুকের গলায় আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'পান খাও না, তামুক খাও না, কেমনতরো পুরুষ তুমি!' বলতে বলতে বাদামী ভুরুর তলায় তার নীলচে চোখের মণি খাঁচার পাখির মতন ছটফট করতে লাগল।

বিনু এবার আর কিছু বলল না। তার মুখচোখ দেখে আঞ্জুমান কী বুঝল কে জানে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থাউক থাউক, পান-তামুক খাইতে হইব না।' বলতে বলতে আঙুলের ডগায় বিনুর থুতনিটা তুলে অল্প অল্প নাড়তে লাগল, 'অখনও মোচ গজায় নাই, এক্কেরে পোলাপান। আগে দাড়িমোচ গজাউক, পুরুষমানুষ হও। হের পর পান-তামুক খাইও। অহন মিঠাই খাও।'

শুধু মিঠাই না, পাকা অমৃতসাগর কলা আর ক্ষীরাইও বিনুদের খেতে দিল আঞ্জুমান। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে সারা বহর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেদের ঘর-সংসার দেখাতে লাগল।

মোট সাতখানা নৌকো। একটা নৌকোয় শুধু সাপের ঝাঁপি। ছোটবড়, চৌকো, গোল—নানা আকারের অগণিত বেতের ডালা পর পর সাজানো। সেগুলোর ভেতর অসংখ্য রকমের সাপ—শঙ্খচূড়, কালজাতি, দুধরাজ, খরিস, লাউডগা, পাহাড়ী অজগর, শামুকভাঙা, চন্দ্রবোড়া। আরো কত কি!

একেকটা ডালা খোলে অঞ্জুমান, আর বিদ্যুৎচমকের মতন সাঁ করে সাপগুলো লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। লিকলিকে সরু জিভ বার করে ফণা দোলাতে দোলাতে কুটিল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। অঞ্জুমান তাদের নাম-ধাম বংশ-পরিচয় মুখস্থ বলার মতন গড় গড় করে বলে যায়। সাপ দেখতে দেখতে এবং তাদের ইতিহাস শুনতে শুনতে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল বিনুর।

কোনো নৌকোয় শুধুই বিছানা। কালো কুটকুটে শতরঞ্জি-জড়ানো কাঁথা বালিশের স্তূপ একেবারে ছইয়ের মাথা পর্যন্ত ঠেকেছে। একটা নৌকোয় এসে দেখা গেল, সেখানে শুধু পশু আর পাখি। ছাগল, গরু, খচ্চর, ভেড়া, গোটা দুই বাঁদর এবং অগুনতি খাঁচার ভেতর নানারকম পাখি—শালিক, ময়না, টিয়া, মোহনচূড়া, ঝুটকলি, সিদ্ধিগুরু, কোড়াল, এমন কি বাজও রয়েছে।

আঞ্জুমানের পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে শেষ নৌকোখানায় এসে পড়ল বিনুরা। বেবাজিয়া বহরের এটাই সবচাইতে ছোট নৌকো। অঞ্জুমান বলল, 'এইটা আমাগো পান্‌হা ঘর—'

আঞ্জুমানকে অনেকক্ষণ দেখছে। বুড়ি বেদেনীর সহজ আন্তরিক ব্যবহারে ভয় কেটে গিয়েছিল। বিনু শুধলো, 'পান্‌হা ঘর কী?'

'দেখ—' সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল অঞ্জুমান।

দেখা গেল, উঁচু একটা বেদীর ওপর মাটির সপ্তনাগ। তার মাথায় দেবী মনসার সিংহাসন। এমন মনসা-মূর্তি আগে আর কখনও দেখে নি বিনু। মাথার পেছন থেকে বরুণ ছত্র ধরেছে কালীয় নাগ। খরিস আর শঙ্খচূড় সাত লহর হার হয়ে বুকের কাছে ঝুলছে। মণিবন্ধে কঙ্কণ হয়েছে খৈজাতি। দেবীর সুডৌল বক্ষকুম্ভ কাঁচুলি হয়ে ঢেকেছে চক্রচূড় আর উদয়নাগ। লাউডগা আর কালচিতি, চন্দ্রবোড়া আর গোক্ষুর বুনে বুনে ঘাগরা বানানো হয়েছে। দেবীর কটিতট থেকে তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আঙুলে আঙুলে অঙ্গুরী হয়েছে সুতোশঙ্খ। পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে মল হয়েচে দাঁড়াস। কর্ণভূষণ হয়ে দোদুল দুলছে সাদা চিতির ফণা। দেবীর চোখে বিষের কাজল, নিশ্বাসে গরল ঝরছে যেন অবিরল।

মনসামূর্তির সামনে অনেকগুলো ধুনুচি। সেগুলো থেকে ধূপের গন্ধ উঠে আসছে। খানকতক পেতলের

সরাও চোখে পড়ল, সেগুলোতে কাঁচা দুধ আর সবরি কলা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'এইটাই আমাগো আসল জায়গা। মা মনসার ঘরে আমরা কুনো পাপ করি না, শত্তুরও যদি এইখানে আইসা আশ্শয় লয় তার গায়ে হাত তুলি না। রোজ সন্ধ্যায় মনসার নামে এইখানে ছদ্‌গা (উৎসর্গ) হয়। আমরা বেবাইজ্যা মাইয়ারা তখন ল্যাংটা হইয়া ধূপতি (ধুনুচি) নাচ নাচি। 'ছদ্‌গা'র সময় পুরুষমানুষ এই ঘরে আইতে পারে না।'

সবটা বুঝতে না পারলেও বিনু এটুকু বুঝল, এই পান্‌হা ঘর বেদেদের কাছে অতি পবিত্র জায়গা। এখানে এমন কিছু তারা করে না যা অশুচি, যা অন্যায়, যা ধর্মবিরুদ্ধ।

আরো কিছুক্ষণ গল্পটল্প করার পর যুগল হঠাৎ বলল, 'অনেকখানি সময় তোমাগো এইখানে কাটাইয়া গেলাম। অহন আমরা যাই।'

আঞ্জুমান বলল, 'আইচ্ছা—'

'আমাগো বাড়িত্ যাইবা তো?'

'নিয্যস য্যামু। রাইজদিয়ায় আইসা হ্যামকত্তার বাড়িত যামু না, আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা! হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'কইলকাতা থনে তেনার নাতি আইছে, নাতনী আইছে, ভাগনী আইছে। যাইতে আমাগো হইবই। বিকালে যামু।'

'আইচ্ছা। এই বেলা ছোটবাবুরে কিছুই দেখাইলা না। ঐবেলা গিয়া সাপখেলা দেখাইবা কিলাম।'

'দেখামু।'

'মনসার গান শুনাইবা—'

'শুনামু।'

বিনু এইসময় বলে উঠল, 'যাবে কিন্তু। নিশ্চয়ই যাবে।'

কিছুক্ষণ পর বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে বেদেদের সম্বন্ধে আরো কিছু চমকপ্রদ খবর দিল যুগল। এরা অদ্ভুত জাত। মনসা পুজোও করে, আবার কেউ কেউ নামাজও পড়ে। অনেক খৃস্টানও এখানে এসে জুটেছে। সাপখেলা, বাঁদরখেলা, ছাগলখেলা, নানারকম শারীরিক কসরত এবং ভেল্কিবাজি দেখিয়ে ওরা পয়সা রোজগার করে। তা ছাড়া সাপে কামড়ালে ওঝাগিরিও করে। কিন্তু এসব দিনের আলোর ব্যাপার। রাতের অন্ধকারেই ওদের আসল খেলা—সেটা হল চুরি। সেখানে বেবাজিয়া বহর ভেড়ে সে জায়গায় বাসিন্দাদের চোখ থেকে ঘুম ছুটে যায়, সর্বক্ষণ তারা তটস্থ হয়ে থাকে।

অঞ্জুমান বেবাজিয়ানীরা এসেছে। রাজদিয়াতে এবার চুরির ধুম পড়ে যাবে।

বিকেলবেলা সত্যি সত্যিই আঞ্জুমান হেমনাথের বাড়ি এল। তার সঙ্গে এসেছে দুটো যুবতী বেদেনী। আঞ্জুমান এবং তার সঙ্গিনীদের মাথায় পর পর সাজানো অনেকগুলো করে সাপের ঝাঁপি।

বাগান পেছনে ফেলে বার-বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই অঞ্জুমান চিলের মতন সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কই গ্যালেন সগলে—'

বেদেনীরা যে আসবে সে খবর বাড়ি ফিরে ওবেলাই দিয়ে রেখেছিল বিনু। আঞ্জুমানের গলা পেয়ে সুরমা, সুধা, সুনীতি, স্নেহলতা, বিনু কিংবা যুগল—কেউ আর ঘরে বসে থাকতে পারল না। এ-ঘর থেকে ও-ঘর থেকে ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এল।

মাথা থেকে সাপের ঝাঁপি মাটিতে নামাল আঞ্জুমান। তারপর স্নেহলতার দিকে ফিরে বলল, 'আইলাম গো বুইনদিদি—' বলে হাসল।

স্নেহলতাও হাসলেন, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'আইজই আমরা রাইজদিয়ায় আইছি।'

'শুনেছি।'

আঞ্জুমান বলতে লাগল, 'অন্য সগল বার এইখান থনে যাওনের দিন আপনাগো বাড়িত্ আসি। এইবার কিলাম পরথম দিনই আইলাম।'

স্নেহলতা উত্তর দিলেন না, হাসিটুকু তাঁর ঠোঁটে স্নিগ্ধ আভার মতন লেগে রইল।

আঞ্জুমান আবার বলল, 'এইবার রাইজদিয়া আইসা আমি আটাশ (অবাক) !'

স্নেহলতা উৎসুক হলেন, 'কেন ?'

'বিহান বেলায় আপনেগো যুগলার লগে এউক্কা সোন্দর ফুটফুইটা পোলা আমাগো বহরে গেছিল। শুনলাম পোলাগা নিহি আপনের নাতি। শুইনা আমার ধন্দ লাইগা গেল।'

'কেন ?'

'আমি তো জানতাম আপনেগো পোলা মাইয়া নাই। নাই-ই যদি নাতিখান আইল কই থনে ? শ্যাষে যুগলাই কইল, পোলাগা আপনের ভাগ্নীর ঘরের, কইলকাতা থনে আইছে।'

স্নেহলতা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

অঞ্জুমান বলল, 'বিহান বেলায় নাতি গিয়া কইল সাপের খেলা দেখব, আমাগো আইতেও কইল। বড় মুখ কইরা নাতি দাওয়াত কইরা আইছে, হেই লেইগা পরথম দিনই আইলাম।'

'ভাল করেছ।'

টিয়াপাখির মতন লাল টুকটুকে ঠোঁট নেড়ে আঞ্জুমান বলল, 'মেলা কথা তো হইল। এইবার ভাগনী ভাগনী-জামাই দেখান। নাতিরে দেখছি, নাতিন দেখান।'

স্নেহলতা বললেন, 'ভাগনী-জামাই তো দেখাতে পারব না। ক'দিন হল সে কলকাতায় গেছে। অন্য সবাই আছে, তাদের দেখাচ্ছি।'

সুরমা, সুধা এবং সুনীতির সঙ্গে আঞ্জুমানের আলাপ করিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

আঞ্জুমান বলল, 'সগলের লগে আলাপ-সালাপ হইল, ভাগনী-জামাইরেই খালি দেখলাম না। আ আমার কপাল !' বলতে বলতে তার চোখ সুরমার ওপর স্থির হল, 'আ গো বুইনদিদি—'

স্নেহলতা সাড়া দিলেন 'কী বলছ ?'

'ভাগনী আমাগো এমুন কাহিল ক্যান ? শরীলখানে কিছু নাই, য্যান ফু দিলে উড়ব।'

'হ্যাঁ, ও ভারি রোগা। শরীরটা একেবারেই সারছে না। ওকে নিয়ে আমাদের বড্ড ভাবনা।'

একটু চুপ থেকে আঞ্জুমান বলল, 'বাতাস লাগছে মনে লয়।'

স্নেহলতা প্রায় হতাশার সুরেই বললেন, 'কী জানি, ক' বছর ধরেই তো এরকম চলছে। ডাক্তার-কবিরাজ ওষুধ-বিষুধ বারোমাস লেগেই আছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।'

আঞ্জুমান বলল, 'ভাগনীরে একখান শিকড় দিয়া যামু, তামার তাবিজে ভইরা ভাগনীর কমরে পরাইয়া দিয়েন। সাইরা যাইব।'

'আচ্ছা।'

এবার সুধা-সুনীতিকে ভাল করে লক্ষ করল আঞ্জুমান। বলল, 'কপালে সিন্দুর নাই, নাতিন দু'গা অবিয়াত মনে লাগে—'

'হ্যাঁ।'

'নাতিনগো বিয়ার সময় দাওয়াত য্যান পাই।' বলেই সুধা-সুনীতির কাছে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটল :

'আইবা নি ভাই, যাইবা নি—
নাতিন খাওয়াইব সাধের মেজবানি !'

বেদেনীর রকমসকম দেখে সুধা-সুনীতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

স্নেহলতা বললেন, 'নেমন্তন্ন তো করব, তোমাদের পাব কোথায় ? ঘরদুয়ার কি কিছু আছে তোমাদের ?

সারা বছর শুধু ভেসে ভেসেই বেড়াও—'

'কাক-পক্ষীর কাছে খবর দিয়া দিয়েন, ঠিক উড়াল দিয়া আইসা পড়ুম।' আঞ্জুমান হাসতে লাগল।'

খানিক নীরবতা।

তারপর আঞ্জুমান আবার শুরু করল, 'সগলের লগে দেখাশুনা হইল, হ্যামকত্তারেই খালি দেখি না। তেনি কই?'

স্নেহলতা বললেন, 'দুপুরবেলা আবদুল্লাপুর গেছে।'

'ফিরলে আমাগো কথা কইয়েন।'

'বলব।'

'পারলে আমাগো বহরে য্যান যায়।'

'আচ্ছা।'

আঞ্জুমান বলল, 'আলাপ সালাপ হইয়া গেল। এইবার আমাগো পান-তামুক খাওয়ান গো বুইনদিদি—'

তার মুখ থেকে কথা খসবার আগেই যুগল আর করিম ছুটে গিয়ে তামাকের ডিবে, পানের ডাবর, আগুনের মালসা, হুঁকো-টুকো নিয়ে এল। তারপর তামাক সেজে হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে আঞ্জুমানের হাতে দিল। আঞ্জুমান এবং তার দুই সহচরী পালা করে তামাক খেতে লাগল এবং আয়েস করে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বেদেনী হলেও আঞ্জুমানেরা মেয়েমানুষ। আগে আর কখনও মেয়েমানুষকে তামাক খেতে দেখে নি বিনু। পায়ে পায়ে যুগলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'এই—'

যুগল মুখ ফেরাল, 'কী ক'ন?'

ফিসফিস গলায় বিনু বলল, 'ঐ দেখ, বেবাজিয়ানীরা তামাক খাচ্ছে।'

বিনু ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে যুগল তাকিয়ে থাকল।

পরে খুব সহজ গলায় যুগল বলল, 'খাইব না ক্যান? নিশার জিনিস সগলেই খাইতে পারে। তার পুরুষমানুষ মাইয়ামানুষ নাই। খালি কি এই বাইদানীরাই—কামারপাড়ায়, যুগীপাড়ায় ঘুইরা দ্যাখেন গা, সগল বাড়িতেই দুগা চাউরগা কইরা মাইয়ামানুষ হুক্কা খায়।'

যত সহজে যুগল কথাগুলো বলল ঠিক তত সহজে মেনে নিতে পারল না বিনু। আবার কী বলতে যাচ্ছিল সে, ঠিক সেইসময় সাপের ঝাঁপি খুলল বেদেনীরা। তিনটে ঝাঁপি থেকে তিনটে কালকেউটে বিদ্যুৎচমকের মতন সাঁ করে লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

এদিকে একটা বেদেনী তুমড়ি বাঁশ বার করে বাজাতে শুরু করেছে। বাঁশির তালে তালে সাপ তিনটে ফণা দোলাতে লাগল।

একজন বাঁশি বাজাচ্ছে। সাপের নাচের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্জুমান সরু গলায় সুর করে গান ধরল:

চান্দ্ রাজার দাপট গেল বাতাসে মিশিয়া—

তৃতীয় বেদেনীটি গাইল:

হায় বিষহরির দোয়া!

আঞ্জুমান এক কলি করে গায়। তৃতীয় বেদেনীটি, 'হায় বিষহরির দোয়া' বলে ধুয়ো ধরে। এইভাবে গান চলতে লাগল।

বেউলা সতী কান্দে শোন আলুথালু হইয়া—
হায় বিষহরির দোয়া
কালনাগিনী খাইল আজি সোনার লখাইরে—
হায় বিষহরির দোয়া।
সোনার অঙ্গ ভাসাইল গাঙুনীর নীরে—
হায় বিষহরির দোয়া।

তাহার দোয়ায় সূয্য ওঠে পুবের আকাশে—
হায় বিষহরির দোয়া!
পরান পাইয়া ভেলায় বইসা লখাই হাসে—
হায় বিষহরির দোয়া!

গান চলছে। তার মধ্যেই যুগল ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু—'

চোখকান ধ্যানজ্ঞান বেদেনীদের দিকে রেখে সাড়া দিল বিনু।

যুগল শুধলো, 'এইটা কী গান জানেন?'

'না।'

'ভাসানের গান। মা মনসা আছে না?'

'হ্যাঁ।'

'মনসার গানেরে ভাসানের গান কয়। মনে কইরা রাইখেন।'

বিনু মাথা হেলিয়ে দিল, মুখে কিছু বলল না।

যুগল আবার বলল, 'অহন থনে আপনেরা তো এই দ্যাশে থাকবেন। শাওন মাসের শ্যাষে যহন মনসা পূজা হইব তহন ঘরে ঘরে ভাসানের গান শুনতে পাইবেন।'

'তাই নাকি?'

'হ।'

গানটানের পর সাপ খেলা দেখিয়ে ক্ষীর-মুড়কির ফলার করল বেদেনীরা। আরেক প্রস্থ পান-তামাক খেল। তারপর বখশিস হিসেবে একডালা ধান, চার আনা পয়সা, কিছু আনাজপাতি আদায় করল।

পানচিবুতে চিবুতে আঞ্জুমান বলল, 'এইবার যাই গো বুইনদিদি—'

স্নেহলতা বললেন, 'এখনই যাবে?'

'হ। চকিদারে থাকতে তো দিব আড়াই দিন। এইর ভিতর রাজদিয়ার সগল বাড়িত্ যাইতে হইব। বাড়ি তো আর এউক্কা দুগা না—'

বেবাজিয়ানীরা সাপের ঝাঁপি, ধানের ডালা টালা মাথায় চাপিয়ে উঠে দাঁড়াল।

স্নেহলতা বললেন, 'আবার এস।'

আঞ্জুমান বলল, 'এইবার আর আসন হইব না বইনদিদি, আইতে আইতে হেই ফিরা বচ্ছর।'

হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল স্নেহলতার। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'চলে তো যাচ্ছ, ভাগ্নীকে শিকড় দিয়ে গেলে না?'

'আমার লগে তো নাই। নায়ে আছে। যুগলারে আমার লগে পাঠাইয়া দেন, দিয়া দিমু'অনে।'

আঞ্জুমানদের সঙ্গে যুগলকে বেদে-বহরে পাঠিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

অবনীমোন বলেছিলেন, দিন সাতেকের ভেতর কলকাতার সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসবেন। ফিরতে ফিরতে দু সপ্তাহ কেটে গেল।

সন্ধেবেলা পুবের ঘরের তক্তাপোশে সুধা-সুনীতি-বিনু এবং ঝিনুক গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়তে বসেছিল। তাদের সামনে দুটো ঝকঝকে হারিকেন।

হেমনাথও এই ঘরেই আছেন। তক্তাপোশের ধার ঘেঁষে একটা ক্যাম্প খাট। তার ওপর কাত হয়ে শুয়ে মূল বাল্মীকি রামায়ণ পড়ছেন।

সময়টা অঘ্রাণের মাঝামাঝি। নিয়ম অনুযায়ী পৌষ থেকে শীত শুরু। নিয়ম যা-ই থাক, এ বছর শীতের যেন আর তর সইছে না, তার বড় তাড়া। হেমন্ত থাকতে থাকতেই সে এসে দরজায় দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। ক'দিন ধরেই এলোমেলো উত্তুরে বাতাস ছেড়েছে। আজ যেন সেটা হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে। কাছেই বিনুরা চাদর বা কম্বল, যে যা পেরেছে তাই জড়িয়ে পড়তে বসেছে।

সময়টা কৃষ্ণপক্ষ। বাইরে যতদূর চোখ যায় চাপ চাপ অন্ধকার। চাঁদটা আজ নিরুদ্দেশ। আকাশ, পুকুর বা ধানখেত—কিছুই বোঝা যায় না। সব অদৃশ্য, নিরবয়ব। শুধু কাছাকাছি যে জোনাকিরা উড়ছিল তাদের দেখা যাচ্ছে। আলোর ছুঁচের মতন এই পোকাগুলো অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাইরের উঠোন থেকে অবনীমোহনের গলা ভেসে এল, 'বিনু, সুধা—কে আছিস রে, একটা আলো-টালো নিয়ে আয়। বড্ড অন্ধকার—'

'বিনু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—'

সুধা-সুনীতি সামনের হারিকেন দুটো নিয়ে বাইরে ছুটল। হেমনাথও রামায়ণ রেখে ব্যস্ত গলায় ডাকাডাকি শুরু করলেন, 'কোথায় গো, কোথায় গেলে সব—অবনী এসেছে—' বলতে বলতে বাইরে এলেন। তাঁর পিছু পিছু ঝিনুকও এল।

চেঁচামেচি শুনে রান্নাঘরের দিক থেকে স্নেহলতারাও ছুটে এলেন।

উঠোনের মাঝখানে অবনীমোহন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পেছনে তিনচারটে কুলি। কুলিদের মাথায় গন্ধমাদন চাপানো।

হেমনাথ বললেন, 'বড্ড ঠাণ্ডা। এস এস—ঘরে এস অবনী—'

আলো দেখিয়ে অবনীমোহনকে ঘরে আনা হল। কুলিরা বারান্দায় মালপত্র নামিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

এখন সবাই অবনীমোহনকে ঘিরে বসে আছে। স্নেহলতা বললেন, 'তুমি কেমন মানুষ বল তো অবনী! সাতদিনের নাম করে গিয়ে চোদ্দ দিন কাটিয়ে এলে। না একটা খবর, না একটা কিছু।'

অবনীমোহন অপ্রতিভের মতন হাসলেন, 'ঝামেলা মেটাতে মেটাতে দেরি হয়ে গেল।'

হেমনাথ বললেন, 'আজ যে আসবে আগে জানালে না কেন? লালমোহন কি ভবতোষের ফিটন নিয়ে স্টিমারঘাটায় যেতাম। স্টিমারঘাটা থেকে আমাদের বাড়ি তো একটুখানি পথ নয়। শুধু শুধু কষ্ট করতে গেলে!'

অবনীমোহন বললেন, 'ভেবেছিলাম চিঠি লিখে জানাব, তারপর কেমন যেন আলস্য লেগে গেল। লিখি লিখি করে আর লেখা হল না।'

সুরমা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার মুখ বাঁকালেন, 'চিরদিন ঐ এক স্বভাব।'

অবনীমোহন হাসতে লাগলেন।

একটু নীরবতা। তারপর হেমনাথ বললেন, 'কলকাতার সব কাজ হয়ে গেছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর যাবার দরকার নেই?'

'আজ্ঞে না। সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকিয়েই এসেছি।'

খানিক ভেবে হেমনাথ এবার শুধোলেন, 'তারপর বল, 'কলকাতায় গিয়ে কী দেখলে। ওখানকার হালচাল কী?'

অবনীমোহন নড়েচড়ে বসলেন। তাঁকে রীতিমত উত্তেজিত দেখাল। বললেন, 'বাড়ি ফিরেই আপনাকে খবরটা দেব, তা নয়। কথায় কথায় একেবারে ভুলে গেছি।'

হেমনাথ উৎসুক হলেন, 'কী খবর?'

'আপনি যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে গেছে মামাবাবু।'

'কিরকম, কিরকম?'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ইওরোপের যুদ্ধ বাংলাদেশের দিকে ছুটে আসছে। পরশু রাত্তিরে কলকাতায় প্রথম ব্ল্যাক-আউটের মহড়া হয়ে গেল। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে খুঁড়ে শহরটার যা অবস্থা করেছে। পনের ষোল দিনের খবরেরকাগজ এনেছি। পড়লেই বুঝতে পারবেন—'

উত্তেজনায় হেমনাথের গলা কাঁপতে লাগল, 'কোথায় খবরেরকাগজ?'

'আমার সুটকেসে—'

অবনীমোহন উঠতে যাচ্ছিলেন, বাধা পড়ল। স্নেহলতা বললেন, 'উঁহু-উঁহু, এখন না। যুদ্ধ নিয়ে মাতলে রাত কাবার হয়ে যাবে। ট্রেনে স্টিমারে দু'দিন কাটিয়ে এসেছে ছেলেটা, আগে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিক। তারপর ওসব হবে।'

হেমনাথ তক্ষুণি সায় দিলেন, 'সেই ভাল, সেই ভাল। যাও অবনী, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।'

সারা গায়ে দু'দিনের ক্লান্তি মাখা। আর আছে ট্রেন-স্টিমারের ধুলো। অবনীমোহন একেবারে স্নানই সেরে নিলেন।

হেমনাথের ধৈর্য থাকছিল না। পুবের ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার স্নান হয়েছে অবনী?'

ওধারের কোনো একটা ঘর থেকে অবনীমোহনের গলা ভেসে এল, 'হয়েছে।'

'তা হলে এখানে চলে এস।'

'যাই মামাবাবু।'

অবনীমোহন আবার যখন পুবের ঘরে এলেন তখন তাঁর গায়ে দু'দিনের ধুলোবালি-ঘাম-মাখা পোশাক নেই। তার বদলে পাটভাঙা ধবধবে ধুতি আর হাফ শার্ট। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। গালে, গলায় এবং ঘাড়ের কাছে এখনও ফোঁটা ফোঁটা জল। স্নানের পর ভাল করে মোছেন নি বোধহয়।

এবার হেমনাথ গলা তুলে স্ত্রীকে ডাকলেন, 'স্নেহ—স্নেহ—' এই বয়সেও স্ত্রীকে তিনি নাম ধরে ডাকেন।

রান্নাঘরের দিক থেকে স্নেহলতা সাড়া দিলেন, 'কী বলছ?'

'অবনীর খাবার এ ঘরে দিয়ে যাও—'

'আচ্ছা।'

একটু পরে স্নেহলতা এলেন। তাঁর এক হাতে কাঁসার থালা, তাতে ঘি-মাখানো চিঁড়ে ভাজা, নারকেল-কোরা আর দুটো চমচম সাজানো। আরেক হাতে চায়ের কাপ।

স্নেহলতা বললেন, 'এখন তোমাকে ভাত দিলাম না অবনী—'

অবনীমোহন বললেন, 'না না, এখনই ভাত খাব কি, সবে তো সন্ধে। এখন চা-ই খাই।'

হেমনাথ অধীর হয়েই ছিলেন। বললেন, 'খেতে খেতে কলকাতার কথা বল। যুদ্ধের হালচাল কিরকম দেখে এলে, শোনাও—'

চায়ে চুমুক দিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'অবস্থা খুব খারাপ মামাবাবু। পরশুর আগের দিন রাত্তির থেকে কলকাতায় ব্ল্যাক আউট আর এয়ার-রেড প্রিকসানের মহড়া চলছে। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব।'

'এ কথা তো তুমি তখন বললে।'

'বলেছি নাকি?'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ ঘাড় কাত করলেন। সাগ্রহে শুধোলেন, 'তা মহড়াটা কি রকম হচ্ছে?'

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'সন্ধের পর কলকাতার সব আলো নিভিয়ে সাইরেন বাজানো হয়। শকুনের কান্নার মতন কেঁপে কেঁপে একটানা সুর। তখন রাস্তায় কেউ থাকতে পারে না। হয় কাছাকাছি কোনো বাড়ির ভেতর ঢুকে যেতে হবে। নইলে পার্কটার্কের ট্রেঞ্চে গিয়ে লুকোতে হবে। তা না হলে এ-আর-পি'র লোকেরা ধরে নিয়ে যাবে। এক ঘণ্টা কি দু ঘণ্টা বাদে অল ক্লিয়ার বাজলে আবার বাইরে বেরুনো চলবে।'

তক্তাপোশের একধারে বসে দম বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিল বিনু, চোখে পলক পড়ছিল না। রাত্রিবেলা সব আলো নিভে যাবার পর নির্জন রাস্তায় একটানা কান্নার মতন কোনো সুর যদি বাজতে থাকে, কলকাতা শহর কতখানি ভীতিকর হয়ে উঠতে পারে? ভয়ের সে ছবিটা পুরাপুরি কল্পনা করতে পারল না বিনু, তবে তার গা ছমছম করতে লাগল।

হঠাৎ বিনু বলে উঠল, 'সাইরেন কী?'

অবনীমোহন তার দিকে ফিরে বললেন, 'শত্রুদের বিমান আক্রমণের আগে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে একরকম সুর বাজানো হয়, তাকে বলে সাইরেন।'

বিনুর কৌতূহল অসীম। সে আবার বলল, 'এ-আর-পি কাকে বলে? ট্রেঞ্চ কী?'

অবনীমোহন বুঝিয়ে দিলেন।

একটু চুপ।

তারপর হেমনাথের দিকে আবার ঘুরে অবনীমোহন বললেন, 'আপনি শেষ কবে কলকাতায় গিয়েছিলেন মামাবাবু?'

এক মুহূর্তও না ভেবে হেমনাথ বললেন, 'নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে—সেই যেবার দেশবন্ধু মারা গেলেন। উঃ, কলকাতায় সে শোকের দৃশ্য কোনোদিন ভুলব না।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক, বিষণ্ন হয়ে গেলেন হেমনাথ। তাঁর চোখের সামনে শোকাচ্ছন্ন বিহ্বল মহানগর যেন ছবির মতন ফুটে উঠেছে।

অবনীমোহন বললেন, 'সেই কলকাতাকে এখন চিনতেই পারবেন না। পার্ক আর ফাঁকা জায়গা যেখানে যতটুকু পেয়েছে, ট্রেঞ্চ খুঁড়ে খুঁড়ে সর্বনাশ করে রেখেছে। শুধু কি ট্রেঞ্চ, প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির সদরে ব্যাফল ওয়াল তোলা হয়েছে, তার সামনে বালির বস্তার স্তূপ। স্টেশনে, সিনেমা হাউসে, রাস্তায়-ঘাটে—যেখানে যাবেন শুধু গভর্নমেন্টের পোস্টার।'

'কিসের পোস্টার?'

'নানা রকমের। যেমন 'গুজবে কান দেবেন না', 'গুজব রটাবেন না,' 'দলে দলে সেনাবাহিনীতে নাম লেখান', 'দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হবেন', ইত্যাদি ইত্যাদি।'

হেমনাথকে বেশ চিন্তিত দেখাল। কপাল জুড়ে এলোমেলো গভীর রেখা ফুটতে লাগল তাঁর। ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার কী মনে হয় অবনী?'

'কী ব্যাপার?' অবনীমোহন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'কলকাতায় বোমা পড়তে পারে?'

'তার খুবই সম্ভাবনা।'

'কেমন করে বুঝলে?'

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'এই তো পরশুর আগের দিন এক সরকারি বড়কর্তা মিস্টার সেমন্ড রেডিওতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ফার ইস্টে অবস্থা যেভাবে ঘোরালো হয়ে উঠছে, তাতে কলকাতায় যে কোনোদিন বিমান আক্রমণ ঘটতে পারে। নইলে—'

হেমনাথ শুধোলেন, 'নইলে কী?'

'এত ব্ল্যাকআউট, এত ট্রেঞ্চ খোঁড়াখুঁড়ি আর এয়ার রেড প্রিকসানের ঘটা চলছে কেন?'

অন্যমনস্কের মতন হেমনাথ বললেন, 'তা তো বটেই।' একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে আবার বললেন, 'যুদ্ধ বাংলাদেশে এসে হাজির হলে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। সব ছারখার হয়ে যাবে। ওয়ারের আফটার এফেক্ট যে কী, ভাবতেই শিউরে উঠছি।'

অবনীমোহন এবার আর কিছু বললেন না।

হেমনাথ বললেন, 'কলকাতায় আর কী দেখলে বল।'

'চারদিকে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে। যেখানে যাবেন সেখানেই মিলিটারি। রাস্তাঘাটে যত গাড়ি দেখবেন তার বেশির ভাগই মিলিটারির—হেভি ট্রাক আর জিপের জন্যে হাঁটাই মুশকিল। মনে হয়, সমস্ত শহরটা মিলিটারির হাতে চলে গেছে।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল অবনীমোহনের, 'আরেকটা ব্যাপার চোখে পড়ল মামাবাবু—'

উৎসুক সুরে হেমনাথ জানতে চাইলেন, 'কী?'

'ব্যাঙের ছাতার মতন অলিতে গলিতে ব্যাঙ্ক গজাচ্ছে। পুজোর আগে যখন এখানে এলাম তখনও এত ব্যাঙ্ক দেখিনি। আমার তো ধারণা রোজ একটা করে ব্যাঙ্ক জন্মাচ্ছে।'

'যুদ্ধ বেধেছে, ইনফ্লেশন আরম্ভ হয়ে গেছে, ব্যাঙ্ক তো গজাবেই। দেখবে, টাকা এখন হাওয়ায় উড়তে থাকবে।'

'থাকবে কি, উড়তে শুরু করে দিয়েছে।'

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হেমনাথ তাড়া লাগালেন, 'এবার খবরের কাগজ বার কর অবনী—'

হিন্দুস্থানী কুলিরা বারান্দায় বাক্স টাঙ্ক মালপত্তর নামিয়ে রেখে গিয়েছিল। অবনীমোহন বাইরে গিয়ে সুটকেস খুলে মাসখানেকের খবরের কাগজ বার করলেন।

কাগজগুলো হাতে পাওয়া মাত্র হেমনাথ ঝুঁকে পড়লেন। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন, '২রা নভেম্বর। গ্রিসে ইতালীয় বাহিনীর অগ্রগতি। বৃটেন কর্তৃক টিরানায় বোমাবর্ষণ। তুরস্ক বর্তমানে যুদ্ধ বর্জন করিয়া চলিবে—প্রেসিডেন্ট ইনেনুর ঘোষণা।'

'৩রা নভেম্বর। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মস্থান কেনসিংটন প্রাসাদ বোমাবিধ্বস্ত। জার্মানির উপর প্রবল আক্রমণ—রাজকীয় বিমান-বহরের দাবী। জাপান হইতে আমেরিকানদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। রাষ্ট্রপতি আজাদ কর্তৃক কংগ্রেসের জরুরি অধিবেশন আহ্বান। ভারতরক্ষা আইনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গ্রেপ্তার, কারা প্রাচীরের অন্তরালে বিচার।'

'৪ঠা নভেম্বর। গ্রীসের সাহায্যার্থে বৃটিশ সেনাবাহিনীর অগ্রগতি। জাপান কর্তৃক শত্রুপক্ষের নৌবহর বাজেয়াপ্ত। জার্মান-অধিকৃত দেশগুলিতে—পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া, হল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি—নাৎসীদের নিদারুণ অত্যাচার।'

'৫ই নভেম্বর। দারদানেলেস সমস্যার সমাধান, জার্মানির মধ্যস্থতা। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ইটালির সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা তিরোহিত। ডানিয়ুব সম্মেলন। বৃটিশ নোটের উত্তরে সোভিয়েট বক্তব্য এইরূপ 'আমরা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিব।' মলোটভের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্লিন-পরিদর্শন। দীর্ঘ ছাপান্ন দিন পর লন্ডনবাসীদের একটি বোমাবর্ষণহীন রাত্রি অতিবাহিত।'

'৬ই নভেম্বর। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্প্রসারণ, ভারতবর্ষের যুদ্ধকালীন পরিকল্পনা। সমর-প্রস্তুতির প্রাথমিক ব্যয় তেত্রিশ কোটি টাকা। পরবর্তী প্রতি বছরে ব্যয় ষোল কোটি টাকা। অর্থের জন্য নূতন কর বসানো হইবে।'

'৭ই নভেম্বর। রুজভেল্ট তৃতীয় বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। পশ্চিমের মরু-রণাঙ্গনে বৃটিশ ট্যাঙ্কবাহিনী।'

'৮ই নভেম্বর। কালিনিনের সতর্কবাণী, রাশিয়া যুদ্ধ বর্জন করিয়া চলিবে। তবে কেহ তাহার সীমানা অতিক্রম করিতে চাহিলে চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে।'

'৯ই নভেম্বর। আয়ারল্যান্ড নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলিবে—ডি ভ্যালেরার ঘোষণা। টাওয়ার অফ লন্ডন বোমাবিধ্বস্ত। সোভিয়েট বাহিনীর প্রস্তুতি, সারা দেশে আপৎকালীন অবস্থা। ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভা। রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃপালনী, গান্ধীজি, পন্থ, রাজা গোপালাচারি, প্রফুল্ল ঘোষ, শঙ্কর রাও দেও প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি।

'১০ই নভেম্বর। ফুয়েরার কর্তৃক সর্বপ্রকার সমর-সম্ভার দিয়া মুসোললিনিকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত। পরলোকে চেম্বারলেন। মিউনিক প্যাক্টের জনক, ইতিহাসে যাঁহাকে 'গৌরবময় ব্যর্থতা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তিনি আর নাই। নর্থের পর এমন দুর্বল প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ সাম্রাজ্যে আর কখনও দেখা যায় নাই।'

'১১ই নভেম্বর। আফ্রিকার মরু অঞ্চলে যুদ্ধ সম্প্রসারিত। গাবান রক্ষার্থে ফরাসি সিদ্ধান্ত। জেনারেল দ্য গলের দৃঢ়তা।'

'১২ই নভেম্বর। হিটলার কর্তৃক বার্লিনে মলোটভের সংবর্ধনা। রুদ্ধদ্বার কক্ষে দীর্ঘ আলোচনার সময় রিবেনট্রপের উপস্থিতি। ফুয়েরার কর্তৃক অক্ষশক্তির প্রতি সোভিয়েট সাহায্য প্রার্থনা। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি এ ব্যাপারে নীরব। লন্ডনে জল্পনা-কল্পনা।'

'পূর্ব রণাঙ্গনে ভয়াবহ জাপানি আক্রমণ। হাইনান ও ফরমোসায় বিপুল সৈন্য সমাবেশ। সায়গন, ফরাসি, ইন্দোচিন ও কামরণ উপসাগরে অতর্কিত আক্রমণ সম্ভাবনা। সিঙ্গাপুরে চাঞ্চল্য।'

'১৭ই নভেম্বর। দীর্ঘ বিরতির পর লন্ডনে প্রবলতম বোমাবর্ষণ, প্রচন্ড নৈশ আক্রমণ। লন্ডনবাসীদের ভূগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ।'

'১৮ই নভেম্বর। সর্দার প্যাটেল কারারুদ্ধ। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা। ভুলাভাই দেশাই কর্তৃক সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত।'

হেমনাথ পড়ে যেতে লাগলেন।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল বিনু। কোথায় টিরানা, কোথায় আড্রিয়াটিক সাগর আর এজিয়ান সাগর, কোথায় দারদানেলেস আর ডানিয়ুব এবং ইন্দোচিন—ভূগোলের কোন প্রান্তে এই নামগুলো ছড়িয়ে আছে কে বলবে। বিনুর কল্পনা অতদূর পৌঁছয় না। কালিনিন কি রিবেনট্রাপ, ডি ভ্যালেরা কিংবা টিমোশেঙ্কো, গোয়েবলস অথবা ইনেনু—এই সব নাম যাঁদের, তাঁদের চেহারাগুলো কতখানি ভয়াবহ তাই বা কে জানে।

কাগজ পড়া শেষ করে হেমনাথ মুখ তুললেন। অবনীমোহনের উদ্দেশে বললেন, 'অবস্থা তা হলে রীতিমত ঘোরালোই হয়ে উঠেছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন।

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় রাশিয়া এই যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারবে ?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

খানিক চিন্তা করে হেমনাথ বললেন, 'চারদিকে যে রকম বেড়া আগুন তাতে রাশিয়া কতদিন গা বাঁচিয়ে থাকতে পারবে, সেইটেই হচ্ছে কথা। টার্কি বা আয়ারল্যান্ড নিউট্রাল থাকুক বা যুদ্ধে নামুক, তার গুরুত্ব তেমন নয়। কিন্তু রাশিয়ার মতন এত বড় দেশ যদি যুদ্ধে নামে—ওয়ারের চেহারাই যাবে বদলে।'

সংশয়ের সুরে অবনীমোহন বললেন, 'এই তো সেদিন রাশিয়ায় রেভোলিউশন হয়ে গেল, এর মধ্যে যুদ্ধ করার মতন শক্তি কি ওদের হয়েছে ?'

'একটা ব্যাপার তুমি বোধহয় লক্ষ কর নি।'

'কী ?'

'বৃটেন আর জার্মানি—দুই দেশই চাইছে রাশিয়া নিউট্রাল থাক, এর অর্থ কী ?'

অবনীমোহন উৎসুক চোখে তাকালেন।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'নিশ্চয়ই তার শক্তি আছে। যে পক্ষে রাশিয়া যাবে তার পাল্লা ভারি হবে। শত্রুর পাল্লা ভারি হোক, কে-ই বা তা চায়।' একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা কথা তোমার খেয়াল নেই অবনী—'

'কী?'

'রেভোলিউশনের পর রাশিয়ার খবর দুনিয়ার লোক বিশেষ কিছুই জানে না। চারদিকে আয়রণ কারটেন ফেলে ভেতরে ভেতরে ওরা কতদূর এগিয়ে গেছে, কে বলবে। আমার তো ধারণা, ধীরে ধীরে খুবই শক্তিধর হয়ে উঠেছে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। হেমনাথের কথাগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গত, তার বিপক্ষে বলবার মতন কিছুই নেই।

কিছুক্ষণ চুপ।

তারপর হেমনাথই আবার শুরু করলেন, 'আচ্ছা, এই যুদ্ধে বৃটেনের অবস্থা তোমাব কী মনে হয়?'

'খুবই সঙ্গিন।'

'আমারও তাই মনে হয়। ব্যাটারা দারুণ ঠ্যাঙানি খাচ্ছে, হিটলার ওদের হাড়গোড় একেবারে ভেঙে দিচ্ছে। রয়াল এয়ার ফোর্স বলছে আমরা টিরানায় বোমা ফেলেছি, বার্লিন উড়িয়ে দিয়ে এসেছি—সব মিথ্যে, সব বাজে। ধাপ্পা দিয়ে দুনিয়ার কাছে মুখ রাখতে চাইছে আর কি। কিন্তু লোকে যা বুঝবার ঠিকই বুঝবে।'

দেখা গেল, রাশিয়ার ব্যাপারে কিছু সংশয় থাকলেও বৃটেন সম্বন্ধে অবনীমোহন আর হেমনাথ সম্পূর্ণ একমত।

চিন্তিত গম্ভীর মুখে হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ওয়ার বেধেছে, তা ঠেকাবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। তবে—'

'তবে কী?'

'ওয়ারটা যদি ইউরোপেই আটকে থাকত, মন্দের ভাল। নিজেরা কাটাকাটি করে মরত, আমরা চেয়ে দেখতাম। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। আগুন একেবারে দরজার সামনে এসে পড়েছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এদেশে খুব দুর্দিন আসছে অবনী, খুবই দুর্দিন—' একই কথা দু'বার করে উচ্চারণ করলেন হেমনাথ।

অবনীমোহন বললেন, 'তা বুঝতে পারছি। এদিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কংগ্রেস নেতাদের একে একে জেলে নিয়ে পুরছে, বিচারের নামে 'ফার্স' করছে। 'ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুল' একখানা করেছে বটে!'

'যা বলেছ।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ওয়ারের খরচ চালাবার জন্য আবার ট্যাক্স বসাবে। হারামজাদারা ইন্ডিয়াকে এবার ঝাঁঝরা করে ছাড়বে। সাধারণ মানুষের কী দুরবস্থা হয়, এবার দেখো।'

অবনীমোহন এবং হেমনাথ আসন্ন দুর্দিনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন যেন।

বিনু প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবু রাশিয়া-জাপান-হিটলার-চার্চিল-স্টালিন এবং মহাযুদ্ধ—এই শব্দগুলির মধ্যে এমন প্রচন্ড আকর্ষণ আছে যে অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারছিল না সে, নিশ্বাস বন্ধ করে হেমনাথের আলোচনা শুনে যাচ্ছিল।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার চলছিল। হেমনাথের পড়া খবরের কাগজগুলো নিয়ে সুধা-সুনীতি তক্তাপোশের আরেক ধারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। বিনুর কানে এখন তাদের ফিসফিসানি ভেসে আসছে।

সুনীতি বলছে, 'দ্যাখ দ্যাখ, 'বিজলী'তে 'পথ ভুলে' আরম্ভ হয়েছে। প্রতিমা, ডি জি, পান্না, রণজিৎ রায় অভিনয় করছে। ইস, কলকাতায় থাকলে দেখতে পেতাম।'

সুধা বলল, 'উত্তরা'য় ন' সপ্তাহ ধরে 'শাপমুক্তি' চলছে। আসবার সময় দেখে এলাম না। আর কোনোদিন দেখাই হবে না।'

ধীরে ধীরে ঘুরে বসল বিনু। দেখল, দুই বোন সিনেমার পাতায় মুখ গুঁজে আছে। যুদ্ধ নিয়ে এত যে আলোচনা চলছে, সেদিকে তাদের একটুকু লক্ষ্য নেই। তাদের দেখে মনে হয় না, পৃথিবীতে আদৌ কোনো সমস্যা আছে, দুই গোলার্ধ ঘিরে একটানা ভয়াবহ আগুনের চাকা ঘুরে চলেছে।

সুনীতি বলল, 'ভবানীপুরে আমাদের বাড়ির কাছে 'রূপালী' সিনেমা। সেখানে 'হাঞ্চব্যাক অফ নতরদ্যাম' চলছে। নাম ভূমিকায় চার্লস লটন।'

সুধা বলল, 'চার্লস লটনের অ্যাক্টিং আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমারও।'

'দ্যাখ সুধা, কলকাতায় কত ছবি চলছে। প্যারাডাইসে 'বন্ধন', পূর্ণতে মধু বোস সাধন বোসের 'রাজনর্তকী'। কিছুই দেখতে পেলাম না।'

কলকাতার মোহময় চিত্রজগৎ দুই বোনকে যেন হাতছানি দিয়ে চলেছে। নতুন নতুন কত বিচিত্র লোভনীয় ছবির মেলা বসেছে সেখানে অথচ কিছুই তাদের দেখা হল না। সুধা-সুনীতির কাছে এর চাইতে অপূরণীয় ক্ষতি আর কিছু নেই।

অবনীমোহন কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন। খবর পেয়েই মজিদ মিঞা কেতুগঞ্জ থেকে ছুটে এল। বলল, 'তাহলে আর দেরি করণের কাম নাই মিতা। আপনের জমিন বুইঝ্যা লন। কবে রেজিস্টারি করবেন, ক'ন ?'

হেমনাথ কাছেই ছিলেন। হেসে ফেললেন, 'জমিটা অবনীকে না দেওয়া পর্যন্ত তোর দেখি ঘুম আসছে না!'

'তা যা কইছেন।' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'কুনো ব্যাপার একবার মাথার ভিতরে ঢুকলে যতক্ষণ হেইটা না হইতে আছে, আমার সোয়াস্তি নাই। হে কথা যাউক। আর কয়দিনের মইধ্যে ধান কাটা আরম্ভ হইয়া যাইব। তহন আর উয়াস্ (নিশ্বাস) ফালানের সময় পামু না। ধানকাটার আগেই আমি জমিন রেজিস্টারি করতে চাই।'

স্নেহলতা এ আসরে আছেন। তিনি বললেন, 'সেই ভাল। ধামকাটা শেষ হতে হতে পৌষ মাস হয়ে যাবে। পৌষ মাসে শুভ কাজ করতে হবে না। কেনাকাটা যা করবার এই অঘ্রাণেই একটা ভাল দিন দেখে সেরে ফেলা উচিত।'

তক্ষুণি একটা পঞ্জিকা এসে পড়ল। পাতা উলটে উলটে সপ্তাখানেক বাদে একটা শুভদিনও ঠিক করে ফেললেন হেমনাথ।

দিন তারিখ স্থির হবার পর মজিদ মিঞা বলল, 'এইর ভিতর একখান কথা আছে কিলাম মিতা—'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কী কথা ?'

'যে জমিন আপনেরে দিমু হেয়াতে ধান আছে। এই সনের ধান কিন্তুক আপনে পাইবেন না, কারণটা হইল বর্গাদারেরে ঐ জমিন চাষ করতে দিছিলাম। আমি ছাইড়া দিলেও বর্গাদার তো ছাড়ব না। ধান উইঠা গেলে জমিনের দখল পাইবেন।'

অবনীমোহন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য, ও ধান আমি নেব কেন? যারা খেটেছে ও ফসল তাদেরই প্রাপ্য।'

'তা হইলে কথা পাকা হইয়া গেল।'

জমি কেনার ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবার পর একদিন দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে সুধা-সুনীতি আর বিনু পুকুরঘাটে আঁচাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে উঁচু গলার ডাক ভেসে এল, 'হ্যামকত্তা আছেন, হ্যামকত্তা—'

বিনুরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু পর রাস্তার দিক থেকে বাগানের ভেতর যে এসে পড়ল তার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো। শরীরের কোথাও বিন্দুমাত্র মেদ নেই। ছোটখাট মানুষটি। চোখের দৃষ্টি কিছুটা অন্যমনস্ক, অনেকখানি উদাস। পোশাক-আশাক আর কাঁধের ঝোলাখানা দেখে টের পাওয়া গেল, সে ডাক পিওন।

বিনুদের দেখে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনেরা?'

লোকটা কী জানতে চায় বুঝতে পেরেছিল সুনীতি। নিজেদের পরিচয় দিল সে। হেমনাথের সঙ্গে সম্পর্ক কী, তাও বলল।

লোকটার চোখমুখ আলো হয়ে উঠল, 'তিন মাস আমি এই বাড়িত্ আসি নাই। হেইর লাইগা জানতে পারি নাই। আগে আইলে আপনেগো লগে চিনা পরিচয় হইত। আমার নামখান কইয়া রাখি—নিবারণ ভুইমালী। আমি ডাকপিওন। হে যাউক, একখান কথা জিগাই—'

'কী?'

'আপনাগো ভিতর কেউ সুনীতি রানী বসু আছেন?'

সুনীতি যেন চমকে উঠল, 'কেন?'

নিবারণ বলল, 'একখান চিঠি আইছে—'

কাঁপা গলায় সুনীতি এবার বলল, 'দিন, আমার নাম সুনীতি—'

ঝোলার ভেতর থেকে একটা খাম বার করল নিবারণ। সুনীতির ডান হাত এঁটো, ভাত-টাত মাখানো রয়েছে। কাজেই বাঁ হাতে খামটা নিল সুনীতি, খামের ওপরকার নামঠিকানা চোখ পড়তেই তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল।

বিনু পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুনীতির মুখের দ্রুত রংবদল দেখতে দেখতে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ভেবেই পেল না, সুনীতিকে কে চিঠি লিখতে পারে।

নিবারণ এই সময় বলে উঠল, 'হ্যামকত্তায় বাড়িত্ আছেন?'

সুনীতি বুঝিবা শুনতে পেল না। হাতের খামটার দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল, তার মুখে নানা রঙের খেলা চলতে লাগল।

ওধার থেকে সুধা উত্তর দিল, 'দাদু নেই। সকালবেলা উঠে বেরিয়ে গেছেন, সন্ধের আগে ফিরবেন না।'

নিবারণ এবার শুধলো, 'বৌ-ঠাইন আছে তো?'

নিবারণ যে স্নেহলতার কথা বলছে, সুধা বুঝতে পারল। বলল, 'আছেন।'

'যাই, বৌ-ঠাইনের লগে দেখা করি গা। ঘরের দুয়ারে আইসা তেনার লগে দেখা না করলে রক্ষা নাই। নিয্যস আমার গর্দান যাইব।' নিবারণ বড় বড় পা ফেলে ভেতর-বাড়ির দিকে চলে গেল।

একটু নীরবতা।

তারপর সুনীতির দিকে ঝুঁকে সুধা বলল, 'কার চিঠি রে দিদি?' তার মুখচোখ থেকে কৌতূহল যেন উপচে পড়ছিল।

সুনীতি চকিত হয়ে বলল, 'কারো না।' বলে শাড়ির ভেতর খামটা লুকোতে যাবে, তার আগেই ডিঙি মেরে দেখে নিল সুধা।

বিনুরও খুব ইচ্ছে করছিল, সুধার মতন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দেখে নেয় কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে চিঠিটা অদৃশ্য হয়েছে।

এদিকে সুধার চোখ কৌতুক এবং দুষ্টুমিতে ঝকমকিয়ে উঠেছে। ঠোঁট ছুঁচলো করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুব রগড়ের গলায় সে বলল, 'ফ্রম আনন্দ ঘোষ। আনন্দচন্দ্র তা হলে কথা রাখল। চিঠি দেবে বলেছিল, ঠিক দিয়েছে।'

শিউরে ওঠার মতন করে চারদিক একবার দেখে নিল সুনীতি। তারপর ভীতু গলায় বলল, 'অ্যাই সুধা, আই—চ্যাঁচাচ্ছিস কেন ? কেউ শুনতে পাবে।'

'শুনবে না। আমরা ছাড়া এখানে কেউ নেই।'

'না থাক, তুই মোটে চ্যাঁচাবি না।'

'এক শর্তে চ্যাঁচানো থামাতে পারি।'

সংশয়ের গলায় সুনীতি শুধলো, 'কী ?'

সুধা বলল, 'আমাকে চিঠিটা পড়াবি। আনন্দ মহাপ্রভু কেমন করে তোর ভজনা করেছে, দেখতে হবে।'

জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সুনীতি বলল, 'না না না—'

'তা হলে কিন্তু আমি সব্বাইকে বলে দেব।'

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হাত শুকিয়ে কড়কড়ি হয়ে গেল। চল আঁচিয়ে আসি।'

সুধা বলল, 'আঁচাবার পর কিন্তু পড়াবি। না পড়ালে ছাড়ছি না।'

পুকুরঘাটের দিকে যেতে যেতে সুনীতি ফিসফিস করল, 'কী অসভ্য লোক ভাই—'

'কার কথা বলছিস ?'

'আহা, কার কথা যেন বুঝতে পারছে না-আনন্দদার কথা।'

সুধা বলল, 'অসভ্যের কী হল ?'

'সুনীতি বলল, এমন করে চিঠি কেউ লেখে!'

'ঢঙ করিস না দিদি।'

'ঢঙের কী হল ?'

'আনন্দদার চিঠির জন্যে তো হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলি।'

'তোকে বলেছে!'

'বলিস নি। তবে—'

'তবে কী ?'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুধা বলল, 'যেরকম উদাস উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতিস আর ফোঁত ফোঁত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতিস তাতে মনে হচ্ছিল আনন্দদার চিঠি না এলে বুজি আত্মহত্যাই করে বসবি।'

'তবে রে বাঁদর মেয়ে—' সুনীতি করল কি, এঁটো হাতেই সুধার পিঠে দুম করে কিল বসিয়ে দিল।

পিঠ বাঁকিয়ে নাকি সুরে উঁ-উঁ করতে করতে সুধা বলল, 'পেটে খিদে মুখে লাজ। সত্যি কথা বললেই দোষ।'

'সত্যি কথা তোকে বলাচ্ছি। আয়—'

দ্বিতীয় কিলটি পড়বার আগেই ছুটে দূরে সরে গেল সুধা।

পুকুরঘাটে আঁচাতে আঁচাতে সুনীতি বলল, 'ভাগ্যিস পিওনটার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। বাবা কি দাদু-টাদুর হাতে চিঠিটা পড়লে কী হত বল দেখি!'

এক মুখ জল নিয়ে পিচকিরির মতন ছুঁড়ে দিল সুধা। তারপর বলল, 'খুব ভাল হতো। ওঁরা বুঝতে পারতেন কী পাকাটাই না তুই পেকেছিস।'

'আমাকে নিয়ে বেশি মজা করো না, নিজের কথাটা একটু ভেবে দেখো।'

'আমার আবার কী কথা ?' সুধার চোখ কুঁচকে গেল।

সুনীতি বলল, 'শ্রীমান হিরণকুমার ঢাকায় বসে আছেন। তিনিও এইরকম চিঠি ছাড়তে পারেন। আর তা দাদু কি বাবার হাতে পড়তে পারে।'

চমকে ওঠার মতন করে সুধা বলল, 'কক্ষণো না—'

'না নয়, হ্যাঁ।'

সুধাকে এবার চিন্তিত দেখাল, 'তাই তো রে দিদি, কী করা যায় বল দেখি—'

নারকেল-গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাটে দুই বোন পাশাপাশি বসল। বিনু তাদের সঙ্গেই ছিল, হাত নেড়ে নেড়ে হেমন্তের স্থির জলে ঢেউ তুলতে লাগল। কান দুটো কিন্তু তার সুধা-সুনীতির দিকেই ফেরানো।

সুনীতি বলল, 'আজই কলকাতায় চিঠি লিখে জানিয়ে দেব, আমাকে যেন আর চিঠি টিঠি না লেখে—'

সুধা বলল, 'তোর কথা শুনবার জন্যে বসে আছে আনন্দদা।'

'তা হলে হিরণকুমারও তা-ই।'

'যা বলেছিস। বারণ করলে ওরা আরো বেশি করে চিঠি লিখবে।'

একটু ভেবে সুনীতি হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'একটা ফন্দি মাথায় এসেছে রে সুধা—'

সুধা উৎসুক চোখে তাকাল, 'কী ?'

উত্তর না দিয়ে সুনীতি বিনুকে ডাকল। বিনু তাকাতেই বলল, 'পোস্ট অফিসটা কোথায় জানিস ?'

বিনু ঘাড় কাত করল, অর্থাৎ জানে।

'দু'দিন পর পর একবার করে পোস্ট অফিসে যাবি ভাই ?'

'কেন ?'

'সুধার কি আমার চিঠি থাকলে নিয়ে আসবি।'

চোখ কুঁচকে একটু ভাবল বিনু। তারপর বলল, 'যেতে পারি। কিন্তু—'

সুনীতি উঠে এসে বিনুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল, 'কিন্তু কী ?'

'আমাকে কী দিবি ?'

'কী আবার দেব ? যাবি তো বাবা এখান থেকে ওখানে—'

'এখান থেকে ওখানে! সেই স্টিমারঘাটা বরফকল ছাড়িয়ে তবে পোস্ট অফিস। পাক্কা দেড়-দু মাইল রাস্তা। এমনি এমনি অতখান পথ আমি যেতে পারব না।'

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আচ্ছা আচ্ছা, কী নিবি বল—'

বিনু বলল, 'যেদিন পোস্ট অফিসে যাব সেদিন দু আনা পয়সা দিবি।'

'দুআনা!' সুর টেনে সুনীতি বলল, 'তুই কী ডাকাত রে—'

'তা হলে যেতে পারব না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, দু আনাই দেব।'

ওদিক থেকে সুধা ডাকল, 'দিদি—'

সুনীতি আবার সুধার কাছে ফিরে গেল, 'কী বলছিস ?'

'পোস্ট অফিসের ব্যাপারটা তো মিটল। এবার আনন্দদার চিঠি বার কর।'

'না না—'

'না বললে শুনছি না। বার কর—' সুনীতির শাড়ির আড়াল থেকে চিঠিটা বার করার জন্য টানাটানি শুরু করে দিল সুধা।

শাড়ি সামলাতে সামলাতে বিব্রতভাবে চেঁচামেচি জুড়ে দিল সুনীতি, 'এই সুধা, এই—'

সুধার এক কথা, 'বার কর, বার কর—'

আত্মরক্ষার জন্য সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ছাড় ছাড়, কী ছেলেমানুষি করছিস! বিনু রয়েছে না?'

'বিনু গেলে চিঠি দেখাবি?'

'সে দেখা যাবে।'

সুধা এবার বিনুর উদ্দেশে বলল, 'তুই এখন যা তো বিনু—'

বিনুর মোটেই যাবার ইচ্ছে নেই। আনন্দদা সুনীতিকে কী লিখেছে, জানবার ভারি কৌতূহল হচ্ছিল। সে বলল, 'না, যাব না।'

'যাবি না?'

'না।'

একটা ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তার বদলে অগ্নিদৃষ্টিতে একবার বিনুকে দেখে নিয়ে সুধা বলল, 'চল দিদি, আমরা ওদিকে যাই। হনুমান ছেলে এখানে বসে থাক।' সুনীতিকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের উত্তর দিকে ঘন রোয়াইল আর সিনজুরি ঝোপের ভেতর চলে গেল সুধা।

একা একা ক্ষুণ্ণ মনে কিছুক্ষণ পুকুরঘাটে বসে থাকল বিনু। তারপর একসময় টুক করে উঠে পড়ে চঞ্চল পাখির মতন অস্থির পায়ে বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। একবার ইচ্ছে হল রোয়াইল আর সিনজুরি বনে ঘন ছায়ার ভেতর সুধা-সুনীতি যেখানে বসে আছে সেখানে চলে যায়। পরক্ষণেই ভাবল ওরা যখন তাকে ফেলে চলেই গেছে তখন আর হ্যাংলার মতন যাবে না।

অনেকক্ষণ পর বাড়ির ভেতর চলে এল বিনু। এসেই অবাক।

রান্নাঘরের দাওয়ায় নিবারণ পিওন একটা মোটা গামছা পরে প্রায় খালি গায়ে তেল মাখছিল। কোথায়ই বা তার ইউনিফর্ম, কোথায়ই বা তার চিঠি পত্তরের ঝোলা! তার মুখে অনবরত খই ফোটার মতন কথা ফুটছিল।

স্নেহলতা-সুরমা-শিবানী-অবনীমোহন, বাড়ির প্রায় সবাই নিবারণের সামনে দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে বিনুও গিয়ে সেখানে দাঁড়াল। তার মনে হল এত যখন তেল মাখার ঘটা, নিবারণ এখানে খাবেও।

নিবারণ বলছিল, 'চিঠি লইয়া এই বাড়িত্ যেদিনই আসি হেইদিনই ছান-খাওয়া সাইরা যাই। হেইদিন খাওন আমার বান্ধা। না খাইয়া গেলে হ্যামকত্তা আর বৌ-ঠাইনে আস্তা রাখব না।'

কথাগুলো অবনীমোহনের উদ্দেশ্যে বলা। অবনীমোহন উত্তর দিলেন না, নিঃশব্দে হাসলেন শুধু।

নিবারণ বলতে লাগল, 'রাইজদিয়ায় হ্যামকত্তার বাড়ি, বাজিতপুরে অভয় কবিরাজের বাড়ি, সুনামগঞ্জে ইসমাইল মেরধার (মৃধা) বাড়ি, গিরিগুঞ্জে ছোভান (সোভান) আলি মৌলবীর বাড়ি, হাসাড়ায় মল্লিকগো বাড়ি—এই কয় বাড়িতে চিঠি লইয়া গেলে খাইতে হইবই।'

অবনীমোহন এবার ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'আপনি তো অনেকগুলো গ্রামের নাম করলেন—'

'হ।'

'এত এত গ্রামে আপনাকে ঘুরতে হয়?'

'মোটে তো চাইরখান গেরামের নাম কইলাম। আমারে বিশখান গেরামে ঘুরতে হয় জামাইকত্তা—'

অবনীমোহন হেমনাথের ভাগনী-জামাই। সেই সুবাদে এরই ভেতর 'জামাই কত্তা' ডাকতে শুরু করেছে নিবারণ।

অবনীমোহন বললেন, 'বিশখানা গ্রামে একদিনে যান কী করে?'

'একদিনে ক্যাঠা যায় !'

'তবে ?'

নিবারণ এবার যা উত্তর দিল, সংক্ষেপে এইরকম। রাজদিয়া এবং আশেপাশের কুড়িখানা গ্রাম নিয়ে একটা মাত্র পোস্ট অফিস, আর ডাক পিওন বলতে একা নিবারণ। মস্ত ঝোলায় চিঠিপত্র বোঝাই করে প্রতি সোমবার সে বেরিয়ে পড়ে। পথে নদী-খাল বিল পড়লে নৌকোর মাঝিদের ডেকে ডেকে পাড়ি জমায়, কখনও বা 'গয়নার নৌকো' ধরে নেয়। যেখানেই যাক, এই জলের দেশে মানুষ বড় ভাল, বড় দয়ালু। দু'মুঠো না খাইয়ে কেউ ছাড়তে চায় না। রাত্রিবেলা কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় জুটে যায়ই।

সোম থেকে শনি, একটানা ছ'দিন চিঠি বিলির পর রাজদিয়ায় ফিরে আসে নিবারণ। মাঝখানে রবিবারটা বিশ্রাম। তারপর আবার সোমবার দূরের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদে বেরিয়ে পড়া। পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে এই রকমই চলছে।

সব শুনে অবনীমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'বকবকানি থামিয়ে এখন চান করতে যা নিবারণ। তোকে খেতে দেবার পর আমরা খাব।'

'এই যাই—' ব্যস্তভাবে নিবারণ পুকুরঘাটের দিকে চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে যখন খেতে বসল তখনও তার কথার শেষ নেই। খেতে খেতে গল্প করতে লাগল সে।

একধারে দাঁড়িয়ে বিনুর মনে হল, লোকটা যেন বকবক করার কল। দম দেওয়াই আছে, সব সময় গলগল করে কথা বেরিয়ে আসছে।

খাওয়াদাওয়ার পর নিবারণ বিনুকে নিয়ে পড়ল, 'তোমার লগে ভাল কইরা আলাপই হইল না নাতিবাবু। লও যাই এট্টু গপ-সপ করি।' বিনুকে সঙ্গে নিয়ে যুগলের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। বোঝা গেল এ বাড়ির সব অন্ধিসন্ধিই তার চেনা। টের পাওয়া গেল, এতক্ষণ বকবক করেও তার সাধ মেটে নি, আরো কিছুক্ষণ সে গল্প করতে চায়।

লোকটাকে খুব খারাপ লাগছিল না বিনুর। যুগলের নিচু তক্তাপোশে নিবারণের পাশাপাশি বসে উন্মুখ হয়ে থাকল সে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিবারণ বলল, 'তোমরা তো কইলকাত্তার পোলা ?'

বিনু মাথা নাড়ল।

'কইলকাত্তা দ্যাশখান কেমুন কইবা—'

কলকাতা কেমন শহর, কথায় কথায় তার মোটামুটি ছবি এঁকে নিবারণের চোখের সামনে যেন সেঁটে দিল বিনু।

শুনে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকল নিবারণ। তারপর বলল, 'আলিসান ব্যাপার, না ?'

'হ্যাঁ।'

'কইলকাত্তার কথা তো শুনলাম, এইবার আমাগো জলের দ্যাশের গপ শোন।'

'বলুন—'

দেখা গেল নিবারণ লোকটা সত্যি সত্যি গল্পের খনি। বিপুল অভিজ্ঞতা তার জীবনের। কবে কার্তিক মাসের ঝড়ে বড় গাঙে 'গয়নার নৌকো' উলটে গিয়ে মরতে বসেছিল, তার পর দু'খানা মোটে হাতের ভরসায় দু'মাইল উথলপাথল নদী পাড়ি দিয়েছিল, কবে চরের মুসলমানদের সঙ্গে শুধু লাঠি পেটা করে একটা প্রকাণ্ড কুমির মেরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছ থেকে দশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিল, কবে কোথায় সাক্ষাৎ যমের মতো ডানাওলা উড়ন্ত সাপ দেখেছিল, কোথায় দু'শ বছরের এক বুড়ো ফকিরের অলৌকিক মন্ত্রবলে বিশাল দীঘির সব জল দুধ হয়ে গিয়েছিল—হাত-পা চোখমুখ নেড়ে কত বিচিত্র বিস্ময়কর গল্প যে নিবারণ বলে গেল হিসেব নেই।

গল্প বলতে জানে বটে লোকটা! মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিল বিনু, তার চোখে পলক পড়ছিল না।

গল্পে বিনুকে জয় করে বিকেলের খানিক আগে নিবারণ চলে গেল। এখান থেকে পথে কারো নৌকো ধরে সোজা সুজনগঞ্জ যাবে সে।

নিবারণ চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে হেমন্তের ছায়া তখন আরো দীর্ঘ এবং ঘন হল সেই সময় সিনজুরি বন থেকে বেরিয়ে সুধা-সুনীতি বাড়ি চলে এল।

পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে সুরমা চুল বাঁধছিলেন। বিনু তার কাছেই ছিল। মেয়েদের দেখে সুরমা বললেন, 'কোথায় ছিলি রে তোরা এতক্ষণ?'

সুনীতি বলল, 'বাগানে—'

'কী করছিলি?'

'গল্প।'

'কলকাতা থেকে নাকি চিঠি এসেছে?'

সুনীতি থতমত খেয়ে যায়, আধফোটা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

সুরমা শুধলেন, 'কার চিঠি?'

'আমার—'

'তোকে আবার কে চিঠি দিলে?'

'আমার কলেজের এক বন্ধু—সেই যে বেলা বলে মেয়েটা, কলকাতায় আমাদের বাড়ি আসত—'

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

বিনু লক্ষ করল, সুধা-সুনীতি চোরা চাহনিতে পরস্পরকে দেখতে দেখতে ঠোঁট টিপে হাসছে। বিনুর একবার ইচ্ছে হল, চিঠির আসল রহস্যটা ফাঁস করে দেয়। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকল, কিছু বলল না।

অঘ্রাণের মাঝামাঝি বিনুদের জমি কেনা হয়ে গেল।

রেজিস্ট্রি হবার পর অবনীমোহন, বিনু, সুরমা রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। মজিদ মিঞা, হেমনাথ তখনও অফিসের ভেতর। সুরমাকে এতদূর আসতে হয়েছে, কেননা জমি তাঁর নামেই কিনেছেন অবনীমোহন।

হঠাৎ একটা লোক—মাথার চুলে জট বাঁধা, মুখময় দাড়ি-গোঁফ, ভাঙা-ভাঙা নখ, পায়ে হাজা, লালচে উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, সব মিলিয়ে পাগলাটে চেহারা—অবনীমোহনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'সালাম বাবু। আপনে বুঝিন জমিন কিনলেন?'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কেন?'

'আপনের লগে একখান কথা আছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'কী কথা?'

হলদে হলদে অসমান দাঁত বার করে লোকটা বলল, 'কার জমিন কিনলেন?'

'মজিদ মিঞার।'

চোখের ওপর হাত রেখে ভুরু কুঁচকে লোকটা ভাবতে চেষ্টা করল যেন। বলল, 'কোন মজিদ মেঞা ক'ন দেহি? বাড়ি কুনখানে?'

অবনীমোহন বললেন, 'কেতুগঞ্জে।'

'কেতুগঞ্জের মজিদ মেঞা বড় ভাল মানুষ।' লোকটার চোখমুখ আলো হয়ে উঠল, 'মেঞাভাইর কুন জমিন কিনলেন?'

'উত্তরের দিকের মাঠের।'

'উত্তরে চকের জমিন? বড় বাহারের জমিন। হেই ধারে সুনামগুঞ্জের হাট, আর এইধারে ধলেশ্বরীর গাঙ—এইর ভিতর এমুন ভাল জমিন আর নাই।'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, 'তুমি এখানকার সব জমি চেনো নাকি।'

'চিনি আবার না! সগ্‌গল চিনি, মেঞাভাইর যেই জমিন আপনে কিনলেন হেয়াতে ধান দ্যান, পাট দ্যান, মুগু-মুসৈর-কলই—যা ইচ্ছা দ্যান ফলন যা হইব—চোমৎকার—চোমৎকার—'

একটু চুপ।

তারপর লোকটাই আবার শুরু করল, 'আপনের লগে এত কথা কইলাম, আপনে কে, হেয়াই জানলাম না।'

অবনীমোহন নিজের পরিচয় দিলেন।

অপার বিস্ময়ে লোকটা খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আপনে হ্যামকত্তার জামাই!'

অবনীমোহন আস্তে করে মাথা নাড়লেন। হেমনাথের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাটাই যেন এখানে পরমাশ্চর্য ঘটনা। এ লোকটার চোখেমুখে যে বিস্ময় তা রাজদিয়াবাসী প্রতিটি মানুষের চোখেই আগে দেখেছেন অবনীমোহন।

লোকটা বলল, 'আপনি নিয্যাস কইলকাত্তায় থাকতেন?'

'হ্যাঁ। তোমায় কে বললে?'

'কে কইছিল মনে নাই। তয় শুনছিলাম, কইলকাত্তার থনে হ্যামকত্তার ক্যাঠা যিনি আইছে। ভাবছিলাম আপনেরে দেখতে যামু—'

'যাও নি তো—'

'না।'

'গেলেই পারতে।'

একটু ভেবে লোকটা বলল, 'যাওনের সময় কই? চকে চকে মাঠে-ঘাটে ঘুইরা দিন কাইটা যায়। কুনোখানে যাওনের ফুরসুত নাই।'

বিনু একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ভেবেই পেল না, মাঠে-ঘাটে এত কী কাজ লোকটার। ইচ্ছে হল, একবার জিজ্ঞেস করে, কী ভেবে আর করল না।

অবনীমোহন বললেন, 'নামটা কী ভাই?'

'তালেব—তালেব মেঞা—'

'তুমি এই রাজদিয়াতেই থাকো?'

'না।'

'তবে?'

তালেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর উদাস গলায় অন্যমনস্কের মতন বলল, 'বাড়ি আমার এই দ্যাশে না।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কোথায়?'

'হেই ম্যাঘনার পারে। তয়—'

'কী ?'

'দ্যাশ কইতে কিচ্ছু নাই আমার। ম্যাঘনায় ঘরবাড়ি খাইছে, ভাসতে ভাসতে এইখানে চইলা আইলাম। দশ বিশ বচ্ছর ধইরা এইখানেই আছি।'

'তোমার কে কে আছে ?'

'কেউ না। এক্কেরে ঝাড়া হাত-পা।'

অবনীমোহন হয়তো কৌতূহল বোধ করছিলেন, 'এখানে কোথায় থাকো তুমি ?'

তালেব বলল, 'থাকনের ঠিক-ঠিকানা নাই। যহন যেইখানে পারি হেইখানে পইড়া থাকি। তয় মাঠে-ঘাটেই থাকি বেশি।'

'রাত্তিরেও ?'

'হ।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না অবনীমোহন।

তালেব আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় মজিদ মিঞাকে নিয়ে হেমনাথ এসে পড়লেন। এতক্ষণ রেজিস্ট্রি অফিসের ভেতর মুহুরি আর উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন তাঁরা।

হেমনাথকে দেখে অনেকখানি ঝুঁকে সম্ভ্রমের গলায় তালেব বলল, 'ছালাম বড়কত্তা, শরীল-গতিক ভাল তো ?'

হেমনাথ বললেন, 'ভাল। তুই কেমন আছিস তালেব ?'

'আপনারা যেমুন রাখছেন।'

'আমরা রাখবার কে ?' আকাশের দিকে দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'ভাল মন্দ যা রাখবার ঐ ওপরওলাই রাখবেন।'

তালেব জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'লাখ কথার এক কথা। খোদাতাল্লা ছাড়া কে আর রাখতে পারে।'

ওপাশ থেকে মজিদ মিঞা বলে উঠল, 'জমিন রেজিস্টারির খবর বুঝি পাইয়া গেছস ?'

নোংরা জট-পাকানো দাড়ি-গোঁফের ভেতর জগতের সরলতম হাসিটি ফুটিয়ে তালেব মাথা হেলিয়ে দিল।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'গন্ধ পাইয়াই বুঝি লৌড়াইয়া (দৌড়ে) আইছস ?'

'হ।'

হেমনাথ এই সময় তাড়া দিলেন, 'এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বেলা হেলতে চলল, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

মজিদ মিঞা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'হ-হ, শুদাশুদি খাড়ইয়া থাকনের কুন কাম ? লন যাই।'

সুরমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। রাজদিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, এতখানি রাস্তা তাঁর মতন দুর্বল রোগা মানুষের পক্ষে একবার হেঁটে এসে আবার ফিরে যাওয়া অসম্ভব। শরীরে তা হলে আর কিছুই থাকবে না। তাই সকাল বেলাতেই লারমোরের ফিটনখানা আনিয়ে রেখেছিলেন হেমনাথ।

সামনের দিকে একটা ডালপালা-ওলা বিশাল জামরুল গাছের তলায় লারমোরের ফিটনটা দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স্ক রুগ্ন ঘোড়াটা আর কোচোয়ান কাদের দু'জনেই ঝিমুচ্ছিল। হেমনাথরা সোজা সেখানে চলে এলেন।

মজিদ মিঞা গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কাদের—'

অতি কষ্টে চোখের পাতা দুটো ওপর দিকে টেনে তুলল কাদের। ঘুমন্ত গলায় সাড়া দিল, 'হ—'

'ঘুমাস নিহি ?'

'না।' বলতে বলতেই আবার কাদেরের চোখ বুজে এল।

'ঘুমাস না তো চোখ বুইজা আছস ক্যান ?' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'নে, চোখ টান কর।

তর ঘোড়ারে জাগা। আমাগো কাম হইয়া গেছে। এইবার বাড়িত্ যামু।'

একে একে সবাই ফিটনে উঠল।

হেমনাথের সঙ্গে জামরুল তলায় তালেবও এসেছিল। সবাইকে গাড়িতে উঠতে দেখে সে উৎকণ্ঠিত হল। ফিটন ছাড়বার মুখে তাড়াতাড়ি অবনীমোহনকে ডাকল, 'জামাইকত্তা—'

অবনীমোহন তাকালেন, 'কী বলছ?'

'আমার হেই কথাখান কিলাম কওয়া হয় নাই।'

অবনীমোহনের মনে পড়ে গেল। সাগ্রহে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল—'

তালেব বলল, 'জমিন কিনলেন, ধান রুইবেন তো?'

'সেইরকমই ইচ্ছে। চাষ না করলে আর কিনলাম কেন?' অবনীমোহন হাসলেন।

'অঘ্রান পৌষ মাসে ধান কাটার পর—' তালেব বলতে লাগল, 'আপনের জমিনে যা দুই-চাইর দানা পইড়া থাকব, হেগুলান কিলাম আমার। ইন্দুরের গাদে (ইঁদুরের গর্তে) যা ধান থাকব তা-ও আমার।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'মাটির সঙ্গে যে ধান মিশে থাকবে তা তুলবে কী করে?'

'হে আমি যেমনে পারি। আপনে খালি কথা দ্যান, ঐ ধান আমারে দিবেন।'

সংশয়ের গলায় অবনীমোহন বললেন, 'তুমি যদি তুলে নিতে পার, আমার আপত্তি নেই।'

তালেবের চোখমুখ থেকে আনন্দ যেন উছলে পড়তে লাগল। এত বড় জয় যেন আর কখনও হয়নি তার। উৎফুল্ল সুরে মাথা হেলিয়ে সে বলতে লাগল, 'কথা দিলেন কিলাম, পাকা কথা—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পাকা কথা বৈকি—'

একসময় ফিটন চলতে শুরু করল।

অবনীমোহনের বিস্ময় আর কাটছিল না। বললেন, 'অদ্ভুত লোক—'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, অদ্ভুতই। প্রায়ই এই রেজিস্ট্রি অফিসে এসে বসে থাকে। আর যে জমি কেনে তাকে গিয়ে ধরে, যাতে ধান ওঠার পর ঝড়তি পড়তি ফসল ও কুড়িয়ে নিতে পারে।'

'আর কিছু করে না।'

'না। করতে তো অনেকেই বলে। আমি বলেছি, মজিদ বলেছে, রামকেশব বলেছে, গুয়াখোলার রহিম মিঞা বলেছে। কামলার তো সবারই দরকার। আমরা ওকে বাড়িতে এসে থাকতেও বলেছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে!'

'ধান কুড়িয়ে দিন চলে?'

'ভগবান জানে।'

সারা রাস্তা তালেবের কথাই হল। কথায় কথায় একসময় বরফ কল, স্টিমারঘাটা, সারি সারি মিঠাইর দোকান পেরিয়ে ফিটন হেমনাথের বাড়ি এসে থামল

পুজোর আগে সেই যে ঝিনুক এ বাড়ি এসেছিল, এখনও যায়নি। ভবতোষ অবশ্য মাঝে মধ্যে এসে মেয়েকে দেখে গেছেন। ঠিক হয়েছে এখানে থেকেই পড়াশোনা করবে ঝিনুক। ইংরেজি নতুন বছর

পড়লে স্কুলে ভর্তি হবে।

এখনও মাছের বড় টুকরোটা নিয়ে, দাদুর কাছে শোওয়া নিয়ে, স্নেহলতার ভাগ নিয়ে বিনুর সঙ্গে সমানে হিংসে করে যাচ্ছে ঝিনুক। তবে পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে ঝুমারা আসার পর ঝিনুক যেমনটি হয়ে উঠেছিল, এখন আর তেমন নেই। তখন সব সময় বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকত সে। বিনু কী করে, কোথায় যায় সব তীক্ষ্ণ ধারাল চোখে লক্ষ্য করত। ঝুমার সঙ্গে বিনু খেলা করলে, কথা বললে, কিংবা বেড়াতে গেলে রাগে-আক্রোশে-বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে যেত ঝিনুক। আজকাল সে ভাবটা নেই তার।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ্য করেছে, লেখাপড়া খেলাধুলো কিংবা তার সঙ্গে হিংসের ফাঁকে ফাঁকে কখনও পুবের ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে ঝিনুক, উদাস চোখে হেমন্তের অনুজ্জ্বল ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। যে ঝিনুক হিংসে করে, যে ঝিনুক দাদু-দিদার ভাগ নিয়ে গাল ফুলিয়ে দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে থাকে, তাকে তবু চেনা যায়। কিন্তু এই মেয়েটা বড় অচেনা, তাকে বড় দূরের মনে হয় তখন।

এমনিতে ঝিনুককে বিশেষ পছন্দ করে না বিনু, আবার অপছন্দও করে না। কিন্তু নির্বাক বিষণ্ন প্রতিমার মতন এই সুদূর অচেনা মেয়েটা তাকে যেন অসীম আকর্ষণে টানতে থাকে।

একেক সময় বিনু তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'এখানে বসে কী করছ?'

প্রথমটা হয়তো শুনতেই পায় না ঝিনুক। দু-চারবার ডাকাডাকির পর সে চমকে তাকায়। বিনু আগের প্রশ্নটাই আবার করে, 'এখানে কী করছ?'

গাঢ় বিষাদের গলায় ঝিনুক বলে, 'মা'র কথা ভাবছি।'

দুঃখী মেয়েটা নিমেষে যেন বিনুকে অভিভূত করে ফেলে। তার অনেকখানি কাছে গিয়ে অপার সহানুভূতির সুরে সে শুধোয়, 'মা'র জন্যে মন কেমন করছে?'

আস্তে আস্তে কোঁকড়ানো চুলে-ভরা মাথাটা নেড়ে অস্ফুট গলায় ঝিনুক বলে, 'হুঁ—' রুপোর কাজললতার মতন বড় বড় চোখদুটো প্রথমে জলে ভরে যায়, তারপর ফোঁটায় ফোঁটায় টপ টপ ঝরে পড়তে থাকে।

এই সময়টা একেবারে দিশেহারা হয়ে যায় বিনু। কিভাবে ঝিনুককে সান্ত্বনা দেবে, কেমন করে কোন সমবেদনার কথা বললে মেয়েটা শান্ত হবে, সে ভেবেই পায় না। বিমূঢ়ের মতন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গম্ভীর ভারি গলায় বিনু বলে, 'কেঁদো না।'

কান্না থামে না। ঝিনুক ফুলে ফুলে ফোঁপাতেই থাকে আর ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'মাকে আমি আর কক্ষণো দেখতে পাব না।'

গলার কাছটা, বুকের ভেতরটা কেমন ভারি হয়ে আসে বিনুর। কান্নার মতন কিছু একটা উথলে বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু পথ পায় না। ফিসফিস করে বিনু এবার যা বলে, ঝিনুক তো নয়ই, নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে না।

অঘ্রাণের শেষাশেষি একদিন হেমনাথ বললেন, 'মাঠের ধান তো পেকে এল। আর ক'দিন পর কাটা শুরু হবে। তার আগে একটা কাজ করা দরকার।'

স্নেহলতা-অবনীমোহন-সুধা-সুনীতি-বিনু, এমনকি যুগলও কাছাকাছি ছিল। সবাই জিজ্ঞাসু চোখে

তাকাল, 'কী?'

'ধানকাটার পরই তো যুগলের বিয়ে। তার আগে একখানা ঘর তুলতে হয়। নইলে—'

স্নেহলতা বললেন, 'নইলে কী?'

হেমনাথ বললেন, 'নতুন বৌ এসে থাকবে কোথায়? যুগল যে ঘরে থাকে সেখানে নতুন বৌকে তোলা যায় না।'

'সে তো ঠিকই।' স্নেহলতা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'তা ঘর উঠবে কোথায়?'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ যুগলের দিকে তাকালেন, 'কি রে, কোথায় ঘর তুলবি?'

যুগল ঘাড় গুঁজে এক মনে নখ খুঁটে যাচ্ছিল, আরো ঝুঁকে পড়ল সে, জবাব দিল না।

হেমনাথ বললেন, 'লজ্জায় তো একেবারে গেলি! তাড়াতাড়ি বল, কাল থেকে কামলা লাগবে।'

যুগল আর বসে থাকতে পারল না, উঠে বার-বাড়ির দিকে দৌড় লাগাল।

হেমনাথ হেসে উঠলেন, দেখাদেখি অন্য সবাইও হাসল।

সেইদিনই ঘুরে ঘুরে যুগলের ঘরের জন্য জায়গা ঠিক করে ফেললেন হেমনাথ। দক্ষিণের ঘরের গা ঘেঁষে ঢেঁকিঘর। তার পেছন দিকে কইওকড়া আর চোখ-উদানে গাছের ঝুপসি জঙ্গল। স্থির হল এই জায়গাটা সাফ-টাফ করে কাল থেকে ঘর তোলা হবে। পঁচিশের বন্দ'র মস্ত ঘর।

হেমনাথ যা বলেছিলেন তাই করলেন। পরের দিনই মজুর লাগিয়ে দিলেন।

ঢেঁকিঘরের পাশে যুগলের জন্য নতুন ঘর উঠতে লাগল। আর এদিকে হেমনাথ তাঁর পুকুরে 'মাঝধরা' দিলেন।

অঘ্রাণ মাসের শুরু থেকেই এদেশের পুকুরগুলো খারাপ হয়ে যায়। যত কচুরিপানা, টোপাপানা, বাইচা (এক জাতের জলজ আগাছা) সব পচতে শুরু করে। ফলে জল যায় নষ্ট হয়ে, তার রংও যায় বদলে। কালচে দূষিত জল থেকে দুর্গন্ধ উঠতে থাকে। এই সময় জলের ভেতর মাছেদের 'বেঁচে' থাকা প্রায় অসম্ভব। পাবদা-ট্যাংরা-ফলুই-নলা-গরমা-বোয়াল-বজুরি-ভাগ্না—ঝাঁক বেঁধে পুকুরের সব মাছ জলতল থেকে আধমরার মতন ওপরে উঠে ভাসতে থাকে। এদেশে একে বলে, 'মাঝ গাবানো'।

মাছ গাবাতে শুরু করলে ধরে ফেলতেই হবে। নইলে জলজ আগাছার সঙ্গে মাছ মরে পচতে থাকলে আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু একসঙ্গে এত মাছ দিয়ে কী হবে? তাই বড় বড় গৃহস্থরা 'মাছধরা' দেয়। রাজ্যের লোক জুটিয়ে এনে 'গাবানো মাছ' ধরিয়ে ফেলে। যে যতটা ধরতে পারে সবটাই তার। এর জন্য পুকুরের মালিককে ভাগ দিতে হয় না।

'মাছধরা' দিলে দু দিক থেকে সুবিধে। এক, মরা আধমরা মাছগুলো জল থেকে ছেঁকে আনা যায়। দুই, অসংখ্য মানুষ মাছধরার ফলে পুকুরের সমস্ত আগাছা যায় সাফ হয়ে।

'মাছধরা' দেবার জন্যে ঢ্যাঁড়া দিতে হয় না। দু'চারজনের কানে তুলে দিলেই হল। তারাই খবরটা দিগ্‌দিগন্তে পৌঁছে দেয়।

একদিন সকালবেলা বিনু দেখল কয়েকশ' মানুষ পলো, ধর্মজাল, ঝাঁকিজাল নিয়ে তাদের পুকুরে এসে পড়েছে। তারপর সমস্ত দিন ধরে জল তোলপাড় করে চলল মাছধরা। মানুষের সঙ্গে মাছরাঙা আর শঙ্খচিলেরাও মাছ ধরবার জন্য পাল্লা দিতে লাগল।

বেলা একটু বাড়লে বিনুও বায়না ধরে যুগলের সঙ্গে পুকুরে নামল। এবং কি আশ্চর্য, সারা গায়ে জল আর পাঁক মেখে দুটো মেনি আর একটা সরপুঁটি মাছ ধরেও ফেলল।

শুধু হেমনাথের পুকুরেই না। পর পর ক'দিন রাজদিয়ার আরো অনেক পুকুরে মাছ ধরা চলল। যুগলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে-সব জায়গা থেকেও মাছ নিয়ে এল বিনু।

দেখতে দেখতে পৌষ মাস পড়ে গেল।

আশ্বিনের শুরুতে মাঠময় শুধু ছিল জল। অথৈ অপার সমুদ্র হয়ে শরতের মাঠ দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে

দুলতে থাকত। তার ওপর আমন ধানের চারাগুলো মাথা তুলে ছিল। তখন যেদিকে চোখ যেত, সবুজ আর সবুজ।

কার্তিকের গোড়াতেই জলে টান ধরেছিল। পৌষ মাস পড়তে না পড়তেই মাঠ একেবারে শুকনো, এক ফোঁটাও জল নেই। অবশ্য মাটি এখনও নরম, কোথাও কোথাও কাদা জমে আছে।

তবে সব চাইতে বিস্ময়কর যা, তা হল ধানগাছগুলো। কোন এক জাদুকরের ছোঁয়ায় সেগুলো এখন সোনা হয়ে গেছে। মাঠের ঝাঁপি ফসলের লাবণ্যে ভরে উঠেছে।

হেমনাথ একদিন বললেন, 'আর দেরি করা যাবে না। দু একদিনের মধ্যে ধানকাটা শুরু করতে হবে।'

একটু চিন্তা করে অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু মামাবাবু—'

হেমনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'আপনার জমি একশ' কানির মতন। বার মাসের লোক বলতে মোটে দু'জন—যুগল আর করিম। দুটো লোকের পক্ষে এত জমির ধান কেটে ঘরে তোলা অসম্ভব। আরো কয়েক জন তো দরকার।'

হেমনাথ কিন্তু আদৌ চিন্তিত নন। ব্যাপারটা যেন কোনো সমস্যাই নয় এমনভাবে বললেন, 'তা দরকার।'

'দু-একদিনের মধ্যে যদি ধানকাটা শুরু করেন, অন্তত আজকালের ভেতর লোকজন যোগাড় করে নিতে হবে।'

'সে ঠিক জুটে যাবে।'

হেমনাথকে যতখানি ভাবনাশূন্য দেখাল, অবনীমোহন কিন্তু ততখানি নিশ্চিন্ত নন। কিভাবে কোত্থেকে এত লোক যোগাড় হবে তিনি ভেবে উঠতে পারছিলেন না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে তিনি আর কোনো প্রশ্ন করলেন না।

হেমনাথ বুঝিবা অবনীমোহনের মনোভাব টের পেয়েছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখো, লোক ঠিক বাড়িতে এসে হাজির হবে।'

'আপনি আগেই ঠিক করে রেখেছেন?'

'না।'

'তবে?' অবনীমোহনকে ঈষৎ বিমূঢ় দেখাল।

হেমনাথ বললেন, 'আগে থেকে ঠিক করার দরকার নেই। সময়মতন ওদের পাওয়া গেলেই তো হল।'

হেমনাথ যা বলেছিলেন তা-ই। লোক যোগাড় করতে হিল্লী দিল্লী ছুটতে হল না, ঘরে বসেই পাওয়া গেল।

সেইদিনই বিকেলবেলা লক্ষ্মীছাড়া চেহারার একদল মানুষ এসে হাজির। হাত-পা তাদের ফাটা ফাটা, চামড়া থেকে খই উড়ছে। চুল জট-পাকানো, চিরুনি এবং তেলের সঙ্গে সেগুলোর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। পরনে চিটচিটে লুঙ্গি আর চেক-কাটা জামা কিংবা গেঞ্জি। সবার হাতেই দুটো করে ধানকাটা কাস্তে। চেহারা এবং পোশাক-আশাক দেখে এক পলকেই বোঝা গেল ওরা খুব গরিব মুসলমান।

সবার আগে ছিল বুড়োমতন একটা লোক, সম্ভবত সে-ই দলপতি। হেমনাথের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আদাব হ্যামকত্তা—'

অন্য লোকগুলোও বিনীত সুরে বলে উঠল, 'আদাব আদাব—'

হেমনাথও হাত জোড় করে বললেন, 'আদাব। তারপর কী খবর বল। আজই এলে নাকি?'

'জি—' সবার প্রতিনিধি হিসেবে বুড়ো লোকটা বলল, 'দেরি নি হইয়া গেল কত্তা?'

'না, ঠিক সময়েই এসেছ?'

'ধানকাটা কামলা রাখেন নাই তো?'

'না। তবে আজকালের মধ্যে তোমরা না এলে অন্য লোক দেখতে হতো।

'নসিব ভাল, আইজই আমরা আইছি। তা ধানকাটা আরম্ভ হইব কবে?'

'এসেই যখন পড়েছ, কাল থেকেই আরম্ভ করব ভাবছি।'

'হেই ভাল। আইলসা বইসা থাইকা লাভ কী?'

হেমনাথ শুধোলেন, 'তোমরা ক'জন এসেছ?'

বুড়ো লোকটা জানাল, 'পচিশ জন।'

'ঠিক আছে। পঁচিশ জনই আমার দরকার।' হেমনাথ গলা তুলে ডাকলেন, 'যুগল, যুগল—'

যুগল বার-বাড়ির দিক থেকে ছুটে এল। হেমনাথ দলটাকে দেখিয়ে বললেন, 'এদের থাকার ব্যবস্থা করে দে।'

আরেক প্রস্থ আদাব জানিয়ে লোকগুলো যুগলের সঙ্গে চলে গেল।

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'এরা কারা?'

হেমনাথ বললেন, 'চরের কৃষাণ।'

'আপনি জানতেন, ওরা আসবে?'

'জানতাম, প্রত্যেক বছরই ওরা আসে।' হেমনাথ এরপর যা বললেন সংক্ষেপে এইরকম।

অঘ্রাণের শেষাশেষি ধলেশ্বরীর চরগুলো থেকে এবং সুদূর ভাটির দেশ থেকে দলে দলে ভূমিহীন গরিব কৃষাণ রাজদিয়ার দুয়ারে দুয়ারে এসে হানা দেয়। প্রতি বছরই এই সময়টা ওরা এখানে আসে। শুধু অঘ্রাণেই না, বৈশাখ-জষ্ঠি-আষাঢ়ে—ধান-পাট রোয়ার দিনগুলোতেও আসে। দরকার মতন সম্পন্ন গৃহস্থেরা তাদের কাজে লাগায়, সাময়িক প্রয়োজন ফুরোলে তারা আবার দল বেঁধে ফিরে যায়। যে লোকগুলোকে আজ হেমনাথ রেখেছেন তারাও নির্ভূম নিরন্ন চাষী।

অবনীমোহন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। এই বিশাল দেশে যেখানে এত প্রাচুর্য, জিনিসপত্র এত অকল্পনীয় রকমের সস্তা, সেখানেও মানুষের দু-মুঠো ভাত জোটে না? পূর্ব বাংলার দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ ছড়ানো। অথচ এদেশে বেশির ভাগ মানুষই নাকি ভূমিহীন। অবনীমোহন আরো জানতে পারলেন, জমিজমাগুলা বড় বড় গৃহস্থের বাড়িতে বছরে মোটে চার মাসুের মতন তারা কাজ পায়।

অবনীমোহন শুধোলেন, 'বাকি আট মাস ওদের কিভাবে কাটে?'

'আন্দাজ কর না—' হেমনাথ হাসলেন।

'বুঝতে পারছি না।'

হেমনাথ এবার বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। চার মাস লোকের জমিতে ধান-পাট বুনে এবং খেটে ওদের কাটে। সারা বছরে এই সময়টাই যা একটু সুখের মুখ ওরা দেখতে পায়। একমাস কাজ করে পানের 'বরজ-এ'। মাস-দুয়েকের মতন মুত্রা আর বাঁশ দিয়ে ধামা-কুলো-পাটি এই সব বুনে হাটে হাটে বেচে। তা ছাড়া খালে-বিলে নদীতে মাছমারা তো আছেই। জীবনধারণের জন্য তাদের নির্দিষ্ট সম্মানজনক কোনো জীবিকা নেই, আছে হাজার রকমের উঞ্ছবৃত্তি।

হেমনাথ বলে যাচ্ছিলেন, 'দু চারটে মাস বাদ দিলে দুর্ভিক্ষ ওদের নিত্য সঙ্গী। কত কষ্টে যে ওরা দিন কাটায় ভাবতে পারবে না।'

একটু ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'আমার ধারণা ছিল, এদেশের সব মানুষ খুব সুখে আছে।'

'ধারণাটা ঠিক না।'

'তাই তো দেখছি।'

একটু নীরবতা। তারপর অবনীমোহনই আবার শুরু করলেন, 'এত প্রচুর ফসল এদেশে, এত সস্তাগণ্ডা,

তবু লোকে খেতে পায় না! আশ্চর্য ব্যাপার!'

হেমনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। আবছা গলায় বললেন, 'সত্যিই আশ্চর্য।'

'আচ্ছা মামাবাবু—'

'বল—'

'এভাবে এত কষ্টের ভেতর কতদিন মানুষ বাঁচতে পারে?'

'বংশ পরম্পরায় ওরা বেঁচে আছে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাই এইরকম, কি আর করা যাবে!'

অবনীমোহন উত্তর দিলেন না।

একধারে চুপচাপ বসে দাদু আর বাবার কথাগুলো শুনছিল বিনু। সব বোঝে নি সে। তবু গরিব ঐ মানুষগুলোর জন্য অসীম দুঃখে তার বুক ভারি হয়ে গেল।

পঁচিশ জন লোক রেখেছেন হেমনাথ, তারা সবাই ধলেশ্বরীর চর থেকে এসেছে। উদয়াস্ত খাটলেও একশ' কানি জমির ধান কাটতে, সেই ধান ঝেড়ে শুকিয়ে ডোলে তুলতে কম করেও মাস দুই লাগবে। নতুন লোকগুলো ততদিন এখানেই থাকবে। অর্থাৎ ফিরে যেতে যেতে তাদের সেই ফাল্গুন মাস।

যতদিন ধানকাটা চলবে ততদিন খোরাকি পাবে লোকগুলো। মজুরি হিসেবে টাকা-পয়সা অবশ্য দেবেন না হেমনাথ, দু'মাস পর দেশে ফেরার সময় প্রত্যেককে তিন মণ করে ধান, দু'খানা করে নতুন লুঙ্গি আর গামছা দেবেন।

উত্তর আর দক্ষিণের দু'খানা ঘর লোকগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের। অবশ্য চাল-ডাল-তেল-মশলা স্নেহলতা পাঠিয়ে দেন। রান্নাবান্না ওরা করে নেয়।

লোকগুলো কাজে লাগবার পর থেকেই ছায়ার মতন বিনু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। ভোরবেলা উঠেই কাঠকুটো জ্বেলে ওরা রান্না চড়িয়ে দেয়। তারপর উনুনের চারধারে গোল হয়ে বসে হাত-পা সেঁকতে থাকে। তখনও কুয়াশা আর হিমে চারদিক ঝাপসা, সূর্যের তো দেখাই পাওয়া যায় না। তার বদলে আকাশের দূর প্রান্তে প্রভাতিয়া তারাটা জ্বলজ্বল করতে থাকে।

ওদের ওঠার আওয়াজ পেয়েই আজকাল ঘুম ভেঙে যায় বিনুর। ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। প্রতিদিনই উঠে সে দেখে, হেমনাথ বসে আছেন। এমনিতেই হেমনাথ তাড়াতাড়ি ওঠেন। ইদানীং ধানকাটা শুরু হবার পর তাঁর চোখ থেকে ঘুম গেছে। সারারাত বোধহয় জেগেই থাকেন।

তাড়াতাড়ি দাদুর সঙ্গে সূর্যবন্দনা সেরে সকালবেলার খাবার খেতে খেতে রোদ উঠে যায়, শীতের নিরুত্তাপ স্তিমিত রোদ।

এদিকে অবনীমোহনও উঠে পড়েন, ওদিকে লোকগুলোর খাওয়াও হয়ে যায়। সকালবেলায় অবশ্য ওরা ভরপেট খায় না। নাকেমুখে দু-চার গরাস কোনোরকমে গুঁজে বাকি ভাত-তরকারি আর নুন-লঙ্কা-পেঁয়াজ মেটে পাতিলে ভরে গামছায় বেঁধে নেয়।

সকালে খাওয়া হলে আর এক দণ্ডও বসে থাকে না লোকগুলো। ধানকাটা কাঁচি, ভাতের পাতিল আর তামাকের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। হেমনাথ, অবনীমোহন আর বিনুও রোজ তাদের সঙ্গে চলে যায়। ধানকাটা শুরু হতেই লেখাপড়া একরকম বন্ধ করে দিয়েছে বিনু।

এমনিতে কোনো রাস্তা নেই। জমির আলের ওপর দিয়ে পথ ঘাস শিশিরে ভিজে থাকে। পৌষ মাসের সকালে তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পা শিরশির করতে থাকে বিনুর। অঘ্রাণের মাঝামাঝি থেকেই উত্তুরে হাওয়া ছাড়তে শুরু করেছিল। পৌষ মাসে তার যেন দাঁত বেরিয়েছে। শরীরের যে জায়গাগুলো খোলা, বাতাস যেন সেখানে কেটে কেটে বসে।

যতখানি সম্ভব বিনুরা দামী গরম জামা-কাপড়ে গা মুড়ে আসে। কিন্তু ধানকাটা এই লোকগুলোর বড় কষ্ট। আচ্ছাদন বলতে লুঙ্গি আর মার্কিন কাপড়ের পিরহানের ওপর জ্যালজেলে চাদর, অনেকে আবার চাদরটাও জোটাতে পারেনি। পৌষ মাসের শীতল প্রভাতে খোলা আকাশের তলায় হু-হু উত্তুরে

বাতাসের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে লোকগুলো হি-হি করে কাঁপতে থাকে। রোদ থেকে যে ভরসা পাবে তারও উপায় নেই। এই শীতে সূর্যালোক বড় কৃপণ, বড় কুণ্ঠিত, বড় নিস্তেজ। যদিও রোদ উঠে যায়, কাছে-দূরে কুয়াশার পর্দাগুলো ঝুলতে থাকে। কুয়াশার জন্য পরিষ্কার কিছুই চোখে পড়ে না। উত্তরের চক, দক্ষিণের চক, পুব-পশ্চিমের আদিগন্ত ধানের খেত—সব কিছুই ঝাপসা, নিরবয়ব।

যেতে যেতে লোকগুলো বলাবলি করে, 'এই বছর বেজায় শীত। বড় হিয়ল(কুয়াশা)।'

'হ।'

'হাত-পাও কালাইয়া (শীতে জমে যায়) যায়।'

'হ।'

'সুজনগুঞ্জের হাট থন একখান চাদর যদি কিনতে পারতাম।'

'চাদরের যা দাম!'

'কত?'

'আড়াই ট্যাহা তিন ট্যাহা—'

'হায় আল্লা, অত ট্যাহা কই পামু!'

একটু চুপচাপ।

তারপর কে একজন ডেকে ওঠে, 'বছির ভাই—'

বছির নামে লোকটি তক্ষুণি সাড়া দেয়, 'কী কও তাহের ভাই—'

তাহের বলে, 'ধান কাটতে বাইর হওনের সোমায় ছোট মাইয়াটার ধুম স্বর দেইখা আইছিলাম—'

'হ—'

'অহন কেমুন আছে, কেঠা জানে।'

'মনখান খারাপ লাগে?'

'হ।'

'মাইয়ার ব্যারাম, তোমার বাইরন (বার হওয়া) ঠিক হয় নাই।'

বিষণ্ন গলায় তাহের বলে, 'তুমি তো কইলা বাইরন ঠিক হয় নাই। কইয়াই খালাস। কিন্তুক—'

'কী?' জিজ্ঞাসু সুরে বছির শুধোয়।

তাহের বলে, 'ধানকাটা হইয়া গেলে তিন মণ ধান পামু; লুঙ্গি গামছা পামু দুইখান কইরা। মাইয়া লইয়া ঘরে বইসা থাকলে কে আমারে এই সগল দিব? এই ধানটা পাইলে দুই মাসের লেইগা নিশ্চিন্তি—'

'তয় আড়বুইঝার (আবুঝ) লাখান কথা কইতে আছিলি যে বড়। মাইয়া বাচুক-মরুক, এইটা কি আমাগো ঘরে বইসা থাকনের সোমায়?'

'না।'

'বাইচা থাকলে মাইয়া লইয়া পরে সুহাগ করণ যাইব।'

'হ।'

একটু চুপ করে থেকে বছির বলে, 'তোমার মাইয়ার কথায় আমার একখান কথা মনে পড়ল তাহের ভাই—'

তাহের বলে, 'কী?'

'আহনের সোমায় বিবির হাতে তিনখানা ট্যাহা দিয়া আইছিলাম, ঘরে আছিল তিন পাসারি চাউল; দুই স্যার তিল আর এক আগইল (ধামা) কাঐনের (কাউনের) চাউল। দুইটা মাস চাইরটা পোলা মাইয়া লইয়া কেমনে যে চালাইব!'

তাহের উত্তর দেয় না।

বছির আবার বলে, 'ঘরে এক টুকরা সোনা-দানা নাই যে বেইচা কি বান্ধা দিয়া দুইটা পয়সা পাইব!

কী যে করব-বউটা!'

তাহের এবার বলে, 'ভাইবা কী করবা? পথ আছে কুনো? শুদাশুদি মন খারাপ। তার থনে যা করতে আছ কর।'

ধানকাটা লোকগুলোর টুকরো টুকরো ঘর সংসারের কথা শুনতে শুনতে একসময় বিনুরা জমিতে এসে পড়ে।

ধানখেতে এসে প্রথমে লোকগুলো এক ছিলিম করে তামাক খেয়ে গা গরম করে নেয়। তারপর জামাটি খুলে সযত্নে গাছের ডালে ঝুলিয়ে লুঙ্গিতে মালকোঁচা মারে, তারও পর খাঁজকাটা বাঁকানো ধারাল কাস্তেটি হাতে নিয়ে জমিতে নামে। শুরু হয়ে যায় ধানকাটা, সমস্ত মাঠ জুড়ে শব্দ ওঠে খসর্-র্-খস্। গোড়া থেকে খড়সমেত ধানের গোছা কেটে একেক জন একেক জায়গায় স্তূপাকার কবতে থাকে।

হেমনাথের বসবার সময় নেই। মাঠময় ঘুরে ঘুরে তিনি ধানকাটা তদারক করতে থাকেন। অবনীমোহন আর বিনুও বসে থাকে না। হেমনাথের পিছু পিছু ঘুরতে থাকে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধানকাটার পর নতুন লোকগুলোর ভেতর থেকে কেউ হয়তো বলে ওঠে, 'মুখ বুইজ্জা কাম করণ যায় না। এই ছ্যামরারা একখান গীত ধর—'

সঙ্গে সঙ্গে তালমাত্রাহীন বেসুরো গলায় গান শুরু হয়ে যায়:

'দোহাই আল্লা মাথা খাও
হামাক ফেল্যা কই বা যাও,
বিদ্যাশ গ্যালে এবার তুমার
সঙ্গ ছাড়ুম না—আ-আ-আ—
বাপো নাই মোর মাও নাই,
একলা ঘরে কাল কাটাই,
গোঁসা করলে আর তো
আমি ছালুম রান্ধুম না—আ-আ-আ—
নয়া শীতের জারেতে
যাইবা যহন ধান দাইতে,
তুমার কাচি-কাঁথা, হুক্কা-তামুক
দিমু না—আ-আ-আ—
খসম আমি তুমার
সঙ্গ ছাড়ুম না—আ-আ-আ—
নিদয় হইলে মানুষ পাইবা
পিরীত পাইবা না—আ-আ-আ—'

রোজই অবশ্য গান হয় না। কোনো কোনো দিন অল্পবয়সী ছোকরারা দলের সব চাইতে বর্ষীয়ান কৃষাণটিকে ডেকে বলে, 'একখান কিচ্ছা কও খলিল চাচা।'

খলিল বলে, 'কী কিচ্ছা শুনবি?'

'হেই 'গুলেবাখালি' রাজকইন্যার—'

'রাজকইন্যার কিচ্ছায় বড় রস, না?'

ছোকরারা কিছু বলে না, শব্দ করে হাসতে থাকে শুধু।

বুড়ো খলিল ধবধবে দাড়ি আর শীর্ণ হাত নেড়ে গল্প জুড়ে দেয়, 'এক আছিল রাজকইন্যা। তার চিকন চিকন চুল, চাম্পা ফুলের লাহান বন্ন (রং), মুক্তার লাহান দাঁত। হ্যায় হাসলে হাজারখান চান্দ্ য্যান ঝলমলাইয়া উঠে—'

কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান কিংবা গল্প। গানে গানে গল্পে গল্পে বেলা দুপুর হয়ে যায়। শীতের সূর্য খাড়া মাথার ওপর এসে ওঠে। এ সময়টা ধানকাটা বন্ধ রেখে লোকগুলো পাশের একটা খাল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ভাতের পাতিল খুলে আলের ওপর সারি সারি খেতে বসে যায়।

দুপুরবেলায় হেমনাথ মাঠে থাকেন না। অবনীমোহন আর বিনুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। জিরোবার সময় নেই। কোনোরকমে চান-খাওয়া সেরেই আবার ধানখেতে ছোটেন। এ বেলাও অবনীমোহন এবং বিনু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যায়।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে খানিক নেমে গেলেই ধানকাটা বন্ধ করে দেয় লোকগুলো। তখন ফেরার পালা। সকাল থেকে একটানা পরিশ্রমে যে শস্য কেটে কেটে স্তূপাকার করা হয়েছিল, কৃষাণেরা এবার তা মাথায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। একেবারে তো এত ফসল নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই বার বার তাদের মাঠে আসতে হয়।

সমস্ত শস্য বাড়ি নিয়ে তুলতে সন্ধে নেমে যায়। তারপর পুকুর থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে লোকগুলো উত্তর আর দক্ষিণের ঘরে বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়।

সারাদিন তো কাছে কাছেই থাকে, বাড়ি ফিরেও তাদের সঙ্গ ছাড়ে না বিনু। উত্তর কি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ওদের কথা শোনে।

লোকগুলোকে সারাদিন দেখেও বিনুর বিস্ময় কাটে না। কোথায় কতদূরে তাদের দেশ কে জানে। ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে ফেলে শুধু দু মুঠো ভাতের জন্য তারা এখানে পড়ে আছে। কতদিন ওরা বাড়ি নেই, বাবাকে না দেখে ওদের ছেলেমেয়েদের মন খারাপ হয়ে যায় না? বিনু ভাবতে চেষ্টা করে।

সমস্ত দিন তো কথা বলার ফুরসত নেই। সন্ধেবেলা মাঠ থেকে ফেরার পর লোকগুলো বিনুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

বছির বলে, 'অ বাবুগো পোলা—'

বিনু তক্ষুণি সাড়া দেয়, 'কী বলছ?'

'আপনের নাম কী?'

'বিনু—বিনয়কুমার বসু।'

'বড় বাহারের নাম।' বছির বলতে থাকে, 'কিষাণগো কাম আপনের ভাল লাগে?'

বিনু ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

'আমাগো লগে ধান কাটবেন?'

বিনু উত্তর দেবার আগেই ওধার থেকে বুড়ো খলিল বলে ওঠে, 'কী যে ক'স বছিরা, বাবুগো পোলায় ধান কাটব কোন দুঃখে? লেখাপড়া শিখা দারোগা হইব, ম্যাজিস্টর হইব।'

বছির বলে, 'আমি তামসা করলাম স্যান—'

এমনি টুকরো টুকরো কথা। কথায় কথায় শীতের রাত ঘন হতে থাকে। উত্তুরে বাতাস বাগানের গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে শনশনিয়ে ছুটে যায়। কোথায় যেন কালাবাদুড় ডানা ঝাপটায়, রাতজাগা পাখিরা গাঢ় গলায় খুনসুটি করে। ভারি কুয়াশা জমে জমে চারদিক ঝাপসা হয়ে যায়।

হঠাৎ একসময় খেয়াল হতে ব্যস্তভাবে কেউ বলে ওঠে, 'রাইত মেলা হইল, আর কত গপ করবি? ভাত বসাইতে হইব না?'

সবাই চকিত হয়ে উঠে পড়ে।

ওদিকে ভেতর-বাড়ি থেকে স্নেহলতার গলা ভেসে আসে, 'বিনু—বিনু, খাবি আয়—'

লাফ দিয়ে উত্তর কি দক্ষিণের ঘর থেকে বেরিয়ে বিনু ছুট লাগায়।

শুধু হেমনাথের জমিতেই না, চকের পর চক জুড়ে এখন ধানকাটা চলেছে। শীতের নিস্তেজ রোদেও কৃষাণদের হাতের কাস্তেগুলো ঝকমক করতে থাকে।

হেমনাথের জমির পশ্চিমে রামকেশবের জমি, উত্তরে লারমোরের। ধানকাটা তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে লারমোর আর রামকেশব গল্প করতে আসেন।

রামকেশব বলেন, 'এইবার ফলন বেশ ভাল।'

হেমনাথ আর লারমোর মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ—'

'আমার পঞ্চাশ কানি জমিতে কম করে পাঁচ শ মণ ধান উঠবে।'

হেমনাথ বলেন, 'অত ধান নিয়ে কী করবি ?'

রামকেশব বলেন, 'বছরের খোরাকি রেখে বাকিটা বেচে দেব।'

'আমারও তাই ইচ্ছে। তা দরটর কেমন শুনছিস ?'

'দর বেশ তেজী। সেদিন নিত্য দাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বলল।'

'বাজার তেজী থাকলে ভালই। দুটো পয়সা হাতে আসবে।' হেমনাথ বলতে থাকেন, 'তবে একটা কথা।'

'কী ?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকান রামকেশব।

'আমাদের তো সুবিধেই। কিন্তু যাদের জমিজমা নেই, শরীরের খাটুনিই ভরসা, তারা খুব মুশকিলে পড়ে যাবে।'

একটু নীরবতা।

এক সময় হেমনাথ বলেন, 'যা হবার তা হবে। তারপর লালমোহন—'

'বল—' লারমোর মুখ তুলে তাকান।

'খুব তো ধানখেতে এসে বসে আছ, তোমার রুগীরা ছাড়লে ? হাটে যাচ্ছ না আজকাল ?'

হেমনাথের কোনো নেশা নেই। চা-পান-বিড়ি-সিগারেট কিছুই খান না। রামকেশবও তা-ই। লারমোরের কিন্তু নেশার জিনিসটা হাতে পেলে ছাড়াছাড়ি নেই। পেলেন তো দিনে দশবার চা-ই খেলেন, বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি শেষ করলেন। না পেলেন তো বছরখানেক কিছুই খেলেন না।

আলে কৃষাণদের হুঁকো-কল্কে-তামাক, সব কিছু মজুদ থাকে। পরিপাটি করে এক ছিলিম তামাক সেজে আয়েস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লারমোর বলেন, 'ধানকাটার জন্যে ক'দিন রুগীদের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছি। বলেছি, তেমন জরুরি কেস থাকলে গীর্জায় আসে যেন। বুঝতেই তো পারছ, এই সময়টা ধান-টান ঠিকমত তুলতে না পারলে সারা বছর না খেয়ে থাকতে হবে।'

হেমনাথ হাসেন, 'ত্যাগব্রতী হলে কি হবে, আসল ব্যাপারে টনটনে—'

লারমোর জোরে জোরে মাঠ কাঁপিয়ে হাসতে থাকেন, 'যা বলেছ।'

ধানকাটার মধ্যেই একদিন সময় করে নিলেন হেমনাথ। বললেন, 'আজ বিনুদাদা আর আমি মাঠে যাব না, কৃষাণদের নিয়ে অবনী একলা যাবে।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'আপনার কোনো কাজ আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী ?'

'আজ বিনুদাদাকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাব।'

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেছে, এমনভাবে অবনীমোহন বললেন, 'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

হেমনাথ বললেন, 'তুমি মাঠে গিয়ে একা অতগুলো লোককে সামলাতে পারবে তো ?'

'পারব।'

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর হেমনাথের সঙ্গে স্কুলে রওনা হল বিনু। স্টিমারঘাটা, বরফকল, মাছের

আড়ত পেরিয়ে ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসের গায়ে স্কুলবাড়িটা। নাম রাজদিয়া হাই স্কুল।

স্কুল বাড়িটাকে ঘিরে কোনো বিস্ময় নেই। টিনের চাল আর কাঁচা বাঁশের বেড়া লাগানো অসংখ্য ঘর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। সামনের দিকে প্রকাণ্ড মাঠ, সবুজ সতেজ ঘাসে ছেয়ে আছে। মাঠটার দু'ধারে বাঁশের গোলপোস্ট।

রাজদিয়ার এ প্রান্তে কতবার এসেছে বিনু, যাতায়াতের পথে দূর থেকে স্কুল-বাড়িটাকে দেখেছে। ভেতরে অবশ্য যায়নি।

আজ হেমনাথের সঙ্গে সামনের মাঠখানা পেরিয়ে স্কুলের দিকে যেতে যেতে বুকের মধ্যেটা কেন যেন দুরু দুরু করতে লাগল বিনুর। হঠাৎ সে ডেকে উঠল, 'দাদু—'

'কি রে—' হেমনাথ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

'ভর্তি হতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে, না?'

'নিশ্চয়ই দিতে হবে।'

বিনু কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার চোখমুখ দেখে কিছু অনুমান করলেন হেমনাথ। বললেন, 'আর কিছু বলবি?'

'হুঁ—'

'কী?'

খানিক ইতস্তত করে বিনু বলল, 'হেডমাস্টার মশায়কে তুমি চেনো?'

হেমনাথ বললেন, 'চিনব না কেন?'

'তুমি তাঁকে একটু বলবে—'

'কী বলব?'

'আমার পরীক্ষা যেন না নেন—'

পূর্ণ দৃষ্টিতে হেমনাথ বিনুকে দেখলেন। তারপর খুব গম্ভীর গলায় বললেন, 'না, তা বলতে পারব না। ভর্তি হতে হলে পরীক্ষা দিতেই হবে।'

বিনু চমকে উঠল। আশ্বিনের শুরুতে রাজদিয়া এসেছে তারা; এখন পৌষ মাস। হেমনাথের এমন কণ্ঠস্বর আগে আর কখনও শোনেনি সে।

সামনের মাঠখানা পার হয়ে স্কুলবাড়ির বারান্দায় উঠলেন হেমনাথরা। লম্বা মাটির বারান্দা, তার শেষ প্রান্তে হেডমাস্টারের ঘর। সেখানে উঁচু টুলের ওপর দপ্তরী জাতীয় একটা লোক বসে আছে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এই সময়টা স্কুল বন্ধ, ক্লাসঘরগুলোতে তালা লাগানো রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে যাবার কথা। খুব সম্ভব রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। ইংরেজি নতুন বছর না পড়লে নতুন করে ক্লাস শুরু হবে না। সারা বছর একটানা খাটুনির পর ক্লান্ত স্কুলবাড়িটার গায়ে এখন ছুটি আর আলসেমির আমেজ লেগেছে।

দূর থেকেই হেমনাথ চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'এই উপেন—'

টুলের ওপর থেকে দপ্তরীটা চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আইজ্ঞা—'

'হেডমাস্টার আছে রে?'

উপেন বলল, 'আছেন—'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে এসেছিলেন হেমনাথ। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে পর্দা ঠেলে হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকলেন।

ঘরখানা প্রকান্ড। চারদিকে সারি সারি কাচের আলমারি, তার ভেতর শুধু বই আর বই। আলমারিগুলোর মাথায় গ্লোব, ডাস্টার, ঝাড়ন, চকের বাক্স এবং আরো অসংখ্য জিনিস সাজানো। দেয়ালে দেয়ালে মহাপুরুষদের ছবি। গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক, বিদ্যাসাগর— এমনি অসংখ্য। তাঁদের কাউকে কাউকে চেনে বিনু, অনেকেই অচেনা।

রবীন্দ্রনাথের ছবিটার তলায় একটা গোলাকার বড় ঘড়ি। তার তলায় মস্ত একখানা টেবিল। টেবিলটার এধারে অনেকগুলো কাঠের চেয়ার। ওধারে একটি মাত্র চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়েস ষাটের কাছাকাছি। পরনে মোটা খদ্দরের ধবধবে পাজামা এবং পাঞ্জাবি। চোখে পুরু লেন্সের গোল চশমা।

ভদ্রলোকের গায়ের রং টকটকে, ধারাল নাক, তীক্ষ্ণ চিবুক। দীর্ঘ চোখ দু'টি অত্যন্ত সজীব, দূরভেদী। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথাটা কিন্তু একেবারেই সাদা, একটি কালো চুলও সেখানে খুঁজে বার করা যাবে কিনা সন্দেহ। এই বয়সেও মেরুদন্ড আশ্চর্য ঋজু, চামড়ায় তেমন ভাঁজ পড়েনি।

ঘরে আর কেউ ছিল না। বিনু বুঝতে পারল, ইনিই হেডমাস্টার। তার বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল।

হেমনাথকে দেখে হেডমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। একটু অবাক হয়ে বললেন, 'হেমদাদা যে—'

হেমনাথ হাসলেন, 'হ্যাঁ, আমিই—'

হেডমাস্টার বললেন, 'আপনি হঠাৎ স্কুলে!'

'সাধে কি আর এলাম রে, দরকারে আসতে হল। তারপর কেমন আছিস মোতাহার?'

'ঐ একরকম। আপনি?'

'খুব ভাল। কখনও আমি খারাপ থাকি?'

'তা বটে।' হেডমাস্টার অর্থাৎ মোতাহার সাহেব হাসলেন, 'কতকাল আপনাকে দেখছি। খারাপ আছেন, এমন কথা কক্ষণো শুনিনি।' বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এ কি হেমদাদা, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন— বসুন—'

হেমনাথ বসলে মোতাহার সাহেব বসলেন। বিনুও নিঃশব্দে দাদুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'ব্যাপার কী রে? স্কুলে ছুটি, তুই একা একা এখানে কী করছিলি?'

'নতুন বছরের বুক লিস্টটা এখনও তৈরি হয়নি, তাই করছিলাম।'

'স্কুল কতদিন বন্ধ থাকবে?'

'জানুয়ারির দু' তারিখ পর্যন্ত।'

'তারপর অন্য সব খবর টবর কী?'

'কোন খবর জানতে চান, বলুন—'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'তোর খবর তো মোটে দুটো। এক কংগ্রেস আর এই স্কুল।'

মোতাহার সাহেব কিছু বললেন না, চশমার কাচ মুছে গভীর দৃষ্টিতে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

হেমনাথ থামেননি, 'বিয়ে করলি না, সাদি করলি না, ঘর নেই, সংসার নেই। চিরটা কাল স্কুল আর কংগ্রেস নিয়েই থাকলি।'

মৃদু গলায় মোতাহার সাহেব বললেন, 'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। সত্যি বলছি হেমদাদা, স্কুল আর কংগ্রেস ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতেই পারি না।' বলে হাসলেন।

হেমনাথ বললেন, 'অনেক দিন তোর কাছে আসা হয়নি, তা স্কুলে কেমন চলছে?'

'ভালই। তবে—'

'কী?'

'আমার বড় ইচ্ছা স্কুলবাড়িটা পাকা হোক—'

মোতাহার সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'এক শ' বার হওয়া উচিত। দু চার বছর পর পর বর্ষায় কঁ্যাচা বাঁশের বেড়া নষ্ট হয়ে যায়, মাটির ভিত যায় ধসে। সে সব কতবার তো পালটালি। বার বার কামলা লাগিয়ে খরচও তো কম হয় না।'

'খরচ বলে খরচ! স্কুলের কত আর আয় বলুন। বেশির ভাগ ছেলেই তো ফ্রি, হাফ ফ্রি-তে পড়ছে—'

হেমনাথ বললেন, 'একবার একটু কষ্ট করে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে পারলে সব দিক থেকেই ভাল।'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'কিন্তু টাকা পাব কোথায়? আপনি তো জানেন, গভর্ণমেন্ট থেকে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না।'

'কেন যাবে শুনি? সারা গায়ে কংগ্রেসের গন্ধ মাখিয়ে রেখেছিস, ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিস। আর ওরা দেবে টাকা!'

হাসতে হাসতে মোতাহার সাহেব বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, দু-একদিনের ভেতর আপনার কাছে যাব।'

পাকা ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'আমার কাছে কেন?'

'আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে যেতে পারি?'

'আমি বুঝি তোর স্কুলের জন্যে টাকার থলে নিয়ে বসে আছি?'

'তা জানি না।'

'তবে কী জানো শুনি?'

মোতাহার সাহেব গভীর গলায় বললেন, 'একটা কথাই জানি। তা হল, রাজদিয়ার হেমনাথ মিত্রের কাছে কোনো শুভ কাজের আর্জি নিয়ে গেলে কেউ কখনও বিমুখ হয়ে ফেরে না।'

হেমনাথ বললেন, 'আমাকে তোরা কল্পতরু পেয়েছিস নাকি?'

'পেয়েছিই তো।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে মোতাহার সাহেব বললেন, 'কী?'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'স্কুল বিল্ডিং করে দেবার মতন অত টাকা তো আমার নেই। অবশ্য একটা কাজ করা যেতে পারে—'

'কী কাজ?

'সবার কাছ থেকে টাকা তোলা। যার যেমন সাধ্য সে তেমন দেবে। মোট কথা একটা ফান্ড খোলা দরকার।'

'সে আপনি যা ভাল বোঝেন—'

'তুই কবে আমার বাড়ি যাচ্ছিস?'

'কবে যেতে বলেন?'

'যেদিন তোর খুশি—'

'পরশু সকালে যাব।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরবতা।

তারপর মোতাহার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'যাক, আমার দুর্ভাবনা কাটল। স্কুলবাড়ি এবার হয়ে যাবেই।

হেমনাথ হাসলেন, 'স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমার ভালই লাভ হল দেখছি। তারপর

তোর কংগ্রেসের খবর কী?'

নিমেষে হাসি থেমে গেল। কপালে অসংখ্য রেখা ফুটল মোতাহার সাহেবের। গম্ভীর গলায় বললেন, 'খুবই সাঙ্ঘাতিক। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে ছোট-বড় সব নেতাই অ্যারেস্টেড, সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেছে।'

'দেখেছি। তোর কী মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয়, ভেতরে ভেতরে ইংরেজরা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভেতরে যত কাবু হচ্ছে, বাইরে অত্যাচার ততই বেড়ে চলেছে।'

'তুই তো এখানকার কংগ্রেসের সেক্রেটারি। তোকে কি অ্যারেস্ট করবে?'

'বুঝতে পারছি না। তবে—'

'কী?'

'গেল সপ্তাহে দু-তিন বার পুলিশ এসেছিল।'

হেমনাথ বললেন, 'এখানে কি সত্যাগ্রহ শুরু করবি?'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'এখনও কিছু ঠিক করিনি। আরো কয়েকদিন দেখি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমনাথ এবার শুধোলেন, 'যুদ্ধের হালচাল কেমন বুঝছিস মোতাহার?'

'খুব খারাপ। মিত্রশক্তি চারদিকেই মার খাচ্ছে। ইওরোপ আফ্রিকার কথা থাক, ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের অবস্থাও ভাল না। আমার ধারণা কলকাতায় যে কোনোদিন বোমা পড়তে পারে। কলকাতায় বোমা পড়া মানে সারা বাংলাদেশ তোলপাড় হওয়া। কী যে হবে!'

'সেদিন কাগজে পড়লাম, কলকাতায় ব্ল্যাক-আউটের মহড়া চলছে। এয়ার রেডের সব রকম প্রিকশানও নেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মোতাহার সাহেব।

হেমনাথ বললেন, 'তোর কী ধারণা, এ যুদ্ধে ইংরেজরা হারবে?'

'বলা মুশকিল। হারুক জিতুক, আমি একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।'

'কী?'

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা খুব বেশি দূরে নেই।'

'হঠাৎ তোর এ ধারণা হল?'

মোতাহার সাহেব থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'হিটলারের বোমা খেয়ে খেয়ে ইংল্যান্ডের আর কিছু নেই। যতই ওরা গলা ফাটাক 'আমাদের কিছু হয়নি,' লোক তা বিশ্বাস করে না। আমরা তো আর ঘাস খাই না, আসল ব্যাপারখানা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি। যুদ্ধ থেমে গেলে ইংল্যান্ডে রিকনস্ট্রাকশনের প্রশ্ন দেখা দেবে। তখন নতুন করে পোড়া ঘর তুলবে, না এতদূরে ইন্ডিয়ার কলোনি সামলাবে? অবশ্য—'

'কী?

'এই হচ্ছে সব চাইতে বড় সুযোগ। আমাদের তা হাতছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়। একবার যদি এ সুযোগ আমাদের হাতের বাইরে চলে যেতে দিই, পরে আপসোস করেও কূলকিনারা পাব না।'

হেমনাথ বললেন, 'সুযোগ বলতে?'

মোতাহার সাহেব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। ইংরেজ এখন যুদ্ধ নিয়ে অস্থির হয়ে আছে। ইওরোপে-এশিয়ায়-আফ্রিকায়, যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু বারুদের গন্ধ। এ সময় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যদি একটা আন্দোলন করা যেত।

হেমনাথ বললেন, 'তোর কি ধারণা, শিগগিরই কোনো মুভমেন্ট শুরু হবে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। এ সময় যদি মুভমেন্ট না করা যায় তবে আর কবে হবে? দেখা

যাক, নেতারা কী করতে বলেন—'

হেমনাথ এবার আর কিছু বললেন না। তাঁর পাশে বসে দাদু আর মোতাহার সাহেবের কথা শুনছিল বিনু। অল্পস্বল্প বুঝতে পারছিল সে, তবে বেশির ভাগই অবোধ্য।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মৃদু হেসে মোতাহার সাহেব বললেন, 'দেশের কথা, কংগ্রেসের কথা এখন থাক। তখন কী একটা দরকারের কথা বলছিলেন যেন—' বলতে বলতে হঠাৎ বিনুর দিকে নজর পড়ল, 'ছেলেটি কে হেমদাদা ?'

'আমার নাতি।'

'কিরকম নাতি ?'

কিরকম হেমনাথ বুঝিয়ে দিলেন।

মোতাহার সাহেব বললেন, 'শুনেছিলাম বটে, কলকাতা থেকে আপনার আত্মীয়-স্বজন এসেছে। তা হলে এরাই ?'

'হ্যাঁ।'

'এবার বলুন দরকারটা কী।'

বিনুকে দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'দরকারটা এর জন্যেই। ওকে তোর স্কুলে ভর্তি করতে এসেছি।'

মোতাহার সাহেব ঈষৎ অবাক হলেন, 'ভর্তি করতে এসেছেন মানে! ওরা কি এখানে থাকবে ?'

'হ্যাঁ।

'কলকাতা ছেড়ে এই গ্রামে থাকতে ভাল লাগবে !'

'ওর বাবার খেয়াল। কলকাতায় ব্যবসা-ট্যবসা ছিল। সব তুলে দিয়ে এখানে জমিজমা কিনেছে। ইস্টবেঙ্গল নাকি ওর খুব ভাল লেগেছে।'

'খুব ইন্টারেস্টিং তো।' মোতাহার সাহেব কৌতূহলের গলায় বললেন, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আলাপ করতে হয়।'

হেমনাথ বললেন, 'পরশু আমাদের বাড়ি যাচ্ছিস তো, তখন আলাপ করিয়ে দেব'খন।'

'আচ্ছা। কিন্তু হেমদাদা—'

'কী বলছিস ?'

'সামান্য একটা ভর্তির জন্যে আপনি আবার কষ্ট করে নিজে এসেছেন কেন ? এখন তো স্কুল বন্ধ। জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন, ভর্তি করে নেব।'

'উঁহু—' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগলেন হেমনাথ, 'আমার খাতিরে এমনি এমনি ভর্তি করলে চলবে না। যে ক্লাসে ভর্তি হবে তার যোগ্য কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে।'

স্থির চোখে হেমনাথকে দেখলেন মোতাহার সাহেব। তারপর অসীম সম্ভ্রমের সুরে বললেন, 'পরীক্ষা করে নেবার কথা কোনো অভিভাবকই বলে না। আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা দশগুণ বেড়ে গেল হেমদাদা। আপনি যখন চাইছেন, পরীক্ষা আমি নেব।'

'আজ যখন এসে পড়েছি, আজই নিয়ে নে। পরে না হয় মাইনেপত্তর দিয়ে ফি-বুক, বুকলিস্ট নিয়ে যাবে।'

মোতাহার সাহেব অদ্ভুত হাসলেন।

হেমনাথ শুধোলেন, 'হাসলি যে ?'

'আমাকে বুঝি আপনার বিশ্বাস নেই ? পাছে অন্য কারো সঙ্গে পাঠালে পরীক্ষা না নিই তাই এখনই নিতে বলছেন।'

বিব্রতভাবে হেমনাথ বললেন, 'না, ঠিক তা নয়।'

হাসতে হাসেতেই মোতাহার সাহেব বললেন, 'বেশ বেশ, আপনার যখন এতই অবিশ্বাস তখন পরীক্ষাটা নিয়ে নিচ্ছি।'

দাদুর উপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল বিনুর। হেডমাস্টারমশাই যেখানে এমনিতেই ভর্তি করে নিতে চাইছেন সেখানে দাদু 'পরীক্ষা' 'পরীক্ষা' করে অস্থির হয়ে উঠেছেন। শুধু রাগই না, তার সঙ্গে অভিমানও মিশল।

চোখে প্রায় জলই এসে যাচ্ছিল বিনুর, সেই সময় মোতাহার সাহেবের গলা শোনা গেল, 'তোমার নাম কী?'

বিনু চমকে উঠল। বুকের ভেতরটা ভয়ানক দুলতে লাগল তার। কাঁপা গলায় বলল, 'বিনয়কুমার বসু—'

'বাবার নাম?'

'অবনীমোহন বসু—'

চোখ কুঁচকে মোতাহার সাহেব বলেন, 'শুধু অবনীমোহন বসু? বাবার নামের আগে একটা শ্রীযুক্ত বসাতে হয় তাও জানো না?'

মুখ নিচু করে বসে রইল বিনু।

'কলকাতায় কোন স্কুলে পড়তে?'

'সাউথ সাবারবনে—'

'কোন ক্লাস ছিল?'

'সেভেন।'

'তার মানে এইটে ভর্তি হবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।

'আচ্ছা, ঐ ছবিটা কার বল তো?'

চোখ তুলতেই বিনু দেখতে পেল, মোতাহার সাহেব ডানদিকের দেয়ালে একটা ছবির দিকে আঙুল নির্দেশ করেছেন।

ছবির মানুষটিকে বিনু চিনত। বলল, 'উনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'

'গুড—' বলেই আরেকটা ছবি দেখালেন মোতাহার সাহেব, 'উনি?'

'লালা লাজপত রায়।'

'আচ্ছা বলতে পার, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কবে হয়েছিল?'

ভাগ্য ভাল, উত্তরটা জানা ছিল বিনুর। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, '১৯০৫-এ—'

'ভেরি গুড—'

নিঃশব্দে বসে ছিলেন হেমনাথ। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এ সব কী পরীক্ষা রে মোতাহার?'

'এগুলোই তো আসল পরীক্ষা দাদা—' মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন,'দেশের ছেলে দেশের সত্যিকার খবর রাখে কিনা সেটা জানা দরকার।'

'একটু পড়াশোনার কথাও জিজ্ঞেস কর—'

'নিশ্চয়ই করব।'

গোটা পাঁচেক ট্রানস্লেশন ধরলেন মোতাহার সাহেব, বিনু তিনটে পারল। অ্যালজেব্রার ফরমুলাগুলো ঠিক ঠিক বলল। বাংলা ব্যাকরণের উত্তরগুলোও নির্ভুল হল।

পরীক্ষা হয়ে যাবার পর মোতাহার সাহেব বললেন, 'বিনয়বাবু আমাদের বেশ ভাল ছেলে। স্কুল খুললে রোজ ক্লাস করবে, বুঝলে ? একদিনও ফাঁকি দেবে না।'

'আজ্ঞে না—' বিনু আধফোটা গলায় বলল, তারপর মাথা হেলাল।

হেমনাথ বললেন, 'ক্লাস এইটে ও পারবে তো?'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবে। দেখবেন, স্ট্যান্ড করবে।'

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর হেমনাথ বললেন, 'এবার তা হলে উঠি—'

'এখনই উঠবেন?'

'হ্যাঁ, ধানকাটা চলছে। একবার মাঠে যাওয়া দরকার।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন হেমনাথ। তারপর হঠাৎই যেন কথাটা মনে পড়ে গেল। বিনুর দিকে ফিরে বললেন, 'মাস্টারমশাইকে প্রণাম কর।'

মোতাহার সাহেবকে প্রণাম করে বিনু যখন উঠে দাঁড়াল, হেমনাথ আবার বললেন, 'এঁকে আজ প্রথম দেখলে, ভবিষ্যতে অনেক বার দেখবে। জীবনে এই মানুষটির মতন হবার চেষ্টা কোরো।'
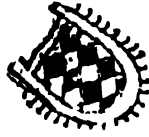
ধানকাটার মধ্যে সময় করে একে একে সুধা, সুনীতি এবং ঝিনুককেও ভর্তি করে দিলেন হেমনাথ। সুধা-সুনীতিকে কলেজে, ঝিনুককে মেয়েদের স্কুলে।

স্থির হয়েছে, আপাতত ঝিনুক এই বাড়িতেই থেকে যাবে, এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে। পরে যা-হয় ভেবে ঠিক করা যাবে। ভবতোষও এতে রাজি হয়েছেন। না হয়ে উপায়ই বা কী? তাঁর কলেজ খুলে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে ঝিনুককে কার কাছে রাখবেন? কে তাকে দেখবে। সব দিক বিবেচনা করে এই ব্যবস্থাই ভবতোষের ভাল মনে হয়েছে।

সবাই ভর্তি টর্তি হয়ে যাবার দিনকয়েক পর এক সন্ধেবেলায় লারমোর এসে হাজির। এ বাড়িতে তাঁর অনিয়মিত যাতায়াত নিয়ে স্নেহলতার অভিমান আছে। অবশ্য সে অভিমানের ভেতর অভিযোগ নেই, স্নিগ্ধ কৌতুকের আভায় তা ঝলমলে।

অনেক দিন পর লারমোর আজ এ বাড়ি এলেন। দীর্ঘকাল না আসার জন্য যথারীতি অনুযোগ করলেন স্নেহলতা, ঠাট্টা-টাট্টাও করলেন।

হাতজোড় করে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে লারমোর বললেন, 'এইবার—এইবারটা শুধু ক্ষমা করে দিন বৌ ঠাকরুন। ক'দিন পর থেকে দেখবেন, রোজ আসছি।'

লারমোরের সারল্য, কাঁচুমাচু মুখভঙ্গি, করুণ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—সব মিলিয়ে এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করে যাতে না হেসে কেউ পারে না। আজও সবাই হাসল। স্নেহলতা কিন্তু হাসলেন না। তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটিতে লারমোরকে বিদ্ধ করতে করতে বললেন, 'যেদিন থেকে সাহেব তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে সেদিন থেকেই তো ঐ কথা শুনে আসছি। তা প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল।'

'যা হবার হয়ে গেছে। এবার থেকে আমি সুবোধ বালক হয়ে যাব।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'কতবার তো প্রতিজ্ঞা করা হল! সে যাকগে, এতদিন পর কোত্থেকে উদয় হলেন? করছিলেন কী?'

'রুগী-টুগী ছিল। তার ওপর ধান উঠছে। নানা ঝঞ্ঝাটে আর আসা হচ্ছিল না।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'আজ হঠাৎ কী মনে করে?'

লারমোর একটু যেন অবাকই হলেন, আহতও। বললেন, 'বারে, সব ভুলে গেছেন!'

তবু মনে করতে পারলেন না স্নেহলতা। অপ্রস্তুত মুখে বললেন, 'কী বলুন তো?'

হেমনাথ খানিক দূরে বসে ছিলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "পরশু পঁচিশে ডিসেম্বর, বড়দিন। তাই না?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়ে দিলেন লারমোর।

স্নেহলতা লজ্জিত, বিব্রত। বললেন, 'সত্যি, আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। মন আজকাল যে কি বেভুলো হয়ে যাচ্ছে!'

হেমনাথ বললেন, 'বড়দিনের নেমন্তন্ন করতে এসেছ বুঝি লালমোহন?'

লারমোর বললেন, 'হ্যাঁ। পরশু আমার ওখানে সবাই যাবে।'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'গীর্জা পরিষ্কার-টরিষ্কার করিয়েছ? চারধার যা নোংরা করে রেখেছিলে।'

'না। কোথায় আর করানো হল!' লারমোর বলতে লাগলেন, 'ধানকাটা শুরু হয়ে গেল, তাই নিয়ে মেতে উঠলাম।'

'চমৎকার!' হেমনাথ অত্যন্ত রেগে গেলেন, 'পরশু বড়দিন, এখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ! গীর্জা ধোয়ামোছা মাজা-ঘষা হবে কবে?'

'কাল সকালবেলা তুমি যদি একবার আসো—'

'যেতেই হবে। ভাবছি যুগলকে নিয়ে যাব।'

'তাহলে খুব ভাল হয়, আমার ওখানে পরানের মা আছে। সবাই হাত লাগালে কতক্ষণ আর লাগবে?'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'যা দেখছি, গীর্জা সাফটাফ করে সাজিয়ে-গুজিয়ে কাল আর আমার ফেরা হবে না।'

'কাল তোমাকে ফিরতে দিচ্ছে কে? তুমি ফিরবে পরশু বিকেলে।'

বলতে বলতে লারমোরের হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'ভাল কথা—'

'কী?'

'আমরা না-হয় পরিষ্কার-টরিষ্কার করব। গীর্জা সাজানোর ভার সুধাদিদি সুনীতিদিদিকে দিলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল, খুব ভাল—'

'তা হলে কাল বিকেলে সুধা-সুনীতিকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বাকি সবাই পরশু যাবে।'

'আচ্ছা।'

একধারে বসে বসে চুপচাপ সবার কথা শুনে যাচ্ছিল বিনু। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'কাল সকালে দাদুর সঙ্গে আমিও যাব।'

সুরমা ওধার থেকে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না। কাজের মধ্যে গিয়ে তোমাকে আর ঝঞ্ঝাট করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে তুমি পরশু যাবে।'

বিনুর মুখখানা কালো হয়ে গেল।

লারমোর বিনুকে লক্ষ করছিলেন। সস্নেহ গলায় বললেন, 'না না, পরশু নয়, কালই তুমি যাবে।'

ঝিনুক এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। বিনুর যাবার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে দেখে হিংসুটি মেয়েটা আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। কান্নার মত সরু গলায় হঠাৎ বায়না জুড়ে দিল, 'বিনুদাদা গেলে আমি যাব, আমি যাব।'

অত্যন্ত বিরক্ত চোখে বিনু ঝিনুকের দিকে তাকাল। মেয়েটা তার পেছনে সব সময় প্রায় জোঁকের মতন লেগে আছে।

লারমোর বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবি। নিশ্চয়ই যাবি।'

সুধা সুনীতিও এ ঘরেই ছিল। সুধা হঠাৎ বলল, 'বড়দিনে আমাদের ক্রিসমাস কেক খাওয়াবেন তো লালমোহন দাদু?'

লারমোর হাসলেন, 'এই গ্রামদেশে কেক কোথায় পাব দিদি? তবে—'

'কী?'

'চমচম খাওয়াব, পাতক্ষীর খাওয়াব, রসগোল্লা খাওয়াব। দেখব, কে কত খেতে পারিস।'

সুধা কিন্তু খুঁতখুঁত করতে লাগল, 'বড়দিনে কেক না হলে ভাল লাগে না।'

পরের দিন ভোরবেলা ফিটন পাঠিয়ে দিলেন লারমোর।

ধানকাটা এখনও চলেছে। একশ' কানি জমির ফসল তো অল্পস্বল্প ব্যাপার না যে মুখের কথা খসলেই খেত থেকে উঠে এল।

ঠিক হল, কৃষাণদের সঙ্গে জমিতে গিয়ে অবনীমোহন আজকের দিনটা ধানকাটা তদারক করবেন। কাল ভোরবেলা যুগল ফিরে আসবে। যুগল ফিরলে অবনীমোহন বাড়ির বাকি সবাইকে নিয়ে গীর্জায় যাবেন। কালকের দিনটার ধানকাটা দেখাশোনার ভার থাকবে যুগলের ওপর।

এত ভোরে রোদ ওঠেনি। কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। পৌষের হাওয়া এত ঠাণ্ডা, মনে হয় বরফের দেশ থেকে ছুটে আসছে। ভেজা মাটির থেকে এমন হিম উঠছে যে পা ফেলা যায় না।

সারা গায়ে গরম জামা-কাপড়, তবু শীত কাটে না। হি-হি কাঁপতে কাঁপতে বিনু, ঝিনুক, হেমনাথ এবং যুগলের সঙ্গে ফিটনে গিয়ে উঠল।

গীর্জায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে রোদ উঠে গেল। শীতের রোদ—নিস্তেজ, উত্তাপহীন। তবু তো রোদ। পকেট থেকে হাত বার করে সিঁটনো আঙুলগুলো সেঁকে নিতে লাগল বিনু।

গীর্জায় এসে এক মুহূর্তও বসলেন না হেমনাথ। যুগল আর লারমোরকে সঙ্গে নিয়ে ঝাড়পোঁছ শুরু করে দিলেন। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে সারাদিন ধোয়ামোছা চলতে লাগল।

বিকেলে সুধা-সুনীতি এল। ততক্ষণে ঘষে-মেজে গীর্জাকে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সুধারা আসতে না আসতেই বিনুকে সঙ্গে নিয়ে যুগল বেরিয়ে পড়ল। ঘুরে ঘুরে রাজ্যের ফুল, লতা-পাতা যোগাড় করে গীর্জার সামনে স্তূপাকার করল। নদীপারের মনিহারি দোকান থেকে লাল-নীল-সবুজ নানা রঙের কাগজ কিনে আনল।

লারমোর বললেন, 'সুধাদিদি সুনীতিদিদি, আর কী লাগবে বল—'

সুধা-সুনীতি একসঙ্গে বলল, 'আর কিছু না।'

'এবার তা হলে সাজাতে শুরু কর।'

দু'বোন কোমর বেঁধে লেগে গেল। ফুল, লতাপাতায় চমৎকার নকশা করে গেট সাজাল, তিন-চারটে তোরণ বানাল। লাল-নীল কাগজ কেটে অসংখ্য শিকলি বানিয়ে চারদিকে টাঙিয়ে দিল। দেয়ালে আর মেজেতে আলপনা আঁকল অনেক। একটা ক্রিসমাস-ট্রি বানাল, তার তলায় কাগজ-টাগজ দিয়ে বুড়ো সান্তাক্লজ তৈরি করে দাঁড় করিয়ে দিল। সব চাইতে সুন্দর করে সাজাল যিশুখৃস্টের ছবিখানা। অবশ্য যুগল-লারমোর-বিনু-ঝিনুক, যার যেমন সাধ্য সুধা-সুনীতিকে সাহায্য করেছে।

রাত পোহালেই বড়দিন। কোথায় কত শতাব্দী আগে বেথেলহেমের আকাশে উজ্জ্বল তারাটি দেখা দিয়েছিল। তারপর এই ধূলিধূসর মর্ত্যে আবির্ভাব হয়েছিল মানবপুত্রের। আপন রক্তে এই রিপুতাড়িত জগৎকে তিনি শুদ্ধ করে গেছেন।

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষটিকে কৃতজ্ঞ মানুষ আজও ভোলেনি। বহু শতাব্দী পরও বসুন্ধরার এক প্রান্তে রাজদিয়া নামে এক অখ্যাত নগণ্য জনপদে তাঁর পুণ্য জন্মদিন স্মরণ করে তারা ধন্য হচ্ছে।

লারমোর ঘুরছেন, ফিরছেন আর সুসজ্জিত গীর্জা বাড়িটাকে দেখছেন, যিশুর ছবিখানা দেখছেন। দেখে দেখে সাধ যেন তাঁর মেটে না।

দেখেন আর ঘন আবেগের গলায় লারমোর বলেন, 'চল্লিশ বছর ধরে রাজদিয়ায় আছি। সব বছরই তো বড়দিনের উৎসব হয়। কিন্তু কোনো বার এমন করে গীর্জাবাড়ি সাজাতে পারিনি। ভাগ্যিস সুধাদিদি সুনীতিদিদিরা রাজদিয়া এসেছিল। কি আনন্দ যে হচ্ছে!'

ক'ঘণ্টা পরেই বড়দিন। গীর্জার চারধারে ক'টি মানুষ তার জন্য হৃদয় বিছিয়ে রেখেছে।

গীর্জা সাজাতে সাজাতে অনেক রাত হয়ে গেল। তারপর খেয়ে দেয়ে সবাই শুয়ে পড়ল। কতক্ষণের জন্যই বা শোওয়া! খানিক পরে, তখনও রাতের অন্ধকার রয়েছে, লারমোর উঠে পড়লেন। এমন যে ঘুমকাতুরে বিনু, সেও শুয়ে থাকতে পারল না।

শীতের এই শেষ রাতে চারদিক যখন বরফের মতন ঠান্ডা, পেছনের নদী থেকে লারমোর এবং হেমনাথ স্নান করে এলেন। সুধা-সুনীতিও স্নান করতে চেয়েছিল, হেমনাথ করতে দেননি। অভ্যেস তো নেই। শেষে অসুখ-বিসুখ হয়ে যেতে পারে। দু-একখানা বেশি জামা-কাপড় নিয়ে এসেছিল ওরা। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিল।

এত ঠান্ডায় প্যান্ট-জামা বদলাতে ইচ্ছা করছিল না বিনুর। হেমনাথ বললেন, 'কি ছেলে রে তুই, উৎসবের দিনে কেউ বাসি জামা-টামা পরে থাকে! যা যা, পরিষ্কার জামা-প্যান্ট পরে নে—'

অগত্যা কি আর করা, চটকানো বাসি জামাটামা ছাড়তেই হল বিনুকে। দেখাদেখি ঝিনুকও চট করে ফ্রক বদলে নিল।

এদিকে যিশুর ছবির সামনে অসংখ্য মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছেন লারমোর। একসময় সবাইকে ডেকে পবিত্র শুদ্ধ মনে চোখ বুজে আশ্চর্য সুরেলা গলায় বড়দিনের প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। যিশু-বন্দনার পর বাইবেল থেকে তাঁর প্রিয় ক'টি পদ আবৃত্তি করলেন :

Make a joyful noise
unto the Lord, all ye lambs
Serve the Lord with gladness.
Come before his presence with singing.
Know ye that the Lord he is
God. it is he that hath made us.
And not we ourselves ; we are his
People,and the sheep of his pasture.

আবৃত্তি শেষ হলে অসংখ্য পবিত্র প্যারাবেল শোনালেন লারমোর। ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট থেকে অনেক কথা শোনালেন। যিশুর জন্ম থেকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত পুণ্য জীবনকাহিনী বললেন। বুড়ো সান্তাক্লজের কথা বললেন। হেমনাথ-সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুক সবাই অভিভূত হয়ে শুনতে লাগল।

যিশুভজনা শেষ হতে ভোর হয়ে গেল, ঘন-করে-বোনা কুয়াশার ভারি পর্দাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে রোদ উঠল।

রাত থাকতে থাকতেই যুগল বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। তাকে আবার কৃষাণদের সঙ্গে মাঠে যেতে হবে।

বেলা বাড়লে সুরমা-স্নেহলতাকে নিয়ে অবনীমোহন গীর্জায় এলেন। শিবানী আসেননি, ক'দিন ধরে তাঁর জ্বর। তা ছাড়া সবাই চলে এলে তো হয় না, বাড়ি পাহারা দেবার জন্য এক-আধজন থাকা দরকার।

শুধু হেমনাথদের বাড়ির লোকজনই না, বেলা যত চড়তে লাগল রাজদিয়া এবং দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জ

থেকে কত মানুষ যে আসতে লাগল গীর্জায়! চেনাজানা যাকেই পেয়েছেন তাকেই নেমন্তন্ন করেছেন লারমোর।

যে আসছে তারই হাতে ফল-টল মিষ্টি-টিষ্টি দিচ্ছেন লারমোর, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত গীর্জাবাড়ি দেখাচ্ছেন আর বলছেন, 'কেমন দেখলে বল তো?'

'চোমৎকার! কতকাল ধইরা এই গীর্জায় বড়দিন দেখতে আছি। কিন্তুক এমুন সাজান-গুছান কুনোদিন দেখি নাই।'

'কোত্থেকে দেখবে? আমরা কি সাজাতে-টাজাতে জানতাম?'

'এইবার তাইলে এমুন সোন্দর কইরা সাজাইলেন ক্যামনে?'

'আমরা কি সাজিয়েছি?'

'তয়?'

'আমার নাতনীরা সাজিয়েছে।' বলে সুধা-সুনীতির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে সগর্বে সবাইকে দেখান লারমোর।

সারাদিনই লোক আসছে। একদল যায় তো আর একদল তক্ষুনি এসে পড়ে। জনস্রোতের আর বিরাম নেই। এ তো শুধু খৃস্টানদেরই উৎসব নয়, সমস্ত মানবজাতির কাছেই এক পরম পবিত্র দিন। অন্তত রাজদিয়ার মানুষ এইভাবেই দিনটিকে গ্রহণ করেছে।

লোক আসছে, যাচ্ছে। হেমনাথরা কিন্তু ছাড়া পেলেন না।

বেলা অনেকখানি চড়লে স্নেহলতা একবার বললেন, 'বড়দিনের উৎসব তো মিটল। এবার আমরা বাড়ি যাই?'

তাঁর কথা শেষ না হতেই চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন লারমোর, 'কোথায় মিটল! আজ সারা দিনই বড়দিন।'

'তার মানে কী বলতে চান আপনি?'

কপাল কুঁচকে কপট শঙ্কার গলায় স্নেহলতা বললেন, 'সারা দিন!'

'হ্যাঁ, সারা দিন।' লারমোর ঘাড় হেলিয়ে দিলেন।

সন্ধে পর্যন্ত একটানা গল্পগুজব, খাওয়া দাওয়া, এবং হালকা সুরের ঠাট্টা-টাট্টা চলল। স্নিগ্ধ মনোরম একটি দিন কাটিয়ে অনেক, অনেক রাত্তিরে বিনুরা ফিটনে উঠল। এতক্ষণে বাড়ি ফেরার অনুমতি মিলেছে।

দিনকয়েক পরে এক সকালবেলায় পুবের ঘরের তক্তাপোষে বসে ছিল বিনু। নাকের ডগা এবং চোখদুটো বাদ দিলে গা গরম চাদরে ঢাকা। একটা পুঁটুলির মতন দেখাচ্ছিল তাকে। বাতাস এমন কনকনে যে চাদরের ভেতর থেকে হাত-পা বার করতে ইচ্ছে হয় না।

একটু আগে ঘুম ভেঙেছে বিনুর। স্কুলে ভর্তির সমস্যাটা মিটে যাবার পর আজকাল বই-টই ছুঁচ্ছে না সে। বিনু জানিয়ে দিয়েছে, নতুন বছরে নতুন ক্লাস শুরু না হলে সে আর পড়ছে না।

দাদুর কাছে যদিও সে শোয়, ইদানীং এত ঠান্ডায় ভোরবেলা আর উঠতে চায় না, হেমনাথও টানাটানি করেন না। শীতকালের মাঝামাঝি এই হিমবর্ষী দিনগুলোর জন্য বিনুর সূর্যস্তব স্থগিত আছে।

এখন বেশ বেলা হয়েছে। আকাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে।

জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল বিনু। উঠোনভর্তি এখন শুধু ধান আর ধান, হেমনাথের খেতের ধান—সোনার পাহাড়ের মতন স্তূপাকার হয়ে আছে। উঠোনের পর বাগান, তারপর পুকুর। অঘ্রাণের গোড়াতেই পুকুরের ওপারের মাঠ থেকে জল নেমে গিয়েছিল। এখন ওখানকার মাঠ একেবারে নিঃস্ব। কৃষাণেরা ধান কেটে নিয়ে গেছে। ধানকাটা ফাঁকা মাঠ এখন কেমন যেন ধূসর দেখায়। শস্যকণার খোঁজে ঝাঁকে ঝাঁকে মোহনচূড়া পাখি আর বুলবুলি সেখানে চক্কর দিয়ে ফিরছে। এছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।

হেমনাথ ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, 'কী করছিস বিনুদাদা?'

দূর মাঠের দিকে চোখ রেখেই অন্যমনস্কের মতন বিনু উত্তর দিল, 'বসে আছি।'

কৌতুকের গলায় হেমনাথ এবার বললেন, 'ফাঁকা মাঠের শোভা দেখছিস?' বলে শব্দ করে হাসলেন।

একটু পর পেছন দিকে কিসের আওয়াজ হতে বিনু মুখ ফেরাল। তার চোখে পড়ল, তক্তাপোষের তলা থেকে প্রকাণ্ড স্টিলের বাক্স বার করে খুলে ফেলেছেন হেমনাথ। এবং খুব তন্ময় হয়ে ভেতরে কী সব দেখছেন।

আগেও বারকয়েক এই বাক্সখানা খুলে বিভোর হয়ে হেমনাথকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে বিনু, কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

আজ পৌষ মাসের এই অলস সকালে হঠাৎ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল বিনু। ডাকল, 'দাদু—'

হেমনাথ প্রথমটা শুনতে পাননি। আরো দু-চারবার ডাকাডাকির পর মুখ তুললেন, 'কী বলছিস?'

'বাক্সের ভেতর কী দেখছ?'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই দেখবি?'

বিনুর কৌতূহল ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। বলল, 'হ্যাঁ।'

'আয়—'

জানালার পাশ থেকে উঠে পড়ল বিনু, পায়ে পায়ে হেমনাথের কাছে চলে এল।

বাক্সের ডালাটা পুরোপুরি মেলে ধরলেন হেমনাথ। বললেন, 'দ্যাখ—'

ভেতরে চমৎকার চমৎকার সব জিনিস স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বেতের সাজি, নকশা-করা কাশ্মীরি শালের পাড়, বহুবর্ণময় ময়ূরের পালক, অসংখ্য ছবি, মাটির পুতুল, পট, ডাকের সাজের অগণিত নমুনা, কারুকার্য-করা প্রাচীন কাঁথা, নানারকম রঙচঙে পাথর, মণিপুরী চাদর, মোটা আর্ট পেপারে ঘন কালো কালির অতি সুন্দর হস্তাক্ষর, কাঠের এবং হাড়ের রমণীয় শিল্পকার্য—এমনি কত কী।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'এসব কার দাদু?'

হেমনাথ বললেন, 'আমার। একটা বাক্স দেখলি তো?'

'হ্যাঁ।'

'এই রকম আরো পাঁচ ছ'টা বাক্স আছে। এখন আমার বয়েস পঁয়ষট্টির মতন। কুড়ি পঁচিশ বছর বয়েস থেকে এসব জিনিস জমাচ্ছি। যেখানে যা কিছুই ভাল, যা কিছু সুন্দর চোখে পড়েছে, চেয়ে চিন্তে বা পয়সা দিয়ে কিনে এনে জমিয়ে রেখেছি।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, কোত্থেকে হঠাৎ ঝিনুক এসে হাজির। এক পলকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সুর টেনে টেনে বলল, 'বিনুদাদাকে কী দেখাচ্ছ গো?'

বাক্সের ভেতরটা দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এই সব—'

'বিনুদাদাকে দেখালে আমাকেও দেখাতে হবে—' ঝিনুক নাকে-কান্না জুড়ে দিল।

'কাঁদছিস কেন, দ্যাখ না—'

এই এক মেয়ে হয়েছে। বিনু যা করবে, যা দেখবে, যেখানে যাবে, তারও তাই করা চাই, সেখানে

যাওয়া চাই।

মনে মনে ঝিনুকের ওপর রেগে গেল বিনু, একবার ইচ্ছা হল ঝুঁটিটা টেনে ছিঁড়ে দেয় কিন্তু কিছুই করল না। ঝিনুককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে বলল, 'এত সব জিনিস জমিয়েছ কেন?'

হেমনাথ বললেন, 'এমনি, শখ।' একটু চুপ করে থেকে দূরমনস্কের মতন আবার বললেন, 'ঠিক শখ না। ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর জিনিস যোগাড়ের নেশা থাকলে মন খারাপ দিকে যায় না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'মাঝে মাঝে কোনো কারণে বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে থাকলে বাক্স খুলে বসি। এসব দেখতে দেখতে সব ভার কেটে যায়।'

হেমনাথের শেষ কথাগুলো খানিক বুঝল বিনু, অনেকখানিই আবোধ্য থেকে গেল। বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকল সে।

হেমনাথ আবার বললেন,'জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুধা-সুনীতিকে বলব, যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করে রাখে।'

দেখতে দেখতে ইংরেজি নতুন বছর পড়ে গেল। আজ থেকে বিনুদের ক্লাস শুরু হবে। একা বিনুরা না, সুধা-সুনীতি এবং ঝিনুকেরও।

চারজনেরই স্কুল আর কলেজ কাছাকাছি। খেয়ে দেয়ে দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমে পড়ে মেয়েদের স্কুল। সেখানে ঝিনুককে রেখে বাকি তিনজন এগিয়ে গেল। ঠিক হল, ফেরার পথে ঝিনুককে তারা নিয়ে যাবে।

ঝিনুকের পর বিনুর স্কুল। সুধা-সুনীতি তার স্কুলে আর এল না। বড় রাস্তা ধরে সোজা কলেজের দিকে চলে গেল। বিনু ডান দিকের মাঠের ওপর দিয়ে স্কুলবাড়ির দিকে চলল।

মাঠের মাঝামাঝি আসতেই বিনু শুনতে পেল, পেছন থেকে কেউ ডাকছে। এখানে কে ডাকতে পারে তাকে? সবাই তো অচেনা। ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল, হেডমাস্টার মোতাহার হোসেন চৌধুরী সাহেব আসছেন।

কাছে এসে মোতাহার সাহেব সস্নেহে হাসলেন, 'স্কুল খোলার দিনই চলে এসেছ?'

বুক ঢিব ঢিব করছিল বিনুর। চোখ নামিয়ে আবছা গলায় বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'গুড, ভেরি গুড্।' বিনুর কাঁধে একখানা হাত রেখে মোতাহার সাহেব বললেন, 'কখন এলে?'

'এইমাত্র।'

'এখনও তা হলে ক্লাসে যাও নি?'

'আজ্ঞে না।'

'এস আমার সঙ্গে—' বিনুকে সঙ্গে নিয়ে মোতাহার সাহেব তাঁর ঘরে গেলেন।

সেদিন মনে হয়েছিল, এ ঘরখানা হেডমাস্টার সাহেবের জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট। কিন্তু আজ দেখা গেল, অন্যান্য মাস্টার মশাইরাও এখানে বসেন। মোট কথা, এটাই রাজদিয়া হাই স্কুলের টিচার্স কমন-রুম।

এখনও স্কুল বসার সময় হয়নি। সব মাস্টারমাশাই এর মধ্যেই এসে গেছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে বিনুর আলাপ করিয়ে দিলেন মোতাহার সাহেব। ঐ যে লম্বা রোগা মতন প্রৌঢ়টি, যাঁর নাম আশু দত্ত—তিনি ইংরেজির টিচার। উনি সোমনাথ সাহা, অঙ্কের টিচার। উনি রজনী চট্টরাজ, ভূগোলের টিচার। ইত্যাদি—

মাস্টার মশাইদের পরিচয়-টরিচয় দিয়ে মোতাহার সাহেব বললেন, 'এই ছেলেটির নাম বিনয়—বিনয়কুমার বসু। আমাদের হেমদাদার ভাগনীর ঘরের নাতি। এ বছর ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছে।

আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন। ছেলেটি বেশ ব্রাইট।'

হেমনাথের নাতি এবং হেডমাস্টার সাহেবের প্রশংসা শুনে সবাই বেশ আগ্রহান্বিত হলেন। বিনুরা আগে কোথায় ছিল, হঠাৎ রাজদিয়ায় এসে ভর্তিই বা হল কেন, এমন নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন মাস্টারমশাইরা। বিনু উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

কথায় কথায় ক্লাসের সময় হয়ে গেল। দপ্তরী বাইরে ঘন্টা বাজিয়ে দিল।

মোতাহার সাহেব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ক্লাস এইটের প্রথম ক্লাস কার?'

ইংরেজির টিচার রোগা লম্বামতন আশু দত্ত বললেন, 'আমার—'

'বিনয়কে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। ছেলেমানুষ, আজ নতুন এসেছে—'

বিনুর দিকে তাকিয়ে আশু দত্ত ডাকলেন, 'এস—'

ক্লাসে আসতে দেখা গেল বেঞ্চিগুলো বোঝাই হয়ে গেছে, ছেলেরা আগেভাগে সেগুলো দখল করে বসে আছে।

বিনু লক্ষ্য করল, বেশির ভাগ ছেলেই তার চাইতে অনেক বড়। পেছন দিকে যারা বসে আছে তাদের মুখ দেখে মনে হল, নিয়মিত দাড়িগোঁফ কামায়। দু-একজন বিনুর সমবয়সী থাকতেও পারে, কিন্তু এত ছেলের ভিড়ে এই মুহূর্তে তাদের খুঁজে বার করা অসম্ভব।

ক্লাসের দিকে তাকিয়ে আশু দত্ত বললেন, 'তোমাদের নতুন এক বন্ধু এসেছে। আজই এর সঙ্গে সবাই আলাপ-টালাপ করে নেবে।' বলে বিনুকে দেখিয়ে দিলেন। তারপরেই হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে খুব দ্রুত আবার বলে উঠলেন, 'তবে হ্যাঁ, দু'জন এর সঙ্গে মিশবে না, কথাও বলবে না।' বলেই ডাকলেন, 'রুস্তম—পতিতপাবন—'

সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকের বেঞ্চ থেকে বাইশ-তেইশ বছরের দুই গাট্টাগোট্টা জোয়ান উঠে দাঁড়াল। এত বড় বড় ধেড়ে ছেলে যে ক্লাস এইটে পড়তে পারে, বিনুর কাছে তা এক অভাবনীয় ব্যাপার। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল সে।

আশু দত্ত বললেন, 'তোমাদের দু'জনকে সাবধান করে দিলাম, বিনয়ের পেছনে লাগবে না, ওর সঙ্গে মিশবে না।'

'আইচ্ছা স্যার—' রুস্তম এবং পতিতপাবন দু'জনেই ঘাড় হেলিয়ে আবার বসে পড়ল।

ইংরেজির টিচার কেন যে রুস্তম আর পতিতপাবনকে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিলেন, বিনু ভেবে পেল না।

বেশিক্ষণ সেই ভাবনাটা নিয়ে থাকা গেল না। সামনের বেঞ্চের ছেলেদের একটু চেপেচুপে বসে বিনুকে জায়গা করে দিতে বললেন আশু দত্ত। বিনু বসলে বললেন, 'রোজ তুমি ঐ জায়গায় বসবে।'

'আচ্ছা স্যার—' বিনু মাথা নাড়ল।

অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর নতুন বছরে আজই প্রথম স্কুল বসেছে। এখনও ছেলেদের বইটই কেনা হয়নি। বই কেনা হবে কোত্থেকে? এখনও বুক লিস্টই দেওয়া হয়নি। কাজেই গল্প করে সময় কাটানো ছাড়া কাজ নেই।

অলস মন্থর গতিতে একটার পর একটা ক্লাস গড়িয়ে চলল। তারপর একসময় টিফিনের ঘন্টা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতন স্কুলবাড়ির সবগুলো ঘর থেকে হুড়মুড় করে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ল। স্রোতে গা ভাসিয়ে বিনুও বাইরে এল।

ছেলেরা ছোটাছুটি করছে। একদল সামনের মাঠে 'দাড়িয়াবান্ধা'র কোর্টে নেমে পড়েছে। আরেক দল খেলছে 'গোল্লাছুট'। তবে বেশির ভাগই শীতের রোদে পিঠ দিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

কারো সঙ্গেই এখনও ভাল করে আলাপ হয়নি। চারদিকে আলতোভাবে ভেসে বেড়াতে লাগল বিনু। একবার 'দাড়িয়াবান্ধা'র কোর্টে, একবার 'গোল্লাছুটে'র আসরে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে মাঠের

প্রান্তে সারি সারি কাঠবাদাম গাছগুলোর কাছে এসে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

হঠাৎ চাপা গলায় কারা যেন ডেকে উঠল, 'বিনয়—'

চমকে এদিকে তাকাতেই বিনু দেখতে পেল, ডান দিকের কাঠবাদাম গাছটার তলায় রুস্তম, পতিতপাবন এবং তাদের বয়সী আরো দু-তিনটে জোয়ান ছেলে বসে আছে।

মাস্টারমশাই তার সঙ্গে রুস্তমদের মিশতে বারণ করে দিয়েছেন। নিষেধটা একতরফা না। রুস্তমরা যেমন সঙ্গে মিশবে না, তাকেও তেমনি ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। বিনুর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। রুস্তমদের কাছে যাবে কি যাবে না, ঠিক করে উঠতে পারল না।

তার মনোভাবটা রুস্তমরা যেন বুঝতে পারল। বলল, 'ডর নাই, এইখানে মাস্টার মশাই আসব না। আসো—আসো—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখন যে রুস্তমদের কাছে এসে বসেছে, বিনু টের পায়নি।

রুস্তম বলল, 'কইলকাতার থনে আইছ?'

'হ্যাঁ—' বিনু মাথা নাড়ল।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ্য করেছে, রাজদিয়া আসার পর যার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে প্রথমেই তারা কলকাতার কথা জানতে চেয়েছে। কলকাতা সম্বন্ধে তাদের মনে অপার, অসীম বিস্ময়।

রুস্তমরাও কলকাতা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল, অবাক হয়ে বিনুর মুখে অজানা রহস্যময় শহরটির নানা চমকপ্রদ কাহিনী শুনল। পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বার করে একটা করে ধরিয়ে নিল। বিনুর দিকেও একটা বাড়িয়ে দিল।

বিনু চমকে উঠল। প্রথমত, স্কুলের ছেলেরা বিড়ি খায়, এমন দৃশ্য আগে আর কখনও দেখে নি। তার পক্ষে এ এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। তার ওপর তাকেও বিড়ি সাধছে। বিনুর বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। বলল, 'না—না—'

'বিড়ি বুঝি খাও না?'

'না।'

'তয় কী খাও? সিগ্রেট?'

'না—না—'

বিস্ময়ে চোখ গোল হয়ে গেল রুস্তমের, 'বিড়ি খাও না, সিগ্রেট খাও না, ক্যামুন কইলকাত্তার পোলা।'

বুক থরথর করছিলই, এখন মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিনু বলল, 'আমি এখন যাই—'

খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলে রুস্তম বলল, 'আরে যাইবা কই? বসো—বসো—আলাপ-পরিচয়ই হইল না। বিড়িতে একখান টান দিয়েই দ্যাখো না, এমুন সুখ আর কিছুতেই নাই—'

'না-না, আমাকে ছেড়ে দিন—'

'আরে কি আশ্চয্যি, আমাগো 'আপনে' 'আইজ্ঞা' কইরা কও ক্যান। এক লগে পড়ি, 'তুমি কইরা কইবা। 'তুই'ও কইতে পার।'

বিনু স্তম্ভিত। পড়লই বা এক ক্লাসে, দামড়া মোষের মতন তাগড়া তাগড়া ঐ জোয়ানদুটোকে কখনও 'তুমি' কি 'তুই' বলা যায়! বিনু উঠবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

রুস্তম বলল, 'এমুন কর ক্যান? আমরা বাঘ না ভাল্লুক?'

বিনু ফস করে বলে ফেলল, 'মাস্টারমশাই আমার পেছনে আপনাদের না লাগতে বারণ করে দিয়েছেন?'

তাচ্ছিল্যের গলায় রুস্তম বলল, 'মাস্টারমশাইরা অমুন কত কথা কয়। হেই সগল ধইরা বইসা থাকলে চলে নিহি? আমাগো লগে মিশো, মজা পাইবা।'

'কিসের মজা?'

রুস্তম উত্তর দিল না। পতিতপাবনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বলল, 'তুই-ই কইয়া দে—'

পতিতপাবন কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকল। তারপর খুব চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'রুস্তইমার তিন বিবি, আমারও বউ আছে। মেলা রসের কথা আমাগো জানা, তোমারে শিখাইয়া পড়াইয়া চালাক কইরা দিমু—'

কথাগুলো ঠিক যে বুঝল বিনু তা নয়। তবে টের পেল এর ভেতর নোংরা অশ্লীল গন্ধ আছে। তার নাক-কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

রুস্তমরা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল। অর্থাৎ টিফিন শেষ।

টিফিনের ঠিক পরের ক্লাসটাই আবার আশু দত্তের। ক্লাসে ঢুকেই তিনি হুঙ্কার দিলেন, 'রুস্তম, পতিতপাবন—'

শেষ বেঞ্চ থেকে দু'জন উঠে দাঁড়াল।

আগের স্বরেই আশু দত্ত আবার বললেন, 'কী বলেছিলাম তোদের?'

ভীত চোখে একবার মাস্টারমশাইকে দেখেই ঘাড় নিচু করল রুস্তমরা। আবছা স্বরে বলল, 'আইজ্ঞা—'

'তোদের না বলেছিলাম, বিনয়ের পেছনে লাগবি না। নিজেরা তো জাহান্নামে গেছিসই, বছর বছর ফেল করে একেকটা ধর্মের ষাঁড় হয়ে উঠেছিস। নিজেরা যা খুশি কর, ছোট ছোট ছেলেগুলোর সর্বনাশ করা কেন?'

'আমরা তো কিছু করি নাই।'

'করিসনি! আবার মিথ্যে বলা হচ্ছে!' রাগে চিৎকার করে উঠলেন আশু দত্ত, 'ভেবেছিস, আমার চোখে কিছুই পড়েনি! টিফিনের সময় বাদাম গাছের তলায় বিনয়কে ডেকেছিলি কেন? বল হারামজাদা বদের ধাড়িরা—'

রুস্তম পতিতপাবন—দু'জনই এবার চুপ। মুখ তুলে মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকাবার সাহসটুকুও তাদের আর অবশিষ্ট নেই।

রুস্তম আর পতিতপাবনের চেহারা অসুরের মতন। অথচ রোগা দুর্বল আশু দত্তর সামনে ভয়ে তারা সিঁটিয়ে গেছে। দৃশ্যটা খুবই মজাদার, বিনুর খুব ভাল লাগল।

আশু দত্ত থামেন নি, 'তোরা হলি দাগী আম, একসঙ্গে থাকলে বাকিগুলোরও বারটা বাজাবি। স্কুল থেকে তোদের তাড়াতে হবে, দেখছি। যা, এখন ক্লাসের বাইরে গিয়ে 'হাফ নীল ডাউন' হয়ে থাক—'

রুস্তম এবং পতিতপাবন সুড়সুড় করে বাইরের টানা বারান্দায় চলে গেল, তারপর ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে 'হাফ নীল ডাউন' হয়ে রইল।

বিনুর খুব হাসি পাচ্ছিল। বাড়ি ফিরে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটা রঙচঙ ফলিয়ে বলবার জন্য তার আর তর সইছিল না।

পৌষ মাস থাকতে থাকতেই মাঠগুলো ফাঁকা করে দিয়ে ধান উঠে গেল। বাড়ির উঠোনে এখন সোনার পাহাড় সাজানো।

যে পাঁচিশ জন কৃষাণকে হেমনাথ কাজে লাগিয়েছেন তারা আজকাল আর চকে যায় না। খড়সমেত যে ধান কেটে এনেছে, সারাদিন ঝেড়ে ঝেড়ে তা থেকে শস্যের দানাগুলোকে আলাদা করে, তারপর রোদে শুকিয়ে ডোল বোঝাই করতে থাকে। আর খড়গুলো দিয়ে পালা সাজায়।

এদিকে অবনীমোহন মজিদ মিঞার যে জমি কিনেছেন তার ধানও উঠে গেছে। ফসল কেটে নিয়ে যাবার পর মজিদ মিঞা অবনীমোহনকে জমির দখল দিয়ে দিয়েছেন।

দেখতে দেখতে পৌষ সংক্রান্তি এসে গেল। সংক্রান্তির দিন বিনুদের স্কুল আর সুধা-সুনীতির কলেজ ছুটি। এই দিনটিতে এ দেশে অনেকেই বাস্তুপুজো করে থাকে। হেমনাথরাও করেন। অবনীমোহন নতুন জমি কিনেছেন, ঠিক হয়েছে তিনিও বাস্তুপুজো করবেন।

আগের দিনই দু'জন পুরুত এবং দু'জন ঢাকীকে খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল। সংক্রান্তির দিন সকালবেলা তারা এসে হাজির।

বাস্তুপুজোর প্রথাটি বেশ। প্রথম পুজোটি হয় বাড়ির মধ্যেই। পুরুত ঠাকুর চরু রেঁধে বাস্তুদেবকে উৎসর্গ করে। তারপর যেখানে যেখানে জমিজমা আছে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে পুজো হয়।

এবার দুই পুরুত, দুই ঢাকী এসেছে। কেননা হেমনাথ আর অবনীমোহনের আলাদা আলাদা পুজো হবে।

বাড়ির পুজো সেরে দুই পুরুত দু'দিকে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির মানুষরা দু'ভাগ হয়ে দুই পুরুতের পিছু পিছু চলল। আর দুই ঢাকী বাজাতে বাজাতে আগে আগে চলল।

শুধু বিনুদেরই না, এখানে ঘরে ঘরে বাস্তুপুজো। চারদিকের মাঠ জুড়ে কত ঢাক যে বাজছে, কত পুরুতের মন্ত্রোচ্চারণ যে শোনা যাচ্ছে! একদল আধ-ন্যাংটো কালো কালো ছেলেমেয়ের দল একটু প্রসাদের আশায় এ-খেত থেকে ও-খেতে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

ঢাকের বাজনা শুনতে শুনতে, বাতাসে চরুর মধুর সুঘ্রাণ নিতে নিতে এবং জমিতে জমিতে ঘুরে পুজো দেখতে দেখতে পৌষের বেলা হেলে গেল। সারাদিনের ক্লান্তি গায়ে মেখে বিনুরা যখন বাড়ি ফিরল, শীতের সন্ধে নেমে গেছে।

মাঘ মাসের প্রথম দিকেই সব ধান ডোলে তুলে খড় দিয়ে সারি সারি পালা সাজিয়ে চরের মুসলমান কামলারা চলে গেল।

তারপর একটানা অলস মন্থর দিনযাপন। যুগল করিমকে এখন আর মাঠে যেতে হয় না, হেমনাথের অবশ্য কাজের শেষ নেই। বাড়ির কাজ তাঁর যত, তার হাজার গুণ বাইরের কাজ। ইদানীং স্কুলবাড়ির জন্য গঞ্জে গঞ্জে ঘুরে টাকা তুলে বেড়াচ্ছেন। নাওয়া-খাওয়ার ফুরসতটুকু পর্যন্ত তাঁর নেই।

নতুন ধান উঠবার পর এ বাড়িতে পিঠে পায়েস বানাবার ধুম পড়ে গেছে। চালও অঢেল, দুধেরও অভাব নেই। কাজেই পিঠেটিঠে না বানিয়ে কি থাকতে পারেন স্নেহলতা?

পিঠেও কি এক আধ রকমের? ভাপা পিঠে, পাটি সাপটা, চিতই, রাঙা আলুর পুলি, সিদ্ধ পুলি, দুধ পুলি, মুগ পুলি, ভাজা পুলি—রকমের আর লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া পায়েস আছে, চসি আছে।

নতুন ধান উঠবার পর আরেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। আগে আগে সকালবেলা চিড়ে-মুড়ি-ক্ষীর-দুধ খেতে দিতেন স্নেহলতা। আজকাল ভোর ভোর উঠেই মাটির হাঁড়িতে ফেনাভাত বসিয়ে দেন। চিড়ে মুড়ির বদলে নতুন চালের সুঘ্রাণময় ফেনাভাত সর-বাটা ঘি আর আলুভাতে দিয়ে খেতে কি ভাল যে লাগে!

এরই মধ্যে এক রবিবার, স্কুলে যাবার তাড়া ছিল না বিনুর, দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর রোদ পোয়াচ্ছিল। কোথায় যেন খেজুর গুড় জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। বাতাসে তার সুগন্ধ ভেসে আসছে। হঠাৎ যুগল এসে সামনে দাঁড়াল, 'কী করতে আছেন ছুটোবাবু?'

বিনু বলল, 'এই তো বসে আছি।'

'শুদাশুদি বইসা থাইক্যা কী করবেন? চলেন চকে যাই। এই সময় চকে সুন্দি কাউঠা বাইর হয়। খাইতে যা লাগে ছুটোবাবু, কী কমু! যেমুন সোয়াদ, তেমুন ত্যাল—'

বিনু লাফিয়ে উঠল, 'চল—'

কবেই ধান কাটা হয়ে গেছে। শীতের দুপুরে এখন মাঠ জুড়ে শুধু শূন্যতা। ফসল নেই, ধানগাছের গোড়াগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, সব কিছু বর্ণহীন। ঠিক বর্ণহীন নয়, ধূসর। শীতের আদিগন্ত মাঠের ওপর অসীম বিষাদ ঘন হয়ে আছে।

মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে চড়াই আর বুলবুলি উড়ছিল। মাঝে মাঝে তারা নিচে নেমে মাটিতে ঠোকর দেয়, কিন্তু বৃথাই। কেউ তাদের জন্য একদানা শস্যও ফেলে রেখে যায় নি।

একটা বুড়ো গোসাপ আলের ওপর দিয়ে পেট টেনে ধীর মন্থর গতিতে যাচ্ছিল। ধানকাটার সময় সাপটাকে এই মাঠে আরো অনেক বার দেখেছে বিনু। আজ কী হয়ে গেল, চট করে একটা মাটির টিল কুড়িয়ে নিল। ছুঁড়তে যাবে, যুগল হাতটা চেপে ধরল, 'করেন কি ছুটোবাবু, করেন কী? ও হইল এই চকের দ্যাবতা, অরে মারলে সব্বনাশ হইয়া যাইব।'

টিলটা আস্তে আস্তে ফেলে দিয়ে বিনু শুধলো, 'কী সর্বনাশ হবে?'

'জমিনে আর ফসল ফলব না। এখানকার মাইন্ষেরে জিগাইয়া দেইখেন।'

মানুষের বিশ্বাসের ওপর কথা নেই। বিনু আর কিছু বলল না। গোসাপটাকে ডান দিকে রেখে তারা এগিয়ে চলল।

আরো কিছুদূর যাবার পর সেই লোকটাকে দেখতে পেল বিনু, নাম যার তালেব। সেদিন ল্যান্ড রেজিস্ট্রি অফিসে একে প্রথম দেখেছিল সে।

এখন, শীতশেষের এই ফাঁকা মাঠে খুব মনোযোগ দিয়ে ইঁদুরের গর্তে কাঠি ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তালেব ধান বার করছে। সেদিন, হেমনাথ বলেছিলেন, এইভাবেই নাকি লোকটা মাস তিনেকের মতন পেটের দানা জোগাড় করে।

দূরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তালেবকে দেখল বিনুরা। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। তালেব তাদের দেখতে পায় নি।

তারপর সারা দুপুর খোঁজাখুঁজি করে মোটে তিনটে ছোট ছোট সুন্দি কচ্ছপ পাওয়া গেল। তাদের পা বেঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে যুগল বলল, 'একখান কথা ছুটোবাবু—'

'কী কথা?' বিনু জানতে চাইল।

আনন্দ-লজ্জা-সঙ্কোচ—সব মিলিয়ে যুগলের মুখের ওপর দিয়ে পর পর অনেকগুলো ঢেউ চলে গেল। তারপর খুব আস্তে করে সে বলল, 'কাইল গোপাল দাস আইবো।'

'কে বললে?'

'পরশু লোক পাঠাইছিল।'

'আমি তো দেখি নি।'

'আপনে তহন ইস্কুলে—'

সত্যি সত্যি পরের দিন, ভাটির দেশ থেকে পাখির বাপ গোপাল দাস আর যুগলের সেই বোনাই ধনঞ্জয় (এতদিনে টুনির স্বামীর নামটা জেনে ফেলেছে বিনু) এসে হাজির। প্রথমে তারা পণের আট কুড়ি টাকা গুনে গুনে নিল, তারপর বিয়ের দিন ঠিক করল। মাঘ মাসের চব্বিশ তারিখে বিয়ে। এ-ও স্থির হল, বিয়ে করতে অতদূরে ভাটির দেশে যেতে হবে না। মেয়ে নিয়ে একেবারে ধনঞ্জয়ের বাড়িতে চলে আসবে গোপাল দাস, সেখানেই শুভ কাজ সারা হবে।

—

যুগলের বিয়ে নিয়ে বিরাট কাণ্ড করে বসলেন হেমনাথ। রাজদিয়ার হেন বাড়ি নেই, হেন মানুষ নেই, যাদের নেমতন্ন করা হল না। দেখেশুনে কে বলবে, যুগল হেমনাথদের বাড়ির কামলা।

কেউ কেউ বলল, 'কামলার বিয়ায় অত ঘটা ক্যান?'

হেমনাথ বললেন, 'যুগলকে তো আমি কামলা ভাবি নি, ও আমার বাড়ির ছেলে। তা ছাড়া আমাদের বাড়িতে বহুকাল শুভ কাজ হয় না। বিয়েটা উপলক্ষ করে ঘটা না হয় করলামই।'

বিয়ের আগের দিন থেকেই নিমন্ত্রিতদের আনাগোনা শুরু হল। বরণকুলো সাজিয়ে জনা কুড়ি এয়ো জুটিয়ে অধিবাসের গান শুরু করে দিলেন স্নেহলতা ঃ

'আইজ রামের অধিবাস কাইল রামের
বিয়া গো কমলা,
আমরা জল ভরিতে যাই,
সই আমরা জলে যাই।
তোমার রামের অধিবাসের
রানী সময় গেল।
গা তোল কৌশল্যা রানী
নিশি পরভাত হইল।
তোমরা সখি আন গো হলুদ, আন গো
হলুদ সকলে।
আমার রামেরে সিনান করাও
অতি সকালে।'

একটু থেমে আবার শুরু হয় ঃ

'বরণকুলা আনো সখি, বরণকুলা আনো
আমরা শ্যামের ঘাটে যাই।
আমরা জল সইতে যাই।
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও সখি,
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও।
ধান দিয়া, দূর্বা দিয়া, রামের ওই
বরণডালা সাজাও।
আমরা জল সইতে যাই।
আমরা ফুল তুলতে যাই।'

এয়োদের মধ্যে যারা স্নেহলতার সমবয়সিনী তারা বলে, 'পরের পুতের লেইগা এই! নিজে তো বিয়াইলেন না দিদি, বিয়াইলে না জানি কী করতেন!'

স্নেহলতার ছেলেমেয়ে নেই। নিমেষে তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে। পরক্ষণেই স্নিগ্ধ হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠেন, 'না বিয়োলে বুঝি ছেলে হয় না? রাজদিয়া জুড়ে এত ছেলেমেয়ে তবে কার?'

'হেয়া ঠিক, হেয়া ঠিক—'

পরের দিন বিকেলবেলা বরযাত্রী আর বরকে নিয়ে রওনা হলেন হেমনাথ। বরযাত্রীদের ভেতর সুধা-সুনীতি, বিনু-ঝিনুকও রয়েছে।

বিয়ে উপলক্ষে যুগলের বাপ-মা-বোন এসেছে তাদের বাড়ি থেকে। বাপ ভাইরা বরযাত্রীদের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের বাড়ি চলেছে। মা আর বোন থেকে গেছে হেমনাথের বাড়ি।

বর্ষাকাল হলে ডুবন্ত মাঠের ওপর দিয়ে নৌকোয় যাওয়া যেত। কিন্তু এই শীতে জল সরে গিয়ে ডাঙা জেগেছে, ডাঙার ওপর দিয়ে তো নৌকো চলে না, তাই হেঁটেই চলেছেন হেমনাথরা।

রাজদিয়া থেকে ধনঞ্জয়ের বাড়ি মাইল দুয়েকের রাস্তা। কোনাকুনি মাঠ পাড়ি দিলে কতক্ষণ আর লাগবে।

যেতে যেতে কৃষাণ গ্রাম চোখে পড়ে। কৌতূহলী কেউ কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শুধোয়, 'কিয়ের মিছিল ?'

বরযাত্রীদের ভেতর থেকে কে যেন উত্তর দেয় 'বিয়ার—'

'কার বিয়া ?'

'হ্যামকত্তার বাড়ির যুগলার।'

'আমরা যামু ?'

'আসো।'

নানা গ্রাম থেকে দু'জন চারজন করে জুটে বিরাট এক জনতা তৈরি হল। তারা বরযাত্রীদের পিছু পিছু চলতে লাগল।

সন্ধের কিছু পরে বিনুরা ধনঞ্জয়ের বাড়ি পৌঁছে গেল।

এ বাড়ি বিনুর অচেনা নয়। আশ্বিন মাসে সুজনগঞ্জের হাটে যাবার পথে যুগলের সঙ্গে এখানে এসেছিল সে।

তখন চারদিকে জল থইথই করছে। আশ্বিনের মাঠঘাট, ধানের খেত, শাপলাবন, মুত্রাবন—সব কিছু ভেসে গিয়ে একখানা সমুদ্র হয়ে গিয়েছিল যেন। ধনঞ্জয়ের বাড়িটা তার ওপর দ্বীপের মতন মাথা তুলে ছিল।

এত জল যে ঘরের উঠোন পর্যন্ত চলে এসেছিল। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য উঠোনের ওপর দিয়ে সাঁকো দেখেছে বিনু। তার ওপর বসে ধনঞ্জয়ের কালো কালো আধ-ন্যাংটো ছেলেদের ভাতের টোপ দিয়ে পুঁটি এবং বাঁশপাতা মাছ ধরতে দেখেছে।

এখন, এই মাঘের শেষে জল নেই কিন্তু উঠোনের সাঁকোগুলো আছে। সারা বছরই বোধ হয় ওগুলো থাকে। থাকবারই কথা। এদেশে শুকনোর মাস আর ক'টা ? পৌষ-মাঘ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত। জষ্ঠির মাঝামাঝি মাঠঘাট ভাসিয়ে নতুন বর্ষার জল এসে পড়ে। তারপর থেকে অঘ্রান পর্যন্ত চারদিকে শুধু জল আর জল—অথৈ অপার জলরাশি। কাজেই সাঁকো তুলে ফেলে কী লাভ ? ক'মাস পরেই তো আবার বসাতে হবে। ধনঞ্জয় অতখানি পরিশ্রম করতে বুঝি রাজি নয়।

আজ বাড়িটার চেহারাই গেছে বদলে। হাজার হোক বিয়ে বাড়ি। বউ-ঝি, আত্মীয়-কুটুম, নাইওরি-ঝিওরিতে বোঝাই।

উঠোনের চার কোণে চারটে এবং মাঝখানে একটা, মোট পাঁচটা হ্যাজাক জ্বলছে। উত্তরের ঘরের ঢালা বারান্দায় ধবধবে ফরাস পাতা। মনে হল ওটাই বর এবং বরযাত্রীদের বসবার জায়গা।

বিনুরা পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল।

'আইছে রে, আইছে। বরযাত্তররা আইসা পড়ছে।'

'বইতে দে, বইতে দে—'

'সিক্রেট কই, পান-তামুক বাইর কর—'

হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠল, 'বর আইছে, জোকার (উলু) দে ছেমরিরা—'

তক্ষুণি ভেতর বাড়ি থেকে ঝাঁক ঝাঁক উলুর সুমিষ্ট চিকন শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

আরেকজন কে যেন ব্যস্তভাবে বলল, 'ঢাকীগুলান গেল কই ? বাদ্যি বাজা, বাদ্যি বাজা—'

বলার শুধু অপেক্ষা। তারপরেই পাঁচ ছ'টা ঢাকী উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ল। জলবাংলার এই সুদূর গ্রামের ভেতর ইংরেজি বাজনা কোথায় পাওয়া যাবে ? তাই হয়তো ঢাকীদের ডাকা হয়েছে।

নিমেষে ঢাকের শব্দে বিয়েবাড়ি সরগরম হয়ে উঠল এবং বিনুদের কানে তালা ধরে যেতে লাগল।

এরই ভেতর গোপাল দাস, ধনঞ্জয় এবং ক'টি বৃদ্ধ এগিয়ে এল।

গোপাল দাস আর ধনঞ্জয়কে আজ চেনাই যাচ্ছেনা। মুখ পরিষ্কার করে কামানো। দু'জনেই মাথায় প্রচুর তেল ঢেলেছে, ফলে চুলগুলো চপচপে। জুলপি, ঘাড় এবং কপাল বেয়ে সেই তেল চোঁয়াচ্ছে। পরনে ক্ষারে-কাচা ধুতি আর হাফ শার্ট, তার ওপর সস্তা পশমি চাদর। কন্যাপক্ষের কর্তা ওরাই, সাজগোজের একটু বাহার তো থাকবেই।

গোপাল দাসরা হাতজোড় করে বলল, 'আসেন আসেন—' উত্তরের ঘরের ঢালা ফরাসে বিনুদের নিয়ে এল তারা।

যুগলকে মাঝখানে বসিয়ে হেমনাথরা চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে বসলেন।

তৎক্ষণাৎ সিগারেট এল, পান-তামাক এল।

হেমনাথের কোনো নেশা নেই। অন্য বরযাত্রী যারা এসেছে সবাই তাঁকে মানে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর সামনে বসে সিগারেট বা তামাক খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। নেশার সরঞ্জামগুলি বৃথাই ফরাসের ওপর পড়ে রইল।

যুগলের গা ঘেঁষে বসেছিল বিনু। তার কানের কাছে মুখ এনে চাপা নিচু গলায় যুগল ফিসফিস করল, 'বড়কত্তায় না থাকলে একখানা সিক্রেট খাইতাম। কতক্ষণ বিড়ি-বুড়ি খাই না, গলা খুচুর খুচুর করতে আছে।'

বিনু বলল, 'আড়ালে গিয়ে খেয়ে এসো না—'

যুগল বলল, 'কী যে ক'ন ছুটোবাবু—'

বিনু অবাক, 'কী বলেছি!'

'আমি না এই বাড়ির জামাই হমু। আমার নি সিক্রেট লইয়া আবডালে গিয়া খাওন মানায়! আমার এট্টা সোম্মান নাই?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল বিনু। এ দিকটা সে ভেবে দেখেনি। বলল, 'তাই তো।'

ওদিকে ঝাঁক ঝাঁক উলুধ্বনি আর ঢাকের আওয়াজ চলছেই। ঢাকীগুলো উঠোনময় নেচেকুঁদে লাফিয়ে বিপুল উৎসাহে বাজিয়ে যাচ্ছে।

কানে হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে। এবার ওদের একটু থামতে বল। কান ঝালাপালা হয়ে গেল।'

শশব্যস্ত হয়ে গোপাল দাস ঢাকীদের বলল, 'হ্যামকত্তায় কইছে, বাদ্যি থামা ব্যাটারা, বাদ্যি থামা। কানের পোক (পোকা) না বাইর করলে আর হয় না।'

তক্ষুণি বাজনা থামল।

এধারে আরো একটা ব্যাপার ঘটেছে। বরযাত্রীদের দলে সুধা-সুনীতিকে দেখে বিয়ে বাড়িতে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, সাড়া পড়ে গেছে চারদিকে।

এদেশে বরযাত্রী হিসেবে মেয়েদের যাওয়ার রেওয়াজ নেই বললেই হয়। ফলে রীতিমত ভিড় উত্তরের ঘরের দাওয়ার সামনে অনড় হয়ে আছে। দূর থেকে নানা বয়সের বউরা লম্বা লম্বা ঘোমটা অল্প একটু তুলে চকিতে সুধা-সুনীতিকে দেখে নিচ্ছে এবং একজন আরেক জনকে ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় ফিসফিস করছে, 'আউ আউ, মাইয়ামাইন্‌ষে নি বরযাত্তর আহে!'

আরেক জন বলল, 'আহে, আহে—'

'কই, আমরা তো যাই না।'

মুখ বাঁকিয়ে দ্বিতীয় জন বলল, 'কিয়ের লগে কিয়ের তুলুনা। চান্দের লগে প্যান্দের। আমরা হইলাম বগার ঘরে বগী, বেঙ্গার ঘরের বেঙ্গী। আর ওনারা বাবুগা ঘরের মাইয়া।'

'হে কথাখান ঠিকই।'

'হুদা (শুধু) কি বাবুগো মাইয়া, কইলকাত্তার মাইয়া। তেনাগো চালই ভিন্ন।'

'ঠিকই।'

'কইলকাতার মাইয়ারা কেমুন ধলা, ফকফইকা—'

'মেমসায়েবগো লাখান—'

'মেমসায়েব বাপের জম্মে দেখছস?'

'দেখি নাই, তাগো পরস্তাব তো শুনছি—'

এই সময় গোপাল দাস, ধনঞ্জয় এবং কর্তাস্থানীয় জনকয়েক এসে বরযাত্রীদের কাছে জোড়হাত করে দাঁড়াল। বিশেষ করে হেমনাথের উদ্দেশ্যে বলল, 'এইবার হুকুম করেন হ্যামকত্তা, বিয়ার যোগাড় হইয়া গেছে। জামাই লইয়া যাই—'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

যুগলকে নিয়ে গোপাল দাসরা ভেতর-বাড়ির দিকে চলল। বিনুরাও তাদের পেছন পেছন গেল।

আলপনা এঁকে এঁকে ভেতর-বাড়ির উঠোনটাকে চমৎকার সাজানো হয়েছে। মাঝখানে চিত্র-করা বড় বড় দুটো পিঁড়ে, সে দুটো বর-কনের আসন। এ ছাড়া আছে দু পক্ষের পুরুত, কন্যাকর্তা, বরকর্তা এবং যে সম্প্রদান করবে তাদের সবার আসন।

যুগলকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল, ঝাঁক ঝাঁক উলুধ্বনি শুরু হয়ে গেল। হেমনাথরা যাতে বসে বিয়ে দেখতে পারেন সেজন্য ক'খানা জলচৌকিও এসে গেল।

ঢাকীগুলো পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে জিরোচ্ছিল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্যাটারা কি ঘুমাইয়া পড়লি নিহি? বাজা—বাজা—'

বলার শুধু অপেক্ষা। ঢাকীরা সঙ্গে সঙ্গে উঠোনে নেমে পড়ল। শাঁখ, উলু এবং ঢাক তিনে মিলে মুহূর্তে মাঘ মাসের রাত্রি মুখর হয়ে উঠল।

এদিকে যুগল যে জামা কাপড় পরে এসেছিল সেগুলো বদলে মেয়ের বাড়ির নতুন পোশাক পরে নিল। তারপরেই ওদিকের কোনো একটা ঘর থেকে হাত ধরে মেয়েরা পাখিকে নিয়ে এল।

পাখিকে এর আগে মোটে একবারই দেখেছে বিনু, সেই আশ্বিন মাসে। স্বপ্নলোকের জলপরীর মতন সাঁতার কেটে কেটে যুগলের নৌকোয় এসেছিল সে।

আর আজ?

আজ চেনাই যাচ্ছে না পাখিকে। পরনে তার রাঙা পাটের শাড়ি আর লাল জামা, হাতে গোছা গোছা চুড়ি, গলায় মুড়কি হার, কানে ঝুমকো, আঙুলের চৌকো আংটি, নাকের পাটায় আগুনের ফুলকির মতন নাকছাবি। লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না পাখি। নতমুখিনী মেয়েটা যেন মর্তভূমির না, স্বর্গলোকের অপ্সরী।

ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে পলকহীন তাকিয়ে থাকল বিনু।

ঘন ঘন উলুধ্বনি এবং শাঁখের আওয়াজের মধ্যে পাখি-যুগলের মালাবদল হয়ে গেল। তারপর শুভদৃষ্টি। দু'জনের মাথার উপর পাতলা একটা চাদরের ঘেরাটোপ দিয়ে কে যেন বলল, 'তাকা যুগল, নয়ন মেইলা পরাণেশ্বরীরে দ্যাখ—'

যুগল বড় বড় ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকাল, কিন্তু পাখি আর মুখ তোলে না।

সবাই কত সাধ্যসাধনা করল কিন্তু পাখির চোখের পাতা যেন সীসের পাতের মতন ভারি হয়ে গেছে, কিছুতেই তা মেলতে পারছে না মেয়েটা।

কেউ যখন পারল না তখন টুনিকে এগিয়ে আসতে হল, যুগলের পিসতুতো বোন টুনি। টুনিকেও আজ চেনা যাচ্ছে না। আশ্বিন মাসে তার গা থেকে খই উড়তে দেখেছিল বিনু, লাউয়ের মতন লম্বা স্তন ধরে কোলের বাচ্চাগুলোকে ঝুলতে দেখেছিল। আজ সে লাল-পাড় নতুন শাড়ি পরেছে, নীল জামা পরেছে, গয়নাগাঁটি পরেছে, এমনকি পাতা কেটে পরিপাটি একখানি খোঁপাও বেঁধেছে। গোসাপের মতন খসখসে কর্কশ চামড়া আজ মসৃণ, তেলতেলে। কপালে নতুন পয়সার মতন মস্ত সিঁদুর টিপ, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুরের টান।

সম্পর্কে টুনি হল পাখির ননাস। (স্বামীর বড় বোনকে বলে ননাস)। সে বলল, 'আ লো, ছেমরি তো গেলি! মুখ তোল মাইয়া—'

পাখি তবু অবনতমুখী।

টুনি এবার ঠোঁটে ঠোঁট টিপে চোখ পাকিয়ে বলল, 'ও মাইয়া, অহন তোমার এত সরম! ধরুম একবার কিষ্ণবুলি (কৃষ্ণবুলি), ধরুম? ধরি? ভাদাই আশ্বিন মাসে আমার খালাসের সোময় যহন এইহানে আছিলি তহন রোজ আইত যুগলা। তহন কী করতি দুই জনে? কই—সভার মইধ্যে হেই কথাখান কই—'

টুনির কথা শেষ হবার আগেই টুক করে একবার যুগলের চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ নামাল পাখি।

বিয়ের পর বর-কনেকে নিয়ে যাওয়া হল বাসর-ঘরে। সেখানে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে এক গলা ঘোমটার তলা থেকে প্রথমে পাখির মা মুখ দেখল। মুখটুখ দেখা হলে বরণকুলো ঠেকিয়ে ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করল। পাখির মায়ের পর একে একে অন্য এয়োরাও বরকনেকে আশীর্বাদ করল।

তারপর শুরু হল চালখেলা। পেতলের সরাভর্তি চাল এনে এয়োরা পাখিকে বলল, 'ছড়াইয়া দে—'

পাখি প্রথমটা কিছুতেই ছড়াবে না। অনেক পীড়াপীড়ির পর সরা থেকে চালগুলো ঢেলে অল্প একটু ছড়িয়ে দিল।

এয়োদের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'ও মা, বিয়া না হইতেই সোয়ামীর দিকে এত টান! ভাল কইরা আউলাইয়া (ছড়িয়ে) দে—' বলে নিজেই পাখির একখানা হাত ধরে চালগুলো যতদূর পারল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। পরে যুগলকে বলল, 'এইবার চাউলগুলি গুছাইয়া একখানে কর।'

বাধ্য ছেলের মতন চালগুলো এক জায়গায় জড়ো করে যুগল। আবার সেগুলো ছড়িয়ে দিল পাখি, আবার এক জায়গায় করল যুগল। এইভাবে বারকয়েক খেলা চলল।

কৌতুকমুখী এয়োর দল বলল, 'মনে রাইখো জামাই, আমাগো মাইয়া এই রকম আউল-ঝাউল করব আর তুমি মানাইয়া গুছাইয়া নিবা। বুঝলা?'

উত্তর না দিয়ে যুগল হাসল।

চালখেলার পর জলখেলা।

মস্ত একখানা পাথরের থালা জলে ভর্তি করে আনা হল। একজন এয়ো আঙুল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জল ঘোরাতে লাগল। জল যখন ঘূর্ণির মতন ঘুরছে সেই সময় বর আর কনের টোপর থেকে দুটো শোলার টুকরো ছিঁড়ে তাতে ফেলে দেওয়া হল। কখনও দেখা গেল পাখির শোলাটা আগে যাচ্ছে, যুগলেরটা তার পিছু নিয়েছে। অমনি এয়োদের মধ্যে সাড়া পড়ে যাচ্ছে।

'জামাই আমাগো বউ-অন্ত পরাণ। দ্যাখ ক্যামুন মাইয়ার পিছন পিছন দৌড়াইতে আছে। মাইয়া আমাগো সুখে থাকব।'

আবার যখন ঘূর্ণিতে পড়ে যুগলের শোলাটা আগে আগে যায়, পাখিরটা তাকে অনুসরণ করে তখন এয়োরা বলাবলি করে, 'দেখিস, মাইয়া জামাই ছাড়া আর কিছু চিনব না। জামাইর পিছে ঘুরতে ঘুরতে

পিথীমির সগর্লি ভুলব।'

একজন বর্ষীয়সী ওধার থেকে বলে ওঠে, 'ভুলুক, তবু সুখে থাউক অরা।'

ঘুরতে ঘুরতে ঘূর্ণির ভেতর শোলার টুকরো দুটো যখন এক হয়ে যায় তখন খেলা শেষ।

চালখেলার মতন বারকয়েক জলখেলাও চলল।

বিনুরা বাসরে চলে এসেছিল। নানা খেলার ফাঁকে হঠাৎ তাকে দেখতে পেল যুগল। বলল, 'ছুটোবাবু কতক্ষণ ?'

বিনু বলল, 'অনেক ক্ষণ এসেছি।'

'খাওন-দাওন হইছে ?'

'না।'

একটু ভেবে যুগল এবার বলল, 'একখান কতা রাখবেন ছুটোবাবু ?'

'কী ?' বিনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আইজের রাইতখান এইখানে থাইকা যান। কাইল বিকালে আমার লগে বাড়িত্ যাইয়েন।'

'এখানে থেকে কী হবে ?'

'বাসর-ঘরে কুনোদিন রাইত কটাইছেন ?'

'না।'

'তয় তো আপনেরে আটকাইতেই হইব।' বলতে বলতে মুখটা বিনুর কানের কাছে আরো ঘন করে আনল যুগল। গলার স্বর আরো অতলে নামাল, 'বাসর-ঘরে বড় মজা ছুটোবাবু, বড় মজা। দেইখেন রসের মেলা বইব।'

বিনু উত্তর দিল না।

একটু ভেবে যুগল আবার বলল, 'আমার লাখান আপনেরেও একদিন বাসর-ঘরে যাইতে হইব। সগল দেইখা-শুইনা-বুইঝা লন। পরে কাম দিব।'

'কিন্তু—'

'আবার কী হইল ?'

'দাদু আর বাবা কি আমাকে থাকতে দেবে ?'

'কইয়া দ্যাখেন না একবার। আপনে থাকলে আমার বড় ভাল লাগব।'

'আচ্ছা বলব।'

একসময় খাবার ডাক পড়ল।

উত্তরের ভিটির প্রকাণ্ড ঘরখানায় বরযাত্রীদের আসন পড়েছে। বিনুরা গিয়ে সারি সারি বসে পড়ল।

গোপাল দাস মেয়ের জন্য আট কুড়ি টাকা পণ যেমন নিয়েছে, খরচও করেছে তেমনি দু হাতে। খাওয়ার ব্যবস্থা প্রায় রাজসিক।

এই জলবাংলায় লুচি-টুচির তেমন চল নেই। ভাতের রেওয়াজ। কলার পাতায় জুঁই ফুলের মতন ধবধবে পানকাইজ চালের গরম ভাত, এখনও ধোঁয়া উড়ছে। সর-বাটা গাওয়া ঘি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, কপির বড়া, মুগের ডাল, রুই-চিতল-ইলিশ-ঢাইন—চার রকমের মাছ, চাটনি, পায়েস এবং রসগোল্লা।

যতক্ষণ খাওয়া চলল, এক ধারে গলবস্ত্র হয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকল গোপাল দাস। আর ধনঞ্জয় হাঁক-ডাক করে পরিবেশন করাতে লাগল। 'এই পাতে চিতল মাছের কোল দাও, ঐ পাতে মিষ্টান্ন দাও, হেই পাতে রসগুল্লা দাও—'

খেতে খেতে হেমনাথ বললেন, 'খুব খাইয়েছ গোপাল—'

ঘাড়খানা একধারে হেলিয়ে বিনীত সুরে গোপলা দাস বলল, 'খুব খাওয়ামু, আমার সাইধ্য কী ?'

'না না, চমৎকার আয়োজন হয়েছে।'

'আপনেগো লাখান মানুষ আমার বাড়ির কিয়া-কম্মে পাত পাতছেন, এইতেই শান্তি। কী আনন্দ যে পাইছি হ্যামকত্তা মুখে কইয়া বুঝাইতে পারুম না। দিন যদি তেমুন থাকত, পরাণ ভইরা খাওয়াইতাম—'

খাওয়াবার কথায় দেশ-কালের কথা এসে পড়ল। কী দিন ছিল আর কী দিন এল! এখন জিনিসপত্র আক্রা, হাত ছোঁয়ানো যায় না এমন আগুন দর। আগের দিন থাকলে গোপাল দাস তিন দিন আগে বরযাত্রীদের নিয়ে আসত, খাওয়ানো কাকে বলে দেখিয়ে দিত, সবই অদৃষ্ট, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বরযাত্রীদের ভেতর থেকে একজন বর্ষীয়ান লোক জানাল, আগেকার দিনে বরযাত্রীদের বিয়ের চার-পাঁচ দিন আগে মেয়ের বাড়ি যাবার রেওয়াজ ছিল। বরিশাল-ফরিদপুর-কুমিল্লা, এই জলের দেশের নানা জায়গায় সে এভাবে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়িয়েছে। তা সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও না।

খাওয়া-দাওয়ার পর হেমনাথরা বাড়ি ফিরবেন, হঠাৎ বিনু বলে উঠল, 'আমি যাব না।'

অবনীমোহন বললেন, 'যাবি না তো থাকবি কোথায়?'

যুগল বোধ হয় তাকে তাকে ছিল। বাসর-ঘর থেকে চট করে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমার কাছে থাকব। কাইল আমি লইয়া যামু—'

অবনীমোহন আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। যুগলের মুখচোখ দেখে হেমনাথের মায়া হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, 'আচ্ছা থাক, একটা দিন আমোদ-আহ্লাদ করুক।' বলে যুগলের দিকে ফিরে একটু ঠাট্টাও করলেন, 'তুই আবার অপ্সরীদের মধ্যে গিয়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে বসে থাকিস না, আমার দাদাভাইটাকে একটু দেখিস।'

রাত্রিবেলা বাসরঘরে মজা বেশ ভালই জমল। দুটি যুবতী মেয়ে সরু চিকন গলায় গাইল :

'এক দিন শ্যাম নীল জলে,
রাধা বদন হেরব বলে
ধীরে ধীরে চলে শ্যাম রায়।
গিয়ে যুমনার কদম্বমূলে,
দাঁড়াইল কুতূহলে
কুটিলা তাই দেখিবারে পায়।
কুটিলা কয় শোন লো বউ
জল আনিতে যাইস না লো কেউ
ব্রজের যত আছে ব্রজাঙ্গনা।
কাল কুম্ভীর এল যবুনাতে,
দেখে এলাম স্বচক্ষেতে
তাই তো তোদের যেতে করি মানা।'

একটা মাজা-ভাঙা সধবা বুড়ি, সম্পর্কে যুগলের দিদিশাশুড়ি, পাকা চুলে তার সিঁদুর, কপালে সিঁদুর, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে রগড় করে করে নাচতে লাগল। ঘরভর্তি যত যুবতী, যত কিশোরী, যত প্রৌঢ়া হেসে একেবারে কুটিপাটি। এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে বলতে লাগল, 'ঠাউরমা য্যান কী! একখান সং—'

নাচগানের পর হঠাৎ ঘরভর্তি মেয়ের দল যুগলকে ছেড়ে বিনুকে নিয়ে পড়ল। একটি রঙ্গিণী স্বভাবের যুবতী চোখে চোখ রেখে বলল, 'অ বাবুগো পোলা, আপনের বিয়া হইচে?'

চোখ নামিয়ে বিনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

গালে একটা করে হাত রেখে অন্য মেয়ের দল কলকল করে উঠল, 'আ লো, মা লো মা, অহন

তরি বিয়াই করেন নাই! তয় করছেন কী?'

বিনু চুপ। তার মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল।

সেই যুবতীটি আবার বলল, 'বিয়া তো করেন নাই, এই দিকে জামাইর লগে বাসরে আইয়া ঢুকছেন। বাসরের রীত কানুন জানেন?'

এবারও মাথা নেড়ে বিনু বুঝিয়ে দিল, জানে না।

যুবতী বলল, 'দুইখান ধান্দা (ধাঁধা) জিগাই, জবাব দ্যান—'

এতক্ষণে বিনুর গলায় স্বর ফুটল, 'আমি ধাঁধা-টাদা জানি না। বলতে পারব না।'

'না কইলে হইব না। আইচ্ছা শোনেন:

'রক্তে ডুব ডুব কাজলের ফোটা
একে কথায় যে কইতে পারে
হ্যায় মজুমদারের ব্যাটা।'

এইবার ক'ন বস্তুখান কী?

বিনু অনেকক্ষণ ভাবল। কিন্তু হাজার ভেবেও কিছুই বার করতে পারল না। বলল, 'জানি না।'

যুবতী বলল, 'আইচ্ছা আরেকখান জিগাই—

'ওপার থনে আইল টিয়া
সোনার টুপর মাথায় দিয়া
যদি টিয়ায় মন করে
মাঠের মাটি চুর করে।'

বিনু এবারও পারল না।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে এক থুত্থুরে বুড়ি উঠে এসে বিনুর চিবুক ধরে নাড়তে নাড়তে বলল, 'একখান ধান্দাও জবাব দিতে পারলা না। তোমার শাস্তি হইব গোরাচান।'

অন্য মেয়েরা চেঁচামেচি জুড়ে দিল 'কী শাস্তি, কী শাস্তি?'

বুড়ি বলল, 'আমারে বিয়া করতে হইব।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরময় হাসির রোল উঠল। আর বিনুর চোখ-মুখ-নাক-কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

হাসি-টাসি থামলে মেয়েরা আবার যুগল এবং পাখিকে নিয়ে মাতল। গোপাল দাসের বউ অর্থাৎ যুগলের শাশুড়িকে তারা ঠেলতে ঠেলতে বাসর-ঘরের বাইরে বার করে দিল, 'তুমি হাউড়ি মানুষ, তুমি এইখানে ক্যান? আমরা জামাই লইয়া কত কী করুম অখন, কত লীলাখেলা! যাও, যাও—'

গোপাল দাসের বউ হাসতে হাসতে চলে গেল, 'যা ইচ্ছা তরা কর—'

'করুমই তো।'

মেয়েরা এবার পাখিকে জোর করে যুগলের কোলে বসিয়ে সমস্বরে গান ধরে:

'শ্যামের কোলে রাইকিশোরী
এ রূপ দেখে মরি মরি—'

রাতের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিণীদের মাতামাতি, কৌতুক এবং হাসিও পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল।

পরের দিন বাসি বিয়ে হল, আংটি খেলা হল, কাদা খেলা হল। কাদায় কাদায় যুগল আর পাখিকে, এমন কি বিনুকেও ভূত বানিয়ে ছাড়ল মেয়েরা।

বিকেলবেলা বাড়ির সবাইকে কাঁদিয়ে যুগলের সঙ্গে পাখি শ্বশুরবাড়ি রওনা হল।

কাল হেমনাথ বলে গিয়েছিলেন, বেলা থাকতে থাকতে যেন যুগলরা বাড়ি চলে যায়। কিন্তু পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল।

শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে বরকনেকে ঘরে নিয়ে তুললেন স্নেহলতা। সেই ঘরখানায়, যেটা যুগলের জন্য নতুন তোলা হয়েছিল।

ঘরের ভেতর ঢুকে বিনু অবাক হয়ে গেল। কাল বিকেল থেকে আজকের রাত, একটা দিনের কিছু বেশি সময় সে বাড়ি ছিল না। এর ভেতর যুগলের ঘরখানা কি চমৎকার করেই না সাজিয়ে দিয়েছেন স্নেহলতা।

আজ কালরাত্রি। জামাই-মেয়ে একঘরে রাত কাটাবে না। বরণ টরণ এবং অন্য সব রীতি পালনের পর পাখিকে নিয়ে ভেতর-বাড়িতে চলে গেলেন স্নেহলতা। রাত্তিরটা সেখানেই কাটাবে পাখি, আর যুগল একা এ ঘরে থাকবে।

আত্মীয়-কুটুম্ব, নাইওরি-ঝিওরি, সবাই নতুন বউর সঙ্গে ভেতর-বাড়ি চলে গেছে। নতুন ঘরে এখন শুধু যুগল আর বিনু।

যুগল ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

'কী?'

'ঠাউরমা'র বিচারটা দেখলেন?'

'কিসের বিচার?'

'আপনেই ক'ন, বিয়ার পর বউ বিহনে রাইত কাটান যায়?'

বিনু ফস করে বলে ফেলল, 'একটা তো মোটে রাত। কাল থেকেই তো—'

ক্ষোভ এবং অভিমানের গলায় যুগল বলল, 'একটা রাইতও অহন একা একা ভাল লাগে না। একা না বোকা। আপনে অবিয়াত পোলা, আপনে এইর মম্ম বুঝবেন না।'

বিনু বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকল।

রাত পোহালেই বউ-ভাত।

রাজদিয়ার হেন মানুষ নেই যাকে নেমন্তন্ন করেননি হেমনাথ। যুগীপাড়া-কুমোরপাড়া-তেলিপাড়া-বামুনপাড়া-কায়েতপাড়া, সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলে এসেছেন। হেমনাথ বলেছেন পুরুষদের, স্নেহলতা বলে এসেছেন মেয়েদের। হেমনাথের সঙ্গে বিনুও ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন করতে গেছে।

শুধু কি রাজদিয়ার বাসিন্দাদের, এই জলবাংলায় যত চেনাজানা মানুষ আছে সবাইকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন হেমনাথ। বহুকাল বাড়িতে কোনো উৎসব হয় নি, যুগলের বিয়েটা উপলক্ষ করে হেমনাথ আর স্নেহলতা প্রাণভরে সাধ মিটিয়ে নিচ্ছেন।

আজ সকাল থেকেই এ বাড়িতে মেলা বসে গেছে। কেতুগঞ্জ থেকে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে এসেছে মজিদ মিঞা। সুজনগঞ্জ থেকে এসেছে নিত্য দাস, চন্দ্র ভুঁইমালী। কমলাঘাট থেকে এসেছে রমজান সাহেব, মালখানগর থেকে বৈকুণ্ঠ কুণ্ডু। তা ছাড়া এই রাজদিয়ার লারমোর, রামকেশব, হেডমাস্টার মোতাহার সাহেব—এঁরা তো আছেনই।

সন্ধের পর ডে-লাইট আর হ্যাজাকের আলোয় বাড়িটা যেন দিনের মতন হয়ে উঠল। তখন থেকে দলে দলে অন্য নিমন্ত্রিতেরা আসতে লাগল।

পুবের ভিটির বড় ঘরখানা সাজিয়ে গুছিয়ে সিংহাসনের মতন কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড একটা চেয়ারে পাখিকে বসানো হয়েছে। সারা বিকেল ধরে সুধা-সুনীতি তাকে সাজিয়েছে। স্নেহলতা লোহার সিন্দুক খুলে গয়নার বাক্স বার করে দিয়েছিলেন।

পাখির পরনে লাল টুকটুকে বেনারসী। মাথায় সোনার মুকুট, কপালের কাছে গোল টিকলি, ওপর হাতে আড়াই-পেঁচি অনন্ত, নিচের দিকে গোছা গোছা চুড়ি, গলায় সীতাহার। দু'হাতে কম করে ছ'টা আংটি, কোমরে সোনার বিছে, পায়ে তোড়া।

সব মিলেয়ে পাখিকে রাজেন্দ্রাণীর মতন দেখাচ্ছিল।

পুবের ঘরেই সব চাইতে বেশি ভিড়। বিনু আর ঝিনুকও ঐ ঘরেই আছে। স্নেহলতা-সুধা-সুনীতি-সুরমা পাখিকে ঘিরে বসে আছেন।

একেকটা দল আসছে, পাখির হাতে উপহার তুলে দিচ্ছে। পাখির হাত ঘুরে সেগুলো যাচ্ছে সুধা-সুনীতির কাছে। সুধারা সেগুলো একধারে সাজিয়ে নম্বর দিয়ে খাতায় লিখে রাখছে।

স্নেহলতা উপহারদাতাদের শুধোন, 'বউ কেমন দেখলে?'

উত্তর আসে, 'সোন্দর। কিবা রং, কিবা চোখ, কিবা হাত-পায়ের গড়ন—'

'আমার বাড়িতে মানাবে, কি বল?'

'নিয্যস—'

উৎসবের ঘোর বুঝি ছোট্ট ঝিনুকের মনেও লেগেছে। ফিসফিস গলায় সে ডাকে, 'বিনুদাদা—'

মুখ ফিরিয়ে বিনু বলে, 'কী?'

'বিয়ে করতে বেশ লাগে, না?'

অন্যমনস্কের মতন বিনু জবাব দেয় 'হুঁ—'

উত্তরের ঘর, দক্ষিণের ঘর, পুবের ঘর, পশ্চিমের ঘর—সব জায়গায় নিমন্ত্রিতদের জন্য আসন পড়েছে। রাত একটু বাড়লে খাবার ডাক পড়ল।

নিমন্ত্রিতরা সবে বসতে শুরু করেছে, সেই সময় গোলগাল ঘটের মতন চেহারার একটি লোক এসে উঠোনে দাঁড়াল। ফর্সা টুকটুকে রঙ তার। পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি আর ফতুয়া। কাঁধে পাট-করা ময়লা চাদর, খালি পা।

উঠোনে পা দিয়েই সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'অতিথ আইলাম হ্যামকত্তা—'

হেমনাথ আর লারমোর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য, নিমন্ত্রিতদের খাওয়াদাওয়া তদারক করা। তাঁদের পাশে বিনু। হেমনাথ প্রায় ছুটেই লোকটার কাছে চলে গেলেন। বললেন, 'এস—এস চক্কোত্তি, তোমার কথাই আজ সকাল থেকে মনে পড়ছিল। আমার বাড়িতে একটা শুভ কাজ হচ্ছে, অথচ তোমরই পাত্তা নেই।'

লোকটা এক গাল হাসল, 'আপনে নিচ্চিন্ত থাকেন হ্যামকত্তা। কুনো বাড়িতে কিয়াকম্ম হইলে আমি ঠিক ট্যার পাইয়া যাই। আমারে ফাকি দ্যাওন সহজ না।'

লারমোর ওধার থেকে বলে উঠলেন, 'তা ঠিক। বিশ মাইল দূর থেকে তুমি লুচিভাজার গন্ধ পাও।'

লোকটা হাসতেই লাগল, 'তা যা কইছেন লালমোহন সায়েব।'

এদিকে লোকটাকে দেখে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। সবাই উৎসুক, চকচকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে, 'গদু চক্কোত্তি আইছে, গদু চক্কোত্তি আইছে। আইজ আসর জমব ভাল।'

লোকটার নাম জানা গেল—গদু চক্কোত্তি। এমন অদ্ভুত নাম আগে আর কখনও শোনেনি বিনু। তা ছাড়া নিমন্ত্রিতদের তালিকায় গদু চক্কোত্তি ছিল না। যাদের যাদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে তাদের বাড়িতে হেমনাথের সঙ্গে গিয়েছিল বিনু, গদু চক্কোত্তির বাড়ি সে যায় নি।

সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে সবাই গদু চক্কোত্তিকে চেনে এবং সে আসাতে সকলেই ভারি খুশি।

লারমোরের পাশ থেকে বিনু হঠাৎ বলে উঠল, 'লোকটা কে লালমোহন দাদু?'

লারমোর বললেন, 'গদু চক্কোত্তি—'

'নামটা তুমি বলবার আগেই শুনেছি। কিন্তু—'

বিনুর মনের কথাটা চট করে বুঝে নিলেন লারমোর। তারপর বললেন, 'নাম শুনলেই চলবে না, কেমন? কোথায় থাকে, কী তার পরিচয়, এ সবও জানতে হবে, তাই না? ওর বাড়ি হচ্ছে কাজিরপাগলা বলে একটা গ্রামে, এখান থেকে মাইল দশেক পুবে। আর পরিচয়? সেটা একটু পরেই

টের পাবি দাদাভাই। আমি আর মুখে কতটুকু বলতে পারব।'

বিনুর খুঁতখুঁতুনি তবু গেল না। সে বলল, 'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'আমার যদ্দুর মনে আছে একে নেমন্তন্ন করা হয়নি।'

'ওকে নেমন্তন্ন করতে হয় না।'

বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকল বিনু। বিনা নেমন্তন্নে কেউ এভাবে চলে আসতে পারে তার কাছে এটা নিতান্তই অভাবনীয়।

লারমোর এবার যা বুঝিয়ে বললেন, সংক্ষেপে এইরকম। এই জলবাংলায় যত গ্রাম-গঞ্জ আছে সব জায়গায় গদু চক্কোত্তির অবাধ গতিবিধি। এ দেশের সবাই তাকে চেনে। বিয়ে-অন্নপ্রাশন-পৈতা—যেখানে উৎসবের ব্যাপার থাকে, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার থাকে—গন্ধ শুঁকে শুঁকে গদু চক্কোত্তি ঠিক হাজির হবেই। এই জলের দেশে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। ভালমন্দ খাওয়া ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। তার কাছে বেঁচে থাকার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য, তা হল খাওয়া। এক ভোজবাড়ি থেকে আরেক ভোজবাড়ি—সারা জীবন এইভাবে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে গদু চক্কোত্তি। এই প্রাচুর্যের দেশে সে রবাহূত এলেও কেউ অসন্তুষ্ট হয় না, বরং যথেষ্ট সমাদর করেই তাকে গ্রহণ করা হয়।

যত শুনছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল বিনু।

এদিকে হেমনাথ গদু চক্কোত্তিকে বলছিলেন, 'কি চক্কোত্তি, এখনই খেতে বসবে, না নতুন বউ দেখে, পরে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই গদু চক্কোত্তি বলে উঠল, 'পাত যহন পইড়াই গেচে তহন বইসাই পড়ি। পরে বউ দেখুম।'

এখানেই হাত-পা ধোয়ার জল আনিয়ে দিলেন হেমনাথ। হাত-মুখ ধুয়ে একটা আসনে বসতে বসতে নিমন্ত্রিতদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল গদু চক্কোত্তি। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'একজনেরও খাওইয়ার লাখান চেহারা না। এয়াগো তো সব বগের আধার (এরা বকের মতন সামান্য খায়), এগো লগে খাইতে বইসা সুখ নাই, নিজেরই লজ্জা। পাল্লাদার না হইলে আসর জমে না।' বলতে বলতে কী মনে পড়তে চোখমুখ আলো হয়ে উঠল তার, 'ভাল কথা, আপনেগো এইখানে বুধাই পালের ভাই হাচাই পাল তো মন্দ খাওইয়া না, তারে খবর দ্যান হ্যামকত্তা—'

হাচাই পালের নেমন্তন্ন হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে এখনও আসেনি। তক্ষুণি লোক পাঠিয়ে কুমোরপাড়া থেকে তাকে ধরে আনা হল। সব শুনে হাত জোড় করে হাচাই পাল বলল, 'আমি কি চক্কোত্তি ঠাউরের লগে পাল্লা দিতে পারুম?'

গদু চক্কোত্তি হাচাই পালের এই বিনয়ে খুবই সন্তুষ্ট। মুরুব্বিয়ানার সুরে বলল, 'তুমি ক্যান, এই ঢাকার জিলায় কুনো সুমুন্দি নাই আমার লগে পাল্লা দ্যায়। তয় কিনা, একজন ভাল খাওইয়া কাছে বইলে খাইতে আইট হয়।'

অগত্যা হাচাই পালকে তার মুখোমুখি বসতে হল।

হেমনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও রে লুচি দে, লুচি দে—'

গদু চক্কোত্তি খায় আর গল্প করে। কোথায় কোন রাজবাড়িতে দশ সের দই খেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, কোথায় শুধু তিন কড়াই মুগের ডাল খেয়েছিল, কোথায় বড় বড় খাইয়েরা পাল্লা দিতে এসে তার কাছে হেরে ভূত হয়ে গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য দিগ্বিজয়ের কাহিনী বলে যেতে লাগল।

গদু চক্কোত্তির খাওয়া সত্যিই দর্শনীয়। নিমন্ত্রিতরা খাবে কি, হাঁ করে তাকিয়ে আছে। শুধু কি তাই, বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েরা পর্যন্ত বেরিয়ে এসে তার খাওয়া দেখছে। এর মধ্যেই বিনু টের পেয়ে

গেছে, খাইয়ে হিসেবে এ অঞ্চলে গদু চক্কোত্তির বিপুল খ্যাতি, অসীম প্রতিষ্ঠা।

হাচাই পাল মোটামুটি ভালই পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। গদু চক্কোত্তি শুধু বেগুনভাজা দিয়ে কুড়িখানা লুচি খেল, হাচাই পালও তাই খেল। ফুলকপির তরকারি দিয়ে গদু চক্কোত্তি খেল চল্লিশখানা লুচি, হাচাই পালও চল্লিশখানাই খেল। তবে লক্ষ করা গেল, তার চোখমুখ যেন কেমন কেমন। পেটটা সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, পিঠটা পেছনে হেলে যাচ্ছে।

কপির পর এল মাছ। পঞ্চাশ টুকরো মাছ আর বত্রিশখানা লুচি অদৃশ্য করে দেবার পর হাচাই পালের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পেছন দিকে আরো হেলে পড়েছে সে। হঠাৎ দুই হাত জোড় করে সে লম্বা হয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমারে ক্ষমা করেন চক্কোত্তি কত্তা, আপনের লগে পাল্লা দ্যাওন আমার কাম না। হুকুম করেন, আমি যাই।' বলে দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

হাচাই পাল চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল গদু চক্কোত্তি, তারপর বিমর্ষ মুখে বলল, 'এইসব মানুষ ক্যান যে আসরে আইসা বসে। খাওয়াটাই মাটি।' বলে আবার খেতে শুরু করল।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিল বিনু। গদু চক্কোত্তির কোমরের কষিটা বুকের কাছে বাঁধা। খাচ্ছিল আর খানিকটা পর পরই হ্যাঁচকা টানে সেটা নিচের দিকে নামাচ্ছিল সে।

অবাক বিস্ময়ে বিনু লারমোরকে জিজ্ঞেস করল, 'ঐটুকু ঐটুকু করে কাপড়টা নামাচ্ছে কেন লালমোহনদাদু?'

লারমোর হাসতে হাসতে সকৌতুকে বললেন, 'পেটের যেটুকু যেটুকু ফিল-আপ হচ্ছে, কাপড়টা সেইটুকু সেইটুকু নামাচ্ছে। তারপর নাইকুণ্ডল থেকে যখন এক ইঞ্চি ঐ কষি নামাবে তখন খাওয়া শেষ।'

নাভির তলায় কাপড় নামাতে পরিবেশনকারীদের যে কতবার ছোটাছুটি করতে হল তার আর হিসেব নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর ট্যাঁক থেকে একটা দোয়ানি বার করে পাখিকে আশীর্বাদ করল গদু চক্কোত্তি। তারপর হেমনাথকে বলল, 'অহন যাই হ্যামকত্তা।'

হেমনাথ বললেন, 'এত রাত্রে কোথায় যাবে?'

'নবীগঞ্জের 'গয়নার নাও' ধরুম।'

'কাল সকালে গেলে হয় না?'

'উঁহু। কাইল সকালে ঐখানে এক বাড়িতে পৈতা আছে। আইজই আমারে রওনা দিতে হইব।'

'তা হলে তো তোমাকে ছেড়ে দিতেই হয়।'

গদু চক্কোত্তি চলে গেল। যাবার আগে বিনুর মনে বিচিত্র বিস্ময়ের রেশ রেখে গেল।

বৌভাতের দিন পাখিদের বাড়ির সবাই এসেছিল। তাদের নিয়ে এসেছিল গোপাল দাস আর ধনঞ্জয়। গোপাল দাস সেদিন কিছুতেই খায়নি। যতদিন না মেয়ের ছেলেপুলে হচ্ছে ততদিন তার শ্বশুরবাড়ির জলটুকুও ছোঁবে না।

বৌভাতের অনুষ্ঠান শেষ হলে গোপাল দাসরা চলে গিয়েছিল। যাবার আগে মেয়ে-জামাইকে দ্বিরাগমনে

নেমন্তন্ন করে গেছে।

পাখিরা টুনিদের বাড়ি দ্বিরাগমনে যাবে না, যাবে ভাটির দেশে গোপাল দাসের বাড়ি।

গোপাল দাসদের নিয়ম অনুযায়ী বৌভাতের আড়াই দিন পর দ্বিরাগমনে যাবার কথা। যুগলদের রওনা হতে হতে পাঁচদিন কেটে গেল। এখন শুকনোর সময়। বাড়ি থেকে লারমোরের ফিটনে নদীর ঘাটে এসে কেরায়া নৌকায় উঠল পাখিরা। তাদের বিদায় দেবার জন্য বাড়ির সবাই সঙ্গে এসেছিল।

নৌকো ছাড়ার মুখে স্নেহলতা বললেন, 'সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসবি যুগল।'

যুগল মাথা নাড়ল, 'আইচ্ছা—'

'বেশিদিন কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থাকতে নেই, বুঝলি ?'

ঘাড় কাত করে যুগল জানাল, বুঝেছে।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'বেশিদিন থাকলে নিন্দে হয়।'

সেই যে যুগল দ্বিরাগমনে গিয়েছিল তারপর আর কোনো খবর নেই। সাত দিনের ভেতর ফিরে আসার কথা। সাতদিনের জায়গায় পনের দিন গেল, পনের দিনের পর মাসও যায় যায়। না ফিরল যুগল, না এল পাখি।

সবাই অস্থির, চিন্তিত। হেমনাথ ঠিক করলেন, ভাটির দেশে গোপাল দাসের বাড়িতে লোক পাঠাবেন। লোক আর পাঠাতে হল না, তার আগেই যুগলের চিঠি এল। নিজে তো আর লেখাপড়া জানে না, অন্য কাউকে দিয়ে লিখে পাঠিয়েছে।

শ্রীচরণ কমলেষু,

প্রণাম অন্তে জানিবেন, আমরা মঙ্গলমত পৌঁছিয়াছি। পত্র দিতে দেরি হইল বলিয়া মনে কিছু করিবেন না।

যাহা হউক, বর্তমান জানিবেন আমাদিগের আর রাজদিয়া ফিরত যাওয়া হইবে না। শ্বশুরমহাশয়ের পুত্রাদি নাই। তাঁহার ইচ্ছা আমি এইখানেই বসবাস করি।

এখানে আমার থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কী করিব ? শ্বশুরমহাশয়ের অনেকগুলি পুকুর। ইদানীং কয়েকটি বিলও তিনি ইজারা লইয়াছেন। বিল এবং পুকুরে প্রচুর মাছ। কই, বোয়াল, চিতল, মাগুর, কাজলি, বাতাসী, কালিবাউস, রুই, কাতল, ফলি, পাবদা ইত্যাদি। এত মাছ ফেলিয়া আমার রাজদিয়া ফিরিয়া যাইতে মন চায় না।

ঠাকুমা, আপনি এবং বাটীস্থ সকলে আবার প্রণাম নিবেন। ছোটবাবুকে বলিবেন আমার জন্য যেন মন খারাপ না করে।

আগতে আপনাদের কুশল দানে সুখী করিবেন ইতি—

আপনার সেবক—যুগল।'

চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ বিষণ্ণ মুখে বসে রইলেন হেমনাথ। স্নেহলতা কাঁদলেন। সত্যিই ছেলেটার ওপর বড় মায়া পড়ে গিয়েছিল তাঁদের।

যুগল না ফেরাতে সব চাইতে যার বেশি মন খারাপ হয়েছে সে বিনু। বুকের ভেতরটা সবসময় তার ভারি হয়ে থাকে।

যুগল তাকে হাতে ধরে জলে নামিয়েছে, সাঁতার শিখিয়েছে। নৌকো বাওয়ার, মাছমারার কৌশল আয়ত্ত করিয়েছে। হেমন্তের স্থির নিস্তরঙ্গ জলে অলস কচ্ছপ এবং শীতের শূন্য মাঠে 'সুন্দি কাউঠ্যা'র আস্তানা চিনিয়েছে। এই জলের দেশের প্রতিটি বৃক্ষলতা, প্রতিটি পশুপাখি, প্রতিটি তৃণের নাম সে মুখস্ত করিয়েছে। এখানকার বিশাল নদী, বিরাট আকাশ আর সীমাহীন মাঠের মাঝখানে এক অপার অথৈ বিস্ময়ের ভেতর বার বার তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিনুর চোখে নতুন রং ধরিয়ে দিয়েছে। একা

একা মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতে, জলের ভেতর মাছের খেলা দেখতে কিংবা গাছের ডালে মোহনচূড়া পাখিটার নাচানাচি দেখতে যে আজকাল ভাল লাগে, সে ঐ যুগলের জন্য। এই অসীম বিশ্বের বাধাবন্ধহীন ফসলের খেতে, আঁকাবাঁকা আলপথে, স্তূপের মতন সাজানো আকাশের মেঘগুলিতে কিংবা স্থির জলে নলঘাসের প্রতিবিম্বের মধ্যে যে এত আনন্দ ছড়ানো ছিল, এ খবর যুগলের আগে আর কেউ তাকে দেয়নি।

আপন অভিজ্ঞতার সবটুকু সার বিনুর হাতে তুলে দিয়ে চলে গেছে যুগল। তার জন্য তোলা সেই নতুন ঘরখানায় তালা দিয়ে রেখেছেন স্নেহলতা। প্রায় রোজই তার কথা হয়। অনেক দিনের অনেক স্মৃতির কথা বলতে বলতে চোখ ঝাপসা হয়ে যায় স্নেহলতার। শুনতে শুনতে বিনুর মনে বিষাদ ঘন হতে থাকে।

যুগল নেই। আজকাল বিনুর ছোটাছুটি ঘোরাঘুরি অনেক কমে গেছে। কাজ বলতে এখন শুধু পড়াশুনো, স্কুলে যাওয়া, ঝিনুকের সঙ্গে ঝগড়া, আর দু-চারদিন পর পর পোস্ট অফিসে গিয়ে সুনীতির চিঠির খোঁজ করা। আনন্দর চিঠি এলে বইয়ের ভেতর লুকিয়ে বাড়ি এসে সুনীতিকে দেয় বিনু, তার জন্য দু আনা করে পয়সা পায়।

নিবারণ পিওন বলে, 'দাদুভাই, তুমি আইসা চিঠি নিয়া যাও। আমি গেলে একবেলা দুই মুঠা ভালমন্দ খাইতে পাইতাম।'

বিনু বলে, 'চিঠির সঙ্গে কী, আপনি এমনি গিয়ে খেয়ে আসবেন। আর এই চিঠির কথা কাউকে বলবেন না।'

হেসে হেসে, নিবারণ বলে, 'হেয়া আমি জানি, ব্যাপারখান বড় গুপন (গোপন)।'

বিনু হাসে, কিছু বলে না। সুনীতি চিঠির ব্যাপারটা নিয়ে নিবারণের সঙ্গে অলিখিত একটা চুক্তি হয়ে গেছে তার।

মাঘের শেষাশেষি যুগল দ্বিরাগমনে গিয়েছিল। তারপর একে একে ফাল্গুন এল, চৈত্র এল। হেমনাথের বাগানে মান্দার গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল, শিমুলগাছের মাথায় থোকা থোকা আগুন জ্বলতে লাগল। জামরুল আর কালোজাম, রোয়াইল আর কাউগাছগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়ল। আমের গাছগুলোতে বোল এসেছিল মাঘের গোড়ায়, এখন গুটি ধরেছে। লক্ষ লক্ষ ফড়িং ঝিরঝিরে পাতলা ডানায় বাগানময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর উড়ছে পাখি—শালিক, চড়ুই, বুনো টিয়া, বুলবুলি। দক্ষিণ দিক থেকে আজকাল ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ হাওয়া বইতে থাকে।

এই ফুল-ফল-হাওয়া, এই পাখি পতঙ্গ, যুগল ছাড়া সব অকারণে, সবই বৃথা। অন্তত বিনুর তাই মনে হয়।

যুগল চলে যাবার পর কিছুদিন সময় যেন থমকে ছিল। তারপর আবার চিরাচরিত পুরনো নিয়মে চলতে শুরু করেছে। নবু গাজির ছেলের সঙ্গে মজিদ মিঞার মেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে এর মধ্যে। বিনুরা কেতুগঞ্জে গিয়ে সারাদিন থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে। স্নেহলতা-শিবানী-সুরমা-হেমনাথ প্রত্যেকেই যে যার নিজের কাজের চাকায় বাঁধা। এরই ভেতর একদিন সময় করে বুধাই পালের মেয়ের

মাঘমন্ডলের ব্রত সাঙ্গ করিয়ে এসেছেন স্নেহলতা। হেমনাথের মতন তাঁরও দায়দায়িত্ব কি এক-আধটা ? পরিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব—সবই পালন করতে হয়। সুধা-সুনীতি নিয়মিত কলেজ করে যাচ্ছে।

তবে সব চাইতে পরিবর্তন হয়েছে অবনীমোহনের। জমি পেয়ে একেবারে মেতে উঠেছেন তিনি। ধান উঠে যাবার পর পৌষ মাসে রবিশস্যের বীজ ছড়িয়েছিলেন—মুগ,তিল, মটর, খেসারি। চৈত্রের গোড়ায় রবিফসল উঠে গেছে, চৈত্রের শেষাশেষি হাল-লাঙল নিয়ে আবার মাঠে নেমে পড়েছেন। এ জন্য আটটা কামলা রেখেছেন অবনীমোহন, বলদ কিনেছেন ষোলটা। জমি চৌরস করে রাখবেন এখন, তারপর নতুন বর্ষার জল পড়লেই আউশ বুনবেন।

হেমনাথ ঠাট্টা করেন, 'তুমি দেখি দু'দিনেই আমাদের চাইতেও বড় চাষী হয়ে উঠলে অবনী।'

অবনীমোহন কিছু বলেন না, শুধু হাসেন।

সুরমা বলেন, 'দেখ, ক'দিন উৎসাহ থাকে।'

চৈত্রের পর এল নিদারুণ খরার দিন। মাঠ ফেটে এখন চৌচির। আলের ধারের জলসেঁচি শাকগুলো পুড়ে পুড়ে হলুদ হয়ে যেতে লাগল। মেঘশূন্য আকাশ সারাদিন গলা কাঁসার রং ধরে থাকে। অনেক, অনেক দূরে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমেছে সেইখানে আগুনের হলকা কাঁপতে থাকে। কার সাধ্য সেদিকে তাকায়।

সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে সন্ধেবেলায় ফেরেন অবনীমোহন। ফিরেই দু'দিনের বাসি খবরের কাগজ নিয়ে বসেন।

পুজোর পর সেই যে কলকাতায় গিয়েছিলেন অবনীমোহন তখনই তাঁর নামে রাজদিয়ায় খবরের কাগজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। টাটকা টাটকা খবর আর কেমন করে পাওয়া যাবে ? কলকাতায় যে কাগজ আজ বার হয় ট্রেনে-স্টিমারে রাজদিয়ায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে তার দু'দিন লেগে যায়। কী আর করা যাবে, এই গ্রামদেশে দু'দিনের বাসি খবর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অবনীমোহনকে।

আজকাল কাগজভর্তি শুধু যুদ্ধের খবর। ক'মাস আগেও রাজদিয়ার মানুষের যুদ্ধ সম্বন্ধে মাথাব্যথা ছিল না। কোথায় জার্মানি, কোথায় ফ্রান্স, কোথায় গ্রিস, কোথায় ইংল্যান্ড, কোথায় বা বলকান কান্ট্রি—ভূগোলের কোন প্রান্তে এই দেশগুলো ছড়িয়ে আছে অর খোঁজ রাখার প্রয়োজন বোধ করত না তারা। কিন্তু ইদানীং রাজদিয়ার গায়ে যুদ্ধের আঁচ লাগতে শুরু করেছে।

সন্ধে হলে নিকারীপাড়ার আইনুদ্দি, সর্দারপাড়ার ইচু মণ্ডল, কুমোরপাড়ার হাচাই পাল, বুধাই পাল, যুগীপাড়ার গোসাঁইদাস—এমনি অনেকে এসে হাজির হয়। এ ছাড়া হেমনাথ-সুধা-সুনীতি-বিনুরা তো আছেই।

সবাই এসে জড়ো হলে অবনীমোহন হারিকেনের আলো উসকে দিয়ে কাগজ পড়তে শুরু করেন।

পুজোর পর ব্যবসাপত্তরের ব্যবস্থা করতে কলকাতায় গিয়েছিলেন অবনীমোহন। ফিরে আসার পর থেকেই খবরের কাগজ পড়ার আসর বসছে। প্রথম দিকে ইচু মন্ডলরা আসত না, তখন বাড়ির লোকদের শোনাতেন অবনীমোহন। পরে খবর পেয়ে ইচু মন্ডলরা আসতে শুরু করেছে। আজকাল তারা নিয়মিত আসে।

অবনীমোহন কোনোদিন পড়েন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের আওতার ভিতর চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রেরিত সমরোপকরণ যাহাতে বৃটেনে পৌঁছাইতে না পারে সে জন্য জার্মান বিমান ও ইউ বোটগুলি আটলান্টিকে হানা দিয়া ফিরিতেছে।'

'দূর প্রাচ্যে ঘোরালো অবস্থা। বৃটেন সেখানে ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।'

'সিঙ্গাপুরের খবরে প্রকাশ, হাজার হাজার অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছে এবং মালয়ের বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করিয়াছে।'

কোনোদিন পড়েন, 'বাংলা সরকারের ইস্তাহার, বিমান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হউন। কলিকাতা শহরে হাজার হাজার আগুনে বোমা পড়িতে পারে, তবে আগুনে বোমা দেখিয়া ভয় পাইবেন না।'

'সিঙ্গাপুরের খবর : হাইনান ও টঙ্কিনে জাপানিরা দশ ডিভিশন সৈন্য সন্নিবেশ করিতেছে। ইন্দোচিনের দরিয়ায় জাপানের নৌবাহিনী টহল দিতেছে।'

কোনোদিন পড়েন, 'জাপ পররাষ্ট্র সচিব মাৎসুওকা বার্লিন যাইবার পথে মস্কোতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।'

কোনোদিন পড়েন, 'জার্মানি কর্তৃক যুগোস্লাভিয়া ও গ্রিস আক্রমণ। যুগোস্লাভিয়াকে হাত করিয়া গ্রিসের উপর আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় নাৎসীরা যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করে। বেলগ্রেডে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ—'

'জাপ-সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।'

'জার্মানির দুর্ধর্ষ সামরিক বিমান 'য়ুঙ্কারের' আবির্ভাব।'

কোনোদিন অবনীমোহন পড়েন, 'চিন-জাপান যুদ্ধের নতুন অধ্যায়। মহাচিনে চুংকিঙ সরকারের সহিত কমিউনিস্টদের মিটমাট হইয়াছে। চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্ট চতুর্থ বাহিনী ভাঙিয়া দিবার পর উত্তর-পশ্চিম চিনে কমিউনিস্ট অষ্টম বাহিনী চুংকিঙের সহিত সহযোগিতা করিতেছিল না। ফলে তাহারা জাপ আক্রমণ ঠেকাইতে পারিতেছিল না। এই অবস্থায় চুংকিঙ সরকার কমিউনিস্টদের নিকট আবেদন জানান। ইহার পর কমিউনিস্টরা তাহাদের সহিত যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। এখন তাহারা মিলিতভাবে আক্রমণ করায় জাপানিরা মুশকিলে পড়িয়াছে।'

'শেনসি, সানসি ও হোনানে পাল্টা আক্রমণ চলিতেছে।'

কোনোদিন পড়েন, 'জার্মানির বিরুদ্ধে আমেরিকার আচরণ ক্রমেই উগ্রতর হইয়া উঠিতেছে। মার্কিন সরকার আমেরিকায় জার্মান দূতাবাস, তাদের পাঠাগার, টুরিস্ট ব্যুরো, ট্রান্স ওসেন নিউজ এজেন্সি বন্ধ করিয়া দিয়োছেন।'

কোনোদিন পড়েন, 'রুশ-জার্মান যুদ্ধের শুরু।'

'লেনিনগ্রাদ, সেবাস্টিপুল, ওদিকে হেলসিঙ্কি, ওয়ারশ, ডানজিগে জার্মান বোমাবর্ষণ।'

'কৃষ্ণসাগর হইতে শ্বেতসাগর পর্যন্ত যুদ্ধের বিস্তৃতি।'

'জার্মানদের বর্তমানে চারটি প্রধান লক্ষ্য-মুরমানস্ক, লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও কিয়েফ।'

কোনোদিন পড়েন, 'চিন-জাপান যুদ্ধ চার বছর পার হইয়া পাঁচ বছরে পড়িল।'

'রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরু হইবার পর আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি বিস্তারের দিকে মনোযোগ।'

খবরের কাগজের পাতা জুড়ে শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ, উত্তেজনা আর আতঙ্ক। শ্বাস টানলে বাতাসে বারুদের গন্ধ পাওয়া যায়। দেশ-দেশান্তর জুড়ে সেই আগুনের চাকা যেন আরো, আরো বড় হয়ে ঘুরতে শুরু করেছে।

রোজই খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেলে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়।

ইচু মণ্ডল বলে, 'জারমান-জুরমান, মাৎসুকা, লেনিনগোরাদ—নামগুলান জবর খটমইট্যা।'

অবনীমোহন হাসেন, 'হ্যাঁ।'

'জাগাগুলি (জায়গাগুলো) কুনখানে জামাই ?'

'ওর ভেতর শুধু জায়গার নাম নেই, মানুষের নামও আছে। জায়গাগুলো এখান থেকে অনেক দূরে।'

ইচু মণ্ডল মাথা নাড়ে, 'হেয়া বুঝছি। আমাগো দ্যাশে অমুন খটর মটর নাম নাই।'

বুড়ো রসিক শীল বলে, 'আইচ্ছা জামাই—'

ইতিমধ্যে রাজদিয়া এবং চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদে 'জামাই' নামে পরিচিত হয়েছেন অবনীমোহন।

হেমনাথের ভাগনী-জামাই, সেই সুবাদে এ অঞ্চলের জামাই হয়ে গেছেন। ঐ নামেই সবাই তাঁকে ডাকে।

অবনীমোহন বলেন, 'কী বলছেন?'

'খবরের কাগজ শুইনা তো মনে লাগে চাইর দিকে বেড়া আগুন লাগছে। আপনের কী মনে হয়?'

'কী ব্যাপারে?'

'যুজ্যু (যুদ্ধ) কি আমাগো এই রাইজদিয়াতেও আইসা পড়ব?'

'কেমন করে বলি!'

ওধার থেকে হাচাই পাল বলে ওঠে, 'যুজ্যু লাগব কিনা কেঠা কইব। তয়—'

অবনীমোহন শুধোন, 'তবে কী?'

'বাজারে আগুন লাইগা গেছে।'

বুধাই পাল বলে 'হে যা কইছ ঠাউরভাই, আগুনই লাগছে। আমাগো লাখান গরিব মাইনষে আর বাচবো না। বাগুনর স্যার (সের) আছিল এক পহা দ্যাড় পহা, হেই বাগুন অহন তিন পহা চাইর পহার বিকাইতে আছে।'

ইসমাইল চৌকিদার বলে, 'মলন্দি মাছ আর বজুরি মাছের ভাগা আছিল দুই পহা কইরা। তার দাম উঠছে ছয় পহা। এক গেলাস মাঠা চাইর পহা। পটল যে পটল , মূলা যে মূলা, ঝিঙ্গা যে ঝিঙ্গা, বাঙ্গী যে বাঙ্গী—কোন জিনিসখানে হাতে দিতে পারবা! সগল আগুন।'

ইচু মন্ডল বলে, 'মাছ-বাগুন-মূলা-পটল এক কিনারে থুইয়া দাও। যেই দব্য না হইলে পরান বাচে না তার খবর রাখ?'

সমস্বরে অন্য সবাই শুধোয়, 'কোন দব্য?'

ইচু মন্ডল বলে, 'চাউল রে ভাই, চাউল। চাউলেই ঘাউল করছে। গেল হাটে চাউলের দর কত উঠছে জানো?'

'কত? কত?'

'আঠার ট্যাকা মণ।'

অনেকগুলো ভীতিবিহ্বল কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'কও কী মন্ডলের পুত!'

ইচু মন্ডল মাথা নাড়ে, 'ঠিকই কই রে দাদারা, ঠিকই কই।'

বুধাই পাল বলে, 'গেল হাটে চাউল কিনি নাই। তার আগের হাটে কিনছিলাম। তহন দর আছিল বার ট্যাকা মণ। সাত দিনের ভিত্রে ছয় ট্যাকা চইড়া গেল!'

ইচু মন্ডল বলে, 'দরের অহনই দেখছ কী! ব্যাপারীরা কইতে আছিল, পরের হাটে আরো চড়ব।'

'সত্য?'

'সত্য।'

'তাইলে উপায়! আরো দর চেতলে (বাড়লে) খামু কী? পোলা-মাইয়ারে খাওয়ামু কী?'

'খাইতে আর হইব না, শুকাইয়া মরতে হইব।'

'কী যুজ্যু যে লাগল!'

এ ক'মাসে খবরের কাগজের পাতা জুড়ে যুদ্ধের খবরই বেশি। তার ফাঁকে ফাঁকে অন্য খবরও চোখে পড়েছে অবনীমোহনের। সেগুলোও পড়ে পড়ে শুনিয়েছেন তিনি।

'সত্যাগ্রহ করিয়া মৌলানা আজাদের আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ড লাভ।'

'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান। কিছুদিন যাবৎ সুভাষচন্দ্র মৌনাবলম্ব করেন এবং নিজের ঘরে গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন। হঠাৎ দেখা যায় তিনি অন্তর্ধান করিয়াছেন। যেদিন তাঁহার গৃহত্যাগের

সংবাদ প্রকাশ পায় সেদিন ভারতরক্ষা আইনের বলে তাঁহার বিচারের দিন ছিল। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ফলে সারা ভারতবর্ষে নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।'

'নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য। দাম বাড়িয়া যাওয়া অসন্তোষ নানা স্থানে ধর্মঘট।'

এসব ছাড়া মুসলিম লিগের খবর, কংগ্রেসের খবর, নেহরু-জিন্না-গান্ধিজি এবং হকসাহেবের খবর তো ছিলই। আর ছিল জিন্নাসাহেবের দেশ ভাগাভাগি করে নেবার পরিকল্পনা এবং দাবি।

সুভাষচন্দ্র-পাকিস্তান-গান্ধি-জিন্না এসব নিয়েও হেমনাথের ঘরের দাওয়ায় হারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় বসে শ্রোতাদের কম আলোচনা হয়নি, দেশের রাজনৈতিক আর রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে তারা কম মাথা ঘামায় নি।

ইচু মন্ডল বলেছে, 'আইচ্ছা জামাই—'

'বলুন—' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছেন অবনীমোহন।

'সুভাষবাবু গেল কই ?'

'কী করে বলি।'

'সুভাষবাবু খুব বড় মনিষ্য (মানুষ)।'

'নিশ্চয়ই।'

'এংরাজগো চৌখরে ফাকি দিয়া যাওন সোজা না।'

'তা তো ঠিকই।'

ওধার থেকে উদ্বেগের গলায় ইসমাইল চৌকিদার শুধিয়েছে, 'সুভাষবাবুরে এংরাজরা আর ধরতে পারব ?'

অবনীমোহন বলেছেন, 'কিছুই বলতে পারছি না।'

ইচু মণ্ডল বকের পাখার মতন সাদা ধবধবে দাড়ি নেড়ে বলেছে, 'সুভাষবাবুরে আমি দেখছি।'

ইসমাইল চৌকিদার, রজবালি সিকদার, বুধাই পালেরা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছে, 'কই দেখলা চাচা, কই দেখলা ?'

'বরিশালে, তেনি ঐখানে আইছিল। কী সোন্দর দেখতে, য্যান রাজপুত্তুর।'

কথায় কথায় দেশভাগের কথাও এসে পড়েছে। পাকিস্তানের কথা এসেছে।

এ প্রসঙ্গে বুধাই পাল বলেছে, 'অ গো হ্যামকত্তা, অ গো জামাইকত্তা—'

হেমনাথ অবনীমোহন দু'জনেই তার দিকে তাকিয়েছেন।

বুধাই পাল একবার বলেছে, 'মাইনষের মুখে শুনি, খবরের কাগজেও লেখছে, দ্যাশখান নিহি ভাগাভাগির কথা হইতে আছে। একখান ভাগ হিন্দুর, একখান মুসলমানের।'

হেমনাথ আস্তে আস্তে করে মাথা নাড়েন।

'দ্যাশ আবার ক্যামনে ভাগ হয় ?'

'কি জানি—'

এই সময় ইচু মন্ডল হঠাৎ বলে উঠেছে, 'দ্যাশভাগের কথায় একখান কথা মনে পড়ল। সম্বাদখান তোমাগো শুনাই।'

'কও, কও—' সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

'বুঝলা নি ভাইস্তারা (ভাইপোরা), হেই—হেইবার—' গলার স্বরে দীর্ঘ টান দিয়ে একটু থেমেছে ইচু মন্ডল। হয়তো মনে মনে বক্তব্যটাকে গুছিয়ে নিচ্ছিল সে।

শ্রোতাদের তর আর সইছিল না। ভাববার মতন সময়টুকু দিতেও তারা রাজি না। সকলে সমস্বরে তাড়া দিয়ে উঠেছে, 'কোন বার চাচা, কোন বার ?'

ইচু মন্ডল পাকা ভুরুদুটো কুঁচকে বলেছে, 'হেই যেইবার জোড়া বান ডাকল। কী তুফান বড় নদীতে!

এই রাইজদিয়া জলের তলে পরায় (প্রায়) সাত দিন ডুইবা আছিল। ঝড়ে আমার বাড়ির মধুটুকরি আমের গাছটা মাটিতে শুইয়া পড়ল, দুইখান ঘরের চাল উইড়া গিয়া পড়ল ন'য় মাইল তফাতে। হেই বারের দুই বছর আগে কি পরে মনে নাই—'

সময় সম্পর্কে এখানকার মানুষের ধারণা অদ্ভুত। সাল-তারিখের হিসেব নিয়ে তাদের দুর্ভাবনা নেই, তার ধারও তারা ধারে না। ভয়াবহ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা ঐরকম কোনো ঘটনার স্মৃতি দিয়ে তারা সময়ের হিসেব করে।

ইচু মন্ডল থামেনি, 'হেইবার, বুঝলা ভাইস্তারা, এংরাজরা ঠিক করছিল বাংলা দ্যাশখানেরে দুই টুকরা করব—'

'পারছিল ?'

'হে কি পারে! বড় বড় বাবুরা আর বড় বড় মেঞাছাবরা দ্যাশখানের উথালপাথাল কইরা ছাড়ল। শ্যাষম্যাষ এংরাজরা ডরাইয়া গেল, দ্যাশ আর টুকরা-টাকরি করতে সাহস পাইল না।'

রোজই এই খবরের কাগজ পড়ার সময় কিছুক্ষণ অবনীমোহনদের কাছে এসে বসে বিনু। কী একটা বইতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা পড়েছিল সে। বিনু বুঝতে পেরেছে, সেই কথাই বলছে ইচু মন্ডল।

বুধাই পাল, হাচাই পাল এবং ইসমাইল চৌকিদারও বয়সে বেশ প্রবীণ। অবশ্য ইচু মন্ডলের চাইতে ঢের ছোট। ইচুর কথায় তাদের যেন মনে পড়ে গেছে। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে তারা বলেছে, 'আমাগো ছোটকালে এইরকম একখান কথা শুনছিলাম য্যান।'

ইচু মন্ডল আবার কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার নজর এসে পড়েছে হেমনাথের ওপর। হেমনাথ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিলেন। ইচু মন্ডল তাঁকেই সাক্ষী মেনে এবার বলেছেন, 'এই যে হ্যামকত্তা, আপনেই তো এই রাইজদিয়া তুলফাড় কইরা ফালাইছিলেন। মনে পড়ে, বাড়ি বাড়ি ঘুইরা বুঝাইছিলেন, হিন্দুই হৌক আর মুসলমানই হৌক, সগল বাঙ্গালীই এক।'

হেমনাথ উত্তর দেন নি, অল্প হেসে ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছেন।

ইচু মন্ডল আবার বলেছে, 'এংরাজ পারে নাই, ওনরা পারব ! যত তামশার কথা !'

বয়েস যাদের কম তারা শুধিয়েছে, 'এই সগল কত কাল আগের কথা চাচা ?'

ইচু মন্ডল বলেছে, 'তা বিশ-পঞ্চাশ বছর আগের হইব।' বলতে বলতে হেমনাথের দিকে ফিরেছে, 'না হ্যামকত্তা ?'

হেমনাথ কৌতুক বোধ করেছেন। বলেছেন, 'তুমি তো সবই জানো।'

কমবয়সীরা জিজ্ঞেস করেছে, 'তহন তুমার কত ব'স (বয়স) চাচা ?'

ইচু মন্ডল বলেছে, 'হে হইব দ্যাড় কুড়ি। ছ্যামরারা তহন আমার জুয়ান ব'স (বয়স), ঘরে তিন বিবি—'

শুনতে শুনতে সবাই হেসে উঠেছে।

এই জলবাংলায় ঋতু বলতে চারটি—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শরৎ। বাকি ঋতুগুলি কখন যায় কখন আসে, বিশেষ টেরও পাওয়া যায় না। তারা আসে চুপিচুপি, যায় আরো নিঃশব্দে।

চার ঋতু বাদ দিয়ে বাকি থাকে হেমন্ত আর বসন্ত। মাঠভর্তি জলে যখন টান ধরে, উত্তুরে বাতাসে

যখন চামড়া ফাটতে থাকে, সকালের দিকটায় ঠান্ডায় গায়ে কাঁটা দেয়, কুয়াশায় হিমে সন্ধেটা যখন ঝাপসা, সেই সময়টা হেমন্ত। ভাল করে হেমন্তকে বুঝবার আগেই শীত নেমে যায়। শীতের পর মান্দার আর শিমুল গাছে থোকা থোকা রক্তবর্ণ ফুলের নিশান উড়িয়ে বসন্ত আসে কিন্তু তার আয়ু আর কতটুকু। দেখতে দেখতে মাঠ-ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যেতে থাকে। ফাটলের ভেতর থেকে বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মতন পৃথিবীর অন্তঃপুরের যত উত্তাপ বেরিয়ে আসে। আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে বিলীন, সেখানে যখন আগুনের হলকার মতন রোদ কাঁপতে থাকে তখন টের পাওয়া যায় খরা এসে গেল।

হেমন্ত আর বসন্ত ছাড়া বাকি চার ঋতুর চেহারা এখানে স্পষ্ট। এসেই তাদের পালাই পালাই নেই। একবার এলে যেতেই চায় না, রীতিমত আসর জাঁকিয়ে বসে, আকাশে-বাতাসে আপন স্বভাবটি মুদ্রিত করে তবে যাবার নাম করে।

এখন আষাঢ়। জষ্ঠির মাঝামাঝি খালবিল ছাপিয়ে নতুন বর্ষার জল আসতে শুরু করেছিল। পশ্চিমা বাতাসের টানে আকাশ জুড়ে তখন থেকেই কালো কালো ভবঘুরে মেঘেদের আনাগোনা। জষ্ঠি মাসে সে মেঘগুলো ছিল অস্থির, উড়ু-উড়ু, নিয়ত-চঞ্চল, তারাই একাকার হয়ে জমাট বেঁধে আকাশময় বিরাট এক চাঁদোয়ার মতন মাথার ওপর অনড় হয়ে আছে।

সারাদিন বৃষ্টি পড়ছেই। কখনও ঝিপঝিপ, কখনও ঝরঝর। ভরা বর্ষার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিনুর মনে হয়, যুগযুগান্ত ধরে কাল-কালান্তর পার হয়ে এ বৃষ্টি পড়ছেই, পড়েই যাচ্ছে।

হেমনাথের পুকুরটা বর্ষার প্রথম দিকেই ভেসে গিয়েছিল। মাঠ-ঘাট-খেত সব এখন জলের তলায়। নতুন বর্ষার জল পড়তেই বীজ বোনা হয়েছিল। ধানগাছ এখন জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফনফনিয়ে বেড়ে উঠছে।

কচুবনে দিন রাত ব্যাঙ ডাকছে, ঝিঁঝিদের রাজ্যেও একটানা জলসার আসর বসেছে। আকাশ পাতাল জুড়ে তাদের মিলিত সুর সব কিছুকে করুণ, বিষণ্ন, উদাস করে তুলেছে। এ ছাড়া যেন পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই।

এই জলবাংলায় এত যে পাখি—জলপিপি, কবুতর, মোহনচূড়া, বখারি, শালিক, সিদ্ধিগুরু, বুনো টিয়া—বর্ষা নামবার পর থেকে তাদের আর দেখা নেই। কোথায় কোন ঠিকানা তারা দেশান্তরী হয়েছে, কে জানে।

সমস্ত চরাচর বৃষ্টির অবিরাম দীর্ঘ ধারাগুলির ওধারে ঝাপসা হয়ে আছে। কদাচিৎ পুকুরের ওপারে ধানখেতের ভেতরে এক আধটা নৌকো চোখে পড়ে। দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হয় অনেকদিন আগের দেখা কোনো আবছা স্মৃতির ভেতরে নৌকোগুলো দোল খাচ্ছে।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একদিন হেমনাথ আর অবনীমোহনের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গেল বিনু। অনেক দিন পর এবার সুজনগঞ্জে এল সে। স্কুল চলছে, এখন হাটে আসবার সময় কোথায় তার।

এত জল, এত বাদলা, তবু সুজনগঞ্জের হাটে ভিড় একই রকম আছে। শিয়রের দিককার নদীটা নৌকোয় নৌকোয় তেমনই ঢাকা। দশ-বিশ মাইলের ভেতরে এই একটাই তো হাট। বিকিকিনির জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসটুকুর জন্যও হাটের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। মানুষ না এসে কী করবে?

জলবাংলায় বেশ কিছুদিন কেটে গেল বিনুদের। দাদুর সঙ্গে খুব বেশি না হলেও সুজনগঞ্জের হাটে খুব কমও আসেনি সে। আর অবনীমোহন তো প্রতি হাটেই আসছেন। নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সুজনগঞ্জের সব ব্যাপারী-পাইকার-আড়তদার দোকানদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়ে গেছে।

হেমনাথের বাড়ি ইচু মন্ডলরা সন্ধেবেলা এসে যা বলাবলি করে, দেখা গেল তা সত্যি। মাছের বাজারে, আনাজপাতির বাজারে, ডাল-মসলার বাজারে—যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই এক কথা।

'জিনিসপাতি আগুন হইয়া উঠছে। কী যে করুম—'

'দর বাড়লে, তোমাদের তো ভালই। লাভ বেশি।'

'লাভ বেশি ঠিকই কিন্তুক আমাগোও তো চড়া দরে চাউল-ডাইল কিনতে হয়। বেশি লাভ কইরা সুফল কী? আগে দশ ট্যাকা বার ট্যাকার মাল বিকাইতে পারলে হপ্তার খরচ উইঠা যাইত, পোলামাইয়ারে দুধে-ভাতে রাখতে পারতাম। আইজ-কাইল বিশ-পঞ্চাশ ট্যাকা বেইচাও ব্যাড় (বেড়) পাই না। দিনকাল কী যে পড়ল।'

হাটে এলেই হেমনাথ চারদিক টহল দিয়ে বেড়ান। এখানে একটু বসেন, ওখানে দু দন্ড দাঁড়িয়ে গল্প করেন। হেমনাথের সঙ্গে থেকে থেকে তাঁর এই স্বভাবটি পেয়ে গেছেন অবনীমোহন। হাটের সব মানুষের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে না পারলে তাঁর ভালই লাগে না।

ঘুরতে ঘুরতে বিনুরা একসময় নিত্য দাসের ধানের আড়তে এসে পড়ল। খুব খাতির-টাতির করে নিত্য দাস তাদের বসাল।

হেমনাথ বললেন, 'তার পর খবর কী নিত্য?'

নিত্য দাস শুধলো, 'কুন খবর জানতে চান বড় কত্তা?'

'কোন খবর আর, ধান চালের—'

'ধান চালের খবর জবর মোন্দ—'

'কেমন?'

'চাউলের দর বিশ ট্যাকায় উঠছে।'

'গেল হাটে না আঠার ছিল?'

'হ।' নিত্য দাস মাথা নাড়ে, 'অহন রোজ দর চেততে (চড়তে) আছে।' বলতে বলতে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে, 'একখান বড় খারাপ সম্বাদ শোনলাম বড় কত্তা—'

কপাল কুঁচকে হেমনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী সংবাদ?'

'ধান-চাউল নিকি আর পাওয়া যাইব না।'

'কে বললে?'

'পরস্পর কানে আইতে আছে।'

হেমনাথ চিন্তিত মুখে বললেন, 'ঠিক শুনেছিস?'

নিত্য দাস বলল, 'হ, বড় কত্তা।'

'এ দেশ ধান চালের দেশ। এত ধান চাল যাবে কোথায়?'

'যুজ্যে নিকি লাগব।'

একটু নীরবতা। তারপর নিত্য দাসই আবার শুরু করল, 'বড় কত্তা একখান কথা জিগাই।'

'কী?'

'আপনের সগল ধান বেইচা দিছেন?'

'না।'

'সব ধান অহন ছাইড়েন না, 'রাখি' করেন। পরে কামে দিব।'

'দেখি।'

নিত্য দাসের আড়ত থেকে বেরিয়ে বিনুরা বিষহরি তলায় চলে এল। বর্ষা কালে বিষহরি তলার ওধারে পুকুরপারের ফাঁকা জমিতে রুগী দেখতে বসেন না লারমোর। মন্দিরের একধারে একটা বারান্দায় চেয়ার-টেবিল-ওষুধের বাক্স সাজিয়ে বসেন। আজও বসেছিলেন।

বিনুরা এসে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। রুগী দেখতে দেখতে কথা বলতে লাগলেন লারমোর।

অবনীমোহন বললেন, 'জিনিসপত্রের দর ভয়ানক চড়ছে লালমোহনমামা।'

অন্যমনস্কের মতন লারমোর বলেন, 'চড়ছে নাকি?'

'বা রে, আপনি জানেন না!'

'জানবার সময় কোথায়?' লারমোর বলতে থাকেন, 'সারাদিন রুগী নিয়েই থাকি। অন্য দিকে তাকাবার ফুরসতই পাই না। অবশ্য—'

অবনীমোহন বলেন, 'কী?'

'রুগীরা দর চড়ার কথা বলে বটে।'

অবনীমোহন এবার চুপ করে রইলেন।

লারমোর আবার বললেন, 'দর যদি চড়েই তুমি আমি কী কীরতে পারি বল? ভেবে কিছু লাভ নেই।'

কথাটা ঠিক, ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন অবনীমোহন।

লারমোর বলতে লাগলেন, 'ঘরে কিছু চাল আছে। দর চড়লে জিনিসপত্তর যদি কিনতে না পারি একবেলা 'ফেন ভাত' করে খাব। দিনে একবার খেতে পেলেই আমার চলে যাবে।'

যে মানুষের ঘর-সংসার নেই, ছেলেমেয়ে নেই, বহুজনের হিতে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁর সঙ্গে দর-টর নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া বৃথা। তা বুঝে অবনীমোহন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। এবারকার বর্ষা, লারমোরের রুগী, ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলল।

কথায় কথায় একসময় বৃষ্টি ধরে এল। পুব দিকের ঘন মেঘে ফাটল ধরিয়ে চিকচিকে একটু আভা ফুটে বেরুল।

হেমনাথ বললেন, 'বৃষ্টি থেমেছে। এই ফাঁকে কেনাকাটা সেরে নিলে ভাল হত না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—' ব্যস্তভাবে অবনীমোহন উঠতে যাবেন, সেই সময় দূরের ফাঁকা মাঠটায় একজোড়া ঢাক বেজে উঠল।

চমকে বিনু সেদিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল সেই ঢেঁড়াদার লোকটা—নাম যার হরিন্দ—একটা উঁচু প্যাকিং বাক্সের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে মা কালীর অসুরের মতন কুচকুচে কালো দুই ঢাকী, কাগা আর বগা, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে প্রচণ্ডভাবে ঢাক পিটিয়ে চলেছে।

বিনুর মনে পড়ে গেল, যুগলের সঙ্গে প্রথম যেদিন সে সুজনগঞ্জের হাটে আসে সেদিনও কাগা-বগা আর হরিন্দকে ঢেঁড়া দিতে দেখেছিল। অনেক—অনেকদিন পর হরিন্দ এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গকে আবার সুজনগঞ্জে দেখা গেল।

ঢাকের আওয়াজ পেয়ে তামাক-হাটা, আনাজ-হাটা, নৌকো-হাটা ভেঙে দিগ্বিদিক থেকে মানুষ ছুটে আসতে লাগল। মুহূর্তে হরিন্দদের গোল করে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

হেমনাথ বললেন, 'হরিন্দরা এসেছে দেখছি।'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কিসের ঢেঁড়া দিতে এল, কে জানে।'

অবনীমোহন কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। উৎসুক সুরে বললেন, 'চলুন মামাবাবু, একটু দেখে আসি।'

তাঁর মনের কথাটা বুঝিবা পড়তে পারলেন হেমনাথ। বললেন, 'চল।'

কাছাকাছি আসতে বিনুরা দেখতে পেল, মাথাটা একদিকে হেলিয়ে লোক জন দেখছে হরিন্দ। যখন বুঝতে পারল সারা হাট তার চারধারে ভেঙে পড়েছে সেই সময় হাতের ইঙ্গিতে কাগা-বগাকে থামিয়ে দিল।

ভিড়ের ভেতর থেকে হাটুরে মানুষগুলো প্রশ্ন ছুঁড়তে লাগল, 'এতকাল পর কী মনে কইরা গো অঢেড়াওলা?'

হরিন্দ বলল, 'সম্বাদ আছে।'

হরিন্দর আসা মানেই রসের বান ডেকে যাওয়া। পাখি যেমন নানা দেশ থেকে ঠোঁটে ঠোঁটে শস্যকণা কুড়িয়ে আনে, হরিন্দও তেমনি মজার মজার চমকদার খবর নিয়ে আসে। এই জলবাংলায় জীবন যেখানে মৃদু, নিঃশব্দ, তিরতিরে স্রোতের মতন বেগবর্ণহীন, হরিন্দ সেখানে আনন্দের দূত। ঝুলি বোঝাই করে সে আনন্দ নিয়ে আসে। হরিন্দ এলেই তাই হাটে সাড়া পড়ে যায়।

হাটুরে লোকেরা উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'কী সম্বাদ, কী সম্বাদ ?'

হরিন্দ বলল, 'শুনলেই বুঝবা, ধৈয্য ধর।'

লোকগুলোর ধৈর্য মানে না। অধীর গলায় তারা বলতে লাগল, 'রসের সম্বাদ তো, অ ঢেড়াওলা ?'

উত্তর না দিয়ে হরিন্দ এবার ঢাকী দুটোর দিকে তাকাল, 'বাজা ব্যাটারা, ঘুইরা ফিরা বাজা—'

একধারে বসে কাগা-বগা বিড়ি টানছিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঢাকে কাঠি দিয়ে চারদিক সরগরম করে তুলল।

এটা হরিন্দর পুরনো কৌশল। এর সঙ্গে বিনুর আগেই পরিচয় হয়েছে। লোকের কৌতূহল উসকে দেবার জন্য মাঝে মাঝে কথা বন্ধ করে কাগা-বগাকে দিয়ে ঢাক বাজাতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাজাবার পর হরিন্দ কাগা-বগাকে থামাল। তারপর গলা উঁচুতে তুলে বলল, "হাটৈরা (হাটুরে) ভাইরা, তোমরা অহন যাইও না। দুইজন মাইন্যগণ্য মনিষ্য আইজ এইখানে আইব।'

সমস্ত ভিড়টা চেঁচিয়ে উঠল, 'তেনারা কারা ?'

'এছ্-ডি-ও সাব আর জিলা ম্যাজিস্টর সাব। মটর লঞ্চে কইরা তেনারা আইব।'

ভিড়ের ভেতর এবার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, 'এছ্-ডি-ও সাব, ম্যাজিস্টর সাব এইখানে ক্যান ? অ ঢেড়াওলা ভাই, তুমি কিছু বিত্তান্ত জানো ?'

হরিন্দ বলল, 'জানি। তয়—'

'তয় কী ?'

'কমু না।'

'ক্যান কইবা না ? ক্যান ?'

'নিষেধ আছে। যা কওনের তেনারা আইসা কইব। এট্টু সবুর কর।'

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস-ডি-ও'র মতন মানুষ যে সুজনগঞ্জের হাটে আসতে পারেন, এ এক অভাবনীয় ঘটনা। কেন তাঁরা আসছেন, উদ্দেশ্যটা কী, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কাজেই হাটুরে মানুষগুলোর ভেতর গবেষণা শুরু হয়ে গেল।

মাছ ব্যাপারী গয়জদ্দি বলল, 'আমার মনে হয়, ধান-চাউলের দর-দাম বাড়তে আছে, ম্যাজিস্টর সাবরা এইর এট্টা পিতিকার করব। হেই লেইগা আইতে আছে।'

বেগুন ব্যাপারী নোয়াজ মিঞা বলল, 'আমার কিস্তুক অন্য কথা মনে হয়।'

মরিচ ব্যাপারী বিনোদ পাল শুধলো, 'কী মনে লাগে নোয়াজ ভাই ?'

'আমাগো হাটৈরা মানুষগো পিছামোড়া বাইন্ধা লইয়া যাইব।'

'হুদাহুদি বাইন্ধা নিব ক্যান ? আমোগো অপরাধখান কী ?'

'গরিব মাইনষের অপরাধ লাগে না, বাইন্ধা নিলেই হইল।'

ওধার থেকে গো-হাটার কাদের মিঞা হালকা গলায় রঙ্গ করে, 'আমার কী মনে হয় জানস ? ম্যাজিস্টর সাবের পোলার লগে এছ্-ডি-ও সাবের মাইয়ার শাদি হইব। হেই লেইগা আমাগো মেজবান করতে আইতে আছে।'

সবাই হেসে উঠল।

হালকা এবং গম্ভীর—যত আলোচনাই চলুক, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের আসার উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে

না। তাই হাটুরে মানুষগুলো ভীত, চিন্তিত, সন্ত্রস্ত হয়ে রইল। সন্দেহে সংশয়ে দুলতে লাগল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, সত্যি সত্যি একটু পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা এসে পড়লেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খাস ইংরেজ, লাল টকটকে চেহারা। ছ'ফুটের বেশি লম্বা, প্রকাণ্ড বুক, মাথায় হ্যাট। এস-ডি-ও সাহেব কিন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গসন্তান। কিন্তু গায়ের রংটি বাদ দিলে কে বলবে তিনি বাঙালি। হ্যাট-কোট-প্যান্ট এবং চালচলন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চাইতে তিন কাঠি ওপরে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের আগমনটি সত্যিই দর্শনীয়। সামনে এক অক্ষৌহিণী বন্দুকধারী পুলিশ, পেছনে আরেক অক্ষৌহিণী। দুটো লম্বা লোক ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস-ডি-ও সাহেবের মাথায় ছাতা ধরে আছে।

তাঁরা এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে দুটো বড় বড় কারুকাজ-করা ভারি চেয়ার এসে পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা বসলেন। চারদিকের জনতা দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চেয়ারে বসেই এস-ডি-ও সাহেব ইশারায় হরিন্দকে কাছে ডাকলেন, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় কি ফিসফিস করলেন। তারপরেই হরিন্দ লাফ দিয়ে ঢাকী দুটোর কাছে গিয়ে হাওয়ায় হাত ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'বাজা ব্যাটারা, বাজা—'

কিছুক্ষণ বাজনার পর কাগা-বগাকে থামিয়ে হরিন্দ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'হাটেরা ভাইরা, এইবার এছ-ডি-ও ছাব আপনেগো কিছু কইবেন—' বলে একধারে সরে গেল।

এস-ডি-ও সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

কোথাও এতটুকু আওয়াজ নেই। বাতাস বুঝি থেমে গেছে। গাছের একটা পাতা খসলেও এখন তার শব্দ পাওয়া যাবে।

গলায় খাকারি দিয়ে এস-ডি-ও সাহেব হঠাৎ শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যুদ্ধ লেগেছে—'

কেউ উত্তর দিল না। গলা লম্বা করে জনতা উদ্গ্রীব দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চোখের পলক পড়ছে না।

এস-ডি-ও সাহেব চারদিকে সারি সারি মানুষগুলোর মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'যুদ্ধ আমাদের এই পূর্ব বাংলাতেও চলে আসতে পারে। তাই বলছিলাম, ঘর-সংসার এবং দেশ রক্ষা করবার জন্যে আপনারা দলে দলে সেনাদলে নাম লেখান।'

জনতার ভেতর গুঞ্জন উঠল, 'যুজ্যে যাইতে কয়। হায় আল্লা, ঐ কারবারে আমি নাই।'

আরেকজন কে বলল, 'যুজ্যে গিয়া মরি আর কি।'

অন্য একটি গলা শোনা গেল, 'লও যাই, মানে মানে অহন সইরা পড়ি।'

একটু থেমে এস-ডি-ও সাহেব খুব সম্ভব জনতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন। আবার তিনি শুরু করলেন, 'দেশের জন্যে, মাতৃভূমির জন্যে, নিজের ভাইবোন সন্তানদের জন্যে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। নইলে সব কিছু ছারখার হয়ে যাবে।' একটু ভেবে, 'আজই আপনাদের যুদ্ধে নাম লেখাতে হবে না, বাড়ি গিয়ে সবাই ভাবুন। আসছে হাটে আবার আমরা আসব। তার পরের হাটেও আসব। এখন থেকে প্রতি হাটেই আমরা আসব। আপনারা এর ভেতর ভেবেচিন্তে নিন। মনে রাখবেন, সেনাদলে এমনি এমনি নাম লেখাতে বলছি না। ভালই মাইনে পাবেন, পোশাক পাবেন, ভাল খেতে পাবেন। আমার কথা শেষ হল, এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপনাদের কিছু বলবেন।' বলে বসে পড়লেন তিনি।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবার উঠে দাঁড়ালেন। বাংলাটা তিনি ভালই বোঝেন কিন্তু তেমন বলতে পারেন না। ভাঙা ভাঙা যা বললেন তা এই রকম।

'বন্ধুগণ, আপনারা যুদ্ধে আসিলে টাকা পাইবে, অনেক সুখ হইবে। গভর্নমেন্টের খুব আনন্দ হইবে।'

ইত্যাদি ইত্যাদি—

খাস ইংরেজের আড়ষ্ট জিভে জায়গা পেয়ে গর্বে বাংলা ভাষার বুক যেন দশ হাত ফুলে উঠল।

একটু পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা চলে গেলেন।

হাটুরে মানুষগুলো সেনাদলে নাম লেখাবার ব্যাপার নিয়ে সন্ত্রস্ত আলোচনা করতে করতে তামাক-হাটা, মরিচ-হাটা, গো-হাটার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিনুরা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

উদ্বেগের গলায় হেমনাথ বললেন, 'যুদ্ধে রিক্রুটমেন্টের জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও পর্যন্ত ছুটে এসেছে। অবস্থা খুব ভাল না অবনীমোহন।'

জষ্ঠিমাসে সেই যে বৃষ্টি নেমেছিল, এখনও তার থামবার নাম নেই। মনে হয় দু-এক দিন নয়, দু-চার মাসও নয়, অনাদি অনন্তকাল ধরে ঝরছেই। ঘন কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বৃষ্টির লক্ষ কোটি ধূসর ধারায় চরাচর ঝাপসা, বর্ণহীন, বিস্বাদ।

ঘরের জানালায় বসে আকাশ দেখতে দেখতে বিনুর মনে হয়, কোনোদিন আর বেরুতে পারবে না, আর কখনও রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকমকে দিনের মুখ দেখতে পাবে না। এই ঘরটুকুর মধ্যেই চিরকাল বন্দি হয়ে থাকতে হবে। অথচ ঘরে থেকে থেকে তার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিনুর মনে হয়, জলের গন্ধ, ভেজা মাটির গন্ধ, গাছপালার গন্ধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে তার বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে এবং সেখানে বিচিত্র এক বিষাদ গাঢ় করে তুলছে। খুব খারাপ লাগে বিনুর, খুব খারাপ লাগে।

তাকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ঝিনুক কখনও কখনও কাছে এসে দাঁড়ায়। অন্যমনস্কের মতন বিনু বলে, 'বৃষ্টি বোধহয় আর থামবে না।'

ঝিনুক বলে, 'থামবে না, তোমায় বলেছে!'

'আবার রোদ উঠবে?'

'উঠবে।'

'কবে?'

'বর্ষা গেলেই।'

যেদিন সকালের দিকে জোর বৃষ্টি নামে সেদিন আর স্কুলে যেতে পারে না বিনু। অল্প বৃষ্টি থাকলে অবশ্য ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

এই বর্ষার সময়টা প্রায়ই স্কুল কামাই হচ্ছে। সারাদিন বাড়িতে আটকে থেকে পরিচিত মানুষগুলোকে বার বার, হাজার বার দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বিনু। সন্ধের সময় ইচু মণ্ডলরা জলে ভিজে ভিজে যখন খবর শুনতে আসে, সেই সময়টা মোটামুটি উন্মাদনার মধ্যে কেটে যায়।

রোজই খবরকাগজ নতুন নতুন উত্তেজনা নিয়ে আসে। যুদ্ধের তাণ্ডব ক্রমশ বেড়েই চলেছে—এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত তার অশুভ ভয়াবহ ছায়া পড়ছে। বর্ষার অনড় মেঘের মতন দুই গোলার্ধকে কী এক অভিশাপ যেন ঢেকে ফেলেছে।

যুদ্ধের খবরের মধ্যে একদিন অবনীমোহন পড়ে শোনালেন, রবীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ। তারপর আরেক

দিন পড়লেন, তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

দিনের পর দিন যেতে লাগল।

সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টির ভেতর স্কুলে গেল বিনু। দুটো ক্লাস হবার পর হঠাৎ থার্ড পিরিয়ডে হেডমাস্টার মোতাহার সাহেব এলেন। অবোধ বালকের মতন তিনি কাঁদছেন, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ আর নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি কী ছিলেন, কত বিরাট, কত বিপুল, আজ বুঝতে পারবে না। বড় হয়ে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করো। যাও, আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যাও।'

বাড়ি ফিরে বিনু দেখতে পেল, সমস্ত বাড়িটা যেন শোকাচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ। পুবের ঘরের ঢাকা বারান্দায় অবনীমোহন, হেমনাথ বসে ছিলেন। খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে কি বলাবলি করছিলেন।

কাছে যেতে হেমনাথের গলা বিনুর কানে এল, 'পৃথিবী জোড়া অন্ধকারে ঐ একটুখানি আলো ছিল, তাও নিভে গেল।'

বিনু বুঝতে পারল, রবীন্দ্রনাথের কথাই হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ কত বড়, কত বিশাল, কত মহৎ—বিনুর জানা নেই। তবু পাষাণভারের মতন কী যেন তার বুকের ভেতর নিশ্চল হয়ে রইল। শ্বাসটা আটকে আটকে আসতে লাগল যেন।

গত বছর পুজোর ছুটির পর সেই যে হিরণ ঢাকায় গিয়েছিল, সেই থেকে তার আর খোঁজখবর ছিল না।

হিরণ যাবার পর তাকে নিয়ে এ বাড়িতে আলোচনা কম হয়নি।

একদিন হেমনাথ বলেছিলেন, 'বাঁদরটা ঐরকম। কাছে থাকলে দিনরাত মাখামাখি, যেই চোখের আড়াল হল অমনি সব ভুলে গেল।'

সেদিনই সন্ধেবেলায় সুধা-সুনীতি-বিনু, তিন-ভাই-বোন পড়তে বসেছিল। চারদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় সুনীতি সুধাকে বলেছিল, 'দাদু হিরণচন্দর সম্বন্ধে তখন কী বলছিল শুনেছিস তো? এমন মানুষকে মন দিলি ভাই, একবার খোঁজও নেয় না।'

সুধা ঠোঁট উলটে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল, 'খোঁজ নেয় না বলে তো আমি একেবারে মরে গেছি।'

'গেছিসই তো—'

'তোকে বলেছি?'

'না বললে কী, তোর মুখ দেখে বুঝতে পারি না ভেবেছিস?'

'ও বাবা—' সুধা গালে হাত রেখে বলেছিল, 'কবে থেকে অন্তর্যামী হলি রে দিদি!'

সুনীতি বলেছিল, 'যেদিন হিরণচন্দরের সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে সেদিন থেকে—'

একটু চুপ। তারপর সুনীতিই আবার শুরু করেছিল, 'ঐ ভদ্রলোকটি কিন্তু বেশ, কলকাতা থেকে ঠিক চিঠিপত্তর দিয়ে যাচ্ছে।'

সুধা মুখ টিপে হেসেছিল, 'তোর কথাই আলাদা। মনের মতন মনের মানুষ পেয়েছিস।'

'তোরটা বুঝি মনের মতন নয়?'

'বিচ্ছিরি।'

'আয় তা হলে বদলা-বদলি করে নিই।'

'বদলা-বদলির দরকার নেই, দুটোকেই তুই নিয়ে নে—'

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল সুনীতির। ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, 'তুই ভারি অসভ্য হয়ে উঠেছিস সুধা।'

সুধা উত্তর দেয়নি, হেসে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঢাকা থেকে হিরণ এসে হাজির।

পুবের ঘরে সুধা-সুনীতি-বিনু আর হেমনাথ বসে ছিলেন। হিরণকে দেখে হেমনাথ প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে কালাচাঁদ যে, আয় আয়—'

হিরণ ছাতা নিয়ে এসেছিল। ছাতাটা মুড়ে বাইরে রেখে ভেতরে এসে বসল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'কী ব্যাপার, এতদিন খবর নেই বার্তা নেই, একবার আসিসও নি। ঢাকায় বসে কী করছিলি?'

হিরণ খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'সরস্বতীর আরাধনা।'

হেমনাথ ভ্রূকুটি হানলেন, 'তার মানে?'

'তার মানে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। মাসে মাসে আমার পেছনে কতগুলো করে টাকা ঢালছ, খেয়াল আছে?'

হেমনাথ কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

হিরণ বলল, 'অন্তত একটা ফার্স্ট ক্লাস যদি না পাই, তুমি আমাকে আস্ত রাখবে?'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তা রাখব না। শুধু কি তা-ই, এখানকার কলেজে চাকরিও দেব না।'

'তা হলেই বুঝে দেখ, ঢাকা থেকে হুট হুট ছুটে আসা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'না-ই বা এলি, মাঝে মাঝে চিঠি লিখলেও পারিস তো।'

'চিঠি লেখা আমার কুষ্ঠিতে নেই, তা তো তুমি জানোই।'

'তোর কুষ্ঠিতে নেই। এদিকে আরেক জনের দিকে যে তাকানো যায় না। মুখে সব সময় মেঘ জমে আছে।'

'কার?'

আঙুল বাড়িয়ে সুধাকে দেখিয়ে দিলেন হেমনাথ। হিরণ-সুধা বা সুনীতি- আনন্দর মধ্যে যে হৃদয়রাগের খেলা চলছে এ বাড়িতে তা বিশেষ গোপন নেই। এ ব্যাপারে হেমনাথদের কিছু প্রশ্রয়ও আছে। তাদের স্নেহের ছায়ায় চারটি উন্মুখ তরুণ মনে উৎসব শুরু হয়ে গেছে যেন।

হাত-পা নেড়ে একেবারে চেঁচামেচি জুড়ে দিল সুধা, 'আহা-হা, আহা-হা—'

এই সময়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন হেমনাথ। রসালো সুর টেনে টেনে বললেন, 'আহা আহা করিস না লো সই।' বলেই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান ধরলেন:

'নয়ন-নীরে কি নেভে মনের অনল,
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনে তার সকলই বিফল॥
যবে তারে হেরে সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিভে সখি অনল প্রবল॥'

সুধা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। আরক্ত মুখে বলল, 'এরকম করলে আমি কিন্তু চলে যাব দাদু—'

হাত ধরে সুধাকে তক্তাপোশে বসিয়ে দিতে দিতে হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, এই গান থামিয়ে দিলাম। তোরা গল্প টল্প কর। আমাকে বেরুতে হবে। হিরণ, তুই এখানে খেয়ে যাবি। হোম ডিপার্টমেন্টে বলে যাচ্ছি।'

হিরণ ঘাড় হেলিয়ে জানালো, খেয়েই যাবে।

বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কী মনে পড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন হেমনাথ। হিরণের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'হ্যাঁ রে—'

'কী বলছ?'

'পুজো তো এসে গেল।'

'হ্যাঁ।'

'গেল বারের মতন এবারও নাটক টাটক করবি তো?'

হিরণ বলল, 'এবার পুজোর ছুটিতে আমি আসছি না, ঢাকাতেই থাকব।'

একটু অবাক হলেন হেমনাথ, 'কেন রে?'

'ছুটির পর কতটুকু আর সময় পাওয়া যাবে। তারপরই পরীক্ষা—'

'তাই তো, আমার খেয়াল ছিল না। না না, ছুটিতে তোর আসার দরকার নেই। পরীক্ষা আগে, জীবনে ফূর্তি করার ঢের সময় পাওয়া যাবে। আচ্ছা এখন যাই।'

হেমনাথ বেরিয়ে যাবার পর মুখ নিচু করে নিঃশব্দে নখ দিয়ে তক্তাপোশে আঁকিবুকি কাটতে লাগল সুধা। হিরণের সঙ্গে কথা টথা যা বলবার, সুনীতিই বলল। তার এতদিন ডুব দিয়ে থাকা নিয়ে ঠাট্টা করল, প্রাণ খুলে হাসির ফোয়ারা ছোটাল। তারপর একসময় কাজের ছল করে উঠে গেল।

এখন ঘরের ভেতর ওরা তিনজন। সুধা, হিরণ আর বিনু। বিনু জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। আকাশ জুড়ে শুধু মেঘ, চরাচর আচ্ছন্ন করে ধূসর রেখায় বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে। ধানখেতের দিক থেকে হঠাৎ হঠাৎ দমকা বাতাস ছুটে আসে, বাগানের সুপুরি গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে। জামরুল আর কালোজাম গাছদুটো পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস গলায় কী পরামর্শ করতে থাকে।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর হিরণই প্রথম কথা বলল, 'কেমন আছ সুধা?'

সুধা উত্তর দিল না।

হিরণ আবার বলল, 'খুব রাগ করে রয়েছ, না?'

এবার সুধা ভারি গলায় উত্তর দিল, 'না। খুশিতে—'

'খুশিতে কী?'

'ডগমগ হয়ে আছি।'

'সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এক-আধবার রাজদিয়াতে আসা উচিত ছিল। কিন্তু এমন অভ্যেস আমার—'

'খুব খারাপ অভ্যেস—' এতক্ষণ সুধার গলা ভারি ছিল, এবার কাঁপতে লাগল, 'মরে গেছি কি বেঁচে আছি, খোঁজ নেওয়ার দরকার মনে করেন না। ওদিকে জানেন—'

'কী?'

'আনন্দদা সপ্তায় দুটো করে চিঠি লেখে দিদিকে—'

'আনন্দবাবু লেখে দুটো করে, ঢাকায় গিয়ে এবার থেকে আমি চারটে করে লিখব—'

'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'না না—' হিরণ কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'তুমি দেখে নিও—'

সুধা ভয় পেয়ে গেল যেন, 'দোহাই আপনার, অত চিঠি লিখবেন না। দিদি তা হলে আমাকে খেপিয়ে মারবে। মাঝে মাঝে এক-আধটা লিখলেই আমি খুশি—'

কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল হিরণ, হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, 'এই সুধা—'

'কী বলছেন?'

'আমরা তো খুব প্রাণের কথা চালিয়ে যাচ্ছি। ওদিকে—'

'ওদিকে কী?'

'ঘরের ভেতর বিনু রয়েছে না?'

এক পলক বিনুকে দেখে নিয়ে সুধা বলল, 'ওটা একটা হাবা গঙ্গারাম, জানলার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টিই দেখছে, আমাদের কথা কানেও যাচ্ছে না। ভারি অন্যমনস্ক ছেলে—'

হাবা গঙ্গারামটির চোখ অবশ্যই জানালার বাইরে ছিল, কিন্তু ধ্যানজ্ঞান ছিল ঘরের ভেতরে। কান খাড়া করে হিরণদের প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছিল বিনু।

সুধা বলা সত্ত্বেও সন্দেহ গেল না হিরণের। সংশয়ের গলায় বলল, 'যদি শুনে থাকে—'

সুধা বলল, 'কিচ্ছু শোনেনি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিরকম অন্যমনস্ক দেখবেন?' বলেই ডাকল, 'অ্যাই বিনু—'

বিনু প্রথমটা সাড়া দিল না। বৃষ্টির লম্বা লম্বা ধূসর রেখাগুলি এবং তাদের একটানা ঝমঝম শব্দ ছাড়া জগতের আর কোনো দিকে তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ আছে বলে মনে হল না।

সুধা আবার ডাকল। বারকয়েক ডাকাডাকির পর চমকে ওঠার ভঙ্গি করে বিনু ঘুরে দাঁড়াল, 'কী বলছিস?'

'কী করছিস, জিজ্ঞেস করছিলাম—'

'বৃষ্টি দেখছি।'

'আমি তোকে কবার ডেকেছি বল তো?'

'এই তো একবার।'

'আমরা কী বলছিলাম, শুনেছিস?'

'না তো—'

'ঠিক আছে, তুই বৃষ্টি দ্যাখ—'

বিনু আবার জানালার বাইরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাল।

আর সুধা হিরণকে বলল, 'দেখলেন তো?'

হাতেনাতে এত বড় প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও বিনু সম্পর্কে সতর্ক হয়ে রইল হিরণ। যতখানি সম্ভব গলাটা অতলে নামিয়ে সে ফিসফিস করতে লাগল। সঙ্গগুণেই কিনা সে জানে, সুধাও গলা নামাল।

আর জলবাংলার ক্লান্তিহীন বর্ষণ দেখতে দেখতে উৎকর্ণ বিনু ঘরের ভেতর দুটি অন্তরঙ্গ গাঢ় গলার ফিসফিসানি শুনতে লাগল।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল।

এই সেদিনও আকাশ জুড়ে কালো মেঘ অনড় হয়ে ছিল। এখনও মেঘ আছে, তবে রং গেছে বদলে।

সারা বর্ষার জলে ধুয়ে আকাশখানি এখন আশ্চর্য নীল। এত চকচকে, এত ঝকমকে যে মনে হয়

এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত একখানা নীল আয়না কেউ টাঙিয়ে রেখেছে। তার গায়ে থোকা থোকা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

আশ্বিন মাস পড়তেই খাল-বিল আর নদীপারের কাশবন সাদা হয়ে গেছে। হিজল গাছগুলোর পাতা দেখা যায় না, শুধু ফুল আর ফুল।

বর্ষার সময়টা এই জলবাংলা থেকে সব পাখি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। দিন রাত একটানা বৃষ্টির ভেতর তারা বেরোয় কী করে? আশ্বিনের শুরুতে যেই বৃষ্টি থামল, মেঘ কেটে ঝলমলে সোনালি রোদ দেখা দিল, অমনি নিরুদ্দেশ পাখির ঝাঁক রাজদিয়ার আকাশে ফিরে আসতে লাগল। দিবানিশি তাদের কিচিরমিচিরে চারদিক এখন মুখর। আর এসেছে পতঙ্গেরা—ফড়িং, প্রজাপতি, নানারকম পোকা।

পুকুর, ধানখেত, দূরের মাঠ, মাঠের মাঝখানে ছোট ছোট কৃষাণ গ্রাম—বর্ষায় সব ভেসে গিয়েছিল। মাঠের জল, ধানখেতের জল, খালবিলের জল, সব জায়গায় জল এখন স্থির। কৃষাণ গ্রামগুলোকে আজকাল দ্বীপের মতন দেখায়। দূরে দূরে মাঠের মাঝখানে ভেসাল জাল পাতা। ভেসালের বাঁশে শঙ্খচিল কি কানি বক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকে। নিস্তরঙ্গ জলে ধানগাছের ছায়া, মুত্রার ছায়া, নল ঘাস এবং ধঞ্চের ছায়া সারাদিন স্থির হয়ে থাকে। শুধু উড়ন্ত পাখিদের ছায়া দুলতে দুলতে ধূ ধূ দিগন্তের দিকে চলে যায়।

ক'টা মাস একটানা বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে, সিক্ত থাকার পর রোদে-বাতাসে-আলোয় এবং উত্তাপে জলবাংলা আবার যেন সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

হেমনাথ আর অবনীমোহন এবার জমিতে আউশ ধান দিয়েছিলেন, পাটও রুয়েছিলেন। শ্রাবণের শেষাশেষি আউশ উঠে গেছে। বর্ষায় পাট জাগ দিয়ে রাখা হয়েছিল। কামলারা এখন বার-বাড়ির বাগানে বসে পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছে।

জমিজমা নিয়ে একেবারে মেতে উঠেছেন অবনীমোহন। দিনরাত ধান-পাট, কামলা-কৃষাণ, এসব নিয়েই আছেন। কে বলবে, মাত্র ক'মাস আগে জমি কিনেছেন। দেখেশুনে তো মনে হয়, চাষবাসই তাঁর জীবনের সারাৎসার, নিরবধি কাল ধরে এই কাজই করে যাচ্ছেন।

খরার দিনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জমি চৌরস করিয়েছেন অবনীমোহন, বর্ষায় নতুন জল এলে বীজ বুনিয়েছেন। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আউশ ধান আর পাট কাটিয়েছেন। এখন যে পচা পাট থেকে আঁশ ছাড়ানো হচ্ছে, তাও সারাদিন সামনে বসে থাকেন। চাষবাসের জীবন তাঁকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ধান-পাট ছাড়া আর কিছুই আজকাল ভাবতে পারেন না অবনীমোহন। অন্য কোনো দিকে মনেযোগ দেবার মতন যথেষ্ট সময়ও তাঁর নেই।

হেমনাথ কিন্তু তাঁর নিজস্ব নিয়মেই চলছেন। বাড়ি থেকে একবার বেরুতে না পারলে তাঁর ঘুমই হয় না। এই রাজদিয়া কিংবা আশেপাশের গ্রামগঞ্জগুলোর খোঁজ নেওয়া চাই-ই। জষ্ঠির পর থেকে এত যে বর্ষা, এত যে জল, তবু তাঁকে কেউ বাড়িতে আটকে রাখতে পারেনি, ছাতাটি মাথায় দিয়ে ঠিক বেরিয়ে পড়েছেন।

আশ্বিন মাস পড়বার পর একদিন দুপুরবেলা কোত্থেকে বাড়ি ফিরে হেমনাথ বললেন, 'পুজোর ছুটি পড়ে গেছে। আজকের স্টিমারে কলকাতা থেকে রাজেন গুহর ছেলে-বৌ এল।'

স্নেহলতা বললেন, 'কে, অশোক?'

'হ্যাঁ।'

'গুহবাড়ির ছেলে তো এল। অন্য বাড়ির কেউ আসেনি?'

'এখনও আসেনি। দু-একদিনের ভিতর এসে পড়বে।'

পুজোর ছুটি পড়তেই গৃহকোণলোভী প্রবাসী সন্তানেরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে

রাজদিয়া ভরে যাবে। এখানকার মৃদু স্তিমিত বেগবর্ণহীন জীবন সরগরম হয়ে উঠবে।

একেক দিন একেক জনের খবর নিয়ে আসেন হেমনাথ। কোনোদিন এসে বলেন, 'আজ মল্লিকবাড়ির সরোজরা এল।' কোনোদিন বলেন, 'আজ নাহাবাড়ির প্রাণকান্তরা এল।' কোনোদিন বলেন, 'আজ রুদ্রবাড়ির মহিমরা এল।'

হেমনাথ যখন খবর নিয়ে আসেন, সুধা-সুনীতি-বিনুরা অসীম আগ্রহে কাছে এসে দাঁড়ায়।

একেক দিন একেক জনের কথা বলেন হেমনাথ, কিন্তু ঝুমাদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন না।

এই নিয়ে সুধা-সুনীতি চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে। সুধা বলে, 'কিরে দিদি—'

সুনীতি বলে, 'কী?'

'দাদু শিশিরমামাদের কথা একবারও তো বলছেন না।'

'ওঁরা আসেননি, তাই বলছেন না।'

'ওঁরা এলে—'

'এলে কী?'

'আনন্দদাও আসবে।'

'তার কি কিছু ঠিক আছে?'

চোখ ঘুরিয়ে সুধা বলে, 'আসবে রে, আসবে। তুই এখানে পড়ে আছিস, চিঠিতে কত আর মনের কথা লেখা যায়। বিধুমুখ দেখতে না পেলে—'

তার পিঠে দুম করে এক কিল বসিয়ে সুনীতি বলে, 'খুব ফাজলামি শিখেছিস।'

পিঠ বাঁকিয়ে খানিকক্ষণ 'উ-উ-উ' করে সুধা। তারপর ঘন গলায় বলে, 'আনন্দদা এলে বেশ হয়, না?'

সুনীতি বলে, 'জানি না, যা—'

পুজোর সপ্তাখানেক আগে একদিন বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে হেমনাথ চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'কই গো, কোথায় গেলে সব—'

সবাই ছুটে এল। স্নেহলতা বললেন, 'কী হয়েছে, অত চিৎকার করছ কেন?'

হেমনাথ বললেন, 'খুব খারাপ খবর।'

উদ্বিগ্ন মুখে স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী?'

'আজ রামকেশরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ও কী বললে জানো?'

'কী?'

'শিশিররা এবার পুজোয় দেশে আসছে না।'

কেন?'

'শিশিরের বড় মেয়ে রুমার খুব অসুখ। ডাক্তার নড়াচড়া করতে বারণ করেছে। তাই—'

স্নেহলতা বললেন, 'কী অসুখ?'

হেমনাথ বললেন, 'টাইফয়েডের মতন—'

'সত্যিই খুব খারাপ খবর। হিরণটা পরীক্ষার জন্য আসতে পারবে না, শিশিররা আসবে না। এবারকার পুজোয় তেমন আনন্দ হবে না।'

একধারে সুধা-সুনীতি দাঁড়িয়ে ছিল। সুধা চাপা গলায় বলল, 'এই দিদি, তোর মুখটা অমন কালো হয়ে গেল কেন রে?'

শিশিররা আসবে না শুনে সুনীতির মুখখানা সত্যিই ভারি করুণ হয়ে গিয়েছিল। সুধার কথায় হাসবার চেষ্টা করল সে, 'কোথায় কালো হয়েছে?'

সুধা বলল, 'আমাকে তুই ফাঁকি দিতে চাস দিদি?'

সুনীতি উত্তর দিল না।

একটু চুপ করে থেকে ভারি গলায় সুধা বলল, 'একজন ঢাকা থেকে রাজদিয়া আসতে পারবে না, আরেক জন কলকাতায় পড়ে থাকবে। না আসুক গে—'

সেদিনই রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঝুমার কথা ভাবছিল বিনু। আগের বছর পুজোর সময় তার সঙ্গে ভেসে যাওয়া নৌকোয় করে মাঠের মাঝখানে চলে গিয়েছিল, সেখানে কাউ ফল পাড়তে গিয়ে পড়েছিল অথৈ জলে। ডুবেই যেত, ঝুমাই সেদিন তাকে নৌকোয় টেনে তুলেছিল।

শুধু কি তাই, ঝুমার পাশে বসে থিয়েটার দেখেছে। ঝাপসা রহস্যময় জ্যোৎস্নায় যুগলের নৌকোয় উঠে সুজনগঞ্জে যাত্রা শুনতে গেছে। নিশিন্দার চরে গেছে চড়ুইভাতি করতে। দুঃসাহসী মেয়েটার অসংখ্য স্মৃতি নানা দিক থেকে বিনুর চারপাশে ভিড় করে আসতে লাগল।

হঠাৎ ঝিনুক ডাকল, 'বিনুদা—'

বিনু চমকে উঠল, 'কী বলছ?'

'ঝুমারা এবার আসবে না।'

'হুঁ।'

'এবার থিয়েটারের সময় তোমার জন্যে আমি জায়গা রাখব।'

অন্যমনস্কের মতন বিনু বলল, 'হুঁ—'

ঝিনুক আবার বলল, 'সুজনগঞ্জের হাটে রাত্রিবেলা নৌকোয় করে যাত্রা শুনতে যাব।'

'হুঁ—'

হিরণ আসেনি, শিশিররা আসেন নি। তবু পুজোয় সমারোহ কম হল না। অন্যবারের মতন এবারও ধুনুচি-নাচের, ঢাকের বাজনার প্রতিযোগিতা হল, নাটক হল, যাত্রা হল, ভাসান গান হল, জারি-সারি-কাচ নাচের আসর বসল, একদিন ধুমধাম করে বাইচ খেলাও হয়ে গেল।

নিয়মমতন সবই হল কিন্তু মানুষের মন এবার বড় অস্থির, বড় চঞ্চল। পুজোমণ্ডপে, জারি-সারি-ভাসান গান কি যাত্রার আসরে—সর্বত্রই এক কথা, এক আলোচনা।

'যুজ্যু লাগছে, কী যে হইব!'

'এইবার আর রক্ষা নাই।'

'জিনিসপত্তরের দাম যা বাড়তে আছে তাইতে আর বাচতে হইব না।'

'জিনিসপত্র আর পাইবা নিহি, বাজার থিকা চাউল-ডাইল সগল উধাও হইয়া যাইতে আছে। ট্যাকা-পয়সা যার আছে হ্যায়ও না খাইয়া মরব, যার নাই হ্যায় তো মরবই।'

কলকাতা-প্রবাসী কেউ কাছাকাছি থাকলে আলোচনাটা আরো জমে ওঠে। কলকাতার মানুষ অনেক বেশি জানে-শোনে, অনেক বেশি খবর রাখে। তারা যুদ্ধ সম্বন্ধে এমন এমন সব কথা বলে যাতে ভয়ে আতঙ্কে রাজদিয়াবাসীদের বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায়।

মোট কথা সবাই আশঙ্কা করে আছে, কিছু একটা ঘটবে। নিদারুণ, বিপজ্জনক, অনিবার্য কিছু। সারা দেশ, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তারই আয়োজন চলছে। রাজদিয়াবাসীরা ভাবে, যুদ্ধ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এই রাজদিয়ারও নিস্তার নেই।

দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো। তারপর রাজদিয়া আবার ফাঁকা হয়ে গেল। একে একে কলকাতার চাকুরেরা ফিরে যেতে লাগল। ক্ষণিকের জন্য রাজদিয়া উৎসবে, উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠেছিল, তার ওপর আবার স্তিমিত নিরুচ্ছ্বাস, বর্ণহীন দিন নেমে আসতে লাগল।

লক্ষ্মীপুজোর পর কালীপুজো।

কালীপুজোর রাত্তিরে একটা মজার ঘটনা ঘটল। মজার এবং বিস্ময়েরও।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বিনু আর ঝিনুক হেমনাথের ঘরে শুতে আসছিল। স্নেহলতা ঝিনুককে ডাকলেন।

ঝিনুক দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কী বলছ?'

স্নেহলতা তার কথার উত্তর না দিয়ে বিনুকে বললেন, 'তুই শুতে চলে যা দাদাভাই—'

বিনু বলল, 'ঝিনুক যাবে না?'

'না।'

ঝিনুক এইসময় চেঁচিয়ে উঠল, 'বা রে আমার বুঝি ঘুম পায় না!'

স্নেহলতা বললেন, 'ঘুম পেয়েছে তো আমার বিছানায় শুয়ে থাক গে—'

ঝিনুক অবাক, 'তোমার বিছানায় শোব কেন?'

'আজ থেকে আমার কাছেই শুবি।'

'নানা, দাদুর কাছে শোব, বিনুদাদার কাছে শোব—' ঝিনুক হাত পা ছুঁড়তে লাগল।

বড় বড় চোখ পাকিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'যা বলছি তাই কর। যাও আমার বিছানায়।

স্নেহলতার এ চেহারা আগে আর কখনও দেখে নি, এমন কণ্ঠস্বর শোনেনি। নিমেষে তার হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ হল কিন্তু জেদটা একেবারে গেল না। ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে, আর সমানে বলতে লাগল, 'কেন ওদের কাছে শোব না, কেন?'

খুব শান্ত গলায় স্নেহলতা এবার বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়ে গেছ, তাই—'

ঝিনুক বিহ্বলের মতন প্রতিধ্বনি করল, 'বড় হয়ে গেছি!' বলে নিজের দিকে তাকাল, তাকিয়েই রইল।

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ।'

ঝিনুক কী বুঝল, কে জানে। আর কিছুই বলল না।

আর বিমূঢ় বিনু অবাক চোখে ঝিনুককে দেখতে লাগল। গেল বার পুজোর সময় তারা রাজদিয়া এসেছে। এবার আরেক পুজো গেল। এক বছরের ভেতর কখন কোন ফাঁকে মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, সে ভেবেই পেল না।

খানিক তাকিয়ে থেকে একসময় একাই হেমনাথের ঘরে চলে গেল বিনু।

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলল। মাঝখানে মোটে দেড়টি মাস, তারপরেই অ্যানুয়েল পরীক্ষা।

সারা রাজদিয়া জুড়ে এখন পড়ার মরসুম চলছে। আজকাল যে বাড়িতেই যাওয়া যাক, সকাল-সন্ধে কচি কচি গলার একটানা বিচিত্র সুর কানে আসে, 'থ্রি সাইডস, অফ এ ট্রায়েঙ্গল—' অথবা 'জলস্পর্শ করবো না আর চিতোর রানার পণ, বুঁদির কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ।' ইত্যাদি ইত্যাদি। জিরান্ড, ভার্বেল নাউন, বহুব্রীহি সমাস, জ্যামিতির কঠিন কঠিন উপপাদ্য,' অ্যালজেব্রার ফরমুলাগুলো রাজদিয়া জুড়ে রাজত্ব করে চলেছে।

একদিন সন্ধেবেলা দক্ষিণের ঘরে বিনুরা পড়তে বসেছে। বাইরের বারান্দায় অবনীমোহন, হেমনাথ খবরের কাগজ নিয়ে আসর জমিয়েছেন। ইচু মন্ডল, ইসমাইল চৌকিদার, কুমোরপাড়ার হাচাই পাল, বুধাই পাল—এমনি অনেকে ঘন হয়ে বসে নিঃশ্বাস বন্ধ করে যুদ্ধের খবর শুনছে।

হঠাৎ বাগানের দিক থেকে রাজদিয়া স্কুলের ইংরেজির টিচার আশু দত্তর গলা ভেসে এল, 'হেমদাদা আছেন?'

পড়তে বসেই ঢুলুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিনুর, চোখ বুজে আসছিল। বার বার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ছিল সে।

আশু দত্তর গলা পেয়ে ঝিমুনি ছুটে গেল। খাড়া হয়ে বসে শেষ পর্দায় গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বিনু পড়তে লাগল, 'আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকায় পিগ্‌মি নামক জাতি বাস করে। ইহারা পৃথিবীব সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মানব, মাত্র চার ফুট দীর্ঘ। এই অঞ্চলের তীব্র সূর্যতাপের জন্য—'

চোখ বইয়ের পাতায় আছে ঠিকই কিন্তু কান রয়েছে বাইরে। ওদিকে হেমনাথ বারান্দা থেকে সাড়া দিয়েছেন, 'আছি। কে, আশু?'

'হ্যাঁ।'

'আয়, আয়—'

আশু দত্ত এলে একটা জলচৌকিতে তাঁকে বসানো হল। হেমনাথ বললেন, 'কী ব্যাপার আশু, হঠাৎ রাত্রিবেলা কী মনে করে?'

আশু দত্ত বললেন, 'একটু খোঁজখবর নিতে এলাম।'

'কিসের?'

'আপনার না, আমার ছাত্রের।'

'মানে বিনুর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জিজ্ঞাসু সুরে হেমনাথ বললেন, 'বিনু তো ভালই আছে। ঐ যে পড়ছে। কিন্তু—'

আশু দত্ত হেসে বললেন, 'ভাবনার কিছু নেই। আমি পড়াশোনারই খোঁজ নিতে এসেছি। বুঝতেই তো পারছেন, অ্যানুয়েল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। ছেলেগুলো পড়ছে কি ঘুমাচ্ছে, দেখতে হবে না?'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তা তো ঠিকই। বিনুকে ডাকব?'

'ডাকতে হবে না, আমিই ঘরে যাচ্ছি।'

'যা—'

আশু দত্ত ঘরের ভেতর এলেন। গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে দিল বিনু।

আশু দত্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পড়া শুনলেন। তারপর ডাকলেন, 'বিনয়—'

স্কুলে বিনয় নামটাই চালু। বিনু বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'আজ্ঞে—'

'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

রাজদিয়া ছোট জায়গা। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। সুধা-সুনীতির সঙ্গে আগেই আশু দত্তর পরিচয় হয়েছিল।

সুধাটা চিরকালই বিভীষণ। সে বলল, 'কোথায় পড়া, এই তো একটু আগে ঢুলছিল।'

কটমট করে সুধাকে একবার দেখে নিয়ে মিনমিনে গলায় বিনু বলল, 'ঢুলছিলাম না স্যার।'

আশু দত্ত বললেন, 'মন দিয়ে পড়। ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার আর গ্রামার কিন্তু তোমার ঠিকমতন তৈরি হয়নি। ওগুলো দেখে রাখবে।'

'রাখব স্যার।'

'মুখে বললে হবে না, কাজে দেখাতে হবে। পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছ কিনা, সেটা দেখতে আমি আবার আসব।'

'কবে আসবেন?'

'তা কি বলে আসব! যে কোনোদিন আসতে পারি।'

আশু দত্ত ঘরের বাইরে যেতে হেমনাথ বললেন, 'বোস, চা খাবি?'

আশু দত্ত অবাক, 'আপনার বাড়িতে চা ঢুকেছে নাকি!'

হেমনাথ হাসলেন, 'জামাইয়ের চায়ের অভ্যেস। চা না ঢুকিয়ে কী করি বল।'

'তা হলে খেয়েই যাই।'

একটু পরে চা এল, খেয়েই উঠে পড়লেন আশু দত্ত।

হেমনাথ বললেন, 'এক্ষুণি যাবি ? আরেকটু বোস না। খবরের কাগজ এসেছে, গরম গরম অনেক যুদ্ধের খবর আছে, শুনে যা।'

'আমার বসবার সময় নেই হেমদাদা।'

'কেন, তোমার কী এমন রাজকাজ ?'

'আর বলবেন না। লাহিড়ীবাড়ি যেতে হবে, মুন্সিবাড়ি যেতে হবে, রুদ্রদের বাড়ি যেতে হবে।'

'কেন ?'

'ওদের বাড়ির ছেলেরা পড়ায় বড্ড ফাঁকি দেয়। এখন থেকে যদি পেছনে না লেগে থাকি ম্যাট্রিকে স্কুলের রেজাল্ট ভাল হবে কি করে ? আমি চাই রাজদিয়ার প্রত্যেকটি ছেলে লেখাপড়ায় ভাল হোক, মানুষ হোক।' একটু থেমে আশু দত্ত আবার বললেন, 'যুদ্ধের খবর শুনবার জন্যে বসতে বলছেন ? শুনে কী করব ? যুদ্ধ তো আর আমি ঠেকাতে পারব না। যা হবার তা-ই হবে।'

হেমনাথ মাড়া নাড়লেন, 'হ্যাঁ। ছেলেদের চিন্তায় আশুটা পাগল। কে পড়ছে না, কার কী অসুবিধা হচ্ছে—এসব দেখে না বেড়ালে ওর ঘুমই হয় না।'

অসীম শ্রদ্ধায় অবনীমোহন উচ্চারণ করলেন, 'সত্যি, এরকম শিক্ষক আগে আর কখনও দেখিনি !'

অ্যানুয়েল পরীক্ষার ক'দিন খুব হৈ-চৈ। জাপানিরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পার্ল হারবারে, সিঙ্গাপুরে, ম্যানিলায় বোমা ফেলেছে। 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' আর 'রিপালস্' নামে দুটো বড় বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

ভয় উত্তেজনা উদ্বেগ এবং রকমারি গুজবের মধ্যে বিনুদের পরীক্ষা হয়েও গেল।

অ্যানুয়েল পরীক্ষার কিছুদিন পর খবর-কাগজ আরো মারাত্মক সংবাদ বয়ে আনল। জাপানিরা ঘরের কাছে বর্মায় নাকি এবার বোমা ফেলেছে। শুধু তাই না, বর্মা থেকে দলে দলে লোক পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড়-পর্বত বনজঙ্গল পেরিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলে আসছে।

একদিন হেমনাথ বললেন, 'ত্রৈলোক্য সেনের নাম শুনেছ তো ?'

স্নেহলতা বললেন, 'যে রেঙ্গুনে থাকত ?'

'হ্যাঁ। তারা আজ রাজদিয়ায় ফিরে এসেছে।'

স্নেহলতা বললেন, 'ত্রৈলোক্য সেন এসেছে ?'

হেমনাথ বললেন, 'একা আসবে কি, ছেলেপুলে নাতি-নাতিকুড়-সবাইকে নিয়ে এসেছে। তাদের কোথায় রেখে আসবে ?'

'হঠাৎ চলে এল ?'

'বা রে, তুমি কি কিছুই খোঁজ রাখো না !'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'বর্মায় জাপানিরা বোমা ফেলেছে। অনেক লোক মরেছে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট সব ধ্বংসস্তূপ। বোমা পড়তেই রেঙ্গুন শহর থেকে লোক পালাতে শুরু করেছিল। রেঙ্গুন এখন একেবারে ফাঁকা।'

কোথায় বর্মা, কোথায় জাপান, কোথায় শ্বেতসাগর, কোথায় ডানজিগ -সেবাস্টিপুল- মস্কো, কোথায়

বলকান - যুগোশ্লাভিয়া- পোল্যান্ড — ভূগোলের কোন প্রান্তে এই জায়গাগুলো পড়ে আছে, দুই গোলার্ধের কোথায় কোথায় বোমা পড়ছে, কত লোক মরছে, মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য কারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, এ সব কোনো খবরই রাখেন না স্নেহলতা। এই রাজদিয়া, হাচাই পালের মেয়েব মাঘমন্ডলের ব্রত, নাটাইচন্ডীর ব্রত, নীলপুজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, বাস্তুপুজো, কারো বিয়ে হলে জল সইতে যাওয়া, বাসর জাগা—এ সবের মধ্যেই তাঁর ভূমন্ডল, তাঁর জগৎ। এতকাল এর বাইরে কোনো কিছু সম্বন্ধেই তাঁর দুর্ভাবনা ছিল না।

ভীত সুরে স্নেহলতা বললেন, 'তাই নাকি, এত কান্ড হয়েছে!'

'হ্যা।' ঐরকম অবস্থায় মানুষ কখনও বর্মায় পড়ে থাকতে পারে?'

'তা তো ঠিকই।'

হেমনাথ বললেন, ত্রৈলোক্যদের যা দুর্গতি হয়েছে কি বলব—'

'তবে এল কী করে?'

'হেঁটে।'

'বর্মা তো শুনেছি অনেক দূর।'

'হ্যাঁ। ছেলেপুলে নাতি-নাতনীর হাত ধরে পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল পেরিয়ে প্রথমে আসামে এসেছে। সেখান থেকে ট্রেনে রাজদিয়া।'

একটু ভেবে স্নেহলতা বললেন, 'হেঁটে তো এসেছে। জিনিসপত্র কিছু আনতে পেরেছে কি?'

হেমনাথ জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'কিছু না, কিছু না। নিজের হাত-পা আর পরনের জামা-কাপড় ছাড়া কুটোটুকুও আনতে পারে নি।'

আহা রে, কী কষ্ট!'

একটু চুপ।

তারপর স্নেহলতা আবার বললেন, 'অনেক কাল পরে ত্রৈলোক্য সেনরা রাজদিয়া এল, তাই না?'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। তা বছর তিরিশেক হবে।'

'বর্মায় ওরা তো বেশ ভালই ছিল।'

'ভাল বলে ভাল। বিরাট অবস্থা করে ফেলেছিল ত্রৈলোক্য। এক রেঙ্গুনেই তিনখানা বাড়ি, প্রোমে ছিল একখানা। তা ছাড়া জমিজমা, নারকেল বাগান। নগদ টাকা পয়সাও প্রচুর।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নেহলতা বললেন, 'কিছুই আনতে পারল না। সর্বস্ব বিদেশেই পড়ে রইল।'

হেমনাথ বললেন, 'বাড়িঘর যাক। নিজের নিজের প্রাণটুকু নিয়ে যে আসতে পেরেছে, এই ঢের।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে স্নেহলতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ভালো কথা—'

'কী?'

অনেক কাল ওরা ছিল না। রাজদিয়ায় ওদের বাড়ি তো জঙ্গলে ঢেকে গেছে। তা উঠল কোথায়? আমাদের বাড়ি নিয়ে এলেই পারতে। যদ্দিন না কিছু একটা ব্যবস্থা হয় এখানেই থাকত।'

হেমনাথ বললেন, 'ভালো জায়গাতেই উঠেছে, সে জন্যে চিন্তা নেই। স্টিমারঘাটা থেকে রামকেশব ত্রৈলোক্যদের নিজের বাড়ি নিয়ে তুলেছে।'

'আপাতত ওখানেই থাকছে তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'কাল একবার যাব।'

'হ্যাঁ, যাওয়া দরকার।'

ম্যাপ বইতে বর্মার মানচিত্র দেখেছে বিনু। ভারতবর্ষের ঠিক গায়েই ব্রহ্মদেশ। আরাকান ইরাবতী পেগু মান্দালয়—সে দেশের নদ-নদী শহর-বন্দরের নাম ভূগোল বইয়ের কল্যাণে তার মুখস্থ। ম্যাপে

যত কাছে মনে হয়, ব্রহ্মদেশ আসলে তত কাছে নয়—সে কথা বিনু জানে। ভারতবর্ষ, বিশেষ করে এই রাজদিয়া থেকে বর্মা শত শত মাইল দূরে।

রাজদিয়া নামে জলবাংলার এক অখ্যাত নগণ্য মফস্বল শহরের লোক বর্মায় গিয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর ছিল, জাপানি বোমার ভয়ে এত কাল পর সপরিবারে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আবার জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। একধারে দাঁড়িয়ে ত্রৈলোক্য সেনদের কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চোখে আর পলক পড়ছিল না বিনুর। বুকের ভেতর শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার সঙ্গে আমিও যাব দিদা—' ত্রৈলোক্য সেনদের দেখবার জন্য মনে মনে সে অস্থির, উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

বিনু যেতে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুকও সুর ধরল, 'আমিও যাব ঠামু—'

দেখা গেল সুধা-সুনীতি, এমন কি সুরমা-শিবানী-অবনীমোহনেরও এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহ। বর্মা ফেরত মানুষগুলোকে দেখার জন্য সকলে পা বাড়িয়ে আছে।

স্নেহলতা বললেন, 'সবাই যাবে।' বলেই হেমনাথের দিকে ফিরলেন, 'ওদের জিজ্ঞেস করেছ?'

হেমনাথ বললেন, 'কী?'

'টাকা পয়সা কি অন্য কিছুর দরকার আছে কিনা?'

'না, সবে এসেছে। তা ছাড়া রামকেশব নিজের বাড়ি নিয়ে গেছে। এক্ষুনি জিজ্ঞেস করাটা খারাপ দেখায়।'

একটু চুপ করে থেকে স্নেহলতা বললেন, 'আমি কিন্তু কাল ত্রৈলোক্যঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করব।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'কোরো। তবে রামকেশবের সামনে না।'

'তা তোমাকে বলে দিতে হবে না। আমার ঘটে সেটুকু বুদ্ধি আছে।' স্নেহলতা হাসলেন।

'আছে নাকি?' হেমনাথও হাসলেন।

বাকি দিনটা ত্রৈলোক্য সেনদের আলোচনাতেই কাটল।

ত্রৈলোক্য সেনের বাবা ছিলেন নাম-করা কবিরাজ, লোকে বলত স্বয়ং ধন্বন্তরি। অম্বিকা কবিরাজ ছুঁলেই নাকি রোগ অর্ধেক সেরে যেত। কবিরাজি তাঁদের কৌলিক ব্যবসা, বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল। বিপুল পসার ছিল অম্বিকা কবিরাজের। ঢাকা বরিশাল-ময়মনসিং, দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর ডাক আসত। প্রচুর পয়সাও করেছিলেন। লোকে সম্মান করত, ভক্তি করত।

জলবাংলার দূর-দূরান্ত থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখতে অম্বিকা সেনের কাছে ছাত্ররা আসত। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও নিজের ছেলেকে কুলবিদ্যা ধরাতে পারেননি অম্বিকা সেন। বংশগত ব্যবসা না করুক, ছেলে অন্তত লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক, এই আশায় ত্রৈলোক্যকে ইংরেজি স্কুলে পাঠিয়েছিলেন অম্বিকা কবিরাজ। তখন ইংরেজির খুব রবরবা, তার তোপের মুখে ভারতবর্ষের যত প্রাচীন বিদ্যা উড়ে যাচ্ছে। এক-আধ পাতা 'এ বি সি' শিখলেও করে খেতে পারবে।

কিন্তু দু-চার বছরের বেশি ইংরেজি স্কুলে যাতায়াত করেন নি ত্রৈলোক্য সেন। আসলে লেখাপড়ায় মনই ছিল না। যৌবনের শুরুতেই বেছে বেছে খারাপ সঙ্গ যোগাড় করেছিলেন। কুসঙ্গে পড়ে নেশা-টেশা ধরেছিল, মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটিয়ে আসতেন। অনেক বার যুগীপাড়া, তেলীপাড়া থেকে মার খেয়ে এসেছেন।

ছেলের চরিত্র শোধরাবার জন্য কম বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন অম্বিকা সেন। সে আমলে মেয়েদের ছোটবেলাতেই বিয়ে হত। ঘরে যাতে ছেলের মন বসে, তাই খুঁজে খুঁজে যুবতী পুত্রবধূ এনেছিলেন। তাতে কাজও হয়েছিল। ত্রৈলোক্য সেন আর বাড়ি থেকে বেরুতেন না।

ছেলেকে তরুণী মেয়ে ঘুষ দিয়ে নিজের ইচ্ছামতন হয়তো চালাতে পারতেন কিন্তু তার আগেই অম্বিকা সেন মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর যা কিছু সঞ্চয় ভেঙে ভেঙে খেলেন ত্রৈলোক্য

সেন। তারপব একে একে দেড়শ' কানি ধানজমি বেচলেন। পৈতৃক বাড়িখানা ছাড়া যখন আর কিছু নেই, সেই সময় একদিন ছেলেপুলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সুদূর বর্মায় পাড়ি দিলেন ত্রৈলোক্য। এত রাজ্য থাকতে কেন যে মগের মুল্লুকে গেলেন, তিনিই জানেন।

সে কি আজকের কথা! তিরিশ বছর আগে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয় নি, ত্রৈলোক্য সেন বর্মা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হেমনাথকে একখানা মোটে চিঠি লিখেছেন, তারপর এতকাল রাজদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জাপানি বোমার ভয়ে দেশে ফিরে আসতে হল তাঁকে।

ভাগ্যের সন্ধানে বর্মায় গিয়েছিলেন ত্রৈলোক্য সেন। ভাগ্য তাঁকে ছলনা করে নি, দশ হাতে ঢেলে দিয়েছিল। কাঠের ব্যবসা কবে অজস্র পয়সা করেছিলেন, বাড়িঘর করেছিলেন। কিন্তু জীবন এমন ব্যাঙ্গবসিক যে সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে।

পরদিন বিকেলবেলা বিনুরা রামকেশবের বাড়ি গেল।

ত্রৈলোক্য সেনরা যে জাপানি বোমার ভয়ে চলে এসেছে, সে খবর জানতে কারো বুঝি বাকি নেই। সারা রাজদিয়া যেন রামকেশবের বাড়ি ভেঙে পড়েছে। রাজদিয়া কেন, আশেপাশের গ্রাম-গঞ্জ থেকেও অনেকে এসেছে। সবাব চোখ-মুখে আগ্রহ, বিস্ময়, ভয় এবং আতঙ্ক।

বিনুরা যেতেই সাড়া পড়ে গেল। চারপাশের ভিড়টা বলাবলি কবতে লাগল, 'হ্যামকত্তার বাড়িত্ থনে আইছে।'

'ভিতরে যাইতে দাও।'

খবব পেয়ে রামকেশব ছুটে এলেন। সম্ভ্রমের সুরে বললেন, 'আসুন, আসুন বৌ ঠাকুরন। কাল হেমদাদা এসেছিলেন, তাঁর মুখে নিশ্চয়ই ত্রৈলোক্যদাদার খবর পেয়েছেন—'

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো ছুটে এলাম।'

'তা জানি। নইলে—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন স্নেহলতা।

রামকেশব আবার বললেন, 'ত্রৈলোক্যদাদা এসেছেন বলে গরিবের বাড়ি আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।'

চোখ কুঁচকে মাথা নেড়ে নেড়ে কপট রাগের গলায় স্নেহলতা বললেন, 'আমি বুঝি আসি না?'

'কই আর আসেন! কদ্দিন পর এলেন নিজেই হিসেব করে দেখুন।'

'হিসেব আমার করাই আছে।'

'তবে তো ভালই হয়েছে। কতকাল পর এলেন, চট করে বলে দিতে পারবেন।'

রণে ভঙ্গ দিলেন স্নেহলতা। হাসতে হাসতে বললেন, 'হিসেব-নিকেষ ভবিষ্যতের জন্যে থাক। এখন সেনঠাকুরপোর কাছে নিয়ে চলুন।'

কৌতুকের গলায় রামকেশব বললেন, 'অমন মোহন হাসি হাসলে চলবে না। কোমর বেঁধে ঝগড়া করব, তবে ছাড়ব।'

'আচ্ছা, আমি তার জন্যে তৈরি।'

'দেখা যাবে।'

রামকেশব তাঁদের নিয়ে দোতলার একটা ঘরে এলেন। এ ঘরে সব চাইতে বেশি ভিড়। একটি লম্বামতন সুপুরুষ বৃদ্ধকে ঘিরে রাজদিয়াবাসী অনেক লোকজন বসে আছে।

বৃদ্ধ কিছু বলছিলেন। আর চারধারের জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল, শ্বাস টানতে পর্যন্ত তারা ভুলে গেছে।

ঢুকেই রামকেশব ডাকলেন, 'সেনদাদা—'

বোঝা গেল উনিই ত্রৈলোক্য সেন। রামকেশব বললেন, 'আপনার আরো শ্রোতা এসেছে।' বলে

স্নেহলতাকে দেখিয়ে দিলেন, 'এঁকে চিনতে পারছেন?'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ত্রৈলোক্য। ধীরে ধীরে বললেন, 'চেনা-চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।'

রামকেশব বললেন, 'আমাদের বৌ-ঠাকরুণ। হেমদাদার—'

চোখের তারায় আলো নেচে গেল ত্রৈলোক্যের, 'আর বলতে হবে না। ওঃ, কতকাল পর আপনাকে দেখলাম। চিনবার কি উপায় আছে, চুলটুল সব পাকিয়ে ফেলেছেন।'

'চুল পাকবে না? আয়নায় নিজের চেহারাখানা দেখেছেন? আপনিও কিন্তু আর নবীন যুবকটি নেই।'

'তা যা বলেছেন।' বলতে বলতে উঠে এসে স্নেহলতাকে প্রণাম করলেন ত্রৈলোক্য।

বিব্রতভাবে পিছোতে পিছোতে স্নেহলতা বললেন, 'থাক থাক, আবার প্রণাম কেন?'

ত্রৈলোক্য বললেন, 'আপনি আমাদের প্রণামের পাত্রী, তাই—'

রামকেশব এরপর একে একে অবনীমোহন, সুরমা, সুধা-সুনীতিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

পরিচয়-পর্ব চুকলে ত্রৈলোক্য বললেন, 'বেশ বেশ। বসুন বৌ-ঠাকরুন, বোসো বাবা অবনী, সুরমা তোমরাও বোসো।'

সবাই বসবার পর স্নেহলতা বললেন, 'আপনাকে তো দেখছি। আমার বোন, ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনীরা কোথায়?'

'বড় নাতি ছাড়া আর সবাই আমাদের বাড়ি দেখতে গেছে।'

'আপনাদের বাড়ি কি আর বাসের যোগ্য আছে?'

'কী করে থাকবে বলুন। কতকাল আমরা দেশছাড়া। বাড়িঘর এখন জঙ্গলে বোঝাই। সাপখোপের আস্তানা হয়ে উঠেছে। আজ থেকে কামলা লাগল। বাড়ি সারিয়ে-সুরিয়ে যেতে হবে তো। রামকেশবের ওপর কদ্দিন আর জুলুম করব।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়তে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'শ্যামল কোথায় রে, শ্যামল—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় যে ছেলেটি এসে দাঁড়াল তার বয়েস চোদ্দ পনেরর মতন, বিনুর সমবয়সী, কি বছর খানেকের বড়।

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, লম্বাটে মুখ, ভাসা-ভাসা বড় চোখ, গায়ের রংখানি উজ্জ্বল শ্যাম। সব মিলিয়ে চেহারাটি ভারি মিষ্টি, তাকালেই চোখ স্নিগ্ধ হয়ে যায়। ছেলেটির শ্যামল নাম সার্থক। নামের সঙ্গে চেহারার এমন মিল কদাচিৎ দেখা যায়।

ত্রৈলোক্য ডাকলেন, 'আয়—'

ছেলেটি ভেতরে এল। ত্রৈলোক্য বললেন, 'এই আমার বড় নাতি।'

স্নেহলতাদের দেখিয়ে শ্যামলকে বললেন, 'ইনি ঠাকুমা। উনি হলেন পিসিমা, উনি পিসেমশায়, ওরা দিদি, যাও প্রণাম কর।'

টিপ টিপ করে স্নেহলতা-সুরমা-অবনীমোহন-সুধা-সুনীতির পায়ে কপাল ঠেকিয়ে বিনুর পাশে গিয়ে বসল শ্যামল।

এদিকে ঘরে অন্য লোকজন যারা আগে থেকে বসে ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কিছু অবশ্য বলছে না। তবে মুখ-টুখ দেখে তা টের পাওয়া যায়।

স্নেহলতা লক্ষ করছিলেন। বললেন, 'আমরা আসবার আগে কী কথা হচ্ছিল সেন-ঠাকুরপো?'

'এই বর্ষার কথা বলছিলাম সবাইকে।'

রামকেশব বিনুদের পৌঁছে দিয়ে চলে যান নি, একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'সেনদাদা, কাল থেকে কতবার যে বর্ষার কথা বলছে, লেখাজোখা নেই। সারাদিন লোক আসছে, সারদিন বকবকানি

চলছে। বকতে বকতে মুখে ফেনা উঠবার যোগাড়।'

ত্রৈলোক্য হাসলেন, 'কি আর করা যাবে। লোকে এত আগ্রহ নিয়ে আসছেন। না শুনিয়ে পারি কখনও ?'

স্নেহলতা বললেন, 'আমরাও কিন্তু বর্মার গল্প শুনতে এসেছি।'

ত্রৈলোক্য বললেন, 'নিশ্চয়ই। বলে ভিড়টার দিকে তাকলেন, বৌ-ঠাকরুন এসেছে। তাহলে গোড়া থেকে আবার শুরু করা যাক।'

দেখা গেল, এ ব্যাপরে কারো আপত্তি নেই। সবাই মাথা নেড়ে বলল, 'হ-হ, হেই ভাল। আরেকবার শুনা যাইব।'

ত্রৈলোক্য আরম্ভ করলেন। বেশ সুখেই ছিলেন তাঁরা বর্মায়। হঠাৎ কেন যে যুদ্ধ লাগল। আর লাগবিই যদি, পৃথিবীতে ঢের জায়গা পড়ে ছিল। সেসব ছেড়ে জাপানি ব্যাটারা এসে বর্মার ওপর বোমা ফেলল। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না, পলক পড়তে না পড়তে বহুকাল ধরে তিল তিল সাধনায় গড়ে ওঠা মনোরম জনপদ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতন কাত হয়ে পড়ল, রাস্তায় রাস্তায় প্রকাণ্ড গর্ত। আহত মানুষের চিৎকার, স্তূপাকার মানুষের মৃতদেহ, ঘন ঘন সাইরেনের শব্দ, ঝাঁক ঝাঁক জাপানি প্লেনের আক্রমণ—সব মিলিয়ে বর্মা যেন নরকের আরেক নাম।

ত্রৈলোক্য বলতে লাগলেন, 'বোমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুন-টেঙ্গুন থেকে পালানোর হিড়িক লেগে গেল। কিন্তু যাবে কোথায় ? বার্মিজরা গ্রামের দিকে পালাল। আর ইন্ডিয়ানরা ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু আসতে চাইলেই তো আসা যায় না। দশ দিন বারো দিন পর একটা করে কলকাতার জাহাজ। দামের তিন গুণ দিয়েও তার টিকিট পাওয়া যায় না। এদিকে রেঙ্গুনে বসে থাকা মানে নির্ঘাত মৃত্যু। অগত্যা বহু মানুষ হাঁটা পথ ধরল, আমরাও পা দু'খানার ওপর ভরসা করে রওনা হলাম।'

স্নেহলতা বললেন, 'তারপর ?'

'সে যে কী কষ্ট, বলে বোঝাতে পারব না বৌ-ঠাকরুন। পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে দিনের পর দিন হাঁটছিতো হাঁটছিই। হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে গেল। কত লোক যে রাস্তায় পড়ে মরেছে, তার হিসেব নেই। খাদ্য নেই, জল নেই। খিদের জ্বালায় পেট পুড়ে গেছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে। কোথাও ঝরনা দেখে হয়তো ছুটে গেছি। কাছে যেতেই চোখে পড়েছে, দা হাতে মগেরা দাঁড়িয়ে আছে। দশ টাকা করে দিলে এক বালতি জল পাওয়া যাবে। ভয়ে ভয়ে ফিরে এসেছি। কোথাও বনের ভেতর কলা ফলে আছে। সেখানেও দা হাতে মগ। হাঁটতে হাঁটতে বাচ্চাগুলোর জ্বর হয়ে গেল। তাদের কাঁধে তুলে চলতে লাগলাম।'

স্নেহলতা বললেন, 'আহা রে—'

বর্মা থেকে রাজদিয়া পর্যন্ত পথের ভয়াবহ নিদারুণ বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগলেন ত্রৈলোক্য, রাস্তায় কতবার যে ডাকাতের হাতে পড়েছি তার হিসেব নেই। শুধু আমরাই তো নই, বর্মা থেকে আরো অনেক মানুষ আসছিল। ডাকাতরা যদি টের পেয়েছে, কারো সঙ্গে টাকা-পয়সা সোনাদানা আছে, গলার কাছে রামদা ধরে সব কেড়ে কুড়ে নিয়েছে। দিতে না চাইলে স্রেফ কেটে ফেলেছে। এভাবে যে কত লোক প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব নেই বৌ-ঠাকরুন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনে যাচ্ছিল বিনু। হঠাৎ পাশ থেকে কে ডাকল, 'এই—'

চমকে সেদিকে তাকাল বিনু। দেখল সেই ছেলেটা যার নাম শ্যামল। চোখাচোখি হতেই শ্যামল হাসল। বলল, 'তোমার নাম কি ভাই ?'

বিনু স্কুলের ভালো নামটাই বলল, 'বিনয়কুমার বসু—'

শ্যামল বেশ সহজ সাবলীল ছেলে। লজ্জা, সঙ্কোচ-টঙ্কোচ তার নেই বললেই হয়। হাসতে হাসতে

বলল, 'ও তো ভালো নাম মস্ত বড়। ডাক নাম নেই তোমার?'

'আছে। বিনু—'

'সুন্দর নাম তো।'

বিনু বলল, 'তোমার নামটাও সুন্দর।'

শ্যামল বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'সবার সঙ্গে দাদু আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, শুধু তোমার সঙ্গেই বাদ।'

কথাটা ঠিক। বিনু বলল, 'হয়তো খেয়াল করেননি।'

শ্যামল বলল, 'সে যাক গে, তোমার সঙ্গে আমি কিন্তু সেধে আলাপ করলাম। রাগ করলে না তো?'

'বা রে, রাগ করব কেন?'

'তুমি কোন ক্লাসে পড় ভাই?'

'এবার নাইনে উঠেছি।'

শ্যামল উৎসাহিত হয়ে উঠল, রেঙ্গুনে আমি ক্লাস এইটে পড়তাম। এ বছর নাইনে উঠবার কথা ছিল। ভালই হল, নাইনে ভর্তি হব, তোমার সঙ্গে পড়ব।' একটু থেমে বিমর্ষ সুরে আবার বলল, 'কিন্তু বিনু—'

'কী?'

'আমাকে কি এখানে ক্লাস নাইনে নেবে?'

'কেন নেবে না?'

'আমার যে ভাই ওখানে অ্যানুয়াল পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট-টার্টিফিকেট আনতে পারিনি। আনব কি করে বল, জাপানিদের বোমা পড়ল। সব ফেলে পালিয়ে আসতে হল—'

বিনু বলল, 'এখানে ভর্তি হতে হলে একটা অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে। আমিও কলকাতা থেকে এসে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম।'

চিন্তিত মুখে শ্যামল শুধলো, 'খুব কঠিন পরীক্ষা নেয়?'

নিজের ফাঁড়া তো কেটে গেছে। মুরুব্বিয়ানা চালে বলল, 'তেমন কঠিন আর কি—'

শ্যামল বলল, 'বড্ড ভয় করছে।'

বিনু শ্যামলের সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই। কিন্তু তার কান দুটো ছিল ত্রৈলোক্য সেনদের দিকে। জাপানি বোমার ভয়ে দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে পালিয়ে আসার দীর্ঘ রোমাঞ্চময় বিবরণ শোনার মতন উন্মাদনাকর আর কী থাকতে পারে? প্রবল আকর্ষণে ত্রৈলোক্য বিনুকে তাঁর দিকে টানছিলেন।

বিনু যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে শ্যামল তা লক্ষ্য করছিল। বলল, 'দাদুর কথা বুঝি ভাল লাগছে?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'দাদু আর কতটুকু বলছে। আমি তোমাকে পরে সব বলব। জাপানিরা প্রথম দিন এসে কেমন করে বোমা ফেলল, ইংরেজ সৈন্যরা তখন কী করছিল, আমরা কী করছিলাম, রেঙ্গুনের লোকেরা কী করছিল, আমরা কেমন করে এলাম—সব বলব। কত শুনতে পার তখন দেখা যাবে। শোনাতে শোনাতে কান একেবারে ঝালাপালা করে ছাড়ব। এখন আমার সঙ্গে গল্প কর দেখি।'

কি আর করা, ত্রৈলোক্য সেনের গল্পের আশা ছাড়তে হল বিনুকে। চোখ কান মেলে শ্যামলের দিকে তাকাল সে।

শ্যামল বলল, 'তখন কলকাতার কথা কী বলছিলে?'

বিনু বলল, 'আমরা কলকাতায় থাকতাম।'

'কবে এসেছ?'

'বছর দেড়েকের কাছাকাছি।'

'রাজদিয়াতে তোমরা কোথায় থাকো?'

কোথায় থাকে, বিনু বলল।

'তোমাদের বাড়ি একদিন যাব।'

'নিশ্চয়ই যাবে।'

'তোমাকেও আসতে হবে। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।'

'আসব। তোমাকেও আমার ভাল লেগেছে।'

দু'জনের মধ্যে টুকরো টুকরো, এলোমেলো, অসংলগ্ন গল্প চলতে লাগল। কথা বলতে বলতে বিনুর হঠাৎ মনে পড়ল, ঝুমার সঙ্গে এখানেই তার আলাপ হয়েছিল। সেই দুঃসাহসী, ভয়লেশহীন মেয়েটা। কতকাল তার সঙ্গে দেখা হয় না। ঝুমার কথা ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল বিনুর।

ওধারে এক সময় ত্রৈলোক্য সেনের বিচিত্র ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কাহিনী শেষ হল।

স্নেহলতা ছাড়া একে একে অন্য শ্রোতার দল চলে যেতে লাগল।

সবাই চলে গেলে ঘর যখন ফাঁকা, স্নেহলতা শুধোলেন, 'একটা কথা সেন-ঠাকুরপো—'

ত্রৈলোক্য সেন উৎসুক চোখে তাকালেন, 'কী?'

'মগের মুল্লুকে সবই তো ফেলে-টেলে এসেছেন। কিছুই আনতে পারেন নি।'

'হ্যাঁ।'

'টাকা-পয়সার দরকার থাকলে কিন্তু বলবেন। একটুও লজ্জা করবেন না।'

'আপনাদের কাছে লজ্জার কিছু আছে নাকি। তবে—'

'কী?'

'টাকা-পয়সার এখন দরকার নেই বৌ-ঠাকরুন।'

কিছুই আনতে পারেন নি অথচ পয়সাকড়ির প্রয়োজন নেই—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না স্নেহলতা। বিমূঢ়ের মতন তিনি তাকিয়ে থাকলেন।

স্নেহলতার মনোভাব খানিক যেন অনুমান করতে পারলেন ত্রৈলোক্য। হাসতে হাসতে বললেন, 'তা হলে আপনাকে একটা কথা বলি—'

'কী?'

'হাজার বিশেক টাকা আমি আনতে পেরেছি।'

'কিভাবে?' বিস্ময়ে আর উত্তেজনায় গলা কাঁপতে লাগল স্নেহলতার, 'ডাকাতরা ধরে নি?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ত্রৈলোক্য সেন বললেন, 'সে একটা চালাকি করেছিলাম বৌ-ঠাকরুন। পা যেন ভেঙে গেছে, তা দেখাবার জন্যে হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করে নিয়েছিলাম। ব্যান্ডেজের ভাঁজে ভাঁজে একশ' টাকার নোট রেখেছি। লোকের চোখে ধুলো ছিটোবার জন্য খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতাম। কিরকম ফন্দি খাটিয়েছিলাম বলুন তো?' চোখেমুখে গর্বের ভাব ফুটিয়ে ত্রৈলোক্য তাকালেন।

গালে হাত দিয়ে মাথাটি হেলিয়ে দিলেন স্নেহলতা, 'বাব্বা, আপনার মাথায় এতও এসেছিল?'

ত্রৈলোক্য হাসতে লাগলেন, 'হাজার হোক ওরা মগ ডাকাত। আর আমি—'

'আপনি কী?'

'ঢাকাইয়া পোলা।' শব্দ দুটো পূর্ব বাংলার টান দিয়ে উচ্চারণ করলেন ত্রৈলোক্য।

স্নেহলতা এবার হেসে ফেললেন।

কথায় কথায় বেলা ফুরিয়ে এল। শীতের অবেলায় রোদের রং যখন বাসি হলুদের মতন সেই সময় ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ, অন্য নাতি-নাতনীরা নিজেদের বাড়ি দেখে ফিরে এল।

অগত্যা আরো কিছুক্ষণ বসে যেতে হল বিনুদের। স্নেহলতা ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী, ছেলের বৌদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললেন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল। নদীর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসতে লাগল। হিমে-কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা, অস্পষ্ট। কাছাকাছি ঝোপঝাড়গুলোর ভেতর থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। আলোর ছুঁচের মতন অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে জোনাকিরা একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। সারা রাতের জন্য এই জ্বলা এবং নেভার খেলা চলবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হলেন স্নেহলতা, 'এবার আমরা যাই বোন।'

ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী বললেন, 'এখনই যাবেন দিদি ?'

'হ্যাঁ। রাতের রান্না পড়ে আছে, গিয়ে বসাতে হবে। তোমরা যেও—'

'বুঝতেই তো পারছেন দিদি, এখন যাওয়ার খুব অসুবিধে। নিজের বাড়ি-ঘরে থিতি হয়ে বসি, তারপর যাব।'

'বাড়ি যেতে কদ্দিন লাগবে ?'

'আজই সবে কামলা লাগল। সাত-আটদিনের আগে সারাই-টারাই হবে বলে তো মনে হয় না।'

'বাড়ি গিয়ে বসবার পরই তা হলে যেও।'

'যাব। আপনারও আসবেন।'

'আসব।' বলতে বলতে উঠে পড়লেন স্নেহলতা।

দিনকয়েক পর শ্যামল বিনুদের ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেল। এখন রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়। দিনের অনেকখানি সময় এক সঙ্গে কাটে দু'জনের।

কলকাতা থেকে আসার পর এখানে বিশেষ বন্ধু-টন্ধু পায় নি বিনু। ক্লাসের ছেলেরা অবশ্য ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে তেমন মিশত না।

বন্ধুর জন্য বিনুর প্রাণের যে জায়গাটা ফাঁকা পড়ে ছিল, শ্যামল এসে তা ভরিয়ে তুলল।

টিফিনের সময় কিংবা স্কুল ছুটির পর বিনুরা নদীর পারে গিয়ে বসে, কখনও হাঁটতে হাঁটতে বরফকল, স্টিমারঘাটার দিকে চলে যায়।

এর মধ্যে বর্মার অনেক গল্প করেছে শ্যামল। রেঙ্গুন শহর, শোরেডাগন প্যাগোডা, রয়াল লেক, বর্মিদের জল-উৎসব, সাগরের জলে ভরপুর নীলকণ্ঠ ইরাবতী—এমনি কত কথাই না বলেছে।

একদিন গল্প করতে করতে শ্যামল বলল, 'জানো বিনু, দু'জনের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়।'

'তারা কে ?'

'সুব্রত আর মা-পোয়ে। সুব্রত ছিল আমার প্রাণের বন্ধু, রেঙ্গুনে আমরা এক-রাস্তাতেই থাকতাম। বোমা পড়বার পর সবাই যখন পালাচ্ছে সুব্রতরা জাহাজের টিকিট পেয়ে গেল। ওরা কলকাতায় এসেছিল,

তারপর কোথায় গেছে কে জানে। জীবনে আর হয়তো কোনোদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে শ্যামলের, চোখমুখ বিষণ্ণ দেখায়।

বিনু শুধোয়, 'মা-পোয়ে কে?'

'একটা বার্মিজ মেয়ে। ওরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। ওর বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। আমাদের বাড়ি ওরা সবসময় আসত, আমরাও ওদের বাড়ি যেতাম। বোমা পড়বার পর মা-পোয়েরা মান্দালয়ের দিকে গেল, আমরা এলাম এই রাজদিয়াতে।'

বিনু এবার কিছু বলল না।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামল বলল, 'মা-পোয়ের মা আর বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন। ওঁদের খুব ইচ্ছে ছিল, বড় হলে মা-পোয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। আমার মা-বাবারও ইচ্ছে ছিল।'

একটা কথা মনে হতে বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'মা-পোয়েরা বার্মিজ না?'

'হ্যাঁ।'

'বার্মিজদের সঙ্গে বাঙালির বিয়ে হয়?'

'অনেক হয়েছে। বর্মায় গিয়ে দেখে এস না—'

এরপর আর কেউ কিছু বলল না। শ্যামল উদাস চোখে অনেক দূরে নদীর ওপারে ধু-ধু বনানীরেখার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

একদিন স্কুল ছুটির পর বিনুরা অলস পায়ে নদীর পারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল স্টিমারঘাটায় নতুন একটা স্টিমার এসে লেগেছে। গোয়ালন্দ থেকে রোজ সকালে যে শাদা ধবধবে স্টিমার যাত্রী নিয়ে আসে এটা সেটা নয়। এর রং ধূসর, আকারেও অনেক বড়।

বিনুরা দেখল, অনেক লোক স্টিমারঘাটার দিকে ছুটছে। দেখাদেখি ওরাও ছুটল এবং মুহূর্তে সেখানে পৌঁছেও গেল।

স্টিমারঘাটার জেটিটাকে ঘিরে মেলা বসে গেছে যেন। রাজদিয়ার যত দোকানদার-আড়তদার-মাছ ব্যাপারী, সবাই ছুটে এসেছে।

স্টিমার, এমনকি জেটির ওপরেও কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অগুণতি পুলিশ চারদিক ঘিরে রেখেছে। এগুতে চাইলেই লাঠি তুলে তাড়া করে আসছে।

ভিড়ের ফাঁক দিয়ে একসময় বিনুরা দেখে ফেলল, স্টিমার থেকে বিশাল ফৌজ নামছে।

চারদিকের ভিড়টা চাপা ভীতু সুরে বলাবলি করতে লাগল, 'সৈন্য আইছে। রাইজদিয়াতেও তাইলে যুজ্যু আইসা গেল!'

'হায় আল্লা, কী হইব!'

'হা ভগবান, কপালে কী লেখছিলা!'

কয়েকদিনের ভেতরেই দেখা গেল সেটেলমেন্ট অফিসের পেছন দিকে যে বিশাল ফাঁকা মাঠখানা পড়ে ছিল, তারকাঁটা দিয়ে সেটা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং তার মধ্যে মিলিটারির জন্য সারি সারি অসংখ্য তাঁবু উঠেছে।

শুধু তাই নয়, বরফকল এবং মাছের আড়তগুলোর ওধারে একেবারে নদীর ধার ঘেঁষে মাইলের পর মাইল নীচু জমি পড়ে ছিল। বর্ষায় জায়গাটা জলে ডুবে যায়, অন্য সময় কাদায় থক থক করে। তার ওপর জলসেঁচি আর বিশল্যকরণীর বন উদ্দাম হয়ে বাড়তে থাকে। কাদাখোঁচা আর পাতিবকের দল নরম মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে জলসেঁচির বনে সারাদিন কী যেন খুঁজে বেড়ায়।

মিলিটারির নজর পড়ল জায়গাটার ওপর। কোত্থেকে ঠিকাদাররা এসে গেল। চারধারের গ্রাম-গঞ্জ থেকে, নদীর ধু-ধু চর থেকে মোটা মজুরির লোভ দেখিয়ে হাজার দুই তিন লোক জুটিয়ে ফেলল তারা। কানের কাছে কাঁচা পয়সার ছনছনানি চলতে থাকলে কতক্ষণ কে আর ঘরে বসে থাকতে পারে।

মজুরদের প্রায় সকলেই ভূমিহীন কৃষাণ। অন্যের জমিতে ধান কেটে, হাল দিয়ে এবং আরো হাজারটা উঞ্ছবৃত্তিতে তাদের দিন কাটত। বছরের বেশির ভাগ সময়ই তাদের জীবনে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে।

ঠিকাদাররা প্রথমে তাদের মাটি ভরাটের কাজে লাগাল। নীচু জমিটাকে রাস্তার সমান উঁচু করতে হবে।

সারাদিন কাজ তো চলেই, রাত্তিরেও নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আলো জ্বালিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছে তো হচ্ছেই।

স্কুলে যাবার পথে সময় হয় না। তবে টিফিনে কি ছুটির পর শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে বিনু ওখানে চলে যায়। দু-তিন মাইল জায়গা জুড়ে হাজার কয়েক লোক ঝোড়া বোঝাই করে এনে মাটি ফেলছে। মজুরদের ব্যস্ততা, ঠিকাদারের লোকদের ধমক, খিস্তি খেঁউড়, চিৎকার, হৈ হৈ—সব মিলিয়ে বিরাট ব্যাপার।

বিনু বলে, 'ওখানে কী হবে বলতে পার ?'

শ্যামল বলে, 'কি জানি—'

ঠিকাদারের লোকেরা, যারা মজুর খাটায় জিজ্ঞেস করলে বলে, 'দেখ না, কী হয়।' বলেই ব্যস্তভাবে চলে যায়।

একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেই লোকগুলোকে দেখতে পেল বিনু—তাহের, বছির, বুড়ো খলিল। ওরা সবাই চরের মুসলমান। প্রতি বছর ধানকাটার সময় চুক্তিতে কাজ করতে আসে। এবারও অঘ্রাণ মাসে এসে তারা বিনুদের ধান কেটে গেছে।

বছরে মাসদুয়েকের মতন বছিররা রাজদিয়ায় এসে থাকে। আসে অঘ্রাণের মাঝামাঝি, মাঘ মাস পড়তে না পড়তে চলে যায়। কোনো কোনো বার অবশ্য দেরিও হয়, যেতে যেতে মাঘের শেষ কিংবা ফাল্গুনের শুরু।

ধানকাটার মরশুম বাদ দিলে বছরের অন্য সময় বছিরদের রাজদিয়ায় দেখা যায় না। এবারটা কিন্তু ব্যতিক্রম। এই তো সেদিন ধান কেটে গেল ওরা, এর মধ্যেই আবার মাটি ভরাটের কাজে ফিরে এসেছে।

বিনুকে এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে হল না। মাটি ফেলতে ফেলতে বছিররাই তাকে দেখে ফেলল। দেখামাত্র বছির আর তাহের লম্বা লম্বা পা ফেলে কাছে এল। খুশি গলায় বলল, 'বাবুগো পোলা না ?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

বিনুর হাতে বই খাতা-টাতা ছিল। বছির বলল, 'ইচ্‌কুল(স্কুল) থনে আইলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। একটু আগে ছুটি হল।'

'হ্যামকত্তায় ভাল আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'জামাইকত্তায় ?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ির আর সগলে?'

'সবাই ভাল। তোমরা?'

'খোদা যেমুন রাখছে।'

একটু নীরবতা। তারপর বিনু শুধলো, 'এখানে কদ্দিন কাজ করছ?'

বছির হিসেব করে বলল, 'দশ দিন।' একটু চুপ করে থেকে উজ্জ্বল উৎফুল্ল মুখে আবার বলল, 'বাহারের কাম ছুটোবাবু।'

বিনু উৎসুক সুরে জানতে চাইল, 'কিরকম?'

'রোজ নয় সিকা কইরা মজুরি। তা হইলে হিসাব কইরা দ্যাখেন দশ দিনে কত ট্যাকা পাইছি। বাপের জম্মে এত ট্যাকার মুখ আর দেখি নাই।' বলে তাহেরের দিকে তাকাল বছির, 'না কি কও তাহের ভাই?'

দেখা গেল তাহেরের এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। জোরে জোরে মাথা নেড়ে সে বলল, 'সত্য কথা।'

বছির বলতে লাগল, 'হেই ইনামগুঞ্জ, ঝিশিন্দার চর, চরবেউলা, গিরিগুঞ্জ, কেতুগুঞ্জ, ডাকাইতা পাড়া—যেইখানে যত কিষাণ আছে সগলে মাটি কাটার কামে আইছে। আইব না ক্যান? এত মজুরি এত ট্যাকা পাইব কই? শুনতে আছি—'

'কী?'

'সুজনগঞ্জেও নিহি মাটি কাটার কাম শুরু হইব।'

'কে বললে?'

'পরম্পর কানে আইল।'

'ওখানে মাটিকাটা কেন?'

'সৈন্যগো পেয়োজন (প্রয়োজন)।'

'ওখানেও সৈন্য যাবে!' বিনু অবাক।

বছির বলল, 'হেই তো শুনতে আছি।'

বিনু চুপ করে থাকল।

বছির উৎসাহের গলায় বলতে লাগল, 'এইরকম কাম যদি মিলে কিষাণরা আর চাষবাস করব না। জমিন ফালাইয়া সগলে যুজ্যের কামে দৌড়াইব।'

তাহের বলল, 'ভাগ্যে যুজ্যু বাধছিল! দুইখান পহা নাড়াচাড়া করতে পারি, পোলামাইয়ারে দুই বেলা প্যাটভরা ভাত দিতে পারি। হায় রে আল্লা, জম্ম ইস্তক কী দিনই না গেছে!'

বছির বলল, 'মাইনষে কয়, যুজ্যু নিহি মোন্দা, আমরা কই যুজ্যু ভাল। যুজ্যু কালানে (কল্যাণে) বউ-পোলার মুখে হাসি ফুটছে।'

আর কিছুক্ষণ হয়তো গল্প-টল্প করত বছিররা, তা আর হল না। ঠিকাদারের একটা লোক শকুনের চোখ নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে প্রায় তাড়া করে এল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লোকটা অশ্লীল খিস্তি দিল প্রথমে। তারপর বলল, 'সুমুন্দির পুত, গপ (গল্প) মারনের জায়গা পাও না! দুই ঝোড়া মাটি ফেলাইয়া নয় সিকা পহা গইনা লাইতে বড় সুখ! আইজ শালা তোগো মজুরি যদি না কাটি তো আমার নাম ফিরাইয়া রাখিস।'

বছির আর তাহেরের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বিষণ্ণ সুরে তারা বলল, 'যাই ছুটোবাবু অহন আর খাড়নের সময় নাই।'

বিনু বলল, 'একদিন এসো আমাদের বাড়ি।'

'যামু।'

দেখতে দেখতে নদীপারের নীচু জমি উঁচু হল। তার ওপব সারি সারি ব্যারাক উঠল মিলিটারিদের জন্য।

শুধু কি তাই, রাজদিয়ায় আগে বিজলি আলো ছিল না। মিলিটারির কল্যাণে, যুদ্ধের কল্যাণে রাতারাতি তা এসে গেল। অবশ্য বিজলি আলোটা সাধারণ মানুষের জন্য না, শুধু মিলিটারির জন্য। রাজদিয়ার একমাত্র বড় রাস্তাটাকে দ্বিগুণ চওড়া করে পিচ ঢেলে চেহাবা একেবারে বদলে দেওয়া হল। নতুন নতুন আরো অনেকগুলো কনক্রিটের রাস্তাও তৈরি হল। সব চাইতে মজার ব্যাপারটা যেটা হল তা এইরকম। এখানকার যত তালগাছ, তাদের মাথা কেটে আলকাতরা দিয়ে কালো রং করে দেওয়া হল, সেগুলোকে এখন অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্ট্ কামানের মতন দেখায়। অনেকগুলো নকল কামানকে নদীর ধারে ধারে আবার হেলিয়েও রাখা হয়েছে।

এখন সারাদিন সারারাত বাজদিয়া জুড়ে কাজ চলছে। অগুনতি ঠিকাদার হাজার হাজার মজুর শুধু খেটেই যাচ্ছে। রোড রোলার এবং নানারকম যন্ত্রের শব্দে জায়গাটা আজকাল সরগরম।

রাজদিয়ার গায়ে যেন ময়দানবেব ছোঁয়া লেগেছে। এতকাল জায়গাটা যেন ঘুমিয়ে ছিল। শতাব্দীর অতল নিদ্রা থেকে সে আচমকা জেগে উঠেছে।

ক'দিন আগেও এখানকার জীবন ছিল স্তিমিত, বেগবর্ণহীন, নিস্তরঙ্গ। তিরতিরে স্রোতের মতন যুগ-যুগান্তরের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে, চুপিসাবে অতি সঙ্গোপনে সেটা বয়ে যেত। রাজদিয়ায় সেই শান্ত অচঞ্চল জীবনযাত্রায় হঠাৎ যেন জলোচ্ছ্বাসের বেগ এসেছে।

আগে আগে সারাদিনে গোয়ালন্দের একখানা স্টিমার আসত। আজকাল যাত্রীবাহী স্টিমার তো আছেই। তা ছাড়া সপ্তাহে একবার কবে মিলিটারিদের সেই স্টিমারটা সৈন্যসামন্ত, লরি-ট্রাক-জিপ এবং অসংখ্য সরঞ্জাম নিয়ে আসছে। মিলিটারিদের স্টিমারটা এলে জেটি ঘাট থেকে নতুন ব্যারাকগুলো পর্যন্ত রাস্তাটা দিয়ে লোক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাছাকাছি কাউকে এগোতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। সাধারণ পুলিশ-টুলিশ না, কয়েক শ' মিলিটারি পুলিশ জায়গাটাকে ঘিরে ফেলে। তারপর কি সব জিনিসপত্র ঢাকাঢুকি দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ব্যারাকের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

আড়ালে রাজদিয়ার বাসিন্দাবা ফিসফিস করে, 'শালারা কী আনছে কও দেখি?'

'কেমন কই?'

'আমার মনে হয়, কামান আর গোলাগুলি।'

'হইতে পারে। ঢাইকা-ঢুইকা আনে ক্যান?'

'কি জানি। যুজ্যে বুঝি গুপন (গোপন) রাখা নিয়ম।'

বিনু লক্ষ করেছে, প্রথম দিন স্টিমারটা এসেছিল দুপুরবেলায। আজকাল বেশির ভাগ আসে রাতের দিকে। রাত্রিবেলা কখন আসে টের পাওয়া যায না। সমস্ত রাত ওখানে থেকে কী করে, কে বলবে। তবে সকাল হলেই রাজদিয়াবাসীরা দেখতে পায় স্টিমার জেটিঘাট ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আগে ফিটন আর কদাচিৎ দু-একখানা সাইকেল ছাড়া এখানে অন্য কোনোরকম গাড়িটাড়ি ছিল না। ইদানীং দিনরাত রাজদিয়ার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে মিলিটারি ট্রাক-জিপ ছুটতে থাকে। শোনা যাচ্ছে এখানে নাকি একটা এরোড্রোমও তৈরি হবে।

মিলিটারি ব্যারাক, রাস্তাঘাট, বিজলি আলো——এত কিছু হয়েছে রাজদিয়াতে, তবু যেন কাজের শেষ নেই। ব্যারাকের উল্টোদিকের ফাঁকা জায়গাগুলোতে কাঁচা বাঁশের চালা তুলে ঠিকাদার আর মজুরদেব থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আগে রাজদিয়াতে চায়ের দোকান একটাও ছিল না। দোকান দূরের কথা, চা খাওয়ার রেওয়াজই

ছিল না। রাজদিয়ার মোট সাতটি বাড়িতে চা ঢুকত। আজকাল মজুরদের অস্থায়ী আস্তানাগুলোর গায়ে কম করে কুড়িটা চায়ের দোকান বসেছে।

এক ছুটির দিনের সকালে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে হেমনাথরা আসর জমিয়েছেন। স্কুল-কলেজ বন্ধ। রান্নাবান্নার তাড়া ছিল না। সকাল থেকেই দিনটার গায়ে যেন আলস্য মাখানো। স্নেহলতারা পর্যন্ত রান্নাঘর ছেড়ে গল্প করতে বসেছেন।

কথা হচ্ছিল এই রাজদিয়া নিয়ে। খুব চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'কী জায়গা ছিল আর এখন কী দাঁড়িয়েছে!'

অবনীমোহন বললেন, 'আমরা এসেও যা দেখেছি তা আর নেই। রাতারাতি সব বদলে গেল।'

'তা বদলাক। রাস্তাঘাট হয়েছে। ইলেকট্রিক আলো এসেছে। এখন অবশ্য মিলিটারির জন্য, দু'দিন পর আমাদের ঘরেও আসবে। কিন্তু—'

'কী?'

'একটা বড় সাঙ্ঘাতিক খবর শুনলাম অবনীমোহন—'

'কী খবর মামাবাবু?'

'মিলিটারিরা মদটদ খেয়ে রামকেশবদের পাড়ায় খুব হামলা করছে। সেদিন নাকি অতুল নাহাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল।'

'আমিও শুনেছি।'

'সন্ধেবেলা মেয়েদের নিয়ে রাস্তায় বেরুনো এখন নিরাপদ না। পরশুদিন রাত্তিরে দুটো মাতাল টমি রুদ্রবাড়ির আরতিকে তাড়া করেছিল। ভাগ্য ভাল, সেইসময় মিলিটারি পুলিশের একটা জিপ এসে পড়ে। তাতে মেয়েটি বেঁচে যায়। বেশ শান্তিতে ছিলাম আমরা, কী উৎপাত শুরু হল বল দেখি—'

সুরমা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। শিউরে উঠে বললেন, 'সুধা-সুনীতির কলেজও তো ওদিকে। আমি ওদের আর পাঠাব না। কোনদিন কী বিপদ হয়ে যাবে—'

হেমনাথ কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাইরের উঠোন থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'হ্যামকত্তা—'

হেমনাথ সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কে রে?'

'আমি নিত্য—নিত্য দাস—'

'আয়—আয়—'

একটু পর নিত্য দাস পুবের ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল। সুজনগঞ্জের হাটে আগেই তাকে দেখেছে বিনু। গলায় তিনকণ্ঠি তুলসীর মালা, মুখে বসন্তর কালো কালো দাগ। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। দেখতে দেখতে এ চেহারা মুখস্থ হয়ে গেছে বিনুর।

নিত্য দাস দাওয়ার এক ধারে মাটির ওপরেই বসে পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'তোদের খবরটবর কী?'

নিত্য দাস বলল, 'আপনেগো আশীব্বাদে ভালুই।'

'বাড়ির সবাই কেমন আছে?'

'ভাল।'

একটু ভেবে হেমনাথ এবার বললেন, 'তারপর এত সকালে কী মনে করে রে?'

নিত্য দাস বলল, 'একখান কামে আইতে হইল। ভাবলাম, রাইজাদিয়া যহন আইলাম, হ্যামকত্তা আর বৌঠাইনের চরণ দশ্শন কইরা যাই।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই কাজের মানুষ, শুধু শুধু যে আসিস নি, বুঝতে পেরেছি। তা কাজটা কী?'

'এছ্-ডি-ও সায়েবের বাংলায় একবার যাইতে হইব।'

'কেন রে?'

'ক্রাচিন (কেরোসিন), চিনি আর কাপড় কনটোল হইয়া যাইতে আছে।'

হেমনাথ বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'কনট্রোল!'

'হ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল নিত্য দাস, 'তিনটা জিনিস বাইরে আর মিলব না। গরমেন্ট লাইছেন (লাইসেন্স) দিয়া কনটোলের দোকান খুলব। গরমেন্ট মাথাপিছু একটা হিসাব ঠিক কইরা দিব, তাব বেশি চিনি-টিনি পাওয়া যাইব না। এছ্-ডি-ও সায়েবেরে ত্যাল দিয়া দেখি একখান লাইছেন, পাই কিনা—'

'কনট্রোল যে হবে এ খবর তুই কোথায় পেলি?'

'কয়দিন আগে ঢাকায় গেছিলাম, হেইখানেই শুইনা আইছি।'

'কবে নাগাদ কনট্রোল হবে, কিছু জানিস?'

'দিন তারিখ জানি না, তবে শিগ্‌গিরই হইব।'

হেমনাথ এবার আর কিছু বললেন না। তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার রেখাগুলি গভীরভাবে ফুটে উঠতে লাগল।

নিত্য দাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চাপা গলায় বলল, 'এছ্-ডি-ও সায়েবের কাছে তো যাইতে আছি। শুনছি তেনার বড় খাই।'

চমকে হেমনাথ শুধোলেন, 'কিসের খাই?'

'ঘুষের। পরস্পর শুনলাম বিনা ঘুষে লাইছেন বাইর করা যাইব না। হেহ লেইগা—'

'কী?'

'পাচ শ' ট্যাকা আনছি। পাচ শ'তে হইব না হ্যামকত্তা?'

'কী করে বলি? আমি তো আর এস-ডি-ও সায়েবের অন্তর্যামী না।'

'আপনে কত কি দেখছেন, শুনছেন। কত কি জানেন। একটা আন্দাজ যদি দিতেন—'

সে কথার উত্তর না দিয়ে হেমনাথ বললেন, 'কি এমন লাভের কারবার যাতে পাঁচ শ' টাকা ঘুষ দিতে চাইছিস?'

রহস্যময় হেসে নিত্য দাস বলল, 'লাভ আছে হ্যামকত্তা, লাভ আছে। যদি না হইব এই সককালবেলা সুজনগঞ্জ থনে দৌড়াইয়া আসুম ক্যান? এছ্-ডি-ও'র বাংলোয় গিয়া দেখুম আমার আগে আরো কয়জন বইসা আছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমাগো এইদিকে অহনও কনটোল হয় নাই, কিন্তুক ইনামগঞ্জে বসুলপুরে হইয়া গেছে। কনটোলের দোকান দিয়া একেক জন লাল হয়ে গেল।'

'লাল কী করে হবে, বুঝতে পারছি না।'

'তার পথ আছে হ্যামকত্তা। আপনি তো আর ব্যবসায়ী না, হইলে বুঝতে পারতেন।'

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন।

নিত্য দাস আবার বলল, 'শুধা কাপড়-চিনি-ক্রাচিনের লাইছেন নিতেই আসি নাই, হ্যামকত্তা। আরো একখান কামেও আইছি—'

'কী?'

'উই যেইখানে মিলিটারিগো থাকনের বাড়ি-ঘর উঠছে, তার উল্টা দিকে মদের দোকান খোলনের লাইছেন দিব গরমেন্ট—'

হেমনাথ চমকে উঠলেন, 'রাজদিয়াতে মদের দোকান খোলা হবে!'

'হ।'

'তুই তার লাইসেন্স নিবি নাকি?'

'হেই রকমই ইচ্ছা—'

হেমনাথ এবার প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'না, কিছুতেই না।'

হেমনাথ ধীর স্থির, অচঞ্চল মানুষ। কোনো ব্যাপারে তাঁকে অসহিষ্ণু বা বিচলিত হতে দেখা যায় না। হঠাৎ তাঁকে এরকম চেঁচিয়ে উঠতে দেখে সবাই অবাক, কিছুটা বা চিন্তিত।

নিত্য দাস ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় বলল, 'আইজ্ঞা—'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তুই না ধর্মকর্ম করিস! নারায়ণ সেবা না করে জল খাস না! তোর এত অধঃপতন হয়েছে? মদের দোকান খুলে এখানকার মানুষের সর্বনাশ করতে চাইছিস?'

'কিন্তুক—'

'কী?'

'এয়া তো ব্যবসা, ধম্মের লগে এয়ার সম্পক্ক কী!'

'সম্পর্ক নেই?'

'থাকলেও আমি বুঝতে পারতে আছি না। হে ছাড়া—'

'আবার কী?'

'আমি যদি মদের দোকানের লাইছেন না লই আর কেউ নিয়া নিব—'

'যে খুশি নিক, তুই নিতে পারবি না, এই বলে দিলাম—'

নিত্য দাস উত্তর দিল না। শীতল চোখে হেমনাথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ নামাল। একটু পর চলে গেল সে।

নিত্য দাস যা বলেছিল, তা-ই। দেখতে দেখতে খোলাবাজার থেকে চিনি, কাপড় এবং কেরোসিন উধাও হয়ে গেল। সুজনগঞ্জের দোকানদারদের কাছে ধর্না দিলে জোরে জোরে দু'হাত নেড়ে তারা শুধু বলে, 'নাই, নাই—'

চিনি না হলে তবু চলে। কিন্তু কেরোসিন আর কাপড় ছাড়া সংসার অচল। রাজদিয়া, কেতুগঞ্জ, ইসলামপুর, ডাকাইতাপাড়া—সারা তল্লাটের লোক কাপড়-কেরোসিনের জন্য দিগ্বিদিকে ছোটোছুটি করতে লাগল।

এই ডামাডোলের ভেতর একদিন দেখা গেল, রাজদিয়াতে কাপড়-কেরোসিন-চিনির জন্য তিনটে কনট্রোলের দোকান বসেছে। একটা কেতুগঞ্জের রায়েবালি শিকদারের, একটা ইসলামপুরের অখিল সাহার, আর তৃতীয়টি নিত্য দাসের।

একজন যাতে বার বার কেরোসিন না নিতে পারে সেজন্য পরিবার পিছু রেশন কার্ডও হল। রেশন কার্ড দেখালে তবেই ঐ দুর্লভ বস্তুগুলো পাওয়া যায়।

আরো কিছুদিন পর রাজদিয়াবাসীরা দেখল, মিলিটারি ব্যারাকের উল্টোদিকে একটা মদের দোকান খোলা হয়েছে। দোকানটার মালিক আর কেউ না, স্বয়ং নিত্য দাস।

নিত্য দাস মদের দোকান খুলেছে, এই খবরটা এল দুপুরবেলা। শুনে তক্ষুনি হেমনাথ ছুটলেন। স্নেহলতা বারণ করলেন, 'এখন বেরুতে হবে না।'

অবাক বিস্ময়ে হেমনাথ বললেন, 'বেরুব না, বল কী!'

'বেরিয়ে কী হবে? তার চাইতে দু দণ্ড বিশ্রাম কর।'

'তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হল স্নেহ! মদের দোকান দিয়ে হারামজাদা সারা রাজদিয়াকে জাহান্নামে পাঠাবে, আর ঘরে বসে আমি বিশ্রাম করব!'

ভয়ে ভয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ওখানে গিয়ে তুমি কী করবে?'

শান্ত অথচ কঠিন গলায় হেমনাথ বললেন, 'যাতে এখানকার সর্বনাশ না করতে পারে গোড়াতেই তার ব্যবস্থা করব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'এটা ওর ব্যবসা—'

'যে ব্যবসা মানুষের ক্ষতি করে তা চালাতে দেওয়া উচিত না। এ ব্যাপারে আমার কর্তব্য আছে।'

হেমনাথকে আটকানো গেল না, দুপুরের সূর্য মাথায় নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর হেমনাথ ফিরে এলেন। এখন আর তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সমস্ত রক্ত বুঝি মুখে গিয়ে জমা হয়েছে। চোখ দুটো যেন ফেটেই যাবে।

উদ্বিগ্ন মুখে স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী হয়েছে?'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

স্নেহলতা কাছে এগিয়ে এসে আগের স্বরেই আবার জিগগেস করলেন, 'কী হয়েছে, বলছ না কেন?'

হেমনাথ এবার বললেন, 'নিত্য আমাকে অপমান করেছে।' অসহ্য আবেগে তাঁর ঠোঁট এবং কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

'অপমান!'

'তা ছাড়া কী?' হেমনাথকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাল, 'আমি নিত্যকে বললাম দোকান বন্ধ করে দে, কিছুতেই সে শুনল না।'

বিনু-ঝিনুক-অবনীমোহন-সুরমা, হেমনাথকে ফিরতে দেখে সবাই ছুটে এসেছিল। কেউ কিছু বলল না। স্নেহলতাও এবার চুপ করে থাকলেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'সারা জীবন মানুষের হিত ছাড়া অহিত চিন্তা করি নি। যাকে যা বলতাম সে তা-ই শুনত, সেইমতন চলত। কিন্তু এই শেষ বয়সে নিত্য দাস আমার কথাটা রাখল না, আমাকে অমান্য করল।' দুঃখে অভিমানে তাঁর গলা বুজে এল।

আবছা গলায় স্নেহলতা বললেন, 'তখনই তো তোমাকে বললাম, যেও না—'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ ঘরের ভেতর চলে গেলেন। তারপর দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে আচ্ছন্নের মতন বসে থাকলেন।

বিনু দাঁড়িয়ে ছিল। আস্তে আস্তে একসময় এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে হেমনাথ যেন একবারে ভেঙেচুরে গেছেন। তাঁকে ক্লান্ত, পরাভূত, মলিন দেখাচ্ছে।

দাদুর অবস্থা খানিকটা অনুমান করতে পারছিল বিনু। রাজদিয়াকে ঘিরে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে যত গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ, সব কিছুর ওপর ঈশ্বরের মতন ব্যাপ্ত হয়ে আছেন হেমনাথ। তিনি আঙুল তুলে সামান্য একটু ইঙ্গিত করলে চারদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে। সবাই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

যে মানুষ এতকাল শুধু সম্মানই কুড়িয়েছেন, যাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল সম্রাটের মতন, জলবাংলার এই জায়গাটুকু জুড়ে সহস্র হৃদয়ে যাঁর সিংহাসন পাতা, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সেই হেমনাথ আজ

প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। নিত্য দাস অবাধ্য হবে, হেমনাথের পক্ষে তা ছিল অকল্পনীয়। এই একটি আঘাত তাঁকে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে।

অবনীমোহনরা এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। স্নেহলতা হঠাৎ ফিসফিস গলায় বললেন, 'কী লক্ষ্মীছাড়া যুদ্ধ যে বাধল! মানুষকে একেবারে বদলে দিচ্ছে। ঐ নিত্য দাস আগে আগে এ বাড়িতে পড়ে থাকত। একটা পয়সা ছিল না তার। তোমার মামাবাবু টাকা দিয়ে ব্যবসায় বসিয়ে দিলে। সেই থেকে তার উন্নতি। এখন তার আড়তে সবসময় দু-তিন হাজার মণ ধান মজুত থাকে, যখন তখন দশ-বিশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে। যার জন্যে এত, তার কথাটাই বাখল না নিত্য দাস।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে থাকলেন।

দিনকয়েক পর সন্ধের সময় যথারীতি খবর-কাগজ পড়ার আসর বসেছে। ইচু মণ্ডল, হাচাই পালরা অন্ধকার নামতে না নামতেই এসে হাজিরা দিয়েছে।

অবনীমোহন পড়ছিলেন, 'রেঙ্গুনের পতন। মাত্র কয়েকদিন আগে সিঙ্গাপুর অধিকার করিবার পর জাপবাহিনী আজ রেঙ্গুন দখল করিয়াছে। মিত্র সৈন্যরা সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিতেছে।'

'জাপানী আক্রমণের আতঙ্কে কলিকাতা সন্ত্রস্ত। মহানগরী ত্যাগ করিয়া বহু লোকের নানা দিকে পলায়ন—'

হঠাৎ পড়া থামিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'কলকাতায় ইভাক্যুয়েশন শুরু হয়ে গেল মামাবাবু—'

এর ভেতর সেদিনের সেই আঘাতটা অনেকখানি সামলে নিয়েছেন হেমনাথ। বললেন, 'তাই তো দেখছি। আমার মনে হয়, রাজদিয়ার লোক যারা কলকাতায় থাকে, তারাও চলে আসবে।'

হেমনাথ যা অনুমান করেছেন তা-ই। দু-একদিনের ভেতর দেখা গেল স্টিমার বোঝাই হয়ে রাজদিয়ার প্রবাসী সন্তানেরা জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে চলে আসছে। দেখতে দেখতে নাহাপাড়া, গুহপাড়া, দত্তপাড়া, আদালতপাড়া, কলেজপাড়ার ফাঁকা বাড়িগুলো ভরে গেল।

কলকাতা থেকে যারা এসেছে তাদের মুখে চমকপ্রদ সব খবর পাওয়া যাচ্ছে। জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতন কলকাতার লোকেরা নাকি যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। রেলওয়ে বুকিং অফিসগুলোতে দু'মাইল লম্বা 'কিউ' পড়েছে কিন্তু টিকিট মিলছে না। ন্যায্য দামের সঙ্গে দ্বিগুণ তিনগুণ ঘুষ দিয়েও না। হাওড়া আর শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকবার উপায় নেই। একেক ট্রেনে দশটা ট্রেনের যাত্রী উঠছে। বেঞ্চির তলায় পা রাখবার জায়গা নেই। সেখানেও মানুষ। ল্যাট্রিন, পা-দানি, এমনকি ছাদের ওপর উঠেও মানুষ পালাচ্ছে। ছাদে যারা ওঠে তাদের মধ্যে কত লোক যে ওভারব্রিজে ধাক্কা খেয়ে মরছে, হিসেব নেই।

মাড়োয়ারি, হিন্দুস্থানি, গুজরাটিরা জলের দরে বাড়ি বেচে দিচ্ছে। রেলের আশায় তারা কলকাতায় বসে থাকছে না। স্রেফ পা দু-খানার ওপর ভরসা করে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পাড়ি জমাচ্ছে। বাঙালিরা বেশির ভাগ যাচ্ছে গ্রামের দিকে। যাদের অনেক পয়সা তারা মধুপুর, গিরিডি, যশিডিতে গিয়ে টপাটপ বাড়ি কিনছে। প্রাণের মায়া বড় কঠিন মায়া।

ত্রৈলোক্য সেনরা আসার পর বর্মার খবর শুনবার জন্য রাজদিয়াবাসীরা তাঁর কাছে ছুটত। বর্মা সম্বন্ধে উৎসাহ মলিন হয়ে গেছে। এখন কলকাতার খবর শুনতে এখানকার লোকজন নাহাপাড়া,

আদালতপাড়া, দত্তপাড়ায় ছুটছে।

সব শুনে অবনীমোহন সুরমাকে বললেন, 'এখানে জমিজমা কিনে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলাম, না কি বল?'

সুরমা বললেন, 'ভাগ্যিস কিনেছিলে! নইলে এ সময়ে কোথায় যে যেতাম!'

ঝিনুকও কলকাতা থেকে লোক পালানোর খবর শুনেছিল। এ সব কথা যখন হত, অসীম আগ্রহে সে গিলতে থাকত।

একদিন সবার আড়ালে ঝিনুক বলল 'আচ্ছা বিনুদা—'

বিনু বলল, 'কী?'

'কলকাতা থেকে লোক তো পালাচ্ছে—'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ঝুমারাও আসবে?'

ঝুমাদের কথা অনেকদিন ভাবে নি বিনু। ঝিনুকের কথায় হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল। তাই তো, কলকাতা থেকে সবাই চলে আসছে। ঝুমারা তো এখনও এল না!

কলকাতা থেকে লোক পালাবার হিড়িক শুরু হয়েছে। ফলে শুধু রাজদিয়াই নয়, আশেপাশে গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ দ্রুত ভরে উঠছে। চারধারের গ্রামগুলোই কি শুধু? সারা জলবাংলাই হয়তো মানুষে মানুষে ছেয়ে যাচ্ছে।

এতদিন রাজদিয়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর আনছিল হেমনাথ। ইদানীং কিছুদিন ধরে চারপাশের গ্রামগুলোতে যাচ্ছেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে যান। ফিরতে ফিরতে বিকেল কিংবা সন্ধে। ফিরে কোনোদিন বলেন, 'আজ কেতুগঞ্জে গিয়েছিলাম। শুধু কলকাতারই লোক।' কোনোদিন বলেন 'আজ গিয়েছিলাম বাজিতপুরে, সেখানে এক অবস্থা।' কোনোদিন বলেন, 'ভাগ্যিস যুদ্ধটা বেধে ছিল আর জাপানি ব্যাটারা বার্মায় বোমা ফেলেছিল। তাই না ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এসেছে। যারা কখনও এখানে আসত না, এখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতাবাসী হয়েছিল, যুদ্ধের কল্যাণে দেশের বাড়ির জন্যে তাদেরই প্রাণ কেঁদে উঠেছে।'

জিনিসপত্রের দাম আগে থেকেই বাড়ছিল, কলকাতায় ইভাক্যুয়েশন শুরু হবার পর হু হু করে আরো চড়ছে। এখন সব জিনিসেরই সকালে এক দর, দুপুরে এক দর, সন্ধেয় আরেক দর। দরটা এখন কিভাবে কতগুণ চড়বে, আগে তার হদিসই পাওয়া যায় না। বাজার এখন বড় অস্থির।

তবু যত দামই বাড়ুক, কলকাতার তুলনায় তো অনেক কম।

আজকাল হাটে গেলে মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়। কলকাতার বাবুরা হঠাৎ এই সস্তাগন্ডার দেশে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। যে জিনিস দেখেন তাই কিনে ফেলেন, দরদস্তুর কিছুই করেন না, যা দাম চাওয়া যায় ঝনাৎ করে ফেলে দেন। আর কথায় কথায় বলেন, 'ড্যাম চিপ—'

সেদিন অবনীমোহন আর হেমনাথের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল বিনু। সেখানে চমকপ্রদ একটা ব্যাপার ঘটল।

একজন মুসলমান ব্যাপারী ক'টা গাছপাকা পেঁপে নিয়ে বসে ছিল। সব চাইতে বড় ফল দুটো বেছে

অবনীমোহন বললেন, 'দাম কত ?'

ব্যাপারী বলল, 'একখান আধলি লাগব বাবু।'

জলবাংলায় আসার পর প্রথম প্রথম দরদাম করতেন না অবনীমোহন। আজকাল এখানকার হালচাল বুঝে গেছেন। যে জিনিসের দাম চার পয়সা ব্যাপারীরা হাঁকে দু আনা। কজেই দর-টর না করলে কি চলে!

অবনীমোহন বললেন, 'বল কি, ঐ দুটো পেঁপের দাম আট আনা!'

'হ বাবু। সিকি আধলাও কমাইতে পারুম না।'

'ন্যায্য দাম বল, নিয়ে যাই।'

'চাউলের মণ বাইশ ট্যাকা, বাগুনের স্যার ছয় পহা, ঝিঙ্গার তিন পহা। দুইটা বড় পাউপার (পেঁপে) দাম আট আনা চাইয়া অলেহ্য (অন্যায) কাম করি নাই।'

'শোন ব্যাপারী, তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক, ছ আনা দিচ্ছি। দিয়ে দাও।'

ব্যাপারী এবার উত্তর দিল না, মুখ ঘুরিয়ে পাশের মরিচ-ব্যাপারীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

অবনীমোহন বললেন, 'কি হল, আমার কথাটা শুনতে পেলে না?'

মুখ না ফিরিয়ে ব্যাপারী বলল, 'শুনছি।'

'আমি যা বললাম সেই দামে দেবে কি দেবে না, কিছু বললে না তো?'

একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারী বলল, 'আপনের কাম না বাবু—'

অবনীমোহন অবাক, 'কী আমার কাজ নয়?'

'আমার পাউপা কিনন (কেনা)। আপনের কাছে তো আষ্ট গন্ডা পয়সা চাইছি। ড্যাঞ্চি বাবুরা (ড্যাম চিপ বাবুরা) আইলে এক ট্যাকা দিয়া লইয়া যাইব।'

সত্যিই তাই। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে এক কলকাতার বাবু এসে ছোঁ মেরে পেঁপে দুটো কিনে নিল; দাম বাবদ একটি টাকা আদায় করে গেঁজেতে পুরতে পুরতে সগর্বে হাসল ব্যাপারী, 'দেখলেন তো।'

এ নিয়ে তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটি বাধানো যেত। অবনীমোহন কিছুই করলেন না। মুখ লাল করে মাছহাটার দিকে চলে এলেন।

সুজনগঞ্জে এসেই হেমনাথ ধানের আড়তগুলোর দিকে চলে গিয়েছিলেন। অবনীমোহন আর বিনু গিয়েছিল বাড়ির জন্য সওদা করতে।

মাছের বাজারে এসে প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা হল।

এক চেনাশোনা মাছ-ব্যাপারী, নাম তার গয়জদ্দি নিকারী, এক কোণে দোকান সাজিয়ে বসেছিল। সুজনগঞ্জে প্রথম যেদিন এসেছিলেন, সেদিন থেকেই গয়জদ্দির কাছে মাছ কিনছেন অবনীমোহন। গয়জদ্দি তাঁর বাঁধা ব্যাপারী।

গয়জদ্দি আজ ভাল ভাল লোভনীয় মাছ এনেছে। তার সামনে দুটো বড় বড় বেতের চ্যাঙাড়ি। চ্যাঙাড়ির ঢাকনার ওপর পেট-লাল পরমা, কালবোস, কাজলি এবং কুলীন জাতের চকচকে পাবদা মাছ সাজানো।

এই জলের দেশে যেখানে অঢেল মাছ, সেখানেও এরকম পাবদা দুর্লভ। মাছগুলোর লালচে রুপোলি শরীর এত চকচকে যে মনে হয় পালিশ করা।

অবনীমোহন বললেন, 'ক' কুড়ি পাবদা আছে গয়জদ্দি ?'

গয়জদ্দি বলল, 'তিন কুড়ি।'

'দাম কত নেবে ?'

'পাবদাগুলান আপনের লিমু না জামাইকত্তা—'

'কেন?'

গয়জদ্দি বলল, 'ঐগুলানের অন্য গাহেক (খদ্দের) আছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে কৌতুকের গলায় অবনীমোহন বললেন, 'ড্যাঞ্চিবাবুরা নাকি?'

গয়জদ্দি একগাল হাসল, 'হ। ড্যাঞ্চিবাবুর এক্কেবারেই মূলায় (দরদাম করে) না। যা কই তাই দিয়া যায়। এই সুযুগে দুইখান পহা কইরা লই।'

অবনীমোহন বললেন, 'পাবদা না দাও, কালবোসটা দাও।'

'কালিভাউসটাও ড্যাঞ্চিবাবুগো লেইগা রাখছি।'

অগত্যা ভুলা বোঝাই করে কাজলি মাছই কিনলেন অবনীমোহন।

এখন সুজনগঞ্জের হাটে 'ড্যাঞ্চি' বাবুদেরই জয়জয়কার।

বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তাদের ছেলেমেয়েরা রাজদিয়ার স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে লাগল।

বিনুর ক্লাসেও দশ-বারোটা ছেলে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে সব চাইতে চমকদার হল গোঁসাই বাড়ির অশোক। প্রথম দিন স্কুলে এসেই সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। বিনু আর শ্যামল তো রীতিমত তার ভক্তই হয়ে দাঁড়িয়েছে। হবার মতন যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

অশোক স্কুলে আসে সাইকেলে করে। ঝকঝকে নতুন সাইকেল তার। স্কুলের সামনের মাঠটায় বোঁ করে একটা পাক দিয়ে সাইকেলটা যখন সে থামায় সেই বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে অন্য ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এত সুন্দর সাইকেল সারা রাজদিয়াতে আর কারো নেই।

সাইকেলের নানারকম খেলাও জানে অশোক। একটু আগে আগে স্কুলে এসে সে-সব দেখায়ও সে। হ্যান্ডেল না ধরে অশোক সাইকেল চালাতে পারে। চলন্ত অবস্থায় সিটে বসে জামাকাপড় পরতে পারে।

বিনু আর শ্যামলের চাইতে অশোক বেশ বড়, অন্তত দু-তিন বছরের তো বটেই। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে সে, লম্বা জুলপি রাখে। ঘাড়ের ওপর জামার কলারটা সবসময় খাড়া হয়ে থাকে। বুকের কাছে একটা মোটে বোতাম আটকানো, বাকি দুটো খোলা। ফলে ভেতরের গেঞ্জি দেখা যায়। ছোকরার ঠোঁটের ওপর সরু সৌখিন গোঁফ। যখন কায়দা করে হাঁটে, পায়ের চটি দু ফুট আগে আগে চলে। কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চমৎকার শিস দিতে পারে সে।

একেক দিন একেক রকম করে চুল আঁচড়ে আসে অশোক। একদিন হয়ত ব্যাকব্রাশ করে এল, একদিন এল অ্যালবার্ট কেটে কিংবা চুলে ঢেউ খেলিয়ে।

কোনোদিন এসে অশোক বলে, 'কার মতন চুল আঁচড়েছি বল তো?'

সারা ক্লাস চারদিক থেকে সাগ্রহে, সমস্বরে শুধোয়, 'কার মতন?'

'রবীন বিশ্বাসের।'

বিনু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রবীন বিশ্বাস কে ভাই?'

রবীন বিশ্বাসের কথা জানে না, এমন ছেলে হয়তো এই প্রথম দেখল অশোক। অবাক বিস্ময়ে সে বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'রবীন বিশ্বাসকে চেনো না।'

রবীন বিশ্বাসকে না চেনার লজ্জায় মাথা আপনা থেকেই নুয়ে পড়ে বিনুর।

অশোক আবার বলে, 'স্টাইল যদি শিখতে হয় রবীন বিশ্বাসের সিনেমা দেখতেই হবে।'

বিনু এতক্ষণে বুঝতে পারে, 'রবীন বিশ্বাস একজন ফিল্মস্টার।'

কোনোদিন এসে অশোক বলে, 'আজ ছবি মজুমদারের স্টাইলে চুল আঁচড়েছি।'

কোনোদিন বলে, 'আজ জহর ব্যানার্জির মতন আঁচড়েছি।'

জামাও অশোক একরকম পরে না। বেশির ভাগ দিনই কলারওলা অথবা হাতাহীন পাঞ্জাবি পরে আসে। বলে, 'কি একটা বইয়ে মনে পড়ছে না, অমলেশ বড়ুয়া এই রকম জামা পরেছিল।'

ছোটদি আর বড়দির মুখে অমলেশ বড়ুয়ার নাম শনেছে বিনু। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

কিন্তু এসব অতি সামান্য ব্যাপার। ছেলেদের নিশ্বাস বন্ধ করে দেবার মতন আরো অনেক কিছু জানে অশোক। হেন সিনেমা নেই যা সে দেখেনি। শুধু সিনেমা দেখাই নাকি, ছায়ালোকের তাবত কিন্নর-কিন্নরীকেও সে চেনে। অশোক বলে, স্টার—চিত্রতারকা। কলকাতায় থাকতে সে নাকি তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সে লীলারানীকে দেখেছে, কনকবালাকে দেখেছে, ছবি মজুমদারকে দেখেছে। জহর ব্যানার্জি, অমলেশ বড়ুয়া, মহীন্দ্র গাঙ্গুলি, কাকে না চেনে সে? কাকে না দেখেছে?

ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে সারাক্ষণ সিনেমার নানা গল্প করে যায় অশোক। ফাঁকে ফাঁকে গান। কত গানই না সে জানে।

'এসো যৌবন,
এসো যৌবনমত্তা ওগো
মধুমাস এলো কি—
সাগরের কল্লোল শুনি তব বক্ষে
বিজলির ঝিলিমিলি আনিয়াছে চক্ষে।'

কিংবা

'তাহারে যে জড়াতে চায় দু'টি বাহুলতা—
কে শুনেছ মোর কামনার নীরব ব্যাকুলতা।'

কিংবা

'আমার ভুবনে এল বসন্ত তোমারই তরে
আঁখি দুটি তব রাখ, রাখ মোর আঁখির পরে।'

ছায়ালোকের অজস্র জ্ঞানে বোঝাই হয়ে যে এসেছে তার ভক্ত না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের।

ক্লাসের সব ছেলেই অশোকের ভক্ত, তবু তাদের মধ্যে বিনু আর শ্যামলের তুলনা হয় না। অশোকের দিকে সর্বক্ষণ তারা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। অশোক যা বলে অভিভূতের মতন শুনে যায়। একই কথা বার বার শুনেও ক্লান্তি নেই। অশোককে একবার পেলে তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। গুড়ের গায়ে মাছির মতন বিনু আর শ্যামল তার গায়ে লেগেই আছে।

এমন ভক্ত পেলে কে না খুশি হয়! অশোকও সবার ভেতর থেকে বিনুদের বেছে বার করেছে। তাদের সঙ্গেই সে বেশি মেশে, বেশি গল্প করে, বেশি ঘোরে। মোট কথা তাদের ওপরেই অশোকের বেশি অনুগ্রহ।

আগে জামা-কাপড় পোশাক-টোশাকের দিকে নজর থাকত না বিনুর। ছেঁড়া হোক, ময়লা হোক—একটা কিছু পরতে পেলেই হত। জুতো পায়ে দেবার বিশেষ বালাই ছিল না। এসব ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন ছিল সে।

অশোক আসার পর সাজটাজের দিকে মন গেছে বিনুর। আজকাল আর ময়লা জামা প্যান্ট পরতে

চায় না। পোশাকটি ধবধবে হওয়া চাই, তাতে কড়া ইস্তিরি থাকা চাই। জুতোটা চকচকে ঝকমকে না হলে আজকাল আর চলে না।

প্রায় কান্নাকাটি করেই একটা ধুতি কিনেছে বিনু, কলারওলা হাতাহীন পাঞ্জাবি বানিয়েছে। অশোকের মতন কায়দা করে ফেরতা দিয়ে আজকাল ধুতি পরে সে। বাড়িতে অবশ্য পরে না, রাস্তায় বেরুলেই জামার কলার উল্টে দেয়। চটিটা সামনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাঁটে।

এ তো গেল পোশাকের কথা। তা ছাড়া অশোককে আরো নানা দিক থেকে নকল করছে বিনু। তার মতন স্টাইল করে চুল আঁচড়ায়, সরু করে শিস দেওয়া প্র্যাকটিশ করে। আর গান তো আছেই। দিনরাত গুন গুন করেই যাচ্ছে সে:

'শত জনমের কামনা বাহিয়া।
রূপ ধরে আজ এসেছে কি প্রিয়া?
যত ভালবাসা তত যদি আশা—'

বিনুর হঠাৎ পরিবর্তনটা সুধা-সুনীতির চোখেও পড়েছে। এত দ্রুত বদলে গেলে না পড়ে উপায় কী। সুনীতি গালে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'ও বাবা, দিন দিন ছেলে কোন স্টাইল শিখছে দেখ না!'

সুধা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'ছোঁড়া একেবারে ঝুনো হয়ে উঠছে। ঐ রুদ্রবাড়ির অশোকটা আসার পরই পাকামো শুরু হয়েছে। হ্যাঁ রে বিনু, লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি টিড়ি খাচ্ছিস নাকি?'

সুধার কথা শেষ হবার আগেই লঙ্কাকান্ড বেধে যায়। বিনু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঝিনুক অবশ্য অন্য কথা বলে, 'তুমি অমন গুন গুন করে কেন বিনুদা? গলা ছেড়ে গাইতে পার না? কি সুন্দর গলা তোমার।'

যত জ্ঞানের জাহাজ হয়েই আসুক, তার তো শেষ আছে। একদিন সিনেমার গান আর গল্পের ঝুলি ফুরিয়ে গেল অশোকের। ফুরোবার পর আবার নতুন করে সেগুলো শোনাল সে। তারপর আবার, এবং আরো অনেক বার।

শুনতে শুনতে সব গান মুখস্থ হয়ে গেছে বিনুর। যত রোমাঞ্চকর আর যত চমকপ্রদই হোক না, একই গল্প কতবার আর শুনতে ভাল লাগে! আজকাল যখন অশোক চিত্রতারকার গল্প নিয়ে বসে, বিনু বা শ্যামল ততটা আগ্রহ নিয়ে শোনে না।

ভক্তদের বিস্ময় আর মুগ্ধতা যে কমে আসছে তা লক্ষ করে একদিন অশোক বলল, 'চল, মিলিটারিদের ব্যারাক থেকে ঘুরে আসি।'

মিলিটারির কথায় ভয় পেয়ে গেল বিনু। বলল, 'না না, ওখানে গিয়ে দরকার নেই।' নদীর পারে ব্যারাকগুলো যখন তৈরি হচ্ছিল তখন খুব যেত বিনু। নিগ্রো আর আমেরিকান টমিরা ওখানে আসার পর আর যায় না।

অশোক বলল, 'যাবে না কেন?'

'ওরা যদি ধরে রেখে দেয়?'

'ভীতু কোথাকার! আমরা কলকাতায় কত মিলিটারির সঙ্গে মিশেছি, কই আমাদের তো ধরত না।'

বিনু বলল, 'কলকাতায় এখন বুঝি খুব মিলিটারি!'

অশোক মাথা নাড়ল, 'মিলিটারি ছাড়া কলকাতায় এখন আর কিছু নেই। রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি ট্রাক আর জিপ। লালমুখো আমেরিকান টমি আর নিগ্রো সোলজার। লেকের দিকে কখনও গেছ?'

'অনেক বার।'

'সেখানে এখন মিলিটারিদের ছাউনি পড়েছে। ওদিকে যেতে কেউ সাহস পায় না। কিন্তু বন্ধুদের নিয়ে আমি ঠিক যেতাম—' বলে সগর্বে তাকাল অশোক।

বিনু আর শ্যামল অবাক হয়ে গেল।

অশোক আবার বলল, 'শুধু যেতামই না, ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে চকোলেট, টফি, ড্রাই ফুড, টিনের মাছ—কত কী আদায় করতাম।'

বিনুরা সবিস্ময়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তাই নাকি!'

অশোক বলল, 'হুঁ হুঁ—' তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তে তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, 'ধরে রাখার কথা বললে না তখন—'

'হ্যাঁ।'

'ধরে তোমাকে ঠিকই রাখবে। যদি—'

'যদি কী?'

'তুমি মেয়ে হতে।'

'মেয়ে হলে ধরে রাখবে কেন?'

ঠোঁট টিপে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ বিনুকে দেখল অশোক। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে কী বলল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ লাল হয়ে উঠল বিনুর, কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

হাসতে হাসতে অশোক বলল, 'তুমি একটা ভোঁদা, তোমাকে মানুষ করতে অনেক সময় লাগবে।' বলে একরকম টানতে টানতে মিলিটারি ব্যারাকের দিকে নিয়ে গেল।

ব্যারাকের সীমানা তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা। কয়েক মাইল জুড়ে এই সীমানা। অবশ্য মাঝে মাঝে কাঠের গেট রয়েছে। সেখানে মিলিটারি পুলিশ রাইফেল কাঁধে পাহারা দিচ্ছে।

বিনুরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুল, প্রথম গেটটা থেকে কিছু দূরে তারকাঁটার ওপর একটা করে পা রেখে পাঁচ-ছ'টা লালমুখো টমি দাঁড়িয়ে আছে। সীমানার বাইরে একদল আধ-ন্যাংটো কালো ক্ষুধার্ত মানুষ জড়ো হয়ে রয়েছে, তাদের লুব্ধ করুণ চোখ টমিগুলোর দিকে। মনে হয়, ওরা প্রায়ই এখানে আসে। টমিগুলোর সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে।

অশোক বিনুদের নিয়ে বাইরে জনতার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'এখানে দেখছি অনেক খদ্দের। এই কালো কালো জানোয়ারগুলো এসে জুটেছে। কলকাতায় আমরা দু-চারজন মোটে যেতাম।' বলেই টমিদের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যালো জো—'

টমিরা ভুরু বাঁকিয়ে তাকাল, কিছু বলল না।

অশোক আবার বলল, 'ইউ আর ভেরি কাইন্ড। প্লিজ গিভ আস চকোলেট, টফি। হ্যালো জো—'

টমিরা নিজেদের ভেতর কি বলাবলি করল। তারপর পকেট থেকে মুঠো মুঠো চকোলেট অর টফি বার করে ছুঁড়তে লাগল। নিমেষে বাইরে জনতার ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি মারামারি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। অশোকও তার মধ্যে ঝাঁকিয়ে পড়ল। বিনু আর শ্যামল অবশ্য দাঁড়িয়ে রইল।

একটা টমি উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে চেঁচাতে লাগল, 'গো অন ফাইটিং, ইউ ডগস, স্ন্যাচ স্ন্যাচ—বাইট দ্যাট সোয়াইন—পুশ দ্যাট বাস্টার্ড—'

আরেকটা টমি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ব্লাডি ইন্ডিয়ানস্—বেগারস, সন্স অফ বিচেস—'

বাকি টমিগুলো কিছুই বলল না, ক্যামেরা বার করে টকাটক ছবি তুলতে লাগল।

কাড়াকাড়ি করে অনেকগুলো চকোলেট কুড়িয়েছে অশোক। সেগুলো নিয়ে বিনুদের কাছে এসে বলল, 'আচ্ছা, ছেলে তো তোমরা, চুপচাপ হাঁদার মতন দাঁড়িয়ে রইলে! তোমরা কুড়োলে আরো কত চকোলেট পাওয়া যেত।'

বিনু হঠাৎ বলে ফেলল, 'টমিরা কী বলছিল জানো?'

'কী ?'

'ব্লাডি বেগারস, ডগস, সোয়াইনস—এমনি আরো কত কি। এসব শুনবার পরও ওদের জিনিস কুড়োতে যাব !'

অশোক গ্রাহ্য করল না। গা থেকে গালাগালগুলো ঝেড়ে ফেলে বলল, 'বলুক গে। গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ছে না। ওদের চকোলেট খেয়ে দেখ, জীবনে এমন জিনিস আর কখনও খাও নি। খাস আমেরিকায় তৈরি। শুধু টমিদের জন্যে জাহাজে করে আসে।' বলে একটা বড় চকোলেট এগিয়ে দিল।

বিনু কিন্তু নিল না।

মিলিটারি ব্যারাকে সেই একদিনই গেল না বিনুরা। অশোক প্রায় রোজই তাদের ধরে নিয়ে যেতে লাগল।

টমিরা তারকাঁটার বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে রোজ শুধু চকোলেট ছোঁড়ে না, এক-আধদিন বিস্কুটের টিন, ড্রাই ফুডের টিন ছোঁড়ে। মাঝে মাঝে মুঠো মুঠো রেজগিও ছুঁড়ে দেয়। পয়সা যেদিন ছড়ায়, মারামারিটা সেদিন সাঙ্ঘাতিক রকমের ঘটে যায়।

প্রথম প্রথম বিনু ওদের কোনো জিনিসই ছুঁত না। অশোকের দেখাদেখি কবে থেকে যে সে কাড়াকড়ি করতে শুরু করেছে, নিজেই জানে না।

আমেরিকান টমিদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতে আজকাল বিনুদের নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। টমিদের খোঁজে এখন আর ব্যারাক পর্যন্ত যেতে হয় না। রাজদিয়ার রাস্তায় রাস্তায়, স্টিমারঘাটে, নদীর পাড়ে ঝাউবনের দিকটায় সবসময় টমিগুলো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

একদিন বিনুরা দেখতে গেল, তাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে সেই কাঠের পুলটার ওপর দুই টমি একটা প্রকাণ্ড পাকা কাঁঠাল নিয়ে বসে আছে। খানিকটা দূরে মুসলমান চাষীদের এক জনতা উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে টমি দুটোকে দেখিয়ে ফিসফিস গলায় নিজেদের ভেতর কি বলাবলি করছে।

বিনুরা প্রথমে চাষীদের কাছে গেল। শ্যামল শুধলো, 'কী ব্যাপার ? কী হয়েছে ?'

একটি জোয়ান চাষী জনতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'সায়েবগো কাছে আমরা একখান কাঠল (কাঁঠাল) বেচছি। কত দাম নিছি জানেন ?'

'কত ?'

'চাইর ট্যাকা।'

'তাই নাকি !'

'হু। কাঠলটার দাম বড় জোর আষ্ট আনা। নগদ সাড়ে তিন ট্যাকা লাভ করলাম।' একটা কাঁঠালে সাড়ে তিন টাকা লাভ করা দিগ্বিজয়ের সমান। গর্বে ছোকরার বুক ফুলে উঠছিল।

আরেকটি মধ্যবয়সী চাষী বলল, 'হালারা যে কই থন (কোথা থেকে) আইছে ! যা দাম চাই তাই দিয়া দ্যায়। ট্যাকা-পহার উপুর দয়ামায়া নাই। একখান কাঠল বেইচা চার ট্যাকা পাওন যায়—বাপের জম্মে এমুন কথা শুনি নাই।'

আরেক জন বলল, 'যা দ্যাখে হালারা হেই কিনে (তাই কেনে)। হেই দিন আমি তো আড়াই

ট্যাকায় একখান কুমড়া বেচছিলাম।'

তারপর দেখা গেল, শুধু কুমড়োই না, অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় দামে আরো অনেক অনেক, কিছু টমিদের কাছে বিক্রি করেছে।

অশোক এই সময় বলে উঠল, 'কাঁঠাল তো বেচেছ, আবার দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?'

সেই জোয়ান চাষীটি বলল, 'সায়েবরা আমাগো কি জানি কইতে আছে, বুঝতে পাবতে আছি না।'

মধ্যবয়সীটি বলল, 'এমুন তরাতরি এংরাজি কয় য্যান ছাগলে নাইদা (নেদে) যায়। কার সাইধ্য বোঝে!' ভাবখানা এই, তাড়াতাড়ি না বলে ধীরে-সুস্থে বললে সে ইংরেজি ভাষাটা অক্লেশে বুঝে ফেলত।

অশোক কি বলতে যাচ্ছিল সেই সময় টমি দুটো ডাকল, 'ইউ গায়—'

বিনুরা ফিরে তাকাতে টমিরা হাতের ইশারায় ডাকল।

টমিদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাহস বেড়ে গিয়েছিল, এখন আর তাদের ভয় পায় না বিনুরা। অশোক বলল, 'চল, ব্যাটারা কী বলছে শুনে আসি।'

বিনু, শ্যামল আর অশোক—তিনজনে পায়ে পায়ে পুলটার ওপর গিয়ে উঠল। উৎসুক জনতা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

একটা টমি শুধলো, 'নো ইংলিশ ?' অর্থাৎ অশোকরা ইংরেজি জানে কিনা, সেটাই তার জিজ্ঞাস্য।

অশোক বলল, 'ইয়েস।'

কাঁঠালটা দেখিয়ে এবার টমিটা বলল, 'উয়াটস দিস ?'

প্রথমে খুব চাপা গলায় অশোক বাংলায় বলে নিল, 'ব্যাটারা কী কিনেছে তাই জানে না।' তারপর ইংরেজিতে বলল, 'ফ্রুট।'

'খায় ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কেমন করে খেতে হয় ?' বলে দূরের জনতাকে দেখিয়ে টমিরা বলল, 'ব্লাডিগুলোকে জিজ্ঞেস করছি, কিছু বলছে না।'

অশোক বলল, 'ওরা ইংরেজি জানে না, তাই তোমাদের কথা বুঝতে পারে নি।'

'দ্যাট মে বি—'

এবার কাঁঠালটা ভেঙে খাওয়ার কায়দা দেখিয়ে দিল অশোক। একটা করে কোয়া মুখ পুরতে যেই স্বাদটা টের পাওয়া গেল আর যাবে কোথায়। দুই টমি চার হাতে কোয়া খুলে টপাটপ খেতে লাগল। খাওয়াটা সত্যিই দর্শনীয়। নিশ্বাস ফেলার যেন সময় নেই। বিচিসুদ্ধ কোয়াগুলো মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বিচিগুলো গালের পাশ দিয়ে বার দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে কাঁঠালটা শেষ হয়ে গেল, পড়ে রইল মাঝখানের মোটা বোথা আর কর্কশ কাঁটাওলা ছালটা।

খাওয়া তো হল। তারপরেই দেখা গেল আরেক সমস্যা। কাঁঠালের আঠায় হাত-মুখ, গাল-গলা, নাক, ভুরু, এমন কি জামা পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেছে। টমিরা যতই ঘষে ঘষে তুলতে চাইছে ততই আঠা লেপটে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত, বিব্রত হয়ে আবার অশোকের শরণ নিল তারা, 'এ গায়—'

অশোক বলল, 'ইয়েস—'

'ব্লাডি আঠা তো তুলতে পারছি না।'

অশোক চৌখস ছেলে। বিনুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শালাদের ট্যাঁক কিছু খসাচ্ছি।' তারপর থেমে থেমে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে টমিদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আঠা তুলে দিতে পারি, পাঁচ টাকা লাগবে।'

'ও, ইয়েস—' হিপ পকেট থেকে এক মুঠো রেজগি আর নোট বার করে একটা টমি অশোকের হাতে দিল, গুনল না পর্যন্ত।

অশোক অবশ্য গুনল—প্রায় সাত টাকার মতন। টাকাটি পেয়েই সে বিনুকে বলল, 'তোমাদের বাড়ি তো কাছে। শিশিতে করে সরষের তেল নিয়ে এস। একটু বেশি করেই এনো।'

সরষের তেল এলে তিন বন্ধু ডলে ডলে টমিদের গা থেকে কাঁঠালের আঠা তুলে ফেলল।

টমি দুটো বেজায় খুশি। মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, কাম অন—' বলে তিনজনের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁধের জোড় প্রায় আলগা করে ফেলল।

উচ্ছ্বাস খানিকটা স্তিমিত হলে টমি দুটো বলল, 'সিট ডাউন। এস, তোমাদের সঙ্গে গল্প করি।'

বিনুরা বসল।

দুই টমি জড়ানো জড়ানো উচ্চারণে কত কথা যে বলতে লাগল। ক্লাস নাইনের ইংরেজি বিদ্যেয় তার সামান্যই বুঝতে পারল বিনু, বেশিটা দুর্বোধ্য থেকে গেল। অশোক অবশ্য টমিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে 'ইয়েস' 'নো' করে যেতে লাগল। তবে একটা কথা জানা গেল, রাজদিয়া আসার আগে টমি দুটো কলকাতায় ছিল।

অনেকক্ষণ গল্পটল্প করার পর একটা টমি হঠাৎ বলে উঠল, 'হেঃ গায়—'

অশোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'ইয়েস—'

একটি চোখ কুঁচকে আরেকটা চোখ ইঙ্গিতপূর্ণ করে চাপা গলায় টমিটা বলল, 'বিবি হাউস মালুম ?' কলকাতায় থাকার ফলস্বরূপ দু-চারটি হিন্দি শব্দও তারা শিখে এসেছে।

একটু ভেবে অশোক বলল, 'ইয়েস—'

'ইউ গুড গায়। আমাদের নিয়ে চল—'

'টেন রুপিজ—' অশোক বলল। অর্থাৎ দশটি টাকা দিলে, তবেই 'বিবি হাউসে'র দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

'ইয়া ইয়া—' হিপ পকেট থেকে আবার এক মুঠো নোট-টোট বার করে অশোককে দিল টমিটা।

'বিবি হাউসে'র ব্যাপারে টমি দুটোর প্রচণ্ড উৎসাহ। টাকা দিয়েই লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে তারা এবং অশোকের হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে।

অগত্যা অশোকদের উঠতেই হল। এই সময় বিনু অশোকের কানে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'বিবি হাউস কী ?'

অবাক চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অশোক বলল, 'জানো না !'

'না।' বিনু বিমূঢ়ের মতন মাথা নাড়ল।

অশোক বলল, 'পরে বলব।' তারপর আঙুল কামড়াতে কামড়াতে গলাটা নামিয়ে দিল, 'বিবি হাউস'–এর নাম করে তো দশ টাকা আদায় করলাম। এখন ব্যাটাদের কোথায় নিয়ে যাই ?' তারপরই কী মনে পড়তে তার চোখের তারা নেচে উঠল, 'হয়েছে—'

বিনু শুধলো, 'কী ?'

'ব্যাটাদের এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

'কোথায় ?'

'চলই না। গেলে বুঝতে পারবে।'

অশোক টমিদের নিয়ে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরল।

পুলের তলায় জনতা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মাঝবয়সী সেই মুসলমানটি ভিড়ের মধ্য থেকে বলে উঠল, 'বাবু কাঠলের আঠা তোলনের লেইগা কত নিলেন ?'

অশোক বলল, 'সাত টাকা।'

'তাইলে এক কাঠল খাইতে এগার ট্যাকা লাইগা গেল।'

উত্তর না দিয়ে অশোক হাসল।

লোকটা আবার শুধলো, 'সৈন্য দুইটা আরো-ট্যাকা দিল না আপনেরে?'

দ্বিতীয় বার টাকা দেওয়াও সে তা হলে লক্ষ করেছে। ব্যাপারটা স্বীকার করতেই হল অশোককে।

মধ্যবয়সী বলল, 'এই ট্যাকাটা পাইলেন কোন খাতে?'

খানিক চিন্তা করে অশোক বলল, 'সে তোমাকে পরে বলব।'

'অহন ওগো নিয়া চললেন কই?'

'শ্বশুরবাড়ি দেখাতে।'

দক্ষিণ দিকে খানিকটা যাবার পর অশোকরা পুবে ঘুরল। তারপর কোনাকুনি কিছুক্ষণ হেঁটে বাংলো মতন একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকেই অশোক বলল, 'যাও, ভেতরে যাও—' বলেই পেছন ফিরে বিনুদের নিয়ে ছুট। মুহূর্তে এর রান্নাঘর, ওর বাগান, তার ঢেঁকিঘরের ওপর দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বিনুরা থামল একেবারে তাদের পুকুরপাড়ে এসে। ঘাটে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে তিনজন অনেকক্ষণ হাঁপাল।

তারপর বিনু বলল, 'যেখানে টমি দুটোকে দিয়ে এলে ওটা তো পুলিশের বড়সাহেব মিস্টার রজার্সের বাড়ি—'

যেন বিরাট এক কীর্তি করেছে, ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কায়দা করে কিছুক্ষণ হাসল অশোক। তারপর বলল, 'ইচ্ছে করেই তো দিয়ে এলাম। একটু পর খোঁজ নিলে জানতে পারবে বাছাধনদের হাড়-মাংস আলাদা করে রজার্স সাহেব মিলিটারি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। উল্লুকরা বাংলা দেশে এসে 'বিবি হাউস' খুঁজছে!'

চকিতে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল বিনুর। বলল, 'বিবি হাউস' মানে কী, বললে না তো?'

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি বলল অশোক। শুনতে শুনতে নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল বিনুর, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

কলকাতা থেকে জ্ঞানবৃক্ষের অনেক ফল নিয়ে এসেছে অশোক, একটা একটা করে বিনুকে খাওয়াতে শুরু করেছে সে।

দিনকয়েক পরের কথা।

বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরছিল বিনুরা। স্টিমারঘাটের সামনে আসতেই চোখে পড়ল একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানে ভিড় জমেছে।

কৌতূহলের বশে বড় বড় পা ফেলে কাছে আসতেই বিনুরা দেখতে পেল একটা টমি একের পর এক সিগারেটের প্যাকেট কিনছে, তারপর সেগুলো খুলে হরি লুটের মতন ছড়িয়ে দিচ্ছে।

চারপাশের মানুষগুলো যেন চোখমুখ শানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সিগারেট ছড়ালেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

বিনুরা একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

হঠাৎ টমিটার চোখ বোঁ করে ঘুরে এসে পড়ল বিনুদের ওপর। দেখেই বোঝা গেল, মদে চুর

হয়ে আছে সে। তারই মধ্যে হিপ পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বার করে মাঝে মাঝে গলায় ঢালছে।

আচমকা টমিটা চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউ ব্লাডি সোয়াইন—'

বিনুরা ভয় পেয়ে গেল।

টমিটা ছুটে এসে অশোকের কলার চেপে ধরে চেঁচাল, 'ইউ আর স্ট্যান্ডিং—'

অমন যে তুখোড় ছেলে অশোক, সে-ও একেবারে তোতলা হয়ে গেল, 'ইয়ে-এ্-এ-এস স্যার—'

'ওয়াই ?'

'ফর নাথিং সায়েব, ফর নাথিং—'

টমি গর্জে উঠল, 'নো—'

মাতালটা ঠিক কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল অশোক। ভয়ে তার হাত-পা কাঁপতে লাগল, চোখের তারা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

হঠাৎ টমিটা ধাক্কা দিয়ে অশোককে দশ হাত দূরে সরিয়ে দিল। তারপর সিগারেট কিনে ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'টেক টেক—'

এতক্ষণে বোঝা গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে চলবে না, সবার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে হরির লুটের সিগারেট নিতে হবে। কি আর করা, সিগারেট কুড়োতেই হল।

বিনু আর শ্যামল দাঁড়িয়ে ছিল। টমির ভয়ে তাদেরও সিগারেট কুড়োতে হল। কুড়িয়েই যদি মুক্তি পাওয়া যেত! দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে টমিটা চিৎকার করল, 'ইউ ব্লাডি—স্মোক।'

বিনু ভাবল, একদিন আশু দত্ত রুস্তম আর পতিতপাবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই নদীর পাড়ে স্টিমারঘাটের আশে পাশে এমন কেউ নেই যে তাকে বাঁচাতে পারে।

সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল বিনুর, হাতের আঙুলগুলো থরথর করছিল। মনে হচ্ছিল, মাথাটাথা ঘুরে পড়েই যাবে।

টমির আরেকটা হুঙ্কারে সিগারেট ধরিয়ে টান লাগাল বিনু।

সেই যে একটা নিষিদ্ধ রাজ্যের দরজা খুলে গিয়েছিল, তারপর থেকে নদীর পাড়ে ঝাউবনের ভেতর ঢুকে দুই বন্ধুর সঙ্গে সিগারেট খেতে লাগল বিনু। সিগারেট টমিরাই বেশি জোগাত, মাঝে মাঝে তারা নিজেরাও কিনত।

এ ব্যাপারে ভয় আছে, পাছে কেউ দেখে ফেলে। তবু লুকিয়ে লুকিয়ে নিষিদ্ধ কিছু করার ভেতর বিচিত্র এক উত্তেজনাও রয়েছে। সিগারেট টানতে টানতে বিনুর মনে হতে লাগল সে যেন আর বাচ্চাদের দলে নেই, সিগারেটের ধোঁয়ায় চড়ে হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে।

সিগারেট খেয়ে চোরের মতন বাড়ি ফেরে বিনু। চনমন করে সবাইকে লক্ষ্য করে, সহজে কারো কাছে ঘেঁষতে চায় না। তার আশঙ্কা বুঝি তার মুখ থেকে কেউ সিগারেটের গন্ধ পেল।

মোটামুটি এইভাবে চলছিল।

হঠাৎ এক ছুটির দিনের বিকেলবেলা বিনু বেরুচ্ছে, ঝিনুক কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'বেড়াতে যাচ্ছ ?'

শ্যামল আর অশোক স্টিমারঘাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিনু সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ—' বলেই ব্যস্তভাবে উঠোনে নেমে গেল।

পেছন থেকে ঝিনুক ডাকল, 'বিনুদা—'

বেরুবার মুখে বাধা পড়ায় বিনু বিরক্ত। পেছন ফিরে রুক্ষ গলায় বলল, 'কী বলছ ?'

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'পরে শুনব।'

'না, এক্ষুনি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝিনুকের কাছে ফিরে এল বিনু। চোখটোখ কুঁচকে বলল, 'কী বলবে, তাড়াতাড়ি বল—'

ঝিনুক হাসল, 'অত তাড়া কেন? বন্ধুরা বুঝি দাঁড়িয়ে আছে?'

শ্যামল আর অশোক যে তার সব সময়ের সঙ্গী, এ কথা জানতে আর কারো বাকি নেই। বিনু কিছু বলল না, তার চোখ আরো কুঁচকে যেতে লাগল।

ঝিনুক একটু ভেবে বলল, 'তুমি আজকাল একটা জিনিস খাচ্ছ?'

'কী?'

'তুমিই বল না—'

'বুঝতে পারছি না।'

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে খুব চাপা গলায় ঝিনুক বলল, 'সিগারেট।'

পলকে মুখখানা একেবারে কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল। ভাল করে কথা বলতে পারল না বিনু। তোতলাতে তোতলাতে কোনরকমে বলল, 'কে বললে? মিথ্যে কথা।'

তার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝিনুক বলল, 'মিথ্যে কথা?'

'নিশ্চয়ই—' বিনু খুব জোর দিয়ে বলতে চাইল বটে, কিন্তু গলার ভেতর থেকে সরু দুর্বল একটা আওয়াজ বেরুল মাত্র।

'তা হলে তোমার পকেট থেকে সিগারেট বেরুল কেমন করে?'

'আমার পকেট থেকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই।'

বিনু কিছু বলতে চেষ্টা করল, পারল না। তার বুকের ভেতরটা ঢাকের আওয়াজের মতন গুরগুর করতে লাগল।

ঝিনুক আবার বলল, 'ধোপাবাড়ি পাঠাবার জন্যে মাসিমা আমাকে তোমার ময়লা জামা আনতে বলেছিল। পকেট টকেটগুলো দেখে নিচ্ছিলাম, যদি পয়সাকড়ি কিছু থাকে। পয়সার বদলে ও মা, একেবারে সাপ বেরিয়ে পড়ল—'

বিনুর এবার মনে পড়ে গেল, সেদিন টমিদের কাছ থেকে অনেকগুলো সিগারেট জোগাড় করেছিল। ঝাউবনে বসে কয়েকটা টেনেছিল, ক'টা রেখেছিল পকেটে। ভেবেছিল, পরে ফেলে দেবে। অসাবধানে ফেলে দিতে ভুলে গেছে।

শ্বাস আটকে আসছিল বিনুর। নাকের ডগাটা ঝিঁ ঝিঁ করছিল। সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে আসছে। কোনোরকমে সে বলতে পারল, 'মাকে সিগারেট দেখিয়েছ নাকি?'

আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল ঝিনুক, 'হুঁ—'

বিনুর হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এল যেন, 'সত্যি!'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ঝিনুক। তারপর মাথাটা ধীরে ধীরে দু'ধারে নাড়ল। অর্থাৎ বলে নি।

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি।'

'আমাকে ছুঁয়ে বল।'

বিনুর গায়ে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'হল তো?'

এতক্ষণে সহজভাবে শ্বাস টানতে পারল বিনু। একটু হেসে বলল, 'বাঁচালে।'

'এই প্রথম, এই শেষ। এর পর খেলে আর বাঁচাব না। ঠিক মাসিমাকে বলে দেব।'

'আর খাবই না।'

'শ্যামলদা আর অশোকদার সঙ্গে মিশে মিশে তুমি খুব খারাপ ছেলে হয়ে যাচ্ছ।'

বিনু এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'সিগারেটগুলো কোথায় ?'

ঝিনুক বলল, 'আমার কাছে।'

বিনু মুখ কাঁচুমাচু করে অনুনয়ের গলায় বলল, 'আমাকে দিয়ে দাও না—'

ঝিনুক বললে, 'উঁহু—'

'দাও না, দাও না—'

'না। ওগুলো আমার কাছে থাকবে।'

'সিগারেট দিয়ে তুমি কী করবে ?'

'তুমি যদি আমার কথা না শোন, মাসিমাকে-দাদুকে-দিদাকে সবাইকে দেখাব।'

কি সাঙ্ঘাতিক মেয়ে। বিনুর মনে পড়ল, ঝুমার সঙ্গে কাউফুল পাড়তে গিয়ে মাঠের জলে ডুবে গিয়েছিল। সেই কথাটা মাকে বলে দেবে—এই ভয় দেখিয়ে অনেক দিন ঝিনুক তাকে তটস্থ করে রেখেছে, এক মুহূর্তও সুখে থাকতে দেয় নি।

জলে ডোবার ব্যাপারটা মলিন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে সিগারেট বেরুল। আর কি আশ্চর্য, তার যত কুকীর্তি, সবই কিনা ঝিনুকের হাতে ধরা পড়ছে। ভাগ্যিস ঝিনুক ধরেছে। অন্য কারো হাতে পড়লে কি যে হত, ভাবতে সাহস হয় না।

বিনু আর পীড়াপীড়ি করল না। শুধু বলল, 'সিগারেটগুলো একটু লুকিয়ে রেখো, কেউ যেন দেখে না ফ্যালে।'

'সে তোমাকে বলতে হবে না। এমন জায়গায় রেখেছি, কারো সাধ্যি নেই খুঁজে পায়।'

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'আমি তা হলে এখন যাই ?'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল ঝিনুক, 'উঁহু—' এইভাবে মাথা ঝাঁকানো তার কতকালের অভ্যাস।

'না গিয়ে এখন কী করব ?'

'আমার সঙ্গে ক্যারাম খেলবে।'

নদীর পাড়ে, ঝাউবনে কি স্টিমারঘাটায় কি মিলিটারি ব্যারাকে কোথায় অশোকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে তা নয়। শুধু বাড়িতে বসে থাকো। করুণ গলায় বিনু বলল, 'ক্যারম !'

'হ্যাঁ। নতুন বন্ধু পেয়ে আজকাল বাড়িই থাকো না। এখন আমার সঙ্গে খেলতেই হবে।'

জলে ডোবার পর এই নতুন এক অস্ত্র পেয়ে গেছে ঝিনুক। নাঃ, মেয়েটার হাত থেকে কোনোদিন মুক্তি নেই।

বিমর্ষ মুখে ক্যারম খেলতে বসে গেল বিনু।

ঝিনুকের কাছে ধরা পড়বার পর অশোকদের এড়িয়ে চলতে লাগল বিনু। আজকাল টিফিনের সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে স্কুলের পেছন দিকের সোনাল ঝোপে গিয়ে একা একা বসে থাকে। ছুটি হলেই চোখ কান বুজে বাড়ির দিকে ছোটে।

কিন্তু ক'দিন আর। একদিন ছুটির পর চারদিক দেখে ছুটতে যাবে, তার আগেই অশোকরা ধরে

ফেলল।

শ্যামল বলল, 'কি ভাই, আজকাল যে আমাদের সঙ্গে মিশতেই চাও না।'

বিনু আবছা গলায় বলল, 'না, মানে পরীক্ষা এসে গেল। তাই—'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অশোক বলল, 'হঠাৎ গুড বয় হয়ে গেলে যে! পরীক্ষা বুঝি আমাদের নেই?'

'না, মানে—'

'বার বার মানে মানে কী করছ? এস—'

'কোথায়?'

'বা রে, তুমি দেখছি এ ক'দিনে সব ভুলে গেছ। ছুটির পর আমরা যেখানে যাই সেখানেই যাব। স্টিমারঘাটে, টমিদের ব্যারাকে, ঝাউবনে—'

তীব্র আকর্ষণ বোধ করছিল বিনু, আবার ভয়ও লাগছিল। শেষ পর্যন্ত ভয়ের দিকটাই ভারি হয়ে দাঁড়াল। বিনু বলল, 'তোমারাই যাও ভাই, আমার বাড়িতে একটু কাজ আছে।'

'কোনো কাজ নেই।'

জোর করে বিনুকে টানতে টানতে অশোকরা ঝাউবনে নিয়ে গেল। গাছের আড়ালে বসে অশোক পকেট থেকে সিগারেট বার করল।

দেখেই বিনু হাত নেড়ে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি কিন্তু ভাই সিগারেট খাব না।'

'কেন?'

'ঝিনুকের কাছে যে ধরা পড়ে গেছে তা আর জানাল না বিনু। শুধু বলল, 'এমনি।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আঙুলের ডগায় বিনুর থুতনিটা নাড়তে লাগল অশোক। ঠাট্টার গলায় বলল, 'সিগারেট তো খাবে না, তা হলে কী খাবে? ডুডু? কচি খোকা।' বলতে বলতে একটা সিগারেট বিনুর ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে ফস করে দেশলাই ধরাল।

কয়েক দিনের জন্য ঝিনুক বিনুকে ফিরিয়েছিল ঠিকই কিন্তু অশোকদের টান এত প্রবল, নিষিদ্ধ দেশের আকর্ষণ এত তীব্র যে আবার সে ভেসে যেতে লাগল।

অশোকদের সঙ্গে আবার ঘুরতে শুরু করেছে বিনু, আবার লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। যুদ্ধ লাগবার পর পূর্ববাংলার হৃদয়ের গভীরে লুকনো এই মায়াবী রাজদিয়াকে ঘিরে যে উদ্‌ভ্রান্ত ঘূর্ণি ঘুরে চলেছে তা যেন হাজার হাতে তাকে টানতে লাগল। বিনুকে ফেরাতে পারে তেমন শক্তি ঝিনুকের ক্ষুদ্র দুর্বল বাহুতে নেই।

অশোকদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট টানে বটে, তবে আগের চাইতে অনেক বেশি সাবধান হয়ে গেছে বিনু। বাড়ি ফেরার সময় ভাল করে পেয়ারা পাতা চিবিয়ে নেয়, যাতে মুখে গন্ধ না থাকে। পকেট-টকেটগুলো অনেকবার করে দেখে উল্টেপাল্টে।

মোটামুটি এইরকম চলছিল।

হঠাৎ একদিন অঘটন ঘটে গেল। সেদিন আর ঝাউবনে বসে সিগারেট খাচ্ছিল না বিনুরা। সাহস দেখাবার জন্য বড় রাস্তা দিয়ে তিন বন্ধু বুক ফুলিয়ে হাঁটছিল, তাদের ঠোঁটের একধারে সিগারেট ঝুলছে, ভাবখানা এই, কাউকে পরোয়া করি না।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যখন তারা আদালতপাড়ার কাছে এসেছে, সেই সময় বিনু টের পেল একটা কর্কশ শক্ত হাত তার কানে সাঁড়াশির মতন চেপে বসেছে।

চমকে পেছনে ফিরতেই বিনু দেখতে পেল—মজিদ মিঞা। মুখ থেকে সব রক্ত যেন নিমেষে নেমে গেল, ঠোঁট থেকে সিগারেট খসে পড়ল, ভয়ে চোখের তারা স্থির, হাত-পা একেবারে জমে গেছে।

মজিদ মিঞাকে চেনে না অশোক। একটি অপরিচিত মুসলমানকে বিনুর কান ধরতে দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। তার পরেই রুখে উঠল, 'আপনি ওর কান ধরছেন যে?'

মজিদ মিঞা বলল, 'বেশ করছি।'

'আপনি কি ওর গার্জেন?'

'গার্জেন-গুর্জেন ঐ সগল এংরাজি বুঝি না। অর কানটা যদি ছিড়াও ফালাই কেউ কিছু কইব না। কানটা তো পরথমে ছিড়ুমই, হের পর ভাইবা দেখুম, আর কী করন দরকার—' বলে বিনুর কানে প্রচন্ড এক মোচড় দিল মজিদ মিঞা।

অশোক এবার ধমকের গলায় বলল, 'ভাল চান তো শিগ্‌গির ওর কান ছেড়ে দিন।'

'ছ্যামরা তর কথায় নিহি?'

'হ্যাঁ, আমার কথায়।'

'মোচের র‍্যাখ (রেখা) পড়ে নাই, গলায় টিফি দিলে (টিপলে) মায়ের দুধ উইঠা আইব। ওই বয়সে সিক্‌রেট খাও, আবাব চোখ লাল কর। র' ছ্যামরা, তরে দেখাই।' বিনুর কানটা ডান হাতে ধরা ছিল, বাঁ হাত দিয়ে ঠাস করে অশোকের গালে এক চড় কষিয়ে দিল মজিদ মিঞা। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে পড়ল অশোক।

মজিদ মিঞা একাই ছিল না, তার সঙ্গে অন্য একটা লোকও ছিল। অশোক পড়ে যেতেই মজিদ মিঞা সঙ্গীকে বলল, 'ধর তো ছ্যামরারে, কত বড় বান্দর হইচে একবার দেখি।'

মজিদ মিঞার মুখ থেকে কথা খসবার আগেই লোকটা বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোককে ধরে ফেলল। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে শ্যামল এই সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

পেছন থেকে মজিদ মিঞা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমারে আমি চিনি বাসী, ত্রৈলোক্য স্যানের নাতি তুমি। লৌরাইয়া (দৌড়ে) পলাইবা কই, যাইতে আছি তোমাগো বাড়িত্।'

এদিকে অশোককে টানতে টানতে সেই লোকটা সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। মজিদ মিঞা তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাগো বাড়ির পোলা তুমি?'

অশোকের অবস্থা অবর্ণনীয়। এত যে তুখোড় সে, এত চৌখস, চোখে মুখে যার কথার খই ফোটে, একটু আগেও যে রুখে উঠছিল, এখন তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখ জলে ভরে গেছে।

মজিদ মিঞা ধমকে উঠল, 'কী হইল, মুখ দিয়া দেখি রাও (শব্দ) বাইর হয় না।'

কাঁদো কাঁদো মুখে অশোক বলল, 'আর কক্ষনো করব না।'

'কান্‌তে (কাঁদতে) আরম্ভ করলা দেখি। গজ্জন-তজ্জন গেল কই? কান্দনে আমি ভুলুম না। কোন্ বাড়ির পোলা আগে কও—না কইলে কিলাম ল্যাঠা আছে।'

ভয়ে ভয়ে অশোক এবার বলল, 'রুদ্রবাড়ির—'

'তোমার বাপের নাম কী?'

'অনন্তকুমার রুদ্র।'

হঠাৎ ভীষণ রেগে উঠল মজিদ মিঞা। অশোকের গালের কাছে চড় নিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল, 'হারামজাদা, বাপেরে সোম্মান দিতে জান না! নামের আগে শিরিযুক্ত বাবু বসাইতে মানে লাগে!'

মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল অশোক।

মজিদ মিঞা এবার তার সঙ্গীকে বলল, 'কাশমা, তুই ঐ ছ্যামরারে রুদ্রবাড়ি লইয়া যা। আমি হ্যামকত্তার বাড়িত্ থনে আইতে আছি।'

কাশমা অর্থাৎ কাশেম অশোককে নিয়ে চলে গেল। আর মজিদ মিঞা বড় রাস্তার ওপর দিয়ে বিনুর কান ধরে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। তার এমন ভয়ানক চেহারা আর কখনও দেখেনি বিনু।

হেমনাথ অবনীমোহন স্নেহলতা সুরমা, সবাই বাড়িতেই ছিলেন। মজিদ মিঞা আর বিনুকে এভাবে

আসতে দেখে তাঁরা উদ্বিগ্ন মুখে বেরিয়ে এলেন।

হেমনাথ শুধোলেন, 'কী হয়েছে রে মজিদ?'

সংক্ষেপে সব ঘটনা বলে গেল মজিদ মিঞা। শুনতে শুনতে অবনীমোহন সুরমা এবং স্নেহলতার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। অবনীমোহন মাথায় হাত দিয়ে সেখানেই বসে পড়লেন। স্নেহলতা আর সুরমা কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, গলা দিয়ে তাঁদের স্বর বেরুল না। সুধা-সুনীতি ফিসফিস করে নিজেদেব ভেতর কি বলাবলি করতে লাগল। আর স্তব্ধ মূর্তির মতন একধারে দাঁড়িয়ে রইল ঝিনুক।

হেমনাথ একদৃষ্টে পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন। কথাটা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অনেকক্ষণ পর আস্তে করে বললেন, 'বলিস কী!'

'হ হ্যামকত্তা। এইর এট্টা বিহিত করেন।' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'অহনও সময় আছে। পোলা চৌখের সামনে নষ্ট হইয়া যাইব, এ আমি সইতে পারুম না।'

হেমনাথ হঠাৎ যেন খেপে গেলেন, 'বিহিতেব জন্যে আমার কাছে ধরে এনেছিস কেন, নিজে শাসন করতে পার নি? তুমি ওর কেউ হও না?'

অবনীমোহন এই প্রথম কথা বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমি তো ভাবতেই পারি না, ছেলেটা এত বড় উল্লুক হয়ে উঠেছে!'

মজিদ মিঞা আবেগের গলায় বলল, 'হ, আমারই শাসন করা উচিত আছিল। আমি পরের লাখান কাম করছি, এইবার আপন মাইন্‌ষের লাখান কাম করি।' বলে উঠোনের এক ধারে একটা খুঁটির সঙ্গে বিনুকে কষে বাঁধল। তারপর কোত্থেকে একটা কাঠের লম্বামতন টুকরো জোগাড করে এনে সমানে মারতে লাগল।

একেকটা ঘা পড়ছে আর চামড়া ফেটে ফেটে রক্ত ছুটছে। বিনু আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'আমাকে মেরে ফেলল, আমাকে মেরে ফেলল। আর কক্ষনো ও কাজ করব না।'

দেখাদেখি ঝিনুকও কান্না জুড়ে দিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বিনুদাদাকে মেরে ফেললে গো—'

স্নেহলতাও ঝিনুকের সঙ্গে সুর ধরলেন, 'মজিদ আর ওকে মেরো না।'

অবনীমোহন বললেন, 'মারুন আপনি, মেরে শেষ করে দিন। এরকম ছেলের দরকার নেই আমার।'

সুরমাও তা-ই বললেন। হেমনাথ উঠে গিয়ে স্নেহলতা আর ঝিনুককে রান্নাঘরে দিয়ে এলেন।

একসময় মেরে টেরে মজিদ মিঞা চলে গেল।

মারের চোটে কত জায়গায় যে কেটে গেছে। হাত-পায়ের আর কিছু নেই, ফুলে ঢুমো ঢুমো হয়ে উঠেছে। রক্ত জমাট বেঁধে জায়গায় জায়গায় কালশিটে পড়ে গেছে। ব্যথার তাড়সে সন্ধেবেলায় জ্বর এসে গেল বিনুর—ধুম জ্বর।

জ্বর আসার খানিকক্ষণ পর হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা, মোহনবাঁশি কলার ছড়া আর একটা নতুন ফুটবল নিয়ে আবার এল মজিদ মিঞা। বাড়িতে পা দিয়েই বিনুর খোঁজ করল।

হেমনাথ বললেন, 'ওর জ্বর এসেছে।'

'জ্বর!' মজিদ মিঞা চমকে উঠল, 'বিনু কই?'

'পূবের ঘরে শুয়ে আছে।'

পাগলের মতন ছুটে পূবের ঘরে ঢুকল মজিদ মিঞা। তারপর বিনুর মাথার কাছে ফুটবল, মিষ্টির হাঁড়িটাড়ি রেখে তার সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কাঁদতে লাগল, 'অয় রে কী পাষাণ পরাণ আমার, দুধের শিশুরে মাইরা ফালাইলাম—'

কিছুক্ষণ হাত বুলোবার পর মজিদ মিঞা চলে গেল। ঘন্টাখানেক পর লারমোরকে নিয়ে আবার এসে হাজির হল। বলল, 'দ্যাখেন লালমোহন সায়েব, পোলায় নি আমার বাচব!' বলে তার কি কান্না।

অবনীমোহন হেমনাথ যত বোঝান, 'জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে—' মজিদ মিঞা শোনে না। তার কান্না বাড়তেই লাগল, 'অয় রে কী পাষাণ পরাণ আমার—'

সারা রাত বিনুর শিয়রে জেগে বসে থাকল মজিদ মিঞা।

এরই ভেতর একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির এম-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেল। যা আশা করা গিয়েছিল, তা-ই হল। হিরণ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।

কলেজের চাকরি ঠিক হয়েই ছিল। রেজাল্ট বেরুবার পর রাজদিয়া এসে প্রফেসারি নিল হিরণ।

জ্বর ছাড়ার পর অবনীমোহনের সঙ্গে একদিন সুনামগঞ্জের হাটে গেল বিনু। হেমনাথ আসেন নি। ক'দিন ধরে তাঁর জ্বর, একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। বিনু সেরে উঠবার পরই তিনি জ্বরে পড়েছেন।

দু বছর হল বিনুরা রাজদিয়া এসেছে। এই প্রথম হেমনাথকে সে অসুস্থ হতে দেখল।

হাটে পা দিতেই বিনুদের কানে এল, সুজনগঞ্জে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। এতবড় একটা গঞ্জ, যেখানে ফি হাটে কম করে পাঁচ-দশ হাজার মণ ধান-চাল বিকিকিনি হয় সেখানে একদানা শস্যও নেই। নদীর ধার ঘেঁষে সারি সারি আড়তগুলোতে তালা ঝুলছে। পূব দিকে হাটুরে চালাব তলায় চারপাশের গ্রাম থেকে চাষীরা ঘরে ভানা চাল এনে বসত। চালাগুলো আজ ফাঁকা।

চাল নেই, চাল নেই।

তামাকহাটা বেগুনহাটা মরিচহাটা—যেখানেই বিনুরা যাচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে।

'হায় আল্লা, বাজারে চাউল নাই। নিজেরা খাই কী? পোলাপানরে বাচাই কেমনে?'

'হে ভগবান, অদ্দিষ্টে কী যে আছে!'

বিনুরা দেখতে পেল, হাটের নানা জায়গায় থোকা থোকা ভিড় জমেছে। সবাই ভয়ার্ত, বিহ্বল, দিশেহারা। চাল ছাড়া আজ আর কেউ কোনো কথা বলছে না।

ঘুরতে ঘুরতে বেগুন-ব্যাপারী গয়জদ্দির সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'হাটে কুন সময় (কখন) আইলেন জামাই কত্তা?'

অবনীমোহন বললেন, 'একটু আগে।'

'খপর শোনছেন?'

'হ্যাঁ, শুনলাম।'

'পঞ্চাশ ষাইট বছর বয়স হইল, চাউলের এমুন আঁকাল আগে আর দেখি নাই। ঘরে এক পাসারি চাউল আছে, তিন ওক্ত কইরা খাইলে তিনদিনও চলব না। দুই ওক্ত কইরা খাইলে বড় জোর চাইর রোজ। হের পর কী যে করুম!'

অবাক হয়ে অবনীমোহন বললেন, 'তোমার ঘরে মোটে এক পাসারি চাল থাকবে কেন? তোমার না দশ কানি ধানের জমি!'

গয়জদ্দি কপালে চাপড় মেরে বলল, 'আর কইয়েন না জামাই কত্তা, বুদ্ধির দোষ আর লোভ। দুইয়ে পইড়া এইবার গুষ্টিসুদ্ধা মরলাম।'

'কিরকম?'

'ধান-চাউলের দর যখন চ্যাতনের (চড়বার) মুখে হেই সোমায় ঘরের বেবাক ধান-চাউল দিলাম বেইচা। টাকা হাতে পাইয়া মাথা গেল গরম হইয়া। চাষীর হাতে কাচা ট্যাকা, বুঝলেন জামাই কত্তা, বড় পোলারে সাদি দিলাম। সাদির পর পনের দিন ধইরা খাওয়নের কি চোট! আত্ম-বান্ধব মিলাইয়া চাল্লিশজন বাড়িত্ বইসা খাইল। রুজ মাছ। এইবেলা চিতল তো ঐ বেলা কাতল। তার উপর গোস্ত, মিষ্টান্ন, পাতক্ষীর। অন্য পোলারা কমলাঘাটের বড় গুঞ্জ থনে নয়া জোতা কিনা আনল, পিরহান কিনা আনল। টর্চ বাত্তি, লুঙ্গি, ফাটার পেন (ফাউন্টেন পেন), কত জিনিস যে কিনল! অহন ঘরে চাউলও নাই, ট্যাকাও নাই। অখন খালি কপাল থাপড়াই আর পাছা থাপড়াই। সগলই বুদ্ধির দোষ।'

অবনীমোহনদের কথা বলতে দেখে আরো অনেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যেমন মোতালেফ নিকারী, মনা ঘোষ, বৃন্দাবন ভুঁইমালী—এমনি পনের কুড়িজন। তারাও একই কথা বলল। দর চড়তে দেখে অনেকেই ধান-চাল বেচে দিয়ে কাঁচা টাকা দু-হাতে উড়িয়ে দিয়েছে।

মনা ঘোষ বলল, 'চাউলের কী করন? একখান বুদ্ধি দ্যান দেখি জামাই কত্তা—'

অবনীমোহন বললেন, 'কী বুদ্ধি দেব, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বৃন্দাবন ভুঁইমালী বলল, 'সুজনগুঞ্জে চাউল নাই। কাইল একবার মীরকাদিম, বেতকা, আউশ্‌শইতে (আউটশাহীতে) যামু। দেখি পাওয়া যায় কিনা—'

মোতালেফ নিকারী এই সময় বলে উঠল, 'কুনোখানে চাউল নাই। আমার বুইনের জামাই পরশু ঘুইরা আইছে।'

'তয়?'

'তয় আর কি, মরণ। একখান কথা শুনছ?'

'কী?'

'কাইল গিরিগুঞ্জের বাজারে দুইটা দোকান লুট হইছে।'

'নিহি?'

'হ।'

'জন্ম ইস্তক চাউল লুটের কথা আর শুনি নাই।'

'প্যাটের জ্বালায় মাইন্‌ষের মাথা কি ঠিক থাকে! লুটপাট তো হপায় (সবে) আরম্ভ হইল। দ্যাখ না, কী কান্ড হয়!'

'আরেকখান কথা শুনছ?'

'কী?'

ভাটির দ্যাশে চাউল না পাইয়া মাইন্‌ষে শাক-পাতা খাইতে আছে।'

'কী যে হইব!'

কথায় কথায় দুপুর হয়ে গেল। এখন সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। অবনীমোহন কি বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বিষহরিতলার ওধারের মাঠ থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে এল। চমকে বিনু দেখতে পেল, ঢেঁড়াদার হরিন্দ উঁচু প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই চেলা কাগা-বগা সমানে ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছে। এস-ডি-ও সাহেব একধারে চেয়ারে বসে আছেন, একটা লোক তাঁর মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে। চারপাশে অসংখ্য লাল পাগড়ি। নতুনত্বের ভেতর আজ কয়েকজন মিলিটারি অফিসারকে দেখা যাচ্ছে।

বিনু ফিসফিস করে বলল, 'বাবা মিলিটারি এসেছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আগে তো মিলিটারি দেখি নি।'

'তিন-চার হাট তুই আসিস নি, তাই জানিস না। আজকাল ফি হাটে মিলিটারি আসছে।'

'কেন?'

'যুদ্ধের জন্যে লোক জোগাড় করছে। একে রিক্রুট করা বলে।'

বিনু আবদারের গলায় বলল, 'বাবা, আমি রিক্রুট করা দেখব।'

খুব একটা ইচ্ছা ছিল না অবনীমোহনের। তবু ছেলে যখন ধরেছে, আর না বলতে পারলেন না। বললেন, 'চল—'

বিষহরিতলার কাছে আসতে দেখা গেল, লারমোর ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় যথারীতি তাঁর রুগীপত্তর নিয়ে বসে আছেন। এত যে ডামাডোল, আকাল, যুদ্ধ, সমস্ত জলবাংলা জুড়ে যে এত দুর্ভিক্ষের দুর্ভাগ্যের ছায়া—সে সবের কোনোদিকেই লক্ষ্য নেই তাঁর। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় এক প্রশান্ত ধ্যানের ভেতর তিনি মগ্ন হয়ে আছেন।

বিষহরিতলা বাঁয়ে ফেলে খোলা মাঠের কাছে আসতে দেখা গেল, ঢাকের বাজনা থেমে গেছে। এর ভেতর হাটের নানাদিক থেকে মানুষ গিয়ে সেখানে জমা হতে শুরু করেছে।

এস-ডি-ও সাহেব জমায়েতটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মোটামুটি শ'চার পাঁচেক লোক জমেছে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যারা সৈন্যদলে নাম লেখাবে তারা ডানদিকের ঐ ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন দু'জন করে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। বিনুর মনে পড়ল, তিন-চার সপ্তাহ আগে যখন সুজনগঞ্জের হাটে এসেছিল তখন রিক্রুটমেন্টের কথায় হাটুরে লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এক মাসের কম সময়ের ভেতর কি এমন ঘটল যাতে তাদের ভয় কেটে গেছে?

হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, তার ঠিক পাশে খলিল বছির তাহের এবং আরো ক'জন চরের মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। ধানকাটার মরসুমে তারা হেমনাথের বাড়ি আসে। কিছুদিন আগেও তাদের রাজদিয়ার মাটি ভরাট এবং মিলিটারি ব্যারাক তৈরি করতে দেখা গেছে।

বছিরদের দেখে বিনু অবাক। বলল, 'তোমরা এখানে?'

বছির বলল, 'যুজ্যে নাম লিখাইতে আইছি।'

'তোমরা যুদ্ধে যাবে!'

'হ।'

এই সময় অবনীমোহন তাদের দিকে ফিরলেন। বছিরদের শেষ কথাগুলো তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'যুদ্ধে যাবে কেন?'

বছির বলল, 'কাম কাইজ নাই। কিছু এট্টা তো করন লাগব।'

বিনু বলে উঠল, 'কাজ নেই মানে! এই তো ক'দিন আগে মিলিটারিদের ওখানে মাটি কাটছিলে। ব্যারাক তৈরি করছিলে—'

'হে আর কয়দিনের কাম? শ্যাষ হইয়া গেছে।'

খানিক ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'আর কোথাও কোনো-কাজ পেলে না?'

'না জামাই কত্তা—' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল বছির, 'কুনোখানে কাম নাই। এই দিকে ধান-চাউল মিলে না। আগে চাষবাসের খন্দ গেলে মাইনষের বাড়িত্ কামলা খাটতাম। অহন কেউ কামলা নেয় না। উপাস দিয়া দিয়া আর পারি না জামাই কত্তা। পোলাপান মরতে বইছে।'

তাহের বলল, 'শুনছি, যুজ্যে গেলে প্যাটভরা খাওন মিলব, মাস মাস ট্যাকা পাওয়া যাইব। না খাইয়া মরার থনে যুজ্যে যাওন ভাল না?'

অবনীমোহন কি বলবেন, ভেবে পেলেন না।

তাহের আবার বলল, 'আমাগো চরের কেউ আর ঘরে বইসা থাকব না। সগলে যুজ্যে যাইব গিয়া।'

খলিল বলল, 'হুদা (শুধু) আমাগো চরের নিহি, চাইর দিকে যা আকাল লাগছে, হেয়াতে যাগো

ঘরে চাউল আছে তারা ছাড়া বেবাক মাইনষে যুজ্যে যাইব। না গিয়া উপায় নাই জামাই কত্তা। নিজেরা না খাইয়া থাকে, হে এক কথা। কিন্তুক চৌখের সামনে পোলামাইয়া প্যাটের জ্বালায় দাপাইয়া মরব, এ সয় না।'

অবনীমোহন অসহায়ের মতন তাকিয়ে থাকলেন। এবারও কিছু বলতে পারলেন না।

ওদিক থেকে একটা কনস্টেবলের গলা ভেসে এল, 'যারা যুজ্যে যাইবা, ঐ ধারে গিয়া লাইন দিয়া খাড়াও—যারা যুজ্যে যাইবা—'

প্রথমে এস-ডি-ও সাহেব যুদ্ধে যাবার ডাক দিয়েছিলেন। এখন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কনস্টেবলটা [illegible]য়ে যাচ্ছে। আর এস-ডি-ও সাহেব চেয়ারে বসে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর পাশে বসে আছে মিলিটারি অফিসাররা।

বছির আর অপেক্ষা করল না, ডান দিকে যে লম্বা লাইন পড়েছে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চোখের পলকে লাইনটা বিশ হাত বেড়ে গেল।

যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক লোকগুলির সংখ্যা যখন এক'শ ছাড়িয়ে গেছে সেই সময় এস-ডি-ও সাহেব বললেন, 'এবার বাছাইয়ের কাজ শুরু কর।'

তিন-চারটি কনস্টেবল ফিতে দিয়ে ব্যস্তভাবে মাপামাপি শুরু করে দিল। একবার তারা লোকগুলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপছে, তারপর বুকের ছাতি মাপছে।

সেনাদলে যাকে তাকে নেওয়া হয় না। সেখানে নাম লেখাতে হলে বিশেষ শরীরিক উচ্চতা আর বুকের মাপ থাকা দরকার। তার কম হলে চলবে না।

কেউ লম্বায় ঠিক হচ্ছে তো বুকের মাপে আটকে যাচ্ছে। কারো বুকের মাপ ঠিক হচ্ছে তো লম্বায় আটকে যাচ্ছে।

এর ভেতর যারা চলাক চতুর তারা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উচ্চতা বাড়াবার চেষ্টা করছে। যাদের বুক রোগা পাখির মতন তারা জোরে ফুসফুসে বাতাস টেনে টেনে ফুলিয়ে রাখছে। কিন্তু কনস্টেবলদের চোখে ধুলো ছিটানো সহজ নয়। যারা ডিঙি মেরে লম্বা হয়েছিল রুলের গুঁতোয় তাদের বেঁটে করে দিচ্ছে তারা। যারা বুক ফুলিয়ে রেখেছে তাদের পেটে ঘুষি মেরে হাওয়া বার করে দিচ্ছে।

যাদের মাপ মিলল, মুর্গি বাছাইয়ের মতন তাদের একধারে দাঁড় করিয়ে রাখল কনস্টেবলরা, বাকিদের ভাগিয়ে দিল। দেখা গেল শ'খানেক লোকের ভেতর অর্ধেকই বাতিল হয়ে গেছে।

বাছাইয়ের প্রথম কাজ হল দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ নেওয়া। তারপর বাক্সের মতন চৌকো একটা যন্ত্রের ওপর বসিয়ে পছন্দ করা লোকগুলোর ওজন নেওয়া হল। ওজন নিতে গিয়ে আরো কিছু লোক বাতিল হয়ে গেল।

ওজনের পর যারা টিকে রইল এস-ডি-ও সাহেব নিজের হাতে তাদের নাম ঠিকানা লিখে নিলেন। তারপর বললেন, 'পরশু দিন তোমরা রাজদিয়া মিলিটারি ব্যারাকে চলে যাবে।'

লোকগুলো শুধলো, 'কহন যামু?'

'সকালবেলা। হ্যাঁ, ভাল কথা, খালি পেটে আসবে। সেদিন তোমাদের মেডিক্যাল হবে।'

'মেডিক্যাল কী?'

'স্বাস্থ্য পরীক্ষা।'

ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করে এস-ডি-ও সাহেব, মিলিটারি অফিসার এবং পুলিশ বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন।

চরের যে মুসলমান কামলারা ধানকাটার সময় হেমনাথের বাড়ি আসে তাদের ভেতর একজনকে মোটে পছন্দ করা হয়েছে, সে তাহের। প্রাথমিক পরীক্ষায় বাকি কারো যোগ্যতা প্রমাণিত হয়নি।

খলিল বছিররা অযোগ্যতার গ্লানি দুই কাঁধে ঝুলিয়ে হতাশ মুখে ফিরে এল। তাহেরও তাদের সঙ্গে

এসেছে। অন্য কেউ সেনাদলে চাকরি পাবে না, সেজন্য বেচারা প্রাণ খুলে আনন্দ পর্যন্ত করতে পারছে না। রিক্রুটমেন্টের লোকেরা সবাইকে বাদ দিয়ে তাকে পছন্দ করেছে, এ যেন তারই অপরাধ। খলিলদের পিছু পিছু মুখ চুন করে তাহের এসে দাঁড়াল।

বিনুরা এখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

অবনীমোহন বললেন, 'তোমাদের একজনকে বেছে নাম লিখে নিল, দেখলাম।'

খলিল বলল, 'হ। তাহেররে অগো পছন্দ হইছে। আর আমরা ফ্যালনা, গাঙ্গের পানিতে ভাইসা আইছি।'

অবনীমোহন চুপ করে থাকলেন।

খলিল আবার বলল, 'আমি উচায় (উচ্চতায়) খাটো হইলাম। আরে আমি যে খাটো হেয়াতে কি আমার হাত আছে? খোদায় যেমুন বানাইছে তেমুন হইছি। ইচ্ছা কইরা খাটো হইছে?'

অবনীমোহন মাথা নাড়েন, 'তা তো বটেই।'

বছির এবার বলল, 'বুকের মাপে আমি খারিজ হইয়া গেলাম। ছাতির ওসার (প্রস্থ) নিহি আমার কম। কম হইব না তো কি বেশি হইব! উপাস দিয়া দিয়া পরাণ যায়, ছাতি বড় হইব কেমনে? বাইচা যে আছি, হেই না কত!'

সবাই ক্ষুব্ধ, আশাহত, দুঃখিত। অবনীমোহনের উত্তর দেবার মতন কিছুই ছিল না।

খলিল বলল, 'সগলই নছিব জামাইকত্তা। আমরা যুজ্যে গিয়া যে দু'গা খাইয়া বাচুম খোদাতাল্লায় তা চায় না।'

হেমনাথ সেই যে জ্বরে পড়েছিলেন, সারতে দশ দিন লেগে গেল। জ্বর সারলেও দুর্বলতা কাটল না। একটু হাঁটলেই পা ভেঙে আসে, মাথা ঘুরতে থাকে।

চিরকাল বয়সকে অস্বীকার করে এসেছেন হেমনাথ। বয়সও এতকাল উদাসীন ছিল। হঠাৎ সে তাঁর দিকে নজর দিতে শুরু করেছে এবং প্রথম সুযোগেই বিছানায় ফেলে দিয়েছে।

অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে কোথায় গিয়ে কি বিপদ ঘটাবেন, সেই ভয়ে স্নেহলতা তাঁকে বাইরে বেরুতে দেন না। পাছে বেরিয়ে যান, সেজন্য চোখে চোখে রাখছেন।

এতবড় সংসার যাঁর মাথায় তাঁর তো এক জায়গায় বসে থাকলে চলে না। কোনো দরকারে উঠে যেতে হলে ঝিনুক কিংবা সুধা-সুনীতিকে পাহারাদার হিসেবে হেমনাথের কাছে বসিয়ে রেখে যান স্নেহলতা।

হেমনাথ চেঁচামেচি করেন, 'বসিয়ে বসিয়ে আমাকে একেবারে অথর্ব করে ফেলছ স্নেহ।'

স্নেহলতা হাসেন, 'তাই নাকি ?'

'নিশ্চয়ই। দেখো, আমাকে ঠিক বাতে ধরবে।'

'তা হলে আমি খুশিই হব।'

হেমনাথ অবাক হয়ে বলেন, 'খুশি হবে!'

মজার ভঙ্গি করে ঘাড় হেলিয়ে দেন স্নেহলতা, 'হব, হব, একশ'বার হব।'

'কেন ?'

'বাতে শুয়ে থাকলে অন্তত চরকির মতন ঘোরাটা তোমার বন্ধ হবে। এত বয়েস হল, তবু ঘোরা

বাই যাচ্ছে না।'

একটু চুপ করে থেকে কৌতুকের গলায় হেমনাথ বলেন, 'তুমি তো অসুখের জন্যে আমাকে বেরুতে দিচ্ছ না। রাজদিয়ার লোক কিন্তু অন্যরকম ভাবতে শুরু করেছে।'

অস্বস্তির সুরে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করেন, 'কী ভাবছে?'

'বুড়ো বয়েসে তোমার নাকি রস উথলে উঠেছে। দিনরাত আমাকে কোলে শুইয়ে, মুখে মুখে রেখে—'

কথা আর শেষ করতে পারেন না হেমনাথ। তার আগেই স্নেহলতা মুখ লাল করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'আহা, কথার কি ছিরি! কিছুই আটাকায় না মুখে!'

হেমনাথ হাসতে থাকেন।

স্নেহলতা আগের সুরে বলতে থাকেন, 'তোমার চালাকি আমি বুঝি। লোকের ওসব কথা বলতে বয়ে গেছে। বললেও তোমাকে বাড়ির বার হতে দিচ্ছি না।'

হেমনাথ বন্দিত্ব যেন আর ফুরোতে চায় না। এরই ভেতর একদিন বিকেল বেলা মীরকাদিমের রজবালি শিকদার এসে হাজির।

রজবালির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রং টকটকে। এই বয়েসেও শরীরের বাঁধুনি বেশ মজবুত। হাতের হাড় চওড়া, চোয়াল শক্ত, চিবুক ধারাল। দাড়ি এবং গোঁফ সৌখিন করে ছাঁটা। চোখদুটি সবসময় সজাগ এবং তীক্ষ্ণ। তাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু হবার উপায় নেই। যার দিকে রজবালি তাকায় তার বুকের গভীর পর্যন্ত যেন সে দৃষ্টিতে বিঁধে যায়।

পরনে ডোরাকাটা সিল্কের লুঙ্গি আর ফিনফিনে পাঞ্জাবি। তার তলায় জালিকাটা গেঞ্জির আভাস। মাথায় নক্সা-করা ধবধবে টুপি। কানে আতর মাখানো গোলাপি রঙের তুলো। পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। চোখের কোলে সুর্মার সূক্ষ্ম টান। সব মিলিয়ে মানুষটি রীতিমত সৌখিন।

মীরকাদিমের গঞ্জে রজবালির ধান-চাল মুগ-মসুর তিল-তিসি ইত্যাদি শস্যের ব্যবসা। শাল কাঠের খিলান-দেওয়া টিনের প্রকাণ্ড চারটে আড়ত রয়েছে তার। সবসময় সেগুলো বোঝাই, কম করে দশ পনের হাজার মণ শস্য মজুত থাকে। এ ছাড়া আছে হাঁড়ি-বাসনতির দোকান, মনোহারি দোকান। সব মিলিয়ে এলাহী ব্যাপার।

হেমনাথ বললেন, 'রজবালি যে, আয়—আয়—' বিনু কাছেই ছিল। তাকে একটা জলচৌকি এনে দিতে বললেন।

জলচৌকি এলে তার পর বসতে বসতে রজবালি বলল, 'কেমুন আছেন হ্যামকত্তা? শরীল কেমুন যিনি কাহিল কাহিল ঠ্যাকে।'

হেমনাথ তাঁর অসুখের কথা বললেন, এবং কিছুদিন ধরে বন্দি জীবন যাপন করছেন, তা-ও জানালেন।

রজবালি আন্তরিক সুরে বলল, 'আপনের এমুন অসুখ, খপর পাই নাই তো। পাইলে আগেই আসতাম।'

হেমনাথের মুখ দেখে মনে হল, রজবালির আন্তরিকতাটুকু খুবই ভাল লেগেছে তাঁর। মৃদু হেসে বললেন, 'তোদের খবর ভাল তো?'

'আপনেরা যেমুন রাখছেন।'

'আমরা রাখবার কে? যিনি রাখবার তিনিই রেখেছেন।'

'হে যা কইছেন।'

'তারপর কী মনে করে? কোনো দরকারে এসেছিস, না এমনি বেড়াতে?'

রজবালি হাসল, 'ব্যবসায়ীত্ মানুষ, বিনা দরকারে কুনোখানে যাওনের উপায় আছে? সময় কই?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ।

রজবালি বলল, 'এখানে যে মিলিটারি আইছে আমি তাগো কাছে ছাপ্লাইয়ের এট্টা 'অডার' পাইছি।'

'কী সাপ্লাই?'

'হাস-মুরগি-পাঠা-ডিম, চাউল-ডাইল—এই সগল। অডারের ব্যাপারটা পাকা করতে আইজ আইছিলাম।'

বিনুর হঠাৎ নিত্য দাসের কথা মনে পড়ল। দেখা যাচ্ছে; মিলিটারির কল্যাণে চারদিকের বড় বড় ব্যবসায়ী আর আড়তদারা রাজদিয়ায় হানা দিতে শুরু করেছে।

হেমনাথ শুধালেন, 'অর্ডারের কথা পাকা হল ?'

'হ।'

'কবে থেকে সাপ্লাই দিতে হবে ?'

রজবালি বলল, 'পরশু থনে। ভাবতে আছি রাইজদায় এট্টা বাড়ি ভাড়া নিমু। এইখানে 'রাখি' কইরা না রাখতে পারলে রুজ রুজ ঠিক সময় মাল ছাপ্লাই দিতে পারুম না। এয়া তো এত্তি-পেত্তি লইয়া কারবার না, মিলিটারি বইলা কথা। টাইমে দিতে না পারলে ঘেটিতে মাথা থাকব না।'

রজবালি আরো জানাল, স্টিমারঘাটার কাছে মস্তাজ মিঞা যে নতুন বাড়িখানা করেছে, সেটাই ভাড়া করতে চাইছে, মোটামুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে। কাল পরশু বাড়িটার দখল পাওয়া যেতে পারে।

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন, 'তোদের ওদিকে ধানচালের খবর কী বল—'

'জবর খারাপ হ্যামকত্তা। দশ পনের দিন ধইরা মীরকাদিমের বাজারে একদানা চাউল নাই। চাউল বইলা কথা। মাইনষে পাগলের লাখান ঘুরতে আছে।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'খুবই বিপদের কথা। তা হ্যাঁ রে, তোর আড়তে তো অত ধান ছিল। সব বিক্রি করে ফেলেছিস ?

চকিতে চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে রজবালি বলল, 'না। অত ধান চাউল কি দুই-চাইর-দশ দিনে বেচা যায়! ছয় মাস ধইরা বেচলেও শ্যাষ করন যাইব না।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'সগল ব্যবসায়ীতে যা করছে আমিও হেই করছি হ্যামকত্তা।'

'কী করেছিস ?'

'ধান চাউল সরাইয়া ফালাইছি।'

'কেন ?' বিমূঢ়ের মতন জিজ্ঞেস করলেন হেমনাথ।

রজবালি বলল, 'দর আরো চেতুক (চড়ুক), হেয়ার পর ছাড়ুম। আমার এক সুমুন্দি মানিকগুঞ্জের ঐ দিকে চাউল ব্যবসায়ী। হ্যায় কইছে, দর আরো চেতবো। যত পারি অহন যাান ধান-চাউল 'রাখি' করি।'

হেমনাথ বললেন, ''রাখি' তো করছিস। এদিকে দেশের লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, সেদিকে খেয়াল আছে ?'

কথাটা শুনেও শুনল না রজবালি। অন্যমনস্কের মতন বলতে লাগল, 'আমরা ব্যবসায়ীত্। দ্যাশের মাইনষের দিকে তাকাইলে আমাগো কি চলে!' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনের তো মেলা জমিন। বাড়তি ধান চাউল কিছু আছে? থাকলে আমারে দিতে পারেন। ভাল দাম দিমু।'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'নেই। প্রত্যেক বার ধান ওঠার পরই বাড়তি ধান বেচে দিই। এবারও দিয়েছি। বেশি কিছু থাকলেও তোকে দিতাম না, লোককে বিলিয়ে দিতাম।'

রজবালি কথাটা গায়ে মাখল না। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনের লগে কার তুলনা। আপনে নিজে না খাইয়াও মাইনষেরে খাওয়াইতে পারেন। কিন্তু আমরা হইলাম ব্যবসায়ীত্ মানুষ।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

রজবালি বলল, 'অনেকক্ষণ আইছি। এইবার যাই হ্যামকত্তা।' উঠতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে পড়তে বসে পড়ল, 'ভাল কথা, আপনের একখান খপর দেওয়া হয় নাই—'

'কী খবর ?'

'মুছলিম লিগের নাম শুনছেন?'

'মুসলিম লিগ? শুনব না কেন?'

'হ।' রজবালি মাথা নাড়ল, 'কয়দিন আগে ঢাকার থনে মুছলিম লিগের বড় মিঞারা মীরকাদিমে আইসা মিটিন্ করল। মিটিনে তেনারা কী কইল জানেন?'

'কী?'

'মুছলমানগো লেইগা একখান দ্যাশ চাই। তার নাম পাকিস্তান। তেনারা আরো কইল, যেখানে যত মুছলমান আছে সগলরে মুছলিম লিগে নাম লিখান দরকার। অত বড় মানুষগুলো কইছে, কেও আর না কইতে পারল না। আমাগো ঐদিকের মেলা মাইন্‌ষে মুছলিম লিগে নাম লিখাইতে আছে।'

একটু পর রজবালি গেল।

কনট্রোল হবার আগেই চিনি, কেরোসিন আর কাপড় বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর এই রাজদিয়ায় তিনখানা কনট্রোলের দোকান বসল। একটা নিত্য দাসের, একটা অখিল সাহার আর তৃতীয়টি রায়েবালি সর্দারের।

প্রথম প্রথম রেশনকার্ড দেখিয়ে জিনিস তিনটে পাওয়া যাচ্ছিল। তারপর কনট্রোলের দোকান থেকেই সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিলিটারি ব্যারাকগুলি বাদ দিলে রাজদিয়ার ঘরে ঘরে আজকাল আর হারিকেন জ্বলে না। গন্ধকশলা কি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে সবাই রাতের কাজ সারে। চারদিকের গ্রামগুলোর অবস্থা আরো করুণ। সেখানকার মানুষেরা বিকেল থাকতে খেয়েদেয়ে (যে খাবার জোটাতে পারে) ঘরে খিল লাগিয়ে দেয়। ফলে সন্ধে নামতে না নামতেই গ্রামগুলো নিশুতিপুরে। সারা পুববাংলা জুড়ে পাতালের অন্তহীন গাঢ় অন্ধকার যেন অনড় হয়ে আছে।

বিনুদের রেশন কার্ড পড়েছে নিত্য দাসের দোকানে। চিনি আর কেরোসিন আনতে বিনুকে সেখানে যেতে হয়। যখনই যায়, তার চোখে পড়ে, দোকানটার সামনে উল্টো চন্ডীর মেলা লেগে আছে। শুধু নিত্য দাসের দোকানেই না, অখিল সাহা আর রায়েবালি সর্দারের দোকান দুটোরও একই হাল।

বাইরে রেশন কার্ড আর বোতল হাতে ঝুলিয়ে জনতা তীর্থের কাকের মতন তাকিয়ে থাকে। ভেতর দেখা যায়, নিত্য দাস একটা তক্তপোশে বসে আছে। তার সামনে ক্যাশবাক্স, রসিদ বই। ডান ধারে বড় বড় কেরোসিনের ড্রামগুলো শূন্য, চিনির বস্তাগুলো ফাঁকা। পেছনে কাপড় রাখার জন্য যে সারি সারি কাচের আলমারি বসানো আছে সেগুলোতে কিছু নেই।

বাইরে জনতা করুণ গলায় গোঙানির মতন আওয়াজ করে ডাকে, 'অ দাস মশয়, অ দাস মশয়—'

একশ'বার ডাকলে তক্তপোশের ওপর থেকে একবার মোটে সাড়া দেয় নিত্য দাস, 'কী কও—'

'এট্টু ক্রাচিন দ্যান। আন্ধারে থাইকা থাইকা আর পারি না। হেই দিন রাইতে ঘরে সাপ ঢুকছিল।'

'ক্রাচিন নাই।'

'এট্টা ব্যবস্থা করেন দাস মশয়—'

'ব্যবস্থা কি আমার হাতে? ঐ দেখ না ক্রাচিনের ডেরামগুলান শূইন্য (শূন্য)।'

'দয়া করেন দাস মশয়—'

'দয়ার কী আছে। তোমরা ট্যাকা দিয়া মাল কিনবা, কিন্তুক ব্যাপারখান কী জানো?'

'কী?'

'ছাপ্লাই নাই। ঐ দেখ চিনির ছালাগুলা (বস্তাগুলো) শূইন্য পইড়া রইছে।'

'মিঠার লেইগা পোলাপনাগুলা কাইন্দা মরে। কনট্রোলে চিনি পাইলে কিনতে পারি। কিন্তুক বাইরে গুড়ের দর এক্কেবারে আগুন। কাছে আউগান (এগুনো) যায় না।'

'ক্যান যে তোমরা এত ঘ্যান ঘ্যান কর? কইতে আছি চিনি নাই, নিজের চৌখে সগলে দেখতেও আছ। তবু বিশ্বাস যাও না।'

'চিনি না দ্যান, কাপড় দ্যান- -'

'কাপড়েরও ছাপ্লাই নাই।' আঙুল দিয়ে সারি সারি ফাঁকা আলমারিগুলো দেখিয়ে দেয় নিত্য দাস।

জনতা বলে, 'চিনি-ক্রাচিন না দ্যান তো না দিলেন। কিন্তুক একখান শাড়ি না দিলে চলব না দাস মশয়। কাপড় বিহনে ঘরে বউ-মাইয়া বাইর হইতে পারে না। গামছায় কি সরম ঢাকে! তারা কয় গলায় দড়ি দিব।'

অসীম ধৈর্য নিত্য দাসের। সবার কথা, সবার মিনতি, সবার আবেদন কান পেতে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যায়। তারপর বলে, 'কাপড় কই পাই? ছাপ্লাই না থাকলে আমি কী করতে পারি? আমার তো আর ধুতি-শাড়ির মেচিন নাই যে বানাইয়া দিমু।'

'আপনের কুনো কতা শুনুম না। কাপড় না পাইলে এইখানে 'হত্যা' (হত্যে) দিয়া পইড়া থাকুম।'

'হত্যা দিলে কি কাপড় মিলব! তার থনে এক কাম কর—'

'কী?'

'গরমেন্টেরে গিয়া ধর।'

'গরমেন্ট বুঝি না, আপনেই আমাগো সব। বাচান দাস মশয়, ঘরের বউ-ঝি'র ইজ্জত বাচান।'

এই সব আবেদন-নিবেদন কাকুতি-মিনতির মধ্যে হঠাৎ বিনুকে দেখতে পেলেই হাতের ইশারা করে নিত্য দাস। ভিড় ঠেলে ঠেলে বিনু দোকানের ভেতর চলে আসে।

নিত্য দাস তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে, 'কি ছুটোবাবু, ক্রাচিন নিতে আইছ?'

বিনু মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'যাও গা, রাইতে পাঠাইয়া দিমু।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার দোকানে তো কেরোসিন নেই।'

'থাউক না থাউক, হে তোমার দেখতে হইব না। তুমি ক্রাচিন পাইলেই তো হইল।' নিত্য দাস বলতে থাকে, 'রাইতে যে ক্রাচিন পাঠামু হেই কথাটা গুপন (গোপন) রাইখো। একবার জানতে পা… ঐ শকুনের গুষ্টি আমারে ছিড়া খাইব।' বলে সামনের জনতাকে দেখিয়ে দেয়।

বিনু যেদিনই কেরোসিন আনতে যায়, ঐ একই কথা বলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় নিত্য দাস। তারপর রাত্রিবেলা তার লোক ঢাকাঢুকি দিয়ে কেরোসিনের টিন নিয়ে আসে।

এইভাবেই চলছিল।

নিত্য দাসের যে গোমস্তা কেরোসিন দিয়ে যায় তার নাম সুচাঁদ। হঠাৎ একদিন সে হেমনাথের সামনে পড়ে গেল।

হেমনাথ বললেন, 'তুই নিত্য দাসের দোকানে কাজ করিস না?'

সুচাঁদ বলল, 'আইজ্ঞা।'

'এই রাত্রিবেলা আমার বাড়ি কী মনে করে?'

'আইজ্ঞা ক্রাচিন।'

'কেরোসিন?'

'হ—' সতর্ক চোখে চারদিক দেখে নিয়ে কাপড়ের আড়াল থেকে ছোট্ট একটা টিন বার করল সুচাঁদ।

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন বললেন, 'কী ব্যাপার? এইভাবে চোরের মতন কেরোসিন নিয়ে এসেছিস! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তাঁর বাড়িতে এভাবে গোপনে যে কেরোসিন পাঠানো হচ্ছে, হেমনাথ জানতেন না। তাঁর বিমূঢ় হবার কথাই।'

বিনু কাছেই ছিল। সে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল।

শুনে চিৎকার করে উঠলেন হেমনাথ, 'হারামজাদার এত বড় সাহস, কেরোসিন ঘুষ দিয়ে আমাকে খুশি করতে চায়!' সুচাঁদকে বললেন, 'বেরো—বেরো আমার বাড়ি থেকে।'

সুচাঁদ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, 'আইজ্ঞা—'

উত্তেজিত সুরে হেমনাথ আবার বললেন, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছিস! কেরোসিনের টিন নিয়ে এক্ষুনি চলে যা—'

সুচাঁদ পালিয়ে গেল।

চেঁচামেচি শুনে স্নেহলতারা বেরিয়ে এসেছিলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'কী হল, অত চেঁচামেচি কেন?'

উত্তেজনা যেন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল হেমনাথের, 'ঐ নিত্য দাসের স্পর্ধা দেখেছ!'

'কেন, কী করেছে সে?'

'কী করে নি? রেশনের চিনি-কেরোসিন-কাপড় ব্ল্যাকে দশ গুণ দামে বিক্রি করছে। রাজদিয়া-কেতুগঞ্জ-রসুলপুর, চারদিকের গ্রামগুলোর কোনো লোক ন্যায্য দামে এক দানা চিনি পাচ্ছে না, এক ফোঁটা কেরোসিন পাচ্ছে না, কাপড়ের একটা সুতো পাচ্ছে না। আর রাত্রিবেলা লোক দিয়ে আমাকে ঘুষ পাঠানো হচ্ছে! ওকে আমি পুলিশে দেব, জেলে পাঠাব।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'সুচাঁদ কি কেরোসিন এনেছিল?'

হেমনাথ বললেন, 'এনেছিল। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'তাড়িয়ে তো দিলে, হেরিকেন জ্বলবে কেমন করে?'

'জ্বলবে না। গন্ধকশলা আর রেড়ির তেল দিয়ে কাজ চালাও। তা যদি না পার, অন্ধকারে থাকবে। সারা দেশে আলো নেই, আর তুমি নিজের ঘরে দেয়ালি জ্বালবে—এ হতে পারে না স্নেহ।'

বিনু অভিভূতের মতন হেমনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সিগারেট খাওয়ার জন্য মজিদ মিঞার হাতে সেই যে মার খেয়েছিল, তার পর থেকে শ্যামল আর অশোকের সঙ্গে মেশে না বিনু। হেমনাথ-অবনীমোহন- সুরমা-স্নেহলতা, সবাই ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করে দিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, স্কুল ছুটির পর আর ওদের সঙ্গে বেড়ায় না

বিনু, সোজা বাড়ি চলে আসে।

আজও ফিরছিল সে।

পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতন। বিকেলের নিবুনিবু অনুজ্জ্বল আলো গায়ে মেখে ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাস আর পানিকাউ উড়ছিল। উত্তর আকাশে তুলোর স্তূপের মতন সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘ।

বরফ কল, মাছের আড়ত পেরিয়ে স্টিমারঘাটার কাছে আসতেই কে যেন ডাকল, 'বিনুদা—বিনুদা—'

চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই বিনু দেখতে পেল, জেটির কাছে ঝুমা।

চোখাচোখি হতেই ঝুমা হাতছানি দিল।

প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারল না বিনু। এই বিকেলবেলায় নদীর দিকে থেকে যখন এলোমেলো হাওয়া দিয়েছে, সূর্যটা ডুবুডুবু, রোদের রং বাসি হলুদের যতন, তখন পশ্চিমের ভাসমান মেঘ ফুলে ফুলে পাহাড়ের মতন হয়ে আছে, সেই সময় স্টিমারঘাটার কাছে ঝুমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল। অবাক বিনু দাঁড়িয়েই থাকল।

ঝুমা আবার ডাকল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এস—'

দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বিনু।

স্তূপাকার মালপত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমা। ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বেতের বাস্কেট, কুঁজো, চার-পাঁচটা হোল্ডঅল, টিফিন-কেরিয়ার—কত যে জিনিস, লেখাজোখা নেই। ঝুমারা ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

পলকহীন তাকিয়েই ছিল বিনু। চোখ কুঁচকে ঝুমা বলল, 'একবোরে বোবা হয়ে গেলে যে! আমাকে যেন চিনতেই পারছ না—'

হঠাৎ দেখলে সত্যিই চেনা যায় না। মাথায় অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে ঝুমা। দু'বছর আগে ছিল বালিকা, বড় বড় পা ফেলে কখন সে কৈশোরকে ধরে ফেলেছে, কে বলবে। গায়ের চামড়া এখন টানটান, মসৃণ; তাতে চকচকে আভা ফুটেছে। প্রচুর স্বাস্থ্য মেয়েটার, গায়ের আঁটোসাঁটো জামাটায় ধরতে চায় না।

চোখ এমনিতেই বড়, তার মাঝখানে কালো কুচকুচে মণিদুটো নিয়ত অস্থির, নিয়ত ছটফটে।

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না বিনু। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বিব্রতভাবে বলল, 'না, মানে—'

'মানে আবার কি?'

'অনেকদিন পর তোমাকে দেখলাম কিনা।' একটু সামলে নিয়ে বিনু আবার বলল, 'তুমি একলা এখানে, এই স্টিমারঘাটায়!'

ঝুমা বলল, 'আজই আমরা কলকাতা থেকে এলাম যে—'

'কখন এসেছ?'

'এক্ষুনি এলাম। ঐ দেখছ না স্টিমারটা—'

বিনু তাকিয়ে দেখল, জেটিঘাটের ওপারে রাজহাঁসের মতন সেই স্টিমারটা দাঁড়িয়ে আছে। সেটার মাস্তুলে খয়েরি রঙের শঙ্খচিল। হঠাৎ বিনুর মনে পড়ল ওবেলা স্কুলে আসার সময় স্টিমারটা চোখে পড়ে নি। সে বলল, 'স্টিমার তো সকালবেলা আসার কথা—'

ঝুমা বলল, 'হ্যাঁ, বড্ড দেরি করে এসেছে। পাক্কা দশ ঘণ্টা লেট—'

এবার বিনু ভাল করে লক্ষ্য করল, ঝুমার চুল রুক্ষ, উষ্কখুষ্ক। প্রায় দু'দিন স্টিমার এবং ট্রেনে কাটিয়ে আসার ফলে মুখচোখ মলিন। তারপর একটা কথা খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমাকেই তো শুধু দেখছি, আর সবাই কোথায়?'

'জেটিঘাটের ভেতর। কুলিদের দিয়ে মালপত্তর এনে এনে রাখছে। আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি।

দাদু আর বাবা গেছেন একটা ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করতে। ওঁরা এলেই আমরা বাড়ি যাব।' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল ঝুমার, 'আচ্ছা বিনুদা—'

'কি বলছ?'

'তোমরা তো সেই থেকেই দেশে আছ, আর কলকাতায় যাও নি—তাই না?'

'হ্যাঁ। তোমায় কে বললে?'

'বা রে, কলকাতায় গেলে তুমি বুঝি আমাদের বাড়ি যেতে না? তা ছাড়া—'

'কি?'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুমা এবার বলল, 'তোমরা যে দেশে আছ সে খবর আমরা পেয়েছি।'

'কেমন করে?'

'হাঁদা-গঙ্গারাম, কিছুই জানো না। সুনীতিদি প্রত্যেক সপ্তাহে আমার মামাকে দু'খানা করে চিঠি লেখে। তাতেই জানতে পেরেছি।'

বিনু মনে মনে ভাবল, সত্যিই সে হাঁদা। সুনীতির সব চিঠিই তো সে নিজের হাতে ডাকবাক্সে দিয়ে আসত, অথচ এমন সোজা জিনিসটা তার মাথায় ঢুকল না!

ঝুমা এবার গলা নামিয়ে ফিসফিস করল, 'তোমার দিদি আর আমার মামার ভেতর ব্যাপার আছে, না বিনুদা—' বলে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কেমন করে যেন হাসতে লাগল।

ঝুমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে বিনু। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। দু'বছর আগে মেয়েটা ছিল দুর্দান্ত, ডানপিটে। ভয়-টয় বলে তার কিছুই ছিল না। টের পাওয়া যাচ্ছে, সেই ঝুমা এবার অন্য দিক থেকে পেকে টুসটুসে হয়ে এসেছে।

একটু নীরবতা।

তারপর ঝুমাই আবার ডাকল, 'বিনুদা—'

'কি বলছ?'

'সেই হিংসুটে মেয়েটা এখন কোথায় গো?'

'কার কথা বলছ?'

'ঝিনুক—ঝিনুক—'

বিনু বলল, 'ঝিনুক আমাদের বাড়িতেই আছে।'

ঝুমা ঘাড় বাঁকিয়ে শুধলো, 'সেই তখন থেকে?'

'হ্যাঁ। 'গভীর সহানুভূতির গলায় বিনু বলতে লাগল, 'কোথায় আর যাবে বল। ওর মা তো এখানে নেই—'

'ঝিনুকের মা এখনও আসে নি?'

'না।'

'আর আসবে না মনে হয়।'

'তা-ই শুনোছ।'

একটু কি ভেবে ঝুমা এবার জিজ্ঞেস করল, 'ঝিনুক এখন কত বড় হয়েছে বিনুদা?'

ঝুমার কথায় চকিত হল বিনু। সত্যিই বড় হয়ে উঠেছে ঝিনুক, প্রায় ঝুমার মতনই কিশোরী।

দু বছর হতে চলল—একই বাড়িতে সাতাশের বন্দের ছ'খানা ঘর, ঢালা উঠোন, স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন বাগান, টলটলে পুকুর, পাখিদের অশ্রান্ত কিচির-মিচির আর গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত দিয়ে ঘেরা ছোট্ট মনোরম একটি ভুবনের মাঝখানে তারা পাশাপাশি আছে। অথচ তিল তিল করে কখন যে ঝিনুক বড় হয়ে উঠেছে লক্ষ্যই করে নি বিনু। আজ ঝুমার কথায় আচমকা তা মনে পড়ে গেল।

ঝিনুক যেন শ্বাসবায়ুর মতন। সে কাছেই আছে কিন্তু তার কথা মনেই থাকে না।

বিনু বলল, 'তোমার মতনই বড় হয়েছে।'

'তা হলে তো—' বলে চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে লাগল ঝুমা।

'তা হলে কি?'

ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে ঝুমা বলল, 'দু'জনে বেশ চালাচ্ছ—' কথায় কথায় ভুরু নাচানো মেয়েটার স্বভাব।

কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল বিনুর। আবছা গলায় সে বলল, 'কি যা-তা বলছ!'

ঝুমা আবার কি বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় জেটিঘাটের ভেতর থেকে চার-পাঁচটা কুলির মাথায় বড় বড় স্টিলের ট্রাঙ্ক চাপিয়ে স্মৃতিরেখা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে রুমা আর আনন্দ।

আনন্দও তবে এসেছে!

কাছাকাছি এসে কুলিরা ট্রাঙ্কগুলো নামাল। স্মৃতিরেখা বিনুকে দেখতে পেয়েছিলেন। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বিনু না?'

বিনু বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চিনতেই পারা যায় না। কত বড় হয়ে গেছে!'

লজ্জায় চোখ নামাল বিনু। স্মৃতিরেখা বললেন, 'তুমি এখানে কোত্থেকে এলে?'

বিনু বলল, 'স্কুল থেকে। বাড়ি ফিরছিলাম, ঝুমা ডাকল।'

একটু চুপ করে থেকে স্মৃতিরেখা এবার বললেন, 'বোমার ভয়ে পালিয়ে এলাম। কলকাতায় যে কোনোদিন এখন বোমা পড়তে পারে।'

চোখ মাটির দিকে রেখেই বিনু বলল, 'কলকাতা থেকে অনেক লোক রাজদিয়া চলে এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'কলকাতা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। যে যেদিকে পারছে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সে যাক গে। হ্যাঁ বিনু—'

মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল বিনু।

স্মৃতিরেখা বললেন, 'শুনেছি, তোমরা নাকি সেই থেকেই রাজদিয়ায় আছ—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জমিজমাও কিনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কতটা?'

'তিরিশ কানির মতন।'

'তোমার বাবা বুদ্ধিমানের মতন কাজ করেছেন।'

একটু চুপ।

তারপর স্মৃতিরেখা আবার বললেন, 'বাড়ির সবাই ভাল তো?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এরপর এলোমেলো অসংলগ্ন নানারকম কথা হতে লাগল। যুদ্ধের কথা, জাপানি বোমার কথা, রাজদিয়ার কথা, কলকাতা থেকে আসার সময় ট্রেনে-স্টিমারে অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্টের কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একসময় শিশির আর রামকেশব ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ফিরে এলেন। দেখেই বিনু চিনতে পারল, গাড়িটা ঝিনুকদের। শিশিররা তা হলে ঝিনুকদের ফিটন চেয়ে আনতে গিয়েছিল।

কুলিগুলো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রামকেশব তাড়া লাগালেন, 'মাল তুলে ফেল—'

বাক্সপ্যাঁটরা তোলা হলে কুলিরা ভাড়া নিয়ে চলে গেল। রামকেশব বললেন, 'সবাই গাড়িতে ওঠ।'

স্মৃতিরেখা বিনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের বাড়ি যাবে নাকি ? চল না—'

ঝুমাও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'চল, চল—' আগ্রহে তার চোখ চকচক করতে লাগল।

যাবার খুব যে একটা অনিচ্ছা ছিল তা নয়। হয়তো যেতও বিনু কিন্তু পরক্ষণে সেই নিষেধাজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল। আজকাল স্কুল ছুটির পর আর এক মুহূর্তেও বাইরে থাকার উপায় নেই। মজিদ মিঞা তার কি সর্বনাশটাই না করেছে! একটু ভেবে বিনু বলল, 'এইমাত্র আপনারা এলেন। আজ বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন। আমি পরে যাব।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'সেই ভাল। ট্রেনে-স্টিমারে দু'দিন যা ধকল গেছে! এখন চান করে একটু শুতে পেলে বাঁচি। তোমাকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে কথাই বলতে পারব না। পরে আসবে কিন্তু—'

'আসব।'

ঝুমা বলল, 'কালই এস—'

বিনু হাসল।

স্মৃতিরেখা আর কিছু না বলে ফিটনে উঠলেন। তাঁর পিছু পিছু শিশির, রুমা আর রামকেশবও উঠলেন।

উঠতে উঠতে রামকেশব বিনুকে বললেন, 'হেমদাদা আর বৌঠাকরুণকে বলিস, কলকাতা থেকে শিশিররা আজ এসেছে।'

বিনু ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'বলব।'

আনন্দ আর ঝুমা এখনও নিচে দাঁড়িয়ে। সবার কান বাঁচিয়ে নীচু চাপা গলায় আনন্দ বলল, 'বাড়িতে আমার কথাও বোলো।'

ঝুমাটা কাছেই আছে, তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি। চোখ কুঁচকে ঠোঁট ছুঁচলো করে সে বলল, 'কার কাছে বলবে মামা ? সুনীতিদির কাছে ?'

'তুই ভীষণ ফাজিল হয়েছিস।' আলতো করে ঝুমার মাথায় চাঁটি কষিয়ে দিল আনন্দ।

নাকের ভেতর থেকে কপট কান্নার শব্দ করতে লাগল ঝুমা, 'উঁ-উঁ-উঁ—'

'আর বাঁদরামো করতে হবে না। গাড়িতে ওঠ—' দু'জনে ফিটনে উঠে দরজা বন্ধ করল।

সঙ্গে সঙ্গে রামকেশব চেঁচিয়ে বললেন, 'গাড়ি চালা রে রসুল—' ঝিনুকদের কোচোয়ানটার নাম রসুল।

ফিটন চলতে শুরু করল। জানালার বাইরে মুখ বার করে হাত নাড়তে লাগল ঝুমা। যতক্ষণ দেখা যায়, নদীর পারে স্টিমারঘাটায় দাঁড়িয়ে থাকল বিনু।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আজ সন্ধে হয়ে এল। পুকুরের ওপারে ধানের খেত এর মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে। আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে, সেই জায়গাটা নিরাকার, অস্পষ্ট। বাগানের একোণে-ওকোণে থোকা থোকা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। সোনাল আর পিঠক্ষীরা ঝোপের ভেতর জোনাকিদের নাচানাচি শুরু হয়ে গেছে।

স্টিমারঘাটায় যে সূর্যটা ছিল ডুবু-ডুবু, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ জুড়ে যুঁই ফুলের মতন অগণিত তারা ফুটতে শুরু করেছে।

উঠোনে পা দিতেই সুরমা ছুটে এলেন, 'তোর তো লজ্জা নেই বিনু। সেদিন যে মজিদ মিঞা অত করে মারল, এর মধ্যেই ভুলে গেলি!'

স্নেহলতা, সুধা-সুনীতি, শিবানী, ঝিনুক, সবাই একধারে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব তার ফেরার জন্য ওরা উঠোনে অপেক্ষা করছিল। অবনীমোহন আর হেমনাথকে অবশ্য দেখা গেল না।

স্নেহলতা বললেন, 'গায়ের ব্যথাও মরল, আবার যে কে সে-ই হয়ে দাঁড়ালি!'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমরা যা ভাবছ তা নয় দিদা—'

সুধা এই সময় গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ভেংচি কাটার মতন মুখ করে বলল, 'তোমরা যা ভাবছ তা নয় দিদা! নিশ্চয়ই তা-ই। আবার ঐ বাঁদরগুলোর সঙ্গে মিলিটারি ব্যারাকে গিয়ে ভিখিরিদের মতন চকলেট চাইছিলি, সিগারেট খাচ্ছিলি? দাঁড়া, আজই মজিদ মামাকে খবর পাঠাচ্ছি। চ্যালা কাঠ দিয়ে যাতে—'

সুধার কথা শেষ হল না, তার আগেই বিনু ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিমেষে দেখা গেল সুধার চুলের গোছা বিনুর মুঠোয়। সুধাও ছাড়ে নি, দু'হাতের দশটা নখ বিনুর গালে বসিয়ে দিয়ে ধরে আছে।

চেঁচামেচি এবং টানাটানি করে স্নেহলতারা দু'জনকে ছাড়িয়ে দিলেন।

যে সুনীতি চিরদিনই ধীর স্থির শান্ত, হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল তার। ছুটে এসে বিনুর গালে এক চড় কষিয়ে দিল। চোখ পাকিয়ে বলল, 'অন্যায়ও করবে আবার লোকের গায়ে হাতও তুলবে। দিন দিন তোমার আস্পর্ধা বেড়েই চলেছে। খুনী কোথাকার—'

দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে বিনু বলল, 'আমি অন্যায় করি নি।' চড় খেয়ে তার চোখ টসটস করছে। মনে হচ্ছে সে দুটো বুঝি ফেটেই যাবে।

সুরমা বললেন, 'অন্যায় করিস নি তো এতক্ষণ ছিলি কোথায়? তোকে না বলে দেওয়া হয়েছে স্কুল ছুটির পর এক মিনিটও বাইরে থাকবি না। আবার সন্ধে করে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছ!'

বিনু বলল, 'স্কুল ছুটির পর আমি তো আসছিলামই। স্টিমারঘাটার কাছে ঝুমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'কোন ঝুমা?'

'ঐ যে রামকেশবদাদুর নাতনী—'

স্নেহলতা বললেন, 'ওরা এসেছে নাকি?'

বিনু বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, আজই বিকেলবেলা এসেছে। স্টিমারঘাটায় নেমেই আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা আটকাল; কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।'

সুধাটা চিরকালের ঘরশত্রু। সে হঠাৎ বলল, 'গোয়ালন্দের স্টিমার তো আসে সকালে। বিকেলবেলা এসেছে কিরকম?'

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল বিনু, 'বিশ্বাস না হয় ঝুমাদের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় না রাক্ষুসী।'

আবার একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দু'জনকে থামিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ঝুমাদের জন্যে দেরি হয়েছে, সে কথা বলবি তো। কি বোকা ছেলে তুই! শুধু শুধু মার খেলি।'

অভিমানের গলায় বিনু বলল, 'তোমরা আমাকে বলতে দিলে কোথায়?'

বিনুর একখানা হাত ধরে স্নেহের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'চল, হাত-মুখ ধুয়ে খাবি। সেই কখন চাট্টি খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলি।'

খেয়েটেয়ে বিনু পড়তে বসল, বেশ রাত হয়ে গেছে। ধানখেত, পুকুর, সুদূর বনানী, গাছপালা—সব কিছুই এখন গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত।

সুধা-সুনীতি আর ঝিনুক আগেই পড়তে বসেছিল।

এ বাড়িতে আজকাল আর কেরোসিন ঢোকে না, হেমনাথের বারণ। সারা দেশ যখন অন্ধকারে ডুবে আছে তখন নিজের ঘরে তিনি দেয়ালি জ্বালাতে চান না। তা ছাড়া নিত্য দাসের ওপর তিনি এতই অসন্তুষ্ট যে তার দোকানের একটা কুটোও বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না।

কেরোসিন আসে না, এ বাড়িতে আজকাল রেড়ির তেল জ্বলে।

এই মুহূর্তে পুবের ঘরের এক কোণে দুটো আড়াইতলা কাঠের পিলসুজে প্রদীপ জ্বলছে। রেড়ির তেলের নিরুত্তেজ আলোয় চারধার স্নিগ্ধ। বিনুরা তিন ভাই-বোন আর ঝিনুক সুর করে পড়ে যাচ্ছিল।

বিনুর ডান পাশে বসেছে সুনীতি। তারপর সুধা এবং ঝিনুক।

পড়তে পড়তে মুখ তুলে সুনীতি একবার বিনুকে দেখে নিল। তারপর আবার বাইরের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ পর আবার বিনুকে দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে বই নাড়াচাড়া করতে লাগল।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর খুব আস্তে গলার ভেতর থেকে সুনীতি ডাকল, 'বিনু—'

বিনু শুনেও শুনল না, গলা চড়িয়ে পড়তে লাগল।

ফের ডাকল সুনীতি।

এবার বিরক্ত, অপ্রসন্ন চোখে তাকাল বিনু।

সুনীতি বলল, 'খুব পড়া দেখাচ্ছিস, না ?' বলে হাসল।

বিনু কিছু বলল না, চোখ কুঁচকেই থাকল।

সুনীতি এবার কোমল গলায় বলল, 'গালে খুব লেগেছিল, না রে ?'

মুখ বাঁকিয়ে বিনু বলল, 'না, লাগবে না !'

'সত্যি, আর মারব না। হঠাৎ এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল।' বিনুর মাথায় হাত বুলোতে লাগল সুনীতি।

এক ঝটকায় সুনীতির হাতটা সরিয়ে দিল বিনু, 'মারবার সময় মনে ছিল না ? এখন আদর ফলানো হচ্ছে।'

সুনীতি আবার বিনুর মাথায় হাত রাখল। খোসামোদের গলায় বলল, 'জীবনে আর কক্ষনো তোর গায়ে হাত তুলব না। মা কালীর দিব্যি। আর—'

'আর কি ?'

'তোকে একটা জিনিস দেব।'

'কী জিনিস ?'

'দুটো টাকা।'

বিনু এবার নরম হল। একটু ভেবে বলল, 'কখন দেবে ?'

'আজকেই।'

'ঠিক ?'

'ঠিক।'

একটু চুপ করে থেকে সুনীতি গলার স্বর আরো নামিয়ে দিল, 'অ্যাই—'

'কি বলছ ?'

'ঝুমারা কে কে এসেছে রে ?'

'ঝুমা রুমাদি শিশিরমামী আর—'

নিশ্বাস বন্ধ করে পলকহীন তাকিয়ে ছিল সুনীতি। চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'আর কে ?'

বিনুর চোখ চিকচিক করতে লাগল। সে বলল, 'যার কথা শুনবার জন্যে দম বন্ধ করে আছ—সে। আনন্দদাও এসেছে।'

'আহা, দম বন্ধ করে থাকবার আর লোক পেলাম না !' বলেই বইয়ের ওপর ঝুঁকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল সুনীতি।

বিনু বলল, 'আমার টাকা দাও—'

'দেব'খন।'

'ও, কাজের বেলায় আঁটিসুটি, কাজ ফুরোলে দাঁত কপাটি। টাকা না দিলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে

যাবে।'

কিছুক্ষণ পড়াশোনার পর বিনু হঠাৎ শুনতে পেল, নীচু গলায় সুধা সুনীতিকে বলছে, 'তোর মনস্কামনা পূর্ণ হল তো দিদি—'

সুনীতি বলল, 'কিসের আবার মনস্কামনা?'

উত্তর না দিয়ে সুধা রগড়ের গলায় বলল, 'আনন্দদার খবর জানবার জন্যে নগদ দুটো টাকা খরচ করতে হবে দিদিভাই।'

সুনীতি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আহা—হা—'

একসময় খাবার ডাক পড়ল।

বইটই গুছিয়ে প্রথমে সুধা-সুনীতি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পুবের ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে উঠোন। সুধা-সুনীতির পর বিনু আর ঝিনুক খেতে গেল।

অন্ধকারে যেতে যেতে হঠাৎ ঝিনুক বলল, 'তোমার তো এখন ভারি মজা, না বিনুদা?'

বিনু বলল, 'কেন?'

'ঝুমা এসেছে।'

বিনু কিছু বলল না, উঠোনের ওপর দিয়ে যেতে যেতে ঝিনুকের কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল শুধু।

দিন দুই পর ছিল রবিবার। দুপুরবেলা বিনুরা সবে খেয়েদেয়ে উঠেছে, সেই সময় ঝুমা আর আনন্দ এসে হাজির।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িময় সাড়া পড়ে গেল। সুরমা-শিবানী-হেমনাথ-অবনীমোহন সবাই ছুটে এলেন।

আনন্দ বলল, 'কলকাতা থেকে আমরা বেস্পতিবার এসেছি।' বলে হাসল, তার হাসিটা কেমন যেন লজ্জার রঙে ছোপানো।

সুরমা বললেন, 'বিনুর কাছে সেদিনই আমরা খবর পেয়ে গেছি।'

'বিনুর সঙ্গে স্টিমারঘাটে আমাদের দেখা হয়েছিল।'

স্নেহলতা বললেন, 'উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা নয়। চল, ঘরে চল—' ঝুমাদের হাত ধরে তিনি এনে বসালেন। অন্য সবাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

ঘরে এসে আনন্দ বলল, 'জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে লোক পালাবার হিড়িক পড়েছে। চারদিক এখন ফাঁকা। আমার বাবা মা, ভাই-বোনেরা মধুপুরে চলে গেছে—'

সুরমা শুধোলেন, 'মধুপুরে কে আছে?'

'কেউ নেই। আমাদের একটা বাড়ি আছে, একজন মালী দেখাশোনা করে।'

'কলকাতায় একখানা বাড়ি আছে না তোমাদের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আগের বার সুযোগ হয়নি। এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জেনে নিলেন সুরমা। আনন্দর বাবা অ্যাডভোকেট, দুই দাদা বড় সরকারি চাকুরে। ছোট ভাইটা বি. এ. পড়ছে। বড় বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট যে বোন দুটো রয়েছে তারা এখন ছাত্রী। বাকি রইল আনন্দ নিজে। আগেই এম. এ

আর ল'ট্যা পাশ করেছিল। কিছুদিন হল, বাবার সঙ্গে কোর্টে যেতে শুরু করেছে। আশা, বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই সে দাঁড়িয়ে যাবে। অ্যাডভোকেট হিসেবে বাবার বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি আনন্দকে অনেকখানি এগিয়ে দেবেই। দু'চার বছর বাবার সঙ্গে বেরুতে পারলে সাফল্যের চাবিকাঠিটার সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবে যুদ্ধটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা না থামলে কিছুই হবে না।

সুরমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল আনন্দ, 'জাপানি বোমার ভয়ে আমাদের বাড়ির সবাই গেল মধুপুর। দিদি-জামাইবাবু আমাকে কিছুতেই ছাড়লেন না, টানতে টানতে রাজদিয়ায় নিয়ে এলেন।'

কৌতুকের গলায় হেমনাথ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'রাজদিয়ায় আসতে তোমার বুঝি একটুও ইচ্ছা ছিল না?' বলে চোখের মণি দুটো কোণে এনে আড়ে আড়ে সুনীতির দিকে তাকালেন।

বিনু লক্ষ্য করেছে, এতক্ষণ একদৃষ্টে আনন্দের দিকে তাকিয়ে ছিল সুনীতি। তার চোখমুখে ঢেউয়ের মতন কি খেলে যাচ্ছিল। হেমনাথ তাকাতেই দ্রুত মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

এদিকে আনন্দ থতমত খেয়ে গিয়েছিল, 'না—মানে, দু বছর আগে যখন এসেছিলাম রাজদিয়া আমার খুব ভাল লেগেছিল। তাই—'

বাধা দিয়ে হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তুমি আর যাই হও, উৎকৃষ্ট উকিল হতে পারবে না—' বলে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, 'নিজের কেসটা পর্যন্ত ভাল করে সাজাতে পার না!'

অপলক তাকিয়ে থেকে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল আনন্দ, তারপর হেমনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হেসে উঠল।

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'এবার বন্দুক-টন্দুক এনেছ তো? তোমার যা শিকারের নেশা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরো এক বাক্স কার্তুজও এনেছি।'

স্নেহলতা বললেন, 'রাজদিয়ার জন্তু-জানোয়ার আর পাখিদের দেখছি বড়ই দুর্দিন।'

প্রগলভতার ঈশ্বর আজ বুঝি হেমনাথের কাঁধে ভর করে বসেছে। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রগড়ের সুরে আনন্দকে বললেন, 'তুমি কী ধরনের শিকারী তা আমার জানা আছে। নিশানার এক শ' হাত দূর দিয়ে গুলি চলে যায়। অবশ্য—'

আনন্দ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'এক জায়গায় তীর ঠিক বিঁধিয়েছ। সেখানে নিশানা ভুল হয় নি—' বলে চোরা চোখে সুনীতিকে বিদ্ধ করলেন।

সুনীতি সেই যে মুখ নামিয়েছিল, আর তোলে নি। সমানে নখ খুঁটেই চলেছে।

হকচকিয়ে আনন্দ কি বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বিনুর মনে হল কাঁধের কাছে কেউ মৃদু টোকা দিচ্ছে। মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেল, ঝুমা।

চোখে চোখ পড়তেই ঝুমা বলল, 'চল—'

'কোথায়?'

'তোমাদের বাগানে বেড়াই গে। এখানে বসে বসে বড়দের কথা শুনে কি হবে? তার চাইতে আমরা গল্প করব।'

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'চল—'

দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে এল।

হেমনাথের বাড়ির নকশা-করা টিনের চালগুলোতে রোদ ঝলকে যাচ্ছে। পুকুরে, দূর ধানখেতে, গাছপালার মাথায় কিংবা আকাশ জুড়ে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, রোদের ছড়াছড়ি। কিন্তু বাগানের ভেতরটা বড় ছায়াচ্ছন্ন, নিঝুম, মায়ের কোলের মতন ঠান্ডা। এখানে এলেই যেন ঘুমে চোখ জুড়ে

যায়।

মৌটুসকি আর হলদিবনা পাখিগুলো ঘন জামরুল পাতার ভেতর বসে বসে খুনসুটি করছিল। চোখ-উদানে ঝোপের জঙ্গলে ঝাঁকে ঝাঁকে সোনাপোকা উড়ছে। বড় বড় ঘাসের মাথায় সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িং ঢ্যাঙা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কতকগুলো বহুরূপী গিরগিটি অকারণেই ছোটাছুটি করছে। আর শোনা যাচ্ছিল ঝিঁঝির ডাক। কোন পাতাল থেকে তাদের বিলাপ উঠে আসছে কে বলবে।

মুত্রাঝোপের পাশে, কাঁটাবেতের বনের ধারে কিংবা আম-জাম-বাতাবী লেবু গাছের তলায় তলায় বিনুরা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। কিন্তু একটা জায়গাও মনঃপূত হল না।

শেষ পর্যন্ত ঝুমা বলল, 'চল, পুকুরঘাটে গিয়ে বসি—'

বিনু তক্ষুনি সায় দিল, 'চল—'

পুকুরঘাটটা নারকেল গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো। বসতে গিয়েই ঝুমার চোখে পড়ল, ডান ধারে সরু পিঠক্ষীরা গাছটার গায়ে একটা ছোট একমাল্লাই নৌকো বাঁধা রয়েছে।

ঝুমা তাড়াতাড়ি মত বদলে ফেলল, 'এখানে বসব না।'

'তা হলে কোথায় বসবে ?'

'নৌকোয় চড়ব।'

'নৌকোর নামে বিনুও উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'সেই ভাল। এস—'

দু'জন পিঠক্ষীরা গাছটার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথম ঝুমাকে নৌকোয় তুলল বিনু, তারপর নিজে উঠে বাঁধন খুলে বৈঠা হাতে গুলুইর কাছে বসল।

ঝুমা বলল, 'সেবার তুমি আর আমি নৌকোয় করে অথৈ জলে চলে গিয়েছিলাম, মনে আছে বিনুদা ?'

'হুঁ—' বলেই বৈঠার খোঁচায় নৌকোটাকে মাঝ-পুকুরে নিয়ে এল বিনু।

'সেবার কিন্তু আমরা নৌকো বাইতে জানতাম না। কি কষ্টে যে পুকুর পার হয়ে ঐ ধানখেতের দিকে গিয়েছিলাম !'

'এবার আর কষ্ট হবে না। আমি নৌকো বাওয়া শিখে গেছি।

সেবারের মতন এবারও চারদিকে শুধু জল। পুকুরের ওপারে ধানখেত, মাঠ—সব একাকার। মাঠের মাঝখানে হিজল আর বউন্যা গাছগুলোর বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে। হিজলের যে ডালগুলো জলের ওপরে, ফুলে ফুলে সেগুলো ছাওয়া। আর বউন্যা গাছের ডাল থেকে শক্ত শক্ত অসংখ্য গোলাকার ফল ঝুলছে। ধানখেত বাদ দিলে যে মাঠ, সেখানে শুধু শাপলা শালুক আর পদ্মবন।

পুকুর ধানখেত পার হয়ে একসময় শাপলাবনে এসে পড়ল বিনুরা।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়তে ঝুমা বলে উঠল, 'তোমাকে তো নিয়ে এলাম। সেবারের মতন আবার কান্ড করে বসবে না ?'

'কিসের কান্ড ?'

'কাউফল পাড়তে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলে, মনে পড়ে ?'

বিনু বলল, 'এখন আর ডুবব না, সাঁতার শিখে গেছি।'

চোখের তারা স্থির করে ঝুমা বলল, 'বাব্বা, তুমি দেখছি অনেক কিছু শিখে গেছ! নৌকো বাইতে শিখেছ, সাঁতার কাটতে শিখেছ—'

'বা রে, আমি বড় হয়েছি না।'

'বড় হয়েছ!' বলে নৌকোর মাঝখান থেকে অনেক কাছে চলে এল ঝুমা। তারপর মাথা ঘুরিয়ে এদিক থেকে ওদিকে থেকে মিটমিটি দুষ্টুমির চোখে বিনুকে দেখতে লাগল।

বিব্রত মুখে বিনু বলল, 'কি দেখছ?'

'সত্যিই তো বড় হয়ে গেছ। ঠোঁটের ওপর গোঁফ উঠছে—'

বিনু লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল।

ঝুমা আবার বলল, 'বড় তো হয়েছ, সিগারেট খাও?'

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে যে স্মৃতিটা জড়ানো তা খুব মনোরম নয়। বিনু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানাল, সে সিগারেট খায় না।

ঈষৎ ধিক্কারের গলায় ঝুমা বলল, 'সিগারেট খাও না, কি বড় হয়েছ!'

বিনু চুপ।

কিছুক্ষণ পর ঝুমা শুধলো, 'সেই কাউগাছটা এখনও আছে বিনুদা?'

বিনু বলল, 'আছে।'

'চল, কাউ পাড়ি গে—'

'কাউ এখনও পাকে নি। কাঁচা কাউ পেড়ে কি হবে?'

'তা হলে থাক। শাপলাই তুলি।'

নৌকোর ধারে গিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে কাচের মতন টলটলে জল থেকে শাপলা তুলতে তুলতে ঝুমা বলল, 'আচ্ছা বিনুদা—'

বিনু তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কি বলছ?'

'মনে পড়ে, সেবার রাত্রিবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম—'

'হুঁ।'

'ঝিনুকটার কি হিংসে, আগে থেকে নৌকোয় উঠে বসে ছিল—'

'হুঁ।'

'আমরা কলকাতায় চলে যাবার পর তুমি আর যাত্রা দেখেছ?'

'না।'

'কেন?'

'কে দেখাবে বল?'

'কেন, যুগল?'

'যুগল তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'বিয়ের পর ভাটির দেশে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।'

'ও মা, তাই নাকি। আর ফিরবে না?'

'না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ঝুমাই আবার শুরু করল, 'জানো বিনুদা—'

'কি?'

'কলকাতায় যাবার পর তোমার কথা খালি মনে পড়ত।'

'আমারও।'

'ছাই।' ঠোঁট উল্টে দিল ঝুমা।

বিনু বলল, 'বিশ্বাস কর, সত্যি মনে পড়ত।'

'রোজ ভাবতাম, আমাদের বাড়ি আসবে।'

'কি করে যাব বল। আমরা তো রাজদিয়ায় থেকে গেলাম, কলকাতায় যাওয়া হল না।'

ঝুমা বলল, 'যাওয়া না হয় না-ই হয়েছিল, চিঠি লিখলেও তো পারতে।'

বিমূঢ়ের মতন বিনু বলল, 'চিঠি লিখব!'

'হ্যাঁ, জানো না 'লাভার'রা চিঠি লেখে। তোমার দিদি আর আমার মামা ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি লিখত।'

'লাভার' শব্দটার মানে বিনুর অজানা নয়। তবু সে জিজ্ঞেস করল, 'লাভার কী?'

'আহা-হা। তুমি একটি গর্দভচন্দ্র শিকদার—' লাজুক হেসে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ঝুমা বলল, 'যাদের মধ্যে ভাব থাকে তাদের লাভার বলে।'

ফস করে বিনু বলে ফেলল, 'আমি কি তোমার—' শেষ শব্দটা গলায় ভেতর থেকে কিছুতেই বার করে আনতে পারল না সে।

ঘাড় বাঁকিয়ে কেমন করে যেন হাসল ঝুমা, 'তুমি আমার কী?'

বিনু কিছু বলতে পারল না, ঝুমার দিকে তাকিয়েও থাকতে পারল না। মুখ নামিয়ে এলোমেলো নৌকো বাইতে লাগল।

এরপর কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। শাপলা আর বড় বড় পদ্মপাতা তুলে তুলে নৌকো বোঝাই করে ফেলতে লাগল ঝুমা, আর বিনু লক্ষ্যহীনের মতন কখনও উত্তরে কখনও দক্ষিণে নৌকোটা ছুটিয়ে বেড়াতে লাগল।

একসময় ঝুমা ডাকল, 'বিনুদা—'

'কী বলছ?' এক পলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল বিনু।

'কলকাতা থেকে আসবার আগের দিন একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম—'

'কী সিনেমা?'

'ফাইটের। খুব লড়াই ছিল। আর—'

আর কি?'

ঠোঁট টিপে টিপে চোখের তারায় হাসতে লাগল ঝুমা, 'এখন বলব না।'

বিনু শুধলো, 'কখন বলবে?'

'একদিনে সব শুনতে চাও নাকি? কাল স্কুল ছুটির পর আমাদের বাড়ি যেও, তখন বলব।'

সেবার ঝুমা ছিল দুরন্ত, দুর্দান্ত, দুঃসাহসী। দু বছর পর কলকাতা থেকে অসীম রহস্যময়ী হয়ে ফিরে এসেছে মেয়েটা।

একটু ভেবে বিনু বলল, 'স্কুল ছুটির পর দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা বকে—'

ঝুমা বলল, 'আমি মাসিমাকে বলব'খন।'

'আচ্ছা।'

নৌকোয় ওঠার পর থেকে কত কথা যে বলেছে ঝুমা। অনেক সময় এক কথার সঙ্গে আরেক কথার মিল ছিল না। তবু এই অসংখ্য অসংলগ্ন কথা, ঝুমার হাসি, চোখের তারায় অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত—সব মিলেমিশে বিনুকে হাতছানি দিয়ে দিয়ে এক অচেনা রহস্যের দিকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

আদিগন্ত এই মাঠের ভেতর শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে ধানখেত, নলখাগড়ার ঝোপ, মুত্রার জঙ্গল, শাপলাবন, শালুকবন, পদ্মবন, কদাচিৎ দু-চারটি বউন্যা কি হিজল গাছ ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। এই নির্জন জলমগ্ন চরাচরে নিঝুম দুপুরবেলায় ঝুমাকে বড় ভাল লাগছে। আবার কেমন যেন ভয়ও করছে বিনুর। বুকের ভেতর ছোট ছোট ঢেউয়ের মতন কি যেন বয়ে যাচ্ছে তার।

রোদের রং যখন গাঁদাফুলের মতন হলুদ হয়ে এল সেই সময় ঝুমা বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার ফিরবে না?'

বিনু বলল, 'হ্যাঁ।'

পুকুরঘাটে ফিরে এসে বিনু অবাক। জলে পা ডুবিয়ে নারকেল গুঁড়ির সিঁড়িতে একা একা বসে

আছে ঝিনুক।

সেই পিঠক্ষীরা গাছটার গায়ে নৌকো বাঁধতেই প্রথমে লাফ দিয়ে পাড়ে নামল ঝুমা, তারপর বিনু। নেমেই বিনু ঝিনুককে শুধলো, 'এখানে বসে আছে যে?'

আধফোটা গলায় ঝিনুক বলল, 'এমনি।'

'কখন থেকে বসে আছ?'

'অনেকক্ষণ। তোমরা যখন নৌকোয় করে ধানখেতের ভেতর ঢুকলে সেই তখন থেকে—'

বিনুর একবার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করে, তাদের পিছু পিছু কি ঘর থেকে পুকুরঘাট পর্যন্ত চলে এসেছিল ঝিনুক? কি ভেবে করল না। বিনুর মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে রইল।

বাড়িতে এসে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না ঝুমা। একটু পর তাকে নিয়ে আনন্দ চলে গেল।

যাবার আগে অবশ্য ঝুমা সুরমাকে বলে গেছে, 'স্কুল ছুটির পর বিনুদা কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি যাবে মাসিমা। আপনি বকতে পারবেন না।'

সরল মনে সুরমা বলেছেন, 'তোমাদের বাড়ি গেলে বকব কেন? নিশ্চয়ই যাবে।'

বিনু লক্ষ্য করেছে, সেইসময় একবার তার দিকে আরেক বার ঝুমার দিকে তাকাচ্ছিল ঝিনুক। কি যেন খুঁজবার চেষ্টা করছিল সে।

পরের দিন স্কুল ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি গেল বিনু।

তাকে দেখেই চোখের কোণে হেসে ফেলল ঝুমা, 'এক্কেবারে গুড বয়। আজ আসতে বলেছি, আজই এসেছ—'

খানিকক্ষণ এ-গল্প সে-গল্প পর ঝুমাকে একলা পেয়ে বিনু বলল, 'এবার সিনেমার কথাটা বল।'

'ও বাবা, ছেলের আর তর সয় না।'

কিছুতেই সিনেমার কথাটা সেদিন বলল না ঝুমা।

সেদিন কেন, আরো দিনকয়েক বিনুকে ঘোরাল ঝুমা। তারপর একদিন বিকেলবেলা বিনু ওদের বাড়ি যেতেই তাকে ছাদে নিয়ে গেল। কার্নিসের ধারে নিরালা একটু কোণ দেখে তারা দাঁড়াল।

দূরে স্টিমারঘাটা আর বরফকলের চূড়োটা চোখে পড়ছে। ডানধারে ঝাউবনের ওপারে সারি সারি মিলিটারি ব্যারাক। ব্যারাকের ওধারে বিকেলের রোদ গায়ে মেখে নদীর ঢেউগুলো টলমল করছে। মোচার খোলার মতন কেরায়া আর ভাউলে নৌকোগুলো দুলছে। ছেঁড়া রঙিন পাপড়ির মতন আকাশে ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছে।

বিনু বলল, 'এখন বল—'

ভুরু দুটো বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঝুমা বলল, 'শুনবার জন্যে ঘুম হচ্ছিল না বুঝি?'

এবার প্রথম দু-একদিন মুখচোরার মতন ছিল বিনু, এখন সাহস বেড়ে গেছে। সে বলল, 'হচ্ছিলই না তো—'

একটু চুপ করে থেকে ঝুমা বলল, 'সিনেমাটায় কী ছিল জানো—' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে খিলখিল করে হেসে উঠল।

'হাসছ কেন, বল—'

অনেকক্ষণ হাসার পর স্থির হল ঝুমা। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিসফিস গলায় বলতে লাগল, 'সিনেমায় একটা সাহেব একটা মেমসাহেবকে খুব কিস খাচ্ছিল—'

নাক-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল বিনুর। অবিশ্বাসের গলায় সে বলল, 'যাঃ—'

'সত্যি বিনুদা, মা কালীর দিব্যি।'

খানিক চিন্তা করে বিনু বলল, 'সাহেবটার কত বয়েস?'

'সাতাশ আটাশ—'

'আর মেমটার?'

'বাইশ তেইশ!'

'এত বড় ছেলেমেয়ে কখনো 'কিস' খায়!'

মুখ ফিরিয়ে ঝুমা বলল, 'তুমি একটা হাঁদারাম, কিচ্ছু জানো না। লাভার হলেই কিস খায়। এই যে আমার দিদি—'

বিনু শুধলো, 'তোমার দিদি কি?'

'কলকাতায় দিদির এক লাভার আছে—অনিমেষদা। আমাদের বাড়ি এলেই দু'জনে ছাদে চলে যেত। তারপর খুব কিস খেত।'

সমস্ত শরীর কেমন যেন জ্বরের মতন লাগছিল। ঝাপসা কাঁপা গলায় বিনু বলল, 'সত্যি!'

'সত্যি।'

তারপর কি হয়ে গেল, কে বলবে। সময় যেন কিছুক্ষণ তার গতি হারিয়ে এই নির্জন ছাদে স্তব্ধ হয়ে রইল। বিনুর যখন জ্ঞান ফিরল, দেখতে গেল, বুকের ভেতর ঝুমা চোখ বুজে আছে। চকিত বিনু এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়িঘরের দিকে ছুটল। তরতর করে নিচে নেমে রাজদিয়ার রাস্তা দিয়ে আচ্ছন্নের মতন দৌড়তে লাগল। তার চারধারে চরাচর যেন দুলতে শুরু করেছে।

বিনু জানে না, একটু আগে ঝুমা তার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনের সিংদরজায় পৌঁছে দিয়েছে।

স্কুলের ছুটি হলে আজকাল আর কোনো দিকে তাকায় না বিনু, সম্মোহিতের মতন নেশাগ্রস্তের মতন ঝুমাদের বাড়ি চলে যায়। এই সময়টার জন্য সারাদিন অস্থির, উন্মুখ হয়ে থাকে সে।

অশোকের কাছে জীবনের রহস্যময় একটা কথা কিছু কিছু শুনেছিল বিনু। কিন্তু সে সব ভাসা-ভাসা, মৌখিক। ঝুমা যেন একটানে চারদিকের সব পর্দা ছিঁড়ে সেই রহস্যটাকে তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন স্কুল ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি এসে বিনু অবাক, ঝিনুক বসে আছে।

বিনু শুধলো, 'তুমি!'

ঝিনুক বলল, 'সুধাদিদি সুনীতিদিদির ছুটি হতে আজ অনেক দেরি হবে। কতক্ষণ আর স্কুলে বসে থাকব? তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।'

স্কুল ছুটির পর ঝিনুক তার ক্লাসে বসে থাকে। কলেজ থেকে ফেরার পথে সুধা-সুনীতি তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। দু বছর এই নিয়মেই কেটেছে। আগেও তো সুধা-সুনীতি কত দেরি করে তাকে বাড়ি নিয়ে গেছে। এতকাল পর হঠাৎ বিনুর সঙ্গে বাড়ি ফেরার কেন যে দরকার হল ঝিনুকের, কে বলবে।

আজ আর ঝুমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারল না বিনু। একটু পর ঝিনুককে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আশ্চর্য! পরের দিনও ছুটির পর দেখা গেল ঝুমাদের বাড়ি এসে বসে আছে ঝিনুক। তারপরে দিনও সেই ব্যাপার।

দু-চারদিন দেখে ঝিনুকের চাতুরি ধরে ফেলল বিনু। এখন আর ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি যায় না সে, স্কুল কামাই করে দুপুরবেলা ঝুমাদের বাড়ি যেতে লাগল।

ঝিনুকের সাধ্য কি ঝুমার কাছ থেকে বিনুকে ফেরায়।

কিছুদিন ধরেই খবরের কাগজে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, ঝড় আসছে।

পরাধীন দেশের আত্মা অপমানে অত্যাচারে টগবগ করে ফুটছিল। টের পাওয়া যাচ্ছিল, যে কোনোদিন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

কিছুদিন আগে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। তারপর কয়েকটা মাস সমস্ত ভারতবর্ষ যেন রুদ্ধশ্বাসে অনিবার্য কোনো পরিণামের প্রতীক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই দিনটি এসে গেল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে গান্ধীজি আগেই 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি সেটা একটা প্রস্তাবে রূপ দেয়।

আটই আগস্ট বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

এই সময় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন, 'এই আন্দোলনে আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছি। অধিনায়ক হিসেবে নয়, আপনাদের সকলের ভৃত্য হিসেবে।' তারপরেই সমস্ত জাতির উদ্দেশ্যে ডাক দিলেন, 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়—কুইট ইন্ডিয়া—'

সারা দেশে যেখানে যত বিক্ষোভ, যত বেদনা, যত অসম্মান পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল, সব এক নিমেষে দৃপ্ত অগ্নিশিখা হয়ে উঠল যেন। আর সেই উর্ধ্বমুখ শিখার শীর্ষে দুটি অক্ষর জ্বলতে লাগল, 'কুইট ইন্ডিয়া'—

'কুইট ইন্ডিয়া—' শৃঙ্খলিত দেশ এই মন্ত্রটির জন্য যুগ যুগ তপস্যা করেছে। কোটি কোটি মানুষ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন চকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু তারপরেই নিদারুণ খবর এল। রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনের পর গান্ধীজি, রাষ্ট্রপতি আজাদ, প্যাটেল, জওহরলাল, সরোজিনী নাইডু, ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ, আসফ আলি, কৃপালনি, সীতারামাইয়া এবং সৈয়দ মামুদ সহ ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিড়লা ভবনে কস্তুরবা, গান্ধীজির একান্ত সচিব প্যারেলাল, ডাক্তার সুশীলা নায়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এলাহাবাদে ট্যান্ডন এবং কাটজু।

সারা দেশ জুড়ে শুধু ধরাপাকড়ের খবর। নেতাদের কেউ বাইরে নেই, সবাই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

নেতৃহীন অনাথ দেশ এ অসম্মান নীরবে মেনে নিল না। যুগ-যুগান্তর ধরে বুকের ভেতর যে স্তূপীকৃত বিক্ষোভ বারুদ হয়ে ছিল, দিকে দিকে তার বিস্ফোরণ শুরু হল। কোথায় মহারাষ্ট্র, কোথায় বিহার, কোথায় পাঞ্জাব—দিগদিগন্ত থেকে কত খবর যে আসতে লাগল। এখানে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে, ওখানে মাইলের পর মাইল রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে, সেখানে থানা আক্রমণ, ডাকঘরে আগুন। ওদিকে বিদেশি শাসকও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল না। রক্তচক্ষু মেলে তারা দিগ্বিদিকে ছুটতে লাগল। পরাধীন দেশের জাগ্রত বিবেককে স্তব্ধ করে না দেওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

শুরু হয়ে গেল সন্ত্রাসের রাজত্ব। গুলি, ধরপাকড়, গ্রেপ্তার। বেয়নেটের ধারাল ফলায় কত মানুষের

বুক ফালাফালা হয়ে গেল, রাইফেলের নল থেকে বুলেট ছুটে গিয়ে কত মানুষের পাঁজর বিদীর্ণ করে দিল। জেলখানাগুলো ভরে উপচে পড়তে লাগল।

সৌরাষ্ট্র থেকে আসাম, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—সমস্ত দেশ উত্তাল, ছোট-বড় অসংখ্য ঢেউয়ে তরঙ্গিত। কোটি কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মতন একটি মাত্র শব্দ শোনা যায়, 'কুইট ইন্ডিয়া—'

'বৃটিশ—'

'ভারত ছাড়—'

সারা দেশ যখন দুলছে, রাজদিয়া কি স্থির থাকতে পারে? দূরের ঢেউ এই ছোট রাজদিয়াতে এসেও ভেঙে পড়ল।

বিনুদের স্কুলের হেডমাস্টার মোতাহার হোসেন সাহেব, কংগ্রেসের স্থানীয় সেক্রেটারি, সেদিন একটা মিছিল বার করলেন। পতিতপাবন খলিল থেকে শুরু করে কে নেই তাতে? কলেজের ছেলেরা এসেও যোগ দিল। শুধু কি স্কুল কলেজেব ছেলেরা, রাজদিয়াবাসীদের অনেকেই মিছিলে এসেছে। সারা শহর বেরিয়ে পড়েছে। বিনু কি চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারে? সেও ছুটে এসেছে। প্রায় সবার হাতেই একটা করে ত্রিবর্ণ পতাকা।

সমস্ত দেশ জুড়ে যে বর্বরতা চলছে তার প্রতিবাদ করতে হবে। শোভাযাত্রা শহরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই সঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল :

'বন্দে মাতরম্—'

'বন্দে মাতরম্—'

'ভারত মাতাকি—'

'জয়—'

'ব্রিটিশ—'

'ভারত ছাড়—'

ঘুরতে ঘুরতে থানার কাছে আসতেই হঠাৎ পুলিশ লাঠি চার্জ শুরু করে দিল। একটা লাঠি পড়ল বিনুর হাঁটুতে। লুটিয়ে পড়তে পড়তে বিনু দেখতে পেল, মোতাহার হোসেন সাহেবের মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। শধু কি মোতাহার সাহেবই, কত ছেলের যে হাত-পা ভেঙেছে হিসেব নেই। শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে পালাচ্ছে। থেকে থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে।

দেখতে দেখতে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়ল বিনু। জ্ঞান ফিরলে দেখল, সদর হাসপাতালে শুয়ে আছে, পায়ে মস্ত ব্যান্ডেজ। তার পাশের বেডে মোতাহার সাহেব। চারদিকের সারি সারি বেডগুলোতে আরো অনেক ছেলে। বেড বেশি নেই বলে অনেককে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে।

হাসপাতালে সাতদিন থাকতে হল। এর ভেতর হেমনাথ আর ঝিনুক রোজই আসে।

ঝিনুক ছলছল করুণ চোখে তাকিয়ে বলে, 'তোমার খুব লেগেছে, না বিনুদা?'

বিনু হাসে, 'না, তেমন কিছু নয়।'

সুরমা, অবনীমোহন, সুধা-সুনীতি একদিন পর পর এসে দেখে যায়। ঝুমাও এল একদিন। ঠোঁট টিপে বলল, 'আচ্ছা বীরপুরুষ।'

হাসপাতালে থাকার সময় বিনু লক্ষ্য করেছে, দিনরাত পুলিশ সারা হাসপাতালটা ঘিরে রেখেছে। সাতদিন পর পুলিশের পাহারাতেই কোর্টে যেতে হল। তাদের বিরুদ্ধে থানা আক্রমণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিচারে পনের দিনের জেল হয়ে গেল বিনুর, মোতাহার সাহেবের হল দু মাস। অন্য ছেলেদেরও দশ থেকে পনের দিনের সাজা হল।

মুক্তির দিন জেল গেটে সে কি দৃশ্য! সারা রাজদিয়া যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে। বিনুরা বেরিয়ে আসতেই কারা যেন গলায় ফুলের মালা দিয়ে তাকে কাঁধে তুলে ফেলল। কাঁধে চড়েই বাড়ি ফিরল

সে।

জেল খাটা, পা-ভাঙার জন্য অবনীমোহন বা সুরমা সুখী নন। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'হৈ চৈ করে কতগুলো দিন নষ্ট করল। এ বছর কিছুতেই ও পাশ করতে পারবে না। একটা বছর মাটি হবে।'

হেমনাথ বিনুর পক্ষ নিয়ে বললেন, 'হোক নষ্ট, পড়াশোনার জন্য সারা জীবন পড়ে আছে কিন্তু এমন দিন আর কখনও আসবে না। সেদিন নিজে থেকে প্রশেসানে না গেলে আমিই ওকে দিয়ে আসতাম।'

'ভারত ছাড়' আন্দোলন উত্তেজনা কেটে যেতে বেশ সময় লাগল। তারপর স্কুল, পড়াশোনা, ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি যাওয়া, ঝিনুকের সঙ্গে লুকোচুরি দিয়ে ঘেরা সেই পুরনো অভ্যস্ত জীবনের ভেতর আবার ফিরে গেল বিনু।

অবনীমোহনের সঙ্গে একদিন হাটে গিয়ে বিনু দেখে এসেছিল, একদানা ধানচাল পাওয়া যাচ্ছে না। নদীর পার ঘেঁষে সারি সারি আড়তগুলো তালাবন্ধ। বিনু শুনে এসেছিল, এখান থেকে বিশ মাইল উত্তরে গিরিগঞ্জ নামে যে বাজারটা আছে সেখানে ক'টা ধানচালের দোকান লুট হয়ে গেছে।

সেই থেকে অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সারা রাজ্য থেকে খাদ্যশস্য উধাও হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দূর দূরান্তের হাট থেকে লুঠপাটের খবর আসে। চারদিকের গ্রামগুলো থেকে, নদীর চরগুলো থেকে আরো যা খবর পাওয়া যায় তা ভয়াবহ। ধানচাল নেই, তাই ওসব জায়গার বাসিন্দারা মেটে আলু, মিষ্টি কুমড়ো, কচু, কন্দ, শাপলা শালুক সেদ্ধ করে প্রথম দিকে চালিয়েছে। তারপর আমপাতা, জামপাতা, শিউলি পাতা, যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। এখন নাকি ইঁদুর, খরগোশ পুড়িয়ে খাচ্ছে।

ধানচাল উধাও হবার পর হেমনাথের বাড়ি লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। প্রতিদিনই দুপুরে আট দশজন করে বাইরের লোক খেয়ে যাচ্ছে। আজকাল নিবারণ পিওন প্রায়ই আসে। এ ছাড়া এ গ্রামের, ও গ্রামের চেনা অচেনা কত মানুষ যে আসছে! ঠিক দুপুরবেলা বার-বাড়ির উঠোনে এসে করুণ গলায় তারা বলে, 'অতিথ্ আইলাম গো মা-ঠাইরেন, সাত দিন প্যাটে ভাত পড়ে নাই।'

এ তো গেল দুপুরবেলার কথা, রাতের অন্ধকারে যুগীপাড়া-ঋষিপাড়া-নমঃশূদ্রপাড়ার বৌ-ঝিরা আসে। স্নেহলতাকে বলে, 'দুই মুঠা চাউল দ্যান গো বইনদিদি, তিনদিন আখা (উনুন) ধরাই নাই।'

চিরদিন স্নেহলতা বা হেমনাথ দিয়েই এসেছেন, কাউকে কখনও বিমুখ করেন নি। এই দুঃসময়েও তাঁরা দিয়েই যাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে, কে জানে।

প্রতি বছরই মাঠ থেকে ধান উঠবার পর খোরাকির চাইতে কিছু বেশি রেখে বাদবাকি বেচে দেন হেমনাথ। যেভাবে লোকজন খেয়ে যাচ্ছে, যুগীপাড়া-ঋষিপাড়ার বউ-ঝিরা চাল নিচ্ছে, তাতে নিজেদেরই হয়তো একদিন উপোস দিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু পরের কথা ভেবে স্নেহলতা বা হেমনাথ মন ভারাক্রান্ত করেন না। পরে যা হবার হবে, এখন মানুষের প্রাণ তো বাঁচুক।

দেখতে দেখতে আরেক পুজো চলে গেল।

পুজোর পর মাঠের জলে যখন টান ধরল, ধানের শিষগুলো গাঢ় সবুজ হয়ে এল, সেইসময় একদিন হরিন্দ এবং তার দুই মোষের মতন ঢাকী কাগা-বগা রাজদিয়ার রাস্তায় ঢেঁড়া দিয়ে গেল, 'যার যত

নাও আছে তিন দিনের ভিতর সগল থানায় জমা দিবা। গরমেন্টের হুকুম। জমা না দিলে বিপদ আছে।'

বিনু স্কুলে যেতে যেতে ঢেঁড়া শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নৌকো জমা দিতে হবে কেন?'

হরিন্দ যা বলল তা এইরকম। জাপানিরা যে কোনোদিন পুববাংলায় এসে পড়তে পারে। এসেই যদি নৌকো পেয়ে যায়, মিত্রশক্তির পক্ষে বিপদ ঘটে যাবে। তাই সতর্কতা এবং নিরাপত্তার কারণে নৌকো আটক করা হচ্ছে। বিপদ কেটে গেলেই ফেরত দেওয়া হবে।

বিনু একাই না, রাজদিয়ায় আরো অনেকে হরিন্দদের চারপাশে ভিড় জমিয়েছিল। তাদের ভেতর ভীত সন্ত্রস্ত গুঞ্জন উঠল, 'হে ভগবান, নাও হইল আমাগো হাত-পাও। নাও যদি আটকায় আমরা কী করুম? খামু কী?'

'এইবার মরণ, মরণ—'

তিন দিনের মধ্যেই দেখা গেল, খাল-বিল-নদী শূন্য করে থানার পাশের মস্ত মাঠটায় অসংখ্য নৌকো উঠে এসেছে। গাছি, ভাউলে, মহাজনী, কোষ, একমাল্লাই, দু'মাল্লাই, চার মালল্লাই—কত রকমের যে নৌকো তার লেখাজোখা নেই।

শুধু রাজদিয়ারই না, চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ, সব জায়গার নৌকোই আটক করা হয়েছে।

নৌকো আটকের পর একটা সপ্তাহও কাটল না।

সেদিন স্কুলে যাবার সময় বিনু দেখতে পেল, নদীর পারে বিরাট ভিড় জমেছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সে বিমূঢ় হয়ে যায়।

শত শত লোক নদী সাঁতরে রাজদিয়ার দিকে আসছে। তারা পারে উঠতেই কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোনখানের মানুষ?'

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলল, 'চর-বেউলার।'

'নদী সাতরাইয়া আইলা যে?'

'কি করুম, গরমেন্ট নাও লইয়া গেছে। হেয়া ছাড়া আমাগো চরে এক দানা চাউল নাই। পোলামাইয়া লইয়া না খাইয়া জান যায়।'

আরেকজন বলল, 'হুদা (শুধু) আমাগো চর নিহি, কুনো চরেই চাউল নাই। দ্যাখেন না, দু একদিনের ভিতর আরো কত মানুষ রাইজদার শহরে আসে।'

সত্যিই দেখা গেল, কয়েকদিনের মধ্যে অসংখ্য মানুষ খাদ্যের আশায় রাজদিয়াতে হানা দিল।

লোকগুলো সারাদিন দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় আর গোঙানির মতন শব্দ করে বলে, 'দু'গা ভাত দিবেন মা, এট্টু ফ্যান দিবেন—'

বিমর্ষ হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে।'

শুধু নদীর চরগুলো থেকেই না, চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ থেকেও খাদ্যের সন্ধানে কত মানুষ যে রাজদিয়া ছুটে এল। এমনকি আঞ্জুমান বেবাজিয়ানীরা পর্যন্ত এসেছে। থানা থেকে তাদের নৌকাও 'সীজ' করে নিয়েছে। যুদ্ধ ভাসমান বেদে-বহরকেও রেহাই দেয় নি।

আজকাল সমস্ত রাজদিয়া জুড়ে দিনরাত শুধু শোনা যায়, 'মা জননী, দু'গা ভাত দ্যান, এট্টু ফ্যান·

দ্যান—' 'না খাইয়া খাইয়া শরীলে আর দ্যায় না।'

রাস্তায় বেরুলেই চোখে পড়ে কঙ্কালসার প্রেতের মতন দলে দলে মানুষ দুর্বল অশক্ত পায়ে টলমল করে হাঁটছে, এক দুয়ার থেকে তাড়া খেয়ে যাচ্ছে আরেক দুয়ারে।

অবশ্য রাজদিয়াবাসীরা একেবারে নির্দয় না। সব বাড়ি থেকে চাল-ডাল যোগাড় করে শহরের দু মাথায় দুটো লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। সারাদিন পর বেলা হেলে গেলে মাথাপিছু দু হাতা করে তরল ট্যালটেলে খিচুড়ি দেওয়া হতে লাগল।

কিন্তু দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে দুটো মোটে লঙ্গরখানা খাড়া করে কতক্ষণই বা যুদ্ধ চালানো যায়। ক'টা লোককেই বা খাওয়ানো চলে।

কাজেই চারদিকে চুরির হিড়িক পড়ে গেল।

বাজার থেকে ধানচাল উধাও হবার পর থেকেই চুরি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন যা চলেছে তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনাই হয় না।

থালা-ঘটি-বাটি-গাড়ু-বদনা, কাঁসা বা পেতলের একটুকরো বাসনও বাইরে ফেলে রাখার উপায় নেই। রান্না-করা ভাত-তরকারি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তবে সব চাইতে বেশি যা চুরি হচ্ছে তা ধান।

কার্তিকের মাঝামাঝি মাঠের জল নেমে গিয়েছিল। রাজদিয়ার দক্ষিণে এসে দাঁড়ালে, যতদূর চোখ যায়, এখন শুধু ধান, ধান আর ধান।

সবে অঘ্রাণ পড়েছে। এই মাসের শেষ থেকে আমনের মরসুম। ধানের শিষগুলো এখনও কাঁচাই রয়েছে, তাতে সোনালি আভা লাগেনি। সবুজ তুঁষের ভেতরকার শস্য এখনও যথেষ্ট পুষ্ট নয়। তা হলে কি হবে, রাতের অন্ধকারে ক্ষুধার্ত মানুষ মাঠকে মাঠ কাঁচা ধানই কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

ধানই যদি চলে যায়, সারা বছর লোকে খাবে কি ? চুরি ঠেকাবার জন্য রাজদিয়ার সব বাড়ি থেকে ছেলে যোগাড় করে ডিফেন্স পার্টি তৈরি হল।

ডিফেন্স পার্টির দুটো কাজ। প্রথমত, রাত জেগে জেগে জমির ধান পাহারা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, নদীর ধারে ধারে ঘুরে মহাজনী নৌকোগুলোর ওপর নজর রাখা।

এ অঞ্চলের প্রায় সব নৌকোই যুদ্ধের কল্যাণে 'সীজ' করা হয়েছে। তবে 'স্পেশাল পারমিট' নিয়ে কেউ কেউ দু'একখানা রাখতে পেরেছে। যেমন ব্যবসাদারেরা।

যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ শুরু হবার পর ধানচাল জামা-কাপড়ের কারবারীরা আর মানুষ নেই। দুঃশাসনের মতন সারা দেশকে বিবস্ত্র এবং নিরন্ন করে তারা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে বেশি লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা নৌকো বোঝাই করে রাজদিয়ার ধানচাল এবং অন্যান্য সব শস্য দূর-দূরান্তে পাচার করে দিতে চাইছে। ডিফেন্স পার্টি তা হতে দেবে না। ঘুরে ঘুরে তারা মহাজনী নৌকো ধরছে।

সব বাড়ি থেকেই দু'টি একটি করে যুবক নেওয়া হয়েছে ডিফেন্স পার্টিতে। ঠিক ঐ বয়েসের ছেলে হেমনাথের বাড়িতে নেই। কাজেই বিনুকেই দলে নিতে হল।

যুদ্ধের দৌলতে রাজদিয়ায় তো কম ছেলে নেই। সবাইকে একসঙ্গে রাত জাগতে হয় না। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে পালা করে তারা জাগে। আজ এর পালা পড়লে কাল ওর। সপ্তাহে দু'দিন জাগতে হয় বিনুকে।

ছেলেরা রাত জাগবে। তাই বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে পাঁচ ব্যাটারির বড় বড় অনেকগুলো টর্চ কেনা হয়েছে, চা আর মুড়মুড়ে 'এস' বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম দিন রাত জাগতে এসে বিনু দেখল, তার দলে শ্যামল আর অশোকও রয়েছে।

মজিদ মিঞার হাতে মার খাবার পর অশোক শ্যামলের সঙ্গে আর মিশত না বিনু। অশোকরাও খুব সম্ভব মার খেয়েছে। মজিদ মিঞা ওদের বাড়ি গিয়েও সিগারেট খাবার কথা বলে এসেছিল।

মারটার খাবার পর দু পক্ষই পরস্পরকে এড়িয়ে যাচ্ছিল।

ডিফেন্স পার্টিতে তার দলে অশোকরা না থাকলেই ভাল হত। বিনুর খুব অস্বস্তি হতে লাগল।

বিনুদের দলে সবসুদ্ধ বারোটি ছেলে। তাদের কাজ হল, নদীর পারে ঘুরে ঘুরে ধানচাল বোঝাই মহাজনী নৌকো খোঁজা। টর্চ নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

· প্রথম দিকে বিনু অশোকদের সঙ্গে কথা বলছিল না। অশোকরাও মুখ বুজেই ছিল। আড়চোখে তিন জন তিন জনকে দেখে যাচ্ছিল শুধু।

নদীর পারে এসে অশোক আর পারল না। বিনুর কাছে নিবিড় হয়ে এসে বলল, 'সেই লোকটা সেদিন তোমাকে কান ধরে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল ?'

বিনু বুঝল, মজিদ মিঞার কথা বলছে অশোক। বিব্রতভাবে বলল, 'হ্যাঁ'।

'লোকটা এক নম্বরের ডাকাত।'

বিনু উত্তর দিল না।

অশোক আবার বলল, 'বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোমাকে মেরেছিল ?'

মুখ নীচু করে বিনু মাথা নাড়ল।

অশোক আবার বলল, 'খুব ?'

'হ্যাঁ। মারের চোটে জ্বর এসে গিয়েছিল।'

গভীর সহানুভূতির গলায় অশোক বলল, 'ইস, এমন করে কেউ মারে! খানিক নীরব থেকে আবার বলল, 'আমাকেও বাবা খুব মার দিয়েছিল।'

'তাই নাকি ?'

'মারতে মারতে বাড়ির বার করে দিয়েছিল। ঠাকুমা গিয়ে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

এতক্ষণ শ্যামল চুপ করে ছিল। এবার মুখ খুলল, 'তোমাদের শুধু মেরেইছিল, আমার অবস্থা কী হয়েছিল জানো ?'

ধীরে ধীরে বিব্রত ভাবটা কেটে যাচ্ছিল বিনুর। উৎসুক সুরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল ?'

শ্যামল বলতে লাগল, 'মার তো খেয়েছিলামই, তার ওপর দু'দিন কিছু খেতে দেয় নি।'

'আহা রে—'

দেখা গেল তিনজনেই তিনজনের দুঃখে দুঃখী, সমব্যথী। একটি রাত একসঙ্গে জাগবার আগেই তাদের বন্ধুত্ব আবার আগের মতন গাঢ় হয়ে গেল।

ওধারে লালমোরের গীর্জা আর এধারে সারি সারি মিষ্টির দোকানগুলোর সামনে ঘন হিজলবন। নদীর দীর্ঘ পার ধরে ডিফেন্স পার্টির ছেলেরা কতবার যে টহল দেয়। নদীর জলে সন্দেহজনক কিছু নড়তে দেখলেই তারা থমকে দাঁড়ায়, একসঙ্গে পাঁচটা টর্চ জ্বলে ওঠে।

সবে অঘ্রাণ পড়েছে। কিন্তু এরই ভেতর জলবাংলার এই ছোট্ট নগণ্য শহরটিতে শীত নেমে গেছে।

নদীর দিক থেকে যে উল্টোপাল্টা জলো হাওয়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় তা বরফের মতন ঠাণ্ডা। গুঁড়ো গুঁড়ো হিমে নদী, আকাশ, দূরের ঝাউবন, সারি সারি হিজলগাছ কিংবা রাজদিয়া শহরের বাড়িঘর, মিলিটারি ব্যারাক—সব কেমন যেন ঝাপসামতন।

সারা গা আলোয়ানে মুড়ে, কানে মাথায় কম্ফোর্টার জড়িয়েও শীত কাটে না।

একদিন ডিফেন্স পার্টির সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মানিক বলল, 'আজ বড্ড ঠাণ্ডা, না ?' মানিক নাহা বাড়ির ছেলে, মাসখানেক হল কলকাতা থেকে এসে এখানকার কলেজে বি. এ-তে ভর্তি হয়েছে। বিনুদের গ্রুপটার সে নেতা।

অন্য ছেলেরা হি-হি কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হ্যাঁ মানিকদা—'

'একটা জিনিস খেলে শীতটা কিন্তু কেটে যেত।'

'কি ?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে দেখাল মানিক।

আবার সিগারেট! বিনু চমকে উঠল। লক্ষ্য করল, অশোক শ্যামলও খুব একটা আরাম বোধ করছে না।

বিনু বলল, 'আমি তো সিগারেট খাই না।' মজিদ মিঞার মারের কথা ভেবে মনে আর সুখ নেই তার। অশোক শ্যামলও তাই বলল।

মানিক বলল, 'যা শীত! এক আধটা খেলে গা গরম হয়ে যাবে। হি-হি করে কাঁপছ, কাঁপুনি বন্ধ হবে। নাও-নাও, সবাই একটা করে নিয়ে ধরিয়ে ফেল।'

'কিন্তু—'

'কি ?'

'কেউ যদি দেখে ফেলে ?'

'এই শীতের রাত্তিরে তোমাদের সিগারেট খাওয়া দেখবার জন্যে লোকের বাইরে বেরুতে বয়ে গেছে। সবাই লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে, দেখ গে। সিগারেট টেনে ভাল করে পেয়ারাপাতা চিবিয়ে বাড়ি যাবে, কেউ টেরও পাবে না।'

'কিন্তু—'

'আবার কি ?'

'আপনি রয়েছেন।'

'আমার কাছে লজ্জা কি। আমরা সবাই বন্ধু—ফ্রেণ্ড—'

কোনো অজুহাতই খাটল না, একটা করে সিগারেট নিতেই হল সবাইকে।

আবার সিগারেট খাওয়া শুরু হয়েছে। ডিফেন্স পার্টিতে রাত জাগতে এসে শুধু কি সিগারেট, আরো চমকপ্রদ সব ব্যাপার ঘটতে লাগল।

একদিন রাত্রিবেলা বিনু শ্যামলকে আর সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে অশোক বলল, 'আজ আর আমরা ওদের সঙ্গে সঙ্গে নদীর পারে ঘুরব না।'

বিনু শুধলো, 'তা হলে কি করবে ?'

'এক জায়গায় যাব।'

'কোথায় ?'

চোখ টিপে রহস্যময় হেসে অশোক বলল, 'চল না, গেলেই বুঝতে পারবে। দারুণ মজা হবে।'

অশোক শ্যামল আর বিনুকে নিয়ে মল্লিকদের ঝুপসি বাগান পেরিয়ে একটা ঘরের বন্ধ জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

বিনু বলল, 'এখানে কি ?'

চাপা গলায় অশোক বলল, 'একদম চুপ। কথা না বলে জানালায় কান দিয়ে দাঁড়াও।'

দিন কয়েক আগে মল্লিকদের ছোট ছেলে সুখরঞ্জনের বিয়ে হয়েছে। এটা তাদেরই ঘর। বিনু তা জানে, খুব নীচু গলায় সে কথা অশোককে বললও।

বিরক্ত সুরে অশোক বলল, 'ছেলেটা তো খালি বক বক করে! মুখ বুজে জানালায় একটু কান পাতো ভাই—'

জানালায় কান রাখতেই সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। সুখরঞ্জন যা-যা বলে তার বউকে আদর করছে, এমন সব সোহাগের ভাষা আগে কখনও শোনেনি বিনু।

অনেকক্ষণ পর সুখরঞ্জনদের গলা ঘুমে জড়িয়ে এল। তখন অশোক বলল, 'চল—'

বাগানের বাইরে বড় রাস্তায় এসে অশোক আবার বলল, 'কিরকম লাগল?'

শ্যামল শিস টানার মতন শব্দ করে বলল, 'সত্যি মজাদার।'

'কী বলেছিলাম?'

বিনু বলল, 'এখানকার খবর তুমি কি করে জানলে ভাই?'

মুরুব্বিআনা চালে হেসে অশোক বলল, 'অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আরো অনেক জায়গার খবর আমি জানি।'

'বল না, বল না—'

'একদিনে সব শুনে ফেললে তারপর কী করবে? একটু ধৈর্য ধর।'

এরপর থেকে ডিফেন্স পার্টির সঙ্গে রাত জাগতে এসে তিনজনে এক ফাঁকে সরে পড়ে। যুবতী স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে যুবকেরা যেখানে শুয়ে থাকে, বিনুরা গিয়ে তাদের ঘরের জানালায় কান পাতে।

তা ছাড়া রাজদিয়ার রাস্তায় কত দৃশ্য চোখে পড়ে। হুস-হুস করে যে জিপগুলো ছুটে যায় তার ভেতরে দেখা যায়, আমেরিকান টমির গলা জড়িয়ে নারীদেহ ঝুলছে। ঝাউবনের মধ্যে নিগ্রো সৈন্যগুলো কোত্থেকে যেন মেয়েমানুষ জুটিয়ে এনে এই শীতের রাতে নরকের খেলা শুরু করে দেয়।

একদিন এক বাড়িতে কান পাততে গিয়ে বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল।

বিনুরা দেখল, শীতের রাত্তিরে এরা জানালা খুলে শুয়েছে।

খুব চাপা গলায় অশোক বলল, 'ভালই হয়েছে। এতদিন খালি শুনেছ, এবার ভেতরকার মজা দেখতে পাবে।'

পা টিপে টিপে তিনজনে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য সব বাড়ির জানালায় কান রেখে বিনুরা যা শুনেছে, এখানেও তা-ই শুনতে পেল। গাঢ় গলায় পুরুষটি তার সঙ্গিনীকে আদরের কথা বলছে। মাঝে মাঝে চুমু খাবার শব্দ।

উত্তেজনায় তিনজন মুখ বাড়াতে লাগল। কিন্তু ঘরের ভেতর আলো নেই, তা ছাড়া ওরা মশারি টাঙিয়ে শুয়েছে। চোখে শান দিয়েও কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাইরে হিমের ভেতর অস্থির হয়ে উঠল বিনুরা। হঠাৎ শ্যামল এক কান্ড করে বসল, বোতাম টিপে হাতের টর্চটা জ্বেলে ফেলল। মশারির গায়ে আলো পড়তেই দুটি ঘনবদ্ধ যুবক-যুবতী ছিটকে দু'ধারে সরে গেল। তারপরেই যুবকটি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে, কে রে, চোর—'

মেয়েটিও চেঁচাতে লাগল, 'চোর, চো—'

ততক্ষণে আলো নিভিয়ে ফেলেছে শ্যামল। একমুহূর্ত বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকল তারা। তারপর সারা বাড়ির দরজা-জানালা খোলার আওয়াজ কানে আসতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল এবং চোখের পলকে এর ঢেঁকিঘরের পাশ দিয়ে, ওর বাগানের ভেতর দিয়ে, তার উঠোন ডিঙিয়ে নদীর পারে এসে পড়ল।

নদীর পারে স্টিমারঘাটের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে অশোক শ্যামলকে বলতে লাগল, 'তুমি কি ছেলে বল তো! ফস করে টর্চ জ্বেলে দিলে।'

কাজটা যে ভাল হয় নি, শ্যামল আগেই বুঝতে পেরেছিল। সে চুপ করে থাকল।

অশোক আবার বলল, 'টর্চটা জ্বেলেছিলে জ্বেলেছিলে, একটু পরেই যদি জ্বালাতে—'

শ্যামল বলল, 'পরে জ্বাললে কী হত?'

চোখের তারা নাচিয়ে নাচিয়ে অশোক বলল, 'আরো মজা দেখতে পেতে।'

একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। ভয়ে উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছিল। আর সেই কাঁপুনির মধ্যে, কেন কে জানে, ঝুমার কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

রাজদিয়ায় আসার পর কিছুদিন বেশ ভালই ছিলেন সুরমা। কাগজের মতন সাদা ফ্যাকাসে শরীরে লালচে আভা দেখা দিয়েছিল। নিষ্প্রভ চোখে আলোর খেলা শুরু হয়েছিল, রুগ্ণ মুখে লাবণ্য ফুটি-ফুটি করছিল। চোখের কোলে, শীর্ণ আঙুলের মাথায় রক্তের সঞ্চার চোখে পড়ছিল।

কিন্তু ক'দিন আর। তারপরেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুরমা। টিপটিপে বৃষ্টির মতন একটানা অসুখ চলছিলই। তার মধ্যেই ভাত খেতেন, স্নান করতেন, হেঁটে চলে বেড়াতেন।

কিন্তু এ বছর শীত পড়তেই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন সুরমা। লারমোর রোজ সকালবেলা একবার করে তাঁকে দেখে যান। সুরমার অসুখটা হার্টের, হৃৎপিন্ডটি খুবই দুর্বল। তার ওপর নানারকম স্নায়বিক উপসর্গ রয়েছে।

এবার শুয়ে পড়বার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছেন সুরমা। যত দিন যাচ্ছে, মৃত্যুভয় চারদিক থেকে তাঁকে যেন ঘিরে ধরতে শুরু করেছে। প্রায় সারাদিনই ক্ষীণ সুরে তিনি বলে যান, 'ওগো, সুধা-সুনীতির বিয়ের ব্যবস্থা কর।'

অবনীমোহন বলেন, 'হবে হবে, আগে তুমি সেরে ওঠ।'

'এবার আমি আর উঠব না। মন বলছে, এই শোওয়াই আমার শেষ শোওয়া।'

'কি আজে-বাজে বলছ! ঠিক সেরে উঠবে তুমি, আবার আগের মতন সুস্থ হবে।'

বিচিত্র হাসেন সুরমা, 'যতই ভোলাতে চাও না, এবার আর আমার রেহাই নেই। বেঁচে থাকতে থাকতে সুধা-সুনীতির বিয়ে দাও। দেখে শান্তিতে চোখ বুজি।'

সুরমা কোনো কথাই যখন শুনবেন না তখন কি আর করা! সুধার জন্য হিরণকে একরকম ঠিক করাই আছে। শুধু হিরণের ঠাকুরদা আর জেঠাইমাকে কথাটা জানাতে হবে। হেমনাথ যখন আছেন তখন তাঁর কথার ওপর ওঁরা কিছু বলবেন না। হিরণ সম্বন্ধে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত।

সুনীতির সঙ্গে আনন্দর বিয়ের ব্যাপারে অবনীমোহন আর হেমনাথ একদিন রামকেশবের বাড়ি গেলেন। তারপর রামকেশব এবং স্মৃতিরেখার সঙ্গে পরামর্শ করে মধুপুরে আনন্দর বাবাকে চিঠি লেখা হল। ইভাক্যুয়েশনের সময় ওঁরা ওখানে চলে গেছেন। স্মৃতিরেখা এবং রামকেশবও আনন্দর বাবাকে চিঠি লিখলেন।

দিনকয়েকের ভেতর উত্তর এসে গেল। ছেলে বড় হয়েছে, তাকে সংসারী করবার জন্য আনন্দর বাবা পাত্রীর খোঁজ করছিলেন। সুনীতিকে যদি ছেলের পছন্দ হয়ে থাকে, এ বিয়েতে তাঁর আপত্তি নেই। শিগগিরই তিনি রাজদিয়া আসছেন। সাক্ষাতে অন্য কথা হবে।

দিন পনেরোর ভেতর মধুপুর থেকে আনন্দর বাবা-মা ভাই-বোনেরা এসে পড়ল। হেমনাথ এবং অবনীমোহনের সঙ্গে কথা বলে, সুনীতিকে দেখে আনন্দর বাবা খুবই সন্তুষ্ট। এক কথায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। স্থির হল, মাঘ মাসে ধান কাটার পর বিয়েটা হবে।

বিয়ের ক'দিন আগে এক দুপুরবেলার মাঠের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে কুমোরপাড়ার হাচাই পাল এসে হাজির। ভয়ে চোখের তারা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার।

স্নেহলতা উঠোনের একধারে তুলসী মঞ্চের পরিচর্যা করছিলেন। সুধা-সুনীতি বিনু-ঝিনুক, বাড়ির

সবাই দাঁড়িয়ে ছিল।

হাচাই পালের ঐ রকম সন্ত্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে স্নেহলতা চমকে উঠলেন, 'কী হয়েছে রে হাচাই?'

হাঁপাতে হাঁপাতে হাচাই পাল বলল, 'সুন্দি কাউঠার খোজে মাঠে গেছিলাম। গিয়া দেখি বাঘ। দেইখাই লৌড় (দৌড়) দিলাম—'

'বাঘ!'

'হ বৌ-ঠাইরেন—'

এই বাঘ নিয়ে দিন সাতেকের মধ্যে এক মজার ব্যাপার ঘটে গেল।

কুমোরপাড়ার হাচাই পালই শুধু না, ক'দিনের মধ্যে বাঘটাকে আরো অনেকে দেখল। যেমন মৃধাবাড়ির ছলিমুদ্দি, গোঁসাইবাড়ির সহদেব, নিকুঞ্জ কবিরাজ, অধর সাহা, মনা ঘোষ—এমনি আরো অনেকে।

কেউ বলল, বাঘটা দু'হাত লম্বা। কেউ বলল, আট হাত। কেউ বলল, দশ হাত। যত দিন যেতে লাগল লোকের মুখে মুখে বাঘটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল।

নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বাঘটাও যেন উঠে পড়ে লেগে গেছে। আজ এ-বাড়ির ছাগল পাওয়া যাচ্ছে না, কাল ও-বাড়ির গরুর খোঁজ নেই, পরশু সে-বাড়ির হালের বলদ নিরুদ্দেশ। একদিন তো যুগীপাড়ার একটা ছেলেই নিখোঁজ হয়ে গেল। মাঠের মাঝখানে নলখাগড়ার ঝোপে খানকয়েক হাড় ছাড়া ছেলেটার আর কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না।

এদিকে রাজদিয়াকে ঘিরে দশ বারোখানা গ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে। কনট্রোলের দোকান থেকে কেরোসিন উধাও হবার পর সন্ধে নামতে না নামতেই চারদিক নিশুতি হয়ে যাচ্ছিল। আজকাল বিকেল থাকতে থাকতেই বাঘের ভয়ে ঘরে খিল পড়ে যায়।

সব চাইতে অসুবিধে হয়েছে বিনু আর ঝিনুকের। তারা যে বড় হয়েছে এ কথাটা স্নেহলতা বা বাড়ির আর কেউ মানতেই চায় না। এখন কিছুদিন স্কুলে ছুটি চলছে। বেলা বেড়ে রোদ বেশ চনচনে হয়ে উঠলে তবে তারা ঘরের বার হতে পারে, আবার বিকেলবেলা রাজদিয়ার সব লোক বাইরে থাকতে থাকতেই তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যাবার উপায় নেই তাদের। স্নেহলতার ভয়, বাঘটা তাকে তাকে আছে। রাজদিয়ার কয়েক হাজার লোকের ভেতর থেকে বেছে বেছে তাঁর নাতি-নাতনী দুটোকে টপ করে মুখে তুলে নিয়ে যাবে।

স্নেহলতা লক্ষ্মণের গন্ডি কেটে দিয়েছেন। পেছনে রান্নাঘর, সামনে উঠোন, দক্ষিণে মধুটুকুরি আমের গাছ, উত্তরে ঢেঁকিঘর—এই চতুঃসীমার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে কার আর ভাল লাগে। এমন কি বাগান এবং পুকুরেও একা একা যাওয়া বারণ।

অন্য কিছুর জন্য না, ঝুমার জন্যই খুব খারাপ লাগে বিনুর। সারাদিন ছটফট করে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়ায় সে, উঠোন জুড়ে অস্থির চঞ্চল পায়ে ঘুরপাক খেতে থাকে।

ঝিনুক কিন্তু ভারি খুশি। পুবের ঘরের উঁচু পৈঠের ওপর বসে পা নাচাতে নাচাতে কৌতুকের চোখে সে বিনুর অস্থিরতা দেখতে থাকে। এক সময় খুব আস্তে করে ডাকে, 'বিনুদা—'

বিনু বলল, 'কী বলছ?'

'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?'

'কষ্ট কেন ?'

ঝিনুকের চাপা ঠোঁটের মাঝখানে হাসির একটু আভা ফুটে উঠেই চকিতে মিলিয়ে যায়। সে বলে, 'সারাদিন বাড়িতে আটকে আছ বলে—'

চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত রাগ-রাগ গলায় বিনু বলতে থাকে, 'সমস্ত দিন বাড়ি বসে থাকতে কারো ভাল লাগে!'

'ঠিকই তো।'

'দিদার কি যে ভয়, রাস্তায় বেরুলে এত লোক থাকতে বাঘ এসে যেন আমাকেই গিলে ফেলবে।'

কয়েক পলক বিনুর দিকে তাকিয়ে থেকে গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেলে ঝিনুক, 'একে বেরুতে পারছ না। তার ওপর—'

'তার ওপর কি ?'

'ঝুমাদের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না। ঝুমাদের বাড়ি যেতে পারলে এত কষ্ট, এত রাগ হত না। তাই না বিনুদা ?'

চোখের তারা স্থির করে ঝিনুকের দিকে তাকায় বিনু। বুঝতে চেষ্টা করে মেয়েটা কি কিছু আভাস পেয়েছে ? বলে, 'তোমার কি মনে হয়, রাস্তায় বেরুলেই আমি ঝুমাদের বাড়ি যাই ?' বিনুর গলা অল্প অল্প কাঁপে।

ঝিনুক হঠাৎ উদাস হয়ে যায়, 'কি জানি—'

আর বিনু এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায় না। বড় বড় পা ফেলে আবার এ-ঘরে ও-ঘরে এবং উঠোনে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে ভাবে, ঝুমাই শুধু না, এই ঝিনুক মেয়েটাই কি কম রহস্যময়ী!

বাঘের উৎপাত দিন দিন বেড়েই চলল। রক্তের স্বাদ যখন একবার সে পেয়েছে তখন কি সহজে থামবে ?

এদিকে থানা থেকে ঢেঁড়া দিয়ে পনের কুড়ি মাইলের ভেতর যত গ্রাম-গঞ্জ আছে, সব জায়গার লোককে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। বাঘ মারবার জন্য মোটা টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

এত এত ব্যাপার যখন ঘটে গেল তখন কি আর আনন্দ চুপ করে বসে থাকতে পারে ? বাঘ মারার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিল। একদিন দুপুরবেলা বিনুরা দেখতে পেল, পুকুরের ওধারে চারদিকের গ্রামগুলো থেকে থেকে কয়েক শ' যুবক এবং প্রৌঢ়কে জড়ো করে ফেলেছে সে। এই মুহূর্তে তার গায়ে পুরোপুরি শিকারির সাজ। কাঁধ থেকে বন্দুক ঝুলছে, গলায় টোটার মালা, কোমরে মস্ত ভোজালি।

মাঘের মাঝামাঝি এই সময়টায় মাঠে জল নেই, ধানও কাটা হয়ে গেছে। আনন্দকে ঘিরে বিরাট জনতা ধানকাটা মাঠের ওপর গোল হয়ে বসে পড়ল।

এত লোক যখন রয়েছে তখন ভয়ের কোনো কারণ নেই। স্নেহলতাকে বলে বিনু ধানখেতে ছুটল।

জনতার বেশির ভাগই চাষী শ্রেণীর মানুষ, দুর্ভিক্ষে হেজেমজে যাবার পর যারা কোনো রকমে টিকে আছে তারা ছুটে এসেছে। উৎকণ্ঠিতের মতন লোকগুলো আনন্দের দিকে তাকিয়ে ছিল।

আনন্দ বলছিল, 'বাঘটাকে তোমরা মারতে চাও, এই তো ?'

সবাই সমস্বরে বলল, 'হ সায়েববাবু। হালার বাঘের লেইগা পরাণে শান্তি নাই। কোন্‌দিন কার বাড়িত্ গিয়া যে আকাম কইরা আইব।'

'সায়েববাবু' সম্ভাষণটা খুব সম্ভব আনন্দের হ্যাট-বুট-প্যান্ট এবং গুলিবন্দুকের সম্মানে।

আনন্দ বলল, 'সে তো ঠিকই।'

বাঘ কার কি ক্ষতি করেছে, তাদের কতখানি দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এরপর লোকগুলো সে সব কাহিনী বলে যেতে লাগল।

সব শুনে আনন্দ বলল, 'বাঘ আমি মেরে দিতে পারি। তবে—'

'তয় কী?' জনতা উন্মুখ হল।

'আমার কথামতন তোমাদের চলতে হবে।'

'নিয্যস চলুম।'

এরপর উদ্দীপ্ত ভাষায় ছোটখাটো একখানা বক্তৃতা দিল আনন্দ। তার সারমর্ম এইরকম। প্রথমত সবাইকে লাঠি এবং সড়কি বানিয়ে নিতে হবে। ঘরে ঘরে শাঁখ, কাঁসর, নিদেন পক্ষে একটুকরো টিন মজুদ রাখতে হবে। কেউ যদি বাঘটাকে দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের গ্রামে গিয়ে খবর দেবে। আর খবর পেলেই যত শাঁখটাখ আছে একসঙ্গে বাজাতে হবে। এক গ্রামের বাজনার আওয়াজ পেলে আরেক গ্রাম বাজাতে শুরু করবে। এই ভাবে চারদিকের গ্রামগুলো সতর্ক হয়ে যাবে।

শুধু শাঁখ কাঁসর বা টিন বাজালেই চলবে না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ধ্বনিও দিতে হবে, 'বন্দে মাতরম্' 'কালী মাইকী জয়' কিংবা 'আল্লা হো আকবর'। ধ্বনিটা কানে গেলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিধ্বনিও দিতে হবে। তারপর লাঠি সড়কি নিয়ে সব দিক থেকে বাঘটাকে ঘিরে পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে। তাতেও যদি সুবিধে না হয়, আনন্দ এবং তার বন্দুক তো আছেই।

পরিকল্পনার কথাটা বলে ঘুরে ঘুরে সগর্বে জনতাকে একবার দেখে নিল আনন্দ। তারপর আবার শুরু করল, 'ফন্দিটা কেমন?'

সবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সায় দিল, 'চোমৎকার সায়েববাবু, চোমৎকার—'

'এবার বাঘের আর নিস্তার নেই, বুঝলে?'

'হ।'

এরকম চমকপ্রদ একখানা পরিকল্পনার পর বাঘের আয়ু যে নেহাতই ফুরিয়ে এসেছে, সে সম্বন্ধে জনতার সন্দেহ থাকল না। উৎসাহে উদ্দীপনায় তাদের চোখ চকচক করতে লাগল।

আনন্দ বলল, 'তা হলে ঐ কথাই রইল—'

'হ।'

হঠাৎ এই সময় একজন বলে উঠল, 'বাঘেরে আমরা যহন ঘিরা ধরুম, আপনে আমাগো লগে থাকবেন তো?'

বাঁ হাতের তালুতে প্রচন্ড ঘুষি বসিয়ে আনন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি না থাকলে তোমাদের চালাবে কে?'

লোকগুলো একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। নিজেদের ভেতর তারা বলাবলি করতে লাগল, 'সায়েববাবু আমাগো লগে থাকব। হালার বাঘের এইবার যম আইছে।'

আনন্দ বলল, 'কথা হয়ে গেল। এখন তোমরা বাড়ি যাও। আর হ্যাঁ, যতদিন না বাঘটা মারা পড়ছে, প্রতি সপ্তাহে রবিবার করে এখানে মিটিং হবে। দুপুরবেলা তোমরা চলে আসবে। যদি বাঘ মারার অন্য কোনো ভাল ফন্দি মাথায় আসে, তোমাদের বলে দেব।'

'আইচ্ছা।'

বাঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যে যার বাড়ি চলে গেল। হতভাগ্য প্রাণীটা জানতেও পারল না তার বিরুদ্ধে কি ভীষণ ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

মিটিং শেষ হলে আনন্দকে ধরে বাড়ি নিয়ে এল বিনু। সুধা-সুনীতি উঠোনেই ছিল। ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে সুধা বলল, 'বাবা, একেবারে বীরবেশে যে! দ্যাখ দিদি, দ্যাখ—'

সুনীতি চোরা চোখে আনন্দকে দেখে নিয়ে মুখ নীচু করল, তারপর নখ খুঁটতে লাগল। তার মুখে মৃদু কৌতুকের হাসি আলতোভাবে লেগে রইল।

সুধা এবার এগিয়ে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, 'বন্দুক, টোটার মালা, ভোজালি—যেভাবে সেজেছেন, তাতে বাঘটাকে না মারলেও চলবে।'

ভুরু অল্প কুঁচকে আনন্দ বলল, 'কেন ?'

'এই বীরবেশ একবার যদি বাঘটাকে দেখিয়ে দিতে পারেন, রাজ্য ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে।'

আনন্দ কি বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। স্নেহলতা কোথায় ছিলেন, আনন্দকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। বললেন, 'এস দাদা, এস—'

তারপর যতক্ষণ আনন্দ এ বাড়িতে রইল, সুধা তার পেছনে লেগে থাকল।

দু-চার দিনের ভেতর দেখা গেল, রাজদিয়া এবং চারপাশের গ্রামগুলোতে একটা সুপুরি গাছ কিংবা বয়রা বাঁশও আর আস্ত নেই। সব লাঠি এবং সড়কি হয়ে গেছে।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, রবিবার রবিবার ধানকাটা ফাঁকা মাঠে মিটিং বসবে। এক রবিবার পরই সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিল আনন্দ। নতুন করে স্থির হল, রোজ সবাইকে আসতে হবে। বাঘ বলে কথা!

দু-চারদিন যাতায়াতের পর হঠাৎ একদিন আনন্দ বলল, 'বাঘ মারা সহজ ব্যাপার না, বুঝলে ?'

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'হেয়া আর বুঝি না!'

'এর জন্য সকলকে এক-মন এক-প্রাণ হতে হবে।'

'আইজ্ঞা হেয়া তো হইতেই হইব।'

'আমি ভাবছি—'

চারপাশের বিপুল জনতা দম বন্ধ করে উৎসুক তাকিয়ে রইল।

আনন্দ বলল, 'সৈন্যদের মতন তোমাদের প্যারেড করতে হবে। তাতে একসঙ্গে কাজ করার প্রেরণা পাবে।'

'পেরেট কী ?

'ঐ লেফট-রাইট করা।'

পরের দিন থেকেই প্যারেড শুরু হল। দেখা গেল, কেউ লুঙ্গি মালকোচা দিয়ে পরেছে। তার পাশেই হয়তো একজনের পরনে খাটো ধুতি এবং ফতুয়া, গলায় তিনলহর তুলসীর মালা। তার পরের লোকটি পাজামা পরে এসেছে।

নানারকম বেশভূষা আনন্দর পছন্দ না। দু-একদিন দেখে আনন্দ বলল, 'তোমরা এক কাজ কর।'

'কি ?'

'সবাই একটা করে খাকি প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট করিয়ে নাও। একরকম পোশাক পরলে দেখতে ভাল, কাজেরও সুবিধে।'

এইবার জনতা বিদ্রোহী হয়ে উঠল, 'কি যে ক'ন সায়েববাবু, তার ঠিক ঠিকানা নাই। এই আকালে খাইতে না পাইয়া মরতে বসছি। আপনে ক'ন পেন্টুল-জামা বানাইতে। ঐ সগলে আমরা নাই।'

পাছে সেনাদল ভেঙে যায়, এই আশঙ্কায় আনন্দ বলল, 'আচ্ছা থাক থাক, শার্ট-টার্ট বানাতে হবে না।'

ধুতি-লুঙ্গি-পাজামার বিচিত্র সমন্বয়ের ভেতর বিপুল সমারোহে প্যারেড চলতে লাগল।

প্যারেড করতে করতে বাঁয়ের জায়গায় ডান পা তুললে রক্ষা নাই, অমনি আনন্দের হাতের বেত পায়ের গোছে এসে পড়ে। আনন্দের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ না।

প্যারেড শুরু হবার পর বেশ কিছুদিন বাঘটাকে আর দেখা গেল না। তার বিরুদ্ধে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে, এ খবর কি সে জেনে ফেলেছে? যাই হোক, মানুষ খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে, তবে সতর্ক আছে। সন্ধের আগে আগেই যথারীতি ঘরে ঢুকে খিল দিচ্ছে তারা। এইভাবেই চলতে লাগল।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা বারুইবাড়ির প্রাণবল্লভ মাঠের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এবং চেঁচাতে চেঁচাতে হেমনাথের বাড়ি এসে হাজির, 'খাইছে রে খাইছে, আমারে খাইয়া ফালাইল রে—'

পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, চারদিকের ঘর থেকে সুধা-সুনীতি বিনু-ঝিনুক অবনীমোহন-হেমনাথ, বাড়ির সবাই ছোটাছুটি করে বেরিয়ে এলেন।

উদ্বিগ্ন মুখে শুধোলেন, 'কী হয়েছে প্রাণবল্লভ, কী হয়েছে?'

প্রথমটা কথা বলতে পারল না প্রাণবল্লভ। হাত-পা-ঠোঁট, তার সারা শরীর ভয়ে থরথর কাঁপছে। হাত ধরে তাকে বারান্দায় বসালেন হেমনাথ। বললেন, 'আগে শান্ত হ, পরে বলবি।'

কাঁপা ভাঙা ভাঙা গলায় প্রাণবল্লভ বলল, 'এট্টু জল বড়কত্তা—'

জল খেয়ে খানিকটা শান্ত হল প্রাণবল্লভ। তারপর যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। ভোরবেলা মেটে আলুর সন্ধানে সে ধানকাটা মাঠে গিয়েছিল। আলের ধারে ঘুরে ঘুরে দু-চারটে যোগাড়ও করেছিল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে, দক্ষিণের চকে মাঠের মাঝখানে গুটিসুটি মেরে বাঘটা শুয়ে আছে।

প্রাণবল্লভের কথা শেষ হলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে হেমনাথ বললেন, 'সুধাদিদি সুনীতিদিদি, শিগ্‌গির শাঁখ বাজা। বাঘের খবর পেলেই আনন্দ শাঁখ-টাঁখ বাজাতে বলেছিল না?' সেদিনকার মিটিং-এর কথা কারো জানতে আর বাকি নেই।

সুধা-সুনীতি ছুটে গিয়ে ঘর থেকে শাঁখ বার করে আনল, তারপর দুই বোন গাল ফুলিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগল।

প্রাণবল্লভের ভয় কেটে গিয়েছিল। লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে আকাশে হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্দে মাতরম্—'

'বন্দে মাতরম্'-এর এরকম প্রয়োগ আগে কখনও দেখে নি বিনু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ পাড়া, সে পাড়া এবং দূর-দূরান্ত থেকে শাঁখ-কাঁসর এবং টিন পেটাবার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু শোনা যেতে লাগল, 'বন্দে মাতরম্—'

'কালী মাঈকী জয়—'

মুসলমান পাড়ার দিক থেকে আওয়াজ আসতে লাগল, 'আল্লা হো আকবর—'

তারপরেই হো-হো চিৎকারে দিগ্‌দিগন্ত তোলপাড় করে অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে পড়ল। সবার হাতে লাঠি আর সুপুরি কাঠের সড়কি।

হেমনাথ প্রাণবল্লভকে বললেন, 'যা শিগ্‌গির, আনন্দকে বাঘের খবরটা দিয়ে আয়।'

স্নেহলতা বললেন, 'যা চেঁচামেচি আর কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ তাতে খবর পেতে কি তার বাকি আছে?'

'তবু যাক।'

প্রাণবল্লভ রামকেশবের বাড়ি ছুটল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে খবর দিল, সে একাই না, আরো অনেকে আনন্দকে বাঘের খবর দিতে গিয়েছিল। কিন্তু আনন্দকে পাওয়া যাচ্ছে না।

হেমনাথ বললেন, 'সে কি! কাজের সময় সেনাপতিই নিরুদ্দেশ!'

প্রাণবল্লভ কি বলতে গিয়ে থেমে গেল, হেমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

তার মনের কথাটা যেন পড়তে পারলেন হেমনাথ। বললেন, 'কিছু বলবি ?'

'হ—'

'বল না—'

'অপরাধ যদি না ন্যান কথাখান কই—' বলে হাত জোড় করল প্রাণবল্লভ।

হেমনাথ অবাক, 'অপরাধ নেব কেন ?'

হাতজোড় অবস্থাতেই প্রাণবল্লভ বলল, 'আমার মনে হইল সায়েববাবু বাড়িতেই আছে, ভিতরে তেনার গলাও য্যান পাইলাম। কিন্তুক মা ঠাইরেনরা কইয়া দিল তেনি নাই—'

হেমনাথ ধমকের গলায় বললেন, 'কি যা তা বলছিস!'

'বিশ্বাস যান না বড়কত্তা ?'

'না।'

'বিশ্বাস না যাওনেরই কথা। কিন্তুক—'

'কিন্তু কী ?'

'সাক্ষী আছে।'

'কে সাক্ষী ?'

প্রাণবল্লভ একে একে নাম করে যেতে লাগল, 'গণকবাড়ির মহেন্দর, কামারবাড়ির নিমাই, সোনারুবাড়ির অনন্ত, কালিমুদ্দি মাঝি, বরাতুল্লা নিকারী—কত মাইনষের নাম কমু ?'

'এত লোক আনন্দের খোঁজে গিয়েছিল!' হেমনাথের চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

'হ। বাঘ দেখলে তেনিই তো খপর দিতে কইছিল।'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা তুই যা এখন—'

প্রাণবল্লভ চলে গেল।

ওদিকে আরেক কান্ড চলছিল। লাঠি সড়কি নিয়ে রাজদিয়ার লোক তো মাঠের দিকে ছুটছিলই। দিগন্তের ওপারের কৃষাণ গ্রামগুলো থেকে শত শত মানুষ ছুটে আসছিল, তাদের হাতেও লাঠি-সড়কি এবং নানারকম অস্ত্র।

শাঁখ, কাঁসর এবং টিন পেটাবার আওয়াজ আসছিলই। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছিল, 'বন্দে মাতরম্।'

'কালী মাঈকী জয়—'

'আল্লা হো আকবর—'

ধানকাটা শীতের মাঠ পানিপথ কি হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিতে শুরু করেছে।

বিনু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আমি মাঠে যাব দিদা—'

'মাঠে কেন রে দাদাভাই ?' স্নেহলতা চমকে উঠলেন।

'বাঘ মারা দেখতে।'

'না না, ওখানে তোমাকে যেতে হবে না।' জোরে জোরে প্রবলবেগে হাত নাড়তে লাগলেন স্নেহলতা, চোখেমুখে তাঁর ভয়ের ছায়া পড়ল।

'আমি যাবই—' ঘাড় গোঁজ করে পা ছুঁড়তে লাগল বিনু। শাঁখ-কাঁসরের শব্দ, ঘন ঘন 'বন্দে মাতরম্' আর 'আল্লা হো আকবর' তার রক্ত চঞ্চল করে তুলেছে।

'ওখানে কি হবে, কেউ বলতে পারে! বাঘটা যদি কোনোরকমে ছিটকে তোর কাছে চলে আসে—'

'আমি ঐ হিজলগাছের মাথায় চড়ে দেখব—' দূর মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল বিনু।

স্নেহলতা বললেন, 'গাছে-টাছে চড়তে হবে না। তুই ঘরে গিয়ে বোস। জানলা দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তার বেশি দেখবার দরকার নেই।'

বিনু শুনল না, উর্ধ্বশ্বাসে মাঠের দিকে ছুটল। আজ আর তাকে বাড়িতে আটকে রাখা গেল না। মাঠজোড়া রণভূমি তাকে বিপুল আকর্ষণে টেনে নিয়ে গেল।

পেছনে স্নেহলতার ভীত ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল, হেমনাথ আর অবনীমোহনকে তিনি বললেন, 'তোমরা ছেলেটাকে আটকালে না? আজ কী যে হবে! যাও যাও, ওকে ফেরাও—'

হেমনাথরা কি উত্তর দিলেন, বিনু শুনতে পেল না। তার আগেই ছায়াচ্ছন্ন ঝুপসি বাগান পেরিয়ে, মাঘের নিস্তরঙ্গ পুকুর পেছনে ফেলে, ফসলশূন্য ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল।

চারদিক থেকে জনতা গোল হয়ে ছুটছে। সম্মোহিতের মতন তাদের পিছু পিছু দৌড়তে লাগল বিনু।

দক্ষিণের চকে এসে দেখা গেল, সত্যি সত্যি মাঠের মাঝ-মধ্যিখানে বাঘটা শুয়ে আছে। চারধার থেকে গোল হয়ে জনতা ঝড়ের মতন নেমে আসছিল। বাঘটা যখন সিকি মাইলের মতন দূরে সেই সময় কেউ যেন মন্ত্র পড়ে হঠাৎ তাদের থামিয়ে দিল।

একধারে সারি সারি অনেকগুলো হিজল গাছ। বিনু আর দেরি করল না, সব চাইতে উঁচু গাছটার মগডালে চড়ে বসল। ভাটির দেশে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার আগে বিনুকে গাছে চড়া শিখিয়ে দিয়েছিল যুগল।

শাঁখ-কাঁসরের আওয়াজ থেমে গেছে। 'কালী মাঈকী জয়' কিংবা 'আল্লা হো আকবর'-ও আর শোনা যাচ্ছে না। জনতা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'সায়েববাবু কই?'

আট দশটা লোক চিৎকার করে বলল, 'বাড়িত্ নাই।'

'অহন কী করা?'

'সায়েববাবু তো কইছিল, বাঘ দেখলে তেনারে খপর দিতে। তেনি নাই, আমরা ফিরাই যাই।'

'সগলেরে তাইলে ফিরনের কথা কইয়া দ্যাও। বাঘ মারণ বইলা কথা। সায়েববাবু না থাকলে আমাগো চালাইব কে?'

একটা লোক চিৎকার করে ফেরবার কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাজিতপুরের জোয়ান ছেলে হালিম বলল, 'কিছুতেই না। অ্যাদ্দুর আইসা ফিরা যামু না। সুযুগ যহন পাইছি, শালার বাঘেরে নিকাশ করুম।' বলেই আকাশের দিকে হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে চেঁচাল, 'আউগাও (এগোও) ভাইসগল—'

নিমেষে জনতার ভেতর সাড়া পড়ে গেল।

'আল্লা হো আকবর—'

'কালী মাঈকী জয়—'

তারপরেই বাঘটাকে ঘিরে মানুষের বৃত্ত ছোট হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু জন্তুটা যখন তিনশ' গজের মতন দূরে, লোকগুলো আবার থেমে গেল।

আনন্দ নেই। সেনাপতিত্ব আজ হালিমের দখলে। প্রেরণা দেবার জন্য পেছন থেকে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আউগাও—'

ঠেলে ঠেলে জনতাকে আরো অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেল হালিম। কিন্তু বাঘটা যখন একশ' গজ দূরত্বে তখন আর পারা গেল না।

এতদূর থেকে লাঠি-সড়কি দিয়ে অন্তত বাঘ মারা যায় না। হালিম শূন্যে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সমানে চেঁচাতে লাগল, 'আউগাও ভাইরা, আউগাও—'

কিন্তু এত অনুপ্রেরণাতেও কাজ হল না। লোকগুলো একেবারে অনড়, কেউ যেন পেরেক ঠুকে মাটিতে তাদের পা আটকে দিয়েছে।

ওদিকে আরেক ব্যাপার ঘটল। বাঘটা ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ এত চেঁচামেচি শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

হিজল গাছের মাথা থেকে বিনুর মনে হল, বাঘটা দশ হাতও না, বারো হাতও না, ছ' সাত হাতের মতন লম্বা। হলুদ শরীরে তার কালো ডোরা।

কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাবার জন্য খুব সম্ভব বাঘটা বিরক্ত হয়েছিল এবং এত লোকজন দেখে কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা হকচকিত। সে সামনের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে শ'খানেক লোক অস্ত্র-টস্ত্র ফেলে প্রাণপণে ছুটল, এবং নিমেষে দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার বাঘটা তাকাল ডানদিকে, তক্ষুনি দু'আড়াইশ লোক আর নেই। অনেকে মালকোচা দিয়ে লুঙ্গি পরে এসেছিল, ছুটবার সময় কাছা খুলে যাওয়ায় লুঙ্গিতে পা আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ধান কেটে নিয়ে যাবার পর যে গোড়াগুলো মাঠময় ছড়িয়ে আছে তাতে হোঁচট খেয়েও অনেকে পড়ে যাচ্ছে। পড়েই তক্ষুনি উঠে পড়ছে, এবং ধাঁ করে পেছনে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার ছুটছে।

সামনে-পেছনে যে দিকেই বাঘটা তাকাচ্ছে, এক অবস্থা। মুহূর্তে সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে তাকাতে তাকাতে সেনাপতির সঙ্গে একবার তার শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একটা ডোরাকাটা লাল লুঙ্গি আর সবুজ জামা প্রায় উড়ে গিয়ে আধ মাইল দূরের একটা খালে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কেউ যখন আর নেই, সেই সময় বাঘটা অলস পায়ে চকের এক প্রান্তে উলুখড়ের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। তারপর হিজল গাছ থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এল বিনু।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাঘ শিকারের ব্যাপারটা দিকে দিকে রটে গেল।

হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'যেমন আনন্দটা তেমনি তার প্যানজার বাহিনী।'

বিনু শুনতে পেল সবার কান বাঁচিয়ে সুধা সুনীতিকে বলছে, 'আচ্ছা বীরপুরুষের গলায় মালা দিবি দিদিভাই—'

সুনীতি মুখ তুলতে পারছিল না, মাটির সঙ্গে সে যেন মিশে যেতে চাইছে।

দিন চারেক পর খবর পাওয়া গেল বাঘটা মারা পড়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লঞ্চে করে রাজদিয়া আসছিলেন, নদীর বাঁকে বাঘটাকে দেখে গুলি করে মেরেছেন।

বাঘের ভয়ে আনন্দ যে বাড়ি থেকে বেরোয় নি, এই কথাটা কেমন করে যেন চারদিকের গ্রামগঞ্জগুলোতে রটে গিয়েছিল। খবরটা যে শুনেছে সে-ই হেসেছে।

এদিকে সেদিনকার সেই মজার ঘটনাটির পর আনন্দর আর দেখা নেই। আগে দিনে দু'বার করে হেমনাথের বাড়ি আসছিল, এখন রামকেশবের বাড়ির একটা ঘরে সে নাকি নির্বাসন বেছে নিয়েছে।

একদিন হেমনাথ গিয়ে আনন্দকে ধরে আনলেন। রগড়ের গলায় বললেন, 'আরে দাদা, তোমার এত লজ্জাটা কিসের ?'

আনন্দ খুবই বিব্রত বোধ করছিল, উত্তর দিল না।

হেমনাথ আবার বললেন, 'লজ্জার কিছু নেই, বুঝলে ভাই। বড় বড় সেনাপতি যারা—যেমন ধর রোমেল, মন্টোগোমারি, দ্য গল—ফ্রন্টে হেঁজিপেঁজি সোলজারের গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কি তারা লড়ে ? তারা দূরে দূরে বসে কলকাঠি নাড়ে। তুমি ঘরে বসে থেকে আদর্শ জেনারেলের মতন কাজ করেছ।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ভয় নেই, এর জন্যে সুনীতিদিদি বরবদল করবে না। কি বলিস রে দিদিভাই ?'

সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুকরা কাছেই ছিল। সুনীতি ছুটে পালিয়ে গেল।

সুধা চোখের তারায় আর ঠোঁটের প্রান্তে ধারাল হাসিটি হেসে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, 'কী বীরপুরুষ, বোঝা গেল। কাঁধে বন্দুক, কোমরে ভোজালি, গলায় টোটার মালা ঝোলানোই সার।'

মাঘের শেষ তারিখে দিন পড়েছে। একই লগ্নে সুধা-সুনীতির বিয়ে। রাত থাকতে থাকতে কাকপক্ষী জাগবার আগে দুই বোনকে বিছানা থেকে তোলা হল। শুরু হল 'অধিবাসের' কাজ।

সুধা-সুনীতিকে নতুন কাপড় পরানো হল, গলায় দেওয়া হল তুলসী কাঠের মালা, কোমরে নতুন লাল ঘুনসি, কপালে চন্দন কুসুমের ফোঁটা, চোখে কাজলের টান, সারা গায়ে ঝকমকে নতুন গয়না, হাতে নতুন শাঁখা।

মেয়ে সাজাবার পর নতুন পিঁড়িতে তাদের পাশাপাশি বসিয়ে শ্বেত পাথরের থালায় খাবার খেতে দেওয়া হল—খই চিড়ে মুড়কি ক্ষীর দই চিনি-বাতাসা। বিনু-ঝিনুকও ওদের সঙ্গে বসে গেল। এরপর সারাদিন বিয়ের কনেরা আর কিছু খাবে না। খাবে সেই রাত্রিবেলা—বিয়ের পর।

সুধা-সুনীতিকে খেতে বসিয়ে তিরিশ-চল্লিশজন এয়ো নিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীর ঘাটে 'জলসই'তে গেলেন স্নেহলতা। সঙ্গে সঙ্গে সানাদার (সানাইবাদক) আর ঢুলী বাজাতে বাজাতে চলল।

'জলে ঢেউ দিও না লো সখি
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না,
আমরা জলের চাতকী।
জলের কালোরূপ নিরখি
জলে ঢেউ দিও না গো সখি।
আগে সখি, পাছে গো সখি
মধ্যে রাধা চন্দ্রমুখী।'

স্নেহলতা যতক্ষণ না ফিরছেন, সুধা-সুনীতি পাত ছেড়ে উঠবে না। এই হচ্ছে রীতি।

কিছুক্ষণ পর স্নেহলতারা নদী থেকে নতুন কলসিতে জল ভরে ফিরে এলেন। যে কলসিটায় জল আনা হয়েছে সেটার নাম মঙ্গলকলস। পাঁচজন এয়ো একসঙ্গে কলসিটা ধরে উলু দিতে দিতে মাটিতে স্থির করে বসাল। একজন তার তলায় আগেই ধানদূর্বা দিয়েছে। বাকিরা গান ধরল :

'ওগো মঙ্গলো আসিছে দুয়ারে
মঙ্গলো অবনী আজ।
মঙ্গলো জলধর, মঙ্গলো কলসে
পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে এসো হরষে,
অতিথি, ভূপতি, দেবতা, স্বদেশে,
মঙ্গলো অবনী আজ।'

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল, বেলা চড়তে লাগল। দুপুরের খানিক আগে পুরুত এল। অবনীমোহন মেয়ে সম্প্রদান করবেন, পুরুত তাঁকে নিয়ে 'বৃদ্ধি'তে বসে গেল। 'বৃদ্ধি'র সময়ও মেয়েরা গান ধরল :

'ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?

ষোল মণ চাউল লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল বিড়া পান লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মণ গুয়া লাগে গো।'

বৃদ্ধির পর এয়োরা শিলে কাঁচা হলুদ বেটে সুধা-সুনীতিকে মাখাল। তারপর ধানদূর্বা নিয়ে তাদের মাথায় দিয়ে উলু দিতে দিতে স্নান করাতে লাগল। সেই সঙ্গে গান:

'তোরা আয় লো সকলে
আমার সীতাকে স্নান করাব
সুশীতল জলে।
কস্তুরী মিশায়ে জল ঢেলে দাও গো
সীতার শিরে।
সখি, সকলে আন গো, মাজ কেটে আনো
কুর হরিদ্রা বেটে আনো—'

সুধা-সুনীতির স্নান হয়ে গেলে, 'অধিবাসে'র তত্ত্ব নিয়ে হেমনাথ আর বিনু বেরিয়ে পড়ল। দু বাড়িতে তত্ত্ব যাবে। মাছ, পান, তামার পরাতে পরাতে নানা রকমের মিষ্টি। এত জিনিস হাতে করে তো নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই ভবতোষের ফিটনটা সকাল বেলাতেই আনিয়ে রেখেছিলেন হেমনাথ।

প্রথমে বিনুরা গেল হিরণদের বাড়ি। সেখানে বেশিক্ষণ বসল না, তত্ত্ব নামিয়ে দিয়ে সোজা রামকেশবের বাড়ি চলে এল।

এখানেও সানাই বাজছে, ঢাক বাজছে। মাঝে মাঝে শাঁখ এবং কল কল উলুর আওয়াজ আসছে।

বিনুরা বাড়ির ভেতর আসতেই সাড়া পড়ে গেল। ঝুমা কোথায় ছিল, ছুটতে ছুটতে সামনে এসে হাজির।

আজ দারুণ সেজেছে ঝুমা। অন্যদিন ফ্রক পরে থাকে। আজ হলুদ রঙের সিল্কের শাড়ি আর লাল টুকটুকে একটা জামা পরেছে। শাড়িটার গায়ে ছোট ছোট নীল ময়ূর। কপালে আগুনের কুঁড়ির মতন কুমকুমের একটি টিপ। টিপটাকে গোল করে ঘিরে চন্দনের বিন্দু। চোখে কাজলের টান। গালে এবং ঠোঁটে লালচে রং। আঙুলে পাথর বসানো লম্বা আংটি, গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, বাঁ হাতের সুডোল নরম কবজিটাকে বেষ্টন করে সরু ফিতেতে বাঁধা চৌকো ঘড়ি।

ঝুমার সাজটাজ নিয়ে ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল বিনু। তার আগেই ঘাড়খানা বাঁকিয়ে গালে একটি হাত রেখে ঝুমাই বলে উঠল, 'বাবা, কি সাজটাই না সেজেছে! একেবারে বরবেশ।'

চমকে নিজের দিকে তাকাল বিনু। তার পরনে ধবধবে পাটভাঙা ধুতি, দুধরং সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে নতুন পাম্প-শু। সাজসজ্জা তারও কিছু কম না। বিব্রত হেসে বিনু বলল, 'না মানে—'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুমা বলতে লাগল, 'যা সেজেছ, এখন কারো সঙ্গে মালা-বদল করিয়ে দিলেই হয়—'

বিনুর আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল। হাসতে হাসতে বলল, 'আমার আপত্তি নেই। একজন যদি রাজি থাকে আজই—' বলে চোখের তারায় ইঙ্গিত করল।

ইঙ্গিতটা বুঝেছে ঝুমা। ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'আহা-হা, আহ্লাদ কত—'

বিনু হাসতেই লাগল।

ঝুমা আবার বলল, 'ওবেলা তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি।'

'বরযাত্রীদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, বাসর জাগব। তোমাকেও জাগতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'বাসরে তোমার কী হাল করি, দেখো।'

'দেখব।'

একটু ভেবে ঝুমা বলল, 'বাসর তো সেই রাত্রিবেলায়। তখন যা হবার হবে। এখন একটু মজা করি—'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কি করবে?'

উত্তর না দিয়ে ছুটে কোথায় চলে গেল ঝুমা। পরক্ষনেই ফিরে এসে বিনু কিছু বুঝবার আগেই এক গাদা হলুদ তার নাকে-মুখে, ধুতি-পাঞ্জাবিতে মাখিয়ে দিল।

বিনু বলতে লাগল, 'কি করছ! কি করছ!'

ঝুমা বলল, 'একদিন তো মাখতেই হবে। মাখলে কেমন লাগে দেখ—'

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বেলা থাকতে থাকতে দুই বর এসে পড়ল। বেশিক্ষণ তাদের বসতে হল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের আসরে নিয়ে যাওয়া হল। সানাই ঢোল কাঁসি আর শাঁখের বাজনা, ঘন ঘন উলুধ্বনি—এর মধ্যে পর পর দুই মেয়েকে সম্প্রদান করলেন অবনীমোহন। সাত পাক ঘোরাবার সময় এয়োরা গান ধরল :

'আমতলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া,
আইল গো সুন্দরীর জামাই মুকুট
মাথায় দিয়া।
মুকুটের তলে তলে চন্দনের ফোঁটা।
চল সখি সবাই মিলা জামাই বরি গিয়া।
ও রাধে ঠমকে ঠমকে হাঁটে
শ্যামচাঁদের পাছে যেমন ময়ূরে প্যাখম ধরে।
আগে যায় গো শ্যাম রাজা
পাছে যায় গো রাধা,
তারও পাছে যায় গো পুরুত
ভৃঙ্গার হাতে লইয়া।
এক পাক, দুই পাক, তিন পাকও যায়,
সাত পাক দিয়া রাধা নয়ন তুইলা চায়।'

বিয়ের আসর থেকে সোজা বাসরঘরে। পাশাপাশি দুই বাসরঘর সাজানো হয়েছে। সেখানে মেয়েদের শুধু ভিড়। ঠাট্টা, ঠিসারা, বিদ্যুৎচমকের মতন হাসাহাসি, ঠেলাঠেলি—এর মধ্যেই দুই ঘরে চাল খেলা, যো-খেলা হয়ে গেল। তারপর শুরু হল জামাই নাজেহাল-করা ধাঁধা। ধাঁধার পর স্নেহলতা রঙ্গিণী মূর্তি ধরলেন। দুই বাসরে ঘুরে ঘুরে মাথায় আড়-ঘোমটা টেনে মাজা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে গাইতে লাগলেন :

'ওগো বর, এলাম তোমার বাসরে
একটা গান গাও না শুনি,
গান যদি না গাও, আমার নাতনীর
ধর পাও,
নহিলে মিলবে না সোনার চাঁদবদনী।'

এত ভিড়ের ভেতর ছুঁচের পেছনে সুতোটির মতন বিনুর পেছনে ঝুমা লেগেই আছে। আর ঝিনুক?

জল খেলা, চাল খেলা, ধাঁধা, নাচ, গান, ঠাট্টা, রগড়—কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না সে। পলকহীন ঝুমা আর বিনুর দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

এ বিয়ের আরো একটি দিক আছে। সেটা এরকম। হেমনাথ রাজ্যসুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন, বিয়ে দেখার নেমন্তন্ন। কিন্তু খাবার জন্য তাদেরই ডেকেছিলেন যারা দেশজোড়া আকালে আর মন্বন্তরে একটু ফ্যানের আশায় রাজদিয়ার রাস্তায় রাস্তায় প্রেতমূর্তির মতন ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধে থেকে হেমনাথ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করে খাওয়াচ্ছিলেন।

সকাল থেকে লারমোর এ বাড়িতে আছেন। তিনি বলেছেন, 'এ কি করছ হেম! না খেয়ে খেয়ে ওদের পেট মরে গেছে। তার ওপর ভালমন্দ পড়লে আর দেখতে হবে না। সটান যমরাজার দরবারে গিয়ে হাজির হবে।'

হেমনাথ বলেছেন, 'এমনি মরবে, অমনিও মরবে। না খেয়ে মরে কী হবে, খেয়েই মরুক।'

খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় গদু চক্কোত্তি এসে হাজির। যুগলের বৌভাতে সে এসেছিল, তারপর এই দেখা গেল। চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে গদুর। বুকের হাড়গুলো গুনে নেওয়া যায়, চোখ এক ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে গেছে।

হেমনাথ বললেন, 'তোমার এ কি হাল হয়েছে চক্কোত্তি!'

গদু চক্কোত্তি বলল, 'আর কইয়েন না হ্যামকত্তা, না খাইয়া খাইয়া শরীল গেল। যা আকাল পড়ছে তাতে কেউ আর খাইতে দ্যায় না। আগে মাইনষে আনন্দ কইরা খাওয়াইত, অহন আমারে দেখলে মুখ ফিরাইয়া লয়। যা দুদ্দশা, তাগোই বা দোষ কী?'

'সে তো ঠিকই। অনেক রাত হয়ে গেছে, হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে যাও।'

যুগলের বিয়ের সময় গদু চক্কোত্তি যা খেয়েছিল সুধা-সুনীতির বিয়েতে তার তিনগুণ খেল। কিন্তু কে জানত, এই খাওয়াই তার শেষ খাওয়া।

যাই হোক, খেয়ে টেয়ে চলে গেল গদু চক্কোত্তি। দিন দুই পর খবর এল, এখান থেকে মাইল তিনেক দূরের এক গ্রামে ভেদবমি করে সে মারা গেছে।

সুধা-সুনীতির বিয়ের মাসখানেক পর একদিন দুপুরবেলা ভয়ানক শ্বাসকষ্ট শুরু হল সুরমার। তক্ষুনি লারমোরকে ডেকে আনার জন্য করিমকে পাঠানো হল। কিন্তু লারমোর পৌঁছুবার আগেই সব শেষ।

এ বছর পুজোর পর থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন সুরমা। চলাফেরা দূরের কথা, উঠে বসবার শক্তিটুকু পর্যন্ত তাঁর ছিল না। অদৃশ্য রক্তচোষা দেহের সব সার যেন চুষে নিয়ে একটা বাজে সাদা কাগজের মতন সুরমাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

এবাড়ির লোকেরা মনে মনে অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। বুঝতে পারছিল, সুরমা খুব বেশিদিন বাঁচবেন না। দ্রুত আলো নিভে আসার মতন তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছিল। যা অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী, আজ দুপুরবেলা তাই ঘটে গেল।

খবর পেয়ে সুধা-সুনীতি-হিরণ-আনন্দ ছুটে এল। শুধু কি ওরাই, কুমোরপাড়া-কামারপাড়া-যুগীপাড়া-তিলিপাড়া, সারা রাজদিয়াই বা কেন, মৃত্যু-সংবাদ কানে যেতে চারদিকের গ্রামগঞ্জগুলো থেকে

অসংখ্য মানুষ মলিন মুখে হেমনাথের বাড়ির দিকে আসতে লাগল।

সমস্ত বাড়িখানা জুড়ে কান্না ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সুধা-সুনীতি সুরমার অসাড় বুকে মুখ গুঁজে অবোধ শিশুর মতন কাঁদছিল, 'তুমি আমাদের ফেলে কোথায় গেলে মা ?'

সুরমার শিয়রের কাছে বসে ছিলেন স্নেহলতা আর শিবানী। সজল চোখে ভাঙা ভাঙা গলায় তাঁরা বলছেন, 'আমাদের কাঁদাবি বলেই কি এতদিন পর রাজদিয়া এসেছিলি মা !'

একধারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ঝিনুক। আরেক ধারে হেমনাথ এবং অবনীমোহন ঘন ঘন হাতের পিঠে চোখ মুছছিলেন। তাঁদের চোখ ফোলা ফোলা, আরক্ত, জলপূর্ণ।

এত কান্নার মাঝখানে বিনু কিন্তু একটুও কাঁদতে পারছিল না। বুকের ভেতর পাষাণভারের মতন কি যেন চেপে আছে, চোখ ফেটে যাচ্ছে কিন্তু এক ফোঁটা জলও বেরুচ্ছে না। এত লোকজন, এত কান্না, শোকোচ্ছ্বাস—কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না সে। কিছুই দেখতে বা বুঝতে পারছিল না। বিনুর সমস্ত অনুভূতি বুঝিবা অসাড়, অবোধ হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল।

ওদিকে কারা যেন কুড়োল দিয়ে বাগানের বুড়ো একটা আমগাছ কেটে ছোট ছোট খন্ড করে ফেলল। তারপর পুকুরের ওপারে উঁচু মতন জায়গাটায় চিতা সাজাল।

এদিকে স্নেহলতার সিঁদুরে-চন্দনে এবং রাশি রাশি ফুলে সুরমাকে সাজিয়ে দিলেন। তারপর কারা যেন হরিধ্বনি দিয়ে তাঁকে কাঁধে তুলে পুকুরপাড়ের দিকে নিয়ে গেল। হেমনাথ বিনুর একটা হাত শক্ত করে ধরে শবযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। সুধা-সুনীতি-স্নেহলতা-শিবানী-অবনীমোহন—কেউ বাড়িতে থাকল না। সবাই চলেছে আর অভিভূতের মতন বুক ফাটিয়ে কাঁদছে।

বিনুর মনে হল, সে যেন মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছে না, হাওয়ার ভেতরে ভারহীন হাল্কা শরীর নিয়ে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে।

চিতায় তুলবার আগে সুরমাকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হল। পুরুত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছিল। শব্দগুলো কানে আসছিল ঠিকই কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না বিনু।

একটু পর সুরমাকে চিতায় তোলা হল। এবার মুখাগ্নির পালা। বিনুকেই তা করতে হবে। কে যেন সাদা ধবধবে একগোছা পাটশোলার মাথায় আগুন ধরিয়ে তার হাতে দিল। হেমনাথ তাকে ধরে চিতার চারধারে প্রদক্ষিণ করাতে লাগলেন। পুরুতটা মন্ত্র পড়তে পড়তে আগে আগে চলতে লাগল। বিনুর মনে হতে লাগল, তার চারপাশে সমস্ত চরাচর যেন দুলছে।

চিতাটাকে ক'বার প্রদক্ষিণ করেছে, বিনু মনে করতে পারল না। একসময় পুরুতের কথায় মন্ত্রচালিতের মতন সুরমার মুখে পাটকাঠির আগুন ছোঁয়াল।

শবযাত্রীরা চারদিক থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'বল হরি—'

'হরি বোল—'

তার পরেই চিতার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

কতক্ষণ আর ? চৈত্র মাসের রাত গাঢ় হবার আগেই সুরমার রুগ্ন শীর্ণ দেহ চিতাধূমে বিলীন হয়ে গেল।

আগুন নিভে গেলে চিতা ধুয়ে শবযাত্রীরা পুকুরঘাটে স্নান করল, বিনুকেও স্নান করানো হল, তারপর নতুন কোরা কাপড়ের তেউনি পরানো হল তাকে, গলায় লোহার চাবি-বাঁধা ধড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হল, হাতে দেওয়া হল একটুকরো কম্বলের আসন।

পরদিন থেকে শুরু হল হবিষ্যি। ঘরের এক কোণে নিজের হাতে নতুন মালসায় আলো চালের একসেদ্ধ ভাত রাঁধে বিনু। কাছে বসে সজল চোখে দেখিয়ে দেন স্নেহলতা। রাতে একটু দুধ আর

ফল-টল খেয়ে খালি মেঝেতে একটুকরো নতুন কাপড় পেতে শুয়ে পড়ে।

রাজদিয়ার সব বাড়ি থেকে হবিষ্যির উপকরণ পাঠাচ্ছে—আলো চাল, কাঁচা দুধ, সর বাটা ঘি, আলু, কাঁচকলা ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধ চুকে গেল। শ্রাদ্ধের পরদিন মৎস্যমুখী। রাজদিয়ায় হেন মানুষ নেই যে সুরমার শ্রাদ্ধে না এসে পেরেছে।

বিনুদের সংসারে এই প্রথম মৃত্যু। একটি মৃত্যুই বিনুর চোখে জগতের রূপ একেবারে বদলে দিয়ে গেছে।

এখন, এই চৈত্র মাসে হিজলগাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতে শুরু করেছে। কাউগাছের ডালে ডালে গুটি ধরেছে। মান্দার আর শিমুল গাছগুলো সারা গায়ে থোকা থোকা আগুনের মতন লাল টুকটুকে ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাগানের আমগাছগুলোতে গাঢ় সবুজ রঙের আম লম্বা বোঁটায় সারাদিন দোল খাচ্ছে। পরিষ্কার করে মুছে দেওয়া আয়নার মতন আকাশটা ঝকমকে। সকালে-দুপুরে-বিকেলে, পুকুরের ওপারে শূন্য মাঠের মাথায় কত রকমের পাখি যে উড়তে থাকে—কানিবক, পানিকাউ, টিয়া, বুলবুলি, ধবধবে গো-বক।

যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, এখন শুধুই রঙের সমারোহ। লালে নীলে সবুজে অপরূপ এই বসুন্ধরা বিনুকে আজকাল আর আকুল করে না। যুগল চলে যাবার সময় ধানের খেত, শাপলা বন, জলসেঁচি শাকের ঘন জঙ্গল, উলু খড়ের বন, কেয়া ঝোপ, বেত ঝোপ, বনতুলসীর চাপ চাপ অরণ্য—জল বাংলার সজল শ্যামল ভূখণ্ডের সবটুকুর উত্তরাধিকার তার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। এই সেদিনও একা একা শূন্য মাঠে আলপথ ধরে মোহাচ্ছন্নের মতন হেঁটে যেতে তার ভাল লাগত। আকাশ জুড়ে ফিনফিনে পাতলা ডানায় ফড়িংদের ওড়াওড়ি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যেত। চনচনে সোনালি রোদ, উল্টোপাল্টা বাতাস, গাছপালা, বনানী, নরম তৃণদল—সব যেন জাদুকরের মতন তাকে সম্মোহিত করে ফেলত।

কিন্তু আজকাল সারা দিনই প্রায় পুবের ঘরের পৈঠেয় চুপচাপ বসে থাকে বিনু। পুকুরের ওপারে ধু-ধু দক্ষিণের চক, অনেক দূরের দিগন্ত, আকাশ, বনভূমি—সব মিলিয়ে যেন এক অপরিচিত মহাদেশ। ওখানকার কোনো কিছুই সে জানে না, চেনে না। কোনোদিন ওখানে সে যেন যায় নি, যাবার আকর্ষণও বোধ করে না।

দিনের বেলায় একটা দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে বিনুর। সুরমাকে যেখানে পোড়ানো হয়েছে তার পাশেই উঁচু বাজে-পোড়া সুপুরি গাছটার মাথায় সমস্ত দিন একটা শঙ্খচিল ডানা মুড়ে বসে থাকে, সন্ধে হলেই পাখিটা উড়ে যায়।

শুধু দিনের বেলাতেই না, রাত্তিরেও ঐ পৈঠেটিতে বসে থাকে বিনু। তার চোখের সামনে একটি দু'টি করে তারা ফুটতে ফুটতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে যায়। এক সময় চাঁদও ওঠে।

রাজদিয়ায় আসার পর হেমনাথ তাকে নক্ষত্র চিনিয়েছিলেন। ঐ তারাটা অরুন্ধতী, ঐটা লুব্ধক, ঐটা শতভিষা। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে বিনু শুনেছিল, মানুষ মরে গেলে নাকি আকাশের তারা হয়ে যায়। ঐ সুদূর জ্যোতিষ্কলোকের কোন তারাটি তার মা, কে জানে।

প্রায় রোজই ঝিনুক তার পাশে এসে নিঃশব্দে বসে পড়ে। কখন যে মেয়েটা আসে টেরও পাওয়া যায় না। হঠাৎ একসময় আধফোটা ঝাপসা গলায় সে ডেকে ওঠে, 'বিনুদা—'

বিনু মুখ ফেরায় না। উদাস গলায় বলে, 'কী বলছ?'

'পিসিমার জন্যে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

বিনু চুপ।

বিনু আবার বলল, 'জানো বিনুদা, মায়ের জন্যে আমারও খুব কষ্ট হয়।'

হঠাৎ বিনু ভাবে, ঝিনুকের সঙ্গে এক জায়গায় তার ভারি মিল। মেয়েটাকে বড় আপনজন মনে হয়।

সুরমার মৃত্যুর কারণে অনেক দিন স্কুল কামাই হয়েছে। প্রায় মাসখানেক পর আজ স্কুল গেল বিনু।

সেটেলমেন্ট অফিসের কাছে আসতে ঝুমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আচমকা বিনুর মনে পড়ল, মায়ের মৃত্যুর পর রাজদিয়ার সব মানুষ তাদের বাড়ি গেছে। শুধু ঝুমা বাদ।

ঝুমা বলল, 'তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ বিনুদা।'

আবছা কি উত্তর দিয়ে বিনু বলল, 'মা স্বর্গে গেল। তুমি তো আমাদের বাড়ি একদিনও এলে না?'

দুই হাত এবং মাথা জোরে জোরে নেড়ে ঝুমা বলল, 'তোমাদের বাড়ি গেলেই তো কান্নাকাটি, ও-সব ভাল লাগে না।'

পলকে মুখখানা মলিন হয়ে গেল বিনুর। মনে হল, ঝুমা বড় দূরের মানুষ।

সুরমার মৃত্যুর মাস দুই পর সুনীতিকে নিয়ে আনন্দ কলকাতা চলে গেল। তাদের সঙ্গে শিশিররাও গেলেন। কলকাতার অবস্থা নাকি এখন ভাল। জাপানি বোমার ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা সব ফিরে যেতে শুরু করেছে সেখানে।

যাবার আগের দিন সুনীতিরা দেখা করতে এসেছিল, ঝুমাও এসেছিল ওদের সঙ্গে।

আড়ালে ডেকে নিয়ে ঝুমা বিনুকে বলেছে, 'আমরা যাচ্ছি। কলকাতায় গিয়ে চিঠি দেব। তুমিও কিন্তু চিঠি লিখবে।'

আস্তে ঘাড় কাত করেছে বিনু।

সুনীতিরা চলে যাবার পর দুটো সপ্তাহও কাটল না। একদিন সকালবেলা হিরণ এসে হাজির।

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার হিরণচন্দ্র?'

'একটা কথা ছিল দাদু—'

'নির্ভয়ে বলে ফেল।'

খানিক ইতস্তত করে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হিরণ বলল, 'আমি কলকাতায় একটা ভাল চাকরি পাচ্ছি দাদু—'

হেমনাথের ভুরু কুঁচকে গেল, 'কিসের চাকরি?'

'ওয়ারের। অফিসার র‍্যাঙ্কের চাকরি। নেব?' হিরণের চোখ চকচক করতে লাগল।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হেমনাথ, 'ওয়ারের চাকরি নিবি বলেই কি তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম? তুই চলে গেলে কলেজের কী হবে? ছি ছি, লোভটাই বড় হল?'

হিরণের মুখ কালো হয়ে গেল।

এর পর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন হেমনাথ। বুঝলেন, হিরণকে আঁকাবার চেষ্টা বৃথা। যুদ্ধের চাকরি তার অসীম শক্তি দিয়ে হিরণকে রাজদিয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেই। এক সময় গম্ভীর গলায় হেমনাথ বললেন, 'ইচ্ছে যখন হয়েছে, যাও। তবে এতে আমার ভীষণ আপত্তি—' হেমনাথকে

খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। খুবই হতাশ আর করুণ।

দিনকয়েক পর সুধাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল হিরণ।

দেখতে দেখতে আরো ক'মাস কেটে গেল।

সুরমা নেই। সুধা-সুনীতি চলে গেছে। হেমনাথের বাড়িটা এখন নিঝুম। কিছুদিন আগেও হৈ-চৈ, হুল্লোড় এবং জীবনের নানা প্রাণবন্ত খেলায় এ-বাড়িতে সব সময় উৎসব লেগে থাকত। এখন বাড়িটা ঘিরে অপার শূন্যতা নেমে এসেছে যেন।

মাঝে মাঝে শিবানী আর স্নেহলতা সুরমার জন্য বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন। অবনীমোহন আর হেমনাথ উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।

এখন বর্ষা।

মেঘ-বৃষ্টি-বাজ আর ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক—চতুরঙ্গে আকাশ সারা দিন সেজেই আছে। ক'বছর ধরেই বিনু দেখছে, বর্ষা নামলেই পুকুরের ওপারের মাঠ ভেসে যায়। তার মাঝখানে কৃষাণ-গ্রামগুলো দ্বীপের মতন কোনো রকমে মাথা তুলে থাকে। মাটির তলায় কোথায় যে শাপলা-শালুক আর পদ্মের বীজ লুকিয়ে থাকে, কে বলবে। জল পড়লেই লাফ দিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। সাদা সাদা শাপলা ফুলে, থালার মতন বড় বড় গোল পদ্মপাতায় আর লাল টুকটুকে শালুকে জলপূর্ণ চরাচর ছেয়ে যায়। গাঢ় সবুজ রঙের ধান আর পাটের চারাগুলো বর্ষায় জলের ওপর দিয়ে মাথা তুলে থাকে। মাঝে মাঝে এক আধটা নিঃসঙ্গ বউন্যা গাছ, কোথাও বা হিজলের সারি।

এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে, যেদিকেই তাকানো যাক, চোখ জুড়ে বর্ষার সেই পরিচিত জলছবি।

সেদিন সন্ধেবেলা বিনু আর ঝিনুক পুবের ঘরে পড়তে বসেছিল। সামনে আড়াইতলা পিলসুজে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। অবনীমোহন এবং হেমনাথও এ ঘরেই ছিলেন। আজকের স্টিমারে যে খবরেরকাগজখানা এসেছে, দু'জনে ভাগাভাগি করে পড়ছেন। সুরমার মৃত্যুর পর কাগজ নিয়ে আজকাল আর এ-বাড়িতে আসর বসে না।

বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ ঝুমঝুম আওয়াজে বিনুরা মুখ তুলে তাকাল।

চোখের সামনে থেকে কাগজ নামিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এই বৃষ্টিতে আবার কে এল?'

ততক্ষণে বিনু দেখতে পেয়েছে। উঠোনের মাঝখানে ঝিনুকদের ফিটনটা এইমাত্র এসে থামল।

বিনু বলল, 'মনে হচ্ছে ভবতোষ মামা এসেছেন—'

সত্যিই ভবতোষ। একটু পর তিনি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

ভবতোষের দিকে তাকিয়ে সবাই চমকে উঠল। চুল এলোমেলো, চোখ দুটো লাল টকটকে এবং ফুলে ফুলে অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেছে। মনে হয়, যে কোনো সময় সে দুটো ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। চোখের কোলে গাঢ় কালির ছোপ, কণ্ঠার হাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। জামার বোতাম নেই, বুকটাও হাট করে খোলা, কোঁচার দিকটা অনেকখানি খুলে মাটিতে লুটোচ্ছে।

কেউ কিছু বলবার আগেই ভাঙা ভাঙা ঝাপসা গলায় ভবতোষ বললেন, 'কাকাবাবু, আপনার বৌমা সেই লোকটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে—' তাঁর চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল।

হেমনাথ চকিত হলেন, 'সে কি! বৌমা তার বাপের বাড়ি ছিল না?'

'হ্যাঁ। ওখান থেকেই গেছে। আচ্ছা আমি যাই—' বলেই প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিটনটায় গিয়ে উঠলেন।

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন একটুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ভব—ভব—'

ভবতোষ সাড়া দিলেন না। ঝুমঝুম আওয়াজ কানে ভেসে এল। অর্থাৎ ফিটনটা চলতে শুরু করেছে।

কী করবেন, হেমনাথ যেন ভেবে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। দ্রুত শ্বাসটানার মতন করে বললেন, 'যা তো দাদা, ভব'র সঙ্গে যা। ছেলেটা আবার ঝোঁকের মাথায় এক কান্ড না করে বসে। সবসময় ওর কাছে থাকবি। যদি তেমন বুঝিস, আজ রাত্তিরে আর ফিরতে হবে না।'

বিনু ছুটে গিয়ে যখন ফিটনটা ধরল তখন সেটা বাগান পেরিয়ে রাস্তার ওপর চলে এসেছে।

ভবতোষ বললেন, 'এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তুমি আবার এলে কেন?'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'দাদু পাঠিয়ে দিলেন।'

শব্দ করে অদ্ভুত হাসলেন ভবতোষ, 'কাকাবাবুর ভয়, আমি বুঝি আত্মহত্যা করব। তা বোধহয় করব না। আচ্ছা, এসেছ যখন ওঠ—'

বিনু গাড়িতে উঠল।

তারপর চমকপ্রদ ব্যাপারটা ঘটল। পথে যত বাড়ি পড়ল সব জায়গায় গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে জড়িত ভাঙা গলায় স্ত্রীর চলে যাবার কথা বলতে লাগলেন ভবতোষ। মানুষের বেদনা প্রকাশের রূপ কী বিচিত্র!

সারা রাজদিয়া ঘুরে ভবতোষ যখন তাঁর বাড়ি ফিরলেন তখন অনেক রাত। বাকি রাতটুকু কেউ আর ঘুমালো না। বিনুকে সামনে বসিয়ে সমানে স্ত্রীর কথা বলে যেতে লাগলেন ভবতোষ। সমস্ত শুনে বিনু যা বুঝল, সংক্ষেপে এইরকম।

বিয়ের আগেই ঝিনুকের মায়ের সঙ্গে একজনের ভালবাসা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর বাপ-মা একরকম জোর করেই ভবতোষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছেন। এ বিয়ে মেনে নিতে পারেন নি ঝিনুকের মা, সংসারে নিয়ত ঝগড়া-ঝাঁটি, অশান্তি লেগেই ছিল। পরিণামে একদিন তিনি বাপের বাড়ি ফিরে গেলেন। আজ সকালে খবর এসেছে, ভালবাসার সেই লোকটির সঙ্গে তিনি চলে গেছেন।

সমস্ত রাত ভবতোষের কাছে কাটিয়ে সকালবেলা বাড়ি ফিরল বিনু। ফিরেই দেখল, একা একা বসে ঝিনুক কাঁদছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিনু। ঝিনুককে দেখতে দেখতে আর মমতায় তার মন ভরে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে ঝিনুকের পাশে গিয়ে বসল সে। খুব কোমল গলায় বলল, 'কেঁদো না ঝিনুক, কেঁদো না—'

দু' হাতে মুখ ঢেকে ঝিনুক ফোঁপাতে লাগল, 'আমার মা চলে গেছে।'

বিনু বলল, 'আমার কথা একবার ভাবো তো, আমারও মা নেই।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে জলভরা গভীর চোখে বিনুর দিকে তাকাল ঝিনুক।

আরো একটা বছর ঘুরে গেল।

এর মধ্যে বিনু ম্যাট্রিক পাস করে রাজদিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। ঝিনুক ক্লাস এইটে পড়ছে।

সুরমার মৃত্যুর পর অনেকদিন এই বাড়ির ওপব দিয়ে উদাস হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। তখন বিনুর মনে হত, পৃথিবীর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতি বুঝি চিরদিনের জন্য থেমে গেছে। মনে হত, চোখের সামনের দৃশ্যময় জগতের কোথাও উজ্জ্বল রং নেই, সব দীপ্তিহীন ধূসর হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে দুঃখের তীব্রতা কমে এসেছে। শোকটা এখন আর অনুভূতিতে নেই, স্মৃতি হয়ে গেছে।

সুধা নেই, সুনীতি নেই, সুরমা মৃত। একদিন এই বাড়িটা ঘিরে সব সময় যেন উৎসব লেগে থাকত। হিরণ আসত, আনন্দ আসত, রুমা-ঝুমারা আসত। জাপানি বোমার ভয়ে যারা দেশে পালিয়ে এসেছিল, তারা আসত। গান-বাজনা-নাটক এবং হুল্লোড়ে বাড়িটা গমগম করত।

ভরা কোটালের পর প্রবল ভাঁটার টানে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাড়িটা আজকাল আশ্চর্য নিঝুম। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, শুধুই শূন্যতা।

সুধা-সুনীতি সেই যে কলকাতায় চলে গিয়েছিল, তারপর আর রাজদিয়ায় আসে নি। মাঝে মাঝে এক আধখানা চিঠি লিখে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখছে শুধু।

সুধা-সুনীতির কথা থাক, নতুন সংসার পেয়ে তারা বিভোর হয়ে আছে। এখান থেকে যাবার পর ঝুমাটা খুব চিঠি লিখত বিনুকে—সপ্তাহে দুটো করে। কবে থেকে চিঠি আসা কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, বিনু লক্ষ্য করে নি।

সময়টা জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি। বাগানের আমগাছগুলো কবেই নিঃস্ব হয়ে গেছে, ডালে ডালে পাতা ছাড়া আর কিছুই নেই। কালোজাম, গোলাপজাম, রোয়াইল আর লটকা ফলের গাছগুলোরও এক অবস্থা। শুধু আষাঢ়ে আমগাছগুলো সারা গায়ে কিছু কিছু ফল সাজিয়ে রেখেছে। তবে বেতঝোপের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, হাল্কা বাদামী রঙের গোল গোল থোকা থোকা বেতফলে ঝোপগুলো ছেয়ে আছে।

গরম শেষ হয়ে এল। এর মধ্যেই আকাশ জুড়ে কালো কালো ভবঘুরে মেঘেরা হানা দিতে শুরু করেছে। ক'দিন আর? আষাঢ় মাস পড়লেই মেঘের টুকরোগুলো ঘন হয়ে জমাট বেঁধে চরাচর ছেয়ে ফেলবে। তারপর শুরু হবে বর্ষা। আকাশ থেকে লক্ষ কোটি বৃষ্টির ধারা সারাদিন ধরে, সারারাত ধরে শুধু নামতেই থাকবে।

চৈত্র-বৈশাখে যে মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, নতুন বর্ষা তাদের জুড়িয়ে দেবে। তপ্ত তৃষিত বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সরস হতে থাকবে। চারদিকে বর্ষা তার সজল ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

একদিন দুপুরে অবনীমোহন কোথায় যেন গিয়েছিলেন। সন্ধেবেলা ফিরে এসে হেমনাথকে বললেন, 'মামাবাবু একটা কথা বলছিলাম—'

হেমনাথ আর বিনু পুবের ঘরে বসে ছিল। স্নেহলতা এইমাত্র এ ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ, 'কী কথা অবনী?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবনীমোহন বললেন, 'আমি আসাম যাব।'

'হঠাৎ আসাম!' হেমনাথ অবাক।

তক্ষুনি উত্তর দিলেন না অবনীমোহন।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ক'দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নেমে যাবে। জমিতে হাল-লাঙল নামাতে হবে। এ সময় তুমি আসাম যেতে চাইছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে—'

'কী?'

'এ বছর আমি চাষ করব না।'

'তবে জমির কী হবে?'

'ভাবছি বর্গাদারদের কাছে ভাগচাষে দিয়ে দেব।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হেমনাথ বললেন, 'আসাম থেকে ফিরছ কবে?'

'কিছুই ঠিক নেই।'

'ওখানে যাবার কী কারণ ঘটল, বুঝতে পারছি না তো!'

'আমি একটা কনট্রাক্ট পেয়েছি।'

'কিসের কনট্রাক্ট?'

'মিলিটারির।'

'মিলিটারির?'

'কই, আমাকে আগে কিছু বলনি তো—'

'আজই পেলাম, আগে বলব কি করে?' অবনীমোহন হাসলেন।

হেমনাথ বললেন, 'কনট্রাক্ট তো নিয়েছ। আসামে গিয়ে কী করতে হবে?

'মিলিটারিদের জন্যে রাস্তাঘাট আর পাহাড়ের ওপর ব্যারাক-ট্যারাক তৈরি করতে হবে।'

'তোমার ওসব কাজের অভিজ্ঞতা আছে?'

'বিন্দুমাত্র না।'

'তা হলে?'

'করতে করতেই অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।'

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকলেন।

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'রাজদিয়ায় আসবার আগে চাষ-আবাদের কিছু কি জানতাম? করতে করতেই শিখে গেলাম।'

হেমনাথ এবারও কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না।

অবনীমোহনের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল বিনু। বাবাকে সে চেনে। তাঁর মধ্যে কোথায় যেন একটা চঞ্চল যাযাবরের বাস, দুটো দিনও সেটা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না, নিয়ত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

যৌবনের শুরু থেকে কত কী-ই তো করেছেন অবনীমোহন। অধ্যাপনা-ব্যবসা-চাকরি —একটা ধরেছেন, আরেকটা ছেড়েছেন। নির্ভর করার মতন কিছু হাতে পেলে মানুষ সেটা ঘিরেই জীবনকে সাজিয়ে তোলে। অবনীমোহনের স্বভাব আলাদা। অনিশ্চয়তার ভেতর ছুটে বেড়ানোতেই তাঁর যত আনন্দ।

এই প্রৌঢ় বয়সে বসুন্ধরার এক কোণে অনেকখানি ভূমি পেয়েছেন তিনি, চারদিক শস্যে-স্বর্ণে পরিপূর্ণ। কোথায় পা পেতে বসে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন, তা নয়। রক্তের ভেতরে সেই যাযাবরটা তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে।

চার পাঁচ বছরের মতন রাজদিয়া তাঁকে মুগ্ধ, সম্মোহিত করে রেখেছিল। জলবাংলার এই সরস শ্যামল জায়গাটার আর সাধ্য নেই অবনীমোহনকে ধরে রাখে। তার সম্মোহনের শক্তি ব্যর্থ হয়ে যেতে শুরু করেছে।

দিনকয়েক পর অবনীমোহন আসাম চলে গেলেন।

অবনীমোহন চলে যাবার পর সময় যেন ঝড়ের গতিতে ছুটতে লাগল। যুদ্ধের প্রথম দিকে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী সমস্ত পৃথিবীকে পায়ের নিচে নামিয়ে এনেছিল। এখন তারা পিছু হটছে। দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে মিত্রশক্তির জয়ধ্বনি।

একদিন খবর এল লাল ফৌজ বার্লিনে ঢুকে পড়েছে এবং জার্মানি আত্মসমর্পণ করেছে। পূর্ব গোলার্ধে এখনও আসর জমজমাট। হঠাৎ আরেক দিন খবর এল, হিরোসিমা নাগাসাকিতে পরমানু বোমা পড়েছে। এবং এই দু'টি বোমাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর যবনিকা টেনে দিল।

অবনীমোহন সেই যে খবরেরকাগজ আনার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, এখনও তা চলছে। তিনি

মাস পর পর হেমনাথ টাকা পাঠিয়ে দেন, ডাকে খবরের কাগজ চলে আসে।

একদিন বিনু দেখল, প্রথম পাতা জুড়ে বড় বড় অক্ষরে খবর বেরিয়েছে।

'বিশ্বযুদ্ধের অবসান : মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্ম-সমর্পণ : জাপ সম্রাটের ঘোষণা।

'পটাসডাম ঘোষণার সমস্ত শর্ত স্বীকার। মিকাডো কর্তৃক পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলার কথা উল্লেখ।

'প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মিস্টার এটলির বিবৃতি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিত্রপক্ষ বাহিনীর প্রতি যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ।

'নিউইয়র্ক, ১৫ই আগষ্ট—সম্রাট হিরোহিতো অদ্য বেতারে সরাসরি জাপ জাতির উদ্দেশে এই বক্তৃতায় বলেন যে, পটাসডাম চরমপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতির উদ্দেশ্যে সম্রাটের সরাসরি বক্তৃতা এই প্রথম।'

একধারে ছোট হরফে আরেকটা খবর রয়েছে।

'পরাজিত জাপানের প্রতি মিত্রপক্ষের প্রথম আদেশ জারি। জেনারেল ম্যাক আর্থারের প্রতি দূত প্রেরণের নির্দেশ। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি মিত্রবাহিনী কর্তৃক দখলের আয়োজন।'

তার তলায় আরেকটা খবর।

'জাপানি সমর সচিবের আত্মহত্যা। যুদ্ধে পরাজয়ের জের।'

'লন্ডন, ১৫ই আগষ্ট—জাপানি নিউজ এজেন্সির খবরে প্রকাশ যে, জাপানের সমর সচিব কোরেচিকা আনামি গতরাত্রে তাঁর সরকারি বাসভবনে আত্মহত্যা করেছেন।

কোথায় গ্রেট ব্রিটেন, কোথায় আমেরিকা, কোথায় নরওয়ে, কোথায়ই বা ফ্রান্স আর রাশিয়া। মিত্রবাহিনী জেতার ফলে সে সব জায়গায় নাকি উৎসবের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধজয়ের ঢেউ অখ্যাত নগণ্য রাজদিয়াতেও এসে পড়ল।

মিলিটারি ব্যারাকগুলো আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। রঙিন কাগজ দিয়ে বড় বড় তোরণ তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো থেকে লাল-নীল কাগজের ঠোঙায় অসংখ্য লন্ঠন ঝুলছে। আর উড়ছে পতাকা—মিত্রশক্তির সবগুলো দেশের পতাকা রাজদিয়ার আকাশে সগর্বে মাথা তুলে আছে।

যুদ্ধজয়ের আনন্দে সারদিনই ব্যারাকগুলোতে হুল্লোড় চলছে। নাচ গান আর অবিরাম জ্যাজ বাজানার শব্দে রাজদিয়ার স্নায়ু বুঝি ছিঁড়েই পড়বে। নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-মানিকগঞ্জ থেকে কত যুবতী মেয়ে যে আনা হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া মদের ঢল বয়ে যাচ্ছে। মিলিটারি ব্যারাকের একটি প্রাণীও এখন সুস্থ বা স্বাভাবিক নেই। দিনরাত্রি নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন।

মাসখানেক প্রমত্ত উৎসব চলল। তারপর একদিন রাজদিয়াবাসীরা দেখতে পেল, ধূসর রঙের সেই বড় স্টিমারটা এসে জেটিঘাটে ভিড়েছে। বিশাল জলপোকার মতন এই স্টিমারে করেই নিগ্রো আর আমেরিকান টমিরা রাজদিয়ায় এসেছিল, তাদের লরি-ট্রাক-কামান-বন্দুক গোলাগুলি এবং অসংখ্য সাজ সরঞ্জাম এসেছিল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রাজদিয়াবাসীরা এবার দেখল, জিপ-ট্রাকের চাকাটাকা খুলে এবং বড় বড় লোহার পেটিতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে স্টিমারে তোলা হচ্ছে। একদল টমিও স্টিমারে উঠল।

সকালের দিকে স্টিমারটা এসেছিল, বিকেলে চলে গেল।

এরপর থেকে একদিন পর পর সকালবেলা স্টিমারটা রাজদিয়া আসতে লাগল এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম আর একদল করে টমি নিয়ে চলে যেতে লাগল। দশ দিনের ভেতর চারদিক ফাঁকা হয়ে গেল। যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালের মতন রাজদিয়া জুড়ে পড়ে থাকল কতকগুলো শূন্য ব্যারাক এবং লম্বা পিচের রাস্তা।

যুদ্ধের মাঝামাঝি দু-তিনটে বছর রাজদিয়ার জীবন খুব চড়া তারে বাজছিল, আবার পুরনো স্তিমিত টিমে তালের দিনযাপনের মধ্যে ফিরে গেল সে।

যুদ্ধের শেষ দিকে বিস্ময়কর একটা খবর এসেছিল—সুভাষচন্দ্রের খবর।

বিনুর মনে পড়ে, তারা রাজদিয়া আসার কিছুদিন পর সুভাষচন্দ্র কলকাতার বাড়িতে অন্তরীণ হয়েছিলেন। সেই অবস্থাতেই একদিন তাঁকে পাওয়া গেল না। সমস্ত দেশ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনল, ইংরেজদের সতর্ক বিনিদ্র পাহারার মধ্যে দিয়ে তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধান হয়েছে। কিভাবে, কোথায়, কোন দুর্গম দেশে তিনি অদৃশ্য হয়েছেন, কেউ জানতেও পারল না। সারা দেশের কাছে সুভাষচন্দ্র এক চমকপ্রদ লিজেন্ডের নায়ক হয়ে থাকলেন।

তার ক'বছর পর যুদ্ধের যখন শেষ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য, সেই সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ওপার থেকে টুকরো টুকরো যেসব খবর আসতে লাগল তাতে শৃঙ্খলিত দেশের হৃৎপিন্ড বিপুল আশায় দুলতে লাগল।

রূপকথার চাইতেও সে এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। কলকাতা থেকে অন্তর্হিত হয়ে প্রথমে আফগানিস্তান, সেখান থেকে বার্লিন, তারপর টোকিও গেলেন সুভাষচন্দ্র। পদানত দেশ তাঁকে যেন অস্থির উন্মাদ করে তুলেছে।

বীর নায়ক রাসবিহারী তখন আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছেন। সুভাষচন্দ্র তাতে প্রাণসঞ্চার করে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 'আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ' হল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ইতিহাসের সে এক পরম শুভক্ষণ। একই পতাকাতলে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত এসে হাত মেলাল। সুভাষচন্দ্র সেদিন থেকেই নেতাজী।

তারপর শুরু হল শৃঙ্খলমুক্তির অভিযান। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে একাগ্র চিত্তে সে এক দুরূহ ব্রতপালন। দেখতে দেখতে সিঙ্গাপুরে জাতীয় পতাকা উড়ল। তারপর বর্মা পেরিয়ে ইম্ফল পেছনে ফেলে ঝড়ের গতিতে কোহিমা পর্যন্ত এল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

ঐ কোহিমা পর্যন্তই। এদিকে জাপানের তখন করুণ অবস্থা। রসদ নেই, খাদ্য নেই। ফলে সুভাষচন্দ্রের বড় সাধের 'দিল্লী চল' স্বপ্ন হয়েই রইল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মরণপণ অভিযান পরাভূত বিধ্বস্ত হয়ে যায়। 'জীবন-মৃত্যু'কে যাঁরা তুচ্ছ করেছিলেন সেই ভয়লেশহীন বীর সন্তানেরা বন্দি হয়ে একে একে দিল্লীর লালকেল্লায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। ধীলন শাহনওয়াজ সায়গল—পরাধীন জাতির ইতিহাসে নামগুলো সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার মতন।

বিনুর মনে আছে, দিনকয়েক আগে খবরের কাগজে পড়েছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত সেনানীদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে এবং বন্দিরা আপিল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ট্রাইবুনাল গঠনের পর তিন সপ্তাহ বিচার স্থগিত ছিল। আজ লালকেল্লায় তার প্রহসন শুরু হবে। একরকম আনায়াসেই এই বিচারের রায় আগে থাকতে বলে দেওয়া যায়।

সমস্ত দেশের প্রাণপুরুষ এই বীর সেনানায়কদেব জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতবর্ষের এমন কেউ নেই, মনে মনে লালকেল্লার সেই মানুষ ক'টির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। সামরিক ট্রাইবুনালের সমানে বীর সন্তানদের মুক্তির জন্য সওয়াল করতে ছুটে গেছেন ভুলাভাই দেশাই। দীর্ঘ

দু যুগ পর ব্যারিস্টার বেশে জহরলাল আজ ভুলাভাইর পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন।

কোথায় কলকাতা, কোথায় বোম্বাই, কোথায় দিল্লী—সমস্ত ভারতবর্ষ আজ অস্থির, উদ্বেলিত। বিচারের আগের মুহূর্তে দেশের আত্মা যেন বজ্রকণ্ঠে দাবি জানাচ্ছে, স্বাধীনতার সৈনিকদের সসম্মানে মুক্তি চাই।

দূর সমুদ্রকল্লোল এই রাজদিয়ায় এসেও ধাক্কা দিল। বিনুরা কলেজে স্ট্রাইক করল। দুটো প্রাইমারি স্কুল, ছেলেদের হাইস্কুল এবং মেয়েদের হাইস্কুলেও স্ট্রাইক হয়ে গেল। তারপর ছাত্রছাত্রীরা ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল বার করল। সারা শহর ঘুরতে ঘুরতে তারা স্লোগান দিতে লাগল:

'আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের—'

'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।'

'জয় হিন্দ—'

'বন্দে মাতরম্—'

'নেতাজীকি—'

'জয়।'

'ভারত মাতাকি—'

'জয়।'

'শাহ্‌নওয়াজ-ধীলন-সায়গলকি—'

'জয়।'

একে একে এল রসিদ আলি ডে, বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহ। সারা দেশ ঝড়ের দোলায় দুলতে লাগল।

আজাদ হিন্দ সৈনিকদের মুক্তির জন্য আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, রসিদ আলি ডে—বিদ্যুৎচমকের মতন দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

এদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার ঘোষণা করলেন, একটি ক্যাবিনেট মিশন এদেশে পাঠাবেন। উদ্দেশ্য, কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তার সূত্র উদ্ভাবন করা।

উনিশ শ ছেচল্লিশের তেইশে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসে পৌঁছুল। দলে তিনজন সদস্য—লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং মিস্টার এ. ভি. আলেকজান্ডার।

ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে এসেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল।

লাহোর প্রস্তাবের পর মুসলিম লিগ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতবর্ষের দেহ ছিন্ন করে একটি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গড়তেই হবে। লিগ নেতাদের ভয় দেশ স্বাধীন হলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা থাকবে না, 'হিন্দু রাজ' তাদের ধ্বংস করে দেবে।

কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, দেশভাগে তাঁদের বিন্দুমাত্র সায় নেই। তখন মোটামুটি স্থির হয়, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং সুশাসনের জন্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট তৈরি করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব। এ বি এবং সি—দেশকে তিনটি অংশে ভাগ করে যত বেশি বিষয়ে সম্ভব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে।

'বি' বিভাগে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান। এই অংশটিতে নিরঙ্কুশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। 'সি' বিভাগে থাকবে বাংলা ও আসাম। এখানেও মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন হাতে পেলে মুসলমানদের সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা অন্তত থাকার কথা নয়। তবে জাতীয় ঐক্যের দিকে দৃষ্টি রাখতেই হবে।

মুসলিম লিগ শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। কংগ্রেসেরও এতে আপত্তি ছিল না। সফলকাম ক্যাবিনেট মিশন দেশে ফিরে গেল।

ক্যাবিনেট মিশন চলে যাবার পর ক'দিন আর। আবার পুরনো সংশয় ঘৃণা এবং পারস্পরিক বিদ্বেষে আকাশ বিষাক্ত হয়ে উঠল। মুসলিম লিগ সিদ্ধান্ত নিল কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে যোগ দেবে না বা অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে না। জিন্না ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক দিলেন।

ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট ইতিহাসের এক অন্ধকার দিন। সারা দেশ জুড়ে আত্মঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। কোথায় কলকাতা, কোথায় বিহার, কোথায় নোয়াখালি—সমস্ত ভারতবর্ষ রক্তের সমুদ্র হয়ে দুলতে লাগল। কে বলবে মাত্র ক'দিন আগে নৌ-বিদ্রোহ ঘটে গেছে, কে বলবে রসিদ আলি ডে কিংবা আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের মুক্তির জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষ সেদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছিল।

খবরের কাগজ খুললে এখন শুধু আগুন-হত্যা-ধর্ষণ। ভারতবর্ষ যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে বর্বর যুগের কোনো আদিম অন্ধকারে ফিরে গেছে।

আসমুদ্র হিমাচল একখানা আগুনের চাকা যেন ঘুরে চলেছে। এই ছোট্ট রাজদিয়াতেও তার আঁচ এসে লাগল।

মিলিটারি ব্যারাকে সাপ্লাই দেবার জন্য রজবালি শিকদার মন্তাজ মিঞার যে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে গুদাম করেছিল, এখন সেটাই মুসলিম লিগের অফিস। তার থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে হাইস্কুলের গা ঘেঁষে কংগ্রেসের অফিস।

আজকাল রোজই হয় মুসলিম লিগ, না হয় কংগ্রেস রাজদিয়ায় মিটিং করছে। মিটিংয়ের পর দু-দলই মিছিল বার করে।

সবুজ পতাকা উড়িয়ে লিগের সমর্থকরা শ্লোগান দেয় :

'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্তান।'

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ।'

কংগ্রেসের মিটিংয়ে মোতাহার হোসেন সাহেব আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেন, 'আমরা হিন্দু মুসলমান যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করছি। বাস করবও। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এদেশকে কোনোদিনই ভাগ করতে দেওয়া হবে না। এক বছর, দু'বছর, দশ হাজার বছর পরও এ দেশ একই থাকবে।'

সারা দেশ যখন অস্থির উন্মাদ, তখন মোতাহার সাহেবের কথা কার কানে ঢুকবে? দেশজোড়া উন্মত্ততা জলবাংলার এই স্নিগ্ধ শ্যামল ভুবনেও একদিন রক্তের সমুদ্রকে টেনে নিয়ে এল।

ঘটনাটা এইরকম।

সেদিন হেমনাথের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল বিনু। নৌকো থেকে নেমে ওপরে উঠতেই তারা শুনতে পেল, বিষহরিতলার ওধারে বিশাল মাঠখানায় মিটিং চলছে। হাটের বেশির ভাগ লোক ওখানে ভিড় জমিয়েছে।

কিছুটা আপন মনে হেমনাথ বললেন, 'আজকে আবার কিসের মিটিং?'

বিনু বলল, 'কি জানি—'

বেগুন ব্যাপারী গয়জদ্দি পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, হেমনাথ ডাকলেন। গয়জদ্দি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'কী ক'ন হ্যামকত্তা?'

'অমন দৌড়চ্ছিস কেন?'

'মিটিনে যাই—'

'কিসের মিটিং রে?'

'ঢাকা থনে বড় মাইনষেরা আইছে, তেনারা কী সগল কইব। যাই—' আর দাঁড়াল না গয়জদ্দি, আবার ছুটল।

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বিনুকে বললেন, 'মিটিংয়ে যাবি নাকি দাদাভাই?'

'চল। ঢাকার লোকেরা কী বলছে, শুনেই আসি।'

তামাকহাটা মরিচহাটা আনাজহাটা পেছনে রেখে বড় বড় পা ফেলে বিষহরিতলার কাছে এসে পড়ল বিনুরা।

আশ্চর্য, লারমোর চেয়ার-টেবিল পেতে যথারীতি রুগী দেখতে বসেছেন। এক পাশে ওষুধের মস্ত বাক্স। আরেক পাশে সুজনগঞ্জ হাটের অনেকগুলো অসুস্থ রুগ্ন মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। সামনের বিশাল মাঠ জুড়ে যে অত বড় একটা মিটিং চলছে, অসংখ্য হাটুরে মানুষ যে ভিড় জমিয়েছে—সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই লারমোরের। নিজের কাজের মধ্যে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে এত অস্থিরতা, এত উত্তেজনা, কলকাতা-বিহার-নোয়াখালি রক্তের নদী হয়ে যে দুলছে—লারমোরের দিকে তাকালে সে কথা কে বিশ্বাস করবে।

পেট টিপে টিপে একটা রুগীকে পরীক্ষা করছিলেন লারমোর। হেমনাথ ডাকলেন, 'লালমোহন—'

লারমোর মুখ তুললেন। খুশি গলায় বললেন, 'আরে হেম যে, কখন এলে হাটে?'

'এই সবে। নৌকো থেকে নেমে সোজা আসছি।'

'বসবে তো? না হাট-টাট সেরে আসবে?'

'বসবও না, হাটও সারব না—'

'তবে কী করবে?'

সামনের বিশাল জনতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হেমনাথ বললেন, 'ওখানে মিটিং হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' লারমোর ঈষৎ মাথা হেলিয়ে বললেন, 'অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি। শুনলাম ঢাকা থেকে কারা এসে বক্তৃতা দিচ্ছে।'

'আমিও তাই শুনলাম। আর শুনেই এদিকে এলাম—'

'মিটিংয়ে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। তুমিও চল—'

'আমার যাবার সময় কোথায়? দেখছ না, ওরা বসে আছে। এখন উঠে গেলে আমাকে খেয়ে ফেলবে।' লারমোর তাঁর রুগীদের দেখিয়ে দিলেন।

হেমনাথ বললেন, 'তুমি তা হলে যাবে না?'

'না। ওসব কচকচি আমার খুব খারাপ লাগে। নিজের কাজ আর এইসব রোগা অসুস্থ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। ঢাকার লোকেরা এসে কী-ই বা বলবে! তাতে এখানকার মানুষের উপকার কিছু হবে?'

হেমনাথ হাসতে লাগলেন, 'তার মানে এদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাও না তুমি?'

'না।'

'তবে তুমি এদের নিয়েই থাকো। আমরা মিটিংয়ে যাই—'

'যাও। মিটিং শুনে এখানে আসবে তো?'

'আসব।'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে লারমোর বললেন, 'হাট থেকে তুমি কখন বাড়ি ফিরবে হেম?'

হেমনাথ বললেন, 'বিকেল নাগাদ—'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'সে কি, আজ এত তাড়াতাড়ি? তুমি তো হাট ভাঙবার পর সেই রাত্রিবেলা রাজদিয়া ফের।'

'আজ শরীরটা খুব ভাল লাগছে না।'

হেমনাথকে উদ্বিগ্ন দেখাল, 'কী হয়েছে?'

'তেমন কিছু না।' লারমোর হাসলেন, 'এই একটু জ্বর জ্বর মতন। আচ্ছা তোমরা মিটিংয়ে যাও। এরপর গেলে হয়তো কিছুই শুনতে পাবে না।'

শেষ পর্যন্ত সামনের ঐ বিশাল মাঠে, বিপুল জনতা যেখানে উদ্গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হেমনাথদের যাওয়া হল না। লারমোরের অস্থায়ী হাসপাতাল থেকে সবে দু'পা এগিয়েছেন, মিটিং ভেঙে গেল! তারপরেই জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতন জনতা ছুটল হাটের দিকে।

মিটিং থেকে যারা ফিরছে তারা সবাই উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্ত। সমানে তারা চিৎকার করছিল, 'মার শালাগো—'

'মার সুমুন্দির পুতেগো—'

মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, 'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্তান—'

হেমনাথ আর বিনু দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আগে ঐ মাঠে অনেক বার হাটুরে মানুষদের ভিড় করতে দেখেছে বিনু। হরিন্দ যখন দেশ-দেশান্তরের খবর এনে ওখানে ঢেঁড়া দিত, একটা মানুষও আর হাটের চালার তলায় থাকত না। যুদ্ধের সময় সেনাদলে রিক্রুটমেন্টের জন্য এস-ডি-ও কি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কিংবা মিলিটারি অফিসাররা যখন আসতেন তখনও মরিচহাটা তামাকহাটা নৌকোহাটা ফাঁকা করে সবাই ওখানে ছুটে যেত। কিন্তু এমন উত্তেজনা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতন কেউ ফিরত না।

জনতা উন্মত্তের মতন ছুটে যাচ্ছে। ঢাকার লোকগুলো তাদের কী বলেছে কে জানে। বিনুরা বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছুক্ষণের ভেতর দেখা গেল, হাটের একটা চালাও আর আস্ত নেই। বাঁশের খুঁটিগুলো জনতার হাতে হাতে মারণাস্ত্র হয়ে ঘুরছে।

দেখতে দেখতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। সমস্ত সুজনগঞ্জের হাট জুড়ে কয়েক হাজার লাঠি আকাশের দিকে উঠেই নেমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে উঠছে চিৎকার, আর্তনাদ। লোকের পায়ে পায়ে হাটের ধুলো মাথার ওপর উঠে মেঘের মতন জমতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ পর আপন মনে হেমনাথ বললেন, 'কী সর্বনাশ!'

বিনু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিজের চোখে আগে আর কখনও দাঙ্গা দেখে নি সে। ভীরু গলায় ডাকল, 'দাদু—'

'কী বলছিস?' অন্যমনস্কের মতন সাড়া দিলেন হেমনাথ।

'আমরা কেমন করে বাড়ি যাব?'

হেমনাথ বুঝিবা তার কথা শুনতে পেলেন না। বলতে লাগলেন, 'অন্য অন্য জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু এ পাপ তো এখানে ছিল না—'

বিনু কি বলতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে লারমোরের গলা ভেসে এল, 'হেম—হেম—'

হেমনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন, বিনুও ঘুরল। চোখাচোখি হতেই লারমোর বললেন, 'এখানে এস—'

হেমনাথরা লারমোরের কাছে চলে এলেন।

উদ্বিগ্ন সুরে লারমোর বললেন, 'কান্ডটা দেখেছ?'

'হুঁ—' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন হেমনাথ।

এই সময় হাটের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে মজিদ মিঞা এসে হাজির। তাকে পাগলের মতন দেখাচ্ছে। অস্থির গলায় সে বলতে লাগল, 'এ কী হইল ঠাউরভাই, এ কী হইল?'

হেমনাথ কী বলবেন, ঠিক করে উঠতে পারলেন না। অত্যন্ত বিচলিত আর চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তিনি।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'এট্টা কিছু বিহিত করেন ঠাউরভাই। আপনের চৌখের সামনে এমুন খাওয়াখাওয়ি মারামারি হইব। কোন খানে কার দোষে দাঙ্গা হইছে হেয়াতে আমাগো কী? আমরা চিরকাল যেমুন একলগে আছি, তেমুনই থাকতে চাই। আপনে অগো থামান ঠাউরভাই। সারা জীবন যা দেখি নাই, এই শ্যাষ বয়সে হেই খুনাখুনি দেখতে হইব? তার থনে আমার মরণ ভাল।'

হেমনাথ কিছু বলবার আগেই লারমোর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ দাঙ্গা চলতে পারে না। যেভাবেই হোক থামাতে হবে। চল—' বলেই হাটের মাঝখানে যেখানে তান্ডব চলছে, সেদিকে ছুটলেন।

মজিদ মিঞা, বিনু এবং হেমনাথ লারমোর পিছু পিছু ছুটলেন। সব চাইতে প্রথমে পড়ে আনাজহাটা। সেখানে এসে দেখা গেল অনেকগুলো লোকের হাত-পা ভেঙে গেছে, মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। রাশি রাশি ঝিঙে-পটল-আলু-বেগুন চারধারে ছত্রখান হয়ে আছে। আহত লোকগুলো যন্ত্রণায় ক্ষতস্থান চেপে ধরে কাঁদছিল, কঁকাচ্ছিল, গোঙানির মতন শব্দ করে চিৎকার করছিল।

ডানদিকে মরিচহাটা বাঁ ধারে মাছের বাজার। দু'জায়গাতেই সমানে লাঠি চলছে আর বৃষ্টি ধারার মতন ঢিল পড়ছে। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ হিংস্র মারমুখী জনতা চেঁচাচ্ছিল :

'মার শালারে—'

'মার বউয়ার ভাইরে—'

'মাইরা মাইরা সুমুন্দির পুতেরে শ্যাষ কইরা দে—'

'লড়কে লেগে—'

'পাকিস্তান—'

'কালী মাইকী জয়—'

হঠাৎ গলায় সবটুকু শক্তি ঢেলে সুজনগঞ্জের হাটটাকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন লারমোর, 'থামা, থামা—তোরা মারামারি থামা—'

মজিদ মিঞাও চেঁচাচ্ছিল, 'আহাম্মকের ছাওরা, এমুন খুনাখুনি করিস না তরা। আল্লার কিরা।'

চিৎকার করতে করতে একবার মরিচহাটা, একবার মাছের বাজার, একবার গো-হাটার দিকে ছুটছিলেন লারমোর। তাঁর পেছনে ছিল বিনুরা।

উন্মত্ত জনতা মজিদ মিঞা বা লারমোরের কথা কানেই তুলছিল না। হিংস্র এক ডাকিনী তাদের যেন মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। সমানে তারা লাঠি চালিয়ে যাচ্ছিল, ঝাঁক ঝাঁক ঢিল ছুঁড়ছিল। তাদের চোখে হত্যা যেন ঝিলিক দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ছোটাছুটি করতে করতে তামাকহাটায় এসে হঠাৎ লারমোরের চোখে পড়ল, একটা রুগ্ন লোকের মাথার ওপর তিন চারটে লাঠি উদ্যত হয়ে আছে, পলক পড়বার আগেই নেমে আসবে।

লারমোর লাফ দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মারিস না ওকে, মারিস না। ঐ লাঠির একটা বাড়ি পড়লে ও মরে যাবে।'

যারা মারবার জন্য লাঠি তুলেছিল তাদের ভেতর থেকে একজন খ্যাল খ্যাল করে হেসে উঠল, 'ভালই তো, বেশি কষ্ট করতে হইব না। এক বাড়িতে যমের দুয়ারে পাঠাইয়া দিতে পারুম। তুমি যাও সাহেব—'

'না, কিছুতেই না—' মা-পাখি যেমন করে তার বাচ্চাকে ডানা দিয়ে ঘিরে রাখে তেমনি করে দু' হাত দিয়ে রুগ্ন লোকটাকে আগলে রাখলেন লারমোর।

সেই লোকটা আবার বলল, 'সর সাহেব, শালারে নিকাশ কইরা দেই—'

'না। ক'দিন আগে কালাজ্বরে ও মরতে বসেছিল, কত কষ্ট করে ওকে মরার হাত থেকে ফিরিয়েছি। আমার চোখের সামনে ওকে কিছুতেই মারতে দেব না।'

'ভাল চাও তো সইরা যাও সাহেব—'

'না।' লারমোর অনড় হয়ে রইলেন, তাঁর চোখে কঠিন প্রতিজ্ঞা জ্বলছে যেন।

সেই লোকটা উগ্র গলায় আবার বলল, 'শালা বিদ্যাশি, এইখানে আইসা মাদ্‌বরী (মাতব্বরী) ফলাও—'

লারমোর চমকে উঠলেন, 'আমি বিদেশি!'

'নিয্যস।'

কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না লারমোর। আবার প্রতিধ্বনি করলেন, 'আমি বিদেশি, আমি বিদেশি—'

'তয় কি তুমি এই দ্যাশের নাতিন জামাই ? দেখছ নিজের গায়ের রংখান ?'

সেই লোকটার সঙ্গীগুলো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। তাদের একজন বলল, 'প্যাচাল না পাইড়া সইরা যাও সাহেব—'

স্থির শিখার মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন লারমোর। বললেন, 'না—'

'তয় মর শালা—'

কেউ কিছু বুঝবার আগেই একটা লাঠি এসে পড়ল লারমোরের মাথায়। চড়াত করে শব্দ হল একটা। তারপরেই রক্তের ফোয়ারা ছুটল। মাথায় হাত দিয়ে পলকে লুটিয়ে পড়লেন লারমোর।

বিনু চিৎকার করে উঠল, 'লালমোহন দাদুকে মেরে ফেলল, মেরে ফেলল—'

মজিদ মিঞা কপালে চাপড় মারতে মারতে আর্ত আকুল গলায় বলতে লাগল, 'হায় হায়, এই কি সর্বনাশ করলি ডাকাইতরা!'

হেমনাথ কিছুই বললেন না। ধীরে ধীরে বসে লারমোরের রোগা দুর্বল দেহখানা কোলে তুলে নিলেন। হেমনাথের শরীর আশ্চর্য কঠিন, শুধু ঠোঁট দুটো থরথর করছে।

এই সময় ওদিক থেকে কারা যেন সন্ত্রস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিশ আইছে, পুলিশ আইছে—'

নিমেষে সামনের সেই হিংস্র উত্তেজিত হত্যাকারীর দল অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু তারাই না, যারা দাঙ্গা করছিল, সুজনগঞ্জ হাটের সীমানার ভেতর তাদের কাউকেই আর দেখা গেল না।

আঘাত লাগার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন লারমোর। দিনের আলো থাকতে থাকতেই অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নিয়ে হেমনাথরা রাজদিয়ার ফিরলেন, একেবারে সোজা গীর্জায় নিয়ে তুললেন।

লারমোর আজকের দাঙ্গায় শিকার হয়েছেন, এই খবরটা কেমন করে যেন দিগ্বিদিকে রটে গিয়েছিল। রাজদিয়ার কুমোরপাড়া কামারপাড়া যুগীপাড়া মৃধাপাড়া নিকারীপাড়া সর্দারপাড়া—শুধু কি রাজদিয়া, চারপাশের গ্রামগঞ্জগুলো শূন্য করে কত মানুষ যে লারমোরকে দেখতে এল। বিষণ্ণ করুণ মুখে তারা আজকের এই নিদারুণ ঘটনাকে ধিক্কার দিতে লাগল, 'আ রে সব্বনাইশারা, তরা মারণের লেইগা মানুষ বিচরাইয়া (খুঁজে) পালি না ? লালমোহন সাহেব যে আমাগো বাপের লাখান ভালবাসছে। হ্যায়

যে আমাগো বাপ—'

কাদের আর বিধবা পরাণের মা (দু'জনেই লারমোরের আশ্রিত) অবোধ শিশুর মতন কাঁদছে। কাঁদছে আর ভাঙা গলায় বলছে, 'সাহেবের যদি ভালমন্দ কিছু হয় আমরা কই যামু? আমাগো কী হইব? কে দেখব আমাগো?' চোখের জলে তাদের বুক ভেসে যাচ্ছিল।

খবর পেয়ে স্নেহলতাও ছুটে এসেছেন। শিবানী আসতে চেয়েছিলেন, বাড়ি একেবারে ফাঁকা থাকবে বলে আসেন নি। এসেই লারমোরের শিয়রের কাছে বিষণ্ণ প্রতিমার মতন বসেছেন স্নেহলতা।

এদিকে এই বিপদের সময় হেমনাথ কিন্তু একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন নি। রাজদিয়ার ফিরেই ডাক্তার আনতে মজিদ মিঞাকে কমলাঘাট পাঠিয়ে দিয়েছেন। কমলাঘাটের বন্দরে বড় ডাক্তার আছে।

সন্ধের পর ডাক্তার নিয়ে তখনও মজিদ মিঞা ফেরে নি, লারমোরের জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে ক্ষীণ দুর্বল স্বরে তিনি ডাকতে লাগলেন, 'হেম—হেম কোথায়?'

হেমনাথ লারমোরের পায়ের দিকে বসে ছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, 'এই যে ভাই, এই তো আমি—'

'আমি আর বাঁচব না—'

'ছি, ও-কথা বলতে নেই। তোমার অনেক কাজ, বাঁচতে তোমাকে হবেই।' হেমনাথের কণ্ঠস্বর অসহ্য আবেগে কাঁপছিল।

লারমোর বিচিত্র হাসলেন, তারপর অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'বাঁচতে আমি চাই না হেম, চাই না। ওরা আমাকে বিদেশি বলল! আমি বিদেশি! আমি বিদেশি!'

হেমনাথ বললেন, 'কে বললে তুমি বিদেশি?'

তার কথা বোধ হয় শুনতে পেলেন না লারমোর। আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'কবে এ দেশে এসেছিলাম মনেও পড়েও না। জীবনের সবটুকুই এখানে কাটিয়ে দিলাম। এখানকার অন্ন-বস্ত্র-ভাষা সমস্তই মাথায় তুলে নিয়েছি। এখানকার মানুষকে বুকে জায়গা দিয়েছি। তবু আমি বিদেশি, আমি বিদেশি—'

হেমনাথ তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি কষ্ট পাচ্ছ লালমোহন? একটা উন্মাদ কী বলেছে, মনে করে রেখ না। তুমি যদি বিদেশিই হবে, এত লোক তোমাকে দেখতে এসেছে। ঐ দিকে তাকাও—'লারমোরের খবর পেয়ে যারা ছুটে এসেছিল উদ্বিগ্ন মুখে এখনও তারা গীর্জায় ভিড় করে আছে। হেমনাথ তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

লারমোরের দুরন্ত অভিমান একটুও শান্ত হল না। ক্লান্ত সুরে তিনি বলতে লাগলেন, 'একজন বললেও তো বিদেশি বলেছে—' বলতে বলতে শিশুর মতন ফুঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে মুক্তোর দানার মতন ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে লাগল।

বিনু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লারমোরের দিকে তাকিয়ে অপার বিস্ময়ে তার মন ভরে যাচ্ছিল' এমনিতে এই মানুষটি ধীর, স্থির, সংযত। জগতে ঈশ্বরের দূত হয়েই তিনি যেন নেমে এসেছেন। কিন্তু 'বিদেশি', এই একটি মাত্র কথায় কি নিদারুণ অস্থিরই না হয়ে উঠেছেন। মানুষের হৃদয়ে কোথায় যে দুর্বল আবেগ নিহিত থাকে!

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'কেঁদো না—শান্ত হও—'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুব ক্লান্ত সুরে লারমোর বললেন, 'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে হেম—'

'বেশ তো, ঘুমোও না—'

'একটা কাজ করবে হেম?'

'কী?'

'হল-ঘরে যেশাসের পায়ের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে? ওখানে গেলে আমি একটু শান্তি পেতাম।'

ধরাধরি করে হেমনাথরা খাটসুদ্ধ লারমোরকে হল-ঘরে নিয়ে এলেন। পুব দিকের দেয়ালে যেখানে

জ্যোতির্ময় মানবপুত্রের বিশাল ছবিটা টাঙানো রয়েছে, তার তলায় তাঁকে রাখলেন।

লারমোর বললেন, 'এবার একটু ঘুমোই হেম।' ধীরে ধীরে তাঁর চোখ এবং কণ্ঠস্বর বুজে এল।

অনেক রাত্রে কমলাঘাট থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে ফিরল মজিদ মিঞা। ডাক্তার লারমোরের গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন, ভাল করে পরীক্ষা করে গম্ভীর গলায় জানালেন, লারমোরের চোখে চিরনিদ্রা নেমে এসেছে। মানুষের সাধ্য নেই এ ঘুম ভাঙায়।

একধারে দাঁড়িয়ে বিনু দেখল, ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তির তলায় এ-কালের লাঞ্ছিত রক্তাক্ত অপমানিত আরেক ক্রাইস্ট।

খুব অল্পদিনের ভেতর পর পর দুটো মৃত্যু দেখল বিনু। সুরমার এবং লারমোরের। সুরমার মৃত্যু বিনুর ব্যক্তিগত ক্ষতি। কিন্তু এ মানুষটি কোথা থেকে এসে জলবাংলার প্রতিটি বৃক্ষলতা, পশু-পাখি, তৃণদল এবং মানুষের হৃদয়ে নিজের সিংহাসন পেতেছিলেন। সমস্ত শূন্য করে তিনি আজ চলে গেলেন।

গীর্জার একধারে লারমোরের সমাধি দেওয়া হল সেই জায়গাটায় একটি বেদী তৈরি করে দিয়েছেন হেমনাথ। সেটার গায়ে শ্বেত পাথরের ফলক রয়েছে। তাতে লেখা :

'ডেভিড লারমোর

জন্ম—১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে মে।

মহাপ্রয়াণ—১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে ডিসেম্বর।

মানবতার প্রতীক, আর্তজনের বন্ধু, মহাপ্রাণ এই মানুষটি এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।'

লারমোরের মৃত্যুর পর আশা করা গিয়েছিল, মানুষের মনে শুভবোধ জাগবে। কিন্তু কিছুই হল না। উত্তেজনা, অশান্তি, আতঙ্ক বেড়েই চলল। প্রায় রোজই খবর আসে মুসলিম লিগ এ-গ্রামে ও-গ্রামে এ-গঞ্জ সে-গঞ্জে এবং নদীর চরগুলোতে মিটিং করে বেড়াচ্ছে। চারদিকে দাঙ্গাও চলছে। হত্যা আর্তনাদ হল্লা আগুন ইত্যাদি ছাপিয়ে বহুকণ্ঠের চিৎকার শোনা যায়, 'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্তান—'

পাল্টা উত্তরও ভেসে আসে, 'বন্দে মাতরম্—'

তারপর ক'মাস আর। ভারতবর্ষের ভাগ্য একদিন স্থির হয়ে গেল। কত কালের সুপ্রাচীন এই দেশ। সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট তাকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলা হবে। এক ভাগ হবে পাকিস্তান। আরেক ভাগ আবহমান কালের পুরনো নামটাই ধরে থাকবে—ভারত।

খবর পেয়ে মোতাহার হোসেন ছুটে এলেন। রাস্তা থেকে বাগানে পা দিয়েই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'হেমদাদা—হেমদাদা—'

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। দেশভাগ নিয়ে বিনুর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। চমকে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কে, মোতাহার ?'

'হ্যাঁ।'

'আয়, আয়—'

মোতাহার সাহেব ঘরে এসে তক্তপোষে বসলেন। তাঁকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। বললেন, 'খবর শুনেছেন ?'

কোন খবরের কথা তিনি বলছেন হেমনাথ বুঝতে পারলেন। বললেন, 'শুনেছি। তোর ছাত্রের সঙ্গে তাই নিয়েই আলোচনা করছিলাম।'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'শেষ পর্যন্ত মুসলিম লিগ আর জিন্নারই তা হলে জয় হল।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন হেমনাথ, 'তাই তো দেখছি।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ, 'কী?'

প্রথমটা উত্তর দিলেন না মোতাহার সাহেব, অন্যমনস্কের মতন জানলার বাইরে ধু-ধু ধানখেতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত সুরে বলতে লাগলেন 'এত মানুষ জেল খাটল, হাজার হাজার সোনার ছেলে প্রাণ দিল! না হেমদা, এ আমরা চাই নি, এ আমরা চাই নি।'

মোতাহার সাহেবের উত্তেজনা অস্থিরতা ক্রমশ বাড়তেই লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, 'কোন থিওরির ওপর দেশটা ভাগ হতে চলেছে, ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

বুঝতে না পেরে হেমনাথ শুধোলেন, 'কোন থিওরির কথা বলছিস মোতাহার?'

'জিন্নার টু নেশন থিওরি।' প্রবল আক্ষেপের গলায় মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'সারা জীবন একতার কথা বলে শেষে কিনা দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষ গিলতে হল!'

হেমনাথ চুপ।

মোতাহার সাহেব থামেন নি, 'দেশভাগই যদি মনে নেওয়া হল, আগে মানলেই হত। এত রক্তারক্তি, এত দাঙ্গা, এত হত্যা-ধর্ষণ-আগুন—কোনোটাই ঘটত না।'

'তা ঠিক।'

'নেতারা খেয়ালের বশে যা করলেন তার পরিণাম ভাগ হবে না। দেশভাগের পেছনে কী আছে লক্ষ্য করেছেন হেমদাদা?'

'কী আছে?'

'ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আর শত্রুতা।'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন হেমনাথ।

মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'দেশ যদি সত্যি সত্যিই ভাগ হয়, হিন্দু-মুসলমানকে চিরকাল ঐ তিনটে জিনিসের জের টেনে চলতে হবে। আর সব চাইতে ক্ষতি হবে বাঙালি জাতির। এ জাতি আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর মোতাহার সাহেবই আবার শুরু করলেন, 'আপনার কী মনে হয় হেমদাদা?'

'কি ব্যাপারে?'

'দেশভাগ কি শেষ পর্যন্ত হবে?'

'তার মানে—' হেমনাথ অবাক, 'সব স্থির হয়ে গেছে। একটা সেটেলড্ ফ্যাক্টকে আনসেটেল্ড করা যাবে কী করে?'

হেমনাথের কথা বুঝি বা শুনতে পেলেন না মোতাহার সাহেব। তাঁর বুকের ভেতর এই মুহূর্তে কোন হাওয়া বইছে, কে জানে। দূরমনস্কের মতন তিনি বললেন, 'আমার কি মনে হয় জানেন হেমদাদা?'

'কী?'

'পার্টিশান আটকে যাবে।'

'কে আটকাবে?'

'দেশের মানুষ। নেতাদের এই হঠকারিতা তারা কিছুতেই কোনোমতেই মেনে নেবে না। আপনি

দেখে নেবেন।' মোতাহার সাহেবের চোখ জ্বলতে লাগল। হাত মুষ্টিবদ্ধ, চোয়াল কঠিন।

এমনিতেই মোতাহার সাহেব মানুষটি বেশ গম্ভীর। তার চোখ এত উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ যে, সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। দেখলেই ভয় লাগে, আবার ভক্তিও হয়।

কিন্তু খুব কাছাকাছি এলে টের পাওয়া যায় গাম্ভীর্যটা তাঁর ছদ্মবেশ। কঠিন মাটির ঠিক তলাতেই সুশীতল জল রয়েছে, সামান্য খুঁড়লেই ফিনকি দিয়ে ফোয়ারা বেরিয়ে আসবে।

বাইরে কঠিন ভেতরে সরস, এই মানুষটি আজ কিন্তু বড়ই অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত, চঞ্চল। মাটি খুঁড়লে আজ আর ফোয়ারা বেরুবে না, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আগুনের হলকা হয়ে বেরিয়ে আসবে।

শেষ পর্যন্ত দেশজোড়া রক্তাক্ত সূতিকাগারে সেই দিনটি ভূমিষ্ঠ হল। পনেরই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ। খণ্ডিত দেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।

মোতাহার সাহেব দেশবাসীর ওপর ভরসা রেখেছিলেন, তারা দেশভাগ বন্ধ করবে। জননীর মতন গরীয়সী এই জন্মভূমির দেহে ছুরি বসাতে দেবে না। কিন্তু সব বৃথা। হায় রে দুরাশা!

এই মুহূর্তে দেশের সব মানুষই প্রায় অন্ধ, আচ্ছন্ন। দু হাত দূরের জিনিস দেখবার মতন দৃষ্টিটুকু পর্যন্ত তাদেব নেই। জননীদেহ কেটে-কুটে ভাগাভাগি করে নেওয়া ছাড়া তারা আর কিছু ভাবতেই পাবছে না।

মোতাহার সাহেবের মতন যে দু' চারজন আছেন, যাঁদের দৃষ্টি আপন সময়ের সমস্ত অন্ধকার এবং কুয়াশা সরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছয়, তাঁরাই শুধু অসীম দুঃখে দুরন্ত অভিমানে মূক হয়ে গেছেন। এ তাঁরা চান নি।

পনেরই আগস্ট ভোর হবার কয়েক ঘণ্টা আগে 'পাকিস্তান ডে' ঘোষণা করা হয়েছিল।

চোদ্দই আগস্টের মাঝরাত থেকেই রাজদিয়ার চোখে আর ঘুম নেই। ঢাকা থেকে কত ব্যান্ড পার্টি যে আনা হয়েছে! এই নগণ্য শহরের সব রাস্তা ঘুরে ঘুরে তারা বাজিয়ে চলেছে।

রাজদিয়ার চোখ থেকে ঘুম তো গেছেই, ঘরে আর কেউ নেই। বাজনার শব্দে সবাই বেরিয়ে এসেছে। ঝিনুক আর বিনুকে নিয়ে হেমনাথও বাগান পেরিয়ে ক'বার যে রাস্তায় এলেন তার হিসেব নেই।

এক সময় ভোর হল।

এবার ব্যান্ড পার্টির সঙ্গে বেরুল মিছিল। মিছিল কি এক-আধটা? ধবধবে পোশাক-পরা ছোট ছোট শিশুদের মিছিল, কিশোর-কিশোরীদের মিছিল, যুবক-যুবতীদের মিছিল। প্রতিটি মিছিল চাঁদ-তারা আঁকা সবুজ পতাকা আর নেতাদের ছবি দিয়ে সুসজ্জিত।

মিছিলগুলো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ধ্বনি দিচ্ছে:

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ—'

'পাকিস্তান—'

'জিন্দাবাদ—'

যেভাবে আর যে মূল্যেই হোক, স্বাধীনতা এসেছে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদের কণ্ঠস্বর আর ব্যান্ড পার্টির বাজনা আকাশে- বাতাসে বিচিত্র উন্মাদনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। হেমনাথ আর বাড়ি বসে থাকতে পারলেন না। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

মিছিলের পর মিছিল পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এবং শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে এক সময় সারি সারি মিষ্টির দোকান, স্টিমার-ঘাটা, বরফকল পেরিয়ে হেমনাথরা স্কুলবাড়ির কাছে চলে এলেন।

মিষ্টির দোকান, স্টিমারঘাটা, বরফ কল কিংবা রাজদিয়ার যত বাড়িঘর—সব কিছুর মাথায় সবুজ পতাকা উড়ছে। স্টিমারঘাটটাকে ফুল-পাতা আর রঙিন কাগজ দিয়ে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে। তা ছাড়া রাস্তায় কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে দূরে একটা করে তোরণ চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু মঞ্চ বানিয়ে নহবত বসানো হয়েছে। সেখানে সানাই বাজছে।

আজকের এই দিনটা যে আর সব দিনের চাইতে আলাদা, রাস্তায় পা দিয়েই তা টের পাওয়া যায়। এই রাজদিয়ার ওপর দিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দিন এসেছে, গেছে। কিন্তু এমন দিন আর কখনও আসেনি। উদাসীনভাবে অন্যমনস্কের মতন একে যেন হাত পেতে নেওয়া যায় না, বিপুল সমারোহে একে বরণ করে নিতে হয়।

স্কুলবাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'হেমদাদা— হেমদাদা—'

বিনুরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকাতেই ডান ধারে তারা মোতাহার হোসেন সাহেবকে দেখতে পেল।

স্কুলবাড়ির ঠিক গায়েই কংগ্রেস অফিস। তার দরজায় মোতাহাব সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই তিনি হাতছানি দিলেন। মোতাহার সাহেব এবং তাঁর দু-একজন সঙ্গী ছাড়া কংগ্রেস অফিস এখন একেবারে ফাঁকা।

বিনুরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

মোতাহার সাহেব বললেন, 'আজ এত সকালে বেরিয়ে পড়েছেন হেমদাদা ?'

হেমনাথ হাসলেন, 'ব্যান্ড পার্টির আওয়াজে আর মিছিলের চিৎকারে ঘরে থাকা গেল না যে।'

'আপনাকে যেন ভারি খুশি দেখাচ্ছে—'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে হেমনাথ বললেন, 'রাজদিয়ার সব লোক বেরিয়ে পড়েছে। আমি আর কি করে ঘরে বসে থাকি বল ?'

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ গলায় মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'এত বড় একটা ট্রাজেডি ঘটে গেল, যার পরিণাম কী হবে কেউ বলতে পারে না, আর আপনি মিছিল দেখবার জন্যে, আনন্দ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন। আপনার কাছে এ কিন্তু আশা করিনি হেমদাদা—'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার জন্যে মনে দুঃখ রেখে কী লাভ। হয়ত এতে ভালই হবে। দেশ জুড়ে যে রক্তারক্তি আর হত্যা চলছিল তা চিরদিনের মতন বন্ধ হয়ে যাবে। যা এসেছে তাকে প্রসন্ন মনেই গ্রহণ কর মোতাহার।'

মোতাহার সাহেব খুব একটা সান্ত্বনা পেয়েছেন, এমন মনে হল না। ক্ষোভ বিষাদ দুঃখ—সব একাকার হয়ে তাঁর মুখখানাকে মলিন করে রাখল।

বিনু অবাক হয়ে হেমনাথকে দেখছিল। আজই শুধু না, রাজদিয়ায় আসার পর থেকেই দাদুকে দেখছে সে। ভালমন্দ শুভাশুভ যাই সামনে এসে দাঁড়াক তাকে তিনি সানন্দে, পরম উদারতার সঙ্গে বুকে তুলে নিতে পারেন। তাঁর চরিত্রের মূলমন্ত্র এখানেই।

হেমনাথ বললেন, 'এখন চলি রে মোতাহার—'

মোতাহার হোসেন উত্তর দিলেন না।

—

হেমনাথ আবার বললেন, 'আমাদের সঙ্গে তুই যাবি ?'

নীরস সুরে মোতাহার সাহেব জানালেন, যাবেন না।

আবার বড় রাস্তায় এসে পড়ল বিনুরা। পুবদিকে খানিকটা গেলেই সেটলমেন্ট অফিসের পাশে মুসলিম লিগের অফিস। লিগের অফিসটাকে আজ আর চেনাই যায় না। ফুলে-পাতায়, রঙিন কাগজে আর অসংখ্য সবুজ পতাকায় তার চেহারা বদলে গেছে। কত মানুষ যে সেখানে ভিড় জমিয়েছে, লেখাজোখা নেই। লিগের অফিসটা ঘিরে এই মুহূর্তে বিরাট উৎসব চলছে।

হঠাৎ কংগ্রেস অফিসটার কথা মনে পড়ে গেল বিনুর। একটু আগেই সেখান থেকে তারা এসেছে। মুসলিম লিগের এই উৎসবমুখর জমকালো বাড়িটার তুলনায় সেটাব দৃশ্য বড় করুণ এবং নিষ্প্রভ। অথচ ক'দিন আগেও কংগ্রেস অফিসে ভিড় লেগে থাকত। রাতারাতি সব বদলে গেছে।

লিগ অফিসের কাছে আসতেই রজবালি শিকদার ছুটে এল। তার দেখাদেখি আরো অনেকে। ইদানীং রজবালি এ অঞ্চলে লিগের বড় নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসেই রাজবালি হেমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সে বলল, 'আপনে আইছেন হ্যামকত্তা!' দেখেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

সহজ গলায় হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ এলাম। পার্টিশানের পর এ দেশ যদি পাকিস্তান হয়ে থাকে, আমরা তা হলে পাকিস্তানী। এমন দিনে আমরা আসব না ?'

অভিভূত স্বরে রজবালি শিকদার বলল, 'নিয্যস নিয্যস—'

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আরো কেউগা আছস, গুলাপ জল লইয়া আয়, হ্যামকত্তারে দে—'

একজন ছুটে গিয়ে রুপোর পিচকিরিতে গোলাপ জল এনে বিনুদের মাথায় ছিটিয়ে দিল। শুধু বিনুরাই নয়, হিন্দু-মুসলমান যারাই লিগ অফিসের কাছে আসছে তাদেরই বুকে জড়িয়ে ধরা হচ্ছে, গোলাপ জলে সিক্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

লিগ অফিসের একজন বলল, 'পাকিস্তান হইয়া গেছে। যা চাইছিলাম তা পাইছি। আইজ থিনে আপনাগো লগে আমাগো কাইজা বন্ধ।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার সঙ্গে কিন্তু কোনোকালেই কারো ঝগড়া নেই।'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে লোকটা বলল, 'আপনের কথা কই না হ্যামকত্তা—'

'তবে ?'

'হিন্দুগো কথা কই।'

'আমি বুঝি হিন্দু না ?'

রজবালি বলল, 'আপনের লগে কার কথা। আপনে হিন্দুও না, মুসলমানও না। আপনের সগলের হ্যামকত্তা—' তার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপতে লাগল।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হেমনাথ বললেন, 'এখন যাই রে রজবালি।'

'অহনই যাইবেন ?'

সূর্য উঠে গিয়েছিল। সকালের নরম সোনালি রোদ নদীর ঢেউয়ে টলমল করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে শঙ্খচিল উড়ছিল। মাসটা যদিও শ্রাবণ, আজকের আকাশ আশ্চর্য উজ্জ্বল, পালিশ-করা নীল আয়নার মতন তার গা থেকে দীপ্তি বেরুচ্ছে। আর আছে ভারহীন ভবঘুরে মেঘ। উল্টোপাল্টা পুবের বাতাস তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে একবার এদিকে, আবার ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে।

হেমনাথ বললেন, 'সেই কখন বেরিয়েছি! কত বেলা হয়ে গেল!'

রজবালি বলল, 'এমন দিনে হুদা মুখে যাইতে পারবেন না, আইজের দিনে এট্টু মেঠাই মুখে দিতে হইব।'

'এখন মিষ্টিটিষ্টি খেতে পারব না বাপু।'

'তয় বাইন্দা দেই, বাড়িত্ নিয়া যাইবেন।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'ছাড়বি না যখন, তখন দে। বাড়িই নিয়ে যাই।'

দেখা গেল, হেমনাথদেরই শুধু না, যারাই লিগ অফিসের কাছে আসছে মিষ্টিমুখ না করে কেউ ছাড়া পাচ্ছে না।

রজবালি নিজের হাতে মিষ্টির একটা হাঁড়ি এনে হেমনাথকে দিল। তারপর বলল, 'বিকালবেলা কোর্টপাড়ার মাঠে আইসেন।'

রাজদিয়ায় ফৌজদারি আর দেওয়ানি আদালত দুটো পাশাপাশি। তার সামনে মস্ত মাঠ। হেমনাথ শুধোলেন, 'সেখানে কী?'

'মিটিন হইব। ঢাকার থনে বড় ন্যাতারা আইসা বক্‌তিতা করব। আইসেন কিলাম।'

'আসব।'

বাড়ি আসতেই স্নেহলতা জানালেন, মীরপাড়া-গুধাপাড়া-সর্দারপাড়া, রাজদিয়ায় যত মুসলমান বাড়ি আছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সব জায়গা থেকে মিষ্টি পাঠিয়েছে।

বিকেলবেলা আদালত পাড়ার মাঠে এসে দেখা গেল, লোকে লোকারণ্য। রাজদিয়ারই শুধু না, চারদিকের গ্রামগঞ্জ থেকে মানুষ এসে ভেঙে পড়েছে।

রজবালি কোথায় ছিল, ছুটে এল। যেখানে শহরের গণ্যমান্য শ্রদ্ধেয় মানুষেরা বসে আছেন, তাঁদের পাশে দুটো চেয়ারে হেমনাথ আর বিনুকে নিয়ে বসাল।

ঢাকা থেকে নেতারা এসেছিল। তাঁরা পকিস্তান দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। তারপর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কিছু বলতে অনুরোধ করা হল।

যদিও মুসলিম লিগ এই সভা আয়োজন করেছে, তবু হঠাৎ রজবালি শিকদার বক্তা হিসেবে হেমনাথের নাম প্রস্তাব করে বসল। অগত্যা হেমনাথকে পাকিস্তান সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে হল।

সভা শেষ হতে সন্ধে হয়ে গেল। তারপর শুরু হল আতস বাজির খেলা। কত রকম যে বাজি আনা হয়েছে হিসেব নেই। কোনটা আকাশে গিয়ে আলোর ময়ূর হয়ে যাচ্ছে, কোনোটা চিল, কোনোটা বাঘ, কোনোটা আবার সিংহ। একেকটা হাউই উড়ে গিয়ে আগুনের ফুলকি দিয়ে লিখে দিচ্ছে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' কিংবা 'কায়েদে আজম, জিন্দাবাদ।' তলায় হাজার কণ্ঠে উল্লসিত জয়ধ্বনি উঠছে:

'পাকিস্তান—'

'জিন্দাবাদ।'

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ।'

বাজি পোড়ানো দেখে হেমনাথরা যখন বাড়ি ফিরলেন, মাঝ রাত পার হয়ে গেছে।

সাতচল্লিশে দেশভাগ হল। তারপর দেখতে দেখতে আরো তিনটে বছর কেটে গেল।

এর মধ্যে বি.এ পাস করেছে বিনু। ঝিনুক ম্যাট্রিক পাস করে রাজদিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে।

ওদিকে যুদ্ধের সময় ঝোঁকের বশে যে অবনীমোহন কনট্রাক্টরি নিয়ে আসাম চলে গিয়েছিলেন, সেখানেও বেশিদিন থাকেন নি। যুদ্ধ থামবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শখ মিটে গিয়েছিল। কনট্রাক্টরি ছেড়েছুড়ে

অবনীমোহন কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, সেখানে বড় চাকরি নিয়েছেন।

কলকাতায় গিয়েই বিনুকে পাঠিয়ে দেবার জন্য হেমনাথকে চিঠি দিয়েছিলেন অবনীমোহন। বিনু যায় নি। তারপর ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় কিংবা দেশভাগের সময়ও যাবার কথা লিখেছিলেন। তখনও বিনু যায় নি। দেশভাগের সময় অবশ্য জমিজমা বিক্রি করে হেমনাথকেও চলে যেতে লিখেছিলেন অবনীমোহন। সুধা-সুনীতি কলকাতাতেই আছে। তারাও ঐ একই কথা লিখত। এখনও নিয়মিত লিখে যাচ্ছে।

পাকিস্তান দিবসকে ঘিরে রাজদিয়ায় যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল ভাটার টানের মতন ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে গেছে। তার জীবন আবার পুরনো ঢিমে তালে বাজতে শুরু করেছে।

তিন বছর আগের মতনই চৈত্র-বৈশাখের রোদে মাটি ফেটে চৌচির হয়েছে, দিগন্তে আগুনের হল্কা নেচে নেচে গেছে। গ্রীষ্মের পর শ্যামল বেশে এসেছে বর্ষা। মাঠ ভাসিয়ে, ধানখেত, পাটখেত ডুবিয়ে চারদিক একাকার করে দিয়েছে। তারপর আকাশে-মাটিতে পবিচিত ছবি এঁকে একে-একে দেখা দিয়েছে শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত। রাজদিয়ার মানুষ তিন বছর আগের মতন পাট বুনেছে, ধান কেটেছে, খেতে নিড়ান দিয়েছে, নৌকো বেয়েছে। মটর কলাইর খেতে 'ছেই' সেদ্ধ করে খেয়েছে, গলুয়ায় (মেলায়) গিয়ে বউর জন্য আলতা কিনেছে, ফুলেল তেল কিনেছে। মাঠ পাড়ি দিয়ে গেছে সুজনগঞ্জের হাটে, কিংবা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থিসার হয়ে উঠেছে। তিন বছর আগের মতনই তারা ভাসান গান গেয়েছে, সারি-জারি আর রয়ানিতে চারদিক মুখর করে তুলেছে।

তিন বছর আগের মতনই ভেসালের বাঁশে শঙ্খচিল এসে বসেছে। ধানখেতের আলে-আলে জলসেঁচি শাকের অরণ্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বিলগুলো পানকলস আর জলসিঙাড়ায় ছেয়ে গেছে। পৌষ-মাঘ মাসে শীতের দেশ থেকে এসেছে যাযাবর পাখিরা, গরম পড়তে না পড়তেই তারা ফিরে গেছে। কাচের মতন স্বচ্ছ জলের তলায় টাটকিনি আর ভাগনা, গজার আর বজুরা, কাচকি আর বাজালি মাছেরা ডিম পেড়ে রুপোলি ফসলে জলবাংলাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

তিন বছর আগের মতন কাউফলের গাছগুলোতে ফুল ধরেছে, বউন্যাগাছের শরীর ফলে ভরে গেছে। কালো-কালো মসৃণ মুত্রার মাথায় অসংখ্য সাদা ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। যেখানেই চোখ ফেরানো যাক—ধানের খেতে, শাপলাবনে, বেতঝোপে কি খাল-বিল-নদীতে—সব দিকেই জলবাংলার এই অপরূপ বসুন্ধরা আগের মতনই রমণীয়। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ছুরি ভারতবর্ষকে দু'খানা করে কেটে ফেলার পরও রাজদিয়ার কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। তার আহ্নিক গতি বার্ষিক গতি প্রায় একই নিয়মে চলেছে।

তবে দূর-দূরান্ত থেকে খবর আসছিল পাকিস্তান হবার পরই এদেশে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। সাতপুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে দলে দলে মানুষ আসাম আর আগরতলায় চলে যাচ্ছে। বেশির ভাগ যাচ্ছে কলকাতার দিকে। নোয়াখালি বরিশাল ফরিদপুর কুমিল্লা, এমন কি ঢাকা জেলার নানা গ্রাম-গঞ্জ থেকেও ঐ একই খবর আসছিল।

মোতাহার হোসেন সাহেব মাঝে মাঝে আসেন। বিষণ্ণ সুরে বলেন, 'খবর পাচ্ছেন হেমদাদা?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন হেমনাথ। ঝাপসা গলায় বলেন, 'পাচ্ছি।'

'আপনি তো বলেছিলেন পাকিস্তান হয়ে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এ কি হচ্ছে?'

হেমনাথ উত্তর দেন না, বিমর্ষ মুখে চুপচাপ বসে থাকেন।

উত্তেজিতভাবে এবার মোতাহার সাহেব বলতে থাকেন, 'সমাধানই যদি হয়ে যাবে, হাজার হাজার মানুষ ইস্ট পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন?'

এবারও হেমনাথ নীরব।

এর ভেতর একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

একদিন দুপুরবেলা বিনুরা সবে খেয়ে উঠেছে, বাগানের দিক থেকে খুব চেনা একটা গলা ভেসে এল, 'বড়কত্তা, বড়কত্তা—'

হেমনাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'কে রে?'

'আমি যুগলা—' বলতে বলতে সত্যিসত্যিই যুগল সামনে এসে দাঁড়াল।

যুগলের গলা পেয়ে স্নেহলতা আর শিবানীও বেরিয়ে এসেছিলেন।

দশ বছর আগে নতুন বৌকে নিয়ে সেই যে ভাটির দেশে দ্বিরাগমনে গিয়েছিল যুগল, তারপর এই প্রথম তাকে দেখা গেল।

প্রায় তেমনই আছে যুগল, তেমনি হিলহিলে বেতের মতন পাতলা চেহারা, তেমনি খাড়া খাড়া চুল। তবে এই মুহূর্তে তাকে অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত আর অস্থির দেখাচ্ছে। রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত সে।

এতকাল পর যুগলকে দেখে সবাই ভারি খুশি। স্নেহলতা শিবানী তো চেঁচামেচিই জুড়ে দিলেন, 'বোস যুগল, বোস—'

যুগল বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগল, 'অহন বসুম না ঠাউরমা। আপনেগো লগে দেখা কইরাই যামু গা।'

'যাবি যাবি। কতকাল তোকে দেখি না। সেই যে শ্বশুরবড়ি চলে গেলি, ভুলেও আর এদিক মাড়াস না। শ্বশুর-শাশুড়ি পেয়ে আমাদের একেবারে ভুলেই গেছিস। সে যাক গে, এখন এলি কোত্থেকে?'

'ভাটির দ্যাশ থন।'

'শ্বশুরবাড়ি থেকে?'

'হ।'

'ছেলেপুলে হয়েছে?'

'হ।'

'ক'টা?'

'দুই মাইয়া, এক পোলা।'

'একা একা এলি যে? বউ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনলি না কেন?'

একটু চুপ করে থেকে আবছা গলায় যুগল বলল, 'অরা আইছে—'

স্নেহলতা শিবানী হেমনাথ—তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'কোথায় রে, কোথায়?'

'ইস্টিমারঘাটায়—'

'স্টিমারঘাটে বসিয়ে এসেছিস যে, তোর আস্পর্ধা তো কম না! ঘরের বৌকে রাজদিয়া পর্যন্ত এনে বাড়িতে তুললি না!'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে যুগল বলতে লাগল, 'রাগ কইরেন না। তাগো আননের সময় আছিল না, আনলেই দেরি হইয়া যাইত। আইজের ইস্টিমার ধরতে পারতাম না। দ্যাশ ছাইড়া জন্মের মতন যাওনের আগে আপনেগো লগে দেখা কইরা গেলাম।'

হেমনাথ উৎকণ্ঠিত হলেন, 'কোথায় চলেছিস দেশ ছেড়ে?'

'কইলকাতা।'

'কলকাতায় কেন?'

'ভাটির দ্যাশে আর থাকন গেল না বড়কত্তা। আগুন দিয়া গেরামকে গেরাম পোড়াইয়া দিছে, চৌখের সামনা থনে ফসল কাইটা লইয়া যায়। এত অত্যাচার সইয়া থাকন যায় না। হেইর লেইগা যাইতে আছি গা।'

একটু চুপ। পলকে সমস্ত আবহাওয়াটা বদলে গেল। চারদিক থেকে বিচিত্র এক বিমর্ষতা সবাইকে

ঘিরে ধরতে লাগল।

একসময় হেমনাথ বলে উঠলেন, 'কলকাতায় কোনোদিন যাস নি। অচেনা জায়গায় গিয়ে কী করবি, কোথায় থাকবি, কী খাবি—তার কি কিছু ঠিক আছে! বরং এক কাজ কর, বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানেই চলে আয়। রাজদিয়াতে কোনো গোলমাল নেই।'

খানিক ভেবে যুগল বলল, 'না বড়কত্তা, কইলকাতাতেই যামু। রাইজদিয়াতে গন্ডগোল নাই বুঝলাম, কিন্তুক হইতে কতক্ষণ ? হেয়া ছাড়া—'

'কী ?'

'আমার হউর (শ্বশুর), তিন খুড়া হউর, দুই পিসাতো ভায়রা আর তাগো গুষ্টি আমার লগে যাইতে আছে। তাগো ফালাইয়া আমি কেমনে আসি ? এত মাইনষেরে জায়গা দ্যাওন তো সোজা না বড়কত্তা—'

মনে মনে হেমনাথ ভেবে দেখলেন, কথাটা ঠিকই বলেছে যুগল। শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের ফেলে একা একা সে আসতে পারে না। আবার সবাই এলে এতগুলো মানুষকে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'ভাটির দেশ থেকে কি অনেক লোক চলে যাচ্ছে ?'

'মেলা বড়কত্তা, মেলা। যা দশ-বিশ ঘর আছে, তারাও থাকব না। দুই চাইর দিনের ভিতর সাফ হইয়া যাইব।' একটু থেমে যুগল আবার বলল, 'যদি পারেন আপনেরাও যাইয়েন গা।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

যুগল এবার বলল, 'আর খাড়াইতে পারুম না, ইস্টিমার ছাড়নের সোমায় হইয়া আইল। যাই গা ঠাউরমা, যাই বড়কত্তা, চললাম ছুটোবাবু—' হেমনাথ শিবানী আর স্নেহলতাকে প্রণাম করে একটু পর চলে গেল যুগল।

যুগল চলে যাবার পর পুবের ঘরের তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে তার কথাই ভাবছিল বিনু। ওরা কলকাতায় যাচ্ছে।

দশ বছর আগে বিনুরা যেদিন প্রথম রাজদিয়া এল সেদিনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলকাতার কত খবর নিয়েছিল যুগল। কলকাতা তখন তার কাছে স্বপ্ন, তার কল্পনায় কলকাতা রমণীয় স্বর্গ হয়ে ছিল।

কিন্তু চল্লিশের কলকাতা আর পঞ্চাশের কলকাতা কি এক ? প্রতিদিন ডাকে যে খবরেরকাগজ আসে তাতে কলকাতার ভয়াবহ ছবি থাকে। সুবিশাল ঐ মহানগর নাকি উদ্বাস্তুতে ছেয়ে গেছে। কোথাও থাকবার জায়গা নেই। তাই ছিন্নমূল নরনারীর দল রেলস্টেশনে, ফুটপাথে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে।

পঞ্চাশের কলকাতা যুগলকে কোন স্বর্গে পৌঁছে দেবে, কে জানে।

যুগল যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিল, অক্ষর অক্ষরে ফলে গেল। একটা মাসও তারপর কাটে নি, রাজদিয়ার মাটি তেতে উঠল।

ঢাকা থেকে এসে কারা যেন সুজনগঞ্জে, মীরকাদিমে, ওদিকে আউটশাহী বেতকা আবদুল্লাপুরে প্রায়ই মিটিং করে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের চালে আগুন লাগছে, মাঠের পর মাঠ পাকা ধান কারা রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু কি তাই, সন্ধে হলেই ঘরের চালে চালে ঢিল পড়ে, দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য বেনামি চিঠি আসে। এমন চিঠি খানকতক হেমনাথও পেয়েছেন।

ব্যাপারটা এতেই থেমে থাকল না। সুজনগঞ্জের হাট থেকে ফিরবার পথে সেদিন বারুইপাড়ার রাখাল আর যুগীপাড়ার রাধাবল্লভ সড়কির ঘা খেয়ে এল। তারপর যেদিন গণকপাড়ার কাপাসীকে খুঁজে পাওয়া গেল না সেদিন থেকে এই রাজদিয়াতেও ভাঙন শুরু হয়ে গেল। গণকপাড়া তো বটেই, কুমোরপাড়া কামারপাড়া বারুইপাড়া নাহাপাড়া, সব জায়গা থেকেই দলে দলে মানুষ ভিটেমাটি ফেলে স্টিমারে করে কলকাতার দিকে চলে যেতে লাগল। হেমনাথ আর মোতাহার সাহেব 'পিস কমিটি' করেও ভাঙন ঠেকাতে পারলেন না।

ইদানীং সব চাইতে আশ্চর্য ব্যবহার হয়েছে মজিদ মিঞার। আগে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হেমনাথের বাড়ি আসত সে, আজকাল হাজার ডাকাডাকি করলে আসে না। দেখা হলে এড়িয়ে যায়। তার সম্বন্ধে নানারকম কথা কানে আসছে। লোকটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে।

শোনা যায়, মজিদ মিঞা নাকি কেতুগঞ্জের দিকে লিগের পান্ডা হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য এই মানুষই দশ বছর আগে, বিনুরা প্রথম যেদিন রাজদিয়ায় এল, পনের মাইল জল ঠেলে তাদের দেখতে এসেছিল। এই মানুষই সিগারেট খাবার জন্য তাকে মেরেছিল, মারের চোটে জ্বর এলে সারারাত তার শিয়রে বসে কেঁদেছিল। সুজনগঞ্জের হাটে দাঙ্গা বাধলে এই মানুষই পাগলের মতন ছোটাছুটি করেছিল। রক্তাক্ত আহত অবস্থায় লারমোরকে রাজদিয়ায় নিয়ে আসার পর সে কমলাঘাটে ছুটেছিল ডাক্তার আনতে। তার হৃদয়ের উত্তাপ, তার আত্মীয়তা বোধ, তার মমতা, মহত্ত্ব বিনুকে এতকাল মুগ্ধ করেছে। আশ্চর্য, সেই মানুষটা বদলে গেছে।

রাজদিয়ায় ততটা না হলেও আশেপাশের গ্রামগঞ্জগুলো থেকে প্রায়ই খুন-জখম-আগুনের খবর আসছিল। রাত হলেই উন্মত্ত চিৎকার শোনা যায়, অন্ধকার চিরে চিরে মশালের আলো দপদপ্ করে জ্বলতে থাকে।

একদিন আরো নিদারুণ খবর এল। রাজদিয়া থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যে স্টিমার সারভিস ছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজদিয়া যেন অজানা দ্বীপের মতন জলবাংলার এই প্রান্তে পড়ে রইল।

শুধু রাজদিয়া বা চারধারের গ্রামগুলোতেই না, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-মানিকগঞ্জ থেকেও গোলমালের খবর আসছিল।

যত শুনেছিলেন যত দেখছিলেন ততই যেন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন হেমনাথ। সমস্ত জগৎ থেকে কিছুদিনের জন্য নিজেকে গুটিয়ে এনে চুপচাপ বসে রইলেন। ঠিক বসে রইলেন না, সেই বড় বড় লোহার বাক্সগুলো খুলে সারা জীবনের সঞ্চয় অসংখ্য ভাল ভাল জিনিস—ময়ূরের পালক, সুন্দর হস্তাক্ষর, চকচকে পাথর, চমৎকার ছবি—দেখে দেখে কাটালেন। মন খারাপ হলেই তিনি ওগুলো নিয়ে বসেন। সারাদিন এসব দেখবার পর সন্ধেবেলা গীর্জায় গিয়ে লারমোরের সমাধিতে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে লাগলেন।

দিন কয়েক পর হঠাৎ বুঝিবা হেমনাথের মনে হল, এভাবে নিজেকে গুটিয়ে এনে ঘরে বসে থাকা ঠিক হয়নি। আবার আগের মতন তিনি গ্রাম গ্রাম ঘুরতে লাগলেন। এই দুঃসময়ে তিনি পাশে থাকলে সবাই ভরসা পাবে।

চারদিক জুড়ে যখন আগুন জ্বলছে সেইসময় একদিন দুপুরবেলা ভবতোষ এলেন। চুল এলোমেলো, চোখের কোলে শ্যাওলার মতন কালচে দাগ, মুখময় তিন-চার দিনের দাড়ি, চোখ আরক্ত। সমস্ত শরীর ঘিরে সীমাহীন বিষণ্ণতা।

দশ বছর ধরে ভবতোষের এই এক চেহারাই দেখে আসছে বিনু।

এসেই ভবতোষ বললেন, 'খুব খারাপ খবর কাকাবাবু—'

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কী ব্যাপার ?'

'ঝিনুকের মা মৃত্যুশয্যায়। শেষ সময়ে ঝিনুক আর আমাকে একবার দেখতে চেয়েছে।'

'কে বললে?'

'সে-ই খবর পাঠিয়েছে।'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'ঝিনুকের মা এখন কোথায়?'

'ঢাকায়।'

'তোর শ্বশুরবাড়ি?'

'না।'

'তবে?'

'যার সঙ্গে চলে গিয়েছিল তার কাছে আছে।'

'কিন্তু—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ভবতোষ।

হেমনাথ বললেন, স্টিমার বন্ধ। চারদিকে গোলমাল চলছে। এর ভেতরে ঢাকায় যাবি কী করে?'

'আমি একটা বিশ্বাসী মাঝি ঠিক করে রেখেছি, সে-ই নৌকোয় করে নিয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।'

'এ সময় পাঠানো উচিত না, ঝিনুক বড় হয়েছে। তবু ওর মায়ের কথা ভেবে না পাঠিয়ে পারছি না। খুব সাবধানে যাবি কিন্তু—'

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'কবে ফিরবি?'

'তিন চারদিনের ভেতর।'

ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ চলে গেলেন।

তিন চারদিনের জায়গায় ষোল-সতের দিন কেটে গেল। তবু ঝিনুকরা ফিরছে না। তাদের কোনো বিপদ ঘটল কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। স্নেহলতা-শিবানী এবং হেমনাথ অস্থির হয়ে উঠলেন। আর বিনু?

কৈশোর আর যৌবনের দশটা বছর ঝিনুকের সঙ্গে একই বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছে সে। মাঝে মাঝে ভবতোষ ঝিনুককে নিয়ে গেছেন ঠিকই। কিন্তু দু-একদিন পরেই সে ফিরে এসেছে। একসঙ্গে ষোল সতের দিন তাকে ছেড়ে কখনও থাকে নি বিনু।

ঝিনুক যেন নিশ্বাস-বায়ুর মতন সহজ। কাছে থাকলে টের পাওয়া যায় না। এই দশ বছরে ধীরে ধীরে জীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে সে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে, এই প্রথম বুঝতে পারল বিনু। ঝিনুকের জন্য প্রতি মুহূর্তে তার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, হেমনাথ ভবতোষদের খোঁজে ঢাকায় যাবেন। বিনুও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, হেমনাথ নেন নি। বললেন, 'দু'জনে গেলে কী করে চলবে? বাড়িতে একজন পুরুষমানুষ থাকা দরকার।

দিন তিনেক পর ঝিনুককে নিয়ে ঢাকা থেকে ফিরলেন হেমনাথ। কিন্তু এ কোন ঝিনুক? চুল আলুথালু। চোখের দৃষ্টি স্থির, উদ্‌ভ্রান্ত। গালে-ঠোঁটে-বাহুতে, সমস্ত শরীরের কত জায়গা যে মাংস উঠে উঠে রক্তারক্তি হয়ে আছে! পরনের জামাটা, শাড়িটা নানা জায়গায় ছেঁড়া। কোন রাক্ষস যেন তার শরীরের

সার শুষে নিয়েছে।

ঝিনুককে দেখেই শিবানী-স্নেহলতা কেঁদে ফেললেন, 'কী হয়েছে ঝিনুকের? কী হয়েছে? ভব কোথায়?'

হেমনাথকেও চেনা যাচ্ছিল না। শক্তিমান ঋজু মানুষটা একেবারে ভেঙেচুরে গেছেন যেন। তাঁকে একটা ধ্বংসস্তূপ বলে মনে হচ্ছে।

আড়ষ্ট ভাঙা গলায় হেমনাথ বললেন, 'ভব নেই।'

স্নেহলতা চিৎকার করে উঠলেন, 'কী হয়েছে ভব'র? বল—বল—'

হেমনাথ যা বললেন, সংক্ষেপে এই রকম। এখান থেকে ঢাকা পৌঁছুবার পর ভবতোষ দাঙ্গার ভেতর পড়েছিলেন। ঘাতকের দল ভাবতোষকে মেরে ফেলেছে। তারপর ঝিনুককে নিয়ে চলে গিয়েছিল। হেমনাথ ঢাকায় গিয়ে পুলিশ দিয়ে ঝিনুককে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু ভাবতোষের মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

শ্বাপদেরা ষোল-সতের দিন একটা বাড়িতে ঝিনুককে আটকে রেখেছিল। যে অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়েছে, তার চাইতে সে যদি মরে যেত!

স্নেহলতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কেন মরবে, কেন? কী দোষ ওর?'

হেমনাথ ঝাপসা গলায় বলতে লাগলেন, 'কেন যে ওদের আমি ঢাকায় যেতে দিলাম! আমি যদি তখন শক্ত হতাম কিছুতেই ওরা যেতে পারত না। ভবতোষ মরল। আর এই সোনার প্রতিমা নিজের হাতে বিসর্জন দিলাম।'

একধারে দাঁড়িয়ে পলকহীন ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে ছিল বিনু। একটা কথাও বলতে পারছিল না সে। বার বার মনে হচ্ছিল, তীক্ষ্ণমুখ অগণিত তীর তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করে যাচ্ছে।

ঢাকা থেকে আসবার পর দুটো দিন কিছু খেল না ঝিনুক, ঘুমলো না, এমন কি একটা কথাও পর্যন্ত বলল না। দিনরাত শূন্য চোখে দূর ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকল।

পুরো দু'দিন পর ঝিনুক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'আমাকে তোমরা মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল।'

স্নেহলতা সান্ত্বনা দেবেন কি, নিজেই কাঁদতে লাগলেন। ঝিনুকের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'কাঁদে না দিদি, কাঁদে না—'

'আমার যে আর কিছুই নেই দিদা, আমার বেঁচে থেকে আর কী লাভ?'

'ওসব ভুলে যা দিদিভাই—'

'ভুলতে যে পারছি না।'

উত্তর না দিয়ে স্নেহলতা তার পিঠে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন।

ঝিনুক বলতে লাগল, 'আমি এখানে থাকব না দিদি, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দাও।'

'কোথায় যাবি দিদি?'

'যেখানে খুশি পাঠাও। আমার এখানে বড্ড ভয় করছে।'

'কিসের ভয়, আমরা তো আছি।'

'না-না, তোমরা কিছু করতে পারবে না। ওরা আমাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে।'

যত দিন যাচ্ছে, ঝিনুকের ভয় ততই বাড়তে লাগল। রাত্রিবেলা চারধারের গ্রামগুলো থেকে যখন বর্বর চিৎকার ভেসে আসে কিংবা মশালগুলো দপদপ করে জ্বলতে থাকে, সেই সময় ঝিনুক অস্থির হয়ে ওঠে। স্নেহলতা, শিবানী, হেমনাথ বা বিনু—যে-ই কাছে থাকে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'আমি আর বাঁচব না, এখানে থাকলে নিশ্চয়ই মরে যাব।'

দেখেশুনে একদিন হেমনাথ বললেন, 'ওর মনের ভেতর ভয় বাসা বেঁধে ফেলেছে। এখানে রাখা আর ঠিক হবে না।'

স্নেহলতা বললেন, 'এখানে তো রাখবে না বলছ, কোথায় রাখবে তা হলে?'

'ভাবছি কলকাতায় অবনীমোহন কি সুধা-সুনীতির কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'কলকাতায়?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে যাবে কে?'

'বিনু। এ ছাড়া সত্যিই ওকে বাঁচানো যাবে না।'

বিনু কাছেই ছিল। বলল, 'এক কাজ করা যাক বরং—'

হেমনাথ শুধোলেন, 'কী কাজ?'

'বাড়িঘর জমিজমা বেচে চল সবাই চলে যাই।'

দৃঢ়স্বরে হেমনাথ বললেন, 'না, কিছুতেই না। কোনো অন্যায় আমি করিনি, বিনাদোষে জন্মভূমি ছেড়ে কেন চলে যাব? দুর্দিন দেখে সবাই যদি পালিয়ে যাই সুদিন আনবে কে? মনে রেখো সব মানুষই পশু হয়ে যায়নি, যেতে পারে না। আগের মতন দিন আবার আসবেই। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

'যা দশ-বিশ ঘর এখনও আছে, আমি চলে গেলে তারাও থাকবে না। তাদের জন্যও আমাকে রাজদিয়া থাকতে হবে।'

'কিন্তু—'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তুই কি বলতে চাস, বুঝতে পেরেছি। এর জন্যে যদি মরতেও হয়, আমি রাজি।'

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, বিনু একলাই ঝিনুককে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'স্টিমার তো বন্ধ, যাবে কী করে?'

হেমনাথ বললেন, 'তারপাশা থেকে দিনে দুটো করে স্টিমার যাচ্ছে গোয়ালন্দে। এখান থেকে নৌকোয় ওরা তারপাশা যাবে। আমি রাজেক মাঝিকে ঠিক করে রেখেছি। সে-ই বিনুদের তারপাশায় নিয়ে স্টিমারে তুলে দিয়ে আসবে।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'ঢাকায় গিয়ে ঝিনুকের যা হাল হয়েছে, তারপাশা যাবার পথে আবার কিছু হবে না তো?'

'ওদিকে কোনো গোলমাল হয়নি। তা ছাড়া রাজেক খুব বিশ্বাসী। তারপর অদৃষ্ট।'

দিন দুই পর সন্ধেবেলা পুকুরঘাট থেকেই রাজেক মাঝির নৌকোয় উঠল বিনুরা। বিনুরা বলতে বিনু আর ঝিনুক। সারারাত বাইলে ভোরবেলা তারা তারপাশা পৌঁছে যাবে। ঝিনুক বিনুর কোলের কাছে চিত্রার্পিতের মতন বসে আছে।

সবে কার্তিকের শুরু। এখনও মাঠে প্রচুর জল। ধানখেত আর শাপলাবন ঠেলে অনায়াসেই নৌকো নিয়ে বড় নদীতে চলে যাওয়া যাবে।

স্নেহলতা, শিবানী আর হেমনাথ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবানী স্নেহলতা খুব কাঁদছিলেন। হেমনাথ রাজেক মাঝিকে সাবধান করে দিচ্ছেন। পাখি পড়ানোর মতন বার বার বলছেন, কী ভাবে কেমন করে তারপাশায় নিয়ে যাবে।

রাজেক সমানে মাথা নাড়ছে আর বলছে, 'আপনে নিচ্চিন্ত থাকেন বড়কত্তা, জান থাকতে ছুটোবাবুগো

গায়ে কেউ হাত দিতে পারব না। আল্লার কিরা—'

বিনু একদৃষ্টে হেমনাথের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্নেহলতা, শিবানী— কাউকেই দেখতে পাচ্ছিল না সে। তার চোখের সামনের সব কিছু ঘিরে, সমস্ত চরাচর জুড়ে প্রসন্ন পুরুষটি যেন দাঁড়িয়ে আছেন।

হেমনাথকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বিনু। হঠাৎ দশ বছর আগের সেই দিনটির কথা মনে পড়ে গেল তার। জলবাংলার এই অখ্যাত নগণ্য জনপদে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজদিয়ায় যেন উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর আজ? রাতের অন্ধকারে, নিঃশব্দে, সবার চোখের আড়ালে চলে যেতে হচ্ছে। নিরানন্দ নিরুৎসব এই বিদায় বিনুর বুক অসীম বিষাদে ভরে দিতে লাগল।

এই মুহূর্তে কত কথাই মনে পড়ছে তার। লারমোর, মজিদ মিঞা, রামকেশব, মনা ঘোষ, গয়জদ্দি ব্যাপারী, রজবালি শিকদার, পতিতপাবন, মোতাহার হোসেন সাহেব, ফসলকাটা মাঠে যে লোকটা ইঁদুরের গর্ত থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধান বার করত সেই তালেব, চরের সেই ভূমিহীন কৃষাণের দল, এমনকি ধানের খেতে গা দুলিয়ে দুলিয়ে যে বুড়ো সোনালি গোসাপটা আলের ওপর দিয়ে যেত—সবাই চোখের সামনে ভিড় করে এল। আর মনে পড়ছে শরতের উজ্জ্বল নীলাকাশকে, সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘদলকে, কার্তিকের ধূসর হিমকে। জলসেঁচি শাকের নিবিড় লাবণ্য, বেতঝোপ, মুত্রাবন, বড় বড় পদ্মপাতা, জলসিঙাড়া, কাউ আর হিজলবন, কইওকড়া আর হেলেঞ্চা লতার দাম, শঙ্খচিলের ঝাঁক, গোবক, কানিবক, পানিকাউ, শালিক, বুলবুলি, বাচা-ট্যাংরা-বাজালি-বজুরি মাছেরা—কত কথা যে মনে পড়তে লাগল! এরাই তো তার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছে। হায়, কৈশোরের এই রম্যভূমি, যৌবনের এই স্বর্গে আর কোনোদিন ফেরা হবে কিনা, কে জানে।

জলবাংলার মনোহর দৃশ্য, পশুপাখি, বৃক্ষলতা খুব বেশিক্ষণ বিনুকে বিভোর করে রাখতে পারল না। এবার তার চোখ এসে পড়ল খুব সামনে, একেবারে কোলের কাছে, ঝিনুকের ওপর। মেয়েটাকে দেখতে দেখতে অপার স্নেহে, অসীম করুণায় তার বুক ভরে যেতে লাগল। এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল, তার বাবা অবনীমোহন পশ্চিম বাংলার মানুষ, মা পূর্ব বাংলার মেয়ে। তার বুকে একধারে পূর্ব বাংলা, আরেক ধারে পশ্চিম বাংলা। তার রক্তের এক স্রোত পদ্মা, আরেক স্রোত গঙ্গা। আর কোলের কাছে এই মেয়েটা—এই ঝিনুক? সে তো পূর্ব বাংলার লাঞ্ছিত, অপমানিত আত্মা। তাকে নিয়েই সে কলকাতায় চলেছে।

হঠাৎ প্রাণের ভেতর কী হয়ে গেল, কে বলবে। বড় মায়ায় ঝিনুককে সে বুকের কাছে নিবিড় করে টেনে আনল।

পুকুর পার থেকে একসময় হেমনাথের গলা ভেসে এল, 'আর দেরি করিস না রাজেক, নৌকো ছেড়ে দে—'

মাঝি বলল, 'এই ছাড়ি—'

একটু পর জলে বৈঠা পড়ল, একটানা বাজনার মতন ছপছপ শব্দ কানে আসতে লাগল।

নৌকো অকূলে ভাসল।

॥ দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥